জীবনানন্দ নিয়ে প্রবন্ধ

জীবনানন্দ নিয়ে প্রবন্ধ

সম্পাদনা

প্রণব চৌধুরী



জীবনানন্দ নিয়ে প্রবন্ধ
প্রণব চৌধুরী
প্রকাশক : কমলকান্তি দাস, মোরশেদ আলম, অক্টোবর ১৯৯৯

JIBANANANDA NIYA PROBANDA Edited by Pranab Chowdhury.

সূচনা

রবীন্দ্রনাথের পর, বাংলা নতুন কবিতার আস্বাদনে জীবনানন্দ যে শ্রেষ্ঠ, আজ আর তা বলে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। হয়তো আমাদের কাব্যবোধেই ঘাটতি ছিল, নয়তো তাঁর মতো কবিকে আবিষ্কার করতে এতোটা দেরি হলো কেন! শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দ উঠে এলেন,—তাঁর কবিতা পাঠকপ্রিয়তা ও কাব্যগুণে পরিচিতি লাভ করলো গোটা বাঙালির মন-মানসে। জীবনানন্দকে নিয়ে শুরু হলো লেখালেখি ঃ আদিতে বুদ্ধদেব বসু, তারপর সঞ্জয় ভট্টাচার্য থেকে আজকের অম্বুজ বসু—আবদুল মান্নান সৈয়দ। কবির জন্মশতবার্ষিকী সামনে রেখে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকায় 'জীবনানন্দ—সংখ্যা'। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র, প্রবন্ধ-কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা। বাংলা গবেষণা—সাহিত্যের একজন প্রধান লক্ষ্যপুরুষ আজ জীবনানন্দ দাশ।

একদিন জীবনানন্দ পড়ানোর দুঃসাহস করেছিলাম এই আজ থেকে তেইশ বছর আগে—এম. এ শেষ পর্বের বিকল্পপাঠ হিসেবে। ত্রিশোত্তর কবিতার কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র আমাকে জীবনানন্দ পড়াতে বাধ্য করেছিল। তারা আজ সবাই কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। সেদিন জীবনানন্দ পড়াতে গিয়ে যে উপলব্ধি ও অনুসন্ধান জেগেছিল, তাতে বারবার মনে হয়েছিল—কবিতা পড়ার আনন্দ—আবেগ ও অন্তর্গত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণদানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। সেইসঙ্গে এটিও অনুভব করেছিলাম—একটি ছাত্রপাঠ্য জীবনানন্দ-আলোচনা-সংকলন অনিবার্য। সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই বলতে চাই--আজ অবধি সে অভাব পূরণ হয়নি। বরং যুগপৎ অগ্রগতি ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে জীবনানন্দ আর বিকল্প নন—অবশ্যপাঠ্য। সংকট এখানেই—সহায়ক-সহজ আলোচনা সুলভ ও একত্রে না পাওয়ায় জীবনানন্দের পঠন-পাঠনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। খুব কাছে থেকে এটি প্রত্যক্ষ করে আমি এক ধরনের বেদনা বোধ করি। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী জীবনানন্দ স্পর্শ না করেই পার পেয়ে যাচ্ছে। কী একটি নিদারুণ অসম্পূর্ণতা তাদের মধ্যে রয়ে গেল চিরদিনের মতো!

বর্তমান সংকলন মূলত আমার এই দায়বদ্ধতা থেকে। জীবনানন্দ কবিমানস ও কাব্যসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে ভূমিকাস্বরূপ করে পরপর এনেছি তাঁর যেসব প্রসঙ্গ ঘিরে বারবার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—প্রকৃতিচেতনা, প্রেম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পরাবাস্তবতা, সমকাল-সমাজ; তাঁর কাব্য-প্রকরণের বিভিন্ন দিক—চিত্রকল্প, উপমা-শব্দ-ছন্দ এবং প্রধান কয়েকটি কাব্যের আলোচনা। মৃত্যুভাবনার ওপর একটি প্রবন্ধও যুক্ত করেছি পরিপূরক বিবেচনায়। সবশেষে, জীবনানন্দের বরিশাল পর্বের অনুবাদ ও তাঁর জীবন-কাব্যপঞ্জি। বলাবাহুল্য, জীবনানন্দকে সব্যসাচী লেখক প্রমাণের সাম্প্রতিক যতো চেষ্টাই হোক, আমি তাঁকে কবিই মনে করি এবং সে কারণে তাঁর অপরাপর সৃষ্টিশীলতার মূল্যায়নে বিরত থেকেছি।

জীবনানন্দ-কবিপ্রতিভা বিচারের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনারীতিকে এ গ্রন্থে উপস্থিত করার প্রয়াস পেয়েছি। সংগত-ভাবেই নানাজনের পরামর্শ ও সহযোগিতার দ্বারস্থ হতে হয়েছে আমাকে। এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ঃ আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বিশিষ্ট গবেষক তিতাশ চৌধুরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আশরাফুল ইসলাম ও বিভাগীয় সহকর্মীবৃন্দ। বেশ কিছু বিরল প্রবন্ধ পাঠিয়ে বাধিত করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত সত্যভারতী বিদ্যাপীঠের বাংলার মেধাবী শিক্ষক শ্রীউত্তম সাহা। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন-এর স্বত্বাধিকারী কল্যাণীয় কমলকান্তি দাস ও মোরশেদ আলম অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিলেন। সবাই আমার নিত্যশুভার্থী, তবু তাঁদের কাছে ঋণস্বীকারে আমার অপার আনন্দ।

প্রণব চৌধুরী

উৎসর্গ

আমার আত্মজ
সৌভিক চৌধুরী
সৌম্য চৌধুরী
বর্তমান ও ভবিষ্যতের দুই জীবনানন্দ-পাঠক

সূচিপত্র

কবি জীবনানন্দ

কবি জীবনানন্দ—বুদ্ধদেব বসু ❑ ১১
জীবনানন্দ দাশ—আবুল ফজল ❑ ২৬
জীবনানন্দ দাশের কবিতা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য ❑ ৩২
নতুন করে দেখা—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ৪১
জীবনানন্দের চার-অধ্যায়—অশ্রুকুমার সিকদার ❑ ৪৮
জীবনানন্দের কবিতা ঃ অনিমেশ আলোর বলয়—অমলেন্দু বসু ❑ ৬৭
জীবনানন্দ দাশ ঃ একটি ভূমিকা—আবদুল হাফিজ ❑ ৮১
জীবনানন্দ পাঠের প্রাসঙ্গিকতা—মঞ্জুভাষ মিত্র ❑ ৯১
জীবনানন্দ ঃ শিকড়ের সঙ্গে যোগ—মানস মজুমদার ❑ ১০৫

জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনা

জীবনানন্দের কাব্যে প্রকৃতি—বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় ❑ ১১২
প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ—শুদ্ধসত্ত্ব বসু ❑ ১২০
জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনা—প্রদ্যুম্ন মিত্র ❑ ১৩০
জীবনানন্দের কবিচেতনায় বাংলা—সন্তোষ চক্রবর্তী ❑ ১৬৪

জীবনানন্দের কাব্যে প্রেম

প্রেমের কবি জীবনানন্দ—শুদ্ধসত্ত্ব বসু ❑ ১৭৬
জীবনানন্দের নারীপ্রেম—বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায় ❑ ১৮৬
জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা—আবদুল মান্নান সৈয়দ ❑ ১৯৮
জীবনানন্দের কাব্যে প্রেম—প্রদ্যুম্ন মিত্র ❑ ২০৯

জীবনানন্দের কাব্যে ইতিহাস-ঐতিহ্য

জীবনানন্দের কাব্যে ইতিহাস ও *ঐতিহ্য—দীপ্তি ত্রিপাঠী* ❑ ২৫১
জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা — বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় ❑ ২৫৫
জীবনানন্দের কবিতায় ইতিহাস-ঐতিহ্য — প্রদ্যুম্ন মিত্র ❑ ২৬২

জীবনানন্দের পরাবাস্তবতা

জীবনানন্দ ঃ প্রথম বাঙালি সুররিয়ালিস্ট কবি—দীপ্তি ত্রিপাঠী ❑ ২৮৭
জীবনানন্দের কবিতায় পরাবাস্তবতাবাদ-বাঁশরী রায়চৌধুরী ❑ ২৯২
জীবনানন্দের পরাবাস্তবতা—শুদ্ধসত্ত্ব বসু ❑ ৩০২
জীবনানন্দের পরাবাস্তবতা, কোন অর্থে?—মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ❑ ৩০৭
প্রসঙ্গ ঃ জীবনানন্দের সুররিয়ালিজম—বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় ❑ ৩১১

জীবনানন্দের কাব্যে সমকাল-সমাজ

বারবার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে—সুজিৎ ঘোষ ❑ ৩১৭
জীবনের সম্ভাবনা খুঁজে তিনি কবি—কৃষ্ণগোপাল রায় ❑ ৩৩৩
জীবনানন্দের সমাজচৈতন্য—দীপ্তি ত্রিপাঠী ❑ ৩৪১
একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে—সুব্রত রাহা ❑ ৩৪৯

জীবনানন্দের মৃত্যুচিন্তা

জীবনানন্দের মৃত্যু-ভাবনা—রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী ❑ ৩৫৬

জীবনানন্দের কাব্যাঙ্গিক

'চিত্ররূপময়'—দীপ্তি ত্রিপাঠী ❑ ৩৬১
'উপমাই কবিত্ব'—শুদ্ধসত্ত্ব বসু ❑ ৩৭০
জীবনানন্দের শিল্প-প্রকরণ—দীপ্তি ত্রিপাঠী ❑ ৩৭৪
জীবনানন্দের ভাষা-ব্যাকরণ—সৈকত আসগর ❑ ৩৮১
ছন্দকুশলী কবি জীবনানন্দ—নীলরতন সেন ❑ ৩৯১

কাব্যালোচনা

'ঝরা পালক' থেকে 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'—ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ❑ ৪০৫
জীবনানন্দের কয়েকটি কাব্য—রথীন্দ্রনাথ রায় ❑ ৪২১
জীবনানন্দ দাশ ঃ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—বুদ্ধদেব বসু ❑ ৪২৮
'রূপসী বাংলা' ও জীবনানন্দ দাশ—মঞ্জুভাষ মিত্র ❑ ৪৩৬
'বনলতা সেন'—আবুল হোসেন ❑ ৪৫৭
জীবনানন্দ দাশ ঃ 'বনলতা সেন'—বুদ্ধদেব বসু ❑ ৪৫৯
'সাতটি তারার তিমির'—অশোক মিত্র ❑ ৪৬৩

পরিশিষ্ট

জীবনানন্দের বরিশাল-পর্ব— ক্লিনটন বুথ সিলি ❑ ৪৬৬
অনুবাদ ঃ ফারুক মঈনউদ্দীন
জীবনানন্দ ঃ জীবন ও কবিতাপঞ্জি—অসিতাভ দাশ ❑ ৪৮১

কবি জীবনানন্দ

বুদ্ধদেব বসু

ঢাকা, গ্রীষ্মকাল, ১৯২৭। হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হলো। শুয়োপোকার খোলশ ঝরে গেলো, বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন প্রজাপতি কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষণিক বলেই কোনো-কিছু উপেক্ষণীয় নয়; কারো হয়তো অল্প সময়েই কিছু করবার থাকে, সেটুকু করে দিয়েই সে বিদায় নেয়।

'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার—যাঁর 'বেদে', 'টুটা-ফুটা' সবেমাত্র বেরিয়েছে—তাঁকেও বলা যায় সদ্য-সমাগত। এই দু-জন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপক্রমণিক; বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে তাঁদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনও ভেঙে যায়নি। আর এঁদের মধ্যে—সম্পাদক দু'জনকে বাদ দিয়ে—যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হতো তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল মিত্র' বা ওই রকম কোনো ছদ্মনামে, নিপুণ ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর স্বনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে. তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতি'র পাতা উজ্জ্বল করেছিল। তাঁর সাহিত্যজীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়: লোকে তাঁর স্বনামকেই বেনাম বলে ভুল করছে; অনেকেই বিশ্বাস করছে না 'বিষ্ণু দে'-র মতো সংক্ষিপ্ত ও সুশ্রাব্য নাম বাস্তব কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব।

কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ্য করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিলো যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারিনি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম—এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতিসূক্ষ্ম—ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ—যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।

'প্রগতি'র প্রথম বছরের বাঁধানো সেটটি আমার অনির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার থেকে অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে, অন্য কোথাও থেকে তা সংগ্রহ করতেও পারলাম না। পত্রিকার সূত্রপাত থেকেই জীবনানন্দর লেখা সেখানে বেরিয়েছে এই রকম একটা ধারণা আছে আমার; কিন্তু প্রথম বছরে কোন-কোন লেখা বেরিয়েছিলো সেটা স্পষ্টভাবে

মনে আনতে পারছি না। খুব সম্ভব তার মধ্যে ছিলো '১৩৩৩', 'পিপাসার গান' আর 'অনেক আকাশ'। সৌভাগ্যত, দ্বিতীয় আর অসমাপ্ত তৃতীয় বছরের সংখ্যাগুলি এখনো আমার হাতের কাছে আছে, আর তাতে—এখন পাতা উল্টিয়ে প্রায় অবাক হয়ে দেখছি—প্রথম দেখা দিয়েছিলো 'সহজ', 'পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', 'পুরোহিত' (পরবর্তী নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'), 'কয়েকটি লাইন', 'বোধ', 'আজ', 'অবসরের গান'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সতেরোটি কবিতার মধ্যে 'পাখিরা', 'কল্লোলে', 'ক্যাম্পে', 'পরিচয়ে', 'মৃত্যুর আগে', 'কবিতায়', আর কোনো কোনোটি 'ধূ'পছায়া'য় বেরিয়েছিলো, কিন্তু অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ 'প্রগতি'তে তার উপর যখন বই ছাপা হলো তখন ধাত্রীর কাজও আমি করেছিলাম; তাই ওই গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের একটি অংশ বলে মনে হয় আমার। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে 'আজ' নামক স্তবকবিন্যস্ত দীর্ঘ কবিতাটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই, পরবর্তী অন্য কোনো গ্রন্থেও গৃহীত হয়নি।

'প্রগতি'তে, শুধু প্রকাশ করা নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ্য ছিলো আমাদের। তার জন্যে মনের মধ্যেই তাগিদ ছিলো, বাইরে থেকেও উত্তেজনার অভাব ছিলো না। দেশের মধ্যে উগ্র হয়ে উঠেছিলো সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লন্ডনে-পাস-করা প্রোফেসর, আর কেউ বা ফরাসি, জর্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন। তুলনায় আমরা, যারা নেহাতই কলেজের ছাত্র কিংবা সবেমাত্র উত্তীর্ণ, যে-কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না-বললেও চলে; কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ কথাকে কীটের অন্নে পরিণত করে একটিমাত্র কবিতার পঙ্‌ক্তি তারার মতো জ্বলজ্বল করে, তাই আমরা হেরে যাইনি, ভেঙে যাইনি, সরে যাইনি, দাঁড়িয়ে ছিলাম শরবর্ষণের সামনে, কিছু-কিছু প্রত্যুত্তরও দিয়েছিলাম। সেই দু-বছর বা আড়াই বছর, যে-কদিন 'প্রগতি' চলেছিলো, আমি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না-করে প্রতিপক্ষের জবাব দিতেও চেয়েছিলাম—সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, আর ইতর রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া লাল-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘূর্ণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এই রকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, আর তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হতো নিজের বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তেমন হতো না; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হতো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দর প্রসঙ্গ, সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায়, কিছু বেশি পৌনঃপুনিক বলে মনে হয়; তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ সে-কথা ভাবতে আজ আমার খারাপ লাগে। অবশ্য আমি

অচিরেই বুঝেছিলাম যে প্রতিবাদ মানেই শক্তির অপব্যয়, আর পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরে সেই অপব্যয় সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হলো, তা না-হলে সেই সময়কার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যাবে না। আজ নতুন করে স্মরণ করা প্রয়োজন যে জীবনানন্দ, তাঁর কবিজীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত, অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোনো-এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিলো। এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিল যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত করে দেন। অবশ্য প্রতিভার গতি কোনো বৈরিতার দ্বারাই রুদ্ধ হতে পারে না, এবং পৃথিবীর কোনো জন কীটস অথবা জীবনানন্দ কখনো নিন্দার ঘায়ে মূর্ছা যান না—শুধু নিন্দুকেরাই চিহ্নিত হয়ে থাকে মূঢ়তার, ক্ষুদ্রতার উদাহরণস্বরূপ। মার্কিন লেখক হেনরি মিলার একখানা বই লিখেছেন, যার নাম 'Remember to Remember'। এই নামটি উল্লেখযোগ্য, কেননা আমাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক দায়িত্বের বড়ো একটা অংশ হলো মনে রাখা। জীবনে যেখানে-যেখানে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছি সেটা যেমন স্মরণযোগ্য, তেমনি যেখানে কুৎসিতের পরাকাষ্ঠা দেখলাম সেটাকে যেন দুর্বলের মতো মার্জনীয় বলে মনে না করি। যেন মনে রাখি, মনে রাখতে ভুলে না যাই।

॥ ২ ॥

'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দর কবিতা বিষয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছিলো তার কিছু-কিছু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই উদ্ধৃতিগুলির লেখক আর বর্তমান প্রবন্ধকার ঐতিহাসিক অর্থে একই ব্যক্তি; কিন্তু এর রচনাভঙ্গি, আর লেখার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অবিরল ব্যবহার দেখে আজ আমার কর্ণমূল আরক্ত হচ্ছে। তবু, সব দোষ সত্ত্বেও, অংশগুলি অন্য কারণে ব্যবহার্য হতে পারে; প্রথমত, এতে বোঝা যাবে একজন প্রথম ভক্ত পাঠকের মনে জীবনানন্দর কবিতা কী-রকমভাবে সাড়া তুলেছিলো; দ্বিতীয়ত, এই তিরিশ বছরে বাংলা কবিতা কতদূর অগ্রসর হয়েছে তা বোঝার পক্ষেও এগুলো কিঞ্চিৎ কাজে লাগতে পারে।

জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একট অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ;—অচিন্ত্যবাবুর মতো তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ। তাঁর কবিতা একটু ধীরে-সুস্থে পড়তে হয়; আস্তে আস্তে বুঝতে হয়।

জীবনানন্দবাবুর কবিতায় যে-সুরটি আগাগোড়া বেজেছে, তাকে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়।....তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট করে ভালো কি মন্দ বলা যায় না—তবে "অদ্ভুত" স্বচ্ছন্দে বলা যায়। তাঁর

প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তার অনুকরণ করাও সহজ বলে মনে হয় না। [তিনি] এমন সব কথা বসাচ্ছেন যা পূর্বে কেউ কবিতায় দেখতে আশা করেনি—যথা, "ফেঁড়ে" "নটকান", "শেমিজ", "থুতনি" ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতায় যে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য এসেছে সে কথা আগেই বলেছি; তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরি করে' নিতে পেরেছেন, এর জন্য তিনি গৌরবের অধিকারী।

এ-কথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে।.....জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান,—সে মায়াপুরী হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকবো। [সেইজন্যেই] আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় "renascence of wonder" ঘটেছে।***

[তাঁর] ছন্দ অসমছন্দ হলেও "বলাকা"র ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য কানেই ধরা পড়ে,—"বলাকা'র চঞ্চলতা, উদ্দাম জলস্রোতের মতো তোড় এর নেই;—এ যেন উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী—থেমে-থেমে অজস্র ড্যাশ ও কমার বাঁধে ঠেকে-ঠেকে উদাস, অলস গতিতে বয়ে চলেছে। এতে প্রচুর উৎসাহের তাড়া নেই, আছে একটি মধুর অবসাদের ক্লান্তি। এই সুর যেন বহু দূর থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে।

জীবনানন্দবাবুর.....বহু কবিতায়.....পরমবিস্ময়কর কথা-চিত্র পাওয়া যায়, সে ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subdued।... দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ক'টি লাইন নেয়া যাক—

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে—
তবুও হৃদয়ে গান আসে!
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে!
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান!
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা,—জানি আমি—

আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
তবুও হৃদয়ে গান আসে!

এখানে যেন কথা শেষ হয়েও শেষ হয়নি,—কথা ফুরিয়ে গেলেও তার বিষণ্ন সুরটি পাঠকের মনকে যেন haunt করতে থাকে। একটি বা কয়েকটি লাইন পুনরাবৃত্তি করার....ফলে গোটা কবিতাটি যেন চট করে থেমে যায় না, ভ্রমরের পাখার মতো গুঞ্জন করে ভেসে যায়।

['প্রগতি'—আশ্বিন, ১৩৩৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য]

অনিল। ***আজকালকার একটি কবির লেখা পড়ে' আমার আশা হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ। কে তিনি?

অনিল। জীবানন্দ দাশ?

সুরেশ। জীবানন্দ দাশ? কখনো নাম শুনিনি তো!

অনিল। জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। তাঁর নাম না শোনবারই কথা! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তার প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি—'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে।'....আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটি লাইনে আঁকা হয়েছে—একেই বলে magic linc। আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হয়ে উঠেছে; শব্দের মূল্য-বোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালি কবিই দিয়েছেন।

সুরেশ। (অনিচ্ছাসত্ত্বে) লাইনটি ভালো বটে।

অনিল। এই কবি.....উভচর ভাষা অবলম্বন করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আজকালকার কবিদের মধ্যে তাঁর ভাষা সব চেয়ে স্বাভাবিক। সরল, নিরলঙ্কার, ঘরের ভাষার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ শুনবে? তুমি যদি অনুমতি করো, প্রগতি থেকে জীবনানন্দর একটি কবিতার খানিকটা পড়ে শোনাই।

সুরেশ। শুনি?

অনিল। (পড়িল)।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।
অন্ধকার—নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা

যেতেছ জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে—ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছ জলের মতন,
রাতের বাতাস তুমি—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

এই passage-টির একমাত্র weak point হচ্ছে রধির কথাটা। তা ছাড়া একেবারে নিখুঁত। এতে melody না থাক, music আছে একটা ক্লান্ত উদাস সুরের meandering। থেমে-থেমে পড়তে হয়—তবে সুরটি কানে ধরা পড়বে। যেমন—'রাতের, বাতাস তুমি। বাতাসের, সিন্ধু, ঢেউ॥ তোমার, মতন কেউ; নাই আর॥'

সুরেশ। তা তো বুঝলাম, কিন্তু 'ছেঁড়া দেহ'।

অনিল। ঠিকই—দেহ কথাটা এখানে সঙ্গত হয়নি। শরীর কথাটাকে তো তিনিই [জীবনানন্দ] জাতে তুলে দিয়েছেন। তবে দেহ কথাটাও তো কেবলমাত্র অভিধানগত নয়।

সুরেশ। দেহ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছুই ছিলো না, কিন্তু ছেঁড়া!

অনিল। ছিন্ন না বললে মানে বোঝো না নাকি?

সুরেশ। ছেঁড়া শুনলেই হাসি পায়।

অনিল। অনভ্যাস। সয়ে গেলেই এর সৌন্দর্য ধরা পড়বে। দ্যাখো, এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর বাঙলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাঙলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা—তার ব্যাকরণ, তার বিধি-বিধান, তার spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা।......অথচ, আশ্চর্যের বিষয় বাঙলা কবিতা এখন পর্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত convention গুলো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি; আমাদের কবিতায় এখনো সুন্দরীরা বাতায়ন-পাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলিত করে দেয়, মুকুরে মুখ দেখে, চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করে, শুভ্র ও শীতল শয্যায় শোয়। আমাদের নায়িকাদের এখনো হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং ইত্যাদি, যদিও ও-সব ফ্যাশান দেশ থেকে বহুকাল উঠে গেছে। সংস্কৃতের দুয়ারে এই কাঙালপনা করে আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোট করে রাখবো? আমাদের ভুল জীবনানন্দ দাশ বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাঙলা করে' তোলবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাহস করে লিখেছেন·

সেই জল মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা—শাদা—বরফের কুচির মতন।

শুনে তোমার—শুধু তোমার কেন? অনেকেরই—হাসি পাবে, বলবে—'ঠাণ্ডা—শাদা এ আবার কী?' কিন্তু ওই শব্দ দুটো গদ্যে লিখতে পারি, মুখে বলতে পারি—আর কবিতাতেই লিখতে পারবো না? কেন কবিতায় জানালাকে জানালা বলবো না, বিছানাকে বিছানা?.....যত কথা আমাদের মুখের ভাষার স্থান পেয়েছে.....কাব্যসমাজ থেকে তাদের একঘরে করে রেখে কেন আমরা আমাদের কবিতাকে এক বিপুল শব্দ-সম্ভার থেকে বঞ্চিত করবো? মৌখিক ভাষার ইডিয়মগুলো ব্যবহার করে কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ করে তুলবো না কেন?.....আমি তো বলি, ক্ষণিকার ভাষা, জীবনানন্দের কবিতার ভাষা purest বাঙলা, কারণ তা বাঙলা ছাড়া আর কিছু নয়'।

('প্রগতি'—ভাদ্র, ১৩৩৬, 'বাঙলা কাব্যের ভবিষ্যৎ')

ইচ্ছে করেই উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ করলাম, সেই সময়কার সাহিত্যিক আবহাওয়ার কিছু আভাস দেবার জন্য। আজকের দিনের পাঠক নিশ্চয়ই এ-কথা ভেবে অবাক হচ্ছেন যে কবিতায় 'ঠাণ্ডা' বা 'শাদা' কথাটার ব্যবহারের সমর্থনের জন্য এতগুলো বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু এ-কথা সত্য যে গম্ভীর ভাবের কবিতায় দেশজ ও বিদেশী শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দর আগে অন্য কোনো বাঙালী কবি করেননি। মনে পড়ছে 'পাখিরা' কবিতা পাঠেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিলো 'স্কাইলাইটে'র জন্য, 'প্রথম ডিমে'র জন্য, 'রবারের বলের মতন' ছোটো বুকের জন্য, আর সেখানে 'লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে' মৃত্যু ছিলো বসে। ওটা যে ঐকান্তিক চমক-লাগানো ব্যাপার নয়, সপ্রাণ এবং সজীব নূতনত্ব, এতদিনে সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়ে গেছে। এমনকি, মৌখিক ভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাতে কাব্যের স্পন্দন তিনি এনেছিলেন; 'তোমার শরীর—তা-ই নিয়ে এসেছিলে একদিন', এই পঙ্ক্তিটি পড়ে আমি 'শরীর' কথাটাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরে'র অস্তিত্ব আমরা শুনিনি, শুনেছি 'দেহ', 'দেহলতা', 'তনুলতা', 'দেহবল্লরী'। এই উদাহরণ আমাদেরও রচনার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

॥ ৩ ॥

কবে কোথায় জীবনানন্দকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ছে না। পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও 'কল্লোল'-আপিশে তিনি আসতেন না, কিংবা কদাচ আসতেন; অন্তত আমি তাঁকে কখনো সেখানে দেখিনি। হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিঙের তেতরা কিংবা চারতলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম মনে পড়ে, আর একবার কলেজ স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করতে করতে বৌবাজারের মোড়ের কাছে এসে ধরে ফেলেছিলাম। কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় এলেন একবার, মেঘলা দিনে মাঠের পথে ঘুরলাম তাঁর সঙ্গে; পরে, তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে, ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত আছি অজিত, আমি, অন্যান্য বন্ধুরা। কলকাতায় চলে আসার পর রমেশ মিত্র রোডের একতলা ঠাণ্ডা ঘরে তাঁর সঙ্গে বসে আছি, শীতকাল, বিকেল হয়ে এল। হঠাৎ চেয়ার-টেবিল নড়ে উঠলো, আমরা বাইরে ছোট্ট বারান্দায়

এসে দাঁড়ালাম, মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বসলাম আবার। পরের দিন কাগজে পড়লাম উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের খবর। কিন্তু এই সবই ঝাপসা স্মৃতি, এদের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। আসলে, জীবনানন্দর স্বভাবে একটি দূরতিক্রম্য দূরত্ব ছিল—যে-অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতার, তা-ই যেন মানুষটিকেও ঘিরে থাকতো সব সময়—তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন; তিন বা চার বছর আগে সন্ধেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম—আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না; তাই আবার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে করে পেছিয়েও পড়েছি কখনো-কখনো, তাঁর নির্জনতা ব্যাহত করিনি। কখনো এলে বেশিক্ষণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব-সংকোচ। যুদ্ধের তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে একবার পাক্ষিক সাহিত্যসভার ব্যবস্থা করেছিলুম; তাতে, এ. আর. পি.র কর্মভার সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে আসতেন, কিন্তু জীবনানন্দ এসেছিলেন একবার মাত্র; এসে, একটি কবিতা পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে, অথবা তারই ফলে, আমাদের একটু অপ্রস্তুত করে দিয়ে আকস্মিকভাবে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর মুখে তাঁর নিজের কবিতাপাঠ আমি কখনো শুনিনি, যদিও শুনেছি ইদানীং তরুণদের কাছে তাঁর সংকোচ কেটে গিয়েছিলো। অথচ, সেই 'প্রগতি'র সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিলো বিরামহীন; দেখাশোনায় যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি গভীর করে তাঁকে পেয়েছি তাঁর রচনার মধ্যে—যার অনেকটা অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই ঘটে গেছে। এই সম্বন্ধ পঁচিশ বছরের মধ্যে শিথিল হয়নি; 'কবিতা' প্রকাশের অন্যতম পুরস্কার ছিলো আমার পক্ষে একসঙ্গে তিনটি-চারটি করে পাঠানো তাঁর নতুন কবিতা পড়া; আনন্দ পেয়েছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রুফ দেখে, 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'বনলতা সেন' প্রকাশে তাঁর সম্মতি পেয়ে, তাঁর বিষয়ে লিখে, কথা বলে, তাঁকে আবৃত্তি করে। বাংলা কবিতার যতগুলো পঙ্‌ক্তি বা স্তবক আমার বিবর্ধমান বিস্মরণশক্তি এখনও হারিয়ে ফেলেনি, কিংবা পরিবর্তমান রুচি বর্জন করেনি, যেগুলোকে আমি বহু বছর ধরে অনেকটা রক্ষাকবচের মতো মনে-মনে বহন করে আসছি, তার মধ্যে জীবনানন্দর পঙ্‌ক্তির সংখ্যা অনেক। সেই সব কবিতা বেঁচে আছে আমার মনে, অন্য অনেক পাঠকেরও মনে—ভাবী কালেও বেঁচে থাকবে; তবে আজ এই কথা ভেবেই দুঃখ করি যে আমাদের পক্ষে স্বল্পপরিচিত সেই মানুষটিকে আর চোখে দেখবো না।

॥ ৪ ॥

জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু আলোচনা আমি করেছি; আজ আবার পড়ে আরো কিছু নতুন কথা আমার মনে হচ্ছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইন্দ্রিয়বোধের আনুগত্যে তিনি অতুলনীয়, রূপদক্ষতাই তাঁর চরিত্রলক্ষণ—আর এ-সব কথা পাঠকমহলে যথেষ্টরকম জানাজানিও হয়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু তাঁর কবিতার

মধ্যে দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, তারা যেন পরস্পরকে পরিপূরণ করে চলেছে। একদিকে আমরা রাখতে পারি যে-সব কবিতা বিশুদ্ধ বর্ণনার, অথবা স্মৃতিভারাতুর, অনুষঙ্গময়, নস্টালজিয়ায় পরাক্রান্ত; যেমন 'মৃত্যুর আগে', 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত'—পাঠক আরো অনেক জুড়ে নিতে পারবেন—আমি 'নির্জন স্বাক্ষর' বা '১৩৩৩' ধরনের প্রেমের কবিতাকেও এরই অন্তর্গত করতে চাই। অন্য দিকে আছে যে-সব কবিতা মননরূপী শয়তান অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা কিছু বলতেও চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আরো-নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ করবো 'বোধ', 'ক্যাম্পে', আর সেই লাসকাটা ঘরের আশ্চর্য কবিতাটি, যার নাম দেয়া হয়েছিলো 'আট বছর আগের একদিন'। 'কয়েকটি লাইনকে বলা যায় 'বোধের' সঙ্গী-কবিতা—দুটিই কবির স্বগতোক্তি—প্রথমটিতে কবি নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন হয়ে ঘোষণা করছেন তাঁর নূতনত্ব ('কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী,/আমি ব'হে আনি'), বলে দিচ্ছেন তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য কোনখানে ('উৎসবের কথা আমি কহি নাক',/পড়ি নাক' দুর্দশার গান/শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান'); আর দ্বিতীয়টিতে জীবনের সঙ্গে কাব্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত তিনি, তাঁর 'বোধ', আর-কিছু নয়, তাঁরই কবিপ্রতিভা, যার তাড়নায় 'সকল লোকের মাঝে বসে/আমার নিজের মুদ্রাদোষে/ আমি একা হতেছি আলাদা'। আবার, তাঁর আবেগরঞ্জিত বেদনাময় বর্ণনার কাব্যেও বিভিন্ন বিভাগ করা যায়; প্রথমত, সান্ধ্য বা নৈশ কবিতা, বা যে-কবিতায় সকল সময়কেই সন্ধ্যার মতো মনে হয়, যেখানে আলো ম্লান, ছায়া ঘন, কুয়াশার পরদা ঝুলে আছে ('মাঠের গল্প,' 'হায় চিল', 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'শঙ্খমালা'); দ্বিতীয়ত, আলো যেখানে উজ্জ্বল আর প্রবল অবয়ব নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ('অবসরের গান', 'ঘাস', 'শিকার', 'সিন্ধু-সারস'), আর তৃতীয়ত, যে-সব কবিতায় একাধারে স্থান পেয়েছে আলো আর অন্ধকার, রৌদ্র আর রাত্রি, কান্তি আর অবগুণ্ঠন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিকে আমি ফেলতে চাই না, কেননা বাংলার পল্লীপ্রকৃতির এই চিত্রশালাটিতে 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি'কে যদিও একবার দেখা যায়, আর 'ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ-সহজ' ভোরবেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর পক্ষপাত নৈশতার দিকেই, পড়তে-পড়তে আমাদের মন বারে-বারেই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তায় মন্থর হয়ে আসে। আমি ভাবছিলাম 'হাওয়ার রাত' বা 'অন্ধকার'-এর মতো কবিতার কথা, যেখানে তারা-ভরা অন্ধকারের কথা বলতে-বলতে কবির হৃদয় 'দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে' ভরে যায়, যেখানে 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে' কবি হঠাৎ 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে' জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য আর সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী'। ভাবছিলাম 'নগ্ন নির্জন হাতে'র বিস্ময়কর গঠনের কথা—কবিতাটির আরম্ভ অন্ধকারে, তার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকার, অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ' আমাদের মনে এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো

ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'হায়-চিল্'-এ দুপুরবেলাতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার রাত' কবিতায় অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উতরোল হয়ে উঠলো—'মৃত্যুর আগে'র ছবিগুলোর মতো এ-সব ছবি স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, তারা কবির ভাবনা-বেদনারই প্রতিফলন।

॥ ৫ ॥

আলোচনার আরো অনেক ক্ষেত্র আছে। দেখানো যেতে পারে, বিদ্রূপের শক্তি তাঁর হাতে কী-রকম আত্মস্থ আর গম্ভীর হয়ে উঠেছিলো। 'সোনার পিত্তলমূর্তি' অথবা 'অজর, অক্ষর অধ্যাপকে'র উদ্দেশে লেখা পঙ্‌ক্তিগুলিতে',[১] কিংবা কেমন করে আলোছায়ার দৃশ্যমান জগৎ থেকে তিনি স্বপ্নগোচর অতিবাস্তবের মায়ালোকে প্রবেশ করছিলেন 'বিড়াল', 'ঘোড়া', 'যেই সব শেয়ালেরা' ধরনের কবিতায়। শেলি, কীটস, পূর্ব-ইএটস আর কোথাও-কোথাও সুইনবার্নকে তিনি কেমন করে ব্যবহার করেছিলেন তা তুলনার দ্বারা দেখানো যেতে পারে; সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ইএটস-এর 'O curlew'-র তুলনায় তাঁর 'হায় চিল' অনেক বেশি তৃপ্তিকর কবিতা, আর 'The Scholars' সঙ্গে 'সমারূঢ়ে'র সম্বন্ধ যেমন স্পষ্ট, তার স্বাতন্ত্র্যও তেমনি নির্ভুল। 'ওড টু এ নাইটেঙ্গল'-এর কোনো-কোনো পঙ্‌ক্তি। 'অবসরের গান'-এ কেমন নতুন শস্য হয়ে ফলে উঠেছে, তাও সহজেই বোধগম্য। যদি কখনো কোনো পাঠক জীবনানন্দর অ-াংরক্ত, অ-মানবিক জগতে শ্রান্তি বোধ করেন, তাঁকে অনুরোধ করা যায় 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' পুনর্বার পড়তে—জীবনানন্দর সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই দুটি কবিতা সবচেয়ে প্রাণতপ্ত ও স্তরবহুল; এখানে তিনি মানুষের ঘুম আর জাগরণকে একই রকম 'সচ্ছল'ভাবে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হননি ('জাগিবার কাল আছে—দরকার আছে ঘুমাবার;/এই সচ্ছলতা আমাদের'), নিজের কথা নিজে লঙ্ঘন করে উৎসবের কথা বলেছেন, ব্যর্থতার গানও গেয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতায় মৃগয়ার গল্প অবলম্বন করে 'প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ' তুলেছেন তিনি মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হয়ে আছে 'কোথাও ফড়িঙে কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে', যার ক্ষমতার চাপে ক্ষমতাশালী মাংসাশী শিকারিদেরও হৃদয়গুলো 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের' মতোই পাংশু হয়ে পড়ে থাকে। আর, 'মৃত্যুকে দলিত করে' 'জীবনের গম্ভীর জয়' তিনি প্রচার করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'-এ। এই কবিতাটি এতই দ্যোতনাময় যে এটিকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখালে আলোচনার সহায়তা হতে পারে। এর আরম্ভ—'শোনা গেল লাসকাটা ঘরে/নিয়ে গেছে তারে।' ক্রমশ আমরা জানতে পারলাম যে কোনো এক পুরুষ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে—আর এই খবরটি শুনেই কবি অনুভব করলেন—মৃত্যুকে নয়, তাঁর চারদিকে চাঁদ-ডুবে-যাওয়া অন্ধকারে 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা'কে :

তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে।
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।
টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে

চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

মনে পড়লো বাঁচার ইচ্ছার, বাঁচার চেষ্টার অন্যান্য উদাহরণ :

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে ফের রৌদ্রে উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি....
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে;—

কিন্তু এই প্রাকৃত প্রেরণা মানুষের পক্ষে তো সর্বস্ব নয় :

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাক' দেখা এই জেনে।

হয়তো গাছের ডাল প্রতিবাদ করেছিলো, ভিড় করে বাধা দিয়েছিলো জোনাকিরা, থুরথুরে অন্ধ পেঁচা ইঁদুর ধরার প্রস্তাব এনে জীবনের 'তুমুল গাঢ় সমাচার' জানিয়েছিলো—কিন্তু চেতনার সংকল্পে প্রকৃতি বাধা দিতে পারলো না।

এর পর অনিবার্য প্রশ্ন : কেন মরলো লোকটা? কোন দুঃখে? কিসের ব্যর্থতায়? না—কোনো দুঃখই ছিলো না; স্ত্রী ছিলো, সন্তান ছিলো, প্রেম ছিলো, দারিদ্র্যের গ্লানিও ছিলো না। কিন্তু—

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়—সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই....

যদি এই অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতার শেষ হতো, তাহলে এটি এত দূর পর্যন্ত আলোচ্য হতো না। কিন্তু ঠিক শেষের ক-লাইনেই আবার আমরা অন্য একটি স্বর শুনলাম—যেন একটি ঢেউ সরে যেতে-যেতে দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো—কবি ফিরিয়ে আনলেন জরাজীর্ণ প্যাঁচাটাকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারেনি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম জপে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ।

আর এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন—'আমরা দু'জনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'—মৃত্যু পার হয়ে বেজে উঠলো জীবনের জয়ধ্বনি; আর—সেই সঙ্গে—নির্বোধ ও পাশবিক জীবনের প্রতি চৈতন্যের বিদ্রূপ।

॥ ৬ ॥

তাঁর উপমা, বিশেষণ ও ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। যেহেতু তিনি মুখ্যত ইন্দ্রিয়বোধের কবি, তাই উপমা তাঁর পক্ষে একটি প্রধান অবলম্বন, তাঁর হাতে বিশেষণও অনেক সময় উপমার মতো কর্মিষ্ঠ। 'শিকার' কবিতায় বত্রিশটি পঙ্ক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে চৌদ্দটি উপমা, 'মতো' শব্দের তেরো বার ব্যবহার; 'হাওয়ার রাত'-এ 'মতো'—সংখ্যা আট। এতে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁদের ভেবে দেখতে বলবো, ভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা বা সমীকরণ ছাড়া বর্ণনার কোনো উপায় আছে কিনা, যে-কোনো কবিতায় কতখানি ছবি থাকে, আর কবি যদি জ্ঞানের ভাষায় কথা বলতে যান তাহলে তিনি কবি থাকেন আর কতটুকু। আর দুটি কথা বিবেচ্য: জীবনানন্দ একটিও উপমা প্রয়োগ না-করে 'আকাশলীনা' ('সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি') বা 'সমারূঢ়' ('বরং নিজেই তুমি লেখ নাকো একটি কবিতা')-র মতো অজর কবিতা লিখেছেন[২]। আর তাঁর অনেক উপমাই সরল বা আক্ষরিক নয়, তা থেকে নানা স্তরে নানা ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হতে থাকে, যেমন গানের পরে অনুরণন। কাস্তের মতো চাঁদ, রবারের বলের মতো বুক, বরফের কুচির মতো স্তন—এই সব উপমার উপর আমি জোর দেবো না, কেননা এদের নির্ভর শুধু চোখে-দেখা বা হাতে-ছোঁয়া সাদৃশ্যের উপর, তাঁর আগে কেউ ব্যবহার করেননি বলেই এরা স্মরণীয়। আমি উল্লেখ করবো আরো আগেকার লেখা একটি পঙ্ক্তি—

আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন—

পড়ামাত্রই আমাদের মনে যে-নূতনত্বের চমক লাগে সেটা অচিরেই কাটিয়ে উঠে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ঠিক লাল রঙের চোখটাকে বোঝানো হচ্ছে না, সন্ধ্যারাগের মদির আবেশের দিকেই এর লক্ষ্য, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে যায় গোধূলির সঙ্গে বিবাহ-লগ্নের সংযোগ। 'মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন'—এটা হলো চাক্ষুষ উপমা, কিন্তু সেই আগুনই যখন সূর্যের আলোয় 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' হয়ে যায়, তখন শুধু ফ্যাকাশে চেহারাটাই আমরা চোখে দেখি না, মনের মধ্যেও নির্বাপণের বেদনা অনুভব করি। কী উপমায়, কী বিশেষণে, একটি ইন্দ্রিয় জাগিয়ে তোলেন তিনি—'ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো পান' করতে হলে বর্ণ, গন্ধ আর আস্বাদকে পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয়; 'বলীয়ান রৌদ্র বললে রোদ যেন আয়তন পেয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার সেই রোদকেই 'কচি লেবুপাতার মতো' নরম আর সবুজ বললে তাকে দেখা যায় তখনও-শিশির শুকিয়ে-না-যাওয়া মাটির উপর সুগন্ধি হয়ে শুয়ে থাকতে। এরই পাশে-পাশে 'পরদায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের স্বেদ' আর সন্ধ্যাবেলায় 'জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীর' চিন্তা করলে রোদ বস্তুটাকে আমরা যেন কোনো স্থাপত্যকর্মের মতো প্রদক্ষিণ করে-করে দেখে নিতে পারি। তেমনি, রাত্রি

কখনো 'বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে', কখনো 'জ্যোৎস্নার উঠানে খড়ের চালের ছায়া' টুকুর মধ্যে স্তব্ধ ও সংহত, কখনো 'নক্ষত্রের রূপালি আগুনে' উজ্জ্বল, আর কখনো দেখি সন্ধ্যার অন্ধকার 'ছোটো-ছোটো বলের মতো' পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। যে-দুটো বস্তু স্বভাবতই খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে উপমাসম্বন্ধ অপ্রচলিত, কিন্তু জীবনানন্দ কখনো-কখনো তাদের একত্র করে দুটোকেই আরো স্পষ্ট করে ফোটাতে পেরেছেন ('কাঁচা বাতাবির মতো ঘাস', 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা'); আবার, যে-দুটো বস্তু অপরিমেয়রূপে অ-সদৃশ, তাদেরও একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে তাঁর বিরাট কল্পনাশক্তি, যার ফলে আমরা পেয়েছি 'চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস', 'পাখির নীড়ের মতো' বনলতা সেনের চোখ, আর আত্মঘাতীর জানালার ধারে 'অদ্ভুত আঁধারে উটের গ্রীবার মতো কোনো এক' প্রবল নিস্তব্ধতা। এ-সব উপমা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির রহস্যালোকে। বৌবাজারের নৈশ ফুটপাতে, যেখানে কুষ্ঠরোগী, 'লোল নিগ্রো' আর 'ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকে'র ছায়াছবির উপর ইহুদি গণিকার আধো-জাগা গানের গলা ঝরে পড়ছে, সেখানকার বাতাস নেহাতই প্রাকৃত অর্থে শুকনো নয়, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার চাপে দেশের মধ্যে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে চিনেবাদামের খোলার মতো শূন্য আর ভঙ্গুর হয়ে উঠলো, এই রকম একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। কোনো মহিলার চোখের আকার নিশ্চয়ই পাখির বাসার মতো হয় না, কিন্তু ক্লান্ত প্রাণের পক্ষে কখনো কোনো চোখ আশ্রয়ের নীড় হতে পারে। যে-মানুষ আপন হাতে মরতে চলেছে তার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো 'উটের গ্রীবার মতো' নিস্তব্ধতা. এই অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত ছবিতে আসন্ন আত্মঘাতের আবহাওয়াটা আরো থমথমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। হয়তো এখানে আরো কিছু ইঙ্গিত আছে, এই 'উট' যেহেতু মৃত্যুর দিকেই প্রলুব্ধ করছে, তাই মনে হয় উপমাটি সেই প্রাচীন কাহিনী থেকে আহৃত, যেখানে উট এসে প্রথমে শুধু ঘাড়টুকু রাখার অনুমতি চাইলো, তারপর প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সমস্ত ঘর জুড়ে গৃহস্থকেই বহিষ্কৃত করে দিলে। অনেক বিশেষণও এই রকম মনস্তত্ত্বঘটিত; আত্মহত্যার উদ্‌যোগের সময় অশ্বত্থের 'প্রধান আঁধার', জীবনপ্রেমিক মশক-সংঘে সমাকীর্ণ 'যূথচারী আঁধার', শিকারের পরে শিকারিদের 'নিরপরাধ' ঘুম, 'প্রগাঢ় পিতামহী প্যাঁচা'র জীবনস্পৃহার 'তুমুল, গাঢ় সমাচার'। 'সমাচার' কথাটাও লক্ষণীয়। মিশনারিরা 'গসপেল'-এর আক্ষরিক অনুবাদ করেন 'সুসমাচার'—এ-কথা মনে রাখলেই ধরা পড়ে যে শব্দটিতে এখানে 'খবরে'র চাইতে অনেক বেশি কিছু বোঝাচ্ছে। শুধু বিশেষণে নয়, বিশেষ্যপদেও, আর সাধারণভাবে ভাষাব্যবহারে তাঁর দুঃসাহসী আক্রমণ বারে-বারেই রত্ন ছিনিয়ে এনেছে। বিদেশী শব্দ, গেঁয়ো শব্দ, কথ্য বুলি, অপ্রচলিত শব্দ, আর যে-সব শব্দকে আশাহীনরূপে গদ্য বলে আমরা জেনেছি—এই সব ভাণ্ডারের উপর সহজ অধিকার তাঁর কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। ছন্দব্যবহারে বৈচিত্র্য নেই, আপাতরমণীয়তাও না, কিন্তু নেই বলে কোনো অভাববোধও নেই আমাদের; যা আছে, তার সম্মোহন এত ব্যাপক যে তিনি আজকের দিনেও অনায়াসে এবং অনাক্রমণীয়ভাবে 'ছিল-দেখিল' মিল দিতে পেরেছেন, যা অন্য কোনো কবির পক্ষে সম্ভবই হতো না। তাঁর

কাব্যের পাঠক শুধু বিশেষণের প্রভাবে আবিষ্ট হবেন বার-বার, শিহরিত হবেন পুনরুক্তির আঘাতে ('এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে শুয়ে আছে কিনা'; 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস/অথবা সবুজ বুঝি ঘাস'), মুগ্ধ হবেন যখন হঠাৎ এক-একটি অত্যন্ত চেনা আর গদ্যধর্মী কথার প্রভাবে পুরো পঙ্‌ক্তিটি আলোকিত হয়ে ওঠে।

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝরে পড়ে তার,—

শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে!

ভব্য সমাজে অনুচ্চার্য একটি ক্রিয়াপদের জন্যই হেমন্ত ঋতুর এই ছবিটি এমন উজ্জ্বল হতে পারলো। তেমনি, বিকেলের আলোর স্বচ্ছ গভীরতায়, শুধু বাইরের প্রকৃতি নয়—আমাদের হৃদয় সুদ্ধ ডুবে গেলো শুধু একটা 'মাইল' শব্দ আছে বলে—

অকূল সুপুরিবন স্থির জলে আলো ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে।

দৃশ্যটিকে 'এক মাইলে'র মধ্যে সীমিত করা হয়েছে বলেই এখানে অসীমের আভাস লাগলো।

উদাহরণ আর বাড়াতে চাই না, কিন্তু এটুকু-না-বললে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না যে তাঁর কাব্যে গদ্য ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিলো যে রীতিমতো বিপজ্জনক শব্দও তাঁর আদেশে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ করে গেছে—

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে
প্রেম ছিল, আশা ছিল, তবু সে দেখিল
কোন ভূত?

বলা বাহুল্য, 'ভূত' বা 'ঠ্যাং'-এর মতো শব্দের ব্যবহার অন্য যে-কোনো কবির পক্ষে হাস্যকর হতো।

॥ ৭ ॥

তাঁর অনন্যতা বিষয়ে অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি, অত্যধিক পুনরুক্তিবশত এই কথাটার ধার ক্ষয়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনও সন্দেহ করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর'—তাঁর এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যৌবনে, যখন মানুষের মন স্বভাবতই সম্প্রসারণ খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঋতুতেও তিনি বুঝেছেন যে তিনি স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের মধ্যে আলাদা,' বুঝেছেন যে তাঁর গান জীবনের 'উৎসবের' বা 'ব্যর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিদ্রোহের, আলোড়নের নয়—তাঁর গান সমর্পণের, আত্মসমর্পণের, স্থিরতার। 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত' রোমাণ্টিক হয়েও, তাই, তিনি ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো[৩]; আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে

আকস্মিকরূপে উদ্ভূত বলে মনে হয়; সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে—তিনি যে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বসূরির সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হতে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল; এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি—'হুতোম' অথবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো—একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও-কোথাও এমন সূক্ষ্মভাবে সফল হয়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনা যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তাঁর কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে; এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথম বার জীবনানন্দর স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মর্তব্য যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধির' মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।

১. তাঁর মধ্য পর্যায়ের কবিতায় মাঝে-মাঝে একটি সংক্ষুব্ধ বিবমিষা লক্ষ্য করা যায়—আসলে তার আরম্ভ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সময়েই, সেই সময়েই 'অন্ধকার' কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবীতে 'কোটি-কোটি শূয়ারের আর্তনাদে'র 'উৎসব' দেখে তিনি 'অন্ধকারের অনন্ত মৃত্যুর ভিতর মিশে যেতে চেয়েছিলেন। তারই কিছুকাল পরে 'আদিম দেবতারা' কবিতায় ঘৃণা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল:

> অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
> রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
> স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
> আগুন বাতাস জল, আদিম দেবতারা হো হো করে হেসে উঠল :
> 'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায়?'

'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর অনেক কবিতাতেই এই ঘৃণা বা বিদ্রূপের আঘাত পড়েছে; তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনার মধ্যে এটিকে একটি প্রধান সুর বললে ভুল হয় না।

২. উপমা ও উৎপ্রেক্ষাকে আলাদা করে দেখছি এখানে, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পেও তফাত আছে। 'হাওরের ঢেউ' বা 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস' বড়ো অর্থে উপমা বইকি, কিন্তু ব্যাকরণগত অর্থে নয়, আর সেই বড়ো অর্থ নিলে এ-কথাই বলতে হয় যে কবিতার ভাষাই উপমা।

৩. অর্থাৎ এক হিসেবে তিনি বাংলা কাব্যের প্রথম খাঁটি আধুনিক।

জীবনানন্দ দাশ

আবুল ফজল

অবিমিশ্র কবি বললে যা বোঝায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হচ্ছেন তাই। কবি হিসাবে এ দু'জনের বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য কিন্তু দু'জনের কেউ-ই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এ বললে তা হবে অতিরঞ্জন। এঁদের সাধনা ছিল অকৃত্রিম, একনিষ্ঠ ও সুগভীর কিন্তু প্রতিভা ছিল সীমিত। শিল্পী হিসেবে এঁরা নিপুণ কিন্তু বিচিত্র নন। এঁদের রচনা গভীর কিন্তু ব্যাপ্তিহীন। এঁদের সুর ও স্বর ছিল অনন্য ও স্বতন্ত্র। প্রধান কবিদের বেলায় যে-রকম সুর ও স্বর-বৈচিত্র্য দেখা যায় তা এঁদের রচনায় অনুপস্থিত। অপ্রধান হলেও এঁদের গৌরব এঁরা বিশিষ্ট, চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে এঁরা স্বতন্ত্র—কারো সঙ্গে নয় 'এক মানসে লীন।' এঁরা দশের সহিত এক নন। তাই এঁদের রচনায় রয়েছে একটা আলাদা স্বাদ। তবে সেই স্বাদ উপভোগ করতে হলে হতে হবে connoisseur।

এঁরা ছিলেন বিশেষ করে ও একান্তভাবে কবি। জীবিকার জন্য যে-পেশাই এঁরা অবলম্বন করুন না কেন আদতে মন-মেজাজ ধ্যান-ধারণায় এঁরা নিছক কবি ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। এঁদের পাণ্ডিত্য এঁদের কবিতারই অঙ্গ, তারই প্রস্তুতিপূর্ব হয়তো-বা উপাদান ক্ষেত্র।

কোনো ইজম নেই। কোনো প্রচার-প্রচারণা নয়। কোনো দর্শন বা আদর্শও নয়—শুধু কবিতা—শুধু কবিতাই লিখেছেন এঁরা। সবচেয়ে প্রশংসার কথা কবিতায় এঁরা সংযত বাকের চূড়ান্ত। উভয়ে গদ্য লিখেছেন খুব কম। যা লিখেছেন তাও তাঁদের কবিতার মতোই সংহত ও বাকবাহুল্যবর্জিত।

সমসাময়িক বিষয়েও যখন এঁদের মন-মানস হয়েছে আলোড়িত এবং সেই সম্বন্ধেও যখন কথা বলতে চেয়েছেন এঁরা, তা-ও কবিতার রসে জারিয়ে নিয়ে তবেই বলেছেন। ফলে তা কথাকে ডিঙিয়ে হয়েছে কবিতা। এবং বিপরীত দৃষ্টান্ত নজরুল ও সুকান্তের অনেক কবিতা। যাতে কবিতাকে ছাড়িয়ে কথা হয়েছে প্রধান ও উচ্চরোল। এসব কবিতার আকর্ষণ একমাত্র কথাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দাশ ও দত্ত কবির কবিতার প্রধান আকর্ষণ তার কবিত্ব। কথা এখানে গৌণ।

যাঁদের কাছে কবিতা শুধু কবিতার জন্য প্রিয়, জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের প্রিয় কবি এবং থাকবেন অনেকদিন প্রিয়। কথা যতো সহজবোধ্য কবিতা ততো নয়। ফলে সুকবি ও সুকবিতার রসোপলব্ধি বিলম্বিত হতে বাধ্য। অনেককে তার জন্য মৃত্যুর পরও বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

কবিতার এই সর্বব্যাপী দুর্দিনেও বিশিষ্ট কবি যে নেই তা নয়, কিন্তু সেই বিশিষ্ট কবিদের মধ্যেও সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন সবিশেষ। যেমন সবিশেষ ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। উভয়ে বিশিষ্ট অর্থাৎ নিজস্ব সুর আঙ্গিকের ছিলেন সাধক আর উভয়ের সেই সাধনার একনিষ্ঠ একাগ্রতায় আমৃত্যু কখনো ছেদ পড়েনি। কিন্তু বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় সুমেরু কুমেরু। আর দুয়ের কেউই ছিলেন না জনতার কবি। তবে সুধীন দত্তের কবিতা অধিকতর উপভোগ্য যদি সঙ্গে থাকে একজন সাকী, আধুনিক পরিভাষায় বান্ধবী। জীবনানন্দ দাশের কবিতার বেলায় তারও দরকার নেই। তা বিরল মনে গুন গুন করে পড়ার ও অনুভব করারই কবিতা। একটা শান্ত-সুন্দর নির্মল অনুভূতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেই তিনি থেমে পড়েন। কোথাও ব্যবহার করেননি বাড়তি বা ফালতু শব্দ একটিও। কবিতায় থামা বা থামতে জানা কবির জন্য যে কত বড় মৌলিক গুণ তার প্রমাণ জীবনানন্দের কবিতা।

সুধীন দত্তের কবিতা প্রসঙ্গে সাকীর উল্লেখে কেউ কেউ বিস্মিত হতে পারেন। কারণ আমাদের অনেক পাঠকই যে-সব কবির রচনা দুরূহ ও শক্ত তাঁদের অনায়াসে মিস্টিক ও দার্শনিক ভেবে বসেন। সুধীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে দুরূহ ও শক্ত, কিন্তু তিনি ঐ দুয়ের কোনোটিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রেমের কবি, লিখেছেনও বেশিব ভাগ প্রেমের কবিতা। এমনকি বিদেশী সাহিত্য থেকেও যে-সব কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন তারও অধিকাংশই প্রেমের কবিতা। তাঁর অধিকাংশ প্রেমের কবিতাই মনের দিক দিয়ে প্রায় ওমর খৈয়ামী। শুধু ভাষা ও আঙ্গিকটাই আধুনিক। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক দার্শনিক পণ্ডিতের ছেলে হয়েও সুধীন দত্তের কবিতায় দেহাতীত প্রেম স্থান পায়নি। তবে তাঁর পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শুধু বৈদান্তিক ছিলেন না। বৈষ্ণব সাহিত্যেও ছিলেন সুপণ্ডিত। দার্শনিক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় লীলার সংমিশ্রণ ঘটলে যে সুফসল ফলতে পারে তার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সুধীন দত্তের কবিতা। বৈষ্ণব সাহিত্যের ফলিত কোমল মাধুর্যকে তাঁর ক্লাসিক পাণ্ডিত্য দিয়েছে এক সংহত সংযত কাঠিন্য। এই কাঠিন্য সৌবর্ণেয়।

ক্রোচের মতে উক্তি ও উপলব্ধির একাত্মতাই রসোত্তীর্ণ কবিতা। এ বিষয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ অনন্য। তাই এঁরা এক একটা কবিতা, এমনকি জুৎসই এক একটা শব্দের পেছনে ও তার সন্ধানে অকল্পনীয় দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। তাঁরা যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাকে তাঁদের উপলব্ধির তাদাত্ম্য করতে অথবা উপলব্ধিকে যথাযথ ও তাঁদের মনের মতো উক্তিতে পরিণত করতে এ সময় ব্যয় করাকে অপব্যয় মনে করেননি। বলা বাহুল্য, আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে এঁরা দু'জন পরিমাণের চেয়ে গুণকে মূল্য দিতেন বেশি। তাই এঁদের রচনা সংখ্যায় পরিমিত কিন্তু গুণে অপরিমিত।

জীবনানন্দ সহজ, সরল ও পরিচিত শব্দ ও ছন্দে গড়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যজগৎ। সেই জগৎ কিছুটা আলো আঁধারী। তার কিছু দেখা যায় তো অনেকটা দেখা যায় না, কিছু বোঝা যায় তো অনেক কিছু থেকে যায় অবোধ্য। টি. এস. এলিয়ট বলেছেন, অনেক ভালো কবিতাই তিনি প্রথম পাঠে বুঝতে পারেননি। এমনকি অনেক কবিতা

শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বহুবার পাঠের পরও তাঁর কাছে থেকে গেছে দুর্বোধ্য। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতা সব সময় যে দুয়ে দুয়ে চারের মতো অসন্দিগ্ধ অর্থ প্রকাশ করে তা নয়। তাই অর্থের বোধগম্যতা কখনো কবিতা বিচারের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। পাঠকদের মনে একটা পরিবেশ ও অনুভূতির অনুরণন সৃষ্টি করতে পারলে কবিতা সহজেই অর্থসীমা ছাড়িয়েই হয়ে ওঠে ভালো কবিতা। জীবনানন্দের কবিতাও তাই। শব্দ দিয়ে তিনি ছবি এঁকেছেন আর সেই ছবি চাক্ষুষ হয়ে ওঠে পাঠকের মনের সামনে। তাঁর তুলির আগা অতি সরু ও অত্যন্ত মিহি। কিন্তু আঁকা ছবিটি সুস্পষ্ট। শিল্পী হিসেবে তাঁর এই এক অদ্ভুত সাফল্য। ছবি ও অনুভূতির পরশ পেয়ে যাঁরা খুশি নন, তেমন অর্থ-খোর পাঠক তাঁর কবিতায় পদে পদে হোঁচট খাবেন বই কি।

জীবনানন্দ ছিলেন পূর্ব বাংলার মানুষ। এ খবর যাঁদের অজানা, আমার বিশ্বাস তাঁর কবিতা পাঠের পর, তাঁদের কাছেও এ খবর আর অজানা থাকবে না। তাঁর কবিতায় এখানকার প্রকৃতি এত বেশি ছায়া ফেলেছে যে, স্থূলবুদ্ধি পাঠকের দৃষ্টিও তা এড়াবার কথা নয়। পূর্ব-বাংলার খাল-বিল ধান-পাটের একটা শ্যামল রূপ, তার একটা সুঘ্রাণ যেন তাঁর কবিতার গায়ে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এখানকার সুপরিচিত প্রকৃতির প্রতীক দিয়ে অনুভূতির যে অনুরণন তিনি সৃষ্টি করেছেন; তা যে শুধু অনুভব্য তা নয়, তা যেন হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায়। যায় স্পর্শ করা। কথা দিয়ে, ন্যূনতম কথা দিয়ে এই সৃষ্টিতে জীবনানন্দ দাশ অনন্য ও অদ্বিতীয়। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা যেন এক এক মুঠো তাজা শ্যামল সুকোমল অনুভূতি। তাঁর যে-কোন কবিতা থেকেই দৃষ্টান্ত নেওয়া যায় :

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি,
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে;
তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশের রূপালি শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশের খইক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।

(আমি যদি হতাম, বনলতা সেন)

অথবা

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে—এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-পাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে

(ঘাস, বনলতা সেন)

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে দেখেছেন নিরাসক্ত চিত্তে, দূর থেকে তার সৌন্দর্যে তিনি হয়েছেন মুগ্ধ। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় তাঁর সৌন্দর্যানুভূতি বিবর্তনবাদের সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব আবেগে রূপান্তরিত হয়েছে কাব্যলোকে। যেমন :

মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন—ভ্রূণ-মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি!

(সমুদ্রের প্রতি)

এই কবিতা একই সঙ্গে জ্ঞান (বিবর্তনের জ্ঞান) ও আবেগের সংমিশ্রণ। কিন্তু জীবনানন্দের মতো তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যাননি। জীবনানন্দের প্রকৃতিপ্রেম তাঁর অনুভূতির অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ যেখানে জ্ঞানে ও আবেগে অপূর্ব সেখানে জীবনানন্দ অনুভূতিতে তন্ময়। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও জীবনানন্দের বরং ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে মিল অনেক বেশি। অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো তিনি প্রকৃতির কাছে পাঠ নিতে যাননি। কারণ তাঁর কাছে শিক্ষার চেয়েও অনুভূতির স্বাদ অধিকতর লোভনীয়।

জীবনানন্দের লেখায় কোথাও কঠিন বা অপরিচিত শব্দের ব্যবহার নেই—ব্যবহার করার প্রয়োজনই বোধ করেননি তিনি। চিরপরিচিত সহজ সরল শব্দে নিজের চেনা জগতের ছবি দিয়ে কবি নিজের উপলব্ধিকে দিয়েছেন অভিব্যক্তি। এমন সহজ কথা

দিয়ে নিজের অনুভূতিকে রূপ দেওয়া খাস পশ্চিমবঙ্গের অতিমাত্রায় বিদগ্ধচিত্ত সুধীন দত্তের কাছে আশা করাই বৃথা। এটা সুধীন দত্তের পক্ষে নিন্দার কথা নয় বরং তিনি যদি তাঁর আজন্মলব্ধ ও স্বোপার্জিত মানব-পরিমণ্ডল ছেড়ে জীবনানন্দের মতো সহজ হতে চেষ্টা করতেন তাহলে নির্ঘাত নিষ্ফল হতেন। তেমনি জীবনানন্দও যদি তাঁর আজন্মের মানস-পরিমণ্ডল ছেড়ে সুধীন্দ্রনাথ হতে চাইতেন তাহলে তিনি না হতেন সুধীন দত্ত না হতেন জীবনানন্দ। সত্যিকার শিল্পীরা নিজের জগৎ ও নিজের সীমাকে কখনো ভুল করেন না।

চাঁদের আলোকে 'রূপালি শস্য' বলে যে-রূপকল্প সৃষ্টি, পূর্ব-বাংলার স্বাভাবিক পরিবেশ ও আবছায়ায় মানুষ না হলে, তা কবির কলমে এমন অবলীলাক্রমে আসত কিনা সন্দেহ। তাঁর রচনার আর এক বিশেষ গুণ তাঁর আশ্চর্য তন্ময়তা। জীবনানন্দ নিজের অনুভূতি ও রূপকল্পে নিজে তন্ময় হয়ে তাঁর পাঠককেও করে তোলেন তন্ময়। এ যেন ধ্বনি দিয়ে স্বপ্ন রচনা।

কবি ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের বেলায় কোথাও কঠিন হতে চেষ্টা করেননি। বরং মনে হয় তিনি কি করে সহজ করে নিজের মনের কথাকে প্রকাশ করবেন সারা জীবন সেই সাধনাই করেছেন। এমনকি নিজের অনুভূতির কাছে সহজ ও খাঁটি হতে গিয়ে তিনি পূর্ব বাংলার খাস গ্রাম্য শব্দকেও কবিতায় স্থান দিতে দ্বিধা করেননি যেমন :

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা
সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে—
মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন;
শুকনো অশ্বত্থ পাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের;
সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর,
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ-নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

(শিকার, বনলতা সেন)

'Imagery' সম্বন্ধে এলিয়টের এই মন্তব্য স্মরণীয় : 'It comes from the whole of his sensitive life since early childhood.' শৈশব থেকে 'উম্' শব্দ কবির মনে যে sensitiveness সৃষ্টি করেছিল তা-ই তাঁর উপলব্ধির অঙ্গ হয়ে পড়েছে। ফলে তাঁর অভিব্যক্তিরও। এ তাঁর অধীত বা অর্জিত কল্পরূপ নয়। 'উম্' পূর্ব-বাংলার একেবারে খাস শব্দ। পশ্চিমবঙ্গের কবিরা, পূর্ববঙ্গেরও অনেক অভিজাত ও তমদ্দুনবিলাসী কবি, এই আটপৌরে শব্দটাকে তাঁদের কবিতায় স্থান দিতে বোধকরি হাজারবার দ্বিধা করতেন। অবশ্য ইচ্ছা করে গায়ে পড়ে স্থান দেওয়ার কথা আমি বলছি না। শব্দ কবির অনুভূতি ও রূপকল্পের স্বাভাবিক বাহন। সেই বাহন উদ্দেশ্যমূলক হলে তা ব্যর্থ ও স্বাভাবিকতা হারাতে বাধ্য। ইচ্ছা করে বা কোনো সচেতন প্রচেষ্টার ফলে 'উম্' শব্দের এখানে আমদানি হয়নি। কবি-চিত্তের স্বাভাবিক বাহন হয়েই শব্দটা এখানে

নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এ শব্দের যথাযথ অনুবাদ বিশুদ্ধ বাংলায় সম্ভব কিনা জানি না, হলেও তাতে কবির অভিব্যক্তি পঙ্গু হয়ে পড়ত। তাঁর উপলব্ধি হতো খণ্ডিত।

শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে যে-কোনো সংস্কার বা prejudice কবির জন্য মারাত্মক। এই সংস্কার যে-কবির মনে আছে ধরে নিতে হবে তিনি তাঁর কবিতার উপরে সংস্কারকেই দিয়ে থাকেন বড় স্থান। নজরুল যখন অসংকোচে তাঁর কবিতায়—'লা শরীক আল্লাহ্' ব্যবহার করেছিলেন, তখন তা তিনি ইচ্ছা করে ভাষায় আরবি শব্দ ঢোকাবার মতলব নিয়ে করেননি। তাঁর কবি-ধর্মের তাগিদেই করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যখন 'খেয়া-পারের তরণী' নামক কবিতা লিখছিলেন, তখন তা তাঁর সেই মুহূর্তের অনুভূতি-উপলব্ধির অঙ্গ বা বাহন হয়েই তাঁর মনে ও কলমে এসে গিয়েছিল। ঠেকানোর কোনো উপায় ছিল না। এছাড়া দ্বিতীয় রূপকল্প তাঁর মনে স্থান পায়নি তখন, সেই মুহূর্তে। কারণ অনিবার্য ঐ ভাব ও তার ঐ প্রকাশ তাঁর মনের সঙ্গে এক ও একাত্ম হয়ে বিরাজ করছিল। ঐ আরবি উক্তির বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়া নজরুলের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না, কিন্তু করলে তাঁর সেই মুহূর্তের কবি-ধর্ম যে শুধু ব্যর্থ হত তা নয়, কবিতাটিও হয়ে পড়ত শোচনীয়রূপে দুর্বল, হারিয়ে বসত তার অনিবার্য আবেদন আর থাকত না তাতে এখনকার যতো ছন্দের অনির্বচনীয় দোলা। কবিকে হতে হয় সবরকম prejudice-মুক্ত। আমাদের সাহিত্যে নজরুল এর এক মহৎ দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয় নজরুলের সাফল্যের বড়ো কারণ এটি। এমন সর্ব-সংস্কার-মুক্ত মন কদাচিৎ দেখা যায়। কী ভাবে, কী ভাষায় কোথাও তিনি কোনো সংস্কারের শিকার হননি। এ না হলে এত কম সাধনা নিয়ে এতখানি সাফল্য (কবি হিসাবে) তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। তাঁর কবিতার আবেদনও হত না এতখানি ব্যাপক।

কবিতা যে আজ কঠিন ও দুরূহ হয়ে উঠেছে, এ অভিযোগ পৃথিবীব্যাপী। এ প্রসঙ্গে এ যুগের দুরূহতম কবি এলিয়টের মন্তব্য হচ্ছে, অনেক কবিতা এ কারণে কঠিন মনে হয় যে কবিরা এখন হাতে রেখে কথা বলেন। প্রকাশ করেন না অনেক কিছুই, ইচ্ছা করেই অনেক কিছু ছেড়ে যান। তাঁরা যা ছেড়ে যান পাঠক তা পূরণ করে নেবেন বা নিতে পারবেন এই ভরসায়। পাঠকের মনকেও দিতে হবে কল্পনা করবার তথা ভাববার সুযোগ, উড়বার অধিকার। কবি নিজেই যদি সব কিছু খোলসা ক'রে দেন তা হলে পাঠকের মন হয়ে পড়ে বেকার। আজকের দিনের কবিরা চান না তেমন অলস পাঠক।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার কাঠিন্য হচ্ছে এলিয়ট-বর্ণিত এই কাঠিন্য। তিনি তাঁর কবিতায় লাইনে-লাইনে অনেক শূন্যস্থান রেখে যান। তা পূরণ করে নেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের। কল্পনার-সংকীর্ণতা ও অপ্রসার অভিজ্ঞতা যাঁদের একমাত্র সম্বল জীবনানন্দ-শ্রেণীর কবিরা তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য হতে বাধ্য। অভিজ্ঞতা মানে সাহিত্যের অভিজ্ঞতা। আর আজকের দিনে সাহিত্য মানে বিশ্বসাহিত্য।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের পর বাঙালি কবিতা-পাঠকের চিত্তে যদি কেউ প্রগাঢ় সাড়া এনে থাকেন তাহলে তিনি জীবনানন্দ দাশ। ভালো কবিতা লেখা আর ভালো কবি হতে পারা সম্ভবত এক কথা নয়। ভালো কবি উত্তরোত্তর ভালো কবিতা রচনা করে থাকেন। কবিতার ভালোত্ব রচনার সর্বাঙ্গে মুড়িয়ে দিতে পারেন বা দিয়ে যান ভালো কবি। ভালোত্বটা হয়তো শুরুর সময় রচনার একটি বা দুটি অঙ্গে মাত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। কিন্তু শিল্প-কর্ম এমনই একটি ব্যাপার যাতে আন্তরিকভাবে ব্যাপৃত হলে শিল্পী ক্রমেই আত্ম-সংস্কার ও আত্মোন্নতি করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের পর আত্মোন্নতিতে যিনি সব চাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দ দাশের আত্মোন্নতি-পরায়ণতা রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং লক্ষণীয় বিষয়।

শ্রেষ্ঠ কবিতা-গ্রন্থে জীবনানন্দ দাশের রচনার শুরু থেকে পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত বহু স্মরণীয় কবিতা সংকলিত হয়েছে। পাঠক হয়ত এই সঙ্কলন হতে আপন-আপন রসগ্রাহিতার শক্তি অনুসারে পুনঃনির্বাচন করে অনেক দিন পর্যন্ত অনেক কবিতা পাঠ বা স্মরণ করে আনন্দ লাভ করবেন।

আনন্দ-লাভের ও রস-গ্রহণের নিমিত্তেই সাহিত্যের পাঠক কবিতা-পাঠ করে থাকেন। রস ও আনন্দ আস্বাদনের কর্তা পাঠক-চিত্ত। তা বিতরণের কর্তা লেখক-চিত্ত। চিত্তোৎকর্ষ তাই লেখক পাঠক উভয়েরই থাকা দরকার। সাহিত্যের রস-গ্রহণের শিক্ষা যাঁর নেই, তাঁর চিত্ত অন্য শিক্ষায় উৎকৃষ্ট হতে পারলেই যে সাহিত্য-বোধে বা সাহিত্যের অন্তর্গত ভাব-গ্রহণে তা সমর্থ হবে এমন নয়। শিক্ষিত লোকমাত্রেরই যে সাহিত্য-বোধে অধিকার জন্মেছে একথা মনে করা ভুল। ভাব-বাহী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শাখা হল কবিতা। ভাবের কারুকলায় খচিত থাকে কবিতার নানা অঙ্গ। ভাব-শিল্পের সঙ্গে যাঁর চিত্তের সম্পর্ক নেই। তাঁর রস-গ্রহণের শিক্ষাও নেই।

এই শিক্ষার অভাব রবীন্দ্রনাথের আমলে যেমন ছিল, এখন আর তেমন নয়। অভাব দূর হতে পেরেছে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, সুতরাং সে কাব্যের রস উপলব্ধি করতে হলে এমন মনের প্রয়োজন যা পাশ্চাত্যের কাব্য-রস উপভোগ করতে সমর্থ। পাশ্চাত্যের কাব্য-রস নানা ধরনের পথ অনুসরণ করে প্রবাহিত। সে ধরনগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা যত অস্পষ্ট হবে ততই সে ধরনের কবিতা আমাদের মনে দুর্বোধ্য বলে বিবেচিত হবে কিংবা

অসার বলে প্রতিভাত হবে। প্রাচীন রসশাস্ত্রের বোধ নিয়ে এখনকার রসের গতি-পরিণতির ধারা বুঝতে পারা দুঃসাধ্য। কবিতার ধরন যেমন বদলায় তেমনই তদন্তর্গত রসানুধাবনের ধারাও বদলায়।

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো থেকে রসানুধাবনের ধারা বদলাবার রীতিটা ধরে দেখানো যায়। অনেকেরই ধারণা ছিল, তিনি দুর্বোধ্য কবিতা লিখে থাকেন। এমন ধারণার হেতু বিচার করলে আমরা বলব যে তাঁর সৃষ্ট কল্পলোকের দরজার চাবি অনেক পাঠক বা সমালোচক হাতে পাননি। একজন কবিকে স্পষ্টত জানতে হলে 'কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও কিঞ্চিৎ পরিচিতি থাকা দরকার। ব্যক্তিত্ব অবশ্য কবিতা নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্ব কাব্যাভাস স্ফুরিত করে। জীবনানন্দ দাশকে দেখলে মনে হত না যে তিনি প্রেমের কবিতা রচনা করতে পারেন। অন্তত, প্রেমের কবিতা লেখক যে মূর্তিতে পাঠক-চিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে থাকেন সে মূর্তিতে জীবনানন্দ দাশকে দেখা যায়নি। তাঁর হাস্যময় মূর্তিতেও ভাবা যেতো না যে এ ব্যক্তি প্রেমের কবিতা লেখক।

এখন প্রশ্ন হতে পারে : বস্তুত জীবনানন্দ প্রেমের কবিতা লেখক কি না। আমাদের ধারণা তিনি প্রেমিক কবি কিন্তু প্রেমের কবিতা লিখে যাননি। কথাটা বা ধারণাটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি বলি যে তাঁর প্রেমচিত্ততা সম্পূর্ণতই কল্পলোকের প্রতি নিবেদিত, তাহলে হয়তো অবিশ্বাসের দেয়াল খানিকটা ধসে যাবে। এমন কবিচিত্ততা কি সম্ভবপর—এখন এ-প্রশ্নে সন্দেহাকুল হওয়া যায়। তখনই পাশ্চাত্যের কবিলোকের দিকে তাকিয়ে আমাদের বলতে হবে; ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে সম্ভবপর ছিল না। মানবচিত্তের প্রেম-রস মানবলোকের বা দেবলোকের প্রতি ধাবিত হয় সচরাচর, অন্তত বাংলা কবিতায় তাই হয়ে চলছিল, কিন্তু জীবনানন্দ দাশে দেখা গেল, প্রেম-রস কল্পলোকের পাত্রে ক্ষরিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের একজন কল্পলোকবাসিনী ছিলেন, তিনি 'বিচিত্রা' হতে জানতেন কিন্তু জীবনানন্দের কল্পলোকের যিনি পাত্রী তিনি অদ্বিতীয়া। এই অদ্বিতীয়াকে গ্রহণ করে কবিচিত্ত ক্লান্ত কিন্তু ক্লান্তি-সচেতনতা সত্ত্বেও তিনি নিরুপায়। এ নকশার ক্লান্তিদাত্রী কাল্পনিক প্রেয়সী আইরিশ কবি ঈয়েট্‌সের রচনায় পাওয়া যায়। ইংরেজ কবিরাও যখন রোমান্টিক জগতে বিচরণ করতে উৎসুক হন, তখন এমন একটি প্রেয়সীরই সঙ্গ কামনা করেন। ইনি একজন প্রাচীনা মহিলার প্রেতাত্মা। রোমান্টিক চিত্তে ইনি ভালো বিচরণ-ভূমি পেয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের লীলাসঙ্গিনীর সতিন এই ভদ্রমহিলা। কবিরা তাঁকে পান না, কেবলই হারান—যুগে যুগে পেয়ে পেয়ে হারান উর্বশীর মতো। সোর্বশী কল্পলোককে পাওয়া আর হারানোর ইতিহাসই জীবনানন্দ দাশের কাব্যকলার মূল ধ্বনি। এই মূলধন বাংলা-কবিতায় সর্বপ্রথম জীবনানন্দ দাশই এনে দিলেন।

এই মূলধনের বা রসপুঞ্জের চেহারা সন্দর্শনই জীবনানন্দের কাব্য-পরিক্রমার ফল। অনেক ক্ষেত্রে তা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, অনেক ক্ষেত্রে ম্লান চন্দ্রলেখা, অনেক ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন নীলিমার মতো অকূল শূন্যতা। শেষ পর্যন্ত কয়েকটি আলোর বলয় শুধু।

তাঁর শুরুর সুর 'নীলিমা' জ্ঞানের তারে বাঁধা। তার চেহারা এ রকম ছিল :

জীবনানন্দ—৩

"ভেঙে যার কীটপ্রায় ধরণীয় বিশীর্ণ নির্মোক
তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক।"

(নীলিমা—ঝরাপালক)

আর শেষ দিককার হৃদয়ের তন্ত্রীর মিড় এ সব কথা বলছে;

"হৃদয়ে চলার গতি গান আলো রয়েছে, অকূলে
মানুষের পটভূমি হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর।" *(যাত্রী)*

লক্ষ্য রাখলে আমরা বুঝতে পারব যে কবি-হৃদয় নীলিমা থেকে পৃথিবীর প্রাণলোকযাত্রীর ভিড়ে অবতরণ করেছে। হৃদয়ের গতি নিম্নগ, রবীন্দ্রনাথের মতো উর্ধ্বগ নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রোত্তর শ্রেষ্ঠদের এক্ষেত্রেই ব্যবধান প্রগাঢ়। গোড়া থেকে কিন্তু জীবনানন্দ দাশে এ ব্যবধান রচিত ছিল না। 'ঝরা পালক'-গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে যে জীবনানন্দকে পাওয়া যায়, তাঁর চিত্তে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলাম সক্রিয় ছিলেন। সে সময়ে তাঁর স্বকীয়তা 'পিরামিড' কবিতায় সর্বাধিক উচ্চারিত। তখন কবি নজরুল সহৃদয় হয়ে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে মনের মিতালি সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। তবে ইতিহাস-শিকারে জীবনানন্দর মন সায় দিয়েছে পাশ্চাত্য কবিদের মনোভঙ্গির নকশায়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ভারতসম্রাটের তাজমহল সম্পর্কে আবেগ, কল্পনা ও চিত্তোৎকর্ষ প্রকাশ করে পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী রেনেসাঁসের অন্তর্ভুক্ত কাব্যানুভূতির একটি রূপ বাংলা কবিতায় দান করেছিলেন। 'পিরামিড' কবিতার সংবেদ্য রস 'তাজমহল' কবিতার অনুরূপ। জীবনানন্দ 'পিরামিড' কবিতার বিষয়ান্তরে প্রস্থান করেও ভাব-বৃত্ত রবীন্দ্রনাথের মানসিক জগতের অন্তর্গত করেই রেখেছিলেন। তবু একটু ব্যবধান মানসিকতায়ও ছিল, যাকে বলা যায় ব্যবধানের বীজ।

রবীন্দ্রনাথ তাজমহলকে সম্রাট সাজাহানের এক ফোঁটা নয়নের জল বলে কল্পনা করেছেন। কর্তাই কীর্তির চাইতে বড়ো ছিল কবিগুরুর দৃষ্টিতে, কিন্তু কবিগুরুর অবাধ্য ছাত্র জীবনানন্দ 'পিরামিড' নামক মিশরী সম্রাটদের কীর্তিকে 'স্বতন্ত্র স্বরাট' হিসেবে অবলোকন করেছেন। 'স্মৃতির শ্মশান'কে স্বরাট ভেবে জীবনানন্দ তাকেই সম্ভাষণ জানাচ্ছেন, কোনো মিশরী সম্রাট ফ্যারাওকে নয়। জীবনানন্দের দৃষ্টিতে স্মৃতি বড়ো, সৃষ্টিকর্তা বড়ো নয়। শিল্পই মহৎ, শিল্পী মহৎ নাও হতে পারেন। স্রষ্টা তো মানুষও হতে পারেন, যে মানুষ স্মৃতি ভুলে যায়। তাই জীবনানন্দ 'পিরামিড' কবিতায় তাঁর অপূর্ব চেতনা সোচ্চার করলেন।

"মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি—
অরুন্তুদ আঁখি দু'টি মেলি
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দু-দিনের তরে শুধু; নবোৎফুল্লা মাধবীর গান
মোদের ভুলায়ে নেয় বিচিত্র-আকাশে
নিমেষে চকিতে;" *(পিরামিড)*

দলিত মথিত স্মৃতির প্রতি করুণার্দ্র হয়ে উঠল প্রাথমিক পর্যায়েই জীবনানন্দর হৃদয়। ভূমিষ্ঠ হল একটি শোকগীতিকার, যিনি করুণারস বিতরণে সমর্থ হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। বস্তুত রস হিসেবে জীবনানন্দর সম্পূর্ণ কাব্যলোক বা কল্পলোক করুণ রসই সব থেকে বেশি দান করেছে। এ ক্ষেত্রে তিনি রোমান্টিক শেলীর পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে ঈয়েটসের আমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন।

॥ ২ ॥

প্রাণবাহী মানুষের নৃশংস আচরণ ইংল্যান্ডের প্রথম রোমান্টিক কবির দলে কোলেরিজের মতো আত্মার অভিশাপে বিশ্বাসী একজন অখ্রিস্টান কবি তৈরি করে তুলেছিল। কোলেরিজের বিখ্যাত 'প্রাচীন নাবিক' গাথাকাব্য কাব্যস্রষ্টাকে রোমান্টিক দলে অবশ্য একটি বিশিষ্ট আসন দিয়েছে—কাব্য থেকে যে ধর্মটাকে বাদ দিয়ে দেখতে হয় এই জ্ঞান কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের কবিদের ছিল, যাঁরা গাথাকাব্য লিখে গেছেন। পূর্ব-বাংলার পাঠান-মুঘল আমলের কবিরা কোলেরিজের মতো দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন ধর্মকে কাব্য থেকে বিসর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ ধর্মভাবকে বিসর্জন করে চিত্ত-ভিত্তি তৈরি করেননি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত জীবনানন্দ ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রস পরিত্যাগ করতে ইতস্তত করলেন না। মানুষের ইতিহাসে মনোযোগী হওয়ার ফলে জীবনানন্দ তথাকথিত অধার্মিক হতে পারলেন। তিনি যেন প্রেতলোকে বিশ্বাসী হয়ে শাপগ্রস্ত প্রেতাত্মাদের আর্তনাদ শুনতে পেলেন কোলেরিজের 'প্রাচীন নাবিকে'র মতো—এ প্রেতাত্মাদের জন্যে ব্রহ্ম-পিতা নেই। বুদ্ধদেব বসু যে দেবতায় বিশ্বাসী ছিলেন সে দেবতাও নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র যে রাজায় বিশ্বাসী ছিলেন সে রাজার রাজা সম্রাটও সেই প্রেতস্মৃতির প্রতাপে তুচ্ছ। কোলেরিজের মতো নিঃসঙ্গ পর্যায়ের রোমান্টিক হয়ে উঠলেন জীবনানন্দ দাশ 'ঝরা পালকে'র অধ্যায়ে। তিনি স্মৃতির ছবি কুড়োতে শুরু করলেন পুষ্পচয়িতার পবিত্র মন নিয়ে। সার্থক চয়ন দেখতে পেলাম আমরা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অধ্যায়ে। ধূসর পাণ্ডুলিপি—শিলালিপি নয় অশোক মৌর্যের কিংবা 'যুবনাশ্বে'র; বঙ্গীয় তালপাতার পুঁথি—হরতুকির জলে লোহা ভিজিয়ে হয়ত ধূসরাভ কালি তৈরি হয়েছে তার অক্ষর রচনার। বঙ্গীয় প্রাচীনতা সঞ্চয় করতে 'মৃত্যুর আগে' 'ঝরা পালকে'র পক্ষী-কবি কোথায় যাচ্ছেন? কোন দৃশ্যে? তা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা 'মৃত্যুর আগে'-তে এ ভাষায় ব্যক্ত :

"আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভরে গেছে; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে;"

শশাঙ্ক যে নিস্পৃহতায় জড়িত হয়ে এখানে পৌষের মাঠে এসে দাঁড়াল তার স্বর কত প্রাচীন তা 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলো খুলে জানা যায়। চন্দ্রস্ফীতিও গেছে, চন্দ্র-প্রতিপদও এসেছে বাঙালির ফসলের খেতে, কিন্তু বিংশ শতকের পল্লীতে

চন্দ্রোৎসব নেই। চন্দ্র নিজেই অভিভুক্তিতে কাতর। ধান কাটা মাঠের হতশ্রী দৃশ্যে এসে স্মৃতির অস্পষ্ট ছবি কুড়োচ্ছেন জীবনে ভূমিষ্ঠ একটি মানবপ্রাণ। কবি-প্রাণ জীবনানন্দের পৃথিবীর পরিক্রমা শুরু হচ্ছে নদী উপত্যকায়, আন্তরিক ভগ্নাবশেষ খনন-ক্রমে। বুদ্ধিজাত রসের নাম যদি 'বোধ' হয়ে থাকে তখনই তা কবির হৃদয়ে জন্ম নিয়েছিল। জাতকের চিত্তমুকুরে কুৎসিতের ছায়া প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তখন। আর সেই কুৎসিত অক্ষরের ভিড়ে থেকে একটি সুন্দর 'নির্জন স্বাক্ষর'-ও তিনি তখনই আবিষ্কার করছেন। সে স্বাক্ষর কার? কোন মমতাজের, কোন ফ্যারাও-প্রেয়সীর? যারই হোক তিনি সেই সৌন্দর্য-স্মৃতি রক্ষা করতে চাইলেন, বললেন :

"তুমি তা জানো না কিছু—না জানিলে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।" *(নির্জন স্বাক্ষর)*

অদ্বিতীয়া জীবন-সঙ্গিনীর প্রতিমা তৈরি করলেন মনে মনে কবি। এ প্রতিমার বাস্তব ভিত্তি হয়ত অসুন্দর কিন্তু কবির সত্তার মিশ্রণে এসে তা এমন :

"কোনো এক মানুষের তরে
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে—
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।" *(ঐ)*

গ্রিক দর্শন-জাত প্রেমকে আবিষ্কার করলেন জীবনানন্দ ভারতীয় মন খনন করে। কিন্তু 'নির্জন স্বাক্ষর' প্রেমের কবিতা নয়—প্রেম-বিষয়ক কবিতা মাত্র। প্রেমের মূর্তি-নির্মাণ এবং পুরোহিতের মতো মন্ত্রপুজো সমাধা হয়েছে এই কবিতায়। তারপর 'অবসরের গান'-এ উল্ল্যসিসের আফিংখোর সঙ্গী-সাথীর মতো সার্সির বাগানে বসবাস করতে চেয়েছেন কিংবা হরিণ-শিকারির সঙ্গ নিয়েছেন বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার তিক্ত রস পান করবার নিমিত্ত। তিক্তকে তিক্ত বলবার দুঃসাহস অভিব্যক্ত হয়েছিল তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতায়। কামভাবের সঙ্গী রতি-রস যে মৃত্যুর পথ তৈরি করে এই দার্শনিক মনোভঙ্গি বৌদ্ধ ভারত থেকে আগত। এ ভঙ্গির অভিব্যক্তি ছিল তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতায় কিন্তু বঙ্গীয় সাধুসজ্জনরা কবিতাটিকে বুঝতে বা সহ্য করতে পারেননি। সুতরাং সাধুতার মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন কবি তাঁর 'শকুন' কবিতায়। কিন্তু শকুনীদের সঙ্গে সতত লড়াই করবার মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না বলেই বাস্তবতা পরিহার করে তিনি শেলীর ভাবে অনুভাবিত হতে চেষ্টা করলেন :

"পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে," *(স্বপ্নের হাতে)*

যদিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' জীবনানন্দকে কবি-যশ প্রচুর পরিমাণে দান করেছে তবু আমরা বলব জীবনানন্দ-প্রতিভার প্রকৃত বিস্তার হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে, 'বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবী' গ্রন্থদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলী রচনার কালে। একটি পরিব্রাজক প্রাণের সন্ধান অতি সাফল্যের সঙ্গে তিনি এ সময়ে করতে পেরেছিলেন বলেই আপন সত্তার

সঙ্গে নিবিড়ভাবে তাঁর বান্ধব-গ্রন্থি বন্ধন করেছেন। তাঁর নীল শূন্যাকাশ খচিত হয়েছে অবশেষে এই প্রাণময় কবিসত্তায়, 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে।

পরিব্রাজকের বিচরণ কেন্দ্র ধান কাটা মাঠের 'জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ' নিয়ে বেবিলনে প্রস্থিত; 'বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর কেন যেন'—কিন্তু সেখানে প্রস্থান করেও জিজ্ঞাসার হাত থেকে ত্রাণ পাচ্ছেন না। তাই 'হাজার বছর ধরে' পথ হেঁটে পরিব্রাজক প্রাণ নাবিক বেশে 'নাটোরের বনলতা সেনে'র বৈদভী সৌন্দর্যের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু এখানেও "থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন"। আলোর সন্ধান কোথায়? শুধু অন্ধকার :

"গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল-চ্ছল শব্দে জেগে
উঠলাম আবার :
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।" *(অন্ধকার'—বনলতা সেন)*

অন্ধকার অত্যাচারে ছায়া-কুড়োবার কীর্তি শেষ। মানব জন্ম ও জীবনের রঙে অন্ধকারই বেশি—মৃত্যুত্থিত প্রাণ দেহ ধারণ করে অর্ধাঙ্গে অন্ধকারই লেপন করে। অর্ধাঙ্গিনী যিনি পুরুষের, তাঁরও এই অবস্থা। নরনারী আলো-অন্ধকারে আধাআধি। পূর্ণতা নেই। "তোমার বুকের পরে আমাদের পৃথিবীর রাত"—একথা যেমন পুরুষ নারীকে, তেমনি নারীও পুরুষকে বলতে পারেন। 'তোমাকে' নাম নিয়ে জীবনানন্দ যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেখানে এই পঙ্‌ক্তিটি পাওয়া যায়। অন্ধকারের নিবিড় অনুভব স্পর্শ করেছেন কবি 'হাওয়ার রাত'-এ এবং 'ঘাসে'—আলোর শুভ শুভ্রতা অনুভব করেছেন উপাখ্যানের 'শঙ্খমালা'র মুখে ও স্তনে, ইতিহাসের 'সিন্ধুসারসে'র ডানায়। অতীতে ও বর্তমানে জড়িত রূপালি জরি আর রজনীর অন্ধকার—তাই যেমনি অতীতের মৃণালিনী ঘোষালের শব রঙিন, তেমনি বর্তমানের 'সুরঞ্জনা' রঙ্গিলা। গোধূলি সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে এই নৃত্যশীল রঙিন মানুষের ভিড় জমে বলে কবি মনে করেছেন দ্বিতীয় সামরিক যুগে। তাদের কর্মচাঞ্চল্য জীবনানন্দের দৃষ্টিতে এ রকম :

"কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো:
পুরুষ তাদের: কৃতকর্ম নবীন;
খোঁপার ভিতরে চুলে : নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।" *(গোধূলি সন্ধির নৃত্য)*

ডুবুক প্রলয়-সংবর্তে চীন, ঈশ্বর-ঈশ্বরী স্বভাবে নরনারী নৃত্য করে যাবে। কিন্তু কবি তখনও জনান্তিকে বলছেন পৃথিবীর মানবতার দিকে তাকিয়ে :

"মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল বলে
আজ তার মানবকে কী করে চেনাতে পারে কেউ।

জন-জাগরণে নেতৃত্ব কার? জ্ঞানময় প্রেমের। '১৯৪৬-৪৭' শীর্ষক কবিতায় তিনি তা স্পষ্টত বলে হৃদগত বিশ্বাসের এই ভাষা লিপিবদ্ধ করেছেন শেষ-পঙ্‌ক্তিগুলোতে :

"তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজো—তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম করে চেতনায়
বলয়ের নিজ গুণ রয়ে গেছে বলে মনে হয়।"

এই বিশ্বাসের তীরে এসেই কাব্যযাত্রা শেষ করেছেন জীবনানন্দ। অতঃপর তিনি আর শাখা-পথ অনুসন্ধান করেননি কিংবা বিশ্বাসের সাফল্যে উত্তেজিত হয়ে কলকণ্ঠ হতে পারেননি। আমাদের স্বাধীনতার প্রদোষের কবি তাই জীবনানন্দ। জাতীয়তা-বিচ্যুত দৃঢ়কণ্ঠ মনস্বী তিনি—সমালোচক তিনি, হৃদয়ের কারুশিল্পী তিনি। সহৃদয় ও সদর্থক কাব্যমূল্য তাঁর রচনায় এতো অধিক যে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রবাহ জীবনানন্দের কাব্যকলার উৎস থেকে নির্গত হয়ে ভাষায়, রূপকল্পে এবং সপ্রাণতায় কাব্যদেহ মণ্ডিত করছে।

'বলয়ের নিজ গুণ' বলতে কবি অন্ধকারকে বর্জন করে আলোর বলয় কল্পনা করেননি। চেতনার রূপ সাতটি তারার বলয়ে গর্ভস্থ অন্ধকার নিয়ে তার কল্পনায় উদ্ভাসিত। চেতনার স্বকীয় আলোর গুণেই চিত্তগত পাপান্ধকার দূরীভূত হয় বলে জীবনানন্দ মনে করে গেছেন। এই গুণের বশেই উৎকৃষ্ট চিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মৃত্যুকে অস্বীকার করায় সে চিত্ত এবং

"লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে
সময়ের সমুদ্রকে বার বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে বলে।"

(পৃথিবীতে এই)

॥ ৩ ॥

'বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবী'র অধ্যায়ের নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে জীবনানন্দের মনে যে প্রশ্নমালা তরঙ্গ তুলেছিল তার সমাধান করেছিলেন তিনি তখন ঈশ্বর-প্রেমের পরিবর্তে 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়' কল্পনা করে। কিন্তু এ প্রেম অচেতনতার অন্ধকারে যে পরিক্লিষ্ট চিত্র উপস্থিত করেছে সভ্যতার ইতিহাসে তা তিনি সামরিক যুগে লক্ষ্য করে ('নিরঙ্কুশ' ও গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতাদ্বয় স্মরণীয়) মানব-চেতনার প্রেমে নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়েছেন। প্রেমিক কবি বলতে এ ধরনের চেতনা-প্রেমিক কবিমানসের সাধক বোঝায় না। প্রেমের আবেগের সাধককেই প্রেমিক কবি বা প্রেমচেতনার কবি বলা হয়। জীবনানন্দ যে প্রেমচিন্তা কোনো কবিতায়ই প্রকাশ করেননি এমন নয়, কিন্তু তেমন রচনাতেও প্রেম দর্শনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সে দর্শন গ্রিসীয় বা বৌদ্ধ। কিন্তু মানবচেতনার প্রেমে যখন তিনি মুগ্ধ হয়েছেন তখন গ্রিসীয় নাট্যকারের মনোভঙ্গি বা বৌদ্ধ মানবতার নবীনতর রূপ রেনেসাঁসের বা দান্তের মনোভঙ্গির পাশ ঘেঁষে

গেছেন। তবে দান্তের স্বর্গে বিশ্বাস বর্জন এবং পৃথিবীতেই ভালো হবার ও প্রায়শ্চিত্ত করবার আশা পোষণ তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয় অর্জন। জীবনানন্দের এ বৈশিষ্ট্যে আমাদের নজর না থাকলে আমরা তাঁকে বাস্তববাদী কবি ভাবতে পারব না।

বাস্তবতা যে কল্পনার বিরোধী শক্তি নয়, এই সত্যটি জীবনানন্দ তাঁর রচনার রূপকল্প দ্বারা প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর রূপকল্পের বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যায় নানারূপ আলোচনা হয়েছে। রূপকল্প কবির মগজের কারখানায় একটি দুর্লভ বস্তু নয়, সুতরাং রূপকল্পের উপর জোর দিয়ে কাব্য আলোচনা আমাদের বিচারে অসঙ্গত বলে মনে হয়। কাব্য-কথাগুলো বাচ্যাতীত রসের ব্যঞ্জনা দিতে সমর্থ কি না, সে বিচারের উপরই কাব্য-আলোচনা সার্থক ও অসার্থক হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণত আমরা জীবনানন্দের একটি পঙক্তি পরীক্ষা করতে পারি। 'বনলতা সেন' কবিতায় নায়িকার কালো চুলের ব্যঞ্জনা দিতে কবি বলেছেন; "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।" রাত্রির সঙ্গে চুলের উপমা বা রূপকল্পনামাত্র যদি এ পঙক্তিতে কাব্যকৃতি হত, তাহলে আমরা বলতাম যে কবি ব্যঞ্জনাধ্বনি ব্যবহার করতে পারেননি এবং বাচ্যাতিরিক্ত রস নিবেদনে অসমর্থ হয়েছেন। বিদিশা একটি প্রাচীন আর্য নগর। প্রাচীন নগরীর রাত্রি অন্ধকারের গভীরত্ব বোধ এনে যে চুলের কালোত্ব বাড়িয়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু চুলের কালোবরণকে বর্ধিত করবার একাধিক অভিপ্রায়ই কবির ছিল এ পঙক্তিতে। আর্যত্বের বা আর্যরমণীর রাত্রি অন্ধকার পঙক্তির বাচ্যাতিরিক্ত কৃষ্ণ-রস। এই ব্যঞ্জনার জন্যেই পঙক্তিটি যথার্থ কবিতার শক্তি লাভ করেছে।

অবশ্য এ-পঙক্তির অপরিসর ও বিস্তৃত রস গ্রহণ ও আস্বাদন করা পাঠক-চিত্তের উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। আর্যতার প্রবেশে আনন্দ লাভের ব্যাঘাতও ঘটাতে পারে কোনো কোনো পাঠকের মনে, কেউ বা অপরপক্ষে, আর্যতার সঙ্গ ব্যতিরেকে 'বিদিশা' ধ্বনিই অপয়োজনীয় মনে করতে পারেন। কিন্তু এ-পঙ্ক্তি থেকে কবিকে বা কবি-চেতনাকে যদি আমরা উদ্ধার করে আনতে চাই, তাহলে শুধু অন্ধকারটুকু পরিমাপ করতে হবে। পরিমাপ পরিমাণের দিক থেকে আমরা আগেই করেছি, কারুকার্যের দিক থেকে করিনি। জীবনানন্দের কারুকার্যের বর্ণনা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ সাপেক্ষ। আমরা কবির অন্ধকারের কারুকার্য সম্পর্কে শুধু এ কথাটি বলতে চাই যে তা শূন্যগর্ভ নয়—জীবনের শুভ্রতা দান করবার জন্যে সচেষ্ট। শুনেছি ফরাসি কবি পল এলুয়া জীবনানন্দের ভঙ্গিতে অন্ধকারের উষ্ণ ভ্রূণের দিকে তাকিয়েছেন। আনন্দের খবর, সন্দেহ নেই। তবে আমরা জীবনানন্দের 'স্থান থেকে' পঙক্তি সংগ্রহ করে তাঁর কবিতার দিকে তাকাতে গেলে সব চাইতে বেশি আনন্দিত হতে পারব এ কথাগুলোর সাম্যবোধ উপলব্ধি করে :

'পটভূমি বার-বার পটভূমিচ্ছেদ।
করে ফেলে আঁধারকে আলোর বিলয়
আলোককে আঁধারের ক্ষয়
শেখায় শুক্ল সূর্য;'

অত্যন্ত সাধারণ স্থূল সত্য কথা। দৃশ্যান্তরের খবর। কিন্তু সত্য সংবাদ কবির হাতের ছোঁয়ায় যে স্থান পায় তা তাঁর স্থানের মতোই জীবন্ত। সেই স্থান তাঁর কল্পলোক। সেই কল্পলোক আগেকার দিনের মতো আবেগ-আকুল না হলেও একই পীঠস্থলীতে নিষ্কম্প। জীবনানন্দ যে মনোভঙ্গির বীজ নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন, মধ্যপথে সে বীজের গাছ পত্রপুষ্পে শোভিত হয়েছে এবং শেষ অধ্যায়ে তা ধ্রুব সুফল দান করে গেছে। তাঁর পায়ের নিচের ভূমি সতত সঞ্চরমান ছিল না—হৃদয়ও তাই একটি ভূমিতেই স্নেহচ্ছায়া দান করেছে—সে ভূমি হাজার বছরের পুরনো বাঙলা দেশ বা 'বনলতা সেন'।

নতুন করে দেখা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পর পর দুটি কবিতার স্তবক উদ্ধৃত করে ধাঁধার মতন প্রশ্ন করা যায়, কোনটি কার লেখা।

১. বনের চাতক বাঁধল বাসা মেঘের
কিনারায়
মনের চাতক হারিয়ে গেল দূরের
কুয়াশায়!
ফুপিয়ে ওঠে কাতর আকাশ সেই হতাশার
ক্ষোভে,—
সে কোন বোঁটের ফুলের ঠোঁটের মিঠা
মদের লোভে
বনের চাতক-মনের চাতক কাঁদছে
অবেলায়!

২. কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন ভরে
ঝংকারি উঠে অপরিচিতার
জয় সংগীত স্বরে।
নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার
রক্ত দুকূল দিল উপহার
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে।

এর মধ্যে প্রথমটি এক তরুণ কবির রচনা, দ্বিতীয়টি এক প্রবীণ কবির। বলাই বাহুল্য, প্রথম স্তবকটি অতি দুর্বল, নিরেস। প্রায় অকবিতাই বলা যায়। বনের চাতক, মনের চাতকের তুলনা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর, ছন্দ এবং মিলেও বেশ দোষ আছে। যারা কবি, তারা জানে, 'কুয়াশায়'-এর সঙ্গে 'অবেলায়' সঠিক মিল হয় না। অন্ত্যমিল মানে দুই পঙ্‌ক্তির শুধু শেষ অক্ষরের মিল নয়, পুরো শব্দটির ধ্বনিগত মিল থাকা আবশ্যিক তো বটেই, অন্য অক্ষরগুলির বর্গ-গত মিল থাকলেও ভাল হয়। মাঝখানে একটি অকারণ মিলের লোভে ভুল শব্দও প্রয়োগ করা হয়েছে। 'বোঁটের' মানে কী? 'ঠোঁটের' সঙ্গে

মেলাবার জন্য 'বোঁটা' থেকে 'বোঁটের' করা হয়েছে, এটা অসঙ্গত। যতি চিহ্ন ব্যবহারও ত্রুটিপূর্ণ, ষষ্ঠ লাইনে 'ক্ষোভে'র পর কমা এবং ড্যাশ দুটোই দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। 'ফুলের ঠোঁটের মিঠা মদের লোভে', এতে কোনো কবিত্ব নেই, অনায়াসেই বলা যেতে পারে ক্লিশে। অন্য কবির দ্বিতীয় স্তবকটি নিখুঁত। মাত্রা ও মিল সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই নেই, অনুপ্রাস এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ অনুপ্রাস উচ্চাঙ্গের কবিতার রস নষ্ট করে, কিন্তু অনেকগুলি 'র' ও 'ল'-এর ব্যবহারে ধ্বনি-মাধুর্য পাওয়া যায়। সমস্ত শব্দই অতি সাবলীল, বোঝা যায় বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফসল, চেনা যায় রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার জন্য এক নবীন কবির অতি তরল ও দুর্বল একটি স্তবক উদ্ধৃত করার কারণটি ব্যাখ্যা করা দরকার। এই কবির নাম জীবনানন্দ দাশ, দুটি কবিতাই একই সময়ে লেখা, ১৩৩৪ সালে। রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তিটি 'মহুয়া'র অন্তর্গত, 'বোধন' কবিতার অংশ, জীবনানন্দের পঙ্‌ক্তিটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক'-এর 'বনের চাতক মনের চাতক'-এর শুরু। এই কাব্যগ্রন্থটি পড়লে মনে হয়, রবীন্দ্র অনুসারী দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিবৃন্দের আর একটি সংখ্যাবৃদ্ধি হল মাত্র।

অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হল জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। নামের মিল থাকলেও এই দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা যে একই ব্যক্তি তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। প্রথমদিকের কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন দত্তের অনুকরণ করতে চেয়েছেন প্রাণপণে, হঠাৎ যেন কোনো মায়া সরোবরে ডুব দিয়ে তাঁর জন্মান্তর ঘটে গেল। তাঁর হাতে সম্পূর্ণ নতুন কাব্যভাষা। শব্দ ব্যবহারে তিনি বেপরোয়া।

পাড়াগাঁর গায়ে আজ লেগে আছে
রূপশালি-ধানভানা
রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ
আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে
আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝরে পড়ে
তার,—
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে!
আজো তবু ফুরোয়নি বৎসরের নতুন
বয়স,
মাঠে মাঠে ঝরে পড়ে কাঁচা
রোদ,—ভাঁড়ারের রস!

একমাত্র কমা ও ড্যাশ একসঙ্গে ব্যবহারের দুর্বলতা ছাড়া এই কবির সঙ্গে পূর্বতন কাব্যগ্রন্থের কবির কোনো মিল নেই।

এখানে তিনি তোয়াক্কা করছেন না ছন্দ-মিলের, লাইনগুলি যেন স্বতোৎসারিত। 'বিয়োবার' কিংবা 'ভাঁড়ার'-এর মতন শব্দ ব্যবহার করেছেন অক্লেশে, চাক্ষুষ দৃশ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছেন রহস্য। পল্লী প্রকৃতিকে নারীর রূপ দেওয়া এমন কিছু নয়, সব কবিরই

প্রিয় এই উপমা, কিন্তু জীবনানন্দ লিখলেন, আসন্ন শীতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে সে এক গর্ভিনী, 'নুয়ে আছে নদীর এপারে'। এ যেন ইম্প্রেশনিস্টদের আঁকা ছবির মতন, চোখের সামনে উদ্ভাসিত অথচ পুরোপুরি বাস্তব নয়, তাতে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে 'ভাঁড়ারের রস'।

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি
ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাই হরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে।

এই কবিতার যে প্রথম পঙ্‌ক্তি, 'এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি', আমার মতে রবীন্দ্র যুগোত্তীর্ণ সবচেয়ে দুঃসাহসিক লাইন। তিরিশের দশকে বাংলা কবিতা যে জায়গায় এসে পৌঁছেছিল, সেখানে এরকম কাঁচা, নড়বড়ে একটি লাইন সদ্য হাত মকশো করা কোনো নবীন কবিও লিখবে না!

বাংলা কবিতায় তখনও সাধু ক্রিয়াপদ চালু রয়েছে বটে, কিন্তু গদ্যে চলতি ক্রিয়াপদ কারো কারো রচনায় ব্যবহার শুরু হয়েছে। চলতি ক্রিয়াপদ অর্থাৎ মুখের ভাষায় কবিতা হয় কিনা তা নিয়ে অনেকের মনে দ্বিধা ছিল। প্রমথ চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্য একেবারে পরিত্যাগ করলেও কবিতায় এই দ্বিধা শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেননি, একেবারে শেষ জীবনেও তিনি কবিতায় সাধু এবং চলতি দু'রকম ক্রিয়াপদ মিশিয়ে দিয়েছেন :

কঠোর বিরোধ রচি তুলে তত
অতলের মহালীলা,
ফেনিল নৃত্যে দামামা বাজায় শিলা।
হে শান্ত, তুমি অশান্তিরেই
মহিমা করিছ দান
গর্জন এসে তোমার মাঝারে
হল ভৈরব গান....

এখানে তিনি 'রচি তুলে', 'করিছ' এরকম সাধু ক্রিয়াপদের সঙ্গে মিশিয়েছেন 'এসে', 'হল'। কাছাকাছি সময়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন :

একটি কথার দ্বিধা থরথর চুড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চলা গতি...

এখানে সুধীন্দ্রনাথের ঝোঁক ক্রমশ চলতি ক্রিয়াপদের দিকে হলেও মাত্রা ঠিক রাখার জন্য সুবিধে মতন 'করেছিল' এবং 'থামিল' দু' রকমই ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধদেব বসুও সে রকম :

দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে ধূসর পৃথিবী
করিছে খাঁ খাঁ
(আমারি প্রেমের মতন গহন অন্ধকার,
প্রেমের অসীম বাসনার মতো অন্ধকার:
তবু চলে এসো, মোর হাতে হাত দাও
তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।

এখানেও মাত্রা-সমতা রক্ষার কারণে 'করিছে' এবং 'মোর' ব্যবহার করা সত্ত্বেও কবিতার মূল ঝোঁক চলতি ভাষার দিকেই। আর এক দশক পরেই দেখা গেছে যে বাংলা ভাষায় যাঁদের বলা হয় আধুনিক কবি, তাঁরা সাধু ক্রিয়াপদ একেবারেই বর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের থেকে পৃথক হওয়ার জন্য কেউ ব্যবহার করছেন বেশি পরিমাণে আভিধানিক শব্দ, যেমন সুধীন্দ্রনাথ, আবার কেউ কেউ কামার-ছুতোর-মুটে-মজুরের মুখের ভাষা খুঁজছেন।

জীবনানন্দের প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তিনি এমন একটা কাব্যভাষা আনতে চাইলেন, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সচেতনা নেই। বাংলা ক্রিয়াপদের সংখ্যা বড়ই কম। বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলে একঘেয়েমি এসে যায়, কবিতায় সেই জন্য শেষ শব্দে ক্রিয়াপদ এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু জীবনানন্দ যেন জোর করেই 'ফেলিয়াছি'র মতন একটা এলানো ক্রিয়াপদ বসালেন। একটু পরে আবার লিখলেন, 'বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে', এখানে ক্রিয়াপদটি অনায়াসে ভেতর দিকে চালান করা যেত, কিন্তু তিনি যেন কিছুই খেয়াল করছেন না, স্বগতোক্তির মতন পঙ্ক্তিগুলি বলে যাচ্ছেন। (বলাই বাহুল্য, স্বগতোক্তি কখনো কবিতা হয় না। কবিতা অত্যন্ত সচেতন শিল্প, বিশেষ ধরনের নির্মাণ। প্রতিটি শব্দ ওজন করে ব্যবহার করা কাব্য রচনার প্রাথমিক শর্ত। জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি দেখলেই বোঝা যায়, তিনি পূর্ণ মাত্রায় সচেতন থেকে, অনেক কাটাকুটি করে পঙ্ক্তি নির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ অনেক ভেবেচিন্তে তৈরি করা এটাই তাঁর নিজস্ব শৈলী।) ছন্দ-মিলের রীতি মানা কোনো আঁটসাঁট বাঁধুনি তাঁর নেই। (সেরকমও যে তিনি পারেন, আগের বইতে কিছু কবিতায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন) সেই জন্যই যেন হঠাৎ এসে পড়া কোনো শব্দ বা উৎপ্রেক্ষা ব্যাখ্যা করার দায়ও তাঁর নেই।

চারিপাশে বনের বিস্ময়
চৈত্রের বাতাস
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন।
ঘাই মৃগী সারারাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে—সেইখানে
জ্যোৎস্না আর নাই।

'জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ', ঠিক এমনভাবে কেউ আগে লিখেননি বটে, কিন্তু ব্যাপারটা দুর্বোধ্য নয়। সেই সময়কার পাঠক ও সমালোচকরা মনে করেছিলেন ধোঁয়াটে, অশরীরীর

শরীর তখনও অনেকের ধাতস্থ হয়নি। কিন্তু এখানে আসল বিস্ময়কর শব্দ হচ্ছে 'অনেক'। 'গভীর' কিংবা 'নিবিড়' লেখার কোনো অসুবিধে ছিল না, মাত্রা ঠিক থাকত, তার বদলে 'অনেক'-এর মতন একটা সরল শব্দ তাঁর মাথায় কী করে এল? এ একেবারে নতুন বাংলা ভাষা। 'গভীর' কিংবা 'নিবিড়' শব্দের ব্যঞ্জনা কিছুটা ক্ষয়ে গেছে, তার বদলে 'কোথাও অনেক বনে'। ক্রমশই তিনি শব্দের এই বিপর্যয় ঘটাতে লাগলেন। 'মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে।' 'নোনা মেয়েমানুষ'?

কিংবা আরোপরে, 'বিপন্ন বিস্ময়', 'এক মাইল শান্তিকল্যাণ', 'প্রগাঢ় পিতামহী', 'ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়', 'সুপক্ক রাত্রির গন্ধ', 'সোনার পিত্তল মূর্তি', 'মেধাবী নীলিমা'..,এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অভিনব।

'ঝরা পালক' থেকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে এমন চমকপ্রদ উত্তরণ বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা তো বটেই, আজও রহস্যময় মনে হয়।

'প্রত্যেক বড় মাপের কবিই ভাষাকে কিছু না কিছু সমৃদ্ধ করে যান। জীবনানন্দকে শুধু সে কৃতিত্ব দিয়ে থেমে থাকা যায় না, তিনি বাংলা কবিতার আকৃতিটাই বদলে দিলেন। এমন শব্দের পাশে শব্দ বসাতে লাগলেন, যা উপমা বা রূপক নয়, অবচেতনের বহিঃপ্রকাশ। অনেক পঙ্‌ক্তি পারম্পর্যহীন, যেন কোনো অর্থের সংযুক্তি নেই, অথচ বিনি সুতোর মালাও মনে হয় না, সুতোটি অদৃশ্য কিন্তু অনুভব করা যায়। এই সব কবিতা নিছক উপভোগের জন্য নয়, উপলব্ধির, বারবার পড়লেও পুরনো হয় না। অনেক প্রতিকূলতা, অনেক নিন্দানন্দ, অনেক সমালোচনার ঝড় সামলে জীবনানন্দের কবিতা যখন প্রতিষ্ঠা পেল, তার পর থেকে বাংলা কবিতার একটি বড় অংশ জীবনানন্দীয় ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল।

গদ্য সাহিত্যে, পৃথিবীর গদ্য সাহিত্যে তখন ন্যারেটিভ স্টাইলকে বিদায় দেওয়ার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফ্রানৎস কাফ্‌কার স্বীকৃতির পর উপন্যাসের নিছক কাহিনী বর্ণনা অনেকটা অবান্তর হয়ে যায়। চিত্রশিল্পেও অবয়ব ও বাস্তবতা বিদায় নিতে নিতে বিমূর্ততাই প্রধান হয়ে ওঠে। এরই প্রভাবে আর কিছুদিন পর এমনকি চলচ্চিত্রেও কোনো কোনও পরিচালক সাহিত্য-নির্ভরতা বা কাহিনীকেও বাদ দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে যান। শিল্পের সব শাখার মধ্যেই কিছু না কিছু যোগসূত্র থাকে। এক একটা যুগের বিশেষ প্রবণতা সামগ্রিকভাবেই শিল্পের ওপর পড়ে। সচেতনভাবেই হোক, অথবা বিশ্ব-আবহাওয়ার প্রভাবে, জীবনানন্দ দাশই প্রথম বাংলায় এই বিমূর্ত কাব্যরীতির প্রবর্তন করেন। পুরোপুরি নয়, অর্ধেক মতন।

পরবর্তী বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব পড়তে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। তাঁর সমসাময়িকরা তো বটেই, অব্যবহিত পরবর্তীকালেও সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-অরুণকুমার সরকার প্রমুখ জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজস্ব রীতি খুঁজেছেন, তাঁদের মাথায় ছিল রবীন্দ্র প্রভাব থেকে দূরে সরে যাওয়ার চিন্তা।

বামপন্থীরা বিমূর্ত ধারাকে অপছন্দ করতেন একসময়ে। বিমূর্ত শিল্পে পরিষ্কার কোনো বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ নেই। যে জন্য ফ্রানৎস কাফ্‌কার জন্মস্থান চেকোশ্লোভাকিয়াতেই

তাঁর রচনা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, রাশিয়াতে ডস্টয়েভস্কিকে অনেকদিন সুনজরে দেখা হয়নি। চিত্রশিল্পে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, জ্যাজ সংগীতকে বলা হত ডিকাডেন্ট। অর্থাৎ বিমূর্ততাকে প্রতিরোধ করারও একটা শক্তিশালী ধারা ছিল পাশাপাশি।

কিন্তু বিমূর্ততার একটা মোহ আছে। হয়তো যুদ্ধকালীন নারকীয় বাস্তবতার পর, সবরকম বাস্তবতার প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে যুদ্ধ-পরবর্তীকালে লেখক-শিল্পীরা অনেকেই বিমূর্ততার দিকে ঝুঁকে পড়ে। পঞ্চাশের দশকে বাংলা কবিতাতেও পড়ে এর প্রভাব, জীবনানন্দ দাশের মাধ্যমে। জীবিতকালে জীবনানন্দ দাশ প্রধান কবি ছিলেন না, কয়েক দশক পরে দেখা গেল যে, একমাত্র তিনিই তরুণ কবিকুলের আরাধ্য। এই প্রভাব অবশ্য পুরোপুরি সুখকর হয়নি।

জীবনানন্দের কবিতার প্রতি মুগ্ধতার ফলে তাঁর অনুসারীরা ধরে নিলেন যে, ইচ্ছেমতন যে-কোনও শব্দ ব্যবহারে আর কোনো বাধা নেই, কাব্যশরীরের নিখুঁত বাঁধুনি রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই, বিশেষ্য-বিশেষণের অর্থ পরিস্ফুট করারও কোনো দায় নেই। এটা যেমন একদিকে সত্যি, আবার অন্যদিকে বিপজ্জনকও বটে। যিনি সত্যিকারের কবি, তিনি এই পথে সার্থক কবিতা রচনা করতে পারেন, আবার বহু অকবিও কাব্য-রচনা ব্যাপারটা খুব সোজা ভেবে ছাপার অক্ষরের জঞ্জাল বাড়িয়ে যায়। জীবনানন্দীয় ধারায় সবচেয়ে সার্থক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অসার্থক কবির সংখ্যা অনেক। বিমূর্ত শিল্পে কোনো বক্তব্য থাকে না, এ কথাটাও ঠিক নয়। চড়া বক্তব্য কিংবা প্রচারমূলক কিছুর স্থান নেই। কিন্তু একথাও ঠিক, কবি বা শিল্পীর যে-কোনও চিন্তাই তাঁর বক্তব্য। বিশেষ কোনো চিন্তা ছাড়া শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না। এবং শিল্পীর সেই চিন্তা যদি পাঠক বা দর্শককে একেবারেই স্পর্শ না করে তবে সে শিল্পসৃষ্টিও ব্যর্থ। পঞ্চাশের দশকে ছবির জগতে সমস্তরকম অবয়ব এবং আয়তনকে বর্জন করে যখন শুধু রঙের কারিকুরিই একমাত্র ব্যাপার হয়ে উঠল, তখনই বিমূর্ত শিল্পের পতন সূচিত হল। কবিতাতেও এমনকি মনস্ক পাঠকও যদি পরপর পঙ্‌ক্তিগুলির যোগসূত্র খুঁজে না পায়, তা হলে সে ক্রমশ কবিতার দিকে পিঠ ফেরাতে শুরু করে।

বাংলায় বিমূর্ত কবিতার বদলে বিশুদ্ধ কবিতা নামে একটি আখ্যা চালু হয়েছিল। বিশুদ্ধতা অর্থে কবিতায় কোনো বক্তব্য বা চিন্তার প্রকাশ পাবে না, কোনো কাহিনীর আভাস থাকবে না, কোনো নারী-পুরুষের জীবন্ত চরিত্র রাখা চলবে না। এটা আবার বিশুদ্ধতার বাড়াবাড়ি। জীবনানন্দের অনেক কবিতায় কাহিনীর আভাস আছে তো বটেই, জীবন্ত চরিত্রেরও ছড়াছড়ি। তা ছাড়া সত্তরের দশকের পর পৃথিবীর কাব্য ও চিত্রশিল্পে যে আবার একটি পালাবদল ঘটে গেছে, তা অনেকে লক্ষ্য করেননি। ছবিতে এখন আর শুধু রং নয়, ফিরে এসেছে রেখা ও অবয়ব, গল্প-উপন্যাসে ফিরে এসেছে কাহিনী, কবিতাতেও নিছক শব্দের খেলার বদলে তার আড়ালে ঝিলিক দিচ্ছে কবির জীবনযাপন, এই পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর নিভৃত চিন্তা। সাহিত্য-শিল্পে ঢেউয়ের মতন মাঝেমধ্যেই এইরকম আকৃতি, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং বিশুদ্ধ কবিতার ধারণা যারা এখনও আঁকড়ে ধরে আছেন, তাঁরা এখন প্রাচীনপন্থী।

পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশে একই ভাষায় কবিতা রচিত হলেও দুটি পৃথক ধারা বেশ স্পষ্ট। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বারবার বড় ধরনের আলোড়ন আসার ফলে তার প্রতিফলন দেখা গেছে সেখানকার কবিতায়। এরকম অবস্থায় কবিদের পক্ষে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে কাব্যরচনা সম্ভব নয়, কবিরা গলা মিলিয়েছেন জনসাধারণের সঙ্গে। তাঁদের কবিতা সেইজন্যই কিছুটা উচ্চকণ্ঠ এবং সোজাসুজি। পশ্চিম বাংলায় শব্দের খেলার দিকে ঝোঁক বেশি, বারবার বাজিয়ে বাজিয়ে শব্দের নিখুঁত ধ্বনিটা খোঁজা হয়েছে। অর্থের দিকে জোর না দিয়ে। এই খেলার একটা মাদকতা আছে, তবু কোথাও একটা সীমারেখা টানতে হয়।

কবিকে কখনো কখনো সোজাসুজি কথাও বলতে হয়, দেশে যদি একটি দাঙ্গা বাঁধে, তখনও যদি কোনো কবি শব্দের ধ্বনিমাধুর্য খোঁজেন, তখন সেই প্রক্রিয়াটাকেই অশ্লীল মনে হবে। তবে, যিনি শব্দচর্চা করেছেন, একটি শব্দের পাশে আর একটি ঠিক কোন শব্দ বসালে ব্যঞ্জনা ফুটে উঠবে যিনি জানেন তিনি সোজাসুজি কথা বললেও তা গদ্য হবে না। কোনো বড় শিল্পী যখন পোর্ট্রেট আঁকেন, তখনও তিনি শিল্পীই থাকেন, ফটোগ্রাফির অনুকারক হয় না যেমন।

একমাত্র সংগীত, বিশেষত যন্ত্র-নির্ভর সংগীত ছাড়া আর কোনো শিল্প সম্পূর্ণ বিমূর্ত অবস্থায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। ভোরের কুয়াশায় পৃথিবী ছেয়ে যায়, সব কিছুই মনে হয় অস্পষ্ট, রহস্যময়; আবার কিছুক্ষণ পরেই ঝকঝকে রোদ ওঠে। কখনো জমজমাট কপিশ মেঘে দিনের আলোয় নেমে আসে অন্ধকার; ঝড়বৃষ্টির পর ঝকঝকে তারাভরা আকাশ, এক একদিন এমন ঝকঝকে জ্যোৎস্না, যাতে অনায়াসে চিঠি লেখা যায়। প্রকৃতির এই যে লীলা বৈচিত্র্য, তার ছাপ যেমন পড়ে পৃথিবীর মানুষের জীবনে, তেমনি বিভিন্ন শিল্প-আঙ্গিকে।

বাংলা কবিতায় বিমূর্তধারা বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, আরো প্রয়োজনীয় ছিল তাকে অতিক্রম করার। রবীন্দ্রনাথ যেমন শেষ কথা নন, তেমনই জীবনানন্দও শেষ কথা হতে পারেন না। একবার ছন্দ ভাঙার স্বাধীনতা পাবার পর যেমন অনায়াসেই আবার ছন্দে ফেরা যায়, সেইরকমই মানুষের কথা, জীবনের কথা, সমাজের কথা বর্ণনার মাঝে মাঝেও আনা যায় বিমূর্ততার ছোঁয়া। কবিকে সত্যদ্রষ্টা বলাটা হয়তো বাড়াবাড়ি, কবিতা লিখে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তাও অবাস্তব, তবু, কেউ মানুক বা না মানুক, কবিকে এই পৃথিবীর বিশুদ্ধকরণের কথা বলে যেতেই হয়। সেই জন্যই কবিরা, শুধু শব্দ ঝংকার বা সংগীত-প্রভাবের মোহ কাটিয়ে বারবার ফিরে আসেন সোজাসুজি কথা বলার দিকে। বিভিন্ন যুগে সেটাই আধুনিকতা। বাংলা কবিতার এখনকার ঝোঁকও সেইদিকে। বর্তমান দশকের তরুণ-তরুণীদের কবিতা পড়লে বোঝা যায়, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় যেরকম কবিতা রচিত হচ্ছে, তার চেয়ে বাংলা কবিতার মান কোনো অংশে কম নয়। পূর্ববর্তী কবিরা শব্দচর্চার যে উন্নত স্তর তৈরি করে গেছেন, তার নিচে নেমে আর সম্ভব নয় কবিতা রচনা করা। শব্দের সেই বিশুদ্ধতার মধ্যেও ফুটে ওঠে তাদের জীবন-ছবি, চিরকালীনের পটভূমিকায় সামসময়িকের এক একটি বিন্দু, রাত্রি এবং দিন, স্বপ্ন ও জেগে থাকা দিনের রূঢ়তা। বাস্তবের পাশাপাশি বিমূর্ত, অতি সরলও নয়, নিছক দুর্বোধ্যও নয়।

জীবনানন্দের চার-অধ্যায়

অশ্রুকুমার সিকদার

জীবনানন্দের কবিতার সালতারিখের ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। তাঁর বইয়ে রচনাকাল দেওয়া নেই। কালগত ক্রমান্বয় বজায় রেখে কবিতা বইতে সাজানো নেই, আবার রচনার ক্রম অনুযায়ী বইগুলোও প্রকাশিত হয়নি তাঁর। একই সময়ের কবিতা নানা বইয়ে ছড়িয়ে আছে। যেমন ১৯৩৬-এ প্রকাশিত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র রচনাকাল ১৯২৬-১৯৩০, ১৯৪৪-এ প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী'র রচনাকাল ১৯২৯-১৯৪২, আবার ১৯৪৮-এ প্রকাশিত 'সাতটি তারার তিমির'-এর রচনাকাল পাচ্ছি ১৯২৮-১৯৪৪। চল্লিশের দশকে লেখা কিছু কবিতা আছে 'মহাপৃথিবী'তে, কিছু 'সাতটি তারার তিমিরে', আবার কিছু মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বেলা অবেলা কালবেলা'য়। অন্য ব্যাপারেও নানা অব্যবস্থিততার পরিচয় মেলে। নতুন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে আদি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র সমকালীন কিছু 'ধূসরতর' কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে। নাভানা সংস্করণ শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশকালে কবির জীবদ্দশায়, এবং পরেও, কিছু গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা গৃহীত হয়েছিল। 'বনলতা সেন' কবিতাভবন-সংস্করণের বারোটি কবিতার সব কয়টি ১৯৪৪-এ প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী'-র অন্তর্গত হয়েছিল। কবির জীবদ্দশায় যখন সিগনেট-কর্তৃক 'বনলতা সেন' আলাদা বই হিসেবে বেরোল ১৯৫২ সালে, তখন সেই বারোটি কবিতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আরো আঠারোটি অন্য কবিতা যোগ করা হয়েছিল। তাই 'মহাপৃথিবী'-র যখন নতুন সিগনেট সংস্করণ বেরোল তখন সিগনেট-সংস্করণ 'বনলতা সেন'-এর অন্তর্গত আদি 'মহাপৃথিবী'-র বারোটি কবিতা বর্জিত হলো এবং বইটির পূর্ববৎ আকার দেবার জন্যে শূন্যস্থান পূরণে গৃহীত হলো উনিশটি তৎকালে লেখা কবিতা। আজো বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর অনেক কবিতা ছড়িয়ে গেছে গ্রন্থিত হবার অপেক্ষায়। এই সব অসংলগ্নতা, যদিও মনে হয় জীবনানন্দের পক্ষে চারিত্রিক এবং অনিবার্য, তবু তাঁর কবিতার পরম্পরা ধারার পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে। সেই পরম্পরাসূত্র ঠিকমতো না মেলায় তাঁর কবিতার 'বিপুলজটিল' অভিজ্ঞতা কী ভাবে স্তর থেকে স্তরান্তরে সন্ন্যস্ত হলো, কী ভাবে উন্মেষত হলো তাঁর জগচ্চিত্র তা বুঝে নিতে সময় নেয়।

এই অসুবিধা অতিক্রম করার উপায় হচ্ছে বাইরে থেকে সনতারিখের হদিস না খুঁজে উল্টো দিক থেকে এগোনো, অর্থাৎ কবিতার ভিতরের দিক থেকে তাকানো। যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো তন্নিষ্ঠ গবেষক 'মাংস কৃমি' খুঁটে সেই কালানুক্রমিকতার পুরো চেহারাটা স্পষ্ট করে না দিচ্ছেন, ততোদিন ভিতরের দিকে তাকানোই ভালো। আমি

অবশ্য সামসময়িক উল্লেখের সূত্র ধরে অভ্যন্তরীণ প্রমাণ যোগাড় করার কথা ঠিক বলছি না। আমি বলছি জগচ্চিত্রে ক্রম-উল্লেখ বুঝে নিয়ে তার থেকে তারিখের ইশারা খুঁজে নেবার কথা। এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি নাভানা প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা-য় কবির ভূমিকা। তিনি লিখেছিলেন 'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানা রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।' এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তাঁর সমগ্র রচনাবলীকে জীবনানন্দ একটি কাব্য হিসেবে বিবেচনা করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। সমগ্র রচনাবলীর এক-একটি কালগত পর্যায় যেন এক-একটি অংশ বা অধ্যায়। আমরা যদি কবিতার ভিতরের দিকে মনোযোগ দিয়ে ভাবনা, কল্পনা, প্রকরণের সূত্র ধরে এগিয়ে সেই অধ্যায়গুলো শনাক্ত করতে পারি, তাহলে প্রত্যেকটি কবিতার সঠিক তারিখ নির্ণয় করতে পারবো না বটে, কিন্তু বিশেষ কবিতাটি কাব্যের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ গুচ্ছের অন্তর্গত তা চিনে নিতে পারবো। মনে হয় তাতে মোটামুটি একটা সময়ও বুঝে নেওয়া যাবে। অন্তত বহিরঙ্গ কালের সঙ্গে যদি সেই শনাক্তকরণ মিলে নাও যায়, কবির অন্তরঙ্গ কালের সঙ্গে তা খাপ খেয়ে যাবে। জীবনানন্দকাব্যের সেই অধ্যায় নির্ণয়ের কাজে প্রথমেই বাদ দিচ্ছি 'ঝরা পালক' বইকে। সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল প্রভাবিত ঐ কাব্যের রচনাকাল পরিধি সুপরিচিত, তাছাড়া জীবনানন্দের 'স্বতন্ত্র সারবত্তা'-র উন্মেষ ঐ কাব্যে শুরুও হয়নি।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে'

স্থানচিত্রের অনুপুঙ্খ রচনায় জীবনানন্দের মতো কুশলী বিরল। খুঁটিনাটির নিখুঁত সমাবেশে তিনি দৃশ্যচিত্রকে মূর্ত তথা শরীরী করে তুলতে পারেন, এক লহমায় আঁকা একটি রেখায় দিতে পারেন অবিস্মরণীয় অবয়বত্ব। জীবনানন্দের কাব্যের প্রথম অধ্যায়ের কবিতাগুলো এই ব্যাপারে, অর্থাৎ বস্তুজগৎকে বিশ্বাস্য করে তোলায়, বড় পরিপাটী। ভূবিশ্বের যে খণ্ডে আকস্মিক ভাবে তাঁর জন্ম, সেই ভূখণ্ডের তদ্‌গত বর্ণনায় তিনি সেই দেশকে চিনিয়েছেন; তার অস্তিত্বে তিনি আমাদের গভীরভাবে আস্থাবান করে তুলেছেন। যেমন রিয়ালিস্ট করেন—রিয়ালিস্টের কাজই হলো যে বস্তুজগতে আমরা বসবাস করি তাকেই আরো বিশ্বাস্য করে তোলা। বস্তুবাদীর বর্ণনা পড়ে আমরা বলি, 'এই তো আমাদের চিরচেনা চরাচর!' অবশ্য এই অধ্যায়ের জীবনানন্দকে রিয়ালিস্ট না বলে ন্যাচারালিস্ট বলাই বরং ভালো—এবং দুই অর্থে। সাহিত্যসমালোচনায় যাদের ন্যাচারালিস্ট বলা হয় তাদের মতো তাঁর দৃষ্টিও অনুপুঙ্খের দিকে, সামগ্রিকতার দিকে নয় খাঁটি রিয়ালিস্টদের মতো। দ্বিতীয়ত তিনি ন্যাচারালিস্ট, প্রকৃতিপ্রেমী বলে।

'রূপসী বাংলা'-র প্রায় সব রচনাই এই জাতের। এখানে 'নরম ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ,/ হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা, সরপুঁটিদের/ মৃদু ঘ্রাণ,

কিশোরীর চাল-ধোওয়া ভিজে হাত....।' এক স্পর্শগন্ধময় চিত্রল জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। ঝরে পড়া পাতা এবং সবুজ ঘাসের মধ্যে 'সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু' এই কবির চোখ এড়ায় না, এবং তিনি দেখেন -

অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েল পাখি....।

শ্যাওলা-সবুজ দামপানায়-ঢাকা বাংলার পুকুরকেন্দ্রিক গ্রামজীবনের ছবি এই সব। বিরল শব্দরেখায় আঁকা কিন্তু ইমেজের কী বহুলতা, কী উজ্জ্বলতা! ছায়াচ্ছন্নতা এবং উদ্ভিজ্জ গন্ধ চিনে নিতে ভুল হয় না, অনুপুঙ্খ দিয়ে দৃশ্যকে সাকার ও শরীরী করে তোলায় এতই তিনি দক্ষ।

১. যখন পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়,
শামুক গুগলিগুলো পড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে....।

২. দীঘির জলের গন্ধে রূপালি চিতল তার রূপসীর পিছু
জামের গভীর পাতা-মাখা শান্ত নীল জলে খেলিছে গোপনে....।

আর এই সব সশরীরী ছবি—'কাঁচা কাঠ জ্বলে ওঠে—নীল ধোঁয়া নরম মলিন/বাতাসে ভাসিয়া যায় কুয়াশার করুণ নদীর মতো ক্ষীণ....', শান্ত মনে পূর্বস্মৃতি মন্থন করে পাওয়া নয়। এই সনেটকল্প রচনাগুলি মধুসূদনের চতুর্দশপদীর মতো প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীত নয়। কারন বাংলার 'এই পথ ছেড়ে দিয়ে এ-জীবন কোনোখানে গেল নাকো' এবং 'কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের পথে বাংলার মুখ তুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন/কাটাই নি দিন মাস....।' এই সব ছবি—'আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে—সবই যেন সদ্যোজাত, বাংলার মুখ দেখে তৎক্ষণাৎ সেই আদলে আঁকা।'

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-রও অনেক কবিতা এই অধ্যায়ের মধ্যে পড়ে, কারণ সেখানেও 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান' (অবসরের গান)। হেমন্তের প্রত্যক্ষ কী ম্লান ছবি তিনি আঁকেন 'হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার সাদা মরা শেফালীর বিছানার পর', 'বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা'। প্রকৃতিবাদী এই কবির অনুপুঙ্খের প্রতি কী নিবিষ্ট নজর।

চড় য়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে,—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা,—কড়ু কড়ু।
শসাফুল,—দু একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল—শুকনো মকড়ুসা
লতায়-পাতায়—
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায়...। *(পঁচিশ বছর পরে)*

রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলেছিলেন, সেই 'মৃত্যুর আগে' কবিতাতে বহিরঙ্গ পৃথিবীরই স্বপ্নাচ্ছন্নতা ধরা পড়েছে। এখানে 'যে সবুজ বাতাস'-এর কথা আছে তাও বস্তুতন্ত্র থেকে খুব কিছু বিচ্যুতি মনে হনে না, যদি ইমপ্রেশনিস্টদের ছবিতে রঙ্ ব্যবহারের কথা মনে রাখি। একই কারণে 'শিকার' কবিতায় দেখি 'আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল', 'পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ', ভোর আকাশের শেষ তারাটি 'পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি মদির মেয়েটির মতো', আর আগুনের রঙ্ মোরগফুলের মতো লাল।

নতুন সংস্করণ 'মহাপৃথিবী' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র এই বাস্তবিক ছবিটাও কি ঐ অধ্যায় থেকে তুলে আনা?

গোরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে।
লাল বটফলে থ্যাঁতা মেঠোপথে জারুল ছায়ার নিচে নদীর সুমুখে
কতক্ষণ থেমে আছে; চেয়ে দ্যাখো নদীতে পড়েছে তার ছায়া;
নিঃশব্দ মেঘের পাশে সমস্ত বিকেল ধুয়ে সে-ও যেন মেঘ এক, আহা,
শান্ত জলে জুড়োচ্ছে...। *(জর্ণাল : ১৩৪৬)*

কিংবা সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেনে'-র এই ছবি—

সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে;—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে,
হলুদরঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির;—*(দুজন)*

আর একটা লক্ষ্য করার ব্যাপার আছে। এই সব দৃশ্য হয় শুধুই দৃশ্য, নতুবা, উপমায় সাদৃশ্য আনে। হয় প্রত্যক্ষ ছবি, নয় দৃশ্যে দৃশ্যে যোগ করে 'মতো' 'মতন' এই সব সাদৃশ্যবাচক অব্যয়। উপমার এই অনর্গল ব্যবহার প্রমাণ করে ন্যায়শৃঙ্খল ভেঙে যায়নি এখনো, যেমন জগতে তেমনি কার্যকারণসূত্রেও তিনি আস্থাশীল।

আর জগতের যে কোণাটিকে বেছে নিয়ে তিনি সেই আস্থা প্রকাশ করেছেন, সেই ভূখণ্ডকে সাকার করার জন্যেই বোধহয় তাঁর প্রথম অধ্যায়ের কবিতায় দেশজ শব্দের এমন ব্রীড়াহীন দ্বিধামুক্ত ব্যবহার। মন্ত্রবর্জিত ব্রাত্য এই সব শব্দকে অন্য কবিরা যখন আঙুলের ডগা দিয়েও ছুঁয়ে দেখলেন না তখন জীবনানন্দ সাদরে সেই সব গ্রাম্য অপজাত ইতর শব্দকে ডেকে নিলেন। সেই সব, বুদ্ধদেব বসু যাদের বলেছেন 'ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য', বা কোনোরকমে-উচ্চার্য শব্দ। আর সেই জন্যেই হয়তো জীবনানন্দের হাতে বাংলাদেশ যেমন শরীরী হলো, তেমনটি আর কারো কবিতায় হলো না। এই সব উল্লেখে গ্রামবাংলা জ্যান্ত হয়ে উঠেছে—লাল শাক, নারকেল নাড়ু , কচি

তালশাঁস, শসালতা, সজিনার ফুল, ফেনসাভাত, ধুন্দুললতা, মুথাঘাস, ডাঁসা আম, ভেরেণ্ডা ও কামরাঙা ফুল, বাব্‌লা, বৈঁচি, হোগলা, কাশ। আর এই সব দেশজ শব্দ যা জীবনানন্দের অনর্গল—ফোঁপরা, ছেঁড়াফাড়া, সোহাগ, ব্যাং, ন্যাড়া, নিঙড়ানো, ফেঁসে যাওয়া, ধলা, ছিরি, ফিক করে হাসা, বিয়োবার, কুঁড়েমি, আইবুড়, রগড়। পরিচিত জগতের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই তিনি নিশ্চয় এই সব নিত্যব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু এই বর্ণাঢ্য বস্তুজাগতিক বর্ণনায় আস্থা ঈষৎ টলে যায় যখন মাঝে মাঝেই মিলতে থাকে অন্য ধরনের কিছু শব্দ, কিছু বাক্যাংশ। সেই শব্দ বা বাক্যাংশ স্থিতাবস্থার বাইরে থেকে আসা। হঠাৎ হঠাৎ পেয়ে যাই 'বেদনার গন্ধ,' 'আকাঙ্ক্ষার রক্ত অপরাধ'-এর কথা, 'আকাঙ্ক্ষার উদ্ঘাটন', 'উদ্ভাসিত স্বর' এবং 'গাঢ় বিষণ্ণতা'র কথা। তাই জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে অমিয় চক্রবর্তীর কথা ('প্রসন্ন বেদনার কোমল উজ্জ্বল') হয়তো পুরো মেনে নেওয়া যায় না। কেননা শ্যামল বাংলা নিসর্গের কথায় বারবার এসে যায় *'রুক্ষ প্রশ্ন', 'রূঢ় কথা', 'রূঢ় মনুমেন্ট'* এবং *'রূঢ় কোলাহল'*-এর কথা। কোমল-প্রসন্ন বেদনার মধ্যে এই রূঢ়তা-রুক্ষতার ঘা খেয়ে খুঁজলে, একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ পেয়ে যাই আমরা। সেই সংবাদ হলো রূপসী বাংলার স্বর্গোদ্যানে শয়তান প্রবেশ করেছে। শুধু এই নয় যে, শ্যামলসুন্দর বঙ্গ-প্রকৃতির এই চেহারা থাকবে না, তার চেয়েও বড়, অস্তিত্বের অনিবার্য পরিণাম একটা স্থায়ী অনিত্যতার ভাবনা আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই শ্মশান, শবদেহ, চিতার অনুষঙ্গ আসে অবিরল।

১. যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি পরে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দনচিতায় চড়ে....।

২. রূপসীরা আজ আর আসে নাকো, পাট শুধু পচে অবিরল,
সেইখানে কলমীর দামে বেঁধে প্রেতিনীর মতন কেবল
কাঁদিবে সে সারারাত,—দেখিবে কখন কারা এসে আমকাঠে
সাজায়ে রেখেছে চিতা....।

৩. হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়—চিতা শুধু পড়ে তাকে তার...

৪. কবে যেন তারে আমি দেখিয়াছি—কবে যেন রাখিয়াছে হাতে
তার হাত—কবে যেন তারপর শ্মশানচিতায় তার হাড়
ঝরে গেছে, কবে যেন....।

মৃত্যুর এই অনিবারণীয়তার কথা পাচ্ছি 'বনলতা সেন' সংকলনেও। সেদিন 'খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায়/এই দুপুরের বাতাস', যখন 'একটা ধবল চিতল হরিণের ছায়া/আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তির মতো/নদীর জলে/সমস্ত বিকেল ধরে/স্থির।' তখন,

মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে শ্মশানের চন্দন কাঠের চিতার গন্ধ,
আগুনে ঘিয়ের ঘ্রাণ....। *(আমাকে তুমি)*

'শঙ্খমালা'-র 'স্তন তার/করুণ শঙ্খের মতো-দুধে আর্দ্র' কিন্তু 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার,/দুইখানি হাত তার হিম;/চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম/চিতা জ্বলে; দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়/সে আগুনে হায়।'

যদিও প্রথম অধ্যায়েই জীবনানন্দ একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'মৃত্যুরে কে মনে রাখে?' কিন্তু দেখা যাচ্ছে মৃত্যুচৈতন্য সব সময় জাগরূক, কারণ 'শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ'। বাস্তবিকের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি যে সুখী হতে পারছেন না, তাঁর ইন্দ্রিয়োপলব্ধির আড়াল থেকে জেগে উঠছে এক ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি, এক তৃতীয় চক্ষু—তারই আভাস আছে এই সব বর্ণনায়। তৃতীয় চক্ষুর অস্বাভাবিক দ্যুতি দিয়েই তিনি দেখেন, 'অনেক কুকুর আজ পথেঘাটে নড়াচড়া করে/তবুও আঁধারে ঢের মৃত কুকুরের মুখ—মৃত বিড়ালের ছায়া ভাসে।' তাহলে এক অধ্যায় শেষ হয়ে এলো।

'পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি
বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী'

'মনে হয়/কারা যেন বড় বড় কপাট খুলছে,/বন্ধ করে ফেলছে আবার;/কোনো দূর—নীরব—আকাশরেখার সীমানায় (শ্রাবণরাত)। সেই সব বড় বড় কপাট খুলে-খুলে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগতের পর্দা সরিয়ে-সরিয়ে 'দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো' জীবনানন্দ প্রবেশ করলেন অন্য জগতে, বাস্তবের পিছনে বাস্তবের চেয়ে বেশি অতিবাস্তব জগতে।

কারা এসে বলে গেল : 'নেই
গাছ নেই—রোদ নেই—মেঘ নেই—তারা নেই—আকাশ তোমার তরে নয়!'
(নদীরা)

তাই দুই চোখে দেখা বস্তুপৃথিবী নয়, গাছ নয়, রোদ নয়, মেঘতারা নয়; তৃতীয় নেত্র দিয়ে দেখা সুররিয়াল জগৎ এলো জীবনানন্দ-কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তেই অন্তশ্চক্ষুর অধিকারী কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন, 'কেউ যাহা জানে নাই—/কোন এক বাণী—আমি বহে আনি,/একদিন শুনেছ যে-সুর-—/ফুরায়েছে—পুরানো তা—কোনো এক নতুন কিছুর আছে প্রয়োজন,/তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন/ আর নাই কেউ' (কয়েকটি লাইন)। কিন্তু নতুন কিছুর চাহিদা পূরণের জন্যেই শুধু তিনি এসেছেন একথা মানা যায় না; এই পরাদৃষ্টির উন্মেষ ভিতর থেকেই হয়েছে অনিবার্য অন্তর্গত তাড়নায়, কোনো বাইরের দাবিতে নয়। কবির নিজেরই স্বীকৃতি আছে অন্য কবিতায়—

আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
ওগো শক্তি,—তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার
বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রের মতন্ স্বচ্ছতা!
আমারে করেছ তুমি অসহিষ্ণু—ব্যর্থ—চমৎকার!

জীবনের পার থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বারবার যার ইশারায়,....। *(অনেক আকাশ)*

বিখ্যাত 'বোধ' কবিতায় সেই চৈতন্যের কথা বলেছেন যার প্রভাবে চেনাজগৎ অচেনা হয়ে যায়—অ্যাবসার্ড হয়ে যায়—জগৎসংসারের সঙ্গে পরিচয়সূত্রগুলো খসে খসে যায়।

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে,
সব কাজ তুচ্ছ মনে হয়,—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়
শূন্য মনে হয়।

সেই তৃতীয় চক্ষুর সম্বন্ধবন্ধনগুলো খুলে যায়, পীড়িত হতে হয় বিচ্ছিন্নতাবোধে—'সকল লোকের মাঝে বসে/আমার নিজের মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা?' বিচ্ছিন্ন; কেননা সাধারণ মানুষ যখন জগতের স্থূলবাস্তব চেহারা দেখে তখন কবির পরাবাস্তব দৃষ্টিতে জগৎ হারিয়ে ফেলে তার স্থূলতা। 'বোধ' কবিতার নায়ক অন্য সব মানুষের মতো বালতিতে জল টেনেছে, কাস্তে হাতে মাঠে গিয়েছে, 'মেছোদের মতো আমি কত নদীঘাটে/ঘুরিয়াছি'—তবুও সে আলাদা;—ঐ বোধের জন্যেই আলাদা, ঐ বোধের জন্যেই 'অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?/কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ/পাবে নাকি? পাবে না আহ্লাদ/মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!/মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!/শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!'

একজন অস্তিবাদী মনে করেন জগৎ যে অ্যাবসার্ড তার প্রমাণ আত্মহত্যায়; জগতের অ্যাবসার্ড চেহারা যখন স্পষ্ট হয়ে যায় তখন একমাত্র আত্মহত্যাতেই নিস্তার। জীবনানন্দের কাছে অনিত্যতা এবং নশ্বরতাই সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে জগৎ অ্যাবসার্ড। যে জগতের অনুপুঙ্খ সমাবেশে তাঁর জন্তুর মতো ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ ছিল, এক অপূর্বশ্রুত বোধের তীব্রতায় সেই জগতের চেহারা অপরিচিত হয়ে গেল। সমস্ত আপতিক দৃশ্যের মধ্যে তিনি অনিবার্য নশ্বরতাকে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন। 'বরফের কুচির মতন/সেই জল-মেয়েদের স্তন!/মুখ বুক ভিজে,/ফেনার শেমিজে/শরীর পিছল!' কিন্তু সেই বোধের তৃতীয় নেত্র দিয়ে তাকানো মাত্র 'চেয়ে দেখি,—দুটো হাত, ক'খানা আঙুল/একবার চুপে তুলে ধরি;/চোখ দুটো চূণ চূণ,—মুখ খড়ি-খড়ি!/থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—/সব বাসি,—সব বাসি,—একেবারে মেকি' (পরস্পর)। অথবা

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র অন্তর্গত 'জীবন' কবিতার কথাই ধরা যাক। নাম 'জীবন', কিন্তু সবই তো মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কিন্তু এই অধ্যায়ে এই তো স্বাভাবিক—কারণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি আপতিককে এখন ভেদ করেছেন, দেখেছেন জীবনের মধ্যে মৃত্যুকে।

যে-পাতা সবুজ ছিল—তবুও হলুদ হতে হয়—,
শীতের হাড়ের হাত আজো তারে যায় নাই ছুঁয়ে;—
যে-মুখ যুবার ছিল,—তবু যার হয়ে যায় ক্ষয়,
হেমন্ত রাতের আগে ঝরে যায়, পড়ে যায় নুয়ে;....। *(জীবন)*

চারিদিকে প্রেতের আনাগোনা—'আকাঙ্ক্ষার ভূত লয়ে খেলা', 'ভূত হয়ে করি ঘোরাঘুরি', 'আমরাও চরি-ফিরি কবরের ভূতের মতন', 'বাসিপাতা ভূতের মতন উড়ে আসে'। মৃত্যুর অনুষঙ্গ আসে বারবার—'আমাদের রক্তের ভিতর/বরফের মতো শীত', 'কাশের রোগীর মতো পৃথিবীর শ্বাস', 'মড়ার চোখের রঙে সকল পৃথিবী থাকে ভরে'। চোখ এমন অ-সুস্থ, অস্বভাবী—'অসুস্থ চোখের পরে অনিদ্রার মতন অসুখ;/তাই আমি প্রিয়তম;—প্রিয়া বলে জড়ায়েছি বুক...' (জীবন)। হাড়ে হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায় প্রত্যেক মিনিটে মৃত্যু উপস্থিত—'শুধু পীড়া,—শুধু পীড়া!—মুকুলে-মুকুলে/শুধু কীট' (পিপাসার গান), 'চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়/পৃথিবীতে' (পাখি), 'শরীরে-মমির ঘ্রাণ আমাদের' (হাজার বছর শুধু খেলা করে)। মানুষেরই পক্ষে মাত্র সেই অ-সুস্থ দৃষ্টি সম্ভব যাতে বাস্তবের আড়ালে পরাবাস্তবকে দেখা যায়; মানুষেরই মধ্যে সেই 'বোধ', সেই 'বিপন্ন বিস্ময়' উদ্ভাসিত হতে পারে যার ফলে জগৎচরাচরকে মনে হয় নিতান্ত অ্যাবসার্ড। এই অভিজ্ঞতা দেবতাদের নেই, কীটপতঙ্গেরও নেই।

শুনেছে কে ইহাদের মুখে কোনো অন্ধকার কথা?
সকল সংকল্প চিন্তা রক্ত আনে ব্যথা আনে—মানুষের জীবনের এই বীভৎসতা
ইহাদের ছোঁয় নাকো;—
ব্যুবনিক প্লেগের মতন
সকল আচ্ছন্ন শান্ত স্নিগ্ধভাবে নষ্ট করে ফেলিতেছে মানুষের মন!
(এই নিদ্রা)

সব মানুষের মনে হয়তো সম্ভাবনা থাকে, তবু সব মানুষের মনে এই 'বোধ' জন্মায় না, জন্মায় 'আট বছর আগের একদিন'-এর নায়কের মতো মানুষের মনে। যার 'বধূ শুয়ে ছিল পাশে—শিশুটিও ছিল;/প্রেম ছিল, আশা ছিল', অথচ যে জ্যোৎস্নায় ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে, সেই রকম মানুষের মনেই দেখা দেয় এই অ্যাবসার্ড বোধ। এই নায়ক—

নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ, ...

হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনো দিন কেঁপে ওঠে নাই;
তাই .
লাশকাটা ঘরে।
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।

মারাত্মক এই বিচ্ছিন্ন 'তাই' অব্যয়ের ব্যবহার। কোনো কারণ নেই, 'তাই' কার্য ঘটেছে। এই 'তাই' ব্যবহারে যেন কার্যকারণপরম্পরাকে ভেঙে দেওয়া হল; লজিকের মতো, জ্যামিতির মতো সিদ্ধান্ত সাজানো হয়েছে, কিন্তু এ-লজিক তো লজিক উল্টে-দেবার লজিক। ভেঙে গেল ন্যায়শৃঙ্খল, পারম্পর্য-সূত্রের বন্ধন। একটি অব্যয়ের আশ্চর্য ব্যবহারে, জীবনানন্দ খুলে দিলেন স্থূলপৃথিবীর জোড়গুলোকে।

এই পরাবাস্তবদৃষ্টির এক বেদনাভারাতুর নিদর্শন সিগনেট সংস্করণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে সংযোজিত 'মেয়ে' কবিতায় আছে। কবি দেখেন 'আমার প্রথম মেয়ে' মৃত মেয়েকে। তখন 'হাতখানা ধরে তার : ধোঁয়া শুধু/কাপড়ের মতো শাদা মুখখানি কেন!'

বলিল সে : 'আমারে চেয়েছ তাই ছোট বোনটিরে—
তোমার সে ছোট-ছোট মেয়েটিরে এসেছি ঘাসের নিচে রেখে
সেখানে ছিলাম আমি অন্ধকারে এতদিন
ঘুমাতেছিলাম আমি'—ভয় পেয়ে থেমে গেল মেয়ে,
বলিলাম : 'আবার ঘুমাও গিয়ে
ছোট বোনটিরে তুমি দিয়ে যাও ডেকে।'

এই কথায় 'ব্যথা পেল সেই প্রাণ'; যেই সেই মৃত মেয়ে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল, কবি দেখলেন তাঁর ছোট মেয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে—'আর কেউ নেই'। দুঃস্বপ্ন থেকে তিনি ফিরে এলেন পরিচিত চতুষ্পার্শ্বে, পরাবাস্তব থেকে বাস্তবে। এই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ায় এসে যায় অন্য কোনো অতিবাস্তব, যেন স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের উৎস থেকে, যেন কাফ্‌কার জগৎ থেকে উঠে আসে এইসব অপার্থিব ছবি।

১. হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফ্‌রান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল। *(বেড়াল)*

২. মহীনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন,—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।...
চায়ের পেয়ালা কাটা বেড়ালছানার মতো
ঘুমে ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে।

হিম হয়ে নড়ে গেল ও পাশের পাইস রেস্তরাঁতে;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেলে গোল আস্তাবলে সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে। *(ঘোড়া)*

সরোজিনী চলে যায় 'সপ্তক' কবিতায় 'সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের মতো পাখা বিনা' এবং চলে গিয়েও সে থেকে যায় 'লুপ্ত বেড়ালের মতো; শূন্য চাতুরির মূঢ়, হাসি নিয়ে জেগে'—লিউস ক্যারলের বিখ্যাত চেশায়ার বিড়ালের মতো।

ইন্দ্রিয়মদিরতার আচ্ছন্ন দিনে যাঁর ইচ্ছে হয়েছিল, 'এই ঘাসের শরীর ছানি', ইচ্ছে হয়েছিল 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই', অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি খুলে গেলে তাঁর চোখে ধরা পড়ে 'বাতাসের ওপারে বাতাস,—/আকাশের ওপারে আকাশ' *(আকাশলীনা)*, আর তখন তিনি উপলব্ধি করেন, 'সুরঞ্জনা,/তোমার হৃদয় আজ ঘাস'। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দৃষ্টি তাঁর স্বতন্ত্র, জগতের চেহারাও পৃথক;—এই দৃষ্টি পুরোনো অনুপুঙ্খময় জগতের চেহারাকে অলীক করে দিয়েছে।

এতদিন বসে পুরোনো বীজগণিতের শেষ পাতা শেষ না করতেই
সমস্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল;
কোন্ এক গভীরে নতুন বীজগণিত যেন
পরিহাসের চোখ নিয়ে অপেক্ষা করছে;
আবার মিথ্যা প্রমাণিত হবে বলে? *(আজকের এক মুহূর্ত)*

গভীর নতুন এক বীজগণিত দিয়ে জীবনানন্দ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পৃথিবীকে বুঝতে চেয়েছিলেন। আর বুঝে প্রগাঢ় ভাবে বিচলিত হয়েছিলেন তিনি।

'অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ'

যাকে তৃতীয় নেত্র বলেছি তার দৃষ্টিপাত রঞ্জনরশ্মির মতো বহিরাবরণ উন্মোচিত করে দেয়। চেনা জগতের ছবির ভিতরে ফুটে ওঠে অচেনা আর এক দ্বিতীয় ভুবনের চেহারা। যাকে মনে হয়েছিল সুশ্রী কমনীয়, প্রসন্ন কোমল, তার মধ্যে রুক্ষতা রূঢ়তার চিহ্ন ফুটে ওঠে—লাবণ্যের আড়ালে হাড় ধরা পড়ে যায়। যাকে সত্য মনে হয়েছিল সে আসলে, মেকি প্রমাণ হয়ে যায়। অন্তর্ভেদী নজরে যখন বাস্তবের ভিতরে পরাবাস্তবের মানচিত্র ধরা পড়ে তখন সত্য আর প্রতীয়মানের মধ্যে ব্যবধান জানাজানি হয়ে যায়। প্রতীয়মানের পর্দাকে সরিয়ে দিতেই যে বিশ্বসংসারকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল দৃঢ় এবং স্থিতিশীল তার চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল—'দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;/গ্রামপতনের শব্দ হয়; মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,/দেয়ালে তাদের ছায়া তবু/ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,/বিহ্বলতা বলে মনে হয়' *(পৃথিবীলোক)*।

চারিদিকে নবীন যদুর বংশ ধ্বংসে
কেবলই পড়িতে আছে; সঙ্গীতের নতুনত্ব সংক্রামক ধূয়া

নষ্ট করে দিয়ে যায়;—
স্মৃতির ভিতর থেকে জন্ম লয়, এই সব গভীর অসূয়া।

(আমিষাশী তরবার)

ক্ষুরধার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাচ্ছে মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অবক্ষয়ের ষড়যন্ত্র, সভ্যতাবিনাশের চক্রান্ত। এক-একবার মনে হচ্ছে মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে রক্তপাতের কারণ—'মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময়; সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী' (শ্যামলী)। 'অদ্ভুত আঁধার এক পৃথিবীতে ইদানীং নেমে এসেছে; শঠতা, অন্যায়, দ্বেষ,—বিশেষ করে দ্বেষই যেন আজ চালিকাশক্তি। 'আমরা খারিজ হয়ে দোটানার অন্ধকারে তবুও তো চক্ষু স্থির রেখে/গণিকাকে দেখায়েছি ফাঁদ;/প্রেমিকাকে শেখায়েছি ফাঁকির কৌশল' (সূর্যপ্রতিম)। 'দলিলে না মরে' তবু মানুষ ভিতরে-ভিতরে আজ মৃত; ইতিহাসে না মরে তবু জাতি ও সভ্যতা ভিতরে-ভিতরে বিনষ্ট।

আপাত-স্থিতাবস্থার আড়ালে এই ভাঙন দেখে, প্রতীয়মানের পিছনে সত্যের এই মারাত্মক চেহারা দেখে দুই রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে কবির। প্রথম প্রতিক্রিয়া, ব্যঙ্গের, পরিহাসের, অট্টহাসির। সত্য প্রতীয়মানের ভেদ দেখে তিনি হেসে উঠেছেন। জীবনানন্দকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা সবাই লিখেছেন কী এক অদম্য কৌতুকবোধে স্থানকাল বিবেচনা না করে তিনি অনেক সময় হাসিতে ফেটে পড়তেন। যে বিসঙ্গতিবোধ তাঁকে কৌতুকবিহ্বল করতো ব্যক্তিগত জীবনে, সেই পরিহাসবোধেরই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন কবিতায় যখনই সত্য ও আপতিকের বিসঙ্গতি ধরা পড়ে গেছে তাঁর তৃতীয় নেত্রের আলোকসম্পাতে। এই অসঙ্গতি যে সময় থেকে তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে যাচ্ছে, সেই সময়ের কবিতায় তাঁর ব্যবহৃত বিশেষণ-বিশেষ্যের মধ্যে এক বৈপরীত্যধর্ম দেখা যায়। বিশেষ্য-বিশেষণ যেন পরস্পরকে নাকচ করছে; একটি যদি বলে আপাতিকের কথা, অন্যটি যেন বলে গূঢ় পরিস্থিতির কথা। দুই বিপরীতের সংঘাতের সময় যেন কবির প্রচ্ছন্ন হাসিটিও ধরা পড়ে যায়। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে বিশেষ্য-বিশেষণের পাশাপাশি অবস্থানের মধ্য দিয়ে জীবনের বিসঙ্গতি কী ভাবে তিনি রূপায়িত করেছেন—'মসলিন যুবারা', 'বিমর্ষ প্রসব', 'ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা', 'কামানের স্থবির গর্জন', 'দিনের বিশ্রুত আলো', 'অমায়িক কুটুম্বিনী', 'নিটোল সারস', 'নির্মল ভিটামিন', 'সচ্ছল কঙ্কাল', 'ফিচেল বাতাস', 'সপ্রতিভ আঘাত' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই পরিহাসবোধের প্রথম ইশারা পাওয়া গেল 'অবসরের গান' কবিতায়। সেখানে 'পাড়াগাঁ-র এই সব ভাঁড়'-দের সঙ্গে আমাদের দেখা হল, শোনা গেল যোদ্ধা জয়ী সম্রাট ও সেই সব ভাঁড়ের 'খুলির অট্টহাসি'। তারপর প্রায়ই দেখছি আকাশও 'কৌতুকী', 'নক্ষত্র চুপে হেসে' যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে এক অদম্য কৌতুকবোধ তাঁর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল। সংসারে, অস্তিত্বের গভীরে সব জায়গায় তাঁর চোখে ধরা পড়ছিল হাস্যকর সব পরিস্থিতি।

১. একটি বিপ্লবী তার সোনা রুপো ভালোবেসেছিলো:
একটি বণিক আত্মহত্যা করেছিল পরবর্তী জীবনের লোভে;
একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিলো;
তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিল দশজন মূর্খের বিক্ষোভে। (ও.কে.)

২. ...জড়ায়েছে ঘিয়ের রঙের মতো শাড়ি
ভালো করে দেখে নিলে মনে হয় অতীব চতুর দক্ষিণরাঢ়ী
দিব্য মহিলা এক,...
জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক মিলে আমাদের দুদিকের কান
টানে বলে বেঁচে থাকি—ত্রিবেদীকে বেশী জোরে দিয়েছিল টান।
(অনুপম ত্রিবেদী)

কখনো এই পরিহাস গ্রোটেসক 'সুবিনয় মুস্তফী'-র মতো—'সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে। এক সাথে বেরাল ও বেরালের-মুখে-ধরা-ইঁদুর হাসাতে/এমন আশ্চর্য শক্তি ছিলো ভূয়োদর্শী যুবার।' আবার কখনো সেই ব্যঙ্গ ভয়ংকরভাবে বীভৎস, যেমন যেখানে তিনি 'সমারূঢ়' কবিতায় 'আরূঢ় ভনিতা' সমালোচকের 'অক্ষম পিচুটি'-কে আক্রমণ করেছেন। 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' বইতে অজস্রবার পরিহাসবাচক শব্দ পাই আমরা। প্রথম উদাহরণগুলো 'মহাপৃথিবী' থেকে—'হো হো করে হেসে উঠল', 'চারিদিককার অট্টহাসি', 'পরিহাসের চোখ', 'রক্তচ্ছটা রঞ্জিত ভাঁড়,' 'বৈহাসিক', 'জীবনকে টিটকারি', 'উচ্চস্বরে হেসে ওঠে', 'বেদম হেসে খিল ধরে যেত', 'হেসে খুন হতো', 'কৌতুকে', 'শকুনি মামার সাথে হেসে', 'সেই থেকে হাসায়', 'বিদূষক', 'পৃথিবীর প্রথম তামাসা'। 'সাতটি তারার তিমির' থেকে দিচ্ছি পরের নিদর্শনগুলো—'নৃমুণ্ডের হেঁয়ালি', 'লঘু হাস্য', 'লোল হাস্য', 'তামাসার প্রগলভতা', 'পরিহাসে', 'লোল নিগ্রো হাসে', আবহমানের 'ভাঁড়', 'চোখ ঠার', 'হেঁয়ালি', 'সোনালি হেঁয়ালি', 'ফিচেল', 'ঠোনা দিয়ে', 'নির্দোষ আমোদ' ইত্যাদি।

এই পরিহাসকে কবিতায় শরীরী করার জন্যে আর একটা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন জীবনানন্দ। সেই কৌশল প্রবাদ-প্রবচনের ঈষৎ বিকৃত ব্যবহার। কয়েকটা নিদর্শন দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন, 'কেননা যুগের গালে কালি আর চূণ' (সমিতিতে), 'বাতাসে ধর্মের কল নড়ে ওঠে—নড়ে চলে ধীরে' (মনোসরণি)। আরো কয়েকটি উদাহরণ—'ভারে কাটে—তথাপিও ধারে কাটে বলে' (উন্মেষ), 'অব্যয় শিল্পীরা সব : মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে' (জুহু), 'সূর্যের চেয়েও বেশি বালির উত্তাপে' (লোকসামান্য), 'পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো/সুকঠিন নয় আজ' (সৌরকরোজ্জ্বল), রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো. ভয়/চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?' (বিভিন্ন কোরাস), 'আদার ব্যাপারী হয়ে এই সব জাহাজের কথা/না ভেবে মানুষ কাজ করে যায় শুধু ভয়াবহ ভাবে অনায়াসে' (মহিলা)। তাছাড়া প্রথম অধ্যায়ে জীবনানন্দ খাঁটি দেশি শব্দ

ব্যবহার করেছিলেন অনুপুঙ্খের সমাবেশে বস্তুবিশ্বকে বিশ্বাস্য করে তোলার জন্য। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি ব্যবহার করেন শহুরে অপশব্দ, স্ল্যাং। এবার অভিপ্রায় অন্য। সত্য ও প্রতীয়মানের প্রভেদ জেনে তাঁর ব্যঙ্গপ্রখর মনের বিতৃষ্ণাকেই সাকার করে তোলার জন্যে এই সব অপশব্দের ব্যবহার—মরখুটে, খিঁচড়ে ওঠে, শুনেছি টায় টায়, খচ্চর, মিহিন কামিজ, টেঁসে যায়, ভারিক্কে, ও. কে., হুররে, গাড়ল। এবং এই রকম আরো।

বিশ্বসংসারের চেহারা দেখে ব্যঙ্গপরিহাসের এই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এক সময় রূপান্তরিত হয় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ায়—ঘৃণায়; জাগতিক বীভৎসতা দেখে মর্মান্তিক ঘৃণায়। হাস্যকর বিসঙ্গতিবোধ থেকে জন্মায় অপ্রতিরোধ্যভাবে এই মারাত্মক ঘৃণা।

প্রেমিকেরা সারা দিন কাটায়েছে গণিকার বারে:
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল....
তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে। *(সৃষ্টির তীরে)*

আর একটা অংশ তুলে দিচ্ছি—

পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো করে হেসে উঠল :
'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়োরের মাংস হয়ে যায়?'
হো হো করে হেসে উঠলাম আমি!—
চারিদিককার অট্টহাসির ভিতর একটি বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠল যেন;
পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,....।
(আদিম দেবতারা)

পরিহাস পরিণত হলো, বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছেন, সেই 'সংক্ষুব্ধ বিবমিষা'-য়। 'হো হো করে হাসি' যেন মাঝপথে থেমে গেল বীভৎসতায়—'শূয়োরের মাংস আর 'তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধে' জেগে উঠলো বমনের ইচ্ছা।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই সব বীভৎসতার ইমেজের সঙ্গে প্রায় সব সময় জড়িয়ে আছে জীবজন্তুর অনুষঙ্গ যারা বেশির ভাগই শোভন-সুন্দর নয়; এমন সব প্রাণী যাদের সংসর্গ মানুষ এড়িয়ে চলে। রাতের ট্রামলাইনকে মনে হয় 'কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো'। একটা বীভৎসতার জুগুপ্সিত ছবির মধ্যে এসে যায় নানা ধরনের কতো জৈবিক সমাবেশ!

বিশুষ্ক—ধূসর—
ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকার কৃমিদের স্তর
যেন তারা;—অপ্সরা—উর্বশী
তোমার আকৃষ্ট মেঘে ছিল নাকি বসি?

ডাইনীর মাংসের মতন
আজ তার জঙ্ঘা আর স্তন;
বাদুড়ের খাদ্যের মতন
একদিন হয়ে যাবে;
যে সব মাছিরা কালো মাংস খায়—তারে ছিঁড়ে খাবে। *(মনোবীজ)*

অনর্গল এসে যায় কালো বিড়াল, বানরবানরী, ব্যাং, ইঁদুর, ফড়িং, শেয়াল, শকুন, বেবুন, পেঁচা, ছাগল, হাঙর, এই সব প্রাণীর প্রসঙ্গ। সমুদ্রতীরে রোদ পোহানো শ্বেতাঙ্গদম্পতিকে দেখে মনে হয় 'সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো'। তিনজন আধ-আইবুড়ো ভিখারী যখন একজন শাঁখচুন্নিকে নিয়ে 'গোল হয়ে বসে গেল তিন মগ চায়ে' তখন—'তাহারা গণনা করে গেল এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যায়:/চুলের এঁটেলি মেরে গুণে গেল অন্যায় ন্যায়....' (লঘু মুহূর্ত)। জগৎ কবির কাছে যখন জীর্ণ প্রাসাদ তখন 'অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের পর ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার'......(অবরোধ)। জুগুপ্সা জাগায় স্পর্শ-অশুচি এই সব প্রাণী। এই সব প্রাণীর ইমেজ আবার অবয়ব দেয় ঘৃণ্যবীভৎস চরাচরকে। সব চেয়ে বেশি ক্লেদপঙ্কে লিপ্ত শূয়োর, সংখ্যায় না হোক, অন্তত বিস্ফোরক ব্যবহারে। যেমন—

১. হায়, সোনালি বাঘ-প্রেত,
তোমাদের জন্য শূয়ারের মাংস
শূয়ারের মাংস শুধু;
মৃত্যু তোমাদের ফেলে দিয়েছে
অন্ধকারে অচল অভ্যাসের ভিতর। *(হঠাৎ-মৃত)*

২. যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চিৎকার যেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এই সব ভয়াবহ আরতি। *(অন্ধকার)*

জীবনানন্দকাব্যের তৃতীয় অধ্যায়ে সংসার বাস্তবিক ভয়াবহ। এখানে 'মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম', 'সব ক্বাথ বাথরুমে ফেলে' ক্লেদাক্ত মলিন, সূর্যাস্তও এই মৃত-মুমূর্ষু পৃথিবীতে 'বেহেড আত্মার মতো'। প্রেমহীন চরাচরে 'চীনে বাদামের মতো' বিশুষ্ক বাতাস, নগরীর রাত্রি শ্বাপদসঙ্কুল লিবিয়ার জঙ্গলের মতো। জীবনানন্দের এই বিবমিষার সঙ্গে মনে হয় যেন সুইফ্‌টের 'disgust obsession'-এর সাদৃশ্য আছে। মিডলটন মারে সুইফ্‌টের রচনায় যে 'excremental vission' দেখেছিলেন, সেই বীভৎস-ক্লেদময়তার ছবি যেন এখানেও মেলে। আর জগতের প্রতি বিরূপ বিতৃষ্ণায় এখানেও সেই 'peculiar emotional intensity' আছে, যা সুইফ্‌টের রচনায় লীভিস্‌ লক্ষ্য করেছিলেন।

এই ঘৃণৎজগতে প্রেমহীনতার সঙ্গে আছে অন্নহীনতা, দরিদ্র ভিখারীকে দেখি, 'ধূসর বাতাস খেয়ে একগাল—রাস্তার পাশে ধূসর বাতাস দিয়ে করে নিল মুখ আচমন।' অন্যত্র পাচ্ছি—'অন্ন নেই। হৃদয়হীনভাবে আজ মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুরা/রক্তের সমুদ্র চারিদিকে;/কলকাতা থেকে দূর/গ্রীসের অলিভ-বন/অন্ধকার' (দীপ্তি)। এই বীভৎসতার মানচিত্র দেখে দেখে এক দুরপনেয় হতাশা এই দ্রষ্টাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যে সময়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে-হয়ে ক্লিশে হয়ে গেছে, সেই সময়ে বসে সম্পূর্ণ ক্লিশে-মুক্ত ভাষায় সেই বৈষম্যের অসহায়তা আঁকলেন জীবনানন্দ—'নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব—অথবা যা নিলেমের নয়/সে-সব জিনিস/বহুকে বঞ্চিত করে দুজন কি একজন কিনে নিতে পারে।/পৃথিবীতে সুদ খাটে; সকলের জন্য নয়।/অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দুজনের হাতে।/পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকেদের দাবি এসে সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।' আর এই বৈষম্যের শিকার যারা সেই ইয়াসিন হানিফ মকবুল করিম আজিজ গগন বিপিন শশী—'পাথুরেঘাটার, মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রীটের, এনটালির'—তারা দুর্ভিক্ষ দাঙ্গায় বিপর্যস্ত হয়। 'জীবনের ইতর শ্রেণীর/মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনা-কাটা করে...' (১৯৪৬—৪৭)। 'এই সব দিনরাত্রি' নামক কবিতায় প্রেমহীন অন্নহীন মানুষের এই তমিস্রাগাঢ় নিয়তির রূপায়ণ পাই। মানুষের সত্তার অন্ধকার এবং মানুষের সামাজিক পরিস্থিতির অন্ধকার যুগপৎ শরীরী হয়েছে এই রচনায়।

জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে:
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।...
যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই
হাসপাতালের বেড হয়তো তাদের তরে নয়।....
এ রকম ভাবে চলে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হয়ে যায় দিন,
পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিকচিহ্নহীন,
কেবলি পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর—
খালের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে
হাঘরে হাভাতেদের তবে
অনেক বেডের প্রয়োজন;
বিশ্রামের প্রয়োজন আছে;
বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।

এই তবে পরিণাম! 'প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লোল সঙ্গীতে' সবই কি নরক শ্মশান হবে, শ্রাবণধারার মতো ক্লেদরক্ত চিরটাকাল কি নির্গলিতভাবে বর্ষিত হবে? এই অন্ধকার, বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়, 'মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর', যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রবিপ্লব, অপরিসীম লালসা, 'অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া'-র প্রিয়তম সাধ—এই কি অসংবরণীয় নিয়তি! সত্তার এই অসুখের কি কোনো চিকিৎসা নেই, শুশ্রূষা নেই,

নিরাময় নেই? 'শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ'। সে রাষ্ট্র কি চিরকাল দূরেই থাকে, অথবা সেই রাষ্ট্র একদিন ভবিষ্যতে কাছে আসবে এই জেনে কবি কি রাত্রির চিত্র-পরম্পরাই শুধু এঁকে যাবেন? স্বচক্ষে দেখা ভয়ঙ্কর জাগতিক চেহারায় শেষ পর্যন্ত শিউরে উঠেছিলেন জীবনানন্দ। চতুর্দিকের অন্ধকার থেকে উত্তরণের জন্যে তিনি আকুল হয়ে উঠেছিলেন।

সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই;
লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
চাই। *(ইতিহাসযান)*

এই চাওয়া, এই আকুলতাই জীবনানন্দকাব্যের চতুর্থ অধ্যায়।

'পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা/সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।'

'আমার এই জীবনের ভোরবেলা থেকে—/সে সব ভূখণ্ড ছিল চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার;/একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল/আমাদের দুজনার মতো দাঁড়াবার/তিল ধারণের স্থান তাহাদের বুকে/আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই' (ভাষিত)। কবিজীবনের ভোরবেলার বস্তুবিশ্ব 'কণ্ঠস্থ' ছিল, তারপর 'পরিচিত' পৃথিবী প্রথমে অপরিচিত মাত্র, পরে নিদারুণ বীভৎস হয়ে গেল। দিব্যদর্শিতার রঞ্জনরশ্মিতে ধরা পড়ে গেল পৃথিবীর এই যে গভীর গভীরতর অসুখ, এর কি কোনো সংশোধন নেই—এই জিজ্ঞাসা শেষ অধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দ বারবার করেছেন। 'এ রকম কেন হয়ে গেল তবে সব/বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে।/একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে/আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে (ভাষিত)?'একবার শোণিত-মেশানো নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে তিনি সংশয়াপন্ন—

নিসর্গের কাছ থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুষের
মূঢ় রক্তে ভরে যায়; সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে, 'নদী
নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছো কি? মানুষের হৃদয়ের থেকে?'
(এইখানে সূর্যের)

অন্য সময় আবার স্বচ্ছ উজ্জ্বল জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে অনাস্থা-সংশয়কে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আস্থায় বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে যান।

নিজের নুড়ির পরে সারা দিন নদী
সূর্যের—সুরের বীথি,—তবু
নিমেষে উপল নেই—জলও কোন্ অতীতে মরেছে;
তবুও নবীন নুড়ি—নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী...। *(জনান্তিকে)*

যদিও এক সময় সোফোক্লিসের মতো মনে হয়েছিল 'মাটির পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি, না এলেই ভালো হত অনুভব করে', কিন্তু শিশির-শরীর

ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে 'পরে মনে হয়েছে এক গভীরতর লাভ হল। যদিও 'দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়' তবুও প্রগাঢ় প্রত্যয় জন্মায় 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়' *(সুচেতনা)*।

কাব্যের চতুর্থ অধ্যায়ে জীবনানন্দ তিমিরবিনাশী, তিনি তিমিরহননে উৎসুক। অন্ধকারকে ভেদ করতে চান, অবিশ্বাসকে অতিক্রম করতে চান, বীভৎসতা ও জুগুপ্সার ক্লেদপঙ্ক মুছে অমলিন স্নিগ্ধতার সন্ধানী তিনি আজ। 'নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে' তিনি চলেছেন,

> সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ন হৃদয়;—
> জয়, অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়। *(সময়ের কাছে)*

পূর্বপরিকল্পনার খসড়া কেউ করেন না, তবু নিজের অজ্ঞাতসারে, একটা পূর্ণবৃত্ত বড় কবি রচনা করেন। তাই তৃতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায় জীবনানন্দের পক্ষে অনিবার্য ছিল, কারণ অপ্রধান কবির নিয়তি জীবনানন্দের নিয়তি নয়। তবে অনেক সময় প্রাক্তন অন্ধকার থেকে এই উত্তীর্ণ হওয়ার আস্থাকে জীবনানন্দ বিশ্বাস্য করে তুলতে পারেন নি। অনেক সময় বিশ্বাসের জন্য কবির আকুলতা যতো প্রবল মনে হয়, ততো নিবিড়ভাবে সেই আলোকে কবিতায় তিনি সব সময় অপ্রতিরোধ্য পরিণাম হিসেবে দেখাতে পারেন না। মাঝে-মাঝে অমোঘতার অভাব পীড়িত করে আমাদের। যেমন '১৯৪৬-৪৭' কবিতার তমিস্রার অসামান্য বর্ণনার শেষে বীতশোক স্নিগ্ধতার কথা, আস্থাবাচক সিদ্ধান্ত অনেকটা আরোপিত মনে হয়। হয়তো খানিকটা বেশি সময় পেলে শেষ অধ্যায়ের আলোকে তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের বীভৎসতার ভিত্তির উপর আরো অমোঘ এবং অনিবার্যভাবে স্থাপিত করতে পারতেন।

কিন্তু সে যাই হোক, কিসের অভাবে সব নির্দেশ ভুল হয়ে গেল? কী ফিরে এলে তবে আবার সব বিশুদ্ধ হতে পারে? জীবনানন্দ ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে সময়কালের রাজনীতি ও সমাজনীতির বিষয়ে খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন। প্রাথমিক ঋতুতে তিনি নির্জন কবি হলেও, তৃতীয়-চতুর্থ অধ্যায়ের জীবনানন্দ সম্বন্ধে নির্জনতার আখ্যা খুবই ভুল। কিন্তু সব জেনেও বিশুদ্ধতার ঔষধ কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক·মতবাদে তিনি খোঁজেননি। তিনি জানতেন যে ইচ্ছাশক্তিতে নিরাময় হয় 'সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,/আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়' *(সুরঞ্জনা)*। কবির চোখ দিয়ে তিনি বিপন্ন জগৎকে দেখেছেন, কবির ধরনেই তিনি ত্রাণের পথ খুঁজেছেন। খুঁজেছেন, প্রেমে। গাঢ় আত্মবিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত তিনি উচ্চারণ করেছেন—'প্রেম/ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি' *(অনেক নদীর জল)*। প্রেমের অভাবেই সব কিছু অন্ধ হাহাকারময় এই কথা কাব্যের চতুর্থ অধ্যায়ে বারবার মেলে। প্রেম নেই বলে সব ব্যর্থ, মানুষে-মানুষে দুরতিক্রম্য বিচ্ছিন্নতা—'মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই,/শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে ব্যবহার নেই, প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল....' *(মহাত্মা গান্ধী)*।

জনতার হৃদয়ের ভীতি
মেধা নয়—সেবা চায়;—তাই ভেঙে ধসে গেল অমোঘ সমিতি,—
অন্বীক্ষায় উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া?....
...এই সব ঘাস, হরিতকী, সূর্য মনে হয় যেন প্লিওসিন
হাড়গোড়ে পড়ে আছে নিরুত্তেজ মানুষের প্রেমের অভাবে।

(১৩৩৬-৩৮ স্মরণে)

পৃথিবীর ভরাট বাজারভরা লোকসান, লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষগন্ধ ঠেলে 'আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই—প্রেমে।' শুধু কর্মিষ্ঠতা কিছু নয়, শুধু জ্ঞান বন্ধ্যা, 'জ্ঞান চায় প্রেম'। প্রেম বিনা ভাষা 'নিরাশ্রয় শব্দের কংকাল', আর বিজ্ঞান শুধু সংকলিত জিনিসের ভিড়। কেননা, 'রেললাইনের মতো পাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তহীন কার্যকারিতায়/সুখ আছে, সৃষ্টি নেই। অনেক প্রবাদ আছে প্রেম নেই' (এইখানে সূর্যের)। যেখানে প্রেম নেই, সেখানে প্রতিভা কৌশল মাত্র। জীবনানন্দ অনুভব করেছিলেন প্রেমহীনতা আর অস্তিত্বহীন শূন্যতা সমার্থক।

এই বিমূর্ত প্রেম প্রতিমা নিয়েছে, যেমন নেয়, নারীর মধ্যে। শূন্যের মধ্যে সে-ই জ্যোতিই পদ্মের মতো আত্মস্থ সুষমায় বিরাজমান।

আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যের মতো অপার অন্ধকারে মাইলের পর মাইল।...
সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
অবাক হলাম না।
হতবাক হবার কী আছে?
তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
স্বর্গীয় শিখার মতো....। *(সময়ের তীরে)*

প্রেমের প্রতিমা এই নারী পবিত্র শিখার মতো শুধু আলো দেয় তাই নয়, অস্তিত্বের বীভৎসতাকেও সহনীয় করে তোলে। 'মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালবেসে বুঝেছি, নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে' (তোমাকে)। জ্যোতির উৎস নারীকে তাই, অন্ধকার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি পবিত্র প্রার্থনার সুরে, আবাহন করে বলেন 'হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকারে/ তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে (মকরসংক্রান্তির রাতে)।

শেষে কোনো নির্বিশেষ নারীও নয়। আলো এসে সংহত হল এক জায়গায়—নির্বিশেষ নারী থেকে গুটিয়ে এনে বিশেষ। 'তবুও নারীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষায় জল, সূর্য মানে আলো; এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো'। নারীত্বের সারবত্তা এই 'তুমিতেই কবির পরম বিশ্বাস, প্রগাঢ় আস্থা।

তোমার বুকের পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল;
তোমার বুকের পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস;
তোমার বুকের পরে আমাদের পৃথিবীর রাত;
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস। *(তোমাকে)*

যে নারকীয় বীভৎসতার মানচিত্র জীবনানন্দ এঁকেছেন তৃতীয় অধ্যায়ে, তা কবির মনে জাগিয়েছিল অদম্য বিবমিষা। তার থেকে তিনি উদ্ধার চেয়েছেন আলোয়, পবিত্র নির্মল জলধারায়—আর সেই আলোর দ্যুতি আর জলের শুশ্রূষা যার মধ্যে সাকার সেই নারীর মধ্যে।

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি। *(হে হৃদয়)*

নারীর মধ্যে সেই ঝর্ণার ধ্বনি আর মালিন্যমুক্ত পবিত্রতা। দুর্ঘটনা ঘটার সময় পর্যন্ত, সেই আলো ও পবিত্রতার অসমাপ্ত অধ্যায় রচনায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

জীবনানন্দের কবিতা : অনিমেষ আলোর বলয়

অমলেন্দু বসু

জীবনানন্দের কাব্যের পরিমাণ মোটেই বেশি নয়। সমকালীন অনেক লেখকের তুলনায় তাঁর সৃষ্টিকর্ম সীমিত। কিন্তু প্রসার ও বিস্তৃতি দিয়ে তো সাহিত্যরচনার তুঙ্গতা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় তার অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব দিয়ে। সেই মহত্ত্বের বিচারে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙালি কবিদের মধ্যে (অথবা বলতে পারি ত্রিশের দশক থেকে যাঁরা বাংলায় কবিতা লিখেছেন, আজো লিখছেন, তাঁদের মধ্যে) জীবনানন্দ দাশের উত্তুঙ্গ কৃতিত্ব প্রশ্নগম্য নয়। প্রকাশের তারিখ অনুসারে কাব্যগ্রন্থ কয়টি সাজানো হলেও এমন নয় যে গ্রন্থের পরে গ্রন্থে কবির ভাবনা ও রচনা পর্যায়ের পরে পর্যায় অতিক্রম করে চলেছে। কবির আত্মার যে সৃজনী-উন্মাদনা উত্তাল হয়েছে সে একটি রচনাস্তর পিছনে ফেলে দ্বিতীয় রচনাস্তরে উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তারপরে তৃতীয় কোনো স্তরে উত্তীর্ণ হচ্ছে—এমন যান্ত্রিক পারম্পর্য জীবনানন্দের কাব্যের বিকাশে নেই। কাব্যগ্রন্থগুলির অন্তর্গত যেসব কবিতা, তাদের রচনাকাল ও প্রকাশকাল তুলনা করলে এরকম দেখতে পাই :

> 'বনলতা সেন' কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল ১৯২৬-১৯৩৯ সনে, অর্থাৎ এই কাব্যগ্রন্থের সৃজনী প্রেরণায় কবিচিত্ত উদ্বেলিত ছিল তেরো-চৌদ্দ বৎসর।
>
> কিন্তু এই গ্রন্থের পরেই যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সনে সেই "মহাপৃথিবী"র বিভিন্ন কবিতার রচনা ও প্রকাশ-কাল ১৯২৯ সন থেকে ১৯৪১ সন পর্যন্ত। অর্থাৎ যদিও গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল "বনলতা সেন" গ্রন্থের পরে, তাহলেও দুই সুরের বিভিন্ন কবিতার অনেকগুলিই রচনায় সামসময়িক।

জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থগুলি পাশাপাশি রেখে পড়লে তাঁর রচনায় সেই ভাবনাসম্মিতি পাওয়া যায় যাকে বলতে পারি ভাবনা-স্তবক অথবা সহচর-ভাবনা। আমরা কখনো কখনো দেখতে পাই, এক অধ্যায়ের সামসময়িক হয়ে, একই রচনাকালীন হয়ে পড়েছে অন্য অধ্যায় বা প্রথম গ্রন্থের ভাব উপচে পড়েছে দ্বিতীয় গ্রন্থে, কিন্তু তা হয়েও ক্ষান্তি নেই, কেননা দ্বিতীয় গ্রন্থে এমন কিছু ভাবনা এসেছে যা প্রথম গ্রন্থে অনুপস্থিত। তুলনার জন্য দুই গ্রন্থ থেকে ছত্রমঞ্জরী তুলছি। প্রথমটি নেওয়া হয়েছে 'ঝরা পালকে'র 'পিরামিড' কবিতা থেকে :

> মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা
> হেমন্তের বিদায়-কুহেলি—

অরুন্তুদ আঁখি দুটি মিলি
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দুদিনের তরে শুধু;

এখন তুলছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের 'নির্জন স্বাক্ষর' থেকে :

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন,—
পথের পাতার মত তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে?
—অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার?

এই ছত্রগুলি এবং এহেন আরো ছত্র প্রথম-প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থ পড়ে আমার স্মরণে আসে ইংরেজ উপন্যাস-লেখিকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্-এর কিছু কথা। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

My great adventure is really proust...I'm only in the first volume, and there are, I suppose, faults to be found, [জীবনানন্দর গোড়ার কাব্য সম্বন্ধে এমন বলা যায়] but I am in a state of amazement; as if a miracle were being done before my eyes. How, at last, has some one solidified *what has always escaped*—and made it too into this beautiful and perfectly enduring sub stance? One has to put the book down and gasp. The pleasure becomes physical—like sun and wine and grapes and perfect serenity and intense vitality combined.

(To Roger Fry, Oct. 3, 1922; *Letters of Virginia Woolf,* vol. ii, pp. 565-66, London, 1976).

জীবনানন্দের যে দুটি কবিতার অংশ উপরে উদ্ধৃত করেছি, সে-অংশ দুটিতে অবশ্য সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নেই, তেমন সাদৃশ্য থাকতে পারে না কোনো সৎ কবির রচনায়, কিন্তু একই কল্পনা-পল্লবের একদিকে যে কবিভাবনা, সেই কাব্যভাবনারই সমতুল্য প্রকাশ অন্যদিকে থাকতে পারে। জীবনানন্দে তেমনটি আছে। এমন নয় যে জীবনানন্দর একটি কবিতায় বা কাব্যগ্রন্থেই একটি ভাবনার স্ফুরণ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। অথবা এমনও নয় যে একটি দুটি তিনটি পরপর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে একটিমাত্র ভাবনার, একটিমাত্র কল্পনাস্রোতের ধারা প্রবাহিত হয়েছে, হয়ে নিঃশেষিত হয়েছে, এর পরের একটি বা একাধিক গ্রন্থে আমরা পৌঁছই—অন্য ভাবনার ধারায় যে-ভাবনার কিছুমাত্র চিহ্ন পূর্বের গ্রন্থে ছিল না। এমন কৃত্রিম যান্ত্রিক ভাবনা-সীমান্ত জীবনানন্দে নেই, বরং কখনো কখনো এক ভাবনার সমসাময়িক হয়ে পড়েছে অন্য ভাবনা। 'ঝরা পালকে'র ভাবনা উপচে পড়েছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে, কিন্তু সেখানে এমন নতুন ভাবনা এসেছে যা আগেকার বইয়ে নেই। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে আমি কিছু ছত্র তুলে ধরছি :

আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
ওগো শক্তি, তার চেয়ে পৃথিবীর পিপাসার ভার
বাধা পায় জেনে লয় নক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা।
আমারে করেছ তুমি অসহিষ্ণু—ব্যর্থ—চমৎকার।
জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বারবার যার ইসারায়,
বীণার তারের মত পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তার
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে শুধু যায়!
একাকী মেঘের মত ভেসেছে সে—বৈকালের আলোয়—সন্ধ্যায়!

('অনেক আকাল')

অন্য কবিতা থেকে কয়েকটি ছত্র :

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে:
সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের দুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!

('বোধ')

যদি তিনি বাংলা জানতেন তাহলে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ এই ছত্রগুলি পড়ে হয়তো বলতেন, I am in a state of amazement as if a miracle were being done before my eyes!

'সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!'—পৃথিবীর কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছত্র। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে নেওয়া এই উদ্ধৃতির ভাষা, সুর, ভাবনা "ঝরা পালকে"র কোথাও নেই; যদিও অন্য দু-চারটি কবিতার সূত্রতুলনায় এই দুখানা বইয়ে সমপল্লবী ভাবনার প্রকাশ আছে। অতএব এমন বলতে পারি যে, 'ঝরা পালকে'র ভাব ও শৈলী 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেও আছে কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপিতে' নতুন এক শিল্পপ্রকাশ পাচ্ছি যার দৃষ্টান্ত 'ঝরা পালকে' নেই।

দুই

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি-চেতনা সৃষ্টির ঘুরনো সিঁড়ির পথে (জীবনানন্দ বলেছেন 'আবহমান' কবিতায়, ইয়েটস বলেছিলেন ওয়াইনডিং স্টেয়ার) অনেক এগিয়ে গেছেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থে নিসর্গের সঙ্গে আত্মচেতনার যে সাজাত্য ছিল, তা তো এখনো আছে, কিন্তু একই সময়ে তাঁর কাব্যভাবনার কিছু নতুন প্রত্যয়ও এসেছে। তিনটি তাত্ত্বিক প্রত্যয় প্রবেশ করেছে জীবনানন্দ দাশের কাব্যে : সময়, মৃত্যু অতীত—এই তিন বিষয়ে চিন্তা, যে-চিন্তা অনতিকালমধ্যেই জীবনানন্দ-কাব্যের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক উপাদান হয়ে উঠবে। জীবনানন্দর সমগ্র কাব্যেই (বিশেষত পরিণত কাব্যে) 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কাল থেকে এই তিন বিষয়ের চিন্তা বারংবার ঘুরে ঘুরে এসেছে, জলের মতো ঘুরে ঘুরে এসে যেন কিছু অবিস্মরণীয় কথা বলে গেছে পাঠকের কাছে। এই তিন প্রত্যয়—সময়, মৃত্যু, অতীত—জীবনানন্দ কল্পনা-জগতের অটুট ঐশ্বর্য—প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষে এই তিন প্রত্যয় তাঁর কাব্যে ঘুরে ফিরে আসে, বাক্‌প্রতিমার সৃষ্টি করে। "ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকে এই পুনরাবৃত্ত সময় চিন্তার মাত্র পাঁচটি উদাহরণ তুলছি :

১। সময় সিন্ধুর মত (পৃ. ১৬)
২। আমার নিকট থেকে
তোমারে নিয়েছে কেটে কখন সময়! (পৃ. ২০)
৩। পড়ে আছে যতটা সময়
এমনি তো হয়! (পৃ. ২১)
৪। যে সময় চলে গেছে তা-ও কাঁপে ক্ষমতার বিস্ময়ে-আবেগে! (পৃ. ২৫)
৫। অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ন সময় (পৃ ৪৯)

এই সময়-চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে অতীতের চেতনা। অতীত তো সময়ের একটি বিশেষ অবস্থা, আজকের জীবন কাল অতীত হয়ে যাবে, অতীতের কুক্ষি অরোধ্য। অতীতের ভাবনা অনবদ্য সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র অনেক ছত্রে :

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মত যেন, হায়
তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভরে গেছে; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে।

('ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মৃত্যুর আগে')

[এই আশ্চর্য স্তবকটির গীতময়তা লক্ষ্য না করে পাঠকের উপায় নেই, এবং এই গীতময়তা সৃষ্ট হয়েছে প্রধানত ১১০টি স্বরধ্বনির এমন প্রবহমান সমাবেশে যাতে 'আ'-স্বরধ্বনি হচ্ছে সংখ্যায় ৩৫টি, 'এ'-স্বরধ্বনি ৩০টি। জীবনানন্দর কাব্যে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সুর-বৈচিত্র্য বিশদভাবে নিরীক্ষার বিষয়।]

সময়-চেতনা থেকেই অতীত-চেতনা। সেই অতীত-চেতনা এই স্তবকটিতে পরিপ্লাবিত হয়ে আছে। ক্রিয়াপদগুলি অতীত-সূচক; হেঁটেছি, দেখেছি, গেছে। ব্যথিত বেদনার কোমল অতীত-চেতনা, যে-অতীত ধূসর আবছায়াতে পরিণত হয়েছে ("কুয়াশার, কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মত")। অতীত তো সময়েরই একটি রূপ, সময়-চেতনা যেমন মানুষের মনকে নিয়ে যায়, অতীত তেমনি নিয়ে যায় মৃত্যু-চেতনায়, কেননা জীবন ও মৃত্যু তো সময়েরই রূপ, বর্তমান ও অতীত কালের ভিন্নতা। কবি বলছেন,

উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয়!
*　　*　　*
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব,
নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয়!

('ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'স্বপ্নের হাতে')

ধ্যানের সময় আসে তারপর,—স্বপ্নের সময়!
—শরীর ছিঁড়িয়া গেছে,—হৃদয় পড়িয়া গেছে ধসে!
—অন্ধকার কথা কয়,—আকাশের তারা কথা কয়
তারপর,—সব গতি থেমে যায়,—মুছে' যায় শক্তির বিস্ময়!

('ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'জীবন'; ২৮)

মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধরে!
যে বালক কোনোদিন জানে নাই গহ্বরের ভয়,
পূবের হাওয়ার মতো ভূত হয়ে মন তার ঘোরে!

('ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'জীবন', ২৬)

জীবনানন্দের কাব্যে সময়-চেতনা সময়ের স্থবিরকরণী শীতল নির্জীবতাকে জয় করেছে।

তিন

'ঝরা পালক' এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে আমরা জীবনানন্দর কাব্যের দুটি মূল্যবান উপাঙ্গ পেয়েছি' : নিসর্গপ্রেম এবং সময়-চেতনা। নিসর্গপ্রেম এই কাব্যের প্রথম থেকে শেষ অবধি সক্রিয়। সময় অতীত-মৃত্যুচেতনার প্রকাশ পেয়েছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কিন্তু, আমার ধারণায়, এই চেতনার উজ্জ্বলতম প্রকাশ 'রূপসী বাঙলা'র সনেটগুলিতে। (এই গ্রন্থের কিছু কবিতায় চতুর্দশপদী আঙ্গিকের ব্যতিক্রম আছে।) এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল কবির মৃত্যুর তিন বছর পরে, ১৯৫৭ সনে, কিন্তু সনেটগুলির বড়ো অংশ রচিত হয়েছিল 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকাশকালে, ১৯৩৬ সনে এবং তারপরে। 'রূপসী বাঙলা'র মতো কবিতার সমাহার আমাদের ভাষায় আর আছে বলে আমার জানা নেই, ইংরেজিতে শেক্সপিয়রের বিখ্যাত সনেটসমুচ্চয় এবং 'উনিশ শতকী' ইংরেজি

কাব্যের চারজন কবির সনেট-সমুচ্চয়—এলিজাবেথ ব্যারেন ব্রাউনিং, মেরেডিথ, দান্তে রোসেটি ও ক্রিস্‌টিনা রোসেটির সনেট-সমুচ্চয় কয়টি। 'ধূপসী বাঙলা'র সঙ্গে তুলনীয় কবিতাসমাহার আমাদের ভাষায় আর আছে বলে আমার মনে হয় না। সব বাঙালি কবিই বাংলাদেশকে ভালোবাসেন, ভালোবেসেছেন, বাংলার ঐতিহ্যে তাঁদের প্রাণমন ভরপুর, কিন্তু বাংলার ঐতিহ্য ও বাংলার নিসর্গশোভা সম্বন্ধে সদাপ্রদীপ্ত চেতনা যেন জীবনানন্দ দাশের প্রতি রক্তকণিকায় মিশে ছিল। এই অমর বাঙালি কবি বলেছেন :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর * *
* * *
যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে
অপরাজিতার মতো নীল হয়ে—আরো নীল—আরো নীল হয়ে।
* * *
আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে;
পৃথিবীর পথে ঘুরে বহু দিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে
* * *
কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখান,
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস,—লাল লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরি মাঝে বাংলার প্রাণ।
* * এই বাংলার ঘাস
রবে বুকে; এই ঘাস; সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়—
ইহাদের ঘোড়া আজো অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙে চলে যায়—
* * এই সোঁদা ঘাসের ধূলায়
জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—চারিদিকে বাঙালীর ভিড়
বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি; কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের পথে
বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন
কাটাইনি দিন মাস * *

উদ্ধৃতির তো সীমা নেই, এই সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিতে বাংলা-প্রেমী জীবনানন্দের সর্বেন্দ্রিয় সমেত সংবেদী হৃদয় ও উজ্জ্বল আত্মা ছড়িয়ে আছে। তাঁর এই বাংলাপ্রীতি কোনো রঙিন নাগরিক বিলাস নয়, এই প্রীতি তেমনই প্রাকৃত ও বাস্তব যেমন গ্রামবাংলার শ্যামল সিক্ত তেপান্তর-প্রসারী পল্লীজীবন। স্বদেশের সঙ্গে এই অতুলনীয় আত্মার আত্মীয়তা আমরা টের পাই বহু বাঙালি দেশপ্রেমীর কাহিনীতে, জীবনানন্দের দেশপ্রেম উত্তুঙ্গ সততায় চিরভাস্বর। তিনি বলছেন :

যদি আমি ঝরে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়:
যখন ঝরিছে ধান বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে ম্লান চোখ বুজে,
যখন চড়াই পাখি কাঁঠালিচাঁপার নীড়ে ঠোঁট আছে গুঁজে,
যখন হলুদ পাতা মিশিতেছে উঠানের খয়েরি পাতায়,
যখন পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়,
শামুক গুগ্‌লিগুলো পড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে,—
তখন আমারে যদি পাও নাকো লালশাক—ছাওয়া মাঠে খুঁজে,
ঠেস্‌ দিয়ে বসে আর থাকি নাকো যদি বুনো চালতার গায়,
তাহলে জানিও তুমি আসিয়াছে অন্ধকারে মৃত্যুর আহ্বান— (পৃ ২৫)

কি আশ্চর্য শব্দপ্রয়োগ!—'ঝরে যাই', কবি ঝরবেন, কবির জীবনান্ত হবে ধানঝরার মতো সহজ অচেতন প্রক্রিয়া! আর আছে বাংলার গ্রাম্য দৃশ্যাবলীর কয়েকটি অমিশ্রিত সাদাসিধে রং; নীল কুয়াশা, হলুদ পাতা, খয়েরি পাতা, শ্যাওলার মলিন সবুজ, লালশাক-ছাওয়া মাঠ।

কেন যে জীবনানন্দ নিজ জীবৎকালে এই কবিতাগুলি প্রকাশ করেননি জানি না, খুবই সম্ভবত প্রবল অন্তরোৎসারিত একই অবিরাম সৃজনী আবেগে লিখে ভেবেছিলেন এখানে সেখানে কিছু বাচনিক সংস্কার করবেন (যেমন অপ্রকাশিত রেখেছিলেন তাঁর উপন্যাস ও গল্প কয়টি) কিন্তু এই বঙ্কিমতাবিহীন সরলরেখা বর্ণনাগুলি শুধু যে কবির সেই সময়কার সৃজনী প্রকাশভঙ্গি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে তা-ই নয়, এই বর্ণনাভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে গেছে বিষয়বস্তুর সঙ্গে এবং তাঁর নিষ্কম্প গীতল ছন্দ ও ভাষার সঙ্গে।

* 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে, যে সমবায় আমরা লক্ষ্য করেছি—নিসর্গের ও সময়ের, মৃত্যুর, মৃত্যুচেতনা সমবায়—তার উজ্জ্বলতম প্রকাশ হয়েছে, দুই ভাব স্তবকের (নিসর্গপ্রীতির ও বিগত চেতনার) অকুঞ্চিত মিলন হয়েছে 'রূপসী বাঙলা'র সনেটগুলিতে। বারেবারে মৃত্যুর কথা ভাবছেন কবি :

কোথাও চলিয়া যাব একদিন; তারপর রাত্রির আকাশ
অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে ঘুরে যাবে কতকাল জানিব না আমি; (পৃ. ২৮)
তোমার বুকের থেকে একদিন চলে যাবে তোমার সন্তান
বাংলার বুক ছেড়ে চলে যাবে; (পৃ. ২৯)
সে কত শতাব্দী আগে তাহাদের করুণ শঙ্খের মতো স্তন
তাদের হলুদ শাড়ি—ক্ষীর দেহ—তাহাদের অপরূপ মন
চলে গেছে পৃথিবীর সব চেয়ে শান্ত হিম সান্ত্বনার ঘরে :
আমার বিষণ্ণ স্বপ্নে থেকে থেকে তাহাদের ঘুম ভেঙে পড়ে। (পৃ. ৪৭)

সময়প্রবাহ ও মৃত্যুর কথা ভাবছেন বলেই অতীতের কথা ভাবছেন কবি* এবং ইতিহাসের কথা ভাবছেন। কবির জগতে শালিখ মরে যায় কুয়াশায় (২৭ পৃ.), নদীরা

---

* জীবনানন্দ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন, ইংরেজি গদ্যের তারিফ করতেন। আমার এমন অনুমান নিছক ভাব বিলাস না-ও হতে পারে যে স্যার টমাস্‌ ব্রাউনের Urn Burial-এ লিখিত কয়েকটি ছত্র তাঁর স্মরণপথে উঁকি দিয়েছিল :

মজে যায় (২৭ পৃ.), রাঙা বউটিকে আর ডাকে না বউ কথা-কও পাখি (৩২ পৃ.), কবির ছেলেবেলাকার দেখা দাঁড়কাক নেই আর (৩৩ পৃ.), কবি শুধোচ্ছেন, আজ তারা কই সব? (৬৩ পৃ), এই মৃত্যুর চেতনা তাঁর কল্পনাকে বারেবারে নিয়ে যায়. অতীতের দিকে, যে অতীতে ইতিহাস আছে, রূপকথা আছে। রূপসী বাঙলার জগতে আছে কেশবতী কন্যা (১৫ পৃ.), এখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মাণিকমালা কাঁকণ বাজত (১৩ পৃ.), এখানে চাঁদ সদাগর তার মধুকর ডিঙা নিয়ে কালীদহে ঝড়ে পড়েছিল (১৭ পৃ.), এখানে বেহুলা লহনার প্রেমদৃঢ় জগৎ ছিল, এবং

> কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
> নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রবণের জীবন গোঙায়। (পৃ. ১৯)

অতএব কবির প্রত্যয় এইরকম :

> পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল:— *(নিসর্গ)*
> এশিরিয়া ধূলো আজ,—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

রূপকথার সঙ্গে মিশেছে ইতিহাস, বাংলাদেশের অতীত কথা। এই পাড়াগাঁর বুকের উপর দিয়ে ছুটে চলেছিল বল্লাল সেনের ঘোড়া (১৬ পৃ.); আরো ঘোড়সওয়ার চলেছে—সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায় (১৮ পৃ.)। যদি এখানে কান পেতে থাক তাহলে শুনতে পাবে কে প্রশ্ন করছে: "ঘোড়া চড়ে' কই যাও হে রায়রায়ান?'—এবং এই প্রশ্ন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সেই প্রশ্ন:—দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও হে?

জীবনানন্দ দাশের ঐতিহ্যচেতনা যেমন সদাজাগ্রত (মধ্য ও শেষ পর্যায়ের কাব্যে ঐতিহ্য-চেতনা নিজ দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল) তেমনই সুতীক্ষ্ণ সংবেদনশীল চেতনা ছিল গ্রামবাংলার গাছপালা পাখি জন্তু সম্বন্ধে। বাংলার ফ্লোরা এবং ফণা সম্বন্ধে এমন পুনরাবৃত্ত উল্লেখ আর কোনো লেখকে আছে বলে আমার মনে হয় না, এত পাখি, জন্তু, গাছ, ফুল, ফল রবীন্দ্রনাথও জানতেন না। আমার অধ্যয়নগণ্ডীর মধ্যে একমাত্র শেকসপিয়র জানতেন; "পরিচয়" পত্রিকায় 'শেকসপিয়রের কাল' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে একদা আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, আর বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় অক্স্ফোর্ডের ক্ল্যারেন্ডন্ প্রেস থেকে প্রকাশিত বৃহৎ দুইখণ্ডী গ্রন্থের অ্যানিম্বস এবং প্ল্যান্টস শীর্ষক পরিচ্ছেদ দুটিতে। শেক্স্পিয়রের জ্ঞানের পরিধি কত প্রসারিত ছিল সেকথা বোঝা যায় যখন জানি যে তিনি তেইশ রকম গমের কথা জানতেন। বহুসংখ্যক ফুল ফল গাছ মাছ পাখির কথা জানতেন। জীবনানন্দর জ্ঞানের পরিচয় পাই বহুবিচিত্র গাছপালার নামে, বহু বিচিত্র পাখি ও প্রাণীর নামে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রতি শ্রেণীর মাত্র পঞ্চাশটি নাম দিচ্ছি, আরো নাম মেলা আদৌ কষ্টসাধ্য নয়।

> The number of the dead long exceedeth all that shall live. The night of time far surpasseth the day, and who knows when was the Æquinox?....Since the brother of death daily haunts us, with dying mementos, and time that grows old in itself, bids us hope no long duration: Diuturnity is a dream and folly of expectation.

উদ্ভিদ: ঝাউ, হরিতকী, শাল, পিয়াশাল, পিয়াল, আমলকী, দেবদারু, শিরীষ, সুপুরি, নারকেল, অশ্বত্থ, কাঁঠাল, হিজল, কলমিশাক, বইচি, ফণিমনসা, কদম, নীল, তেঁতুল, আম, জাম, কাঁঠাল, বটফুল, কামরাঙা, শেফালি, শেয়ালকাঁটা, বাসক, ডুমুর, চালতা, নাটাফল, পরথুপী, মধুকূপী ঘাস, বাসমতী চাল, আনারস, হেলেঞ্চা, তালশাঁস, পলাশ, ভেরেণ্ডা, মাদার, ক্ষীরুই, লিচু, আকন্দ, সজনে, করবী, কাটাবহর, জামরুল, বট, মৌরি, বেত (এই তালিকা মোট সংখ্যার ভগ্নাংশ মাত্র)।

প্রাণী : সম্ভর, নীলগাই, হরিণ, চিতল, চিল, পেঁচা, লক্ষ্মীপেঁচা, সজারু, ফড়িং শালিক, জোনাকি, গঙ্গাফড়িং, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা, খঞ্জনা, নিমপাখি, দাঁড়কাক, গুবরেপোকা, ভীমরুল, শঙ্খচিল, বক, ঝিঁ ঝিঁ, বোলতা, কুকুর, বিড়াল, সাপ, বাদুড়, চড় ই, সরপুঁটি, মাছরাঙা, গোরু, ইঁদুর, মৌমাছি, মাছি, ভোমরা, হাঁস, সুদর্শন, শামুক, গুগ্‌লি ভীমরুল, চিল, গোখরা, পিঁপড়া, কোকিল, গাংচিল, বোলতা, রাজহাঁস।

এসব তরুলতা নানারকম প্রাণী সম্বন্ধে উল্লেখে কবি জীবনানন্দের স্বভাবজ বস্তুচেতনার নিদর্শন পাই, বস্তুনির্ভর অভিজ্ঞতাই তাঁকে নিসর্গপ্রেম ও সময়, মৃত্যু, ইতিহাসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু অতীতে যেমন চলে গিয়েছিল তাঁর সৃজনীকল্পনা, সে-কল্পনা চল্লিশের দশকে তৎকালীন জগতের চলমান রূঢ় গ্লানিতে ক্ষুব্ধ হল, না হয়ে উপায় ছিল না। চল্লিশের দশকের জাগতিক যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হানাহানি, দুর্ভিক্ষ, মারী, দারিদ্র্য, মানবতার বিকার—এসবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল আমাদের বাংলাদেশ এবং সে দেশের বৃহত্তম জনতার ও শক্তির কেন্দ্র, কলকাতা। এই মানবতার বিকার তৎকালীন যাবতীয় লেখক, শিল্পীকেই মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছিল, জীবনানন্দ দাশকে দিয়েছিল অবর্ণনীয় বেদনাময় আঘাত, যে-আঘাতে মানুষে বিশ্বাস হারাবার অবস্থায় যেন তিনি এসে পড়েছিলেন। এই ক্লিষ্ট, বেদনাহত অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হয়েছিল জীবনানন্দ-কাব্যের তৃতীয় স্তবকী বা পল্লবী ভাবনা এবং এই ভাবনার আবির্ভাব পাই 'বনলতা সেন' গ্রন্থে। প্রকাশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই গ্রন্থটি কিছুটা অসাধারণ মনে হতে পারে। 'রূপসী বাংলা' ও 'বনলতা সেন' এই দুই কাব্যগ্রন্থে রচনার সময়-সান্নিধ্য আছে বটে কিন্তু 'রূপসী বাঙলা' কবির জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি অথচ 'বনলতা সেনে'র কোনো কোনো কবিতা ১৯২৫-এর পরেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৯ সনে ১৪ বছর পরে (যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে)। এ-ও দেখতে হবে যে এ-বইয়ের কিছু কবিতা অনেক পরে মুদ্রিত হয়েছিল ১৯৪৪ সনে "মহাপৃথিবী" নামক গ্রন্থে। জীবনানন্দর গ্রন্থগুলির রচনাকাল সযত্নে চিত্রিত হয়েছে শ্রীঅম্বুজ বসুর গ্রন্থে ('একটি নক্ষত্র আসে' পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২৬৬ ও ২৬৭ পৃষ্ঠার ক্রোড়ে), গ্রন্থটির বহু উপকারিতার মধ্যে এই গ্রাফ্ চিত্রটি অন্যতম।

*'বনলতা সেনে' আমরা জীবনানন্দ-কাব্যের তৃতীয় স্তবক বা পল্লব পাই, কিন্তু লক্ষ্য করি যে পূর্বের দুটি স্তবক এখানেও উপস্থিত। ইতিপূর্বে যেমন বলেছি, দুটি বা

তিনটি সৃজনী পর্ব এখন একই কালে আত্মপ্রকাশ করে, অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় স্তবক শুরু হয় তখন প্রথম স্তবকের সৃষ্টিও চলতে থাকে, আবার একই কাল-পরিধিতে তৃতীয় স্তবকের ফেজও যদি প্রকাশিত হয়, দুটি বা তিনটি স্তবকেই যদি কবির সৃজনী প্রতিভা সেই কাল-পরিধিতে কর্মশীল হয় তাহলে তাকে বলব কাব্যবিকাশের একটি অসাধারণ লক্ষণ।

'বনলতা সেনে'র, অর্থাৎ জীবনানন্দের প্রতিভাপ্রকাশের তৃতীয় স্তবকে বা পল্লবে কবির জীবনবোধ জটিল হয়ে আসছে। জীবনে, জগতে, সমাজে দেখা যাচ্ছে ক্রূরতা, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। কবি বলছেন :

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি,

ভা-রি রোমান্টিক, ইডিলিক, মায়াবী ঈপ্সা-কোমল পরিস্থিতি। কিন্তু তার পরে কবি বলছেন,

'গুলির শব্দ আবার:
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না।

দুই পরিস্থিতির থেঁতলানো বিরোধিতা, বৈরিতা, আধুনিক জীবনের একটি বিশেষ লক্ষণ। যেখানে ইতি আছে, সেখানেই নেতি আছে, কোথাও নৈতিক মূল্যের একক শুভ্রতা দেখা যায় না, একাধিক মূল্যবোধের যুগপৎ সংস্থান ও তার দরুন সংঘাত, বিকৃতি, এমনধারাই হয়ে গেছে আধুনিক জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি। এখন থেকে জীবনানন্দর বাক্‌প্রতিমাগুলিও অদ্ভুত নিষ্ঠুরতাবোধের আচ্ছাদনে ঢাকা, কোথাও কেউই নিজ জন্মলব্ধ বর্ণে বিরাজ করছে না। কয়েকটি ছত্র দেখা যাক:

খড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে: দক্ষিণ শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়!

জীবনানন্দর বাক্‌প্রতিমাগুলি এই তৃতীয় স্তবকে বা পল্লবেও স্মরণীয় স্বাতন্ত্র্যে ধনী, এখনো তারা প্রধানত দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়-বোধগুলিকে উদ্বেজিত করে তাদের ভাষাকুশলতা এবং অনুভূতির গভীরতা প্রয়োগ করে, জীবনানন্দ তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ও বিচিত্র বাক্‌প্রতিমাকার। কিন্তু তাঁর জীবনদর্শনে বেদনা এসেছে, সমাজের কুশ্রীতা ও কুটিলতাবোধ এসেছে, ক্লেদ, নিরাশা, সর্বব্যাপী গ্লানির বোধ এসেছে। আজ কবি দেখছেন একটি সুন্দর বাদামী হরিণ যে ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল :

এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পরে হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

এই পটভূমির সোনালি প্রত্যাশা চূরমার হয়ে গেল পরবর্তী ঘটনায় :

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বললো আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এলো।
নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরোনো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক-হিম-নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

কাহিনীর অপ্রত্যাশিত মোচড়, রোমান্টিকতার আভাসের অকস্মাৎ বিপরীত পথ-অবলম্বন একটি নিষ্ঠুর শিকার-কাহিনীকে বহুগুণে অধিকতর নিষ্ঠুরতায় মণ্ডিত করেছে। জীবনের বিকৃতি দেখেছেন করি দেখে দেখে একটি সুর, একটি বাচনভঙ্গি এসে গেছে তাঁর কবিতায় যা আগেকার রচনায় ছিল না। এ-সুর, এ-ভঙ্গি ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ নৈতিক বর্জনের। এই সুর পুনরাবৃত্ত হচ্ছে জীবনানন্দের কাব্যে এখন থেকে, অর্থাৎ "মহাপৃথিবী"র কাল থেকে। ব্যঙ্গমাত্রেই বোঝায় নৈতিক অসমর্থন। জীবনানন্দর বেলায় এই অসমর্থন নৈতিক চিন্তার অনেক উর্ধ্বে চলে গেছে। তাঁর জীবনদর্শনের গভীর অস্তিবাদ ও সমকালীন বিশ্বের সার্বিক আচরণ, এই দুয়ে লেগেছে কঠিন সংগ্রাম। ব্যঙ্গের সাক্ষাৎ পাই এই পর্যায়ের কবিতার পরে কবিতায়, সুবিনয় মুস্তফীর আশ্চর্যশক্তি বেড়াল ও বেড়ালের-মুখে-ধরা ইঁদুরকে এক সঙ্গে হাসাবার; অন্য এক নাগরিক যার নাম অনুপম ত্রিবেদী তার দুদিকের কান বেশি জোরে টেনেছিল জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক মিলে। আর কে একজন

বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ; দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি।

কবি দেখছেন :

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই;

এবং এরকম দেখছেন বলেই মর্মাহত নিরাশামগ্ন উক্তি করছেন;

অনেক রক্তের ধ্বকে অন্ধ হয়ে তারপর জীব
এইখানে তবুও পায়নি কোনো ত্রাণ;
বৈশাখের মাঠের ফাটলে
এখানে পৃথিবী অসমান।
আর-কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।

শেষ ছত্রটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এই অতল নিরাশার চরমতম নিষ্ঠুর প্রকাশ হয়েছে চারটি ছত্রে :

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

চার

জীবনানন্দ-কাব্যের তৃতীয় পল্লব (যে পল্লব স্বতন্ত্র এককভাবে তাঁর রচনায় বিরাজ করে, আবার কখনো কখনো অন্য একটি এমনকি দুটি পল্লবের সঙ্গে সহাবস্থানও করতে পারে) বিকশিত হতে থাকল বিশ্বমহাসমরকালে রচিত কবিতাগুলিতে। এই মহাসমরকালে পৃথিবীর বহু ভাষায় এবং আমাদের বাংলা ভাষায় সমরক্ষুব্ধ নতুন কাব্যসুর কিছু এসেছিল অবধারিত রূপেই। সে-সুর শুনতে পাওয়া যায় সে-যুগের বহু সুসংবেদী কবিতায়, তার দু-চারটি উল্লেখ করছি।

কেবল ভাঙার শব্দ দিগ্‌বিদিকে। বিশ্বাসপ্রাকার পড়ছে। ভয়।
মস্ত একটা বনস্পতি টুকরো হয়ে টুকরো-টুকরো হয়ে মূলসুদ্ধ
উপড়ে ছায়া ডাল পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছত্রখান। ধুলো উড়ছে
ধোঁয়া উঠছে বোধবুদ্ধিহৃদয়মনীষা উপচে ভয় ভয়ঙ্কর
ধুলো উড়ছে। না, আর আশ্রয় নেই।

(মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, "এখন ভাঙন")

কে মুখোস, কে মুখ, এখন
স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। কঠিন অসুখ
সেরে গেলে যে রকম অসহায়;
মাথার ভিতরে শুধু স্মৃতি ঘোরে; শিয়রে, পায়ের কাছে
ইচ্ছেগুলি সাপের চুমার মত অন্ধকার; আর
ঘুমের ভিতর স্বপ্নগুলি
পারে না নিশ্বাস নিতে।

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "কে মুখোস, কে মুখ এখন")

তোমার বিষাণ বজ্রে বাজে!
নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত দুর্ভিক্ষের ধূপে,
কৃষ্ণবর্ণ, লোলজিহ্বা, করালবদন!
পদপ্রান্তে নিরুদ্দেশ ধান আর গম
আর পুঞ্জীভূত পুরুষের প্রাণহীন দেহ,
ছিন্ন শিশুর রক্তজবা!
ঘূর্ণীঝড়ে, বন্যায়, বিস্ফোরকে জয়বাদ্য বাজে।
তোমার দুর্দান্ত আমলে
নরহন্তা বিদেশী রাজ, রক্তজোঁক স্বদেশী বণিক, সর্পিল পঞ্চমবাহিনী

জীবন সঙ্কীর্ণ করে; শহরে, বন্দরে, গ্রামে
প্রাচীন সভ্যতা ধোঁকে ঘেয়ো কুকুরের মতো।

(সমর সেন, 'ক্রান্তি')

বিড়ম্বিত জীবনে আবার
কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে।
পালাবার নেই কোন খিড়কির দুয়ার।
সম্মুখে প্রতীক্ষমাণ সবুজ প্রান্তরে।
শায়িত বল্লম;

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'ঘোষণা')

এই সর্বব্যাপী বিপর্যয়ের গ্লানি দেখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ, চারিদিকের এই ভাঙার গান শুনেছিলেন। "সাতটি তারার তিমির" এই গ্লানিবোধের সমাবেশ। এ-গ্রন্থে জীবনের, জগতের যে অবমানবিক নীচতা বর্ণিত হয়েছে বাংলা কাব্যে তার তুলনা নেই। কবি বলছেন,

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই *('ক্ষেতে প্রান্তরে')*
সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।

(বিভিন্ন কোরাস)

অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে?
রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়? *(বিভিন্ন কোরাস)*

কিন্তু এই গ্রন্থেই, "সাতটি তারার তিমির" গ্রন্থেই, গ্লানিবোধের পাশাপাশি পাই আশাবাদ, নৈতিবাচক ও অস্তিবাচক প্রত্যয় দাঁড়ায় একসঙ্গে। জীবনানন্দের কাব্যে একপল্লবী প্রত্যয় অন্যপল্লবী প্রত্যয়ের সঙ্গে সমাবিষ্ট হয়েছে।

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই
আমরা তো তিমির-বিনাশী। *('তিমিরহননের গান')*
তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের
বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে; তৃতীয় চতুর্থ—আরো সব
আন্তর্জাতিক গড়ে ভেঙে গড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত
জাতক মানব।

('সৌরকরোজ্জ্বল')

এই "সাতটি তারার তিমির" গ্রন্থে, আমার সংবেদনায়, সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাটি—'সময়ের কাছে' আমাদের দিয়েছে কবির অস্তিপ্রত্যয়ের সমাপ্তিবিজয়, এই অস্তিপ্রত্যয় বলিষ্ঠতর হয়েছে বহু আঘাতের, বহু ব্যর্থতার, বহু ক্ষোভের চেয়ে এবং এই সমাপ্তিবিজয়ের জন্যই জীবনানন্দ দাশের কাব্যভাবনার চতুর্থ পল্লব, 'অস্তিপ্রত্যয়', তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনের পরম সার্থকতার প্রমাণ। কবি বলছেন এই কবিতায়, আজকের অন্ধকার সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে আসছে যেন শাদা পাখি উচ্ছল প্রাণশিখা নিয়ে, সেই আলোকের পাখির জয়গান তিনি গাইছেন, "জয়, তার জয়, যুগে যুগে তার জয়!" চল্লিশের দশকে কবি জীবনানন্দ সারা দেশে, সারা বিশ্বে, যে অবমানবিক বিকৃতি দেখেছিলেন—"রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষা, ভয়"—তারপরে তিনি যে বিশ্বাস ও শুভ্রতার অভিমুখী হচ্ছিলেন তাঁর কবিব্যক্তিত্বের চতুর্থ পল্লবে ও পর্যায়ে (সে-পর্যায় তাঁর অকাল আকস্মিক মৃত্যুর জন্য চরম পর্যায় হয়ে রইল, তারপরেও তাঁর কাব্যের আরো অগ্রসর হওয়ার শক্তির ধূসর ছায়া দেখা যায় বলে আমার মনে হয়), সেই বিকৃতি-চেতনার উর্ধ্বে যে তাঁর মহৎ সৃজনী কল্পনা যেতে পেরেছিল, এই সম্ভাবনার চিন্তায় আমার পাঠকচিত্ত আন্দোলিত হয়। সেই সম্ভাবনার সর্বোজ্জ্বল প্রমাণ আমি পাই "মহাত্মা গান্ধী"—শীর্ষক কবিতায়, যে-কবিতার উল্লেখ করা হয়েছে এই প্রবন্ধের এ কবারে শুরুতে। এই কবিতায় তিনি "অনিমেষ আলোর বলয়" দেখতে পেয়েছিলেন। এই "অনিমেষ" শব্দটি আমার চিন্তায় অনবশেষ মূল্যবান মনে হয়, কেননা এ-আলোক কখনো স্তিমিত হবে না, এক নিমেষের জন্যও হবে না, এ-আলোক শাশ্বত আলোক। জীবনানন্দ অটল অস্তিপ্রত্যয়ে পৌঁছেছেন তাঁর কাব্যের ও চিন্তার চূড়ান্ত স্তবকে, পৌঁছেছেন বহু বেদনা, গ্লানি, ধ্বংস, ভয়, বহু সংশয়ের অবশেষে। জীবনানন্দে বিন্দুমাত্র facile optimism নেই।

জীবনানন্দ দাশ : একটি ভূমিকা

আবদুল হাফিজ

যেহেতু জীবনানন্দ দাশ সামসময়িক কবি ও আধুনিক, যাঁর ভেতরে সমকাল অন্তঃশীলা নদীর মত লীন হয়ে আছে, অথচ বিশ্বজনীনতা, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে যাঁর কাব্যে প্রাচীন ও প্রদীপ্ত; যাঁর কাব্যে স্বদেশ ও বিদেশ অর্থাৎ ভারতীয়, সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ড, ব্রিটন দ্বীপ এমনকি মার্কিন মহাদেশীয় হাওয়া ও আবহাওয়া সচেতনভাবে জড়িয়ে আছে, যে কবি কাব্যের কলা বা শিল্প সম্বন্ধে আধুনিকতমদের মধ্যে আশ্চর্য সাবধানী এক অভিজ্ঞতা রেখে গিয়েছেন, তাঁর আলোচনা এসব কারণে ও অন্যবিধ কারণেও খুবই জটিল।

আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার জন্যে পাঠকেরা বিরক্তিকর সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। অথচ জিজ্ঞাসু ও সচেতন অনুশীলন নেই বলে এবং যেহেতু আধুনিক কবিরা প্রাচীন এবং চলতি ছন্দে অর্থাৎ পয়ার ও মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের পথ ছেড়ে মিশ্র ছন্দে লেখেন, এবং আরো যেহেতু এসব কবিরা সাধু ভাষা কিংবা চলতি ভাষায় নয়, এবং এক 'আড়ালের ভাষায়, কাকলি কূজনের ভাষায় অথবা কোনো এক প্রেমিক যুগলের ঘনিষ্ঠ ভাষায় কথা বলেন, সেজন্যে আধুনিক দুর্বোধ্যতা ছাড়া আর কিছু নয়॥ সাহিত্যের ইতিহাসে মাঝে মাঝে আন্দোলন ও মতবাদ আলোড়নের ঝড় তোলে আর কবিতা যদি এ ধরনের আন্দোলনজাত ও মতবাদগত হয়, তাহলে অ-পড় য়া পাঠকের করুণ অস্বস্তি আসবে এবং তার বিবর্ণ চিন্তাধারা আর একবার আহত হতে বাধ্য। আধুনিক কবি কবিতায় form নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালোবাসেন বলে, এবং বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে স্বকীয়তার পক্ষাপাতী বলে রাজনীতি থেকে যৌনবোধ তাঁদের কবিতায় উপস্থিত থাকে এবং যেহেতু পুরনো জং-ধরা নীতিবোধ আমাদের আছে, আমরা তাই বারংবার কামানের গুলির শব্দে অস্থির হই। জীবনানন্দের কবিতায় আধুনিকতার সমস্ত দিক পরিস্ফুট, যেমন (ক) তাঁর জীবন দর্শনে; (খ) তাঁর বিশুদ্ধচেতনার কবিতায়; (গ) প্রকৃতির রূপায়নে; (ঘ) তাঁর ইতিহাস চেতনা ও ঐতিহ্যবাদে; (ঙ) তাঁর প্রতীক কবিতায়। অবশ্য এভাবে তাঁকে ভাগ করা যায় না কেননা তাঁকে ঘিরে আছে এক অখণ্ড অবিভাজ্য পরিমণ্ডল। তাঁর জীবন-দর্শন, প্রতীক, ইতিহাস চেতনা ও ঐতিহ্যবাদ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তার কবিতায়—শুধু কাজ করবার সুবিধে বলে এভাবে ভাগ করা হোল।

জীবনানন্দের কাব্যসাধনায় তাঁর জীবনাদর্শ মৌলিক উপাদান হিসেবে দেখা যায়নি, তবুও নানা কবিতায় তাঁর জীবনদর্শন বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। কোথাও স্পষ্ট,

কোথাও আবছায়া। এসব বিভিন্ন কবিতা বা অংশ থেকে একটি সম্পূর্ণ দর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মনে হয় তাঁর মধ্যে ভাববাদী দর্শনের প্রভাব আবছা হলেও আছে এবং ফল্গুধারার মত তাঁর কবিতার অন্তঃসার। যতটুকু জানা যায় জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের চার-দিকেও বৈরাগ্যের এক প্রতিভা সর্বদা বিরাজ করতো। কিন্তু তিনি কীটসের মতো তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় বিলাসীও, তাঁর এ বিলাস তাঁর কবিতায় প্রকট হয়ে আছে। শব্দরূপরসগন্ধস্পর্শ তাঁর কবিতার অবয়বে আভাবিজড়িত হয়ে রয়েছে। তাহলে আবার মনে হতে পারে, বৈরাগ্যের সাথে এ ভোগতৃষ্ণাটি থাকে কি করে? তাহলে বলা যায় যে তিনি ভারতীয় বেদান্ত-দর্শন কিংবা তান্ত্রিক মতে আস্থাশীল নন, অথবা এলিয়টের মত ধর্মের দুর্গম দুর্গে তিনি আশ্রয় নেননি বরং তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্রস্তুতির অবস্থায় রাখতেন, কোনো মুহূর্তে যেন বাদ না পড়ে। দিন রাতের মুহূর্তগুলো বিচিত্রবর্ণা গন্ধস্বাদবিজড়িত শাড়ির মোড়কে দেখা দিয়েছে তাঁর। মহাকাল যেন তার পুষ্পবাসর। তাঁর ভোগের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড বেগ, তার প্রকাশ আবেগময়। তবু এ ভোগের মধ্যে এক সুনীতি ও সুমিতি তাঁকে সর্বক্ষণ আঁকড়ে থেকেছে। এতে উচ্ছলতা নেই, আছে পরিমিতির পবিত্রতা। বলা যায় তাঁর আদর্শের জন্মভূমি ভাববাদ কিন্তু মর্ত্যপ্রীতি তাঁর অসীম কামনায় বিহ্বল। তাঁর সৌন্দর্য সাধনার মধ্যে তাঁর আদর্শের চরম বিকাশ। এ সাধনা প্রায় ধর্ম হিসেবে দেখা দিয়েছে।

অনেকে বলেন, তিনি নির্জনতম কবি, তাঁর কবিতায় যেন যুগ ও জীবনসম্পর্কে এক শীতল অচেতনতা আছে। অথচ প্রগতি ও জীবনের প্রতি এক দুর্নিবার ভালোবাসা আছে বলেই, এই যন্ত্রযুগের দৈন্যকে তিনি বর্শা-তীক্ষ্ণ কবিতায় আঘাত করেছেন এবং আরো বর্তমান ক্লেদভরা সামাজিক অচলায়তন থেকে জীবনের মুক্তিতে তাঁর গভীর আস্থা আছে বলেই তাঁর কবিতায় অশ্রুর লবণাক্ত স্বাদ বারবার অনুভব করি। আর এই একটি ক্ষেত্রে এলিয়টের বিশ্বাসের অংশীদার না হলেও এলিয়টের এ যুগ-সম্বন্ধে যে অশ্রুসিক্ত অভিজ্ঞতা তার সন্ধান পাই, সন্ধান পাই যে, এক নিবিড় ট্রাজেডি, জীবনানন্দের কাব্যে প্রতিমার রূপ পেয়েছে। তাঁর জীবনাদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা যায় ধর্ম নয়, কোনো বিশেষ মতবাদ নয়, রোমান্টিকতা রঞ্জিত এক মানবিকতাই তাঁর প্রার্থনা। তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে গোধূলিলগ্নে কোনো এক 'শুভ্র মানবিকতার ভোরের' উদ্দেশ্যে। কবির 'স্বপ্নের হাতে' ও 'বোধে' কবিতায় তাঁর আদর্শের পরিচয় রয়েছে—

'পৃথিবীর বাধা এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে, স্বপ্নের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই'

অথবা

'সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিতো যদি এই স্বপ্নের হাতে

পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর—'

অন্যত্র সকলকে ডাক দিয়েছেন তাঁর বিশ্বাসের অংশীদার হবার জন্য

তোমরা চলিয়া এসো—
তোমরা চলিয়া এসো সব।
ভুলে যাও পৃথিবীর ওই ব্যথা—ব্যাঘাত—বাস্তব?

এগুলোতে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিশ্চিত প্রমাণ না পেলেও আভাস পাই। জীবনানন্দের কতকগুলি কবিতায় বিশুদ্ধ চেতনাই প্রধান অর্থাৎ এগুলোতে ইতিহাস চেতনা বা প্রতীক নেই। এদের মধ্যে 'বোধ', 'স্বপ্নের হাতে', 'অবসরের গান', 'ঘাস' ও 'মৃত্যুর আগে' কবিতাগুলি বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে। 'অবসরের গানে' অলসতার মাধুর্য, 'ঘাস' কবিতায় প্রাণচেতনার সাথে একাত্মতা বোধ, 'বোধ' কবিতায় বিচিত্র মুহূর্ত ও বিভিন্ন পার্থিব বস্তু সম্পর্কে ক্ষণিক চেতনা, 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় মানবজীবনের সাধ সম্বন্ধে কবি আবেগকে প্রকাশ করেছেন।

'বোধ' কবিতায় তিনি বস্তুভার পীড়িত বিশ্বের হাত থেকে মুক্তি কামনা করেন :

একদিন
এই সব সাধ
জানিয়াছি একদিন—অবাধ—অগাধ।
চলে গেছি ইহাদের ছেড়ে;
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

অন্যত্র তিনি জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন,

সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা একা কথা কয়;
অবসাদ নেই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে নাকি?

ইংরেজ কবি টেনিসন তাঁর বিখ্যাত কবিতা Lotus Eater-তে ইংরেজি স্বর বর্ণের অপরূপ ব্যবহার করে আলস্য ও ঘুমের আবেশ এনেছিলেন, জীবনানন্দ 'অবসরের গান' কবিতায় বাংলা বর্ণের সার্থক ব্যবহার করে ঐ ফল উৎপন্ন করতে পেরেছিলেন।—

'হাতে হাত ধরে-ধরে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে
কার্তিকের মিঠে রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে,

এখানে একটি নাচের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুটি পংক্তিতে 'র' বর্ণ এমন এক অনুপ্রাসে পরিণত হয়েছে যার উদাহরণ অন্যত্র বেশি নেই। বাংলা স্বরবর্ণের দীর্ঘীকরণ এখানে আশ্চর্য ফসল দিয়েছে। 'র' তরল ধ্বনি যেহেতু সেহেতু দীর্ঘস্থায়ী এক

কম্পন সৃষ্টি করেছে। ১৩ বার 'এ' এবং 'ত' বর্ণটি ৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে! জীবনানন্দের ধ্বনি সচেতনতার জন্মভূমি তাঁর উর্বর হৃদয়ের পলিমাটি। Pope বলেছিলেন, 'The Sound must seem an echo to the sense'. তার যাথার্থ্য রয়েছে এখানে।

'ঘাস' কবিতায় বিশ্বময় যে প্রাণ বিস্তৃত কবিপ্রাণ তার সাথে মিলনের জন্য আগ্রহী,

এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘসি;
ঘাসের পাখনায় আমার পালক
ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাসমাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

মনে হয় স্বল্প পরিসরে রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মর্তের সঙ্গে একাত্মতার ব্যাকুলতাটি কখনো এতো আকুল হয়ে দেখা দেয়নি।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আধুনিকদের মধ্যে এতবড় প্রকৃতি-সচেতন কবি আর নেই! কবির কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাঙলা'ই কবির প্রকৃতি চেতনার বড় প্রমাণ। 'মৃত্যুর আগে' ও 'অবসরের গানে' প্রকৃতি-চেতনা প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াসার;

অথবা

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলের জানলায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড় য়ের ডিম যেন নীল হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে।

অবসরের গানে তিনি গাঁয়ের কথা স্মরণ করেছেন,

চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি
ধান-ভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।

বাংলাদেশের প্রকৃতি ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি কখনো পটভূমি, কখনো নায়িকা।

জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রে কালচেতনার প্রয়োগ খুব বেশি দিনের নয়। বদলেয়ার, এলিয়ট ও পাউন্ডের সাথে যোগাযোগের ফলে এর উৎপত্তি। 'ব্যক্তি আমি'র আয়ু খুব বেশি নয়। 'কিন্তু মানবীয় অস্তিত্ব তো একদিনের ব্যাপার নয়। কাল ব্যক্তির জীবনে স্বল্প কিন্তু মানবীয় সমষ্টিজীবনের ধারা অবিচ্ছিন্ন। কাল সেখানে পরাস্ত। তাই কবি বলেন :

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

কবি আরো বলেন :

নাহলে এছাড়া
কোথাও অন্য কোনো প্রীতি নেই।

জীবনানন্দ দাশ অতীতের দীর্ঘ কুয়াশাময় সড়কে আপন অস্তিত্বকে সম্প্রসারিত করেছেন। আর স্নাত হয়েছেন আশীর্বাদে। মানব সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিলো। তিনি এলিয়টের মত পৌরাণিকতাকে আধুনিকতার পাশে রেখে কবিতার আবেদনকে অযথা ভারাক্রান্ত করেননি, শুধু আপন অস্তিত্বকে অতীতের মানুষ-মানুষীদের অস্তিত্বের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন, আবার কখনো কোন সুদূর স্থানে নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন—প্রত্যক্ষকে প্রচ্ছন্নের সাথে, নিকটকে দূরের সাথে, বর্তমানকে অতীতের সাথে লীন করে দিতে চেয়েছেন; আর সৃষ্টি করেছেন পলিমাটি-ভরা এক উজ্জ্বল সংযোগভূমি। এর সাথে অন্য কোনো Abstract দার্শনিকতা নেই বলে আমরা তাঁর কাছে আরো ঋণী।

পথহাঁটা কবিতাটি ক্লান্ত, সে ক্লান্তির কোনো সীমা নেই : সেই একঘেয়ে ঘুম আর শান্তি, সেই নিবিড় নির্জনতা বহু পথ অতিক্রম করে বহু অস্তিত্বকে ক্লান্ত করে বেবিলন পার হয়ে কোলকাতা এসেছে একবার। কবি জানেন তাঁরই মত আরো কোনো মানুষ 'কি এক ইশারা' সামনে রেখে, কর্মব্যস্ত দিন শেষ হলে, রাত গভীরতর হলে, নির্জনতার স্বাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো।

'বেবিলনে একা-একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার
ব্যস্ত বছরের পর।'

'বনলতা সেন' বর্তমান ও অতীতের সমস্ত প্রিয়তমাদের মুখ। আবার, ইতিহাসচেতনা এর কেন্দ্রভূমিতে বিরাজ করছে বলে এর মাধুর্য আরো গভীর। এতে ব্যবহৃত নামগুলো কবির ঐতিহ্যবাদী মানসিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করেছে—তবে এ সত্ত্বেও নামগুলোর ব্যবহার আকস্মিক। পৃথিবীতে কতো প্রেমিক এসেছে আর ভালোবেসেছে। সিংহল সমুদ্রে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে অথবা বিদর্ভ নগরে। কবিতাটি সাময়িকতা কাটিয়ে বিশ্বজনীনতার অমৃত স্পর্শ লাভ করেছে।

'সব পাখি ঘরে আসে সব নদী
ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

বনলতা সেনরা মরে যায়, হারিয়ে যায়, ঝরে যায় তবু তার স্মৃতি থাকে—তাই নিয়ে জোনাকী-উজ্জ্বল সন্ধ্যার অন্ধকারে আলাপ জমে ওঠে হৃদয়ের তানপুরায়।

'সুরঞ্জনা' কবিতাটিতে সুরঞ্জনাও প্রেমেরই প্রতীক। সুরঞ্জনা পৃথিবীর বয়সিনী কোনো এক মেয়ের মতন। এক প্রেমিকের প্রেমিকাকে পৃথিবী হারিয়েছে আবার অন্যকে পেয়েছে—তাই নদী—প্রেমের নদী মহাকালের পথে প্রবাহিত হচ্ছে। অশোক ধর্মপ্রচারের

জন্য মহেন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো এক মানবীর প্রাণকে যে কখনো পেল না, তার অন্য কিছু হবে কি করে? কবি তাই বলেন—

'.........তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয়, শক্তি নয়; কর্মীদের
সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর মানুষের গভীর হৃদয়।'

কর্মীর কর্মাবেগ, ও সুধীজনের বৈদগ্ধ্যকেও ভালোবাসার বৃষ্টিতে স্নাত হতে হয় না, হলে আলোর সন্ধান কখনো পাওয়া যায় না। সুচেতনা তাই দেহ নিয়ে ভালোবেসেও ভোরের কল্লোল হয়ে রইলো। 'সবিতা' ও 'সুচেতনা' কবিতা দুটিতে 'সবিতা' ও 'সুচেতনা'ও গভীর প্রেমের প্রতীক। তবে কবি বর্তমানকালের প্রেমের সমালোচনা করে তার সঙ্গে অতীতকালের প্রেমের তুলনা করেছেন :

'এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে;
কি এক অপব্যয়ী ক্লান্ত আগুন!'

এ কবিতায় কবি ঐতিহাসিক প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বিরক্তির হিমকণা স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় এ কবিতায়। 'সুচেতনা'তে—

'আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মত
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু
দেখেছি আমার হাতে হয়তো নিহত
ভাইবোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন।'

কবি এখানে প্রাক্তন প্রেয়সীকে আহ্বান করে বর্তমান যুগের অসুস্থ প্রেমের কথা জানিয়েছেন। ব্যথা ম্লান কবিহৃদয়ের পরিচয় আছে এতে। কবি বলিষ্ঠ আশাও প্রকাশ করেছেন—কেননা এ অসুখ তো চিরকাল থাকবে না।

'সুচেতনা এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর—
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।'—ক্রমমুক্তি হবে;

'হাজার বছর শুধু খেলা করে', কবিতায় 'বনলতা সেন' প্রেমের প্রতীক হিসেবে আর একবার দেখা দিয়েছে। অবশ্য এর প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছে প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার স্থলখণ্ড—ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রীসের প্রাচীনতম অববাহিকা। 'হাওয়ায় রাত' কবিতাটিতে কবির ইতিহাস চেতনা একটি প্রগাঢ় অভিব্যক্তি লাভ করেছে। মানবজাতি ক্রমাবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে—কবি তাই অতীতের মধ্যেও বেঁচে আছেন। তিনি একজন যাত্রী—প্রাণের ধারাটি অলক্ষ্যে বয়ে চলে বটে—কিন্তু তার সাথে কবিজীবনও অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা।

তাই,

যে-নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর
আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য
মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে।

লাখো লাখো জীবিত মানুষ একদিন আজকের পরিচিত আকাশ দেখেছিল কিন্তু কবির অনুরাগী বিশ্বাসী চোখ অবশ্য সেসব মৃত আকাশকেও খুঁজে পেয়েছে। জীবনানন্দ দাসই প্রথম কবি যিনি 'ইতিহাস' কথাটার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এ কবিতায় তাই 'ইতিহাস চেতনা' কখনো 'প্রবল নীল অত্যাচার', কখনো 'বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধ', অথবা 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জন', কখনো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ 'উচ্ছ্বাস' বা 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা'। এ কবিতাতেও অতীকালের 'রূপসী'দের কবি স্মরণ করেছেন :—

যে রূপসীদের আমি এশিয়ায় মিশরে, বিদিশায়
মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানায় কুয়াশায়-কুয়াশায়
দীর্ঘ বর্ষা হাতে করে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন।'

কবির অর্ধেকের বেশি কবিতা প্রতীক ধর্মী। প্রতীকবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন কতখানি সুস্থতা নিয়ে এসেছে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক চলছে। যদিও আজ প্রতীকবাদী সাহিত্যের পরিমাণ কম নয় তবু প্রতীকবাদকে আজও অনেকেই স্বীকার করতে পারেনি। প্রতীকবাদ কখনো কখনো অবৈজ্ঞানিক 'গভীরতর অসুখ' হিসেবে দেখা দিতে পারে। প্রতীকবাদ যদি বিলাসী হয়ে ওঠে তাহলে তাকে অসুস্থ অবস্থাই বলা যেতে পারে। এ জন্যেই ফরাসি প্রতীক কবি মালার্মে, মার্কিন কবি এজরা পাউন্ড, রুশ কবি আলেকজান্ডার ব্লক আজও বৃহত্তম জনতার কাছে পৌছাতে পারেননি। তবুও উপযুক্ত প্রতিভার হাতে প্রতীক সার্থক হয়ে ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ইয়েটস ও এলিয়ট তার স্বাক্ষর।

জীবনানন্দ দাশের প্রতীকগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সেগুলো প্রগাঢ়ভাবে ব্যক্তিগত আর তা নানা স্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ একটি ভাব বা ভাবনা বা আবেগের জন্য কবি অনেকগুলো প্রতীক ব্যবহার করেছেন—সে জন্যে কবির প্রতীকগুলোর সঠিক অর্থ উদ্ধার সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ জলসিঁড়ি বা ধানসিঁড়ি প্রতীক দুটি স্মৃতির প্রতীক। কবি যেন সচেতনভাবেই একই বস্তুর জন্য বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করেছেন। অরুণিমা স্যান্যাল, বনলতা সেন, সবিতা—এঁরা সবাই প্রিয়তমাদের প্রতীক, অথচ একটি স্থির প্রতীক ব্যবহার করলেই ভালো হতো মনে হয়। কিন্তু র‍্যাঁবোর মতো জীবনানন্দ প্রতিভাও সর্বদা কি এক ঘর্মসিক্ত জ্বরে ভুগতো বলে মনে হয়। তিনি

যেখানে নারীকে প্রতীক করেছেন, সেগুলো সবই প্রেমের, আর সে জন্যই সেগুলো স্নিগ্ধতা এনেছে কবিতায়। কিন্তু যেখানে জন্তু-জানোয়ার বা পাখিকে প্রতীক হিসেবে নিয়েছেন তখন সেগুলো বিশেষ অর্থ বহন করে। যেমন 'হায় চিল' কবিতায় 'চিল' কল্পনার প্রতীক। পাখি হিসেবে চিল প্রিয় এবং সুন্দর না হলেও কবি খুঁজে পেয়েছিলেন যে 'চিল' আকাশের নীলিমার কাছে না হোক তার কাছাকাছি যেতে পারে এবং বহু দূরস্থিত যে কোনো শিকারকে সে দেখতে পায়। কল্পনারও পাখা আছে আর অনায়াসে তা হৃদয়ের অন্ধকার গুহায় যেতে-আসতে পারে। 'বিড়াল' কবিতায় 'বিড়াল' এবং 'পেঁচা' কবিতায় 'পেঁচা' সময়ের প্রতীক। এখানে বিড়াল ও পেঁচার রহস্যময় আচরণের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে বলেই জানি মহাকালও কম রহস্যময়ী নয়।

পেঁচা প্রতীক হিসেবে দেখা গেছে তার বিভিন্ন কবিতায়। কবির অধিকাংশ প্রতীকগুলো তাঁর আবিষ্কার—কিন্তু কতকগুলো প্রতীক বহু ব্যবহৃত এবং এগুলোর অধিকাংশ ইংরেজি সাহিত্য থেকে নেয়া হয়েছে। যেমন 'শিকার' কবিতায় হরিণ শুভ্র মানবিকতার প্রতীক (ব্লেকের Sheep-এর সাথে তুলনীয়) 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় 'হাত' বিশেষ করে 'নগ্ন হাত' প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত। পাখির প্রতীকও পুরোনো, ইয়েটস তাঁর কবিতায় পাখিকে বহুবার ব্যবহার করেছেন, প্রতীক হিসেবে। কবির 'সিন্ধু সারস' কবিতায় 'সারস' ও 'বুনোহাঁস' কবিতায় 'হাঁস' কল্পনার প্রতীক—শেলীর Skylark-কে স্মরণ থাকলে 'সিন্ধু সারস'কে চিনতে কষ্ট হয় না। হাঁসও তো নতুন নয়। 'শকুন' কবিতায় 'শকুন' যুদ্ধ ও ধ্বংসের প্রতীক—এর সাথে অমঙ্গল, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কথাটাও আমাদের অজানা নয়। 'ব্যাং'কে কবি গলিত পূতিগন্ধময় জীবনের প্রতীক করেছেন—'as ugly as toad' এই অর্থে প্রতীকটি ইংরেজি থেকে নেয়া। অতিবাস্তববাদের প্রভাব জীবনানন্দের উপর খুব বেশি নয়। কবির গুটিকয়েক কবিতায় সুররিয়ালিজম স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। সুররিয়ালিজমের জনক হলেন আঁদ্রে ব্রেঁত। এ আন্দোলনের (বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়া থেকে যে আন্দোলনের সূত্রপাত) আর একজন বিপ্লবী নেতা ফরাসি শিল্পী দাদা (Dada)। সুররিয়ালিজমের উৎসভূমি ফ্রয়েড মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা। দাদা কিন্তু অবচেতন মনের ক্রিয়াবলীকে নৈরাজ্যবাদীদের মত ব্যাখ্যা করলেন। তিনি সর্ববিধ মানবিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন জেহাদ—সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, নীতি বা দর্শন কোনো কিছুই তার আক্রমণ থেকে বাদ পড়লো না। তাঁর মনে হয়েছিলো জীবন যেন মায়াজাল, কুহেলিকা, রহস্যময় আর বিরক্তিকর। দাদা আত্মহত্যা ছাড়া বাঁচবার কোনো পথ খুঁজে পেলেন না। এই উন্মত্ত হতাশাই তখনকার জীবনদর্শন। কিন্তু এই বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদ যে একটি নৃশংস অত্যাচার তা দাদার অনুসারীরা বুঝতে পারলেন এবং শেষ পর্যন্ত দাদাবাদী আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এলেন। এঁরা যে নতুন সনদ (১৯২৪—প্যারীতে) ঘোষণা করলেন (আঁদ্রে ব্রেঁত তাঁর Manifesto du Surreaalisme প্রকাশ করেন) তাই সুররিয়লিজম নামে পরিচিত। Psychic Automation স্বয়ংক্রিয় অবচেতন মনের ক্রিয়াকে (Actions Performed Unconsciously) বাংলায় বাস্তববাদের বাস্তববাদ বা অতি বাস্তববাদ বলে অভিহিত করা হয়।

সুররিয়ালিজম এক নব ধর্ম যেন। এ নতুন মতবাদ শিল্পের জগতে একটি বিপ্লব। এ বিপ্লব শেখাল বিশ্বাসীর কাছে সব সম্ভব। ওঁরা ঘোষণা করলেন তর্কশাস্ত্র মিথ্যা এবং যাকে আমরা Intelligence বলি তাও মিথ্যা। কবিতা হলো অবচেতন মনের অবিরাম ক্রিয়ার ফল—a perpetual flow of irrational thoughts in the form of images এসব কবিরা দাবি করলেন যে তাঁরা আমাদেরকে আমাদের মনের সুপ্ত দিকের নগ্নচিত্র উপহার দিলেন। লিখিত শব্দের মাধ্যমে আমাদের মনের 'hidden nakedness' কবিতায় একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুবাদে (Visual Reproduction) সার্থক হলো। কাজেই এসব কবিরা কখনো শুধু image বা Fantasy নির্মাণ করে চললেন অথবা মনের ফিল্মে যতকিছু ছায়াপাত ঘটালো তার একটা গাণিতিক হিসাব দাখিল করে ক্ষান্ত হলেন। কবিতার প্রকার ভেদে এদের আস্থা নেই। কিন্তু মনের অবচেতনের বিষয়বস্তুই কি কবিতার বিষয়বস্তু না একটি নির্বাচন, পর্যবেক্ষণ, যোগ-বিয়োগের প্রয়োজন হবে? সমস্ত সুররিয়ালিস্ট শিল্পীকেই এই দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্যক্তি মাত্রই নিজ মনের অবচেতনের ভাব জানতে পারেন। কারণ এখানে একই ব্যক্তি Subject এবং Object—আর তা ছাড়াও মানবীয় অস্তিত্ব কি শুধুই অবচেতন মনের সমষ্টি? আমাদের সদা জাগ্রতমন (চেতন মন) যদি সর্বদা প্রস্তুতির পথে থাকে তাহলে অবচেতন মনের কিছু কিছু প্রধান ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করলেও করতে পারে। কিন্তু ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে তো যে কোনো সাধারণ ও তাৎপর্যবিহীন ঘটনা মানবজীবনে অবহেলার ব্যাপার হতে পারে না। এখানেই সুররিয়ালিজমের ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব বর্তমান। জীবনানন্দ দাসের 'সৃষ্টির তীরে' কবিতাটিতে সুররিয়ালিজম স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

> 'বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে নিভে যায়—তবু
> ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে :
> হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে;
> সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের লাশগুলো একবার সৈনিক হয়েছে;
> সচ্ছল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর,
> বিলোচন গিয়েছিলো বিবাহ ব্যাপারে,
> প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার দ্বারে;
> সভাকবি দিয়ে গেছে বাকবিভূতিকে গালাগাল।
> সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি হুঙ্কার তুলে বিস্মৃতির
> দিকে উড়ে যায়।"

উদ্ধৃতিটিতে মোট সাতটি চিন্তাধারাকে স্থান দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই। কবির অবচেতন মনের পর্দায় এগুলো যে মুহূর্তে ভেসে উঠেছিল কবি তখন সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন। পরে সেগুলোকে লিখিত শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ কবি কোনো এক বিকেলে যখন সূর্যের আলো ক্রমাগত নিস্তেজ হয়ে আসে—সে সময় নিজের মনের আরশিতে যা দেখলেন—তাই লিখে রাখলেন। ঐ

সময়ের মধ্যেই ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে। কবি কবিতাতে একে একে তা লিপিবদ্ধ করলেন। তবে অবচেতন মনের নদীতে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসেছে—চিন্তার ঢেউ, ভুলে যাওয়া অতীত ঘটনার ঢেউ, কোনো বইতে পড়া বিশেষ চরিত্র বা বাক্যের, শোনা কোনো কাহিনীর, দেখা কোনো দৃশ্যের—তাই কবিতাটি শেষ হয়েও হয়নি। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন নেই। অবচেতন মনের Stream of thoughts এর সূক্ষ্ম হিসেবে সম্ভবপর নয়—তাই মালার্মের মতো দাঁড়ি-কমার ব্যবহার কবির দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত পংক্তিগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছাড়া অন্যগুলোর অর্থ উদ্ধার অসম্ভব বলে মনে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তির কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না—এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে কবি বইয়ে পড়া কোনো বিশেষ ঘটনার একটি ছিন্ন অংশ এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন অথবা এগুলো স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রে মুদ্রিত ঘটনাবলী জটিল আকারে প্রকাশিত। চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিতে বিয়ের ঘটনা এবং গণিকালয়ে প্রেমিক পুরুষদের যাওয়ার কথা এবং ষষ্ঠ পংক্তিতে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী, নাটক কিংবা রামায়ণ-মহাভারতের কোনো ঘটনার উল্লেখ আছে। সপ্তম পংক্তিটি কবির অবচেতন মনের কোনো ভাব বহন করে না—এবং এরূপ রসিক ও কাব্যিক পংক্তির সংখ্যা খুব বেশি নেই। এই পংক্তির সাথে উপরের পংক্তিগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ এই পংক্তিটিই কবিমনের প্রচণ্ড ভাবাবেগকে বহন করছে।

'সমস্ত আচ্ছন্ন সুর' কথাটির অর্থ হোল কবি সারা জীবনব্যাপী যা শুনেছেন যা জেনেছেন—কিন্তু মনে নেই—মনে না থাকবারই কথা—কারও মনে থাকে না—কিন্তু বিশেষ একটি নির্জন মুহূর্তে প্রত্যেক মানুষের কাছে গোটা অতীত কুয়াশাময় হলেও দেখা দেয়, আর ঐ আচ্ছন্ন সুর ক্রমাগত হৃদয়কে টেনে নিয়ে যায় বিস্মৃতির দেশে। তখন গ্রীষ্মের দুপুরে মৌমাছির সুর গুঞ্জনের মতো মনে হয় বিশেষ মৌমাছির সুর তখন আকৃষ্ট করে না। সব মিশিয়ে ঐ যে 'আচ্ছন্ন সুর' (Drowsy and Confusing melodies) তাই সত্য হয়ে ওঠে। পংক্তিটির দ্বিতীয় পদ সমষ্টি 'একটি হুঙ্কার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়' এর মধ্যেও গভীর সত্যবাণী নিহিত কেননা 'হুঙ্কার' মানে 'ওম' ধ্বনি—আর এই ধ্বনিটির অর্থও যেন রহস্যময়—আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করে যে আমরা যখন অতীতকে স্মরণ করি—তখনই ঐ 'আচ্ছন্ন সুর' আমাদেরকে পেয়ে বসে। এ প্রসঙ্গে কবির 'আমাকে তুমি' কবিতায়—

'এক একটা দুপুরে এক-একটা পরিপূর্ণ জীবন
অতিবাহিত হয়ে যায় যেন।'

এ কবিতাটি সম্পর্কে কবির চেতন-অবচেতন মনের দ্বন্দ্বের তর্ক না তুলেও একথা বলা যায়—কবির মৌলিক বক্তব্যটি সত্য। সুররিয়ালিজমকে কবিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন শুধু 'দুর্বোধ্য' বলে এগুলিকে অভিহিত করা যায় কি?

জীবনানন্দ পাঠের প্রাসঙ্গিকতা

মঞ্জুভাষ মিত্র

জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়েছিল সেই কবে ১৯৩৬ সালে, দুটি বিশ্বযুদ্ধ-মধ্যবর্তী বিপন্ন সময়ে। তাঁর বোধ, অবসরের গান, ক্যাম্পে, স্বপ্নের হাতে ইত্যাদি কবিতা পড়ে পাঠকেরা চমকে উঠেছিল। শাশ্বত মানবতার বাণীই শোনা যাচ্ছে কিন্তু নতুন ভাষায় নতুন সুরে। রবীন্দ্রচর্চিত বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করে এক নতুন কবিতার দিকে অভিযাত্রার ইঙ্গিত এখানে মিলল। আলো থেকে অন্ধকারে আসা, সুন্দরের পাশাপাশি কুৎসিতকে স্থাপন করে তার থেকে শিল্প নিংড়ে নেওয়া—এইসবে শুধু আধুনিকতার লক্ষণ নয় দেখা গেল কবিদৃষ্টির ব্যাপকতা।

মানুষ তার গগনবিহারী সত্তা নিয়ে আবিষ্ট হওয়ার পর জীবনানন্দে এসে তাঁর মৃত্তিকাছোঁয়া সত্তা ও আদিম শিকড় সম্বন্ধে সচেতন হল। 'বোধ' কবিতা পড়ে মানুষ জানল তার বুকের ভিতর বাসা বেঁধে আছে শিল্পের অসুখ, সে বুঝল স্থূল বস্তুজীবনে সব পাওয়ার পরও সে বিষণ্ন এবং অসুখী। গ্রাম থেকে নগরের দিকে পথ চলে গেছে এবং সেই পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের ভিতর বিপুল শূন্যতা নৈঃসঙ্গ অনুভব করে আত্মক্ষরণে দ্বন্দ্বে দ্বিধায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। এই হল মানুষের নিজস্ব নিয়তি :

আলো অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে
স্বপ্ন নয় শান্তি নয় ভালোবাসা নয়
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!

অথবা

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি শুধু হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
...　　...　　...
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি? তাহাদের মন
আমার মনের মত না কি?

তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী!

এই basic instinct বা আদি প্রবৃত্তির কণ্ঠস্বর, নিজের অস্তিত্বের টানাপোড়েনকে অনুভব করতে হলে বারবার জীবনানন্দ পড়তে হবে।

জীবনানন্দ শুধু নান্দনিক পৃথিবীর অধিবাসী ছিলেন না, এই বাস্তব পৃথিবীর উন্নয়ন এবং সমাজের কষ্টমুক্তি নিয়েও তিনি ঢের বেশি ভাবনাচিন্তা করে গেছেন। 'বেলা অবেলা কালবেলা' পড়লে বোঝা যায় সভ্যতার সঙ্কট সম্বন্ধে তিনি কত বেশি অবহিত ছিলেন। উদ্ধৃতি ব্যবহার করছি 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যের 'মৃত্যুস্বপ্ন সংকল্প' কবিতা থেকে। এখানে কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অমৃতের বিশ্ব বলেছেন।

'আমরা মানুষ ঢের ক্রূর অন্ধকূপ থেকে
অধিক আয়ত চোখে তবু ঐ অমৃতের
বিশ্বকে দেখেছি;

... ...

ফ্যাক্টরির সিটি এসে ডাকে যদি
ব্রেন কামানের শব্দ হয়,
লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী
অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভীড়
উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চলে যায়,
ওরা যদি কালোবাজারের মোহে মাতে,
নারীমূল্যে অন্ন বিক্রি করে
মানুষের দাম যদি জল হয় আহা

বলাবাহুল্য এখানে সভ্যতার সঙ্কট পরিপূর্ণভাবে উন্মোচিত। এই উন্মোচনে এবং সমাধান সন্ধানে জীবনানন্দ সম্ভবত এই মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ অথবা বৈষ্ণব পদাবলী, শেক্সপীয়ার অথবা গ্যয়েথে পড়বার পরও যে কারণে আমরা বোদলেয়ার অথবা এলিয়ট পড়ি সেই কারণেই জীবনানন্দ পড়ব : এইখানে মানুষের আত্মের বিচূর্ণ দর্পণ আছে এবং সেই আত্মপরিচয় জেনে নেওয়া আমাদের প্রয়োজন, জীবনানন্দ সমাজসচেতন বিবেকী কবি; পশুপাখি গাছপালার সংরক্ষণ চান, নারীকে দেখেছেন নীড়প্রতীকরূপে—এইসব মূল্যবান বিষয়গুলি সম্বন্ধে বহু স্বচ্ছ উক্তি ও ভাবনাচিন্তা তাঁর আছে এবং সেগুলির সঙ্গে সংস্রবও পাঠকের প্রাপ্তি, পূর্বোক্ত ওই বিচূর্ণ দর্পণকে আবিষ্কার করার পাশাপাশি।

মূল বক্তব্যকে এবার একটু বিশদ করছি। প্রত্যেক ভালো কবি তাঁর সমকাল সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন না; সমকালীন ঘটনাবলী সামাজিক বিস্ফোরণসমূহ তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়। আবার একই সঙ্গে তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে সাময়িকতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি মহাসময়ের সঙ্গে যুক্ত হন। তখন একই সঙ্গে তাঁর কাব্যশিল্প

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে প্রতীকিত করে। কবির নিজস্ব আত্ম অথবা একান্ত ব্যক্তিগতের সঙ্গে সমাজ মানসের ক্রমাগত আদান-প্রদান ঘটে চলে এবং এভাবেই নাক্ষত্রিক মহাকাশ ও মহাজাগতিক লোকের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় লিপ্ততা সম্ভব হয় বহির্মুখিতার প্রয়োজন হয় মানুষকে ভালো করে বুঝবার জন্য—এইসব শাণিত উজ্জ্বল কথাবার্তা জীবনানন্দ দাশ 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাতেই বলেছেন। 'উত্তরসাময়িকী' কবিতাটি থেকে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি :

> মানুষের কাছে মানুষের স্বাভাবিক
> দাবির আশ্চর্য বিশুদ্ধতা; যুগের নিকটে ঋণ মনবিনিময়
> এবং নতুন জননীতিকের কথা—আরো স্মরণীয় কাজ
> সকলের সুস্থতার—হৃদয়ের কিরণের দাবি করে আর অদূরের
> বিজ্ঞানের আলাদা সবুজ গভীরতা;—
>
> ... ...
>
> এইসব অনুভব করে নিয়ে সপ্রতিভ হতে হবে না কি।
> রাত্রির চলার পথে এক তিল অধিক নবীন
> সম্মুখীন—অবহিত আলোকবর্ষের নক্ষত্রেরা
> জেগে আছে। কথা ভেবে আমাদের বহিরাশ্রয়িতা
> মানব স্বভাবস্পর্শে আরো ঋত—অন্তর্ধান হওয়া।

বিংশ শতকে ঋত অথবা অন্তর্ধান হওয়ার জন্য মানুষ ও যুগের মধ্যে বিনিময় প্রয়োজন, বিজ্ঞানকেও জেনে নিতে হবে—এসব কথা জীবনানন্দ স্পষ্টতই উচ্চারণ করলেন এবং এই ভাবনাকে একালের প্রায় সব মানুষেরই মনের কথা ভেবে নিতে দোষ নেই। মানুষ যে মৃত্তিকারই সন্তান এই মহতী চিন্তাবীজ মানুষের প্রতি কবির দান—'তুমি কি প্রভাতে জাগ?/সন্ধ্যায় ফিরে যাও ঘরে?/আস্তীর্ণ শতাব্দী বহে যায়নি কি/তোমার মৃত্তিকাঘন মাথার উপরে? *(বিস্ময় : বেলা অবেলা কালবেলা)* এমত প্রশ্নের ভিতরেই উত্তর রয়ে গেছে।

পৃথিবীর আর সব সাধারণ মানুষের মতো কবিকেও নিরন্তর শুশ্রূষা খুঁজতে হয়; যেতে হয় নারীর কাছে, প্রকৃতির কাছে, বইপত্র অথবা কাজের বিন্যাসের ভিতর। প্রতিটি মানুষই নির্জন দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্নতা ও বিবিক্তির আঁধারে নির্বাপিত এই কথাটা শুধু ম্যাথু আর্নল্ডই বলেননি, জীবনানন্দও বলেছেন :

> শান্ত পরিচ্ছন্নতা এক এই পৃথিবীর প্রাণে
> সফল হতে গিয়েও তবু বিষণ্নতার মতো।
> যদিও পথ আছে—তবু কোলাহলের শূন্য আলিঙ্গনে
> নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে;
> প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো
> কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানবসাগরে।

(তোমাকে : বেলা অবেলা কালবেলা)

নিদানও তিনি দিয়েছেন, এই অসহায় অবস্থা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা তিনি করে গেছেন।

জীবনানন্দ ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সময়ের গভীর অসুখ তিনি দেখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় তিনি অসহায় সাক্ষী, মানুষের মৃত্যু ও গৃহ হারানোর দুঃখ তিনি দেখেছেন। আবার মনুষ্যসৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তর অথবা ১৯৪৬-এর জাতিদাঙ্গা ও দেশবিভাগের মতো ঘটনারও তিনি দর্শক। চেতনার ভারসাম্য হারানোর পক্ষে এসব ঘটনা যথেষ্ট। মৃত্যুর ও হত্যার বীভৎস অপউৎসবে কিভাবে মেতে উঠেছিল সভ্য পৃথিবী তার উদাহরণ সংকলন করা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস থেকে—হিটলার কর্তৃক ইহুদি নিধনের নিষ্ঠুর বিবরণী থেকে। ওই মারণযজ্ঞকে একটা প্রতীকী ঘটনা বলেই গ্রহণ করছি মানুষের মূল্যবোধের সর্বাত্মক বিনষ্টির একটা পরিপূর্ণ উদাহরণ এখানে। ইতিহাসের এক বিশ্বস্ত দলিল থেকে কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করছি। কুখ্যাত অসউইজ বন্দীশিবিরের চেয়ে কোনো অংশে কম কুৎসিত ছিল না বার্কেনাউ-এর (Birkenau) বন্দীশিবির। নাৎসিরা তাদের বিকৃত নিষ্ঠুর মানসিকতায় তাড়িত হয়ে এক চরম নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান এখানে করেছিল। রেলগাড়ি ভর্তি করে এখানে হাঙ্গেরি রুমানিয়া পোল্যান্ড থেকে শত শত অসহায় ইহুদি নরনারী শিশুকে নিয়ে আসা হত। নিদারুণ পথকষ্ট, দুর্গন্ধ বাতাস, দম বন্ধ হয়ে আসত। বার্কেনাউ-এ পৌঁছলে অন্য ছবি। তখন সৈন্যদের বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা, নেপথ্যে অর্কেস্ট্রা বাজছে। সবাইকে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বিশাল ভবনে। বলা হল তোমরা এখানে স্নান করে নাও, পথের ক্লান্তি অপনোদন কর।

পরবর্তী ঘটনা সরাসরি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি

"They were taken from station to some large rectangular buildings. White enamel signs were hanging on the doors : "Men's Bath-House", and "women's and children's Bath-House".

They went into a spacious hall—the left-luggage room' where they handed in their suitcases, bundles and rucksacks and were given neat metal discs. Next came the 'cloakroom' where they were again given a metal disc and a piece of soap, then the newcomers went into a special titted hall which was windowless, but well-lit and had rows of showers with hot and cold running water. Longing to be clean again, people began washing themselves and did not notice that the door behind them had not only closed but hermetically sealed. Then a greenish powder poured out of a hatch in the ceiling and a strong toxic smell quickly filled the room. At first they felt a tickling sensation in their throats and then an agonising pain which seem to rip their lungs apart. The victims who by now fully understood what was happening rushed towards the locked doors, and began pleading, shouting and pounding their fists on the thick concrete wall. But it was all in vain. Fifteen minutes later they were all writhing and

dying in agony unware that their sufferings were being watched through special peepholes". *(The 'Final Reckoning : Nuremberg Diaries; Boris Polevoi.)* ।

স্নানঘর ভেবে ইহুদিরা যেখানে ঢুকেছিল তা আসলে ছিল জঘন্য হত্যাশালা। তারা যখন স্নানে সদ্য ব্যস্ত তখন হঠাৎ ছাদের ঢাকনা খুলে গেল জায়গায় জায়গায়, উপর থেকে ঝুরে পড়ল সবজে রঙের পাউডারের মতো গুঁড়ো আর একটা কড়া ধাঁচের বিষাক্ত গন্ধে চারদিক ভরে উঠল। প্রথমে সবাই গলায় একটা জ্বালা অনুভব করল, তারপর হঠাৎ ভীষণ যন্ত্রণায় মনে হল তাদের ফুসফুস যেন ফেটে যাবে। তালাবদ্ধ দরজায় অসংখ্য মুষ্টাঘাত ব্যর্থ হল। পনের মিনিট পরে তারা সব মৃত্যুযাতনায় মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করছে আর উপরে লুকোনো ছেঁদা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখছে শতকের সবচেয়ে নারকীয় ঘাতকেরা।

জীবনানন্দের কবিতা, বিশেষত তাঁর-দ্বিতীয়-পর্যায়ের অথবা শেষদিকের কবিতা পড়লে দেখা যায় এই দুঃস্থ সময়ের নারকীয় নৃশংসতা তাঁর কবিসত্তাকে বিচলিত করেছিল এবং ভাবনার দিক থেকে নির্লিপ্ত অথবা গজদন্তের মিনারবাসী হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কিছুটা আত্মগত ভঙ্গিতে হলেও তাঁর কবিতায় জেগে উঠল প্রতিবাদের ভাষা। পরপর কিছু উদাহরণ সংকলন করছি :

কঠিন অমেয় দিন রাত এই সব।
চারদিকে থেকে থেকে মানব ও অমানবিকতা
সময়সীমার ঢেউয়ে অধোমুখ হয়ে
চেয়ে দেখে শুধু মরণের
কেমন অপরিমেয় ছটা।

(পৃথিবীর রৌদ্রে : বেলা অবেলা কালবেলা)

অথবা

তবু কোন পথ নেই এখনো অনেক দিন নেই।
একটি বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে নিভে গেছে প্রায়।
আমাদের আধো-চেনা কোনো-এক পুরোনো পৃথিবী
নেই আর। আমাদের মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবী আসেনিতো।
এই দুই দিগন্তের থেকে সময়ের
তাড়া খেয়ে পলাতক অনেক পুরুষ-নারী পথে

(উত্তর সাময়িকী : ঐ)

এবং

আমরা এসেছি আজ অনেক হিংসার খেলা অবসান করে;
অনেক দ্বেষের ক্লান্তি মৃত্যু দেখে গেছি।
আজো তবু
আজো ঢের গ্লানি-কলঙ্কিত হয়ে ভাবি;

(অন্ধকার থেকে : ঐ)

পুনশ্চ

চারদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে—মানুষের
হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে;
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা
করেই ক্ষমতাশালী দেখ;
কবেকার সরলতা আজ এই বেশি শীত
পৃথিবীতে শীত;
বিশ্বাসের পরম সাগররোল ঢের দূরে সরে
চলে গেছে;
... ...
আমরা অজ্ঞান নই—প্রতিদিনই শিখি, জানি,
নিঃশেষে প্রচার করি তবু
কেমন দুরপনেয় স্খলনের রক্তাক্তের
বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি।

(মহাত্মা গান্ধী : ঐ)

বোঝা যাচ্ছে দুঃস্বপ্নের সময়কে কবি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন এবং নিরাশা এবং ভুলের ভিতর থেকে আত্মরক্ষা করে মানুষ কবে আবার নতুন জন্ম পেতে পারে সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করছেন। নিখিল বিষ ধীরে ধীরে ক্ষয় করে মধুরের পুনরুত্থান হবে এ সম্বন্ধে জীবনানন্দ অবশ্যই দৃঢ় প্রতীতী যুক্ত ছিলেন। অন্ধকারের কঠিন দরজা খুলে আবার আলোয় যেতে হবে—একথা তিনি বলছেন *(যতিহীন : বেলা অবেলা কালবেলা)*; মানুষের বিবেক সফল হবে *(চারদিকে প্রকৃতির)*; শতাব্দীর রাক্ষুসী বেলায় আজ সব রাষ্ট্র বিমুখ সত্যভ্রষ্ট, তবু মানুষের কাছে মানুষের স্বাভাবিক দাবি সুস্থতার—এই দাবি ফুরোবে না *(উত্তর সাময়িকী)*; সফল মানুষ প্রেমে উৎসারিত হবে, নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে, 'আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে' (অন্ধকার থেকে)'—এমনি বহু বিকীর্ণ সত্য উজ্জ্বল মুক্তাবলীর মতো জীবনানন্দের কাব্যের তটভূমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

কবি নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন

যেতেছে নিঃশেষ হয়ে সব?
কী তবে থাকবে?

(যতদিন পৃথিবীতে : বেলা অবেলা কালবেলা)

উত্তরটাও নিজেই দিয়ে গেছেন একটা বিখ্যাত স্তবকে :

আমি তবু বলি :
এখন যে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর

নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহা-নীলাকাশ.
ভাবা যাক—ভাবা যাক
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি। *(হে হৃদয় : বেলা অবেলা কালবেলা)*

একেই বলা যায় জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনা—যার মূল কথা যুদ্ধ ধ্বংস মৃত্যুর থেকে মানুষ বারবার জেগে উঠবে; সে আছে, সে ছিল, সে থাকবে। মানুষের আবহমান জীবনধারাই এই সত্যকে সপ্রমাণ করেছে এখনকার বিদীর্ণ সময়ে যখন ধর্মের নামে মানুষ নৃশংসতায় মেতে উঠছে, জাতিদাঙ্গা, ভৌগোলিক সীমা নিয়ে চারদিকে সংঘাত কলরোল, ঘৃণা-সন্দেহ-সংশয়ের বিষ উপছে উঠচে তখন মনে হয় বারবার জীবনানন্দ পড়তে হবে বিশেষত তাঁর দ্বিতীয় পর্বের কবিতাগুলি। মানুষের অবিনশ্বরতাকে কোনো পার্থিব নশ্বরতা এসে কোনোদিন ম্লান করে দিতে পারবে না, শুধু এইটুকু বোঝার জন্য এই কবি আমাদের শিরোধার্য।

এই তো গেল জীবনানন্দের সমাজ-চেতনার এক দিক যা পদে পদে রাষ্ট্রবিপ্লব সমাজবিপ্লবের সঙ্গে জড়িত। তাঁর সমাজ-চেতনার আরো একটা দিক আছে যা খুব সূক্ষ্ম ও সুন্দর গাছপালা পশুপাখির প্রতি ভালোবাসার অবয়ব নিয়ে এসেছে। কবি যেন খুব হার্দ্য ও নিম্নকণ্ঠে বলতে চাচ্ছেন ওরা বেঁচে থাকলেই মানুষ বেঁচে থাকবে, ওদের ভালোবাসলেই মানুষকে ভালোবাসা হবে। ভেষজজগৎ এবং প্রাণিজগতই যে পৃথিবীকে নিয়ত নির্মাণ করছে, তাকে শুদ্ধ ও অবিকল করে রেখেছে পরিবেশচেতনার এই আদি কথাটা জীবনানন্দের কবিতায় সংকেতে প্রতীকে চিত্রকল্পে ছবিতে বারবার ব্যক্ত হয়েছে—আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞান এইখানে তার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কবিকল্পনার মিল খুঁজে পাবে। এই মহৎ ও মনোরথ খবরটিকে জানবার জন্যও আমাদের বারংবার খুব নম্র ও সংবেদনশীলভাবে বিংশ শতকের এই মহৎ বাঙালি কবির কাছে আসতে হবে; ব্যাপারটা বোঝা এখন খুব প্রয়োজনীয়, যে কবি একদা শীত সন্ধ্যায় বিষণ্ন কলকাতায় ট্রামের চাকায় পিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি দিনে দিনে কত বেশি জরুরি হয়ে উঠছেন আমাদের মেধার কাছে বুদ্ধির কাছে অনুভূতির কাছে।

বিষয়টা বুঝবার জন্য তাঁর কবিতার উৎসে যাওয়া যাক। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পশুপাখিরা খুব সুন্দর ও বিকীর্ণভাবে এসে গেছে। সেখানে দিনের শেষে তার ডানার রৌদ্রের গন্ধ চিল মুছে ফেলে *(বনলতা সেন)*; হাঁসের নীড়ের থেকে খড় ছড়ায় *(কুড়ি বছর পরে: বনলতা সেন)*; বনহংস-বনহংসী যারা জলসিঁড়ি নদীর ধারে নীড় বাঁধে হয়ে ওঠে প্রেমিক-প্রেমিকার উপমা *(আমি যদি হতাম; ঐ)* সুঘ্রাণ ঘাস হরিণরা ছিঁড়ে নেয় দাঁত দিয়ে *(ঘাস : ঐ)*; স্বপ্নের ভিতর দেখা যায় পলাশের বনে হরিণেরা খেলা করছে *(হরিণেরা : ঐ)*; এই অনুপম পৃথিবীতে মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে অঘ্রাণের রাতে জেগে বসে থাকে পেঁচা *(পেঁচা : ধূসর পাণ্ডুলিপি)*; এখানে ইঁদুর-পেঁচারা জোছনায় ধানক্ষেত খুঁজে আসে যায় *(পঁচিশ-বছর পরে : ঐ)*; সমুদ্রের পাখিরা

সাগর ফেনায় দোল খায় *(পাখীরা : ঐ)*; মাঠে মাঠে ডানা ভাসায় বক *(মৃত্যুর আগে : ঐ)*; বেতের লতার নীচে চড় য়ের ডিম শক্ত হয়ে পড়ে থাকে ঐ); প্রান্তরের বুকে উড়ে যায় কাক; পায়ে ঘুঙুর পরা হাঁসটিকে সন্ধ্যাবেলা কিশোরী পুকুরপাড় থেকে ঘরে ডেকে নিয়ে যায় *(রূপসী বাঙলা)*; লক্ষ্মীপেঁচা তার লক্ষ্মীর জন্য গান গায় *(রূপসী বাঙলা)*; এখানে দেখা পাওয়া যায় মাছরাঙার অথবা বাদুড়ের *(ঐ)*; বউ কথা কও, দোয়েল, ঘুঘু, শালিখ প্রভৃতি পাখিরা এখানেই কলরব করে *(ঐ)*। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ভাষা ও ছন্দের লাবণ্যে, কখনো বা স্বেচ্ছাকৃত রূঢ়তায় আঁকা এইসব পশুপাখিরা প্রত্যক্ষ দেখার রঙে আঁকা বলে একেবারে পাঠকের মর্মতল অধিকার করে বসে।

কখনো আবার দেখি গ্রামবাংলার পশুপাখির প্রতি এই অন্তরের আকর্ষণের বৃত্তেই ভীরুলাজুক ধূসরবর্ণ শেয়াল একটি বিখ্যাত প্রেমের কবিতায় মূল চিত্রকল্পের প্রস্থিতি পেয়েছে; মুক্তার মতো নিটোল কবিতাটি আগাগোড়া তুলে দেবার মতো :

সেই সব শেয়ালেরা জন্ম জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে—বার হয়—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে;—উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি
সেইসব হৃদযন্ত্র মানবের মতো আত্মায়;
তাহলে তাদের মনে সেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিতো—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরতিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

(সেইসব শেয়ালেরা : সাতটি তারার তিমির)

জীবনানন্দের কাব্যে এইসব প্রাণী ও প্রতীক শুদ্ধ কবিতার অবয়ব ধরেই এসেছে; কিন্তু আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞানী তাঁকে একজন সহমর্মী মানুষ বলে চিনতে পারেন যেহেতু তাঁরা এমন এক প্রাকৃতিক ভারসাম্যময় পৃথিবীর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন যেখানে পশুপাখিরা নির্ভয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। একালে যখন বিংশ শতক সমাপ্তপ্রায় এবং আমরা একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তখন একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে দিকে দিকে অরণ্যসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং মানুষের লোভের বলি হয়ে পশু-পাখিরা প্রাণ হারাবে। সেই ভয়াল মুহূর্তে পৃথিবী শুধু বৈচিত্র্য হারাবে না, সে ও মানুষ একসাথে বন্ধ্যা ও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

এই মুহূর্তে বৈজ্ঞানিকেরা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখবার গুরুত্ব এবং পশু-পাখির ভালো থাকার উপর মানুষের ভালো থাকা নির্ভর করে, এই বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন। Ethics of Biospheral Survival নামক গবেষণাপত্রে পরিবেশবিজ্ঞানী শ্রীমতী বিয়াচিত্রে ই. উইলার্ড-এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—"Frequentlay humans do not see the interconnection of one action that triggers another, often distant subsequent result. We are apt to be unware when we have altered significantly the diving forces or components of some ecosystem.

For example in the Western United States we have sought to protect grazing sheep by poisoning shooting coyotes (Canis latrans, also called Prairie Wolves), but we have not seen their actions to be immediately traciable as the cause of a decline in local graincrops. Yet the casual loop is closed when this situation is coupled with quantitative observations of a sharp rise in rodents and bird populations. Protecting grazing sheep is important but respect for the interconnectedness of life and the driving force of biological reproduction would suggest other means of protecting sheep from coyotes which will not have these other side effects. *(Growth withoul Ecodisasters? ed. by Nicholas Polumin)*। পৃথিবীর পরিবেশজনিত ভবিষ্যৎ নিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিয়াত্রিচে উইলার্ভ বলেছিলেন, মানুষেরা অনেক সময় তাদের কোন একটা কাজের ফলে প্রকৃতিতে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে খেয়াল রাখে না। ফলে খুব সহজেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিচলিত হয়ে যায়, পারস্পরিক যোগ সেখানে এতই সূক্ষ্ম। একটা উদাহরণ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে ভেড়াদের বাঁচানোর জন্য কয়োট বা 'প্রেইরি-কুকুর' বলে কথিত প্রাণীদের বিষ দিয়ে বা গুলি করে মারা হচ্ছিল। কিন্তু এর ফলে ইঁদুর এবং পাখির সংখ্যা এমন বেড়ে গেল যে স্থানীয় ফসল উৎপাদনের প্রচণ্ড ক্ষতি হল।

জীবনানন্দের কোন কোন কবিতা—'ক্যাম্পে' বা 'শিকার' এই মুহূর্তে মনে পড়ছে—প্রাণিজগতের প্রতি মানুষের ভালোবাসার মূল্যবান দলিল বলেই গ্রাহ্য হতে পারে। 'শিকার' কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

ভোর :
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে
অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে
কচি বাতাবি লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউ-এ সে নামল—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য
অন্ধকারের হিমকুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য,
এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্যে।
একটা অদ্ভুত শব্দ
নদীর জল মচকা ফুলের মতো লাল।

আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরী হয়ে এল।
নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরোনো শিশিরভেজা গল্প
সিগারেটের ধোঁয়া;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম-নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম। (বনলতা সেন)

যে শহুরে মানুষ দল বেঁধে বনে গিয়ে হরিণ মারছে তার প্রতি কবির ঘৃণা, আপত্তি ও ব্যঙ্গ স্মরণীয় ভাষায় ব্যক্ত। পশুপাখিদের বাঁচানোর জন্য যে আন্দোলন এখন এশিয়ায় ইয়োরোপে আমেরিকায় সোচ্চার হয়ে উঠছে এই কবিতাটি তার পক্ষে একটা ভালো ম্যানিফেস্টো হতে পারে।

অরণ্য আবেশ নিয়ে লেখা এইরকম আর একটি চমৎকার কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের 'ক্যাম্পে'। পোষা হরিণীর ডাক শুনিয়ে মায়াবন্দী করে হরিণদের বারবার প্রাচীন প্রথাটিই এখানে জীবন্ত বর্ণিত ওই হরিণীকে 'ঘাইহরিণী' বলে। অধিকন্তু সমস্ত কবিতাটিতে সাঙ্কেতিকভাবে ব্যক্তিগত কবিহৃদয়ের প্রেমপিপাসা আশাব্যর্থতা অমৃত পিপাসাও মৃত্যুর বোধ যুগপৎ বর্ণিত। যা হোক প্রকৃতিপ্রেমিক অরণ্যপ্রেমিক পশুপ্রেমিক নিখিল মানুষের কাছে কবিতাটির প্রারম্ভ এবং অনবদ্য আবেদন নিয়ে আসে :

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি—
কাহারে সে ডাকে।
কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আর একটি গভীর গম্ভীর সুর বেজে উঠেছে তাঁর কবিতায় গাছপালাশোভিত পৃথিবীর প্রতি নিবেদিত অকৃত্রিম ভালোবাসায়। এইখানে সতৃষ্ণ প্রকৃতিপ্রেমের রঙ্গবিলাসে ও বিস্ময়বোধের প্রাচুর্যে তাঁর কবিতা টমাস হার্ডি অথবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রীনম্যানসনস' এর হাডসন অথবা কোয়াসিমোদো বা হিমেনেথের সাহিত্যের সঙ্গে কিছু তুলনীয় হতে পারে। রূপসী বাঙলা বা ধূসর পাণ্ডুলিপির কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায় সবুজমেখলা মৃত্তিকা পৃথিবী জীবনানন্দকে কি গভীরভাবে টানত; বৃক্ষ ঘাস লতাপাতা বনফুল নক্ষত্র ইত্যাদি প্রকৃতিদৃশ্যের সামনে তিনি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবিষ্টের মতো বসে থাকার ক্ষমতা রাখতেন তার প্রমাণ ওইসব কবিতার ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়।

'আমি চলে যাব বলে/চালতা ফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে/নরম গন্ধের ঢেউয়ে; 'কলমীদামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই পুকুরের নীড়ে'; চারদিকে আম-জাম-কাঁঠালের পল্লবের স্তূপ, ফণীমনসার ঝোঁপ ও শটিবন; হিজলবটতমালের ছায়া ঘেরা রূপটি অপরূপ; সবুজ ঘাসের ভিতর সোঁদা ধুলো শুয়ে থাকে, চারদিকে, ভেরেণ্ডা ফুল; বাসকের গন্ধ পাওয়া যায়, আনারস ফুলে ভোমরা ওড়ে; কাঠালী চাঁপা কোথাও ফোটে, হলুদ পাতা ঝরে পড়ে খয়েরী পাতার সঙ্গে মিশে যায়; লালশাক ছাওয়া মাঠ, পারিপার্শ্বে শ্যাওলার মলিন সবুজ; আম-জাম বনের ছায়ায় বাংলার তীর নীল হয়ে গেছে; শুকনো বাঁশের পাতা, হিজলের বাঁকা ডাল; মাদারের ডুমুরের গন্ধ; মধুকূপী ঘাস প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে, সিংদুরের মতো রাঙা লিচু দ্বিপ্রহরে বুকে তার পড়ে আছে; অশ্বত্থের ডালে সন্ধ্যার হাওয়া লাগে; পাড়াগাঁর নোনাগাছ, কচি তালশাঁস মনে পড়ে; সর্ষের খেতে অপলক তাকিয়ে থাকা যায়, তুলে নেওয়া যায় ঝরা ধানের দু-এক গুচ্ছ; নদীর ধারে ধারে ঝরে পড়ছে বাসমতী ধান; প্রান্তরের বুকে ভিজে খড়; আষাঢ়ের রাতে সবুজ বাঁশের বন উচ্ছ্বাসের গান গায় ধুঁধুল লতায় জোনাকি আসে ঝিঁঝিঁ কথা বলে সারারাত—জীবনানন্দের রূপসী বাঙলা বইটির এইসব চিত্রকল্প ও বর্ণনায় কান পাতলে যেন প্যাস্টোরাল বাংলার রাখালিয়া হৃৎপিণ্ডের ধমনীর ধ্বনি শোনা যায়। চোখ বুজে এইসব দৃশ্যের ধ্যান করা যায়—স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ সমেত তাদের চোখের সামনে সাকার করে তোলা যায়, এমনি অনন্ত উষ্ণ চিত্ররূপময় তারা।

রূপসী বাঙলায় আরো একটি অপরূপ কবিতা আছে, সনেটের আঙ্গিক থেকে একটু বাইরে এসে লেখা, শান্তরসাঙ্গদা ভেষজ বসুন্ধরার সপক্ষে এমন ভালোবাসার দলিল কমই রচিত হয়েছে।

সন্ধ্যা হয়—চারদিকে শান্ত নীরবতা;
খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে;
গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ দিয়ে ধীরে ধীরে;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘনস্তূপে;
পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

পুরো কবিতাটিই তুলে দিলাম।

রূপসী বাঙলার মতো ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যেরও ছত্রে ছত্রে ভেষজ পৃথিবীর জয়গাথা ছড়িয়ে আছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করা যেতে পারে এমন অসংখ্য sensuous ছবি সেখানে আছে। চারদিকে 'পোড়ো জমি—খড়নাড়া—মাঠের ফাটল, ধানক্ষেতে ধোঁয়াটে ধারালো কুয়াশা জমেছে *(মাঠের গল্প)*; পথের উপর 'শসাফুল,—দু-একটা নষ্ট শাদা শসা' *(পঁচিশ বছর পরে)*; 'চারদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল' *(অবসরের গান)*; এমনি বহু উদাহরণ চয়ন করা যায়। এই ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যেই প্রবাদপ্রতিম আর একটি কবিতা আছে; আমি শুধু প্রথম স্তবকটি চয়ন করছি।

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার, কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মত যেন হায়
তারা সব; আমরা দেখেছি—যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভরে গেছে; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে

(মৃত্যুর আগে)

আমার বক্তব্য জীবনানন্দ দাশের কবিতা শুধু কাব্যপ্রেমিকের ভূস্বর্গ নয় প্রকৃতি-প্রেমিকেরও ভূস্বর্গ। প্রকৃতির সূক্ষ্ম মর্মস্পন্দনগুলি জেনে নেওয়ার জন্য জীবনানন্দকে বারবার পাঠ করতে হবে। এই প্রয়োজন আগামী শতকে আরো বেড়ে যাবে বলে মনে হয়। কারণ মানুষ ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে আপৃথিবী গাছপালা অরণ্যের হত্যালীলায় মেতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশবাদীরা অনায়াসে মনে করতে পারেন জীবনানন্দের কবিতা যেন সবুজ আন্দোলনের দলিলের পৃষ্ঠা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া, তা যেন উৎসবতী সবীজ সবুজ ধরণীর পক্ষে এ তরতাজা সওয়াল জবাব। কবি কবিতায় যে কথা আভাসে ইঙ্গিতে বলতে চাইছেন, পরিবেশবিজ্ঞানীরা তা সরাসরি বলছেন। নিখিল মানুষের প্রতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি উভয়তই এক বক্তব্য—এই সবুজ পৃথিবীকে ভালোবাসো, এর উপর অত্যাচার কোরো না, একে বাঁচিয়ে রাখো। বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলছেন তাও একটু শোনা যাক।

"With the increase in human population, the rate of cyclic use in shifting, cultivation has likewise increased and the forest and soil has been and less time to recover. This has resulted, all too widely, in a gradual over exploitation and concomitant reduction in productivity. To this is now added large scale cutting downof forest for timber to be exported and elsewhere. This results in the complete destruction of the ecosystem." (A Biologists' view and Warnings : Donald J Kuenen—Growth without Eco-disasters?) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী লিনাস পলিং এই সিম্পোসিয়াম বা আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে একই কথা বলেছেন—'The exhaustible resources of the Earth should not be exhausted, and the environment should not be damaged in such a way that it would be impossible for human beings to lead a good life for the future.' *(ঐ)*।

মানুষ যত বাড়ছে তার চাষবাসের প্রয়োজনও বাড়ছে। ফলে বন ও বৃক্ষ নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে, কেটে ফেলা হচ্ছে, পরিবেশ উঠছে বিষিয়ে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব প্রাণের সঞ্জীবনী উৎস পৃথিবীকে আমরা যেন বন্ধ্যা না করে ফেলি ক্রমাগত লুণ্ঠনে, লুণ্ঠনে; আমাদের ভবিষ্যতের ভালো জীবনের জন্যই একে দিনে দিনে সবুজ থেকে সবুজতর করে রাখা দরকার।

প্রকৃতিকে যারা হত্যা করছে তাদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত এই সাবধানবাণী। জীবনানন্দের কাব্যে এই প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার মর্মরধ্বনি নিরবচ্ছিন্নভাবে উচ্ছ্বসিত; সেই ধ্বনি কান পেতে শুনবার জন্য আমরা অবশ্যই বারবার এই কবির কাছে আসব। শুধু জীবনানন্দ কেন প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসামূলক প্রবণতা বিংশ শতকের বড় কবিদের মধ্যে আরো কেউ কেউ দেখিয়েছেন। শষ্পাবতী বসুন্ধরার প্রতি মায়াদৃষ্টি তাঁদের কবিতায় এক গভীরতর মাত্রা যোগ করেছে। হাতের কাছেই পাচ্ছি যুয়ান রামোন হিমেনেথের কবিতা। সবুজ পৃথিবীকে তিনি এত ভালোবাসেন যে তাঁর প্রেমিককে তিনি সবুজপ্রিয়া রূপে কল্পনা করেছেন একটি সুপরিচিত কবিতায়।

Green was the maiden, green, green!
Green her eyes were, green her hair.
... ...
Through the green air she came.
(The whole earth turned green for her)

(Juan Ramon Jimenez.....; selected poems)

কুমারী ছিল সবুজ, শুধুই সবুজ। তার দুটি চোখ সবুজ আর তার মাথার চুলও ছিল সবুজ। সবুজ হাওয়ার ভিতর দিয়ে সে এল। পৃথিবী আগাগোড়া সবুজ হয়েছে শুধুমাত্র তার জন্য।

প্রকৃতিপ্রেমিক আর একজন বিখ্যাত কবি ইতালীয় ভাষায়, তাঁর নাম সালভাতর কোয়াসিমোদো। তাঁর কবিতার একটি-দুটি অন্তর্লীন সুর জীবনানন্দ দাশের কবিতার সুরের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। আসলে বড় বড় কবিরা সারা পৃথিবী জুড়েই কোনো কোনো ব্যাপারে বেশ সমানধর্মা হয়ে থাকেন। আর এটাও বেশ লক্ষণীয় যে সব কবিরা গাছপালা-পশুপাখির প্রতি অন্তর্দৃষ্টি ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন তাঁরা অনেক সময়ই জিতে গেছেন। কোয়াসিমোদো লিখেছেন :

And the rain insists
And the hissing of the poplars
illuminated
by the wind.
Like everything remote
do you return to mind.
The light green
of your dress is here among the plants

(The Gentle Hill : Nobel Prize Library)

ঝরছে বৃষ্টি। পপলার বনবীথি দুলছে বাতাসে। যা কিছু সুদূর তারই মতো তুমি আমার মনের ভিতর ফিরে আসছো। এখানে সবুজ গাছপালায় প্রতিবিম্ব দেখছি তোমার হালকা সবুজ বসনপ্রচ্ছদের।

এখানেই আমরা আরো একটা মূল্যবান সূত্র পেয়ে যাচ্ছি—সম্ভবত সবচেয়ে মূল্যবান সূত্র—জীবনানন্দ কেন পড়ব: এই মুহূর্তে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা কি—এরই আলোচনাক্রমে জীবনানন্দ আমরা পড়ব কারণ আমরা মূলত কাব্যপ্রেমিক, কবিতা ভালোবাসি বলে। তাঁর কবিতায় ভাবের যেমন বহুস্তর আছে ভাষারও বহুস্তর আছে—সেখানে বাইরের আপাত সরলতার ভিতরে ভিতরেই রয়ে গেছে এক দুর্বোধ্য অথবা জটিলতা বৈচিত্রী। ওই জটিলতাকে অথবা বৈচিত্রীকে বলতে পারি শিল্পেরই এক প্রথম শর্ত।

জীবনানন্দ দাশের জন্মের পর শতবর্ষ অতিক্রান্ত হল, আগামী শতকের পাঠকও এসে আজকের মতো হার্দ্যকণ্ঠে জীবনানন্দ আবৃত্তি করবে :

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

(বনলতা সেন : বনলতা সেন)

জীবনানন্দ পড়বার কারণ একটাই : এইখানে সাহিত্যের অমরত্ব আছে। স্কাইস্ক্রেপার, ফ্রিজ, টিভি, ফ্ল্যাট, মোটরগাড়ি, টেলিফোন, ইয়োরোপ, আমেরিকা, রাজনীতি, অর্থনীতি, কম্পিউটার, মেশিন ইত্যাদি জানবার পর এইখানে এমন একটা কিছু আছে যাকে জানবার জন্য আগ্রহ কিছুতেই মরে যায় না সংবেদনশীল মানুষের হৃদয় থেকে।

Bibliography : গ্রন্থপঞ্জী

জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ—১ম ও ২য় খণ্ড
The Final Reckoning : Nuremberg Diaries : Boris Polevoi
Growth without Eco-disasters? ed. by Nicholas Polunin
Juan Ramon Mimenez : Selected Poems
Nobel Prize Library (কোয়াসিমোদো-র কবিতা)

জীবনানন্দ : শিকড়ের সঙ্গে যোগ

মানস মজুমদার

বাইরে থেকে দেখলে তাঁকে নিঃসঙ্গ বলেই মনে হয় বইকি! জন-কোলাহল থেকে দূরে থাকেন। জনতার ভিড় এড়িয়ে চলেন। ভালোবাসেন নির্জনতা। খ্যাতি বা অখ্যাতি যাই বলি না কেন, 'নির্জনতার কবি' এই অভিধাটি তো দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র (১৯৩৬) 'বোধ' কবিতায় তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তিও এই অভিধাকে সমর্থন করে : 'তবু আমি এমন একাকী!'

তাই কি মনে মনে তিনি বারংবার গোষ্ঠী-জীবনের শরিক হতে চেয়েছেন? পল্লীবাংলার বুকে মানসভ্রমণে রাত হয়েছেন? বাংলার লোকঐতিহ্যের জগৎ যে তাঁকে হাতছানি দিয়েছে, আকর্ষণ করেছে, তাঁর কবিতায় বাংলার লোকঐতিহ্যের যে প্রভাবপ্রেরণা দেখা যায়, তাঁর কি কোনো গভীরতর তাৎপর্য নেই? আছে বলেই তো মনে হয়। মনে হয়, জীবনানন্দ ওই জগতে মানসিক শান্তি ও স্বস্তি পেয়েছেন। খুঁজে পেয়েছেন নিজের অস্তিত্ব, শিকড়ের সঙ্গে যোগ। বাংলার মাটি-জল আর ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা বোধ করেছেন। কল্পনা করেছেন জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক :

এ জনমে নয়, যেন—এই পাড়াগাঁর
পথে তবু তিনশো বছর আগে হয়তো বা—আমি তার সাথে
কাটায়েছি—পাঁচশো বছর আগে হয়তো বা—সাতশ বছর
কেটে গেছে তারপর তোমাদের আম জাম কাঁঠালের দেশে;
ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠে মাঠে কতবার কুড়ালাম খড়,
বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে,
ভাসানের গান শুনে কতবার ঘর আর খড় গেল ভেসে,
মাথুরের পালা বেঁধে কতবার ফাঁকা হল খড় আর ঘর।

(রূপসী বাঙলা, ১৩ সংখ্যক : ১৯৫৭)

'খোড়ো ঘর' হয়েছে কবির আশ্রয়। 'খোড়ো ঘর' বস্তুকেন্দ্রিক লোকঐতিহ্যের নিদর্শন। স্মরণযোগ্য, 'মহাপৃথিবী'র (১৯৪৪) 'বলিল অশ্বত্থ সেই' কবিতাতেও বংশানুক্রমিক আশ্রয় হিসেবে 'খোড়ো-ঘর'-এর আবির্ভাব ঘটেছে :

পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিকো—এইতো সেদিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়

—আজও আহা, তাহাদের কথা মনে হয়।
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এইসব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিল ঋণ

কবিতাটি পরিবেশিত হয়েছে অশ্বত্থের জবানিতে। বহুকালের পুরনো এই গাছ নিয়েছে দর্শনের ভূমিকা। অশ্বত্থকে দেখা হয়েছে জীবন্ত সত্তারূপে। স্পষ্টতই Animatism বা সর্বাত্মাবাদের প্রভাব পড়েছে। অশ্বত্থ শুনিয়েছে খোড়ো ঘরটির উদ্ভব-ইতিহাস। দীর্ঘজীবী অশ্বত্থের স্মৃতিচারণায় মানুষের বসবাসের যে ইতিহাস বিধৃত হয়েছে তাতে ধরা পড়েছে কাল-পরম্পরা, ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্যনিষ্ঠা। মানুষের জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষা বেদনা খোড়ো ঘরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। 'খোড়ো ঘর' শেষ পর্যন্ত তাই নিছক নিশ্চল বস্তুমাত্র থাকেনি, হয়ে উঠেছে জীবন-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। লোকঐতিহ্যের উপকরণ বিশেষকে কবি করে তুলেছেন তাৎপর্যমণ্ডিত। আরো তাৎপর্যপূর্ণ গোষ্ঠী-জীবনের প্রতি আকর্ষণ। 'পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠা মহাময়' সেই গোষ্ঠী-জীবনের প্রতিনিধি। কবি ওই জীবনের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ বোধ করেন। 'খোড়ো ঘর' হয়ে ওঠে রমণীয় আশ্রয়।

সহজ সরল জীবন কাম্য কবির। 'সহজ লোকের মতো' বাঁচতে চান। 'শরীরে মাটির গন্ধ মেখে, শরীরে জলের গন্ধ মেখে' কৃষক-জীবনের শরিক হওয়ার সাধ জাগে। বহু যুগ ধরে ব্যবহৃত উৎপাদন সরঞ্জাম 'লাঙল' আর 'কাস্তে' হাতে তুলে নেন। 'লাঙল' আর 'কাস্তে', সেই জীবনেরই প্রতীক। বলেন : 'হাতে তুলে দেখি নি কি চাষার লাঙল?' *(বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)* অথবা : 'কাস্তে হাতে কতবার যাই নি কি মাঠে?' *(ঐ)* কিন্তু সহজ সরল জীবন অনায়ত্তই থেকে যায়। নিঃসঙ্গতা ঘোচে না, ঘোচে না বিচ্ছিন্নতা।

লোকজীবন তাঁকে মুগ্ধ করে। লোকঐতিহ্যের জগতে প্রবেশ করেন। চোখে তাঁর মুগ্ধতার আবেশ : 'চারিদিকে বাংলার ধানী শাড়ি—শাদা শাঁখা—' *(রূপসী বাঙলা : ৬ সংখ্যক)*। 'ধানী শাড়ি' অর্থাৎ ধান রঙের শাড়ি। যার সৌন্দর্য ও সুষমা কবির মনোহরণ করে। সাদা শাঁখা সাধব্যের প্রতীক। সাদা শাঁখায় কবি বঙ্গরমণীর কল্যাণী মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেন। সাধারণী হয়ে ওঠে অসাধারণী। 'রূপসী বাঙলা'র ২৬ সংখ্যক কবিতায় রৌদ্রের ভিতর যে মেয়েটিকে দেখেন কবি—তার পরনে রয়েছে নক্‌শা পেড়ে শাড়ি। ৫২ সংখ্যক কবিতার কিশোরীটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে 'লালপেড়ে' শাড়িতে। ৪২ সংখ্যক কবিতায় 'কড়ির মালা'র উল্লেখ ঘটে। ৪৪ সংখ্যক কবিতায় নায়িকার কপালে শোভা পায় 'কাঁচপোকা টিপ'। যুগপৎ পরিধান ও প্রসাধনের জগতে বিচরণ করেন কবি। স্বভাবে রোমান্টিক। বিস্ময় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত কবিদৃষ্টি।

লোকখাদ্যও উপেক্ষিত থাকে না। 'ঝরা পালক' (১৯২৭)-এর 'বনের চাতক—মনের চাতক' কবিতায় 'ননী'র উল্লেখ করেন। যার স্বাদ 'আতার ক্ষীরের মতো'। উপমাটি উপভোগ্য। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অবসরের গান' কবিতায় সামান্য 'ক্ষুদকুঁড়া' অসামান্য হয়ে ওঠে।

একাধিক লোকবাদ্যের উপস্থিতি ঘটে তাঁর কবিতায়। শ্মশানের পটভূমিকায় পাই 'ডমরু'র উল্লেখ *(কিশোরের প্রতি : ঝরা পালক)*। ডমরুধারী শিব যে শ্মশানচারী। অনুষঙ্গটি অবচেতনে নিহিত থাকে। ওই কবিতাতে বাঁশির সুর কবিকে উন্মনা করে তোলে : 'কে যেন ডাকিছে আকুল উদাস বাঁশির সুরে'। কবির মন ব্যাকুল হয়। সে ব্যাকুলতা পাঠকচিত্তেও অনুরণন তোলে।

যানবাহনের ভিড়ে জলযানেরই প্রাধান্য। নদীমাতৃক বাংলায় তাই বোধ করি স্বাভাবিক। বিশেষত জীবনানন্দের জীবনের প্রথম সতেরো-আঠারো বছর এবং কর্মজীবনের আরো কয়েকটি বছর যে বরিশাল অঞ্চলে অতিবাহিত হয়েছে সে অঞ্চলটি নদী অধ্যুষিত। দুলকি চালে পানসি চলে যায়। কবিতায় তার গমনভঙ্গিটি ধরা পড়ে; 'পানসী দুলায়ে গেছে মাঝি বাঁকা ঢেউটি বেয়ে' *(চাঁদিনীতে : ঝরা পালক)* চোখে পড়ে খেয়া নৌকা। দেখেন : 'খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে' *(রূপসী বাঙলা : ২ সংখ্যক)*। 'রূপসী বাঙলার' ৪ সংখ্যক কবিতায় চাঁদ সদাগরের 'মধুকর ডিঙা' কবির স্মৃতিকে নাড়া দেয়। বেহুলাকে দেখেন 'ভেলা'র ওপরে, গাঙুরের জলে। ২৯ সংখ্যক কবিতায় শ্রীমন্তের 'ময়ূরপঙ্খী' কবিকে স্বপ্নাবিষ্ট করে। অতীত আর বর্তমান মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। ময়ূরপঙ্খীকে উপলক্ষ করে বহমান কালের ছন্দস্পন্দটুকু আবিষ্কার করেন করি। স্থলযানের উল্লেখ সামান্যই। 'মহাপৃথিবী'র 'নিরালোক' কবিতায় গোরুর গাড়িটি ধীরে চলে যায় অন্ধকারে'। গ্রামীণ পটভূমিকায় উপস্থাপিত একটি স্বাভাবিক চিত্র রূপে একে দেখা যেতে পারে। আবার অন্ধকারের ভেতর চলমান ধীর মন্থর এই যানটিকে জীবনের প্রতীক হিসেবেও দেখা চলে। কেননা, স্থির একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে যানটি।

> আমার কথাটি ফুরলো
> নটে গাছটি মুড়লো॥

ছড়াটি সুপারচিত। লোককথার শেষে কথকের মুখে এই ছড়াটি শোনা যায়। 'মহাপৃথিবী'র 'বিভিন্ন কোরাস' কবিতায় ছড়াটির তির্যক প্রয়োগ দেখা গেল :

> নটে গাছ মুড়ে গেছে বলে মনে হয়
> আমাদের বক্তব্য ফুরুলে।

অনুরূপ কৌশলী প্রয়োগ সুপরিচিত প্রবাদেরও। 'সরষে দিয়ে ভূত তাড়ানো'-র বিধি বহুকালের। 'ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা' *(পরিচায়ক : 'মহাপৃথিবী)* উক্তির আশ্রয় হল পূর্বকথিত লৌকিক প্রবাদ। 'মেঘ না চাইতে জল' প্রবাদের চতুর ব্যবহার ঘটেছে 'জুহু' কবিতায় : 'মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে'। *(সাতটি তারার তিমির : ১৯৪৮)*। 'চালচুলো' বিশিষ্টার্থক শব্দ। 'বেদিয়া' কবিতায় হয়েছে 'চুলিচালা'। বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের অন্যান্য দৃষ্টিন্ত : 'মাখামাখি' *(আট বছর আগের একদিন, বনলতা সেন : ১৯৪২)*, 'বেনো জলে' *(ওই)*, 'মাটির দরের মতো' *(সুবিনয় মুস্তফী : ঐ)*, 'খিল ধরে যেত' *(ওই)*, 'ভাসুর-ভাদ্রবৌ' *(লঘু মুহূর্ত : সাতটি তারার তিমির)*,

'ধর্মের কল' *(ওই)*, 'হাড় হাভাতে' *(ওই)*, 'তিল ধারণের স্থান' *(ভাষিত : ওই)*, 'কানাকড়ি' *(সৃষ্টির তীরে : ওই)*। নানাধরনের লোকগীতির উপস্থিতিও ঘটেছে তাঁর কবিতায়। যেমন :

১. ভাটিয়াল সুর সাঁঝের আঁধারে দরিয়ার পারে মেশে।

(আমি কবি—সেই কবি: ঝরা পালক)

২. নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান!

(জীবন : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

৩. ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে

(রূপসী বাঙলা : ৬ সংখ্যক)

৪. কীর্তন ভাসান গান.....যাত্রা পাঁচালীর *(ওই : ১১ সংখ্যক)*

৫. মাঠ থেকে গাজন গানের ম্লান ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস ভেসে আসে

(ওই : ৩৮ সংখ্যক)

প্রথম দৃষ্টান্তে ভাটিয়াল সুরের বিলীয়মান রেশটুকু ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন কবি। শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য করে তুলেছেন। সূক্ষ্ম চিত্রকল্পের নিদর্শন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে নতুন রাত্রির সঙ্গে পৃথিবীর বিয়ের কল্পনায় অভিনবত্ব আছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে ভাসান গানের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক স্থাপনে ঔচিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থ দৃষ্টান্তে রূপসী বাঙলার আন্তরসম্পদের পরিচয় প্রদান, ঐতিহ্যাশ্রয়ী বিভিন্ন লোকগীতির উল্লেখ। পঞ্চম দৃষ্টান্তেও গাজন গানকে উপলক্ষ করে একটি উপভোগ্য চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে।

ছোটবেলায় মোতির মায়ের কাছে শুনতেন পরণ-কথা। স্মৃতিতে সে-সব গেঁথে গিয়েছিল। জীবনানন্দের বহু কবিতাতেই তাই রূপকথার আবহ ও অনুষঙ্গ লভ্য। যেমন : অপরূপ রূপ-পরীস্থান (কিশোরের প্রতি : ঝরা পালক)। কোথা দূরে মায়াবনে পরীদল মেতেছে উৎসবে *(নাবিক : ওই)*। মনে পড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার *(পরস্পর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)*। পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে *(হায় চিল : বনলতা সেন)*। পরণ-কথার গন্ধ লেগে আছে যেন তারা নরম শরীরে *(রূপসী বাংলা : ৩ সংখ্যাক)*। যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার/কাঁকন-বাজিত *(ওই : ৫ সংখ্যক)*।

রোমান্টিক আবেগ-ব্যাকুলতা, রহস্য বিভোরতা ও সৌন্দর্য সতৃষ্ণা প্রকাশে রূপকথার সহায়তা গ্রহণের আরো কয়েকটি নিদর্শন :

১. কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে *(রূপসী বাঙলা : ৭ সংখ্যক)*

২. রাজপুত্র কতদিন রাশ টেনে
টেনে এই পথে—কী যেন খুঁজেছে আহা, হয়েছে উদাস;

(ওই : ৮ সংখ্যক)

৩. এই ঘাস; এরই নীচে কঙ্কাবতী শঙ্খশালা করিতেছে বাস

(ওই : ১০ সংখ্যক)

৪. কোনো এক শঙ্খবালিকার
ধূসর রূপের কথা মনে হবে *(ওই)*

৫. কত পাটরানীদের গাঢ় এলো চুল *(ওই : ১৯ সংখ্যক)*

৬. চলে যায় মন্ত্রিকুমারের মতো, কোটাল-ছেলের মতো, রাজার ছেলের মতো মিলে কোন্ এক আকাঙ্ক্ষার উদ্‌ঘাটনে কত দূরে—
(ওই : ৫৮ সংখ্যক)

প্রয়োজনে লোকভাষার সহায়তাও নিয়েছেন কবি। এসব শব্দকে অচ্ছুৎ বলে অগ্রাহ্য করেননি। কবিতারও সৌন্দর্যহানি ঘটেনি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

১. বনের চাতক—মনের চাতক *(ঝরা পালক)* : ফোঁপায়, ছল্‌ছল, ছুঁড়ি।
২. সাগর বলাকা *(ওই)* : বেহুঁশ, টুকটুকে, ফুটফুটে, ডাগর, কাঁচা, ফাঁপা, কাঁদন।
৩. চলছি উধাও *(ঐ)* : টুঁটি, ঝাঁঝে, ঘায়েল, উড়্ উড়্, ধূ ধূ, থরে থরে, হেঁকে, খাঁ খাঁ, ভিখ।
৪. একদিন খুঁজেছিনু যারে *(ঐ)* : আধো আধো, মর্ মর্, নিদালি, ঢুলুঢুলু, নিঝঝুম, উড়্ উড়্।
৫. মরুবালু *(ওই)* : খিঁচে, দানো, হাড্ডি, ফোঁফরা।
৬. নির্জন স্বাক্ষর *(ধূসর পাণ্ডুলিপি)* : ছুঁয়ে ছেনে।
৭. অবসরের গান *(ওই)* : গেঁয়ো, ভাঁড়ারের, বিয়োবার, আইবুড়, রগড়।
৮. বিভিন্ন কোরাস *(মহাপৃথিবী)* : খিঁচড়ে, টেঁসে যায়, ডাঁইয়ে।
৯. লঘু মুহূর্ত *(সাতটি তারার তিমির)* : জাঁহাবাজ।
১০. ভাষিত *(ওই)* : ফিচেল।

লোকভাষার ব্যবহারে কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। প্রথমত, শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রতি কবির দুর্বলতা আছে। মনে হয়, ছন্দধ্বনির প্রয়োজনেই। দ্বিতীয়ত, প্রথম যুগের কবিতাতেই লোকভাষার বেশি ব্যবহার করেছেন তিনি। তৃতীয়ত, এসব ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষারীতি তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে।

লোকজীবন অনুসারী বহু উপমার সাহায্যও নিয়েছেন তিনি। কয়েকটি উদাহরণ :

১. ধু ধু মাঠ—ধানক্ষেত—কাশফুল—বুনো হাঁস—বালুকার চর
বকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর
এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিল নাচিয়া!
(সেদিন এ ধরণীর : ঝরা পালক)

নিসর্গ প্রকৃতির নৃত্যচপল রূপটি এ উপমায় উদ্ভাসিত।

২. মেঠো চাঁদ—কাস্তের মতো বাঁকা, চোখা—
(মাঠের গল্প : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

চাঁদের রূপচিত্রণসূত্রে এলো এ উপমা। চাঁদ কাস্তের মতো বাঁকা এবং তীক্ষ্ণ। উৎপাদন সরঞ্জাম 'কাস্তে' উপমান রূপে ব্যবহৃত। 'মেঠো চাঁদ' উপমেয়।

৩. শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
(অবসরের গান : ওই)

ভোরের রোদের ওপর অলস গেঁয়োর ভাব আরোপিত।
ভোরের রোদ উপমেয়, অলস গেঁয়ো মানুষ উপমান।

৪. মেঘের মতন চুল—তার সে চুলের ঢেউ
এমনি পড়িয়া রবে পালঙ্কের 'পর *(পরস্পর : ওই)*

নায়িকার কেশরাজির প্রশস্তি-কীর্তন-সূত্রে উপমাটির আবির্ভাব। উৎস রূপকথা।

লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকপ্রথা, লোক-উৎসব ও অনুষ্ঠান নির্ভরতার পরিচয় ঘটল কোনো কোনও কবিতায়। 'ঝরা পালক'-এর 'নীলিমা' কবিতায় জাদু-বিশ্বাস ও জাদু-সংস্কারের উপস্থিতি ঘটলো :

হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধিবিধানের এই কারাতল
তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছ মায়াবী।
কোন্ দূর জাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী!

নীলিমা যাদুশক্তিসম্পন্না। মায়াদণ্ডের অধিকারিণী। রোমান্টিক কবির দৃষ্টিতে নীলিমা রহস্যের যাদুপুরী।

ভূত-প্রেত-শাঁকচুন্নি-আলেয়া ডাইনি সম্পর্কিত বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতিফলন :

১. হালভাঙা এই ভূতের জাহাজটারে! *(চলছি উধাও : ঝরা পালক)*
২. স্পন্দহীন প্রেতপুরদ্বারে *(কিশোরের প্রতি : ওই)*
৩. কোন্ যেন এক জিন্-সর্দার সেজেছে তাহার সাথী।
(মরীচিকার পিছে : ওই)
৪. নীরবে যেতেছে দুলে নিদালি আলেয়া!
(আলেয়া : ঝরা পালক)
৫. কোন্ ডাকিনীর বুকের চিতায় পচিম আকাশ টাটে!
(বনের চাতক—মনের চাতক : ওই)
৬. ডাইনে তোমার ডাইনী মায়া *(সাগর বলাকা : ওই)*

রহস্যময়তা সৃষ্টির কারণেই কবি এ ধরনের বিশ্বাস-সংস্কারের আশ্রয় নিয়েছেন। মুখ্যত 'ঝরা-পালক'-এর কবিতাসমূহেই এমনটি দেখা যায়।

প্রথা ও উৎসব প্রসঙ্গও এসেছে তাঁর কবিতায়। এ সমস্ত প্রথা ও উৎসব লোকজীবনে বহুল প্রচলিত। যেমন :

১. আকাশপ্রদীপ জ্বেলে তখন কাহারা যেন কার্তিকের মাস সাজায়েছে— *(রূপসী বাঙলা : ৩৮ সংখ্যক)* দেবতার উদ্দেশে বা মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে কার্তিক মাসের প্রতি সন্ধ্যায় বাঁশের মাথায় যে প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয় তাই আকাশপ্রদীপ। প্রথাটি সুপরিচিত। হেমন্তের বঙ্গভূমি এ প্রথার পটভূমি।

২. অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ
ভোর রাতে—নবান্নের ভোরে আজ বুকে যেন কিসের আঘাত।
(ওই : ২৫ সংখ্যক)

নবান্নের সঙ্গে রয়েছে কাকের সম্পর্ক। নবান্নের দিনটিতে কাকের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা হয়। নবান্নের ভোরে কাকের শব্দে শৈশবের দিনগুলি মনে পড়ে যায় কবির। দীর্ঘশ্বাস পড়ে পুরনো দিনগুলির জন্যে। কবিচিত্ত হয়ে ওঠে স্মৃতিভারাতুর।

লৌকিক খেলাধুলার জগতেও বিচরণ করেছেন কবি। 'রূপসী বাংলা'র ২২ সংখ্যক কবিতায় কড়ি খেলার প্রসঙ্গ এসেছে। কড়ি দিয়ে নানা ধরনের খেলা বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত। একটি খেলা হল 'ছক্কা পঞ্জা'। ঘর কেটে খেলা হয়। একদা সমৃদ্ধ ছিল, এখন জনশূন্য, এমন একটি জনপদে উপস্থিত হয়ে কবির মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। একসময় মানুষের বসতি ছিল, ছিল জীবন আর জীবনের আনন্দ। কড়ি খেলায় সেই আনন্দ আর অবকাশেরই বহিঃপ্রকাশ। আজ আর কেউ কড়ি খেলে না—'কড়ি খেলিবার ঘর মজে গিয়ে গোক্ষুরার ফাটলে হারায়'। সে ঘর অধুনা নিশ্চিহ্ন, গোঘরোর গর্তের সঙ্গে মিশে গেছে। সন্দেহ নেই, ঐতিহ্যের জগতে স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁর। লোকঐতিহ্যের উপাদান-উপকরণ তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবনানন্দের কবিতা পাঠের সময় এ দিকটিও তাই মনোযোগের দাবি রাখে।

জীবনানন্দের কাব্যে প্রকৃতি

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যকে যদি আলোচনার জন্য ভাগ করা হয়, তাহলে তার মধ্যে সুস্পষ্ট তিনটি স্তর দেখতে পাওয়া যাবে। প্রথম স্তরে প্রকৃতির আধিপত্য, দ্বিতীয় স্তরে প্রেমের ও তৃতীয় স্তরে মানবসভ্যতার ইতিহাসের। বলা বাহুল্য, এই আধিপত্য সর্বগ্রাসী নয়। প্রথম স্তরে যেখানে প্রকৃতির আধিপত্য সেখানে প্রেম ও ইতিহাসের চেতনা প্রকৃতিকে জীবন্ত ও ঘনিষ্ঠ করে তুলে, তাকে জড়তার ঊর্ধ্বে টেনে এনে আমাদের একঘরের বাসিন্দে করে তুলেছে। দ্বিতীয় স্তরে প্রকৃতি ও ইতিহাস প্রেমের মুখে আলো ও ছায়ার আলপনা এঁকে চলেছে। আর তৃতীয় স্তরে প্রকৃতি ও প্রেম ইতিহাসের গ্লানি ও মালিন্য মার্জনায় নিযুক্ত।

প্রকৃতি-অধ্যায়ে আমরা প্রধানত প্রকৃতির দুটি রূপের সংগে পরিচিত হই। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র যুগে ধ্বংসোন্মুখ হেমন্তশ্রী প্রকৃতির রাজ্যে নতুন সৌন্দর্য নিয়ে এসেছে, 'রূপসী বাঙলা'-র যুগে বাংলার নিপুণ প্রাকৃতিক চিত্রলেখের সংগে এসে মিশেছে বাংলার রূপকথা ও ইতিহাসের ধূপছায়া। জীবনানন্দ ভাষায় ছবি আঁকতে অত্যন্ত নিপুণ। সে-ছবি অনুভূতির ছবি বলে আরো মনোরম :

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা
নির্জন মাছের চোখে; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;
মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ়রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁ ঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;

(মৃত্যুর আগে : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এ-ছবি প্রধানত সাদা আর কালো রঙে আঁকা। আলো আর বুলবুলি, ইঁদুরের রোমে, খুদ, সন্ধ্যার আঁধারে হাঁস, জ্যোৎস্নার উঠানে খড়ের চালের ছায়া, নীলাভ নোনার বুকে গাঢ় রস, মেঘ ও সোনালি চিল, বেতের লতার নীচে চড় য়ের ডিম, জলের ঢেউ-এর উপর ভেসে থাকা চালের কুঁড়ো সাদা ও কালো রঙের অনুভূতি এনে দেয়। সাদা ও কালো মিশে ধূসর রঙ—জীবনানন্দের কবিতার বিশিষ্ট রঙ। আমরা বলেছি যে আশা ও নিরাশার বুননে জীবনানন্দের কবিতা অতুলনীয়। আশা ও নিরাশার সংগে রঙ মিলিয়ে জীবনানন্দের ছবিতে সাদা ও কালো রঙের ব্যবহার।

উপরের ছবিটিতে কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ই কাজ করে না, কবি সকল ইন্দ্রিয় দিয়েই প্রকৃতিকে গভীরভাবে অনুভব করেছেন বলে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের আস্বাদ লেগে আছে। এছাড়া 'বাতাসে ঝিঁ ঝিঁর গন্ধ', 'সবুজ বাতাসে', 'চালের ধূসর গন্ধে', 'পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ' ইত্যাদি বাক্যাংশে ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্থান পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রান্তরের সবুজ বাতাসে, ঘুমের ঘ্রাণের মধ্যে নরম জলের গন্ধে, চালের ধূসর গন্ধে কোথায় যেন মেয়েলি হাতের স্পর্শ রয়ে গেছে। সবার উপরে বিরাজ করছে 'নির্জন মাছের চোখ'-এর অপরূপ প্রশান্তি।

জীবনানন্দের 'ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ'-এর সংগে ইয়েটসের 'the mice in the barley sheaves'-এর সাদৃশ্য স্বপ্রকাশ, তবু এ ইঁদুরটি বিলেত থেকে আমদানি এ-কথা বলা যাবে না। কেননা প্রায় হাজার বছর আগে সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ আমন ধানের ক্ষেতে ইঁদুরটিকে দেখেছিলেন।

পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে দিকে,—চড় য়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে,—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা-কড়্ কড়্!
শসাফুল,—দু' একটা নষ্ট শাদা শসা,—
মাকড়ের ছেঁড়া জাল,—শুকনো মাকড়সা
লতায় পাতায় ;—
ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে পথ চেনা যায়;

(পঁচিশ বছর পরে : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

জীবনানন্দের প্রকৃতি-বর্ণনায় হেমন্তের আধিপত্য। তার কারণ, হেমন্ত-প্রকৃতির বন্ধা রূপের মধ্যে তিনি যুগের বন্ধ্যাত্বকে অনুভব করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে যুগের বন্ধ্যাত্বর সংগে তাঁর মানসিকতার আত্মীয়তা আছে—ফলে আবহমান মানবসভ্যতাও তাঁর চোখে একই রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

আমাদের চারপাশে কুয়াশার নিরাবয়বতা। জীবন শুষ্ক ও শূন্য। এযুগে মানুষের বাসা ভেঙে গেছে। উষ্ণ সম্ভাবনাকে লালন-পালন করার কোনো পথ খোলা নেই। তবু জীবনানন্দের কাছে হেমন্ত-প্রকৃতি কেবলমাত্র বিনষ্টশ্রীর প্রতীক নয়, ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে লতায় পাতায় শুকনো মাকড়সার ছেঁড়া জাল যেমন সুন্দর দেখায় তেমনই

কবি-মনের ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় হেমন্তও অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে। হেমন্তের যে এত রূপ জীবনানন্দের আগে সেকথা কে জানত।

হতশ্রী যুগের মধ্যেও সৌন্দর্য আবিষ্কার করে কবিকে তথা মানুষকে বেঁচে থাকার পথ চিনতে হবে।

'এই বলে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।
হলুদ রঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর;
চুলের উপরে তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশি;—'

(দু'জন : বনলতা সেন)

শিল্পী যামিনী রায় 'সবুজ মেয়ে' ছবিতে বাংলার সৌন্দর্যকে রূপ দিয়েছেন। জীবনানন্দও বাংলার ছবি এঁকেছেন, অবশ্য হেমন্তের বাংলার। তাই এ-ছবির নাম রাখা যেতে পারে 'ধূসর মেয়ে'। তবু এ-মেয়ের রূপের কোনো অভাব নেই। কেননা বিষয়ের গুণে ছবি সুন্দর হয় না, সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষমতাই ছবিকে সুন্দর করে তোলে। যামিনী রায়ের 'সবুজ মেয়ের' মতো জীবনানন্দের ধূসর মেয়েকেও 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হয় না। অহল্যার মতো প্রকৃতি থেকে সবেমাত্র তা জন্ম হয়েছে, এখনও তাঁর গায়ে লেপে আছে মাটির গন্ধ। প্রকৃতির গর্ভ থেকে এখনও সম্পূর্ণ সে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। তার হাঁটু পর্যন্ত কাশবনে ঢাকা, হেমন্তের ম্রিয়মাণ আঁচল ঢেকে রেখেছে তার মুখ, গাছের হলুদ পাতা দিয়ে তার শাড়িখানা তৈরি, এখনও তাতে চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো বাতাস চারপাশ থেকে খড়ের টুকরো উড়িয়ে এনে যেন, 'পুষ্পবৃষ্টি' করে যাচ্ছে, তার চুলের উপরে এখনও কুয়াশার রহস্যময় হাতের স্পর্শ, আর শরীরে রয়েছে শিশিরের স্নিগ্ধ ঘ্রাণ।

জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি থেকে নারীর জন্ম হয়েছে। পরে আমরা দেখব যে বনের লতায় তৈরি পাখির নীড়, শিউলি ফুলের শুভ্রতা ও জলের উপর মূর্ছিত পদ্ম বনলতা সেন, শেফালিকা বোস ও মৃণালিনী ঘোষালে রূপান্তরিত হয়েছে।

জীবনানন্দ যে প্রকৃতিকে নারীর রূপে দেখেছেন তার প্রমাণ হিসেবে প্রকৃতিদেহে নারীরূপের আরোপের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃতির সম্পর্কে যখন আমরা স্তন, যোনি, বিয়োনো, চুম্বন ইত্যাদির উল্লেখ দেখি যার ফলে প্রকৃতি নারীর মতো ইন্দ্রিয়গম্য অনুভূতি নিয়ে আসে তখন প্রকৃতি ও নারীর ভেদরেখা মুছে যায় :

(ক) 'চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল';

(অবসরের গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

(খ) আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝরে পড়ে তার—
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে; *(ঐ)*

(গ) 'সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা,—শাদা—বরফের কুঁচির মতন!
তাহাদের চোখমুখ ভিজে,—
ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল!'

(পরস্পর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

(ঘ) 'মোর দেহ ছেনে' গেছে অলস—আঢুল
কুমারী আঙুল
কুয়াশার ; ঘ্রাণ আর পরশের সাধ
জাগায়েছে; *(পিপাসার গান : ঐ)*

(ঙ) 'হেমন্তের রৌদ্রের মতন
ফসলের স্তন
আঙুলে নিঙাড়ি
এক ক্ষেত্র ছাড়
অন্যক্ষেতে
চলিব কি ভেসে
এ সবুজ দেশে
আর একবার।' *(ঐ)*

(চ) 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো
মিশে থাকতে চেয়েছিল।' *(অন্ধকার : বনলতা সেন)*

ব্রাহ্মপরিবারের ভদ্র ও সভ্য জীবনাদর্শের শালীন রীতি-নীতির মধ্যে কবির ইন্দ্রিয়জ উপভোগের স্পৃহা বাধাগস্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। ফলে অবদমিত কামনা-বাসনাগুলি বাঁকা পথ নিয়েছে। এ-অনুমানের পিছনে সংগত কারণ আছে। নারীদেহ বর্ণনায় জীবনানন্দ রতিভাব উদ্রেককারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করেননি, সযত্নে তা এড়িয়ে গেছেন, নারীকে ঘিরে আদিম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার বাসনা জীবনানন্দের কবিতায় নেই। 'অন্ধকারের স্তন ও যোনি' থেকে জীবনানন্দ ঘাসমাতার স্তন ও যোনি, বড়জোর 'শূকরীর যোনি' পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন, কিন্তু মানবীর ক্ষেত্রে জীবনানন্দ এ-ধবনের মনোভঙ্গিকে কোনোমতেই সামান্য প্রশ্রয়ও দিতে রাজি নন। কারণ যাই হোক, এর ফলে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি দেহের স্বাদের কথা কয় এবং পাঠকও ইন্দ্রিয়ঘন নিবিড়তায় প্রকৃতিকে উপভোগ করেন। আধুনিক কবিতার প্রধান লক্ষণ জীবন ও জগৎকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা। তার জন্য আধুনিক কবি সব বেড়া ভেঙে দিতে চেয়েছেন। জীবনানন্দও এক্ষেত্রে প্রকৃতি ও নারীর বেড়া ভেঙে দিয়ে আমাদের চেতনাকে সম্প্রসারিত করেছেন।

বনের লতা দিয়ে পাখির নীড় তৈরি; তাই যে নায়িকার চোখ পাখির নীড়ের মতো, কবির কাছে সে বনলতা সেনের মূর্তিতে ধরা দেয়। তেমনই শাদা শিউলি ফুলের হাসি

শেফালিকা বোসের স্মৃতির মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে : 'হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে'। আর কোনো এক সন্ধ্যায় জলের উপর মূর্ছিত শ্বেতপদ্ম মৃণালিনী ঘোষালের শবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে :

"এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন; নীল লাল রুপালি নীরব।" *(শব : মহাপৃথিবী)*

এ-ধরনের অনুমানের কারণ আছে। মৃণালিনী ঘোষালকে আমরা অন্য একটি কবিতায় আর-একবার দেখতে পেয়েছি, তখন সে 'সরোজিনী'।

"এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে;—জানি না সে এইখানে
শুয়ে আছে কিনা।
অনেক হয়েছে শোয়া; তারপর একদিন চলে গেছে
কোন্ দূর মেঘে।
অন্ধকার শেষ হলে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে :"

এর সঙ্গে যোগ করা যাক নিচের পংক্তিগুলি : *(সপ্তক : সাতটি তারার তিমির)*

"—কীটে মৃণালকাঁটায় অনিকেত
শাদা রঙের সরোজিনীর মুখের দিকে চেয়ে,
কী এক গভীর বসে থাকার বিষণ্নতার কিরণে ক্ষয় পেয়ে
নারি তোমায় ভাবা যেত।" *(নারী সবিতা : বেলা-অবেলা-কালবেলা)*

বনের লতা, শাদা শিউলি আর মূর্ছিত পদ্ম বাংলাদেশের মেয়ে হয়ে জীবনানন্দের কবিতার জগতে চলাফেরা করে, আমরা তাদের ধূসর শাড়ির শব্দ ও গন্ধ পাই।

জীবনানন্দের কাছে প্রকৃতি জড় পদার্থের সমাবেশ নয়, প্রকৃতি মানুষের আত্মার আত্মীয়, প্রকৃতি প্রতীকের জননী। (যেমন, কার্তিক মাঠের চাঁদ অতীতের অনুভূতির প্রতীক, ধান-কাঁটা মাঠ বিরহ অথবা হৃতসর্বস্ব সভ্যতার প্রতীক, নক্ষত্র শাশ্বত মূল্যের প্রতীক, খসে-পড়া নক্ষত্র বিনষ্ট শাশ্বত মূল্যের প্রতীক ইত্যাদি)।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন : "লক্ষ্য করিতে হইবে জীবনানন্দের কবিতায় ফুল নাই। (ধূসর পাণ্ডুলিপির পরে মাঝে মাঝে কবিচিত্তের কুয়াশা কাটিবার উপক্রম হইয়াছিল। এই সময় দৈবাৎ কোনো কবিতায় ফুল দেখা দিয়াছে। যেমন 'সব চেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো'—সুদর্শনা : বনলতা সেন)।" এ-কথা সত্য নয়। জীবনানন্দের কবিতায়, বিশেষত রূপসী বাঙলা'য় কম ফুলের উল্লেখ নেই। 'রূপসী বাঙলা'র কবিতাগুলি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'বনলতা সেনে'র মধ্যবর্তীকালের রচনা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেও ফুলের উল্লেখ আছে। যেমন, 'নারীর অধরে/চুলে-চোখে-জুঁয়ের নিশ্বাসে'/অথবা 'শসাফুল—দু' একটা নষ্ট শাদা শসা',—

'বনলতা সেন থেকে আরো দুটি উদাহরণ :

(ক) 'নীল আকাশে খরক্ষেতের সোনালী ফুলের মতো অজস্র তারা,

(খ) 'যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতী-সৌরভে।'

১৩৫৪ সালে রচিত (কবি কর্তৃক পরে ঈষৎ পরিবর্তিত) একটি কবিতার নামই 'রজনীগন্ধা'। সেখানে কবি লিখেছেন :

রজনীগন্ধার ফুলে মৌমাছির কাছে
কেউ নেই, কিছু নেই, তবু মুখোমুখি
এক আশাতীত ফুল আছে।'

'রূপসী বাঙলা' কাব্যগ্রন্থে অজস্র ফুলের উল্লেখ আছে—যেমন, গোলাপ, পদ্ম, চাঁপা, বেলকুঁড়ি, শেফালী, অপরাজিতা, ভাঁট ফুল, আনারস ফুল, বাসক ফুল, কলমী ফুল, সজিনার ফুল, ভেরেণ্ডা ফুল, দ্রোণ ফুল, ঘাস ফুল ইত্যাদি। নিচে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

(ক) 'একদিন নক্ষত্রের দেশে তারা হয়ে রবে গোলাপের মতন রক্তিম।'
(রূপসী বাঙলা)

(খ) '—হয়তো সে কন্যার হৃদয়
শঙ্খের মতন রুক্ষ, অথবা পদ্মের মতো।" *(ঐ)*

(গ) 'তাদের দেহের গন্ধ, চাঁপা ফুল মাখা ম্লান চুলের বিন্যাস
ঘাস আজো ঢেকে আছে; *(ঐ)*

(ঘ) 'সেই সব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি-ছাওয়া পথ—ধোঁয়া ওঠা ভাত, *(ঐ)*

(ঙ) 'যখন হলুদ বোঁটা শেফালীর কোনো এক নরম শরতে' *(ঐ)*

(চ) 'অপরাজিতার মতো নীল হয়ে—আরো নীল আরো নীল হয়ে *(ঐ)*

ডঃ সুকুমার সেন আরো বলেছেন : "রবীন্দ্রনাথের ঘাস নবনবায়মান চিরন্তন প্রাণ প্রবাহের প্রতীক, জীবনানন্দের ঘাস পশুদের মত উপভোগের (Munching and wallowing) প্রতীক।' অন্যত্র তিনি বলেছেন : "ঘাসের কদর কোমলতার ও খাদ্যত্বের জন্য।"

আমাদের কাছে এ-কথাও সত্য বলে মনে হয় না। জীবনানন্দের কাছে ঘাস সজীবতার প্রতীক, সকল ক্লান্তির শুশ্রূষা ও গভীর প্রশান্তির প্রতীক, এক কথায় 'নবনবায়মান চিরন্তন প্রাণ প্রবাহের প্রতীক'। এক্ষেত্রে ঐতিহ্য থেকে জীবনানন্দ অনাবশ্যক দূরে সরে যাননি :

(ক) 'সব চেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো ;'
(সুদর্শনা : বনলতা সেন)

(খ) 'অতি দূর সমুদ্রের পর'
হালভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে, *(বনলতা সেন : বনলতা সেন)*

(গ) পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'-জনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে'। (রূপসী বাঙলা)

(ঘ) 'দেখেছি সবুজ ঘাস—যতদূর চোখ যেতে পারে :
ঘাসের প্রকাশ আমি দেখিয়াছি অবিরল,—পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনারে
ঢেকে আছে; *(ঐ)*

(ঙ) 'রাঙারোদ, শালিধান, ঘাঁস, কাশ, মরালেরা বারবার রাখিতেছে ঢেকে
আমাদের রুক্ষপ্রশ্ন, ক্লান্ত ক্ষুধা, স্ফুট মৃত্যু—আমাদের বিস্মিত নীরব
রেখে দেয়—পৃথিবীর পক্ষে আমি কেটেছি আঁচড় ঢের—অশ্রু গেছি রেখে
তবু ঐ মরালীরা কাশ ধান রোদ ঘাস এসে মুছে দেয় সব'। *(ঐ)*

'বনলতা সেন'-এর 'ঘাস' অথবা 'শিকার কবিতায় যেখানে হরিণেরা 'কচি বাতাবি লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে' অথবা 'সাতটি তারার তিমির'-এ 'ঘোড়া' অথবা 'মহাপৃথিবী'র 'নিরালোক' কবিতায় যেখানে হামিদের কানা ঘোড়া অথবা 'মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে' সেখানেও ঘাসের কদর কেবলমাত্র খাদ্যত্বের জন্য এমন কোনো মনোভঙ্গি প্রকাশ পায়নি।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে জীবনানন্দ যেমন বিনষ্টশ্রী হেমন্তের মধ্যে নতুন সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন 'রূপসী বাঙলা'য় তেমনই বিধ্বস্ত বাংলার বিষণ্ণতার মধ্যে নতুন রূপ ও ঐশ্বর্য বিস্ময়ের চোখে দেখেছেন। বর্তমান বাংলার ধ্বংসরূপ তিনি দেখেছেন, তার জন্য গভীর বেদনাও অনুভব করেছেন, তবু দেশের শ্রীহীনতার মধ্যেও তিনি এমন কিছু সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে কবিতা লেখা সম্ভব। বাংলাদেশ (পূর্ব বাংলা) তার অশ্বত্থ, বট, তেঁতুল, আম, জাম, কাঁঠাল, হিজল, গাছ, বঁইচি, শেয়ালকাঁটা, হেলেঞ্চা-কলমীর বন, ভেরেণ্ডা, অপরাজিতা, আকন্দ, ভাঁট, কলমীর ফুল, ডাঁশা আম, কামরাঙা, কুল, আতা, নাটা, কাঁটাবহরের ফল, শালিখ, দোয়েল, শ্যামা, খঞ্জনা, চড়াই, বউকথাকও, পাখি, কাঁচপোকা, গুবরে পোকা, শ্যামা পোকা, ফড়িং, ঝিঁ ঝিঁ, সাপমাসা, সরপুঁটি, শামুক, গুগ্‌লি—সবকিছু নিয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তার সংগে এসে মিশেছে, অতীত বাংলার ধূপের গন্ধ :

(ক) মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ সম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীলছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল :

(খ) আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার
সনকার মুখ আমি দেখি নাকি? বিষণ্ন মলিন ক্লান্ত কিযে
সত্য সব;—তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।

(গ) বেহুলাও একদিন গাঙ্গড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণাদ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—

সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁট ফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

(ঘ) কেউ নাই কোনোদিকে—তবু যদি জ্যোৎস্নায় পেতে থাক কান
শুনিবে বাতাসে শব্দ : 'ঘোড়া চড়ে কই যাও হে রায় রায়ান'

(ঙ) নদীটির জল
বাঙালী মেয়ের মতো বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর কপাটে
আঘাত করিয়া যাবে ভয়ে ভয়ে—

(চ) আসিয়াছে চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার :
শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা; মৃত কত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।

উদ্ধৃতিগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, অতীত বাংলা যেন বর্তমান বাংলার মুখ দিয়ে কথা কয়ে উঠেছে। তাই যখন কোনো সমালোচক বলেন : 'বাংলাদেশের নিজস্ব প্রকৃতির এমন নিপুণ ঘনিষ্ঠ চিত্র এঁকেও তাঁর কবিতা পড়ে কখনোই মনে হয় না, তিনি বাংলার কোনো ট্রাডিশনের সঙ্গেই নিজের মানসিকতাকে যুক্ত রেখেছিলেন, বাংলাদেশের কোনো প্রচলিত কাহিনী, পুরাণ, বাংলার পুরনো দিনের কবিকর্ম....তিনি পড়েছেন বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, এতই তিনি ট্রাডিশন থেকে বিচ্যুত।' (কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল-অরুণ ভট্টাচার্য) তখন সঙ্গত কারণেই আমাদের পক্ষে তাঁর কথায় সমর্থন জানানো সম্ভব হয় না।

প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

প্রকৃতির প্রতি জীবনানন্দের অনুভব ও আনুগত্য। 'ঝরা পালক' জীবনানন্দের প্রস্তুতিপর্বের কাব্যগ্রন্থ। এখানে কবির উপলব্ধি হয়েছে যে তিনি এখনো পূর্বজ কবিদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি, কি করে তিনি সেই প্রভাব এড়াবেন তারই প্রয়াস রয়েছে এখানে। তাই 'ঝরা পালকে' যদিও কবির প্রকৃতিবীক্ষণ রয়েছে—তবু বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। পূর্বসুরী আর পাঁচজন কবির মতোই প্রকৃতিকে স্পর্শ করেছেন ও ভোগ করেছেন। প্রকৃতি এখনো কবির কাছে তার রহস্যের গুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচন করতে পারছে না।

আমি কবি,—সেই কবি;—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি!
আন্‌মনা আমি চেয়ে নাকি দূর হিঙুল-মেঘের পানে!
মৌন নীলের ইশারায় কোন্ কামনা জাগিছে প্রাণে!
বুকের বাদল উঠিছে কোন্ কাজরীর গানে!
দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি!

কিংবা,

হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছে মায়াবী।
জনতার কোলাহলে একা বসে ভাবি
কোন্ দূর যাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী!
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা!
চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধির লিপিকা
জ্বলে ওঠে অন্তহারা আকাশের গৌরী দীপশিখা!

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদৃষ্টির প্রভাব যে কবি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি, তা স্পষ্টই বোঝা গেল, কিন্তু এসময় কবির কাছে প্রধান সমস্যা হলো—রবীন্দ্র প্রভাব থেকে কি করে মুক্তিলাভ করা যায়, কি করে নতুন বাণী নতুন সুর শোনানো যায়। পূর্বশ্রুত সুরের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়; রবীন্দ্রনাথের পথে চলা কোনো কাজের নয়, তাই নতুন

দৃষ্টিতে তাকাতে হবে চারদিকে, নতুন দৃষ্টিকোণের জ্যামিতিক বিন্দু খুঁজতে হবে 'ঝরা পালকে' এই সাধনা স্পষ্টতা লাভ করেছে এবং ধূসর পাণ্ডুলিপির রচনার কালেই তিনি নিজের ভুবনে পৌছবার সরণি খুঁজে পেয়েছেন!

জীবনানন্দের কাছে প্রকৃতি কখনো আধার, কখনো বা আধেয়। জীবনের সকল দুঃখ দুর্দশার মধ্যে শান্তি নিহিত রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে। কবি প্রকৃতিকেই শান্তি ও স্থৈর্যের পরম আশ্রয়ের আধার বলে মেনে নিয়েছেন, তাই নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা ও অভিশাপে যখনই দগ্ধ হয়েছেন—তখনই তিনি আহত মন নিয়ে শান্তির আগার প্রকৃতির কাছে আশ্রয়কামী হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

আবার কোথাও প্রকৃতিও কবির মানসিকতার মধ্যে সমীভূত হয়ে অবস্থান করছে দেখতে পাওয়া যায়, তখন প্রকৃতির রসই তাঁর কাব্যের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি সেখানে যেন আধেয়, তাঁর কাব্যে আশ্রিত।

রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে;
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে! সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল—
চেনে নাই তারে অই সমুদ্রের জল!

কবির কাছে প্রকৃতি কোথাও পটভূমি; কবির মনোজগতের বিবিধবোধের পরিপোষণে আলম্বন বিভাবের মতো পরিবেশ রচনার কাজে ব্যাপৃত। প্রকৃতির তন্ময়তায় কবি তাঁর মন্ময় সত্তাকে মিশিয়ে দিয়েছেন, বিশেষ করে দুটি ক্ষেত্রে—কবি যখনই ঘাসের সবুজ রসের উন্মাদনার কথা ভাবেন, আর রিক্তফসল হেমন্তের বন্ধ্যারূপ দেখেন তখন তিনি প্রকৃতিলগ্ন, প্রকৃতির রসে আকণ্ঠমগ্ন, অর্থাৎ তাঁর চৈতন্য তখন

আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত!—
যে-নক্ষত্র মরে যায়, তাঁহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থ থেকেই কবি নিজের স্বাতন্ত্র্যের সাম্রাজ্যে দখলী পত্তন নিয়েছেন। এই গ্রন্থের কবিতার বর্ণনায় 'উত্তররৈবিক' (এই শব্দটি রবীন্দ্রোত্তর শব্দের বদলে কবিই মনে হয় প্রথম ব্যবহার করেছেন) ভাষা এবং বিন্যাস, উপমা ব্যবহারে নতুন লাবণ্য এবং কোমল পেলবতা দেখা গেল। সেই সংগে 'ঝরা পালকে' তাঁর ভাবুকতায় কারুণ্য ও বেদনার যে বোধ বীজাকারে প্রসুপ্ত ছিল—তার অঙ্কুরোদগম ঘটলো। কবির বিষাদ কাব্যায়িত হতে শুরু করলো, নারী প্রেমের বেদনা স্বীকৃত হলো, কিন্তু প্রকৃতির প্রতি তার ভালবাসার বদল ঘটলো না নিমগ্নতা গভীরতর হলো। কারণ প্রকৃতিকে ভালবেসে ব্যর্থতা নেই।

যদিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রেমের ধূসর স্মৃতি ও তার বেদনার প্রকাশ, তবু প্রকৃতির রূপায়ণও এখানে উল্লেখযোগ্য। কবির বিষণ্ন প্রেমের স্মৃতির উপভোগ্যতা ঘটেছে প্রকৃতির পটভূমিতে, তাই পটভূমি হিসেবে প্রকৃতিকেও কখনো-সখনো তাঁর ধূসর মনে হয়েছে বটে, তবু প্রকৃতির মধ্যে এক সহজ শান্তি রয়েছে। মানবীকে নিবেদিত প্রেমে কখনো প্রীতি, কখনো বা স্মৃতির ধূসরতা, কখনো সুখ, কখনো বা বেদনার অতল গভীরতা। কিন্তু প্রকৃতিকে ভালবেসে বেদনা পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। নারীর মতো নিষ্ঠুর নয় প্রকৃতি। যেমন করেই কবি প্রকৃতিকে ভালবাসুন না, প্রকৃতি মুখ ফেরায় না, শান্তির আশ্রয়ে টেনে কল্যাণ হস্ত বুলিয়ে দিতে কার্পণ্য করে না। নির্জন খড়ের মাঠে পৌষ সন্ধ্যায় রূপের কুহকে কবি মুগ্ধ হন, মাঠের পারে "নরম নদীর নারী" কুয়াশার ফুল ছড়াতে ছড়াতে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝরে পড়ে আকন্দ-ধুঁধুল গাছের, প্রায়ান্ধকার পাতার ফাঁকে ফাঁকে, যে মাঠে ফসল নেই, তার শিয়রে চুপ করে এসে চাঁদ দাঁড়িয়ে কি যেন দেখে—এই সব প্রকৃতির বিস্ময়ে মুগ্ধ হলে ঠকবার যেমন ভয় থাকে না, সেই রূপমুগ্ধতায় তেমনি কোনো ফাঁকিও নেই।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থ থেকেই কবির যেমন বিচ্ছিন্নতার সুর, বিষণ্ন চেতনার ভারাক্রান্ত আভাস, প্রকৃতি-চেতনাতেও তার অনুরণন! শহরে ক্লান্তি, চিন্তা, যুগযন্ত্রণা, সে তুলনায় পল্লী প্রকৃতিতে নরম মাটির স্নেহ, জ্যোৎস্নাভরা অপরূপ রাত, বাতাবী লেবুর ঘ্রাণ, ঘাস, রোদ মাছরাঙা, নক্ষত্র আকাশ, নির্জন মাছের চোখ, পুকুরের পারের হাঁস, শরতের নীলিমার ছোঁয়া, ধানসিঁড়ি নদীর উচ্ছ্বাস, শরহোগলার বন—কবির কাছে সুশান্তির এক নিশ্চিন্ত ভুবনের দরজা মুক্ত করে দেয়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কাল থেকেই কবি এমন করে চোখ দিয়ে দেখে কান দিয়ে শুনে মন দিয়ে ভালবেসে প্রকৃতিকে গ্রহণ করতে শিখলেন—'রূপসী বাঙলা'তে এই বোধের আরো গাঢ়তা দেখা গেল। শুধু ইন্দ্রিয়ঘনত্ব নয়—তার সংগে মিললো ইতিহাস-চেতনা। রূপসী বাঙলার প্রকৃতি এক একটি দৃশ্যের উন্মোচনে নিজেকে অভিব্যক্ত করেছে কবির কাছে, কবি সেই রূপসুধা পান করেই তৃপ্ত! শহর, সভ্যতা, যন্ত্র এবং বিজ্ঞাননির্ভর সুখী জীবন—তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে!

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবির মনে বিষণ্নতার যে ধূসর ছায়া জমলো, 'রূপসী বাঙলা'র সনেটগুলির মধ্যেও বিষাদের সেই অবলেপ দেখা গেল। পল্লী বাংলার রূপের সৌন্দর্য দেখেও কবি কেমন ব্যথাতুর এক কারুণ্যকে সঞ্চারিত করেছেন তাঁর বর্ণনার মধ্যে—

আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে
পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে
ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে,
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদে সেই শ্যামা আজো আসে,
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি পরে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে—আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা,
যেইখানে সবচেয়ে বেশি রূপ—সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্নতা;

যেখানে শুকায় পদ্ম—বহুদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব;
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মাণিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন, বাজিবে কি আর!

পাণ্ডুর বিষণ্ন মানসিকতার অজেয় প্রভাব কাটানো কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি, তাই প্রকৃতির অন্তর্লোকের রহস্যে অবাধ ও অনায়াস অবগাহন সত্ত্বেও কবির কেমন একটা আর্তি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

একথা ঠিক যে জীবনানন্দের প্রকৃতি বর্ণনার একটা বড় ভগ্নাংশ হেমন্তের ঋতুকে কেন্দ্র করে; এবং হেমন্তের ফসলপূর্ণ সমৃদ্ধ রূপের কথার চেয়ে রিক্তঋদ্ধি ও শূন্যফসল হেমন্তের ধূসর রূপের প্রতিই কবির মনোযোগ বেশি। হেমন্তের পাতা ঝরার কারুণ্যটুকুও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি; হেমন্তের শিশির টুপটাপ ঝরছে—তার স্পন্দিত বিষাদমাখা ধ্বনিটুকু পর্যন্ত তিনি আগ্রহ নিয়ে শুনেছেন; শস্যশূন্য রিক্তফসল মাঠ, ধান কেটে নেওয়া বিরান জমি, শুকনো খড়—এই শূন্যতার চিত্রগুলি জীবনানন্দ ওস্তাদ শিল্পীর মতো শব্দের রেখায় একরঙা করে ফুটিয়ে তুলেছেন এর কারণ কবির মানসিকতায় রয়েছে। বিষণ্নমনস্ক, শূন্য, বিচ্ছিন্নতা-জর্জর কবি—প্রকৃতির চারদিকে রিক্ততা এবং বন্ধ্যাত্বকেই দেখতে পাচ্ছেন, হেমন্তের মাঠে-মাঠে শুধু শিশিরের জল ঝরছে—

অঘ্রাণের নদীটির শ্বাসে
হিম হয়ে আসে
বাঁশ পাতা—মরা ঘাস—আকামের তারা।

রিক্ত প্রকৃতিকে আধাররূপে বলতে গিয়ে প্রেমের বোধকে প্রকৃতি চেতনার সমতটে এনে হাজির করেছেন। পঁচিশটা বছর ঘুরে গেলেও ফের দেখা করার যে অনুরোধ ও আশ্বাস ছিল, প্রেমের সেই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার সফলতা নেই—বলতে গিয়েও কবি বলেছেন যে প্রকৃতি ঠিকই পঁচিশ বছর পরেও সমান ধুসর চেহারায় ঘুরে ঘুরে আসে,—সেই পরিপার্শ্বে আসে না শুধু সে।

শসাফুল—দু-একটা নষ্ট শাদা শসা—
মাকড়ের ছেঁড়া জাল,—শুকনো মাকড়সা
লতায়—পাতায়—
ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে পথ চেনা যায়;—
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়,—ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে-মাঠে, ক্ষুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে।

হেমন্ত এসে গেলে চিলের সোনালি ডানা হয়ে যায় খয়েরি, ঘুঘুর পালক ঝরে পড়ে। চারিদিকে ধূসর রুক্ষতা, শীর্ণতা, নিষ্প্রাণতা—"ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।"

শুধু হেমন্তের রুক্ষ রূপের দিকে তাকিয়েই কবি ক্ষান্ত নন, বুঝি তিনিও বিবর্ণ হলুদ হয়ে ঝরে পড়েছেন—

বনের পাতার মত কুয়াশায় হলুদ না হতে,
হেমন্ত আসার আগে হিম হয়ে পড়ে গেছি ঝরে!

কিংবা, প্রকৃতি তাঁর দিকে তাকিয়েই বুঝি বা বিবর্ণ হয়েছে—

মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে,—ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়-নাড়া—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল!

হেমন্তের শুধু খরা রূপ নয়, ভরা রূপেও কবি মুগ্ধ হয়েছেন। শুধু শূন্যতা নয় পূর্ণতার রূপও আমরা তাঁর কাব্যে পাই। যেমন—

চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল!
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণেভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মত করে,
যেই রোদ একবার এসে শুধু চলে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধরে
আহ্লাদের অবসাদে ভরে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া—রোদ—ক্ষুদ—কুঁড়া—কার্তিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আর্জ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ!
আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর ওপারে
বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝরে পড়ে তাঁর—
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে!
আজো তবু ফুরায়নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে-মাঠে ঝরে পড়ে-কাঁচা রোদ,—ভাঁড়ারের রস!

ফলন্ত ধানের গন্ধে চারিদিক ভরে গেছে, রঙে তার সতেজ নবীনতা, তার স্বাদে আমাদের সকলের দেহ ভরে উঠবে! অবশ্য অবসরের এই গান, ভরা হেমন্তের রূপবতী প্রকৃতির এই ঋদ্ধ গরবিনী রূপ বেশিক্ষণের জন্যে নয়!

আমাদের অবসর বেশি নয়,—ভালবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয়!
তখন শান্তি সৌন্দর্যের বদল ঘটে, তখন 'গেঁয়ো মাঠের রগড়' থেমে যায়।
হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ-ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার পর,
মদের ফোঁটার শেষ হয়ে গেছে এ-মাঠের মাটির ভিতর!

তখন সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা সব, হয়ে গেছে আকাশ ধবল,
চলে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড় মেয়েদের দল!

জীবনানন্দ বাংলাদেশকেই দেখেছেন, ভালবেসেছেন, বাংলার মুখ দেখেই তিনি রূপতন্ময়, ভাববিভোর; পৃথিবীর আর কোথাও যাবার দরকার হয়নি। এই বাংলাদেশের প্রকৃতিলোকে যে সব তুচ্ছ ঘটনা ঘটেছে—সেগুলিও কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। অভিজাত সজ্জা নিয়ে প্রকৃতি যেখানে বাহারে নয়, কবির নিগূঢ় ভালবাসা সেই তুচ্ছ বস্তুটিকে কেন্দ্র করে ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতিরাজ্যের ছোটবড় নানা দ্রব্য, অপাংক্তেয় এবং তুচ্ছ সামগ্রীও মহিমান্বিত মর্যাদায় উচ্চের সংগে, অভিজাতের সংগে সমান আদরে একই আসনে সহাবস্থান করেছে। বিরাটের মধ্যেই যে শুধু সাব্লাইমকে উপলব্ধি করা যায়, এমন নয়, অনভিজাত ছোটর মধ্যেও এক মাহাত্ম্য আছে, জীবনানন্দ তা ব্যক্ত করতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হননি।—

একদিন কোন এক আঞ্জির গাছের ডালে সকালের রোদের ভিতর
সোনালি সবুজ এক ডোরাকাটা রাক্ষুসে মাকড়কে আমি
একটি মিহিন সুতো নিয়ে দুলে নির্জন বাতাসে
দেখেছি স্বর্গের দিকে পৃথিবীর দিকে এল নেমে।

ডুমুর গাছে বসে-থাকা ভোরের দোয়েল পাখিটির চোখের বিস্ময় পর্যন্ত কবি মহান্ সমারোহের সঙ্গে বর্ণনা করেন—

অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ।

শহর-জীবনের প্রতি কবির কেমন একটা বৈরাগ্য ছিল—শহরে মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস, প্রতারণা, জীবন-যুদ্ধে অসহায় সৈনিকের মতো অন্তরে অবলীন ক্ষোভ. এখানে মানুষ অকারণে অন্তরীণ। শহরের কোলাহলে বাঁচার দায় মিশে থাকে, কিন্তু মন মুক্তি পায় না, অথচ জীবনের fever and fret থেকে কবির মন কেবলই মুক্তি চাইছে। তাই পল্লীপ্রকৃতির প্রতি তাঁর টান স্বাভাবিক। পল্লীপ্রকৃতির চিরায়ত রূপের তিনি যেন সাধক ভক্ত। কখনো বা পল্লীর চিরন্তন সৌন্দর্য-প্রতিমার মুগ্ধ সেবক। কখনো আবার গভীর বিস্ময়ে এবং অপার আবেগে পল্লীর চিরায়ত মাধুর্য ভোগ করতে উৎসুক। এই আবেগ এবং ঔৎসুক্যের জন্যেই তিনি পল্লী প্রকৃতিকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। ফলে প্রকৃতির তাবৎ সামগ্রীই তাঁর কাছে যেমন সৌন্দর্যের আকার মনে হয়েছে, তেমনই তাঁর আবেগও ইন্দ্রিয়ঘন হয়ে উঠেছে।

তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যের চিরন্তনতায় বিশ্বাসী ছিলেন, প্রকৃতির আদিমতার কাছে কেউ নয়, কিছু নয়; মানুষের সভ্যতা গড়ে-ভাঙে, জ্বলে-নেভে আসে-যায়, তা সে সভ্যতা যত বড় আর যত বিরাটই হোক না কেন। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরকালবাহিত, এর ক্ষয় নেই, লয় নেই—চিরকাল পৃথিবীর সৌন্দর্যের সব গল্পই বেঁচে থাকবে—

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।
আমি চলে যাব বলে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
চারিদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব;
খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে,
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল;—
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে দেখুক বা না দেখুক, চিরায়ত সৌন্দর্যরাশির তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের গড়া বাড়িঘর ধসে পড়ে, লৌহযুগের পর প্লাস্টিক যুগ আসতে পারে—কিন্তু প্রকৃতির রূপ, পৃথিবীর গল্প 'বেঁচে রবে চিরকাল।' রাজ-রাজড়ার প্রতিবেদনও হারায়। কোন্ রাজপুত্র ঘোড়ায় চেপে বাংলার পল্লীর পথে কি যে খুঁজে গেছে—তা আজ হারিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে পর্যায় শেষ হলেও প্রকৃতি নিজের অমলিন মূর্তি নিয়ে তেমনই দাঁড়িয়ে আছে। কবি জানেন অমোঘ নিয়মে বস্তুরূপের লয় হয়, এক যায় আর আসে—এই ধারাবাহিকতার সূত্র ধরেই চিরন্তনতা। যদিও পল্লীর হাঁস, নারী—সবই 'দূরে নিরুদ্দেশে চলে যায় কুয়াশায়', তবু কবির কাছে তারা হারায় না। বাংলার মুখ দেখেই তার গভীর স্বস্তি, পরম পরিতৃপ্তি।

শুধু বাংলার প্রকৃতিকে দেখেই কবি তৃপ্ত নন, সেই প্রকৃতিলীন যে-সব নারী ও পুরুষ বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে—এদেশের সাহিত্যে ও ইতিহাসে—কবি তাদের জীবনের উপলব্ধিরও অংশভাক্ হয়েছেন—

মনে হয়,

এ নদী কি কালীদহ নয়? আহা ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার সনকার মুখ আমি দেখি না কি? বিষণ্ন মলিন ক্লান্ত কি যে

সত্য সব;—তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।

কালীদহে আজ বাদলের কালে মেঘের ছায়ায় তাঁর মনে চাঁদ সদাগরের কথা তার মধুকর ডিঙাটির কথা, এই কালীদহেই কবে যেন একদিন সেই ডিঙা ঝড়ের আকাশের নিচে পড়েছিল। ঐ নদী বা দহের ঘাটে "এলানো খোঁপার সনকার মুখ" পর্যন্ত কবি দেখে থাকবেন। আজকের গাংশালিখ দেখেও কবির মনে হচ্ছে—তখনও এই সব পাখিগুলি ছিল,—প্রকৃতি তার রূপ নিয়ে আবহমান কাল ধরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কোথাও আবার প্রকৃতির রূপ এবং লোকগাথার মাধুর্য কবির কাছে এক হয়ে গেছে।

সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়—
ইহাদের ঘোড়া আজো অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙে চলে যায়—
এই ঘাস : এরি নিচে কঙ্কাবতী শঙ্খমালা করিতেছে বাস :
তাদের দেহের গন্ধ, চাঁপা ফুল ম্লান মাথা চুলের বিন্যাস
ঘাসে আবচা ঢেকে আছে।

এতদসত্ত্বেও একটা কথা বলা দরকার। পল্লীসৌন্দর্যের রূপসুধা কবি আকণ্ঠ পান করেছেন, তাঁর ইন্দ্রিয় ঘন চেতনার মাধ্যমে আমরাও পল্লীর রূপে মুগ্ধ,—তবু, কবির বিষণ্ণমনস্কতার এক কারুণ্য এই সৌন্দর্য-চেতনাকে ক্লান্ত অবসন্ন করে ফেলেছে। অনেক কবিতায় যেমন তাঁর মৃত্যু চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি পল্লী থেকে প্রাচীন সৌন্দর্য-নিকেতনগুলি ধ্বংসের পথে ঢলে পড়েছে, অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে—তাও কবি লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য কবির কারুণ্য ও বিষাদ যে সে জন্যেই—এমন কথা বলি না, বিষাদ তাঁর মানস-লক্ষণের একটি উজ্জ্বল অভিজ্ঞান—বরাবরই তার অভিব্যক্তি আমরা কোনও-না-কোনভাবে দেখেছি। 'রূপসী বাঙলা'র সনেটগুলিতে অমলিন কারুণ্যের, প্রকাশ রয়েছে—

আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে
পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে
ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে,
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি পরে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে—আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা;
যেইখানে সবচেয়ে বেশি রূপ—সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা;
যেখানে শুকায় পদ্ম—বহুদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব;
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মাণিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনো দিন বাজিবে কি আর!

এই বিষণ্ণ বাংলার গতশ্রী সৌন্দর্যেও তিনি যুগপৎ বিস্ময় ও বেদনা বোধ করেছেন।

'মহাপৃথিবী' কিংবা 'বনলতা সেন' গ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রকৃতির স্বাদভিন্নতা লক্ষ্য করা যাবে। এখানকার কবিতায় বাংলার প্রকৃতি নিছক নৈসর্গিক সৌন্দর্য-প্রতিমার প্রতিরূপ নয়। মানব-হৃদয়ের বিবিধ বোধের সংগে সংগতি রেখেই সেখানে প্রকৃতির রূপরঙ্গরসের উজ্জীবন।

অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু; বললে সে, 'ঘাসের ওপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিস্তব্ধতা কেমন যে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার
ছড়িয়ে পড়েছে জলে; কিছুক্ষণ অঘ্রাণের অস্পষ্ট জগতে

হাঁটলাম, চিল উড়ে চলে গেছে—কুয়াশার প্রান্তরের পথে
দু' একটা সজারুর আসা যাওয়া; উচ্ছল কলার
ঝাড়ে উড়ে চুপে সন্ধ্যার বাতাসে
লক্ষ্মীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার গলিতে নেমে আসে,
আমাদের জীবনের অনেক অতীতব্যাপ্তি আজো যেন লেগে
আছে বহতা পাখায়
ঐ সব পাখিদের; ঐ সব দূর দূর ধানক্ষেতে ছাতকুড়োমাখা
ক্লান্ত জামের শাখায়

কিংবা, যখন দেখি—

আলেয়ার মতো ঐ ধানগুলো নড়ে শূন্যে কি রকম অবাধ আকাশ
হয়ে যায়; সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
ধরে আছে বলে সে-ও সনাতন।

তখন আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে কবির দেখা-প্রকৃতি মানব হৃদয়ের অনুভূতির ক্ষেত্রে কেমন আসন বিছিয়ে চলেছে; মানুষের জীবনের বহু বোধ ও বিস্ময়ের মূলে প্রকৃতির যে দান—তা কখনো জীবনানন্দ বিস্মৃত হননি।

প্রকৃতির জগৎও বিরাট চালচিত্রে ব্যাপ্ততর হয়েছে, গ্রহ নক্ষত্রের ভুবনের সংগে বাঁধা পড়ে আছে; নক্ষত্রকে দেখে কবির বলতে বাধে না যে নীল আকাশের অজস্র তারা খই ক্ষেতের সোনালি ফুল। এই নক্ষত্রই আবার নারীর হৃদয়ের কামনা-বাসনা, ব্যথা-বিষণ্ণতা চুরি করে নিয়ে যায়, ফিরিয়ে দেয় না!

হৃদয়ের কামনা ব্যথা শেষ হয়ে গেছে কবে তার,
নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তারে আর।

যে-কথা বলে কবির প্রকৃতি পরিচয়ের প্রসংগ শুরু করেছি, সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে উপসংহার টানি—জীবনানন্দ হেমন্ত ঋতুরই কবি; হেমন্তের নানারূপ, বিবিধ রস, অপরিমেয় রঙের আসব পান করেই তাঁর পরিতুষ্টি, হেমন্তের পূর্ণছবি, বিচূর্ণ ছবি, অসম্পূর্ণ ছবি এঁকেই তাঁর পরিতৃপ্তি। হেমন্তের গ্রামবাংলায় আমরা যে যাইনি, বা সেই প্রকৃতিকে দেখিনি—তা নয়, তবে কবির মতো প্রাণরসে উজ্জ্বল হয়ে প্রকৃতিকে নিজের সত্তার গভীরে গ্রহণ করে এমনভাবে ভালবাসিনি!

প্রকৃতিকে জীবনানন্দ সচ্ছল সমৃদ্ধিতে এবং উচ্ছল প্রাণবত্তার নিশ্চিন্তভাবেই দেখেছেন। প্রকৃতি মানুষের মতোই সজীব; তাই ভোরের রোদের আদলটুকু বলতে গিয়ে শিশুর গালের কোমলতার সংগে তিনি তাকে উপমিত করেছেন; কিংবা; বাস্তব জগতের নারীর মতোই পল্লী প্রকৃতির চিরায়ত সৌন্দর্য কেমন করে মানুষকে মুগ্ধ করে, লুব্ধ করে—তা তিনি বলেছেন। এমনকি, কয়েকটি কবিতায় তিনি প্রকৃতি থেকেই বুঝি বা নারীদেহের নির্মিতি—এমন বিস্মিত সংশয়ে চঞ্চল ও অভিভূত হয়েছেন!

জীবনানন্দের ইন্দ্রিয়ঘনত্ব নিয়ে সকলেই বেশ কিছু আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের পুনরুল্লেখ বাঞ্ছনীয় নয়। জীবনানন্দ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে

প্রকৃতিকে উপভোগ করেছেন; চোখ দিয়ে প্রকৃতির রূপই শুধু দেখেছেন—এমন নয়, কান দিয়ে ধ্বনি শুনেছেন শুধু—তা নয়, মন দিয়েও তিনি ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুকে অনুভব করেছেন। তাঁর রোমান্টিক অনুভূতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে যখন তিনি এক ইন্দ্রিয়ের বস্তু অন্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। "ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল"—'বনলতা সেন' কবিতাটির এই পঙ্‌ক্তিটি জীবনানন্দের সকল পাঠকেরই বহুপঠিত লাইন। কেউ কি ভেবেছেন রোদের আবার গন্ধ কি? রৌদের বর্ণ তবু প্রতিভাত হয়, প্রাক্-সন্ধ্যার নিস্তেজ নরম রোদেরও একটা রঙ কল্পনা করা যায়—কিন্তু গন্ধ? রৌদ্রের বর্ণ নয়নেন্দ্রিয়ের ব্যাপার, গন্ধ হচ্ছে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের জগৎ; কবির ইন্দ্রিয় ঘনত্ব এমনই চূড়ান্ত ও গভীর! "ঘুমের ঘ্রাণ" "বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ" বলতেও সেই একই ব্যাপার।

তবে এখানে একটা কথা বলি। 'রৌদ্রের গন্ধ' বলতে কবি 'রৌদ্রটুকু' এই অর্থে গ্রহণ করেছেন বলে কারুর মনে হতে পারে, সাধারণ মুখের ভাষায় 'গন্ধ' শব্দটির এবং বিধ প্রয়োগও যে খুঁজে পাওয়া যায় না—তা নয়, আমরা ত' বলেই থাকি—'নাম গন্ধ নেই'। জীবনানন্দ 'রৌদ্রের গন্ধ' বলতে রৌদ্রটুকু বোঝাতে চাননি নিশ্চয়ই। কবির মানসিকতা এবং কাব্যব্যঞ্জনার দিক থেকেই শব্দার্থের উপলব্ধি করতে হবে। 'রৌদ্রের 'গন্ধে'র ক্ষেত্রে 'গন্ধ' পদাংশকে 'টুকু' পদাশ্রিত নির্দেশক বলে গ্রহণ করার তর্ক করলেও 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় 'বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ' বা সন্ধ্যার অন্ধকারে হাঁস 'ঘুমের ঘ্রাণ' পায়—প্রভৃতি চিত্রে দর্শনেন্দ্রিয়গত ছবি নয়, অন্য ইন্দ্রিয় স্বাদের চিত্রও অংকিত হয়েছে, একথা মানতেই হবে। বাতাস অঙ্গে লাগলে উপলব্ধ হয়—কবি চোখ দিয়ে দেখলেন—'প্রান্তরের সবুজ বাতাস।' কবি সহজেই উপলব্ধি করেন—"দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান্ রৌদ্রের আঘ্রাণ।" কবির এই ইন্দ্রিয়স্বাদের বৈচিত্র্যে তিনি প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে উপভোগ করতে পেরেছেন। তাঁর কাব্যের প্রকৃতিচেতনার এ এক অনন্য-বৈশিষ্ট্য। 'হাওয়ার রাত' কবিতাটি যাঁরা তারিয়ে তারিয়ে উপলব্ধিরসের জারকে পাঠ ও পাক করেন—তাঁরাই কবির ইন্দ্রিয়ঘনত্বের গভীরতা সহজে ধরতে পারবেন,—আকাশের নক্ষত্র এবং সেই আকাশ—উপমিত হয়েছে কিভাবে এবং কার সঙ্গে—তা তখন বোঝা যাবে :

অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিল-পুরুষের শিশির—
ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করেছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা;
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করেছিলো বিশাল আকাশ!

বোঝা যাবে প্রকৃতিকে কোন্ গভীর অনুভূতি দিয়ে কবি নিজের মর্মলোকে স্থান করে দিয়েছেন!

জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনা

প্রদ্যুম্ন মিত্র

'জীবনানন্দ প্রকৃত কবি এবং প্রকৃতির কবি।' একথা সকলের আগে উচ্চারণ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু।[১] বলেছিলেন, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রসঙ্গে এবং তারও আট বছর পরে প্রকাশিত 'বনলতা সেন' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জীবনানন্দকে অভিহিত করেন 'নির্জনতম' বিশেষণে। জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির যে অধ্যায় সম্বন্ধে বুদ্ধদেব গভীর উৎসাহী ছিলেন, সে প্রসঙ্গে জীবনানন্দের এ উক্তি অবশ্যই স্মরণীয় :

ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে, আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর হাইরে কোথাও নয়।...তারপরে 'বনলতা সেন' এবং পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।[২]

এ স্মরণীয় কথাগুলির ওপর আপাতত কোনো মন্তব্য না করেই বলা যায়, বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখে এবং আদিপর্যায়ের কাব্যরচনার ওপর তাঁর ধারণার পরোক্ষ এবং প্রতিবাদহীন স্বীকৃতির মাধ্যমে জীবনানন্দ তাঁর নিজের প্রথমদিকের কবিতাবলীর প্রকৃতি-মগ্নতা স্বীকার করেই নিয়েছেন।

বস্তুত বাসভূমির সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের যে সম্পর্ক, মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতিরও তা-ই। সে অর্থে সকল কবির-ই কাব্যে প্রকৃতি উপস্থিত, প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে, কোথাও তা বিচরণভূমি অন্যত্র নীলাক্ষেত্র, কদাচিৎ কয়েকজনের তা একান্ত আবাস। শুধুমাত্র, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'বনলতা সেন' পাঠে জীবনানন্দ সম্পর্কে এ শেষতম বিশেষণটিই প্রয়োগ করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু অগ্রসর হয়ে যে পাঠক 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত পৌঁছাবেন, তাঁর পক্ষে সে ইচ্ছা আর অকুণ্ঠিত হবে না। 'মহাপৃথিবী'তে নিসর্গাশ্রিত কিছু কবিতা স্থান করে নিলেও 'সাতটি তারার তিমিরে' বিশুদ্ধ প্রকৃতি নিবিষ্ট কবিতা অনুপস্থিত বলবো। জীবনানন্দ নিজেই জানিয়েছেন, আবহমান মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের পটভূমিকায় দেখে তার-ই মধ্যে হতে তিনি 'উৎসনিরুক্তি' খুঁজে পাননি। তবু, কবি যে কখনো কখনো কোনোকিছুকে 'চরম' মনে করে নেন, সে এক বিশুদ্ধ কবিজগৎ সৃষ্টির-ই প্রয়াসে—সেখানে আত্মচেতনার 'শুদ্ধ মুকুরে' বাস্তবকে

১. 'কালের পুতুল', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'।
২. 'কবিতার কথা', 'কবিতা প্রসঙ্গে'।

ফলিয়ে দেখা যায়। প্রকৃতি, সমাজ ও সময়-অনুধ্যান—এ ত্রিভুবনচারী লিরিক কবির কাব্যসৃষ্টির কোনো কোনো অধ্যায়ে কোনো একটি 'ভুবন' প্রধান হয়ে ওঠে।[৩] কাব্যরচনার প্রথম পর্যায়ে জীবনানন্দের কাছে যে 'ভুবন' 'চরম' হয়ে উঠেছিল তা প্রকৃতিভুবন—নিসর্গের এক প্রশান্ত আশ্রয়। তবু, আমার বিশ্বাস, এ প্রকৃতিভুবন কোনোদিন-ই কবির কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়নি। তাঁর কাব্যে প্রকৃতি প্রথমাবধিই এক উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ব—কখনো তা মূলাধার, কখনো বা প্রেক্ষাপট, কিন্তু কোন সময়েই 'মানবসমাজের ঘটঘটায় দুর্নিরীক্ষ্য' হয়ে হারিয়ে যায় নি।

এ প্রাথমিক ভূমিকায় দেখাতে চেয়েছি, স্বীয় কাব্যের প্রকৃতিমগ্নতা সম্বন্ধে জীবনানন্দের নিজস্ব সচেতনতা যথেষ্টই ছিল এবং এ প্রকৃতিচেতনা তাঁর কাব্যসৃষ্টির সকল পর্যায়ে কম-বেশি সক্রিয় ছিল। আর একটি কথাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। জীবনানন্দ স্বয়ং বলেছেন, 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুর'-এ কবি যে চেতনার জগৎ সৃষ্টি ও আবিষ্কার করেন, তা কোনো সময়েই কেবলমাত্র প্রাতিভাসিক নয়। কেননা, সেখানে 'বাস্তব বাস্তব-ই থেকে যায় না'।[৪] জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনা প্রসঙ্গে একথা সর্বাংশে সত্য। তাঁর সার্থক রচনাগুলির সর্ব অবয়বে ছড়িয়ে থাকে প্রায়শই এমন এক প্রতীকী দ্যুতি, যা পরাবাস্তবতার আভাস বহন করে ফেরে। কাব্যরচনার নানা পর্যায়ের অনেকগুলি প্রকৃতিনিবিষ্ট কবিতা এ প্রতীকী সংকেতে সমৃদ্ধ থেকে জীবনানন্দের প্রকৃতি-চেতনাকে দিয়েছে এমন এক অনন্যতা, যা সমকালীন দেশী-বিদেশী অনেক কবির রচনাতেই বিরল। জীবনানন্দের প্রকৃতিজগৎ তাই প্রচলিত চিন্তাময় প্রভাবিত বর্ণনা অনুষঙ্গের কোনো জগৎ নয়—স্বতঃস্ফূর্তিতে উজ্জ্বল, স্বকীয় নির্মাণে বিশিষ্ট, বাংলা কবিতার পূর্বাপর ইতিহাসে বড় অনন্যপূর্ব, বোধ ও ইন্দ্রিয়বেদ্য এক কবিজগৎ। আরো একটি কথা থেকে যায়। এই যে বিশিষ্ট অর্থে জীবনানন্দীয় প্রকৃতিভুবন, তা প্রথমাবধিই তাঁর কাব্যে এক অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বের মতো উপস্থিত নয়। কাব্যরচনার বিভিন্ন পর্যায়ে, কবিচেতনার ভিন্ন ভিন্ন মগ্নতার রঙে ও সুরে, এ প্রকৃতিজগতের নব নব মূল্যায়ন ঘটেছে তাঁর কাব্যের প্রবহমান বিকাশে। 'ঝরাপালকে'র অনুকারী ঝংকার থেকে 'আলোপৃথিবী'র ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়ের মন্দ্র উচ্চারণ এমন এক সুদূরতম সিদ্ধি, যা বাংলা কবিতার ইতিহাসে তুলনাহীনভাবে বিরল। অথচ প্রথম কবিজীবনের সেই প্রভাবিত রচনাগুলি থেকে একেবারে শেষপর্যায়ের অনন্য কবিতাগুলি পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজিত থেকেছে প্রকৃতিচেতনার ধারাটি, কখনো একক একান্তভাবে, কখনো বা অন্যতমরূপে। তাই কাব্যরচনার বিভিন্ন পর্যায়-বিন্যস্ত বিশ্লেষণে এ বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় প্রকৃতিচেতনার স্বরূপটি সম্পর্কে অভিনিবিষ্ট পাঠকের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

রচনাকালপঞ্জি অনুসারে 'ঝরাপালক'ই জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত এ কাব্যগ্রন্থটি কবির কাছে অকিঞ্চিৎকর[৫] মনে হলেও আমরা তাকে সম্পূর্ণ

৩. 'কবিতা প্রসঙ্গে', 'কবিতার কথা'।
৪. 'কবিতা প্রসঙ্গে' : 'কবিতার কথা'।
৫. আদি সংস্করণ : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

উপেক্ষা করতে পারি না। পরবর্তী গ্রন্থ ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সনে, ন'বছর পরে। ‘রূপসী বাংলা’ নামে প্রকাশিত আর একটি মরণোত্তর সংকলনে এমন কিছু সনেট জাতীয় কবিতা গ্রথিত হয়েছে, যেগুলি বিষয় ও শৈলীর আন্তরাসাযুজ্যে ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র নিকটবর্তী। কালানুক্রমী যে কোনো নিরিখেই এ তিনটি কাব্য গ্রন্থ দিয়ে চিহ্নিত হবে জীবনানন্দের কাব্য সৃষ্টির প্রথম পর্যায়। ‘কবিতাভবন’ থেকে বুদ্ধদেব বসু প্রকাশ করেন জীবনানন্দের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ, আধুনিক বাংলা কবিতার সবচেয়ে উজ্জ্বল মোড়-ফেরা, ‘বনলতা সেন’ ১৩৪৯ বা ১৯৪২ সনে। ‘এক পয়সায়, একটি সিরিজের আদি সংস্করণ ‘বনলতা সেন’-এ ছিল মাত্র ষোলোটি কবিতা, যেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে বছর দুই পরে, ১৩৫১-এর শ্রাবণে প্রকাশিত হয় ‘মহাপৃথিবী’। এ দু'টি গ্রন্থ একত্রে চিহ্নিত করতে পারত তাঁর কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায়, যদি না অন্তত প্রকৃতি-ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুই গ্রন্থে আমরা লক্ষ্য করতাম বিষম প্রবণতা। কি আদি সংস্করণ ‘বনলতা সেন’ কি পরবর্তীকালের পরিবর্ধিত সিগনেট সংস্করণের কবিতাবলীতে লক্ষ্য করা যায় মানুষিক বাস্তবতার জগৎ থেকে নৈসর্কিক প্রশান্তির মধ্যে কবির চেতনার ক্রমাপসরণের এমন এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা, যা প্রকৃতির সত্তার মধ্যে খুঁজেছে অস্তিত্বের এক জৈব নিমজ্জন। ‘মহাপৃথিবী’তে এর-ই সমান্তরাল আগ্রহে উদ্দীপিত হয়েছে এক মর্ত্যমুখী আবর্তন; সমাজ ও সময়সীমায় বদ্ধ এক মানবিক পৃথিবী তার সমস্ত লোভ ও রিরংসার, রণ ও রক্তের প্রবলতর আকর্ষে কবিকে টেনে এনেছে দেশকালের চিহ্নিত ভূগোলে। এখানে রয়েছে প্রকৃতিচেতনার পাশাপাশি প্রতিবেশচেতনার আঘাত। এ প্রতিবেশ, দেশ, কাল ও সমাজ, তার মূল্যবোধের বিপর্যয়ে জীবনানন্দকে এ পর্যায় থেকেই এমন প্রবল আচ্ছন্ন ও সংক্ষুব্ধ করে রেখেছিল যে, তাঁর কাব্যসৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে, ‘সাতটি তারার তিমির’-এর মতন গ্রন্থে এবং তার সমকালীন কবিতাবলীতে, প্রকৃতি একরকম অনুপস্থিত-ই বলা যায়। ‘সাতটি তারার তিমির’ প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর আটচল্লিশে। মহাযুদ্ধ তার মূল্যবিনাশী অন্ধকারে তখনকার মতো এমন-ই সমাচ্ছন্ন করেছিল কবির চেতনা যে, প্রকৃতির প্রশান্তির আশ্বাস ও আশ্রয় বিচ্যুত দিশাহীনতায় এসময়কার বহু কবিতাই প্রতিকূল প্রতিবেশের বিষম আঘাত বহন করছে। কিন্তু উনিশশো পঞ্চাশের পর থেকে লেখা বহু কবিতায় আবার প্রকৃতির প্রত্যাবর্তন লক্ষণীয়। মরণোত্তর কিছু প্রকাশনায় প্রকৃতির অনিঃশেষ প্রশান্তির উজ্জ্বল উল্লেখ এমন-ই অপ্রতিরোধ্য শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত যে, মনে হয়, শেষ পর্যায়ের এসব কবিতাবলীতে কবির চেতনা বলয়িত হয়ে স্থিত হয়েছে বিশ্বাসের নতুন ভূমিতে : জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি ‘হেমন্তময়’ বলে দায়মুক্ত হওয়া যায় না; তাঁর প্রকৃতিচেতনায় পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, কীট্‌সীয় ইন্দ্রিয়বেদ্য রূপাবিষ্টতা থেকে প্রকৃতিভুবনে প্রশান্তির সন্ধান পাওয়া এবং প্রকৃতিশীল জীবন যাপনের ধারণা থেকে প্রকৃতি ও হৃদয়ের সমাহারে মর্মরিত হরিৎ আলোপৃথিবীর চেতনায় উত্তরণ।

প্রকৃতিচেতনার এ ক্রমপরিণতশীল উদ্বর্তনে 'ঝরাপালক' আক্ষরিক অর্থেই প্রায়-স্খলিত সেই বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় উদ্ভসন থেকে, যা বার বার এ প্রাচীন পৃথিবী এবং তার অনুসঙ্গী কান্তার নক্ষত্র, নদী...আম-বট-হিজলের শিরীষের অথবা নিমের' পরিচিত নিসর্গকে তাঁর কবিতায় এক অনন্য মহিমায় উপস্থিত করছে। কাব্যরচনার ইতিহাসে দেখা যায়, প্রথম আবির্ভাবে সৃষ্টির সপ্রতিভতা কখনো কখনো থাকলেও কোনো বড় শিল্পীর মহৎ স্বকীয়তা অনর্জিতই থাকে। 'ঝরাপালক' জীবনানন্দের প্রথম গ্রন্থ; তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানে অনুপস্থিত থাকবে তার স্বকীয় উচ্চারণ, বিষয়ের নিজস্ব উদ্ভাসন। এসব স্বীকার করে নিয়েও 'ঝরাপালক'-এর কথা বলতে গিয়ে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি জীবনানন্দের নিজের পৃথিবী থেকে এ গ্রন্থের সমূহ কবিতার অনতিক্রমনীয় দূরত্বের কথা ভেবে। এ গ্রন্থের কবিতাবলীতে অনুকৃতি এমন সোচ্চার ও উলঙ্গ যে, কিছু নজরুলী ঘোষণা, কিছু সত্যেনদত্তীয় ছন্দচপল লঘুমুহূর্ত আর দেহবাদিতা, যা মোহিতলালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এসব ছাড়া বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় না হোক, ঘনিষ্ঠ আন্তরিক উচ্চারণও বিরল। তবু, সত্যেনদত্তীয় ঝংকার থেকে বহুদূর এমন কিছু কিছু পঙ্‌ক্তির কথা বুদ্ধদেব বাবু বলেছেন[৬] যা অনুকার উচ্ছাসের মধ্যেও অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় জায়মান জীবনানন্দকেই। 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' উচ্চারণে ও আবহে প্রকৃত জীবনানন্দীয় আমেজ বহন করছে। 'ঝরাপালকের' আরো কিছু কবিতায় বিকীর্ণ রয়েছে এমন কিছু শব্দ, চিত্র ও বাক্‌ভঙ্গি যা নজরুল বা সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাববৃত্তের বাইরে। 'পিরামিড', 'নীলিমা', 'সেদিন এঃ ধরণীর' এবং 'নাবিক' চারটি কবিতাই এক ধরনের মনোযোগ দাবী করে; কিন্তু আমাদের আলোচনার ভিত্তির ওপর তেমন কোনো আলোকপাত করে না। আসলে আত্মপ্রকাশের এ পর্যায়ে প্রকৃতি সম্পর্কে কবির মনে কোনো নির্দিষ্ট ধারণা জন্ম নেয়নি। প্রচলিত চিন্তাময় প্রভাবিত সব কবিতার আবেগ উদ্বেল রচয়িতার কাছে প্রকৃতি তখন নিসর্গ দৃশ্য মাত্র। কবিতায় তার উপস্থিতি এক অঙ্কিত পশ্চাৎপটে—'বকের পাখার ভিড়ে বাদলের গোধূলি আঁধারে'। আর এ গোধূলির আকাশের নিচে দেখা যায়, 'মটরখেতের শেষে' 'ভাটিয়ালী সুরে' ভেসে যাওয়া নৌকা এসে থামে 'বালুর ফরাশে'। সেই পরিচিত গ্রাম্য নিসর্গ—বর্ণাঢ্য কিন্তু সংবেদনাহীনভাবে নিরুত্তাপ—যার প্রতিটি বিবরণ-ই ছিল প্রত্যাশিত, তাই নিশ্চমক। গ্রন্থের নাম কবিতাটি থেকেই এ আবহচিত্রটি উদ্ধৃত হল, অনুরূপ আরো উল্লেখে বিরত থেকে। তবু অনুশীলিত পাঠে, 'ঝরাপালক'-এর মতো গ্রন্থেও উদ্‌ঘাটিত হয় এমন কিছু বিকীর্ণ মনোবীজ, যা আভাসিত করে দেয় উত্তরকালের সেই নিবিড় অরণ্যখণ্ড, যাকে আমরা বিশেষ করে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকৃতিজগৎ বলে জানি। ডাহুক-শালিক-গাংচিল-হরিয়াল-ঘুঘু-কপোত-মরাল-চিহ্নিত 'ঝরাপালকে'র জগতে এসে পড়ে 'সাগর-বলাকা'। 'সাগর-বলাকা'র মতো কবিতা শব্দচয়ন ও ছন্দনর্তনে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েও স্বপ্নের নির্মাণ ও প্রয়াণের এমন একটি কেন্দ্রিক ছবি অস্পষ্টভাবেও তুলে ধরে, যা যে কোনো অনুরাগী পাঠককে অভ্রান্তভাবে মনে করিয়ে দেয় কাব্যের সেই তুঙ্গশিখর, যা আনায়াসেই তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল 'সিন্ধুসারস'-এর ডানায়! 'মহাপৃথিবী'র সেই অত্যাশ্চর্য

৬. 'কালের পুতুল' : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

কবিতায় 'সিন্ধুসারস' হয়ে উঠেছে এক শাশ্বত উজ্জ্বল-প্রাণেষণার প্রতীক, যা 'শীতার্ত-এ' 'পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে' তার গানে নির্মাণ করে দেয় 'নতুন সমুদ্র এক, সাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ'। 'ঝরাপালকে'র 'সাগর-বলাকা'য় আছে এক স্বপ্নপ্রয়াণের আবেগ, যত কৈশোরক উচ্ছ্বাসেই তার প্রকাশনা বিহ্বল হোক না কেন; 'প্রয়াণ তোমার প্রবাল দ্বীপে' যেখানে 'মৌন মীনকুমারীর' শঙ্খের আহ্বান, এবং পুরোনো আবাস ভেঙে ফেলেই এ যাত্রা ('ভেঙে হেথায় বালিয়াড়ীর বাড়ি')। আসলে ভাষায় ও ভাবনায় অনুকৃতি ও প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ থেকেও 'ঝরাপালকে'র কবি কিন্তু বিরুদ্ধ বাস্তব থেকে প্রসন্ন স্বপ্নের সন্ধানেই ব্যাপৃত ছিলেন। 'সিন্ধুসারস'-এর মতো তাই 'সাগরবলাকা'তেও দুই বিপরীত জগৎ অস্ফুট আভাসিত। 'ঝরাপালকে'র অনুষঙ্গেই এসেছে 'ব্যাধবিদ্ধ ধরণীর রুধির লিপিকা'র মতো রূপক। একটি কবিতার নামে (নীলিমা) এবং অনেকগুলি উল্লেখে 'নীলিমা' শব্দটিও একধরনের প্রতীকী আবহ্ নির্মাণ করে। 'বাস্তবের রক্ততট' থেকে বহুদূর এ 'নিষ্পলক নীলিমা' তার 'মায়াদণ্ডে ভেঙে ফেলে, জনতার কোলাহল', 'লক্ষ বিধি-বিধানের কারাতল' এ 'বসুধার কারাগার', এ 'কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক'। নীলিমা হয়ে ওঠে কবির কাছে এক দূর অতন্দ্র কল্পলোক। এ ভাব বিশ্লেষণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব ক'টি শব্দই অবিকৃতভাবে আহৃত হয়েছে 'নীলিমা' কবিতাটি থেকেই। বোঝা যায়, প্রায় সকল সৎ কবির মতন-ই জীবনানন্দ প্রথমাবধি সংক্ষুব্ধ ছিলেন বাস্তব ও কল্পনার বিপরীতমুখী টানে। রক্তাক্ত বাস্তব থেকে দূরস্থ তাঁর কল্পনার জগৎ গঠিত হয়েছিল, কিন্তু কোনো অনৈসর্গিক উপাদানে নয়—প্রকৃতি জগতের-ই বস্তুনিচয়ে, আকাশ বা পাখি বা রোমান্টিক দূরাভিসারে স্বপ্নোচ্ছ্বসিত 'দূর হিঙুল মেঘ', 'রাঙাচাঁদের নিচে রূপসী ধরণী', 'ঘাসের বুকে ঝিলমিল শিশিরের জলে' খুঁজে পাওয়া', মানসী যার 'ননীর আঙুল', ছুঁয়ে যায় 'কচি নোনা শাখা'। 'নীলিমা' কি 'সাগর-বলাকা', যার আশ্রয়ে রচিত হয়েছে 'ঝরাপালকে'র স্বপ্নজগৎ, প্রকৃতিভুবনের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। আবার, এ নৈসর্গিক আবহ-রচনায় কবি ব্যবহার করেছেন এমন শব্দ ও চিত্র, যা 'ধুসর পাণ্ডুলিপি'র ম্লান হৈমন্তিক, মৃত্যুআহত প্রকৃতি জগতের পদধ্বনি বহন করে।

ডেকেছিল ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিম মাস, জোনাকির ঝাড়,
আমারে ডাকিয়াছিল আলেয়ার লাল মাঠ, শ্মশানের খেয়াঘাট আসি।
('সেদিন এ-ধরণীর')

এ জাতীয় চরণ যে নৈসর্গিক পরিমণ্ডল রচনা করেছে, তা বাংলা কাব্যে প্রকৃতির নূতন স্বাদ নিয়ে আসা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কথা মনে করিয়ে দেয়। 'হেমন্তের হিম মাত্র', 'হলুদ-পাতার ভিড়ে'র মতোশব্দযোজনা জীবনানন্দ 'ঝরাপালকে'ই প্রথম করেছেন। কিন্তু বিষয় ও শৈলীর সামগ্রিক দুর্বলতায় সে সব-ই হারিয়ে যায়। জীবনানন্দের কাব্যশিল্পের বিবর্তনের ভাষ্যে আমরা 'ঝরাপালক' থেকেই এমন বহু উল্লেখ আহরণ করে নিতে পারি, যা অভ্রান্তভাবে পরবর্তী জীবনানন্দীয় বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গির ইঙ্গিতবহ। এখানে প্রকৃতিভাবনার প্রসঙ্গে আমরা এটুকুই বলতে পারি, প্রাথমিক কাব্যপ্রয়াসে

জীবনানন্দের প্রকৃতিদৃষ্টি কোনো নির্দিষ্ট পরিণতি পায়নি। প্রকৃতি সম্পর্কে একালে তাঁর রচনায় কোনো স্বকীয় সচেতনতা অনুপস্থিত থাকলেও নিসর্গের যে বস্তুনিচয় বা দৃশ্যরূপটি তাঁর কল্পনাকে স্বকীয় উচ্চারণের দিকে আকৃষ্ট করেছিল, সেগুলি নিঃসন্দেহে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ম্লানালোকিত হৈমন্তিক নিসর্গভুবনের অনুষঙ্গ নিয়ে আসে।

জীবনানন্দের কাব্যে প্রকৃতির উপস্থিতি, চেতনা ও চারিত্র্য নিয়ে যে কোনো আলোচনায় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এক বড় ভূমিকায় উদ্ধৃত হয়ে থাকে। ১৩৪৩-এ (১৯৩৬) প্রকাশিত এ গ্রন্থের প্রধান কাব্যবিষয় যে প্রকৃতি, সেকথা অনস্বীকার্য। নিসর্গই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মৌল রসকেন্দ্র। প্রেমকে উপজীব্য করে যে ক'টি কবিতা এখানে আছে, তাও পাত্র-পাত্রীর উল্লেখমাত্রকে অতিক্রম করে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজেছে কাব্যাবেগের মুক্তি। কবিতার পর কবিতায় স্ফুট হয়ে উঠেছে এক পরিব্যাপ্ত নিসর্গভুবনের ছবি—ধূসর, কোমল, ম্লান ও শীতার্ত সে চিত্র; বড় অপরূপ অথচ বড় নশ্বর। কোনো উৎসব বা দুর্দশার পৌরাণিক সঙ্গীত নয়,[৭] কাব্যের আহ্বান এক স্বপ্নের জগতে। 'চিত্ররূপময়' এ জগৎ, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' আছে। আমরা আরো বলি, এক অনন্যপূর্ব স্বকীয়তা আছে সেই তাকিয়ে দেখার মধ্যে! পূর্বসূরি কি সমসাময়িক আরো কোনো কবির রচনায় আমরা পাইনি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরিব্যাপ্ত হৈমন্তিক বিষাদ। কবিমানসের মুগ্ধ অভিভূত অভিনিবেশ প্রকৃতির সৌন্দর্যের ও নির্জনতার এক তাৎক্ষণিক উদ্ভাসন ঘটেছে কবি-চেতনায়; প্রায় পরমুহূর্তেই তা আক্রান্ত হয়েছে এ 'অধরা মাধুরী'-র নশ্বরতার বিষণ্ণ উপলব্ধিতে। প্রকৃতি-চেতনার এ প্রথম ও স্বকীয় স্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গেই একালের কাব্যে নির্মিত হয়ে উঠেছে কল্পনায় বলীয়ান এক কবিজগৎ, যা স্পষ্টভাবেই নিসর্গআশ্রিত, বাস্তবের বিপরীতভূমিতে অবস্থিত, ব্যাহত ও পীড়িত জীবনের মুক্তির আশ্রয়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকৃতিজগতের বিশিষ্ট পরিমণ্ডলটি ব্যাখ্যা করার আগে আমরা স্মরণ করে নিতে চাই কবির কিছু মূল্যবান উক্তি, যা আমাদের দৃষ্টিকোণটি যথার্থতায় প্রতিষ্ঠা করবে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, জীবনানন্দ তাঁর কাব্যের প্রকৃতিমগ্নতা সম্পর্কে আগাগোড়াই সচেতন ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন :

"আজ পর্যন্ত যেসব কবিতা আমি লিখেছি, সেসবে আবহমান মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকায় এক 'অনাদি' তৃতীয় বিশেষত্ব হিসেবে স্বীকার করে, কেবলমাত্র তারি ভিতর থেকে উৎসনিরুক্তি খুঁজে পায় নি।"[৮]

পরে বলেছেন :

কোনোকিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই, রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করার প্রয়াস—যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভেতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখতে চায়।

৭. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' : 'কয়েকটি লাইন'।
৮. 'কবিতার কথা'; 'কবিতা প্রসঙ্গে'; সিগনেট বুকশপ প্রকাশিত।

এবং পরিশেষে জানাচ্ছেন, "আমিও সাময়িকভাবে কোনো কোনো জিনিসকে 'চরম' মনে করে নিয়েছি জীবন ও সাহিত্যের তাগিদে।"[৯] জীবনানন্দের কাব্যব্যাখ্যায় এ কথাগুলি অশেষ মূল্যবান, প্রায় সূত্রের মতো গুরুত্বময় এবং তাৎপর্যগভীর। এসব স্মরণীয় সদুক্তির আলোকে স্বচ্ছন্দেই এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, প্রকৃতি কোনো কোনো পর্যায়ে কোনো একটি 'ভুবন' 'চরম' বা প্রধান হয়ে ওঠে। সেইরকম ঘটেছিল 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের কবিতাবলীতে প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কবির চেতনায়, যার প্রায় অগোচর স্ফুটনোন্মুখতা লক্ষ্য করেছি 'ঝরাপালক' যুগের প্রভাবিত সব রচনায়।

তবু আশ্চর্য মনে হতে পারে পাঠকের কাছে, যে প্রকৃতিজগৎকে 'চরম' মনে করে কবির চেতনা আশ্রয় খুঁজেছে 'জীবন ও সাহিত্যের তাগিদে' (অর্থাৎ কি ব্যাহত বাস্তবের তাড়নায়? কল্পনার অনুপ্রেরণায়?), সেই নিসর্গভুবনে নেই আলোকের উদার সমারোহ, নেই নবীন বসন্তের উদ্দাম প্রাণময়তা, নেই আশ্বিনের হিরণ্যমুক্তি।[১০] 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আদি সংস্করণের সকল কবিতায় প্রকৃতির এক ধূসর, ক্ষয়িষ্ণু, শীতার্ত ম্লান, অন্ধকার প্রকাশ বড় হয়ে উঠেছে। বড় অনন্যপূর্ব সে নিসর্গছবি, তবু এক নির্জন ধূসরতায় অবলীন। কেমনভাবে জীবনানন্দের বহু কবিতায় নামকরণে ও শব্দযোজনায় অর্থের অব্যবহিত প্রয়োজন অতিক্রম করে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাৎপর্যের এক প্রতীকী বিস্তার, সেকথা তাঁর কাব্যের শিল্পপ্রকরণের আলোচনায় বলার অবকাশ পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম স্বকীয় উচ্চারণেই দেখি, এক ব্যাপ্ত হৈমন্তিক আবহে নিসর্গ অভিজ্ঞতার যে পাঠ নিলেন কবি, প্রকৃতির 'শোভাভূমিকায়' জীবনের যে মূল্যের পরিমাপ করলেন, সর্বত্রই তার বিভিন্ন পাঠ নিয়ে অভিজ্ঞতার যে 'পাণ্ডুলিপি' রচিত হলো, তা ধূসর প্রকৃতিচেতনার ভেতর রয়েছে বলেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সবসময়-ই যে ধূসর, তা হয়তো নয়'।[১১] নয় যে, সে কথা সর্বাংশে সত্য; কারণ তাঁর কাব্যের শেষতম পর্যায়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের সমাহারে মর্মরিত নবীন এক আলোপৃথিবীর অনুপ্রাণিত বোধনে মুখর হয়ে উঠেছিল কবির কল্পনা।[১২] আর, আরো আগেই 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কাব্যেও ধূসর হৈমন্তিক আচ্ছন্নতাকে কাটিয়ে উঠে প্রকৃতির জগতে জীবনানন্দ আবিষ্কার করেছিলেন শুধু মরণশীল এক অপরূপ সৌন্দর্য নয়, প্রশান্তি ও সান্ত্বনার এক স্থির আশ্রয়। তবু, 'ধূসর প্রকৃতিচেতনা'র কথা তিনি স্বীকার করেই নিচ্ছেন শর্তাধীনভাবে। সেই ধূসর প্রকৃতিজগতের অজস্র চিত্র বিকীর্ণ হয়ে আছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পাতার পর পাতায়। নিতান্ত আক্ষরিক অর্থ অতিক্রম করে একরকম প্রতীকী ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হচ্ছে...'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নামকরণের মধ্য দিয়ে এ কথাও স্বভাবিকভাবেই মনে হয়। এ প্রতীকী দ্যুতি ও অর্থবিস্তার জীবনানন্দের বিভিন্ন পর্যায়ের কাব্যসৃষ্টিতেই প্রাণোজ্জ্বলতা নিয়ে এসেছে।

৯. 'কবিতা প্রসঙ্গে' নিবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
১০. 'ময়ূখ' পত্রিকার জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যায় প্রকাশিত পত্র—২
১১. 'ময়ূখ' পৌষ-জ্যৈষ্ঠ. ১৩৬১-২; জীবনানন্দ দাশের পত্র—২
১২. 'আলোপৃথিবী' শীর্ষক উত্তরমৃত্যুকালে প্রকাশিত কবিতাবলী—'কৃত্তিবাস', নবপর্যায়, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৮।

প্রকৃতিচেতনার প্রাথমিক স্ফুটনে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি রূপাবিষ্ট; প্রকৃতির অপরূপ অথচ ক্ষয়িষ্ণু সৌন্দর্যের তীব্র আস্বাদে তাঁর চেতনা অভিভূত। তাঁর অনুভবের আলোকে অসামান্য হয়ে উঠেছে অজস্র পরিচিত নিসর্গবস্তু ও দৃশ্য। কিন্তু সেই প্রবল রূপাবিষ্টতা, সেই তীব্র তুলনাহীন অনুভব সব সময়েই ইন্দ্রিয়জ বা ইন্দ্রিয়নির্ভর তাঁর এ সময়কার কবিতায়। দৃষ্টি ও শ্রুতির প্রায় স্পৃশ্য এক জগৎ শরীরী হয়ে উঠেছে তাঁর চেতনায়; শুধু চিত্ররূপময় নয়, ধ্বনিগন্ধময় সে জগৎ। নিসর্গ তার অজস্র বিকীর্ণ রূপে বাঙ্ময় করেছে কবিকল্পনা। তবু এসব কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে 'এক ধূসর কোমল পরিমণ্ডল',[১৩] যা কল্পনা ও অভিজ্ঞতার মিশ্রণে রচিত এ প্রকৃতিজগৎকে ঘিরে রেখেছে।

এ ধূসর কোমল পরিমণ্ডলটি চিনে নিতে গিয়ে আমরা দেখি, যে হেমন্ত রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতে সসংকোচে সামান্য জায়গা করে নিয়েছে, জীবনানন্দের কবিতার জগতে তার-ই প্রবল আধিপত্য। হয়তো হেমন্ত বলেই চিহ্নিত করা যায় না সবসময় তাঁর কাব্যজগতের ঋতুকে। তবু একথা অবশ্যমান্য যে, হেমন্তও শীত এ দুই ঋতু, আর কার্তিক-অঘ্রাণ এ দুই মাস-ই তাঁর কাব্যের আলোচ্য অধ্যায়ের প্রকৃতির কালপ্রেক্ষিত। সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবে বসন্তকালসূচক শব্দ বা বাক্যাংশ অপেক্ষা শীতনির্দেশী উল্লেখ অজস্র ও অধিক; এবং ঋতু হিসেবে সাধারণত শীত বোঝাতে হেমন্তের চেয়ে 'শীত' শব্দটিই অধিক প্রযুক্ত হয়েছে। একটি হিসাব নিলে দেখা যাবে; ১। হেমন্তের ঝড় ২। হেমন্তের মাঠে মাঠে ৩। অঘ্রাণের রাতে ৪। শীতরাতে ৫। সবচেয়ে শীত তৃপ্ত তাই ৬। শূন্য সেই শীত নদী ৭। শীতের নদীর বুকে ৮। মাঘরাতে ৯। শীত হেমন্তের শেষে ১০। শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে ১১। কার্তিকের ক্ষেতে ১২। হেমন্তের নাম উৎসব ১৩। কার্তিকের মিঠা রোদে ১৪। হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে ১৫। হেমন্তের ধান ওঠে ফলে ১৬। শীতের হাড়ের হাত ১৭। হেমন্ত আসেনি মাঠে ১৮। শীতরাতে ঢের ১৯। বরফের মতো শীত ২০। শীতরাত ২১। শীতমেঘে ২২। হেমন্তের সন্ধ্যায় বাতাস ২৩। শীতে পৃথিবীর শীতে ২৪। শীতের নদীর বুকে ২৫। যেমন শীতের রাতে ২৬। হেমন্ত আসার আগে ২৭। অঘ্রাণের রাতে ২৮। কার্তিকের শীতে ২৯। অঘ্রাণের মাঝরাতে ৩০। হেমন্তের রৌদ্রের মতন ৩১। শীত পিছে ৩২। দীর্ঘ শীত রাত্রি ৩৩। শীতের মতন অপরূপ ৩৪। ইঁদুর শীতের রাতে।

এ ৩৪ বার ব্যবহারের বিপরীতে বৈশাখ, চৈত্র, ফাল্গুন প্রভৃতি বসন্ত-আবহ শব্দের ব্যবহার বড়জোর মাত্র ১০ বার। উভয়পক্ষের হিসেবেই আমরা এক-ই কবিতার মধ্যে এক-ই শব্দ বা বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি গণনার বাইরে রেখেছি। স্পষ্টতই কবির চোখে প্রকৃতির যে রূপ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে প্রধান হয়ে উঠেছে, তা শীতার্ত—সে শীত কখনো আসন্ন, মৃদু হৈমন্তিক, কখনো সম্পূর্ণ, কঠিন, মাঘী।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নিসর্গজগতের ঋতুকে শীত বলে চিহ্নিত করার পর পাঠক দেখেন, এ জগতে কুয়াশা, হিম আর ঝরে-পড়া পাতার পাশাপাশি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে সূর্যালোকের অনুপস্থিতি। এখানে কবি 'রাতে হেঁটে হেঁটে' 'নক্ষত্রের সনে' খুঁজে

১৩. 'কালের পুতুল' : বুদ্ধদেব বসু : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রসঙ্গে আলোচনা।

বেড়ান 'হৃদয়ের সেই গভীর জিনিস'। এ জগতে 'মেঠো চাঁদ কাস্তের মতো বাঁকা চোখা' চেয়ে আছে, এখানে 'হলুদ পাতার ভিড়ে বসে শিশিরে পালক ঘষে ঘষে', 'মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে', 'অঘ্রাণের রাতে' জেগে আছে পেঁচা; এখানে 'আদিম রাত্রির ঘ্রাণ' বুকে নিয়ে অন্ধকারে অরণ্য গায় গান, 'শিশিরের শব্দে' গান গায় সেই অন্ধকার, 'আবেগ জানায় রাতের বাতাস'। এখানে কবিমানস প্রেমেরও মুক্তি খুঁজেছে এক ম্লানালোকিত হিমনিশীথ আবহে, 'যেখানে সমস্ত রাত ভরে নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝরে' 'ঠাণ্ডা ফেনা ঝিনুকের মত' 'সেইখানে রব পড়ে'। বস্তুত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকৃতিজগৎ শুধু শীতার্ত নয়, বড় অন্ধকারময়। যে কবিতার বিষয় জীবন, সে কবিতারও উদ্বোধন রৌদ্রময় পৃথিবীর প্রাণচাঞ্চল্যে নয়, বরং সেখানেই, যেখানে 'বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর'। সেই জীবনেরও সবচেয়ে প্রাণময় যে অনুভব প্রেম, তারও আবির্ভাবের যে আবহ কবি রচনা করেছেন, সেখানে পৃথিবীর 'গহ্বরে মানুষের ঘুম' 'হৃদয় আহত একা হরিণের মতো' 'পাহাড় নদীর পারে অন্ধকারে' 'হিমের হাওয়ার রাতে আকাশের নক্ষত্রের তলে' 'জীবনের বিহ্বলতা সয়ে' দিন কাটে। এই যে হিম ধূসর অন্ধকার-আক্রান্ত নিসর্গ, তাকে আশ্রয় করে, 'চরম' মনে করে, 'সুস্থিরতা লাভ করার চেষ্টায়', জীবনানন্দের ভাষায়, 'আত্মতৃপ্তি' নেই, রয়েছে কবিজগৎ সৃষ্টির প্রয়াস। সেখানে যেটুকু আলোর আভাস পাই, তার উৎস আকাশের নক্ষত্র, 'সন্ধ্যার মেঘের রঙ', 'গোধূলির অস্পষ্ট আকাশ', 'ক্ষণবিদ্যুৎ', 'আলেয়ার বাষ্প', আর 'বিকেলবেলার ধূসরতা'। এ জগৎ থেকে 'আহত চিতার মতো বেগে পালায়ে গিয়েছে রোদ', 'সরে গেছে আলোর বিকাল'। বস্তুতপক্ষে, 'জীবন' কবিতাটির সিদ্ধান্তগুলি নিবিষ্টপঠনে বারেবারেই আশ্চর্যভাবে চিনিয়ে দেয় জীবনানন্দের প্রকৃতির শোভাভূমিকায় স্বসৃষ্ট চেতনাজগতের যথার্থ স্বরূপ। দেখা যাক্, কোন্ জীবনের মধ্যে কবি আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁর ইঙ্গিতকে :

চলে গেছে জীবনের 'আজ' এক,—আর এক 'কাল',
আসিত না যদি আর আলো লয়ে—রৌদ্র সঙ্গে লয়ে!—
এই রাত্রি—নক্ষত্র সমুদ্রলয়ে এমন বিশাল
আকাশের বুক থেকে পড়িত না যদি আর ক্ষয়ে!—

জীবনের যে শক্তি মানুষের সমস্ত ইচ্ছা, সাধ, কর্ম আর উদ্যমের পেছনে ক্রিয়াশীল, তার মধ্যে কবি খুঁজে পাননি 'কোনও নিশ্চয়তা' :

তুমি আছ,—রবে তুমি—এর বেশি কোনো নিশ্চয়তা
তুমি এসে দিয়েছ কি?

কবি উপলব্ধি করেছেন :

যেই গতি,—যেই শক্তি পৃথিবীর অন্তরে পঞ্জরে;—
সবুজ ফলায়ে যায় পৃথিবীর বুকের উপর,—
তেমনি স্ফুলিঙ্গ এক আমাদের বুকে কাজ করে!

তবু,
শস্যের কীটের আগে আমাদের হৃদয়ের শস্য তবু মরে।

অথবা,

হেমন্ত আসেনি মাঠে, হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়ের বন।
তাই, শেষ পর্যন্ত কবির সিদ্ধান্ত,
সব ভালোবাসা যার বোঝা হল,—দেখুক সে
মৃত্যু ভালোবেসে।

বিপরীতে, এ জীবনকে 'একবারে ভালোবেসে দেখি' বলে কবি জেনেছেন :

পৃথিবীর পথে নয়, এইখানে—এইখানে বসে,—
মানুষ চেয়েছে কিবা? পেয়েছে কি?—কিছু পেয়েছে কি—
হয়তো পায়নি কিছু,—যা পেয়েছে, তা-ও গেছে খসে
অবহেলা করে করে কিম্বা তার মক্ষত্রের দোষে;—
ধ্যানের সময় আসে তারপর,—স্বপ্নের সময়!
শরীর ছিঁড়িয়া গেছে,—হৃদয় পড়িয়া গেছে ধসে।
অন্ধকার কথা কয়,—আকাশের তারা কথা কয়,
তারপর,—সব গতি থেমে যায়,—মুছে যায় শক্তির বিস্ময়!

'জীবন' কবিতাটি থেকে উদ্ধৃতির এ পরিসর ও অবকাশ নিয়েছি শুধুমাত্র জীবনানন্দের একালের রচনায় প্রকৃতিচেতনার মধ্যে এক ধরনের ধূসর হিম অন্ধকারের সমাচ্ছন্নতাটি স্পষ্ট করার কারণে। স্পষ্টতই, কবি এখানে 'বাঁচিয়া থাকিতে যারা হিঁচড়ায়, করে প্রাণপণ', তাদের আহ্বান করে আনছেন এমন এক ম্লান বিষণ্ন নিসর্গভূমিতে, অন্য এক রূপ ও শান্তির সন্ধানে, যেখানে 'অন্ধকার কথা কয়ে ওঠে', প্রথাবদ্ধ.জীবনের সমস্ত বিস্ময় থেমে যাওয়ার পরে। 'অন্ধকার কথা কয়,—আকাশের তারা কথা কয়'—সে কি প্রাক-জৈবনিক আঁধার আর মহাবিশ্বালোকোৎসারিত আলোকেরই-ইঙ্গিতবহ, যা জীবনানন্দের শেষপর্বের কাব্যে বারবার চেতনায়, চিত্রকল্পে ফিরে এসেছে?

বস্তুত, আদিসংস্করণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবিতা ছিল সতেরটি; তার মধ্যে দুটি কবিতা পাই, যার কাল-পটভূমি রাত্রি নয়, দিন : 'অবসরের গান' ও 'শকুন'। সে দিবালোকও আবার রৌদ্রের নিরঙ্কুশ প্রসাদে উজ্জ্বল নয়, অন্ধকার-আক্রান্ত। 'অবসরের গান' কবিতাটির তিনটি অংশ : প্রথমাংশে 'ভোরের রোদ' থেকে 'রোদ গেছে পড়ে' এমন বিকালের উল্লেখ; দ্বিতীয়াংশে আবার অন্ধকারের আবির্ভাব—'পুরনো পেঁচারা' বেরিয়ে এসেছে তাদের 'কাটরের' থেকে, 'সূর্যের আলোর দিন' ছেড়ে দিয়ে শিশিরের ভেজা পথ ধরে, মাঠের আহ্বানে সকলে এসেছে 'শস্যের ক্ষেতের পাশে' তাদের পিপাসা মেটাতে 'অগাধ ধানের রসে', আর শুধু এ সাধটুকু সম্পূর্ণ হলেই তারা দিনের আলোর 'লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন' মরতে প্রস্তুত আছে; তৃতীয়াংশে, কবির সিদ্ধান্ত : 'পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে থাকে রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ্'।

চৌদ্দ চরণের 'শকুন' কবিতাটি সম্পূর্ণ দুপুরের পটভূমিতে রচিত। যদিও সমগ্র 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকৃতিচেতনার মূল সুরটির সঙ্গে এ কবিতার সম্পর্ক সামান্যই, তবু লক্ষণীয়, চতুর্দশপদীর স্বল্প-পরিসরেই কবি দু'বার 'অন্ধকার'কে স্মরণ করেছেন : কয়েক মুহূর্তে শুধু এসব শকুনেরা দূর আলো ছেড়ে 'ধূম্রক্লান্ত' দিকহস্তির মতো নেমে পড়ে এশিয়ার ক্ষেতে মাঠে; তারপর আঁধার 'বিশাল ডানা'য় পাহাড়ের শিঙে শিঙে আবার আরোহণ করে, 'বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন বন্দরের অন্ধকারে' ভিড় করে, তাই দ্যাখে। এ কবিতার কাল পটভূমি দ্বিপ্রহর। তবু সারা কবিতাটিতে একটিও উজ্জ্বল রৌদ্রময় দৃশ্য নেই, বরং পরিবেশটি প্রকটভাবে ধূসর। শকুনের নিস্তব্ধ প্রান্তর, ধূম্রক্লান্ত দিক্‌হস্তিদের উপমা, 'অন্ধকার' শব্দটির উপস্থিতি এবং সর্বোপরি 'বিমর্ষ কিনার'-এর উল্লেখ, যেখানে গিয়ে শকুনেরা পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গি য় চলে যায় 'যেন কোন মৃত্যুর ওপার'—সব মিলিয়ে কবিতাটির ওপর এক বিমর্ষ ধূসরতার ছায়া, যা শুধুমাত্র নিসর্গমাধুরীহীন-ই নয়, প্রাকৃতিক শকুন থেকে বোমাবর্ষী মৃত্যুর শকুনের অভ্রান্ত অনুষঙ্গে শকুনক্রান্তির কলরোলে পৌঁছে দেয় কবিতাটিকে। দুপুরের স্পষ্ট রৌদ্রের পটভূমি অতিক্রম করে কিভাবে কবিমানসে 'সাময়িকভাবে' 'চরম' ধূসরতার চেতনা বড় হয়ে উঠেছে, তা বিশদ করার প্রয়োজনেই এ আলোচনা। 'পৃথিবীর বাধা-এই'—হঠাৎই অন্যতর অর্থদ্যুতি পায়; সে শুধু আর শরীরী অস্তিত্বের অমোচনীয় নশ্বরতার বাধা নয়, সৌন্দর্যের নিশ্চিত বিলুপ্তি নয়, যা থেকে কবি সরে যেতে চেয়েছেন ধূসর স্বপ্নের দেশে। নিয়তি নির্দিষ্ট মানব অস্তিত্বের চিরকালীন বেদনার পাশে আরো প্রবলভাবে উপস্থিত সমূহ সামাজিক বিনষ্টির মানুষী উদ্যোগ।

যে ধূসর কোমল পরিমণ্ডলটির বিশ্লেষণ আমাদের প্রসঙ্গ, ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কোনো একটি কবিতার উল্লেখ যদি সেক্ষেত্রে অনিবার্য হয়, যা সবচেয়ে সার্থক শিল্পিত সুষমায় সেটিকে বেঁধেছে, তবে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি সর্বাগ্রে মনে আসে। জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রকৃতিচেতনার প্রথম স্ফুরণে যে মুগ্ধ রূপাবিষ্টতা এবং ইন্দ্রিয়মগ্ন অনুভবের অজস্র বর্ণাঢ্য উৎসার তাঁর কবিতাবলীকে করেছে নয়নাভিরাম, স্বাদু, সুবাসিত এবং সংগীতময়; তার এমন অনায়াসস্বচ্ছন্দ প্রকাশ আর কোথাও পাই না। এ কবিতার নিবিষ্ট অনুশীলন-ই জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনার প্রথম পর্যায়ের বিশিষ্ট চরিত্রটি চিনিয়ে দেয়। এক ম্লানালোকিত নির্জন নিসর্গভুবনের অপরূপ মাধুর্য কবি তাঁর সকল ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তায় পূর্ণ উপভোগ করেছেন। বড় অপরূপ অথচ বড় নশ্বর সেই সৌন্দর্য—হিমার্ত, বিষণ্ন তবু স্নিগ্ধ। চিত্ররূপময়তার যে কুললক্ষণে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছিলেন জীবনানন্দীয় নিসর্গ-বীক্ষাকে, তার-ই অজস্র বিশিষ্টতাই এ রচনাটিতে তাৎপর্য সঞ্চার করেছে। শীত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকৃতিজগতের প্রধান ঋতু, আর সে জগতে পাই আলোকের ক্ষীণ ম্লানাভামাত্র। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিতেও 'পৌষসন্ধ্যা' আর 'অঘ্রাণের অন্ধকারের' পটে কবি 'দীর্ঘশীতরাত্রিটিরে, ভালোবেসেছেন। এ কবিতার ভিত্তিমুহূর্ত সন্ধ্যা, অবস্থানভূমি শস্যরিক্ত শীত-মাঠ। জোনাকি, নক্ষত্র আর মরণশীল জ্যোৎস্নার আলোকে আভাসিত এ জগতের নিসর্গদৃশ্য, যা কবির চেতনাকে আবিষ্ট করেছে নির্জনতার আসঙ্গে : 'নির্জন খড়ের মাঠ', 'নির্জন

মাছের চোখ', নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে', 'নিভৃত কুহকে ভরা'। অপরূপ নিসর্গের মায়া এমন-ই প্রবলভাবে অভিভূত করেছে সে চেতনা যে, স্পর্শ, গন্ধ, দৃষ্টি ও শ্রুতির সমস্ত ঐকান্তিকতা দিয়ে জীবনানন্দ অনুভব করেছেন সেই সৌন্দর্য এবং তার মরণশীলতার বিষণ্ণ উপলব্ধিতে জেগে উঠে বলে উঠেছেন :

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ;

সব ক'টি ইন্দ্রিয়ের আয়োজন এ সৌন্দর্যের কাব্যরূপায়ণে এক পেলব সম্পূর্ণতা এনেছে। কবি অনুভব করেন পুরনো পেঁচার ঘ্রাণ, শিশুর মুখের গন্ধ, চালের ধূসর গন্ধ— এমন কি নরমজলের গন্ধ! ('নরম' শব্দটির প্রয়োগ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে সমৃদ্ধ করেছে স্পর্শ দিয়ে)। এক-একটি চিত্রের আয়োজনে এসেছে নানা ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন অনুভবের অনবদ্য সমন্বয় (যেমন, 'পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে'—দৃষ্টি, স্পর্শ ও ঘ্রাণ এ সব কিছুরই উপাদান সম্পূর্ণ করেছে এ চিত্রকল্পের বিস্তার)। অনেকগুলি উদাহরণেই দেখি, জীবনানন্দের নিসর্গ-অনুভূতিতে কীট্‌সীয় ইন্দ্রিয়মগ্নতা, যেখানে প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করার প্রয়াসে অনুভূতির সমস্ত তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা নিয়ে জেগে উঠেছে কবির সকল ইন্দ্রিয়। ফলশ্রুতি, একটি বর্ণনার মধ্যেই সঞ্চারিত একাধিক ইন্দ্রিয়ের রসাস্বাদ—যা দৃশ্য তা হয়ে উঠেছে স্পৃশ্য, যা শ্রাব্য তা হয়েছে ঘ্রাণময়। যেমন, জীবনানন্দের ক্ষেত্রে—

বেতের লতার নিচে চড় ইয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,

অথবা 'বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ' বা 'পুরনো পেঁচার ঘ্রাণ'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নিসর্গজগৎ বাংলা কবিতার ইতিহাসে অনন্যপূর্ব— একথা আগেই বলেছি। ইন্দ্রিয়মগ্ন রূপানুভূতির নিবিড় অভিনিবেশ-ই এনেছে সেই অনন্যতা, যা বাংলাসাহিত্যে অন্য কোনো কবির রচনায় আমরা পাই না, যার একমাত্র প্রতিতুলনা পাওয়া যাবে কীট্‌সের কবিতায়, হয়তো কিছুটা কীট্‌স্ ও প্রির‍্যাফেলাইট প্রভাবিত অপরিণত ইয়েট্‌সীয় কল্পনায়। এ প্রাথমিক স্ফুটনে জীবনানন্দের প্রকৃতি-দৃষ্টিতে আসেনি এমন কোনো ব্যঞ্জনা, যা অনৈহিক। নিসর্গের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-ই তাঁকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে আকৃষ্ট করেছে; পৃথিবীর নদী মাঠ বন ('জীবন'/২), 'ঘাস রোদ মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ' ('মৃত্যুর আগে')—এসবকিছুর ধ্বনিগন্ধবর্ণময় প্রকৃতির জগৎ সংক্ষুব্ধ করেছে তার কল্পনা, ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির প্রবলতায় সৃষ্টি করেছে প্রায় স্পৃশ্য নিটোলতায় অজস্র দৃশ্যরূপ। তার সবক'টির ওপর পড়েছে এক ধূসর ছায়া—যে ছায়া অমোচনীয় মৃত্যুর, রূপের আসন্ন মরণশীলতার : 'সব রাঙা কামনার শিয়রে' উঁকি দিয়ে গেছে বার বার 'ধূসর মৃত্যুর মুখ'। তবে কোনো লোকোত্তর দ্যোতনায় অভিষিক্ত হয়নি কবির প্রকৃতিচেতনা এ কালের কাব্যে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এক পিপাসার গান—সে পিপাসা সৌন্দর্যের, যে সৌন্দর্য অপরূপ অথচ মরণাহত, অনির্বচনীয় তবু নশ্বর। এ সৌন্দর্যের

জগতে কবি পাঠককে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন, পাঠকের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিয়েছেন নিসর্গের মরণশীল রূপের আবিষ্টতার বেদনা। প্রকৃতির জগৎকে আশ্রয় করেই এ রূপাবিষ্টতা ও বেদনার উৎসার। কিন্তু কবিচেতনায় প্রকৃতি এ প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতাবলীতে তার ঐহিক পরিধিকে অতিক্রম করে দ্বিতীয় কোনো দ্যোতনা নিয়ে আসেনি, হয়ে ওঠেনি তেমন কোনো প্রশান্তি ও স্থিরতার আশ্রয়, যেমনটি হয়েছে পরবর্তীকালে 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে। প্রথম পর্যায় পর্যন্ত বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যনির্দিষ্ট প্রকৃতিবীক্ষার ভূমিতেই জীবনানন্দ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কিছুটা দীর্ঘায়িত এ আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রায় সব কবিতাতেই গোধূলি, বৈকাল, ধূসরতা, রাত্রির অন্ধকারের অজস্র উল্লেখে জীবনানন্দের প্রকৃতি বর্ণনায় নৈশতার আধিপত্য দেখি। তাঁর প্রকৃতিভূবনে 'শুধু হিম কোথায় যে রয়েছে গোপন/অঘ্রাণ খুলেছে তারে'; সেখানে সবকিছুর ওপর লেগেছে 'বিকালবেলার ধূসরতা'। আর এ শীতাবহ বিষণ্ন নিসর্গের জগতে এসে পড়ে যেটুকু আলো, তার উৎস খররৌদ্র কি তীব্রসূর্য নয়; 'কার্তিকের নরম রোদ', কখনো বা 'গোধূলির রক্তিম আকাশ', 'আলেয়ার বাষ্প' কিংবা 'জ্যোৎস্নার বিস্ময়'। জীবনানন্দ নিজেই জানিয়েছেন, কোনোকিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করার চেষ্টায় রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করার প্রয়াস, যাকে হয়তো কবি-জগৎ বলা যেতে পারে। আর তাই একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক, কেন এ প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতাবলীতে কবিকল্পনার আশ্রয় হয়ে উঠলো এক নিরালোক বসন্তহীন ম্লান ধূসর প্রকৃতিজগৎ। এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে চোখ ফেরাতে হয় এসব কবিতার জন্মকালের দিকে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সকল কবিতাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের বিপর্যয়ের ঘনিষ্ঠ, অন্তত রচনাকালের দিক থেকে।[১৪] আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এসব কবিতার জগৎ রূঢ় বাস্তব নয়, কাব্যের বিষয় প্রাত্যহিক পৃথিবীর সমস্যা সংঘর্ষ নয় :

উৎসবের কথা আমি কহি নাকো
পড়ি নাকো দুর্দশার গান।

'কয়েকটি লাইন' কবিতায় এ উক্তি কবি নিজেই করেছেন। কিন্তু স্বসৃষ্ট কবিজগতের ভেতর বাস্তব বাস্তব-ই থাকে না, বাস্তবকে ফলিয়ে দেখা হয়। এবং তা-ই যদি হয়, বিশ্বযুদ্ধের সদস্যসমাপ্ত অধ্যায়ের কোনো উত্তরসূরি অনুভব এ কাব্যে পরোক্ষ প্রতিফলনে আশ্বস্ত হয়েছে কিনা বুঝে নেয়া দরকার। অগ্রজ গ্রন্থ 'ঝরপালক' যতই তুচ্ছ এবং বিস্মরণীয় মনে হোক না কবির কাছে, এ প্রসঙ্গে তারও কিছু গুরুত্ব থেকে যায়। কারণ, ১৯২৮-এ প্রকাশিত 'ঝরাপালকে'র কবিতাগুলির রচনাকাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা তার অব্যবহিত পরে হওয়াই সম্ভব। আরো দেখি, ওই কাব্যে জাগ্রত জগৎকে কবি অপরূপ মধুর সানন্দ দেখেন নি বরং প্রচলিত চিন্তা আর শৈলীর আড়াল থেকে তিনি দেখেছেন 'ব্যাধবিদ্ধ ধরণীর রুধির লিপিকা', 'ছিন্নবাস নগ্নশির ভিক্ষুদল', 'নিষ্করুণ এই রাজপথ'। এবং সেখানে যখন তিনি বলে ওঠেন—

১৪. 'এ বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৬৩ সনের মধ্যে রচিত হয়েছে।' জীবনানন্দ দাশ আদি সংস্করণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ভূমিকা।

মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা
হেমন্তের বিদায়কুহেলি—

তখন ভাবা যেতে পারে, এক লাঞ্ছিত, ব্যাহত বাস্তবের জ্বালা থেকে কবি মুক্তি খুঁজছেন নিসর্গজগতে। সেই সন্ধান আশ্বস্ত হয়েছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রগাঢ় 'ধূসর প্রকৃতিচেতনা'য়। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য 'বোধ' এবং 'স্বপ্নের হাতে'র মতো দু'টি ভিন্নস্বাদী কবিতা। বক্তব্যের দিক থেকে বিচারে দু'টি কবিতাই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রধানত মননির্ভর এ দুই অনবদ্য রচনাই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র তীব্র ইন্দ্রিয়মগ্ন অনুভূতিগ্রাহ্য নিসর্গবলয়িত কবিতাবলী থেকে স্বতন্ত্র। দু'টি রচনাতেই পাই নির্মাণ ও প্রয়াণের এক অনতিপ্রখর আকাঙ্ক্ষা; পৃথিবীর পথ ছেড়ে নক্ষত্রের পথে (বোধ) কিংবা দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে 'ধূসর স্বপ্নের দেশে' পাড়ি দেয়ার ইচ্ছা। 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা'র কবিতার পর কবিতায় নিসর্গচিত্রের যে অজস্রতার মধ্যে কবিকল্পনা আবেগের মুক্তি খুঁজেছে, প্রকৃতির পরিব্যাপ্ত পটভূমিতে দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ ও স্পর্শের বিরাট ভোজের যে বিচিত্র আয়োজন জীবনানন্দ তাঁর একালের কাব্যে উপস্থিত করেছেন, তারপর আর সন্দেহই থাকে না যে, 'বিশুদ্ধ কবিজগৎ সৃষ্টির মধ্যেই কল্পনার মুক্তি বলে কবি মনে করতেন, সে জগতের আশ্রয়ভূমি একালের কাব্যে নিসর্গ। কিন্তু মনে রাখা দরকার, স্বপ্নের প্রয়াণে কল্পনার উদ্যমে এই যে নিসর্গজগৎ নির্মিত হয়ে উঠলো, তা বাস্তবকে 'ফলিয়ে দেখাতে চায়' কবিচেতনার 'শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরে'। 'ঝরাপালকে'র অনুকৃতিশীল রচনার উচ্ছ্বাসে ছিল এক ধরনের তরল ভাবাবেগসর্বস্বতা, যার ফলে সেখানে আছে 'বাস্তবের রক্ততট' থেকে পলায়নের উদ্যম। কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে আবেগ ও স্বপ্নের যে মুক্তি নিসর্গভূমিতে আশ্রিত, তা আর পলায়নের নামান্তরমাত্র হয়ে ওঠেনি। এখানে বাস্তবের বিরুদ্ধতা ও গ্লানি কবিমানসে প্রতিফলিত আলোয় এক শিল্পিত অন্যতর রূপে বর্তমান। যে 'ধূসর ম্লান পরিমণ্ডল' বা 'ধূসর প্রকৃতি-চেতনা'র কথা আগেই উল্লেখ করেছি, তার উপস্থিতির তাৎপর্য এখানেই। 'প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন'[১৫] এ কথা অর্ধসত্যমাত্র। যদি মনে রাখি, জীবনানন্দের একালের কাব্যে প্রকৃতিভুবনের যে ঋতুর অধিকার, তার নাম শীত, যদি দেখি, সে জগতে ঝরাপাতা, হলুদতৃণ, কুয়াশা, হিম এক ক্ষয়িষ্ণুতার রূপকেই প্রকট করছে, যদি কবিবচনে বিশ্বাস রাখি যে, 'কবিজগতে' বাস্তবকে ফলিয়ে দেখা হয়, তাহলে বলবো 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কাব্যবস্তু যে ক্ষয়শীল জীবন, নিসর্গের যে নশ্বর রূপের ঐশ্বর্য, মৃত্যু এবং সব রাঙা কামনার পরিসমাপ্তির বেদনা—সে সবকিছুই ভাব-অবলম্বন পেয়েছে প্রকৃতির ধূসর, শীতার্ত, ম্রিয়মান রূপের মধ্যে। তাই এ পর্যায়ের কাব্যে জীবনানন্দকে 'সুদূর স্বপ্নাবিষ্ট'[১৬] মনে হতে পারে বটে, কিন্তু কবির স্বপ্নের আশ্রয়ভূমি সেই প্রকৃতিভুবনে রয়েছে এক ব্যাপ্ত বিলয়ের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত নিসর্গের অপরূপ সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য। এক বিষণ্ন মৃদু সুরের আবর্তন উত্থিত করেছে স্বপ্নপ্রয়াণের এক বিষাদ মধুর সংগীত :

১৫. বুদ্ধদেব সবু : 'কালের পুতুল'।
১৬. 'কালের পুতুল, : বুদ্ধদেব বসু।

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে—
হৃদয়ে বেদনা জমে; স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই!

জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতির নির্জন রূপের প্রশান্তি দেখে আমরা অনেকেই অভিভূত হই; কিন্তু যাঁরা তাকে পলায়নী মানসিকতা বলেন, আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। কারণ, একদেশদর্শিতায় তাঁরা পূর্বাপর বিকাশের ধারাটি সম্পর্কে অন্ধ থেকে তাঁর প্রকৃতি চেতনার গভীরতাটুকু পরিমাপ করেননি। এ পর্যালোচনায় কিভাবে কবিচেতনায় 'প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল প্রধান আশ্রয় ('চরম')। আর কিভাবেই বা সেই প্রকৃতি বাস্তবকে 'ফলিয়ে দেখাতে চেয়ে' বহন করেছে এক ব্যাপ্ত হৈমন্তিক বিষাদ ও মরণশীলতার আবহ, তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখে এ পর্যায়ের আলোচনার শেষ টানতে চাই। জীবনানন্দ লিখেছেন :

...আমাদের হৃদয়ের ব্যথা
দূরের ধুলোর পথ ছেড়ে
স্বপ্নেরে—ধ্যানেরে
কাছে যেকে লয়!—

এ উচ্চারণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের অন্তিমে আবৃত্ত; এখানে স্বপ্নকে ধ্যানের সমার্থক করে কবি তাকে গভীর মর্যাদা দিয়েছেন দেখি। ধ্যানের-ই মতো স্বপ্ন হৃদয়কে প্রশান্তির এক অসামান্য অর্জনে পৌঁছে দেয়, এ কথাই হয়তো তিনি বলতে চান। এ স্বপ্নাশ্বস্তিকে কবি এক মহিম মানসিক অর্জনের অনুরূপ মূল্যে গ্রহণ করেছেন। 'স্বপ্নের হাতে' কবিতাটিতে তিনি আরো বলেছেন, কবিমানসে বাস্তবের প্রত্যাঘাতে এই যে স্বপ্নজগৎ নির্মিত হয়, তা অমরতায় অভিষিক্ত। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতার পর কবিতায় যে সৌন্দর্যের মরণশীলতার উপলব্ধিজাত বেদনার বিস্তার, তাকে অতিক্রম করে গ্রন্থের এ শেষতম কবিতায়। [প্রথম সংস্করণ] কবি স্বপ্নকে দেখেছেন মৃত্যু-আহত পৃথিবীর বিপরীতে অনশ্বরতার আলোকে—

পৃথিবীর পুরানো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার,—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়।

আবার এ শেষতম কবিতাটিতেই স্বপ্নকে ধ্যানের সঙ্গে যুক্ত করে জীবনানন্দ তাকে দিয়েছেন এমন এক প্রশান্তির তাৎপর্য, যা পরবর্তী পর্যায়ে 'বনলতা সেন' গ্রন্থে অভিব্যক্ত প্রকৃতিচেতনার নবীনতম তাৎপর্যের দিক, প্রকৃতির প্রশান্তিমূল্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এ কাব্যভাষণটিকে।

'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলিকে জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ের অঙ্গীভূত বলে মনে করা হয়, প্রধানত আন্তর-প্রমাণের নিরীখেই; তদুপরি রয়েছে কবি ভক্ত

শ্রীঅশোকানন্দ দাশের সাক্ষ্য : 'এসব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।' এসব কবিতায় জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনার নতুন কোনো উদ্ভাসন তাই তেমন প্রত্যাশিত নয়। উপলব্ধি এখানেও আগের-ই মতো প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়াসক্ত; সেই এক-ই ম্লানাভামণ্ডিত ধূসর ও কোমল নৈসর্গিক পরিমণ্ডলে কবিচেতনা নির্জন মন্থর পাদচারণ আগের-ই মতো ব্যাপৃত। অশোকানন্দের ভূমিকাতে আমরা আরো পাই, এসব কবিও 'গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ-প্রসূতি...নির্ভর'। 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলী জীবনানন্দের নিসর্গবীক্ষায় ও তার কাব্যায়নে যা কিছু নবীনতার স্বাদ এনেছে, তা উদ্ভূত হয়েছে বাংলার একান্ত নিজস্ব পল্লীআবহের বিষাদমধুর অপরূপতা থেকেই। গ্রামবাংলার নিসর্গচিত্র 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলীতে সঞ্চারিত করেছে এমন এক ঘনিষ্ঠ দেশজ আবেগ, যা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে অনুচ্চারিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহাবিষ্ট এক অনুপুঙ্খ অবলোকন তাঁর কাব্যে আমরা আগেও পেয়েছি; পেয়েছি সে সৌন্দর্যের আরক্ত আস্বাদনের সব উত্তাপ। কিন্তু 'রূপসী বাংলা'র 'সার্বিকবোধে এক শরীরী'[১৭] এ সনেটগুচ্ছে জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনার যে নতুন বিশিষ্টতা দেখি, তার অনেকটাই এসেছে এর প্রকৃতিলোকের দেশজ আঞ্চলিক চরিত্র থেকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলার অতীত গরিমার এক চারণিক সংগীত, যার অনেকটা অনতিদূর ইতিহাসের কোনো লুপ্ত অধ্যায়ের শৌর্য ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত, আবার অনেকটাই লোকায়ত, উপকথাভিত্তিক কাহিনীবৃত্ত থেকে আহরণ করেছে তার বিষণ্ণতা ও সৌন্দর্য। নিসর্গের যে অপরূপতা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত জেনেই কবির চেতনা বিষণ্ণতার বোধে ভারাক্রান্ত হতে দেখেছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র জগতে, তার-ই সঙ্গে ইতিহাসের ঢের লুপ্ত অধ্যায়ের গরিমা ও কীর্তির নশ্বরতার বিষণ্ণ উপলব্ধির সংযুক্তি জীবনানন্দের এসব কবিতায় একটি নূতনতর চরিত্রলক্ষণ নিয়ে এসেছে, যা তাঁর আগামী রচনায় আরো বড় আয়তনে ও তাৎপর্যে অর্থময় হয়ে উঠেছে। নিসর্গের রূপাবিষ্ট ইন্দ্রিয়াসক্ত অনুপুঙ্খ অবলোকনের ভিত্তিভূমি থেকে স্বপ্নপ্রয়াণের যে আকাঙ্ক্ষাতীব্রতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'কে দিয়েছে অনন্য স্বকীয়তা, 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলীতে সে বিশিষ্টতাও প্রবলভাবে উপস্থিত। কিন্তু তার সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে নবোৎসারিত ইতিহাসবোধ, যা একালে স্পষ্টভাবেই রোমান্টিক দূরমনস্কতা এবং অতীতচারিতার লক্ষণাক্রান্ত। তবু নিসর্গচেতনায় ইতিহাসবোধের এ অনুপ্রবেশ ও সঞ্চার জীবনানন্দের পরিণত কাব্যসৃষ্টির একটি বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণের পূর্বসূচনা করছে 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুচ্ছে।

স্বপ্ন ও জীবনের অনতিক্রম্য ব্যবধান, যা মৃত্যুও বিনাশ করতে অপারগ, তার এক বিষাদ মধুর অনুভূতির মধ্য হতেই উত্থিত 'রূপসী বাংলা'র চতুর্দশপদী সংগীতের মূর্ছনা :

> সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
> আমি চলে যাব বলে
> চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
> নরম গন্ধের ঢেউয়ে?

১৭. 'রূপসী বাংলা'র ভূমিকা : অশোকানন্দ দাশ।

এ মুখবন্ধী চরণগুলি বিশ্লেষণ করলেই দেখি, কবির চেতনায় 'সোনার স্বপ্নের সাধ'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে নিসর্গলোক, যা 'চালতাফুলের' দেশজ উল্লেখে চিহ্নিত করেছে গ্রামবাংলার প্রতিবেশ; আর কবির নিসর্গানুভূতির প্রবল ইন্দ্রিয়মগ্নতার প্রকাশ ঘটেছে 'নরম গন্ধের ঢেউয়ে', গন্ধকে একইসঙ্গে আঘ্রাণের অতিরিক্ত এক স্পৃশ্য ('নরম') ও দৃশ্য ('ঢেউ') ব্যঞ্জনা দিয়ে। এ 'রূপসী বাংলা'র সনেটপরম্পরা আমাদের পৌঁছে দেয় এক মায়ালোকে—রূপকথার জগতে, 'যেন কোন কাহিনীর দেশে', যেমন জীবনানন্দ নিজেই বলেছেন। তখন বুদ্ধদেবের সেই মন্তব্য : 'প্রকৃতির নির্জন ও ধূসর রূপের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন।' যথার্থ মনে হয় ভিন্ন একটি গ্রন্থ-প্রসঙ্গে। এ রূপকথালোক তবু রচিত হয়েছে নিসর্গের প্রচ্ছায়ে, যে নিসর্গ গ্রামবাংলার আঘ্রাণ নিয়ে কথা কয়ে উঠেছে কবিতার পর কবিতায় : 'এই ডাঙা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে/বটের শুকনো পাতা যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনেঃ/ছড়ায়ে রয়েছে তারা প্রান্তরের পথে পথে নির্জন অঘ্রাণে।' গ্রামবাংলার প্রকৃতির এ নির্জন প্রছন্ন রূপের মধ্যে জীবনানন্দ আবিষ্কার করেছেন তাঁর নিসর্গনিবিড় রূপকথাভূমির রাজকন্যাকে :

> কোন এক রাজকন্যা— পরনে ঘাসের শাড়ি—কালো চুল ধান
> বাংলার শালিধান—আঙিনায় ইহাদের করেছে বরণ,
> হৃদয়ে জলের গন্ধ কন্যার—ঘুম নাই, নাইকো মরণ—
> তার আর কোনোদিন—পালঙ্কে সে শোয় নাকো, হয় নাকো ম্লান,
> লক্ষ্মীপেঁচা শ্যামা আর শালিকের গানে তার জাগিতেছে প্রাণ—
> সারাদিন—সারারাত বুকে করে আছে তারে শুপুরির বন।

এ উচ্চারণে বাংলার নিসর্গলোকের প্রাণসত্তাটিই যে কবির স্বপ্নজগতের শ্রেয়সী, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। প্রকৃতির সৌন্দর্যের তাৎক্ষণিক উদ্ভাসন প্রায় এক-ই সঙ্গেই আমাদের কবির মনে নিয়ে এসেছে তার মরণশীলতার বিষণ্ন উপলব্ধি। এ সময়কার সকল কবিতায় পাশাপাশি আর একটি সুর বেজে উঠেছে 'রূপসী বাংলা'য়, তা হলো নিসর্গের এ ইতিবৃত্তধারাচারী অমরতার দিকটি। যে সৌন্দর্য আজ কবিচিত্তকে মথিত করেছে আনন্দ-বেদনাঘন আস্বাদনে, সেই রূপ-ই একদা উদ্বেলিত করেছিল চাঁদ শ্রীমন্তর মতো ইতিবৃত্তের নায়কদের কি রায়গুণাকর রামপ্রসাদের মতো অনতিদূর ইতিহাসের কবি-পুরুষদের :

> মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
> এমনই হিজল-বট তমালের নীলছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
> দেখেছিল...

অথবা

> ...শ্রীমন্তও দেখেছে এমন
> যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের সিন্ধুর মেঘে হয়েছে অবাক,
> সুদূর প্রবাস থেকে ফিরে এসে বাংলার শুপুরির বন

দেখিয়াছে—অকস্মাৎ গাঢ় নীল; করুণ কাকের ক্লান্ত ডাক
শুনিয়াছে—সে কত শতাব্দী আগে ডেকেছিল তাহারা যখন।

এভাবেই দেখা যাবে, প্রকৃতিচেতনার বিকাশের ধারায় 'রূপসী বাংলা' অনতিস্ফুট করেছে কতকগুলি নূতন কুললক্ষণ—নিসর্গসৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়মগ্ন উপলব্ধি ও তার নশ্বরতার বিষণ্ন বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতির রূপের মৃত্যুহীন আবেদনের সত্যটি; নিসর্গলোকের প্রচ্ছায়ার সঙ্গে ইতিবৃত্তের আবহ জড়িত হয়ে শৌর্য ও সৌন্দর্যের এক অপ্রাপনীয় মায়ালোক রচনা করেছে, যার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে কবির চেতনার উদ্বর্তন এবং স্ফূর্তি :

...রূপ যেই স্বপ্ন আনে স্বপ্নে যেই রক্তাক্ততা আছে,
শিখেছিল সেইসব একদিন বাংলার চন্দ্রমালা রূপসীর কাছে;
তারপর বেত বনে, জোনাকি ঝিঁঝির পথে হিজল আমের অন্ধকারে
ঘুরেছে সে সৌন্দর্যের নীলস্বপ্ন বুকে করে,—
('একদিন এই দেহ ঘাস থেকে')

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মতো এ কাব্যেও বাস্তবের বিরুদ্ধতার বিপরীতে রাখা হয়েছে স্বপ্নজগৎকে। তফাৎ সে জগৎ আশ্রিত হয়েছে দেশ-কালের চিহ্নিত ভূগোলে, ইতিবৃত্তমদির এক নিসর্গলোকে :

ঘাসের প্রকাশ আমি দেখিয়াছি অবিরল,—পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনাতে
ঢেকে আছে; দেখিয়াছি বাসমতী, কাশবন আকাঙ্ক্ষার রক্ত অপরাধ
মুছায়ে দিতেছে যেন বারবার...

এবং লক্ষণীয়, কবির চেতনায় এ নিসর্গজগতের একটি মূল্যমহিমাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির চির নবায়মান জীবনের স্ফূর্তি ও সৌন্দর্যই মানবজীবনের ক্লান্তি, বেদনা ও 'রক্তআকাঙ্ক্ষার' গ্লানি স্খলন করে দিতে পারে।

জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনার বিকাশের ধারায় 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলী চিহ্নিত করেছে আদিপর্যায়। পরবর্তী গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'। 'বনলতা সেন' নানা বিচারেই বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র দিকচিহ্ন হয়ে আছে। তাঁর প্রকৃতিভাবনার উদ্বর্তনেও এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি উজ্জ্বলতায় মণ্ডিত। পাঠক এ গ্রন্থেই পায় তাঁর কাব্যসৃষ্টির এক পরিণত মননঋদ্ধ অথচ আবেগস্পন্দিত প্রকাশ, যা একটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে। উত্তরপর্যায়ে 'মহাপৃথিবী' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত কবির চেতনা সমাজ ও সময়ের আলোড়নে এমন-ই অভিভূত যে, প্রকৃতির প্রশান্তলোক থেকে বহুদূরে বিচ্যুত এক অন্বেষা-অস্থির নাবিকের মতো দিশাহীনতার অন্ধকারে আত্মসত্তাকে আবিষ্কার করেন তিনি। আবার একেবারে শেষের দিকের কিছু রচনায়, প্রকৃতির অপরাজেয় প্রশান্তির জগতে প্রত্যাবর্তিত হয়ে জীবনানন্দ এক হরিৎ 'আলোপৃথিবী'র সংকল্পনায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছেন।

'বনলতা সেন'-এর আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে যে বিষয়টি সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তা হলো তাঁর এ সময়কার কাব্যে প্রকৃতিলীনতার প্রবল আসক্তি। তাঁর আদি পর্যায়ের কবিতাবলীতে নিসর্গসৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়াসক্ত অনুভব কবির চেতনায় এনেছিল স্বপ্নাচ্ছন্ন মদিরতা; প্রকৃতির আকর্ষণ তখনো ছিল তাঁর কাছে অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত অনুভূতির প্রাবল্যে রচিত হয়ে উঠেছে 'স্বপ্নের এক কবিজগৎ', যাকে জীবনানন্দ রেখেছেন বাস্তবের বিপরীতে; 'ব্যাধবিদ্ধ ধরণীর রুধির লিপিকা থেকে দূরস্থ এক ধূসর-স্বপ্নের দেশে' 'হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী' যেখানে ঢেউ তুলে 'তৃপ্ত' হয়। আদি পর্যায়ে স্বপ্ন আর বাস্তব দুই বিপরীত বিন্দু, দুই ভিন্ন ভুবন। কবির স্বপ্নপ্রয়াণের ব্যাকুল আগ্রহ তাই বারেবারেই ব্যাহত বাস্তবের প্রত্যাঘাতে : 'দেহের ছায়ার মতো আমার মনের সাথে মেশে কোন স্বপ্ন—এ আকাশ ছেড়ে দিয়ে কোন্ আকাশেরে খুঁজি ফিরি।' এ জাতীয় পঙ্ক্তির মধ্য দিয়ে আভাসিত যে স্বপ্নাশ্রিত নিসর্গভুবন, তাঁর ধ্যান বা কল্পনা বার বার ভেঙে যায়। কেননা, 'পিছে ছুটে আসিতেছে বৈকাল-সকাল পৃথিবীর', 'যেন কোন মায়াবীর নষ্ট ইন্দ্রজাল কাঁদিতেছে ছিঁড়ে গিয়ে।' তাই একথা বললে ভুল হয় না, নিসর্গের অপরূপ বিষণ্ন মাধুরী দিয়ে ঘেরা যে জগতে কবিচেতনা 'সুস্থিরতা লাভ করার চেষ্টায়' আশ্রয় খুঁজেছিল সে জগতে প্রয়াণের ব্যথা ও বাধা অনুচ্চারিত ছিল না 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়েও। 'বনলতা সেন'-এ প্রকৃতি কিন্তু আর কোনো দূরস্থ আশ্রয়ী-জগৎ নয়, কোনো কাম্য অগম্য স্বপ্নের ভুবন নয়—কবির চেতনায় আরো নিকটবর্তী, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপানুভূতির অধিগত নয়, প্রশান্তি ও স্থিরতার এমন এক জগৎ, যেখানে কবিচিত্ত আশ্রয় পায়, দীর্ঘ অন্বেষার পর, এক সচেতন আত্ম-অবলোপী নিমজ্জনে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে প্রকৃতি তাঁর কাব্যে পটভূমি কি পরিপ্রেক্ষিত; কখনো বা তা হয়ে উঠেছে স্বপ্নরূপময় এক নৈসর্গিক কল্পজগৎ। সে পর্যায়ে কবির ভূমিকা ছিল প্রধানত এক ঘনিষ্ঠ দর্শকের মুগ্ধ অবলোকনের, কখনো বা বাস্তবতাড়িত এক প্রয়াণপ্রয়াসীর। 'বনলতা সেন' পর্বে জীবনানন্দের কাব্যে প্রকৃতি আরো বড়, আরো গভীর চেতনার আয়তনে নবমূল্যায়িত। নিসর্গ এ কালের কাব্যে মানব অস্তিত্বের মূলাধার, প্রকৃতিলীন এক সত্তার নবায়মানতায় উদ্ভাসিত। এ প্রসঙ্গে দু'টি কবিতা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে—'আমি যদি হতাম' ও 'ঘাস'। নিসর্গ আশ্রিত যে কবিজগৎ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর 'রূপসী বাংলা'য় স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, তার সঙ্গে বাস্তব-পৃথিবীর ব্যবধানের অনতিক্রম্যতা বারেবারেই কবির স্বপ্নপ্রয়াণকে বিঘ্নিত করেছে।[১৮]

সেই নিসর্গজগৎই যেন এ পর্যায়ের জীবনানন্দকে উত্তীর্ণ করেছে এক নূতন জায়মান চেতনায় : নিসর্গের জীবনের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিতে পারলেই মানুষ পেতে পারে ব্যাহত বাস্তবের জ্বালা ও হতাশা থেকে মুক্তি, প্রকৃতির সেই অবোধবিদ্ধ নির্লিপ্তির শান্তি। 'রূপসী বাংলা'য় তিনি অনুভব করেছিলেন, আমাদের 'রুক্ষ প্রশ্ন, ক্লান্ত ক্ষুধা, স্ফুট মৃত্যু' নিয়ে পৃথিবীর পথে আমরা ঢের আঁচড়, ঢের প্রশ্ন রেখে যেতে পারি শুধু। অন্যদিকে 'ঐ মরালীরা, কাশ ধান রোদ ঘাস' মানুষের সেই 'ক্লান্ত

১৮. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'স্বপ্নের হাতে' কবিতাটি উল্লেখ্য।

বেদনারে' ঢেকে দেয় তাদের সহজ স্বচ্ছল প্রাণপ্রবাহের অবিনাশী উচ্ছ্বাসে। ('মানুষের ব্যথা আমি'।)

'বনলতা সেনে'র আদি সংস্করণের বারোটি কবিতার মধ্যে দু'টিতেই তিনি চাইছেন প্রকৃতিলীন এক অস্তিত্ব—তার জৈব প্রাণময়তার মধ্যে আত্ম-অবলোপী আত্তীকরণ। যে ঘাসের অবিরল প্রকাশের কথা তিনি 'রূপসী বাংলা'য় শুনিয়েছেন, 'যে মরালীদের স্বচ্ছন্দ বিচরণে তিনি দেখিয়েছিলেন প্রশ্নচিহ্নলীন এক প্রাণোচ্ছলতা, তারাই আবার প্রত্যাবর্তিত হয়েছে 'বনলতা সেনে' প্রতীকী দ্যোতনায়, তাঁর চেতনার জগতে প্রকৃতিভাবনার এ নবপ্রসৃতিকে অভিব্যক্ত করে।

'আমি যদি হতাম' কবিতাটিতে দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ঝাউয়ের শাখা, নিম্নভূমির জলের গন্ধ, শিরীষ বনের সবুজ লোমশ নীড় রচনা করেছে নৈসর্গিক অস্তিত্বের প্রায় রূপকথাগন্ধী এক আবহ, যেখানে 'রক্তের স্পন্দন' অনুভব করে হংসমিথুন। সে জীবনেও আছে মৃত্যু—গুলির শব্দ এসে ভেঙে দেয় রতিবিহারের রম্যতা। পাখায় পিস্‌টনের উল্লাসে নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে বুনোহাঁস পাড়ি দিতে চায় উত্তরে; কিন্তু শিকারীর গুলির আঘাতে এসে পড়ে প্রাণোচ্ছল জীবনে একটি ছেদ—'আমাদের স্তব্ধতা, আমাদের শান্তি'। তবু কবি চান, এ জৈব নৈসর্গিক জীবনের পূর্ণ স্বচ্ছলতা ও শান্তি. আর ব্যর্থ পরাহত মানবিক অস্তিত্বের অবলোপ। কেননা 'আমি যদি বনহংস হতাম বনহংসী হতে যদি তুমি', তাহলে থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো মৃত্যু, 'টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার'। [আদিতে 'মহাপৃথিবী'র] 'ঘাস' কবিতাটিতেও এ আত্মবিলোপী নৈসর্গিক নিমজ্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত। যখন লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভরে গিয়েছে

ভোরের বেলা, তখন সমস্ত কবিচেতনা অনুরণিত হয়ে উঠেছে এ প্রাকৃতিক প্রাণপ্রবাহের অবিনাশী প্লাবনে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে : 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-পাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে'। প্রাকৃতিক জীবনের সপ্রাণতা, জৈব নির্লিপ্তি ও নিশ্চিন্ত শান্তির মধ্যে আত্ম-অবলোপের এ সচেতন আগ্রহ 'বনলতা সেন' গ্রন্থে জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনায় শুধু নবীন স্বাদ আনেনি, তার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে সচেতন মননঋদ্ধ এক নিসর্গ-অনুধ্যান। নিসর্গরূপের ইন্দ্রিয়সংরাগী আস্বাদন, বা তাকে ঘিরে অপ্রাপনীয় কোনো স্বপ্নজগৎ রচনা. বা সে জগতে প্রয়াণের তীব্র ব্যাহত আকাঙ্ক্ষাই শুধু নয়, কবি অনুভব করেছেন প্রকৃতির জীবনের সঙ্গে সাঙ্গীকরণের এক প্রয়োজন। যেন দূরবিহারী নিসর্গরূপধ্যান নয়, প্রকৃতির প্রবল প্রাণসচ্ছলতার সঙ্গে অস্তিত্বের চূড়ান্ত সংযোগ-ই যেন মানবকে দিতে পারে তার প্রার্থনীয় প্রশান্তির আশ্রয়। পূর্ব পর্যায়ের কবিতাবলীতে ছিল প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়াসক্ত কল্পনার অবিরল অজস্রতা; দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ ও ঘ্রাণের এক অপরূপ নিসর্গভুবন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে কল্পনাপ্রতিভার মায়াবী সংশ্লেষে। ইন্দ্রিয়মগ্ন অনুভবের অনবদ্যতা 'বনলতা সেন' গ্রন্থটিতেও অনুপস্থিত নয়; তবে তার উচ্ছ্বাস যথেষ্ট সংবরিত হয়েছে কবির মননশীল উপলব্ধির গুণে। 'নরম সবুজ আলো' বা 'সুস্বাদ অন্ধকার'-এর মতো প্রয়োগ আমাদের মনে করিয়ে দেয় পূর্বলক্ষিত বহুপ্রস্থ ইন্দ্রিয়াবিষ্টতার উত্তরাধিকার। এখানে

দৃষ্টির বিষয়ীভূত 'আলোকও' কবির চেতনায় স্পর্শসংবেদনাময় হয়ে উঠেছে; 'অন্ধকার'-এর মতো বিমূর্ত ভাবনাও আস্বাদ্য হয়েছে সেই মানসিকতার ইন্দ্রিয় সংরাগী উচ্চারণে। একাধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংমিশ্রণী প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে বর্ণনা ও চিত্রকল্পের যে শিল্প জীবনানন্দের নিসর্গবীক্ষায় সঞ্চারিত করেছিল অনন্যতা, তা 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে উপস্থিত থেকেও উচ্ছল হয়ে ওঠেনি অবারিত উৎসাহে। বরং যথার্থ শিল্পীর মনোযোগ ও সংযমে কবি সে বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেছেন মননধর্মী নিসর্গচিন্তার অনুকূলে।

এ কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতাটি নানা কারণেই বিশ্রুতখ্যাতি। কোনো সার্থক কবিতার অবয়বে প্রচ্ছন্ন থাকে অর্থের যে হীরক দ্যুতি, তা 'শতবার ঘুরি, বিচ্ছুরিত করে দেয় শত আলোকের ছুরি'। সেদিক থেকে দেখলে 'বনলতা সেন' সংবেদনশীল পাঠকের কাছে বারেবারেই বহন করে আনবে নব নব অর্থের সম্ভারে ঢের নবীন উদ্ভাসন। আমাদের কাছেও প্রকৃতিচেতনার বিবর্তনের ইতিহাসে 'বনলতা সেন' কবিতাটি সার্থকনামা হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের সমকালীন কাব্যপ্রবাহে প্রকৃতিশীল এক সত্তার সম্পূর্ণ নবীন ও বিশিষ্ট ধারণাটির উদ্ভাসে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত প্রতিটি গ্রন্থই কবির প্রখর অভিভাবকতায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির ভাষা ও ভাষণে এমন এক প্রতীকী তাৎপর্য প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত, যা তাঁর কাব্যের অর্থ অনুধাবনের সহায়ক। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি প্রকৃতির যে পাঠ নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর পাণ্ডুলিপি, তা 'ধূসর সেখানে এক ম্লান হিম নিসর্গজগৎ, আর তার ব্যাপ্তি হৈমন্তিক বিষাদের বাঙ্ময় বিস্ময়। এখানে নামকরণ তার আক্ষরিক অর্থ (যা গ্রন্থ-ভূমিকায় উল্লিখিত) অতিক্রম করে এক প্রতীকী দ্যোতনা বহন করছে। সেই ইন্দ্রিয়নির্ভর নিসর্গানুভূতিই পরবর্তী পর্যায়ে জীবনানন্দকে উত্তীর্ণ করেছে প্রশান্তি ও করুণার আশ্বাসবহ এক প্রকৃতিলোকের চেতনায়। 'বনলতা সেন' এ দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থ, যখন প্রকৃতিলীন অস্তিত্বের সচ্ছল শান্তির মধ্যে, জৈব প্রাণোচ্ছ্বাসের মধ্যে, কবির চেতনা বাস্তবে যা ব্যাহত ও বিপর্যস্ত, সেই মানব-অস্তিত্বের মুক্তির আশ্রয় খুঁজে পায়। 'বনলতা'—এ নামটিই যথেষ্ট ইঙ্গিতময়: এ যেন এক প্রকৃতি (নিসর্গ) ভাবসাযুজ্য পায় আর এক প্রকৃতি (নারী)-র মধ্যে। জীবনানন্দের কাব্যে প্রতীকী-ব্যঞ্জনার নবপ্রসূতির তথ্যটি স্মরণে রেখেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-উত্তর কবিতাগুলি পড়া উচিত। কবির একালের রচনায় প্রেম 'প্রকৃতির শোভা ভূমিকায়' উপস্থিত যেমন, তেমন-ই নারী এসেছেন বার বার নানা মূল্যবোধের আধারিকারূপে। 'বনলতা', 'শ্যামলী', 'সুরঞ্জনা', 'সুচেতনা'—এসব কবিতার বাইরের আয়োজনে যেন কোনো নারী উপস্থিত বলে মনে হলেও নিবিষ্ট অনুধাবনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের কোনো না কোনো মূল্যবোধ, অথবা শাশ্বত মানব অভীপ্সার-ই ভাবরূপ যেন তাঁরা।

বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় প্রকৃতিভাবনার আলোকে 'বনলতা সেন' কবিতাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। ষষ্ঠচারণিক তিনটি স্তবকে সম্পূর্ণ কবিতাটি ক্রমপর্যায়ে অন্বেষা, আবিষ্কার ও অনুধ্যানের একটি পরম্পরা রচনা করেছে এবং সার্থক শিল্পিত প্রতীকের অন্তরাল থেকে উদ্ভাসিত করছে শান্তি ও সৌন্দর্যের এক প্রকৃতিলোক। প্রথম স্তবকে একটি দীর্ঘ ক্লান্ত অন্বেষণের চিত্র—যে অন্বেষণের নায়ক ইতিহাসের বিস্তৃত

সময়চিহ্নহীন প্রান্তরের পথিক ('হাজার বছর ধরে' 'বিম্বিসার অশোক' ও 'বিদর্ভনগরে'র উল্লেখ স্মরণীয়), যার অন্বিষ্ট সফেন জীবন সমুদ্রের মধ্যে এক 'শান্তির' আশ্রয়। কবির ব্যক্তিসত্তার অভীপ্সা এখানে বিশ্বজনীনতা লাভ করছে প্রতীকের বিমূর্তায়ন ও সঙ্কেতের মধ্য দিয়েই। এ কবিতায় দীর্ঘ পদচারণার উন্মোচনী চিত্রটি ইতিহাসে প্রোথিত থেকে মানবের সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় যাত্রা ও উত্তরণের জীবন-সত্যটি ব্যক্ত করছে। কবি স্পষ্টতই নিজেকে 'ক্লান্ত প্রাণ' বলে অভিহিত করেছেন—সে ক্লান্তির ভার তিনি যে অনুভব করেন হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে ব্যর্থ, পরাহত নাবিকীর পরিণামে। সেই ইতিহাসকাল থেকে মানবের এষণাতাড়িত এ ক্লান্তি শেষ পর্যন্ত শান্তিব আশ্বাস পেয়েছে বনলতা সেনের কাছে, প্রকৃতিপ্রতিম এক নারীর কাছে, যিনি বন-লতা।

ইতিহাসের পটভূমিতে এ দীর্ঘ ভৌগোলিক বিচরণের পরে দ্বিতীয় স্তবকে আসে আবিষ্কারের বিস্ময় ও আনন্দ, যা সঞ্চারিত হয়ে যায় বনলতা সেনের মুখশ্রীর কারুকার্যময় স্থাপত্য রূপের বিস্ময়বোধে। 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলীতেই পাঠক লক্ষ্য করেছিলেন কিভাবে ইতিবৃত্ত তার শৌর্য ও সৌন্দর্যের গরিমাময় ঐতিহ্য নিয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে জীবনানন্দের নিসর্গচিত্রণে। নিসর্গ ও ইতিবৃত্তের সেই রূপকথাধর্মী সংশ্লেষ 'বনলতা সেন' কবিতাটিকে আরো বড় ও ব্যাপক ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য দিয়েছে। প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের অন্বেযাপ্রবণ চিরমানবপ্রাণের সংগ্রাম ও অভীপ্সার দ্বিস্তর ব্যঞ্জনা অভিব্যক্তি পেয়েছে একটি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে আশ্রিত থেকে। যে মুহূর্তে কবি বলে ওঠেন, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি', সেই মুহূর্তেই ব্যক্তি অস্তিত্বের পরিধি অতিক্রম করে তিনি একাত্ম হয়ে ওঠেন নবসভ্যতায় উত্তরণের যাত্রী মানবাত্মার সঙ্গে। তারপরেই পরাহত নাবিকের চিত্রকল্পটি 'সবুজ ঘাসের দেশে' ও 'দারুচিনি-দ্বীপে'র অনুষঙ্গে নিয়ে আসে প্রকৃতির অপরাজেয় ঐশ্বর্য ও প্রশান্তিব অবিচল জগতের ইঙ্গিত; সেখানেই কবি আবিষ্কার করেন 'বনলতা সেন'কে তাঁর নীড়ের আশ্বাসবহ চোখ তুলে প্রতীক্ষারত। কবিতার আবয়বিক পরিমণ্ডলে এ বনলতা নাটোরের। এখানে 'নাটোর' কোনো ভৌগোলিক প্রামাণ্যের দায়িত্বে উপস্থিত নয়, যেমন 'সেন' পদবীটিও একটি বিমূর্ত ভাবসত্তায় মানবিকতা আরোপের জন্য এসব অনুপুঙ্খ প্রয়োজনীয় ছিল। বনলতা সেন নাটোরের—হয়তো সে কবির প্রিয় পরিচিত নাটোরের-ই; প্রিয়, পরিচিত অথচ বিস্মৃত; কিন্তু নবীন আবিষ্কারে মহনীয় সত্তায় সে যেন উদ্ভাসিত। তেমন-ই প্রকৃতির সঙ্গে মানবের জীবনের মহনীয় সত্তায় সে যেন উদ্ভাসিত; তেমনই প্রকৃতির সঙ্গে মানবের জীবনের গভীর যোগ থাকা সত্ত্বেও মানুষ শান্তি ও সৌন্দর্যের ব্যর্থ সন্ধানে ঘুরেছে দীর্ঘ ইতিহাস বিকীর্ণ পথে পথে; শেষ পর্যন্ত দিশাহীনতার অন্ধকারে আকস্মিক সাক্ষাতে আবিষ্কার করেছে প্রকৃতির পরম প্রত্নআশ্রয়।

চূড়ান্ত স্তবকটিতে এ আকস্মিক আবিষ্কার একটি উজ্জ্বল অর্জনে রূপান্তরিত। নিসর্গের কিছু অপরূপ চিত্রের সন্নিবেশ রচনা করেছে প্রার্থিত প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল। বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় ইন্দ্রিয়নির্ভর সৌন্দর্যানুভূতির স্বাক্ষর রয়েছে এসব চিত্রকল্পের উপাদানে; 'শিশিরের শব্দ' কিংবা 'রৌদ্রের গন্ধ' একাধিক ইন্দ্রিয়কে আমন্ত্রণ

জানায় এক-ই সৌন্দর্যাস্বাদে। বিশেষ লক্ষণীয়, চিত্রকল্পগুলি বহিরঙ্গের এ আয়োজন ছাড়াও তাদের ভাববস্তুর দিক থেকেও একটি প্রত্যাবর্তন ও প্রশান্তির আবহ রচনা করেছে : চিলের চংক্রমণ শেষ হয়ে আসে, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের পটে জোনাকির অক্ষরে তখন লেখা হয় এক গল্প—যে কাহিনী চিরকালীন, তবু রূপকথার-ই মতো চির আবেদনময়ী। হাজার বছরের পরিক্রমার পর ইতিহাসের বিকীর্ণ ধূসর জগৎ থেকে কবি ফিরে আসেন অন্বেষায় ক্লান্ত নাবিকের মতন দ্বীপের আশ্রয়ে—সে দ্বীপ বনলতা সেন, নিসর্গের অপরাজেয় শান্তির আশ্রয় : 'থেকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। শেষ চরণের এ 'অন্ধকার' শব্দটি আবার গূঢ়ার্থময়। প্রথম স্তবকে অন্বেষার দিশাহীনতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছিল 'নিশীথের অন্ধকারে'—ব্যর্থ সন্ধানের অন্ধকারময় নিশীথ যাত্রার পটভূমিতে এক আকস্মিক সাক্ষাতের বিস্ময় বহন করে তাৎপর্যবহ করছে নবীন আবিষ্কারের সংকেত—এ 'অন্ধকার' সবুজ ঘাসের দেশ আর দারুচিনি দ্বীপের নিসর্গ ভূগোলের আবহে উদগত হয়ে ঘন বনানীর নিবিড় শান্তির কথা বলে। তৃতীয় স্তবকে কিন্তু সকল চিত্রকল্পের আয়োজনে রয়েছে এক অনির্বচনীয় দিব্য প্রশান্তি. স্থিরতা ও কোমলতার আভাস, যখন 'অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছলছল শব্দে জেগে উঠব না আর'। 'নদীর ছলছল শব্দ' নিয়ে আসে ইন্দ্রিয়মগ্ন চেতনা প্রবাহের ইঙ্গিত। সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত চৈতন্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কবি পেয়েছেন 'গভীর অন্ধকারের ঘুম'। আর পরবর্তী চরণগুলি অনিবার্যভাবেই জানিয়ে দেয় সেই ঘুম প্রকৃতির-ই কোলে, নিসর্গপৃথিবীর আশ্রয়ে 'ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে'। তাই 'বনলতা সেন' কবিতাটির শেষ স্তবকের এ 'অন্ধকার' শব্দটি অর্থের নতুনতর দিগন্ত উন্মোচিত করে। 'আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার'—যাব নিবিড় অমাতিমির হতে উদ্ভাসিত হয় 'যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে' তার মুখশ্রী। প্রকৃতি-পৃথিবীর অপরাহত প্রশান্তির আশ্রয় চিরকাল-ই মানবাত্মার অপেক্ষায় রয়েছে; হাল ভেঙে যে নাবিক হারিয়েছে দিশা শেষ পর্যন্ত 'সৈকতের সত্যের মতো প্রকৃতির সবুজ ঘাসের দেশেই পেয়েছে তার অভীপ্সার নীড়।'

এভাবেই 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি জীবনানন্দের ক্রমপরিণতিশীল প্রকৃতিচেতনার উদ্বর্তনে সংযুক্ত করেছে এক মননঋদ্ধ অনুধ্যান, যা প্রতীকে প্রোথিত হলেই গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী। ইন্দ্রিয়-সংবেদী চৈতন্যে নিসর্গানুভূতির মদিরাচ্ছন্নতাকে অতিক্রম করে জীবনানন্দের মানসভূমি এ পর্যায়ের কাব্যে বার বার এক মননঋদ্ধ আবেগময়তায় স্পন্দিত। শুধুমাত্র স্বপ্ন ও স্মৃতির অনুষঙ্গবাহী হয়ে নিসর্গ এখন আর তাঁর কাছে কোনো দূর ঐশ্বর্যময় কল্পলোক নয়, বরং তাঁর চেতনার সমীপবর্তী এমন এক জগৎ, যার সঙ্গে একাত্মীকরণ সম্ভব বলেই মনে হয়েছে কবির কাছে।

সিগনেট সংস্করণের পরিবর্ধিত 'বনলতা সেন' আদি সংস্করণের বারোটি ছাড়াও আর যোলোটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়। আন্তরধর্মের ঘনিষ্ঠতার দিকে লক্ষ্য না রেখে জীবনানন্দের মতো মননশীল শিল্পী নিশ্চয়ই এ সংযোজন অনুমোদন করেননি। এসব সংযোজিত কবিতার অনেকগুলিতেই প্রেমও প্রকৃতির প্রেক্ষিত নিয়ে অর্থের গূঢ় গভীরতা পেয়েছে। যেহেতু জীবনানন্দের কবিতায় প্রেমচেতনার বিবর্তন এ পর্যালোচনায় একটি

স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়ীভূত, বর্তমান প্রসঙ্গে সেসব কবিতায় বিস্তৃত আলোচনায় বিরত থাকছি। তবু উল্লেখ না করে পারা যায় না, সুররিয়ালিস্ট মণ্ডকলায় সমৃদ্ধ তাঁর 'বুনোহাঁস' বা 'হরিণেরা' কবিতা দু'টির কথা। মগ্নচৈতন্যের জলামাঠ ছেড়ে যে বুনোহাঁস উড়ে যায় রাত্রির কিনার দিয়ে ইঞ্জিনের মতো শব্দে কোনো নক্ষত্রলোকের দিকে, তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় কবির কল্পনার নির্বাধ উল্লাস। 'কল্পনার হাঁস সব' এ উল্লেখটিই পাঠকের হাতে তুলে দেয় অর্থরহস্যের চাবিকাঠি। 'পৃথিবীর সব ধ্বনি ও রঙ' মুছে গেলে, অর্থাৎ বাস্তব বা ইন্দ্রিয়সংবেদী পৃথিবীর সব গোচর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে, অগ্রাহ্য করে এসব 'কল্পনার হাঁস' তাদের অপার উল্লাসে উড়ে বেড়ায় 'হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার' ভেতর। এখানেও দেখি, কবির কল্পনা যা প্রেমাবেগস্পন্দিত ('অরুণিমা সান্যালের মুখ') আশ্রয়ী ভুবন হিসেবে গ্রহণ করেছে নিসর্গ-পৃথিবীর প্রত্নরূপ। 'হরিণেরা' কবিতাটিতেও ঠিক এমনইভাবে মুক্তির উল্লাসে ভরা এক অপরূপ নিসর্গলোক নির্মিত হয়েছে, যেখানে ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় পলাশের বনে রূপালি চাঁদের হাত থেকে মুক্তা ঝরে পড়ে শিশিরের পাতায়, আর 'হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে'। তবে কবিতার প্রারম্ভেই কবি যখন পাঠকের হাতে তুলে দেন সংকেত, 'স্বপ্নের ভিতরে বুঝি' বলে, তখন সন্দেহ থাকে না, তাঁর চেতনায় স্বপ্নের জগৎ আর ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার নিসর্গ জগৎ অভেদাত্ম হয়ে গেছে কল্পনা প্রতিভার সংশ্লেষী ধর্মে।

'বনলতা সেন' গ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতার ভাব-অবলম্বন যদি প্রেম হয়, তবে সে প্রেম তার সহস্রমুখী উপলব্ধির প্রতিরূপ খুঁজেছে এক নৈসর্গিক চেতনালোকে। পটভূমি কি পরিপ্রেক্ষিত নয়, প্রকৃতি জীবনানন্দের শিল্পিত সংবিত্তি 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে।

পরবর্তী গ্রন্থ 'মহাপৃথিবী'কে কবি নিজেই সংলগ্নগ্রন্থ হিসেবে দেখে থাকবেন, যেমন সিগনেট সংস্করণের সম্পাদক দাবি করেছেন।[১৯] প্রথম প্রকাশকালে এ গ্রন্থে 'বনলতা সেন'-এর সবক'টি কবিতাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। হয়তো এ সিদ্ধান্ত তখনকার মতো ঠিক-ই ছিল; আবার পরবর্তীকালের কাব্যচারিত্র্যের নিরীখে ঠিক ছিল না বলে কবির মনে হতে পারে। কারণ, দ্বিতীয়বার 'বনলতা সেন' যখন প্রকাশিত হয়, কবির জীবৎকালেই তখন কিন্তু সেই পরিবর্ধিত সংস্করণে 'মহাপৃথিবী'র সবক'টি কবিতাকে কবি স্থান দেননি; মাত্র দু'টি কবিতাই তাঁর শেষতম নির্বাচনে অন্তর্ভুক্ত হয় এ নূতন সুপরিসর সংস্করণটিতে। যেহেতু 'বনলতা সেন'-এর পরিবর্ধিত সিগনেট সংস্করণ জীবনানন্দের 'অভিভাবকতায়' প্রকাশিত হয়, আমরা আলোচনার অবলম্বন সেই গ্রন্থটিকে করেছি। সেভাবেই কবির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী'র আদি সংস্করণটিকেই আমরা আলোচনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি। সেদিক থেকে 'মহাপৃথিবী'কে সংলগ্ন-গ্রন্থ হিসেবে মেনে নিতে খুব আপত্তি হবার কথা নয়।

শব্দের অভিধাকে প্রতীকী বিস্তার দিতে জীবনানন্দ ছিলেন অনায়াসদক্ষ। 'মহাপৃথিবী' গ্রন্থের নামকরণ-ই এর ভাববস্তুকে আভাসিত করেছে প্রতীকী ব্যঞ্জনায়;

১৯. 'মহাপৃথিবী' : ১ম সিগনেট সংস্করণ, বৈশাখী, ১৩৭৬।

'মহাপৃথিবী' অর্থে আরো বড় কোনো জগৎ, যেখানে শুধু নিসর্গলোক নয়, আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়'ও[২০] কাব্যের বিষয়ীভূত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দের এ 'মহাপৃথিবী' নিসর্গপৃথিবী আর মানবপৃথিবীর সমাহার : ত্রিভুবনচারী লিরিক কবির সেই দ্বিতীয় অনুধ্যান, সমাজ, জীবনানন্দের এ পর্যায়ের কাব্যে একটি বড় জায়গা নিয়েছে। পরিণামে, এক দ্বিমুখী আকর্ষে কবির চেতনা আলোড়িত। নিসর্গ তার নিজস্ব সৌন্দর্যের উৎসাহে সমান উজ্জ্বল থেকে ক্রমেই কবির চেতনায় দূরাপসারিত; সে চেতনাকে তখন অধিকার করেছে, আচ্ছন্ন করেছে 'জীবনের বিষ'। দেশ ও কালের আপৎ অভিঘাতে, মানব-ভবিষ্যের চিন্তায়, যুদ্ধতাড়িত পৃথিবীর মূল্য বিনষ্টি ও নৈরাজ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে কবির চেতনা অধিকৃত হয়েছে এমন এক আর্ত, বিমূঢ় অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানে, যে শাণিত বিদ্রূপে ও তিক্ত ব্যঙ্গে অভিষিক্ত হয়েছে তাঁর কবিতার ভাষা। নিসর্গকে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়ানুভূতির যে সুস্বাদ রমণীয়তা পাঠক তাঁর কাব্যসৃষ্টির আদি পর্যায়ে পেয়েছিলেন, যে শিল্পিত সুষমায় 'বনলতা সেন' পর্যায়ে সব কবিতা চিহ্নিত, তার অনেকটাই এখানে অনুপস্থিত। এবং উপস্থিত যখন, তখন তা শুধু ক্ষণিক উদ্ভাসে। এ পরিবর্তনের একটিই কারণ। যে প্রকৃতি পৃথিবীতে জীবনানন্দের কবিচেতনার সহজ ও স্বচ্ছন্দ বিহার, যেখানে প্রয়াণের অভীপ্সা এবং সাঙ্গীকরণের সংরাগ এ তাবৎ তাঁর কবিতায় একটি সুষম সঙ্গতি সঞ্চারিত করেছে, প্রকৃতির সেই অপরাজেয় সৌন্দর্য ও প্রশান্তির জগৎ থেকে উৎপাটিত হয়ে কবির চৈতন্য বিমূঢ় দিশাহীনতায় ঘুরে আপৎকালীন পৃথিবীর পথে পথে। একদিকে সমাজ ও সময়ের আপৎকালীন অভিঘাত, অপরদিকে চেতনার আত্মসন্ধী উদ্‌ভ্রান্তি ও বিপন্নতার বোধ জীবনানন্দের একালের কাব্যে এনেছে অপূর্বব্যক্ত উপলব্ধির আর্তি ও তীক্ষ্ণতা। চিত্ররূপময় হৈমন্তিক নিসর্গ-পৃথিবী থেকে সমকাল ও প্রতিবেশ চিহ্নিত এক যুধ্যমান জগতে পৌঁছে তাঁর চেতনা যেমন 'অভিজ্ঞতার সারবত্তায়' সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমন-ই স্খলিত হয়ে পড়েছে সান্ত্বনা ও শান্তির আশ্বাসবহ এক পরিপূর্ণ কল্পনিসর্গের আশ্রয় হতে।

মনে হয়, 'মহাপৃথিবী'র নতুন কবিতাগুলি রচনার সময় থেকেই জীবনানন্দের কাব্যভাবনায় একটি আমূল বিপ্লব নিঃশব্দে ঘটে চলেছিল। তার-ই ফলশ্রুতি হিসেবে দেখি, চল্লিশের দশকের শেষে, পঞ্চাশের গোড়ায়, জীবনানন্দের প্রায় সব ক'টি কবিতা বিষয়ক নিবন্ধে বারেবারেই একটি নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্ত : 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার' বা 'ইতিহাসবেদের দরকার এবং সমাজবেদের'[২১]; কিংবা 'কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা এবং মর্মে থাকবে কালজ্ঞান'।[২২] এইসব সুন্দর সদুক্তিগুলি অচিরকালের মধ্যেই কবির লেখনী নিঃসৃত হয়েছিল। তবে একথাও মনে রাখা দরকার প্রাসঙ্গিকভাবে, যে 'ভাবপ্রতিভাজাত অন্তঃপ্রেরণা'ই 'শুদ্ধ প্রতর্কের আশ্রয়ে' পরিশীলিত হোক এ-ই তিনি চাইতেন, এবং তাই ইতিহাস বা সমাজচেতনার কোনটির-ই কবিতাকে গ্রাস করা উচিত নয়, সেগুলি কখনই কবিতায় 'উত্তমর্ণ' হিসেবে উপস্থিত

২০. 'কবিতার কথা' : 'কবিতার কথা', পৃষ্ঠা, ২০ : সিগনেট সংস্করণ
২১. 'কবিতাপাঠ' : পূর্বাশা, আষাঢ়, ১৩৫৬।
২২. 'উত্তররৈবিক বাংলাকাব্য' : ময়ূখ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬১।

হবে না, এসব কথা বেশ স্পষ্টতার সঙ্গেই জীবনানন্দ লিখেছিলেন। সেসব স্মরণে রেখে 'মহাপৃথিবী' থেকে 'সাতটি তারার তিমির'-এর দিকে অগ্রসর হলে পাঠক জীবনানন্দের ক্রমপরিণতিশীল চেতনায় প্রকৃতির নিরঙ্কুশ আধিপত্য ক্ষুণ্ন হতে দেখে ততট বিচলিত বোধ করবেন না। কবির চেতনার বিবর্তনে এ সন্ধিলগ্নের স্বাক্ষর বহন করছে আদিসংস্করণ 'মহাপৃথিবী'র নতুন কবিতাগুলি, এবং সমকালীন অন্যান্য অনেক কবিতা, যার কিছুটা পরিচয় 'মহাপৃথিবী'র নতুন সিগনেট সংস্করণের সম্পাদক সংযোযিত 'আমিষাশী তরবার' অংশে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এ দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ কবিচেতনা প্রকৃতিব শাশ্বত মৃত্তিকামুখী আকর্ষণ এবং দেশকালের আপতিক উৎকেন্দ্রিক চাপ, দুই বিপরীতমুখী টানে দীর্ণ হয়তো বা মহনীয় করেছে তাঁর একালের কবিতা। 'ধানের ক্ষেতের গন্ধে মুছে গেছে কবে জীবনের থেকে যেন,'—এ রকম একটি ঋজু ভাষণে গ্রন্থের প্রথমতম 'নিরালোক' কবিতাটির আরম্ভ। পরস্তবকেই কবির গাঢ় নিসর্গলীনতার আকাঙ্ক্ষা বাঙ্ময় ওঠে : অনেক নক্ষত্র ভরা রাতের আকাশের নিচে ফাল্গুনের ছায়ামাখা ঘাসে শুয়ে তাঁর মনে হয়, 'এখন মরণ ভালো' কেননা 'শরীরে লাগিয়া রবে এইসব ঘাস'। কিন্তু এ রমণীয় নিসর্গমগ্নতাকে ভেঙে দিয়ে 'হামিদের মরকুটে কানা ঘোড়া' হেঁচে ওঠে। এমনইভাবে, প্রতীকের অন্তরাল থেকে বাস্তবের প্রত্যাভিঘাত এসে পড়ে কবির চেতনাজগতে, এবং কবিতাটির অবয়বে, নিসর্গের মায়ালোকে। কবিতার শেষ অংশে তাই যেন সেই সান্ধশ্রীময়ী নিসর্গজগতের-ই কাছে কবির ব্যাকুল প্রশ্ন : 'সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি, কোন পথে ঘরে যাবো! কোথায় উদ্যম নাই, কোথায় আবেগ নাই,—চিন্তাস্বপ্ন ভুলে গিয়ে শান্তি আমি পাবো?'

দ্বিতীয় চরণটি হয়তো অসতর্কভাবে কোনো নিবিষ্ট পাঠককে মনে করিয়ে দিতে পারে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নিসর্গরূপাবিষ্ট স্বপ্নজগতের কথা। উদ্যম চিন্তায় উজ্জীবিত, আবেগ স্বপ্নে আশ্রিত; কিন্তু কবি এখানে চিন্তা এবং স্বপ্ন দু'টিকেই অতিক্রম করে এক প্রশান্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। স্বপ্নপ্রয়াণের আবেগ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে লক্ষণীয়: প্রশান্তি যা একমাত্র প্রকৃতিজগতের সঙ্গে একাত্মীকরণেই লভ্য, তার স্বাদ আমরা 'বনলতা সেন'-এ পেয়েছি। নক্ষত্র তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছে : 'অথবা ঘাসের পরে শুয়ে থাকো আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে, অর্থাৎ, স্পষ্টতই কবির 'নিজের ঘর' অর্থাৎ দেশকালবদ্ধ যে সামাজিক মানবিক পৃথিবী এবং ঘাস-নক্ষত্রের নিসর্গজগতের যে অবিচল রূপ, এ দুয়ের কোন সমীকরণ সম্ভব নয়। অতএব দ্বন্দ্ব; দুই ভিন্নমুখী আকর্ষে দীর্ণ কবির আত্মসত্তার আর্ত বিমূঢ়তা; নিসর্গলোকের প্রচ্ছয় ভেঙে তাঁর ইন্দ্রিয় সংবেদী চেতনা মানবলোকে, নিরাশার খাতে' ঘুরে বেড়ায়। তাই কবির কাছে—

> পৃথিবী ক্রমশ তার আগের ছবি—
> বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী হয়ে আছে,
> অপরিচিতের মতো সমাজ সংসার শত্রু সবই...

'নিরালোক',-এর সমকালীন একটি কবিতা 'সিন্ধুসারস' শুধু মহাপৃথিবী গ্রন্থটির-ই নয়, জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যসৃষ্টিলোকের উজ্জ্বলতম এক জ্যোতিষ্ক। 'সিন্ধুসারস'ও

সংক্ষুব্ধ এ দ্বিভুবনচারিতার দ্বন্দ্বে। কবির কল্পনায় মালাবার ফেনার সন্তান সেই পাখি হয়ে উঠেছে এক, প্রাকৃত প্রাণোল্লাসের প্রতীক। তার নৃত্যময় দু'টি ডানার ছন্দ মানবের মনে জাগিয়ে তোলে প্রয়াণের স্বপ্ন, নির্মাণ করে 'নতুন সমুদ্র এক, সাদা রৌদ্র সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ'। এখানে বর্ণনার প্র'তিটি অনুপুঙ্খই এক প্রকৃতিভুবনের স্বপ্ন লালন করছে। তবু মানুষের এ স্বপ্নজগৎ ও প্রয়াণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পাখির নেই কোনো আত্মিক যোগ। তার জৈব প্রাণেষণার কাছে অজ্ঞাত, 'যে রক্ত ঝরেছে তারে 'স্বপ্নে' বাঁধে 'কল্পনার নিঃস্বপ্ন প্রভাত'। 'পৃথিবীর সব পথ ছেড়ে দিয়ে একা বিপরীত দ্বীপে' মানুষেরা যে স্বপ্ন নির্মাণ করে নেয়, তা নিসর্গলোকের-ই এক অলৌকিক প্রতিমা; সিন্ধুসারস সেই স্বপ্নের ঐকান্তিকতা জানে না। একবার এ স্বপ্নজগতের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মানুষের কাছে 'পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো নিভে' শুধু থাকে 'গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা', 'ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন'। এ সবকিছু থেকেই বহুদূরস্থ সিন্ধুসারস তবু তার উড্ডীয়মান ডানার সঙ্গীতে উল্লাসে মানুষের মনে জাগিয়ে দেয় স্বপ্ন, প্রয়াণের এক তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা। কবিতার তৃতীয় স্তবকে সেই স্বপ্নজগৎকে জীবনানন্দ চিনিয়ে দিয়েছেন ধানসিঁড়ি নদী, হলুদ পাতার গন্ধ আর সোনালি চিল ও মেঘের দুপুরের অনুষঙ্গে :

ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো সাদা ডানা,
যদিও এ-পৃথিবীর স্বপ্নচিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

'আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ'—এভাবেই স্বপ্ন ও বাস্তবের ব্যবধানের ইঙ্গিত বহন করে এ অনবদ্য কবিতাটি, যার জন্যেই হয়তো বা শেষ চরণকটিতে ধ্বনিত হয় এক বিদায়মূর্ছনা, যা কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল বিদায়ের অনুরূপ।

আসলে জীবনানন্দের কবিসত্তা বর্ধিত হয়েছিল এক যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, এবং তাঁর পরিণতিশীল চেতনা ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছিল আর এক যুধ্যমান পৃথিবীর দিকে। এক বিবদমান বিশ্বের আসন্ন বিপন্নতার দায়ভাগ সৎ কবির মতই তাঁর চেতনা আরো অধিকতর মাত্রায় গ্রহণ করছিল। নিসর্গের অপরূপতার জগৎ থেকে, ইন্দ্রিয় সংরাগী রূপাবিষ্টতা থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর কবিতা, শোচনীয় কালের বিপাকে 'আবর্তিত হয়ে যায় দানবের মায়াবলে'। সে কারণেই হয়তো একালে তাঁর কাব্যের নায়ক 'বিপন্ন বিস্ময়ে' ক্লান্ত হতে হতে একগাছি দড়ি হাতে একা একা গেছে অশ্বত্থের কাছে, 'যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা এই জেনে'। 'বনলতা সেন'-এর 'আমি যদি বনহংস হতাম' কবিতাটির বিশ্বাসভূমি থেকে এ-চেতনা অনেক দূরের জিনিস। অবশ্যই বিশ শতকী অস্তিত্বের দায়ভাগ বহন করে 'আট বছর আগের একদিন' আমাদের মানসিকতার অনেক নিকটবর্তী। দেশ, কাল ও সমাজের আপতিক টান ক্রমেই তাঁকে প্রকৃতির নিভৃত সান্ত্বনার আশ্রয় থেকে উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করছিল 'সাতটি তারার তিমির'-এর আগ্রাসী তিমিরাচ্ছন্নতার বাস্তব ভূগোলে। আদি সংস্করণ 'মহাপৃথিবী'র শেষতম কবিতাগুচ্ছের ('প্রেম অপ্রেম' কবিতা) কয়েকটি চরণ এ প্রসঙ্গে খুব-ই তাৎপর্যপূর্ণ :

তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চলে গেলে কবে।
সেই থেকে অন্যপ্রকৃতির অনুভবে
মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত হয়ে জেগে উঠেছে হৃদয়।

'অন্য প্রকৃতির' কথাটি 'অন্য প্রকার' অর্থে নেয়া সম্ভব হয় না, যখন পড়েন দেখি জীবনানন্দ আবার লিখছেন :

সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চলে গেছে
ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করছে।

একদিকে ইন্দ্রিয় সংবেদী চেতনার জগৎ, অন্যদিকে গ্রন্থধৃত মানব অভিজ্ঞতার শিক্ষা, সবকিছুই তাঁর যুদ্ধধ্বস্ত উপলব্ধির কাছে অলীক, ছায়াসার মনে হয়েছে। নিসর্গানুভূতির এ দূরাপসৃতির পটভূমিকায় 'সাতটি তারার তিমির'-এর নিরন্ধ্র আঁধারের জগতে প্রবেশ করে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পাঠক হয়তো বা কিছুটা বিমূঢ় বোধ করতে পারেন এ বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল পৃথিবীর 'ঋণরক্ত লোকসান ইতর খাতক' ভরা মানবসমাজের দিকে তাকিয়ে। তবু এ অভিজ্ঞতা 'মহাপৃথিবী'র পাঠকের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। আগেই বলেছি, যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও প্রশান্তির জগতে জীবনানন্দের বিচরণ সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, 'আরো বড় চেতনার লোকে' উত্তরপ্রবেশ করে তা থেকে তিনি ক্রমেই বিচ্যুত হচ্ছিলেন, এ 'বড়চেতনার' আশ্রয়, 'মহাপৃথিবী'র কবিতার ভাষায়, 'মানবিক ভিত্তি আর পংকিল সময়স্রোত'। সৎকবিতার অন্তরে 'সমাজবেদের' পরিচ্ছন্ন তাড়না থাকা প্রয়োজন বলে জীবনানন্দ উল্লেখ করেছিলেন। আবার তিনি এ-ও জানতেন, 'আমরা যে সময়ে বাস করছি, দু'-দুটো যুদ্ধে ও নানারকম বড় অনর্থ অত্যাচারে তা ভেঙে ধসে যেতে থাকলেও জীবনের সব কাজ-ই যুক্তি সফলতায় দাঁড় করাতে হলে যে ধরনের সমাজ নমনীয়তার প্রয়োজন',[২৩] তা বিরল। এসব অভিজ্ঞতার সারাৎসারে পুষ্ট হয়েছে 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের অন্য কবিতাবলীর জগৎও—মূল্যবোধের বিপর্যয়ে চিহ্নিত এক 'বিশৃঙ্খল শতাব্দী', 'মধ্যবিত্তমদির' এক 'তিমিরবিলাসী' সমাজ। তবু ইতিহাসচেতনার পরিশুদ্ধিতে তিনি 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির' থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার অন্তঃশীল প্রেরণার হৃদয়স্পন্দন সভ্যতার অন্তরে বার বার অনুভব করে শেষ পর্যন্ত 'নিরাশার খাতে' আপন চেতনাকে বয়ে যেতে দেন নি। সে বিষয়টি এ গ্রন্থের অন্য একটি অধ্যায়ের আলোচনার প্রসঙ্গ। প্রকৃতিচেতনার বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে 'সাতটি তারার তিমির' ও সমকালীন কবিতাবলী (যার অনেকগুলি 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় গ্রন্থিত) তাদের নেতিবাচক গুরুত্বেই একালে কবির মানসিকতায় উৎকীর্ণ। অবশ্য তার তাড়নায় কোন বিষণ্ন বিলাপ বা দূরবিহারী প্রয়াণস্বপ্নে কবি উজ্জীবিত হননি; কারণ, 'মানবসমাজের ঘনঘটায়' তাঁর চেতনা অধিকৃত ছিল। দু'-একটি কবিতার উল্লেখ প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায়। 'ভাষিত' কবিতার প্রথম ক'টি চরণ এরকম :

২৩. 'কবিতার কথা' : 'সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা'।

আমার এ জীবনের ভোরবেলা থেকে
যেসব ভূখণ্ড ছিল চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার,
একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল
আমাদের দু'জনার মতো দাঁড়াবার
তিন ধারণের স্থান তাহাদের বুকে
আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই।

কত সহজ সংকেতময় উচ্চারণে কবি এ নিরাশা ভারাক্রান্ত অন্ধকার ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে অন্য এক উজ্জ্বল পৃথিবীর স্মৃতিতে মার ধ্যানস্থ হয়েছেন', যে পৃথিবী নিসর্গের আবহে বাঙ্ময়। জীবনানন্দের সন্ধিপর্বের এ জাতীয় রচনায় নিসর্গের উদ্দীপ্তি স্মৃতিবাহিত, স্বপ্নোজ্জ্বল নয়। 'জনান্তিকে' কবিতায় যে কবি বলেন, 'তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ', 'দীপ্তি' কবিতায় তাঁর-ই কণ্ঠস্বর : 'এছাড়া কোথাও কোনো পাখি নেই,/বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই,/তবু এক দীপ্তি রয়ে গেছে,। উদাহরণ অজস্র করা যেতে পারে; তার প্রয়োজন নেই। 'ইতিহাসচেতনা' ও 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানের' নির্দেশে কবি উপলব্ধি করেছেন : 'নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে' তিমিরবিনাশী এক নিরন্তর প্রয়াণে নাবিকের মতো সৈকতের সত্যের অন্বেষায়। কিন্তু 'নবপ্রস্থানের' কথা উল্লেখ করেই 'জনান্তিকে' কবিতায় তিনি বলে ওঠেন :

চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনো ভোরের জনান্তিকে
চোখে থেকে যায়
আরো-এক আভা :
আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর
হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজের জিনিস
হয়ে তুমি রয়ে গেছ।

'দীপ্তি' কবিতায় বসন্তের অনুষঙ্গে জীবনানন্দ অবিনশ্বর মানবহৃদয়-নিহিত আভার কথাই বলেছেন। তার-ই আলোকে যখন 'সূর্যতামসী' কবিতার নিচে উদ্ধৃত চরণগুলি উদ্ভাসিত হয়, বুঝতে অসুবিধা হয় না, জীবনানন্দ যে প্রশান্তি-সুন্দর পৃথিবীর অলোকিত আবির্ভাবে প্রত্যয়ী ছিলেন, সে পৃথিবী নিসর্গের শান্তি ও সুষমায় আশ্রিত : 'তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে সূর্যালোকিত সব সিন্ধু-পাখিদের শব্দ শুনি'। 'সাতটি তারার তিমিরে' তাঁর বিপন্ন চেতনার দেশে 'তিমিরবিলাসী' বিধ্বস্ততা কাটিয়ে উঠে 'উত্তর-প্রবেশ' ঘটেনি কোনো 'আরো বড় চেতনার লোকে' 'যেখানে বসন্তের উদার সমারোহ'। তবু সূর্যালোক, সমুদ্রের নীলিম বিস্তার আর পাখিদের কলকাকলির রূপকে অন্যতর নিসর্গাশ্রিত উজ্জ্বল পৃথিবীর ছবিই শেষ পর্যন্ত কল্পনার ধ্যানে ও প্রেরণায় গরিয়সী হয়ে উঠতে চাইছিল এক 'আলোপৃথিবী'র সংকল্পনায়। এ জাতীয় ভাবনার ইঙ্গিতময় উৎসার-ই এ সময়কার কাব্যের কুললক্ষণ।

জীবনানন্দের চেতনার জগতে প্রকৃতির প্রতি কবির আকর্ষণ এবং প্রকৃতিলীন অস্তিত্বের সঙ্গে সাঙ্গীকরণের আকাঙ্ক্ষা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে প্রেমের আবেগে; অন্যদিকে প্রেমের সূক্ষ্মতম উপলব্ধিগুলি আশ্রিত হয়েছে নিসর্গের নিজস্ব আনন্দ-বেদনার জগতে। একদিকে যেমন কবির চেতনায় 'তার মুখ মনে পড়ে এরকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর, পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে', অপরদিকে তেমন-ই চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে' প্রেমিকমিথুনকে দেখে তাঁর উপলব্ধিতে বেজে ওঠে অনন্য এক নিসর্গস্তব। তিনি অনুভব করেন, 'হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে ক্রমে যেখানে মানুষ আশ্বাস খুঁজেছে এসে' সেই 'ব্যাপ্ত প্রান্তরে'—তারা দু'জনেও আজ এসেছেন সেখানে 'যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে'; আবার সেখানেই—'বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের বলে'। তাহলেই দেখি, প্রকৃতিচেতনার বিবর্তনে জীবনানন্দের মানসিকতা অনেকদিন-ই অধিকৃত ছিল প্রকৃতির সান্ত্বনা, নির্লিপ্তির আশ্রয় ও প্রশান্তির অপরাহত শক্তির ধারণায়। মানুষের হৃদয়ে প্রেমের অপূর্ব উত্থান তিনি দেখেছেন; এ-ও বুঝেছেন যে, সে আবেগেরও একদিন নির্বাণ ঘটে। তখনো প্রকৃতির প্রশান্তির জগৎ তার সান্ত্বনার আশ্রয়ে স্থির অপরিম্লান থাকে স্বীয় সৌন্দর্যের ও শান্তির অবিরল উৎসারে।

জীবনানন্দের চেতনায় প্রকৃতি, কাব্যরচনার মধ্য পর্যায়েও, হৈমন্তিক নশ্বরতার অনুষঙ্গে পরিবৃত। 'দুজন' বা 'অঘ্রাণ প্রান্তর'-এর মতো কবিতায় সেই পরিমণ্ডল সুপরিসর বর্ণনায় বিধৃত, অন্যত্র ক্ষুদ্র বা বিক্ষিপ্ত; কিন্তু উজ্জ্বল উল্লেখে সঙ্কেতপ্রবণ। আদি ও মধ্য পর্যায়ের কাব্যে প্রায় মোহগ্রস্ত ইন্দ্রিয়াবিষ্টতা অতিক্রম করে মননঋদ্ধ অনুভূতির শক্তিতে নিসর্গের 'হৃষ্ট' রূপকার অনুভব করেছেন, মৃত্যুর পরিব্যাপ্ত প্রকৃত সত্য 'বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের বলে'। নিসর্গের নিজস্ব জগতেও যে জীবন ও মৃত্যুর অনিবার্যতা আর অধিকার অব্যাহত, সেই প্রজ্ঞার আশ্রয় থেকেই তিনি বলেন, 'নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব'। জামিরের বনে একাকী পায়রার ডাক শুনে কবির মনে পড়ে যায়, 'আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে' লীন সেই ঈপ্সিতাকে, যাকে চেয়ে পরাস্ত চেতনা জেনেছে, 'নিখিলের অন্ধকার' প্রয়োজনের শাসন মানুষের সব আকাঙ্ক্ষার উত্তেজকে সংবৃত করে। তাই 'প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির' আহ্বানে ক্রমশ তাঁর চেতনা স্থিত হয়, প্রেম ও অপ্রেম থেকে দূরে'। এ নির্মোহ মানসিকতার আবেগময় উদ্বর্তনে মধ্যপর্যায়ের কবিতাবলী চিহ্নিত। জীবনানন্দ একালে বার বার প্রতীকের অনতিপরিমিত স্পষ্টতর এক প্রকৃতিলীন মানব অস্তিত্বের অনুধ্যানে নিযুক্ত রেখেছেন আপন চেতনা। তাঁর সেই চেতনার স্পষ্টতর ও পরিণততর এক উদ্বর্তনের শিল্পিত অভিব্যক্তিতে দীপ্ত হয়ে আছে মৃত্যুর অব্যবহিত আগে লেখা কবিতার পর কবিতা। ১৩৬১-তে প্রকাশিত তাঁর সব কবিতায় ছড়িয়ে আছে এক আলোকদ্যুতি, যা উদ্ভাসে অনতিতীব্র হলেও সবসময়েই সঙ্কেতে গভীর। 'আলোকপত্র', 'আলোকপাত', 'আলোকপৃথিবী', আলোকস্তম্ভ', 'অবিনশ্বর'—এ জাতীয় শিরোনাম আর অজস্র চিত্রকল্প এবং শব্দের আলোকাভিসারী ব্যঞ্জনায় তার সেসব রচনা আনুপূর্বিক গরিয়সী হয়ে আছে। সহজলভ্য দু'একটি কবিতা বেছে নিয়েই আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।

তার আগে পাঠককে একটিবার চোখ ফেরাতে বলি 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থেরই প্রথমতম কবিতাটির দিকে। নাম 'আকাশলীনা'; উদ্দিষ্ট 'সুরঞ্জনা'। 'সুরঞ্জনা'র সাক্ষাৎ জীবনানন্দের পাঠক আর একবার পেয়েছেন 'বনলতা সেন' গ্রন্থে—প্রকৃতি পৃথিবীর প্রশান্তির ব্যাপ্ত পটভূমিতে চিরকালীন এক নারী প্রতিমায় কবি আভাসিত করেছিলেন মানব হৃদয়ের দুর্মরপ্রেম, যা সভ্যতা থেকে নবসভ্যতার যাত্রিক অন্বেষার ক্লান্তি আর সংগ্রামের উর্ধ্বে স্থিত এক চিরকালীন অন্বিষ্ট। আদিম দেহজ কামনা থেকে উত্তরিত হয়ে ঐ কবিতায় 'সুরঞ্জনা' তাই 'ভোরের কল্লোল' হয়ে রয়ে গেছে মানব হৃদয়ে :

তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে তবু আজ ভোরের কল্লোল।

প্রতীকের অন্তরালবর্তিনী সেই সনাতন পরমাগতি প্রেমকেই জীবনানন্দ আহ্বান জানালেন আর একবার 'সাতটি তারার তিমির'-এর সমাচ্ছন্ন আঁধারের জগৎ থেকে, যেখানে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে' বার বার মানব হৃদয় জেগে উঠেছে এক নিরর্থক কালিমায়। আমার কাছে খুব-ই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় যে, শেষ পর্যন্ত 'সাতটি তারার তিমির'-এর মতো গ্রন্থেও, যেখানে বা কিছু ধ্রুব, যা কিছু সুন্দর, তা এক সর্বাত্মক নিরর্থকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, কবি 'সুরঞ্জনা' তথা 'প্রেম'কে আহ্বান জানালেন এক নবীনতর হৃদয় অধিষ্ঠানে।

এ কবিতার একটি বিস্তৃততর বিশ্লেষণে আগ্রহী হব জীবনানন্দের প্রেমচেতনার আলোচনা ক্ষেত্রে। আপাতত লক্ষ্য করা যাক, প্রথম স্তবকেই নিষেধের নির্দেশ 'ওইখানে যেয়োনাকো তুমি, বলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে'; বিপরীতে কবি রেখেছেন প্রত্যাবর্তনের এক নৈসর্গিক পটভূমি; মাঠ, ঢেউ, নক্ষত্রের রাত :

ফিরে এসো সুরঞ্জনা,
নক্ষত্রের রূপালি আগুনভরা রাতে,
ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে,
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার,
দূরে থেকে দূরে, আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

সে আহ্বান শেষাবধি ধ্বনিত অনুরণিত হয়ে উঠেছে আগুনভরা রাত, মাঠ, ঢেউয়ের নিসর্গলোক থেকে কবির অন্তরলোকে ('হৃদয়ে আমার')। 'সুরঞ্জনা' তথা প্রেমকে কবি ডেকে আনছেন নক্ষত্রের আকাশ থেকে নিসর্গে, মাঠের তরঙ্গ থেকে চৈতন্যের নিহিত গভীরে।

এতো কথা বলার দরকার হয় এ কারণেই যে, যদিও সেই 'মহাপৃথিবী'র রচনাকাল ১৩৩৬-৪৮) থেকেই জীবনানন্দের চেতনার জগৎ ক্রমশ সরে আসছিল সংকল্পনাসৃষ্ট এক নিসর্গলোকের প্রশান্ত পরিমণ্ডল থেকে বাস্তবপৃথিবীর অস্তিত্বের গ্লানি ও সমস্যাবলীর কাছাকাছি, 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে যদিও তিনি যুদ্ধবিক্ষুব্ধ পৃথিবীর তীব্র সচেতন

অধিবাসী, তবু প্রকৃতি কোনদিন-ই তাঁর কাব্যে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যাত হয়নি, বর্জিত হয়নি কোনো অলীক স্বপ্নের আধারলোক হিসেবে। যেমন, তিনি নিজেই লিখেছেন, 'অন্তত মানব সমাজের ঘনঘটায় প্রকৃতি ও সময়ভাবনা দুর্গ দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে মিলিয়ে যাবার মতো নয়'।[২৪]

প্রকৃতিচেতনার সাময়িক প্রস্থান এবং প্রগাঢ়তর এক বিশ্বাসভূমিতে তার প্রত্যাবর্তন পঞ্চাশের দশকে জীবনানন্দের লেখা সব কবিতাতেই প্রজ্ঞার এক 'মনীয়' আভা সঞ্চারিত করেছে। 'মহাপৃথিবী'র কোলাহলের মধ্যে যে কবি বলেছিলেন,

কামানের থেকে নয়, এইখানে প্রকৃতি রয়েছে।

'সাতটি তারার তিমির'-এ পৌঁছে সেই কবি 'নীলিমার থেকে আরো দূরে' সরে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বুঝেছেন :

ক : প্রকৃতি আবিল কিছু; তবু-মানুষের প্রয়োজনমত তাতে
নির্মলতা আছে। আরো কিছু আছে তাতে....

খ : নবপৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে?

গ : হে অবাচী, হে উদীচী, কোথাও পাখির শব্দ শুনি, কোথাও
সূর্যের ভোর রয়ে গেছে বলে মনে হয়।

অন্তিম পর্বের অনেকগুলি কবিতার মধ্যে কবি তাই ফিরে আসেন প্রকৃতির প্রশান্তির কাছে। অনুচ্ছ্বসিত কিন্তু গাঢ়তর বিশ্বাসের উজ্জ্বলতায় তাঁর সৃষ্টির শেষতম বিবর্তনে উচ্চারিত হয় এক মহান নিসর্গস্তব। সে নিসর্গ বাস্তববাদী; জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় অভিষিক্ত এক নতুন আলোপৃথিবীর চেতনা। বাস্তবের বর্জনে নয়, দেশকাল ও সমাজের দায় ও পাপ থেকে পলাতক কোনো প্রচ্ছায়ে নয়, এ সবের-ই অমা ও গরলে জারিত হয়ে মানবচেতনা শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হবে এক অমৃতলোকে, মহান্ নবীন জীবনে, এ বিশ্বাস জীবনানন্দ সমস্ত ঘনঘটার মধ্যেও লালন করেছিলেন।

দেখা যাক,
পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যত্ব
আঁধারের থেকে আনে
কী করে যে
মহা নীলাকাশ।
('হে হৃদয়'; 'বেলা অবেলা কালবেলা')

তাই, তাঁর চেতনার জগতের প্রকৃতিপ্রবণ মানসতার চূড়ান্ত বিকাশে পাই এক অন্যতর নিসর্গপৃথিবী, যা মানব অভিজ্ঞতার থেকে দূরস্থ নয়, যার প্রশান্তির দানের সঙ্গে

---

২৪. 'কবিতার কথা' : 'কবিতা প্রসঙ্গে'।

যুক্ত হচ্ছে নির্লিপ্ত ও জৈব নিমজ্জনের ঊর্ধ্বে মানবের হৃদয়মূল্য। এমন-ই একটি বিশ্বাসে সঞ্জীবিত হয়ে 'আলোপৃথিবী' কবিতার অবিস্মরণীয় ভাষণে জীবনানন্দ বলে ওঠেন :

শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি
নর-নারী নেমে পড়ে
প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে
সব গ্লানি না কাটলেও
তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে।

লক্ষণীয়, 'প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে' চরণটি। কোনো সংবেদনাহীন জড় নিসর্গ নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হবে মানবিক অনুভূতির হৃদয়মূল্য; তখন-ই এ পৃথিবী হবে 'আলোপৃথিবী' প্রকৃতিচেতনার এ নবীন উত্থানে নারী তথা প্রেমের ভূমিকাই সবচেয়ে গভীর ও গুরুত্বময়। তাই মৃত্যুপূর্ব কবিতার নিবিড় নিসর্গ মননের পাশাপাশি অভিন্নপ্রায় সংশ্লেষে রয়েছে নারী, অবিনশ্বর মৃত্যুহীন এক সত্তার প্রতিমা। তাই একদিকে যেমন কবির আত্মা বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী হয়ে কোনো নবহরিতের সঙ্গীতে' নিশ্চিহ্ন নিমজনে হারিয়ে ফেলে মানবিক পৃথিবীর ভাষা, অপরদিকে তেমন-ই সে ফিরে আসে 'দূর জন্মজন্মান্তের' এক 'অনাদি আলোর ভালোবাসায়'। অবশ্যই এ সময়চিহ্নগ্রাসী অপার ভালোবাসা নিসর্গের প্রতি মানব-মনের অনাদিকালীন আকর্ষণ। তাই প্রেমের রূপকে ভাবটির বিস্তার ঘটে :

আমি সেই মহাতরু লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
উঠে তুমি জাগিয়েছো অনাদির সূর্য নীলিমায়—
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

শেষ চরণের 'অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর' অনিবার্য ইঙ্গিতে এক প্রশান্ত উজ্জ্বল লাবণ্যময় নিসর্গভুবনের বাণী বহন করছে। সেই 'লাবণ্যসাগর' থেকেই উঠেছেন প্রেরণাদাত্রী নারী। অতএব, আবার পেয়ে যাই সেই জীবনানন্দীয় প্রতীকী ইঙ্গিতময়তার অন্তঃসারে পুষ্ট অভিভাষণ : এক প্রকৃতির ভাবসাযুজ্যে একাত্মীকৃত আর এক প্রকৃতি, জীবনানন্দের ভাষায়, 'দ্বিতীয় প্রকৃতি'। নারী ও নিসর্গ বারেবারেই তাঁর কল্পনাপ্রতিভার অনিবার্য ও অভিন্ন সংশ্লেষে সুস্থিত হয়েছে এক রমণীয় কল্যাণী মূর্তিতে।

বুদ্ধদেব বসু যথার্থই লিখেছেন, আলোর এমন উদার সমারোহ ইতঃপূর্বে জীবনানন্দের কবিতায় দেখা যায়নি। 'দুদিকে ছড়ায়ে আছে' এ কবিতাটির স্বল্প অথচ সুশৃঙ্খল পরিসরের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে এক মহাতরু—মৃত্তিকার বাস্তব থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে যা নীলিমামুখী, আলোকাভিসারী। 'রক্তনদীর তীরে কালো পৃথিবীর' কবিতাটিতেও পাঠক এ বৃক্ষটির দেখা পান। 'বনলতা সেন' পর্বেও কবির সংকল্পনার চকিতে উদ্ভাসে কখনো ধরা পড়ে যায় এ আলোকতরুর দিব্যসত্তা : 'শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে'।

'মৌন বৃক্ষের একমুঠো আলো' 'সনাতন শূন্যের অন্বেষণে' ফেরা ব্যর্থ মানবকে শোনায় 'হরিতের অক্ষয় গুঞ্জরণ'; তখন কবি' বলে ওঠেন :

মৃত্তিকায় মূল রেখে লক্ষ্য রেখে আদি নীলিমায় সহজগাছের স্থির প্রতিচ্ছবি হবে—

এভাবেই অনুপুঙ্খ অনুশীলনে এ কথা অবশ্যমান্য হয়ে উঠে জীবনানন্দের অন্তিমপর্বর সৃষ্টিতে নিসর্গ প্রত্যাবর্তিত হয়েছে দিব্য মহিমায়। তাঁর 'আলোপৃথিবী'র সংকল্পনা ধূসর, ম্লান নয়, উদার উজ্জ্বল এক নিসর্গচেতনার জগতেই আশ্রয় ও মুক্তি খুঁজেছে। তাই তার-ই ভাষায়—

নিমিত্তের ভাগী হয়ে মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়
হরিতের কাছে এসে শিখবে অক্ষয় গুঞ্জরণ।
('রক্তনদীর তীরে' : কবিতা : বর্ষ—১০, সংখ্যা—২ পৌষ, ১৩৬১)

নিসর্গচেতনার এ আবর্তন—ইন্দ্রিয়মগ্ন রূপাবিষ্টতার প্রাথমিক আস্বাদ থেকে ইন্দ্রিয়সংবেদী উপলব্ধিতে প্রকৃতির শান্ত, প্রাণপ্রবাহের মধ্যে আত্মনিমজ্জন, তারপর সেই নিমজ্জন থেকে উৎপাটিতে হয়ে বাস্তবের 'বিষমানুপতিক টানে' মানবজগতের রণ, রক্ত, রিরংসার তিমিরময় শূন্যতায় আত্মঅবলোপ, সেই পতন থেকে আবার উদ্ধৃত হয়ে এক আলোকিত চেতনাময় নিসর্গজগতে প্রত্যাবর্তন—জীবনানন্দের প্রকৃতি-ভাবনার বিকাশের ধারায় এ পর্যায়গুলি তাঁর কাব্যের কোনো ধারাবাহিক নিষ্ঠ অনুশীলনে লক্ষ্য না করে উপায় নেই। জীবনানন্দ স্বয়ং এ অনুবর্তন ও উত্তরণ প্রয়াসী কবিসত্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 'কবিতার কথা' নিবন্ধটির শেষাংশে রয়েছে সেই রকম-ই একটি প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি :

'কিন্তু সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির যদি পুনঃযৌবন না ঘটে, যিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন...তিনি কী করবেন? তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভেতর চলে যাবেন,—শহর-বন্দরে ঘুরবেন—জনতার স্রোতের ভেতর ফিরবেন—নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনামনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার, নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্যে সেই চেষ্টা করবেন আবার চলে যাবেন, হয়তো উন্মাদ পঙ্গুদের সঙ্গে করে নিয়ে, প্রকৃতির সান্ত্বনার ভেতর, সেই কোন আদিজননীর কাছে, যেন নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোনো অদিতির কাছে'।

এ ঋজু গভীর আবেগমন্দ্র ভাষণ কোনো দ্বিতীয় বক্তব্যের অবকাশ রাখে না। তাঁর কবিতার আদি ও অন্তিমে, চেতনার নানা বিচ্ছুরণে উচ্চারিত হয়েছে বাংলা কবিতায় অনাস্বাদিতপূর্ব এক নিসর্গপ্রেম। শেষ পর্যায়ের কাব্যে 'কবিমানসের আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে, মানুষের 'আবহমান অভিজ্ঞতার' মাঠে প্রকৃতি আরো বড় চেতনার আলোকে নবমূল্যায়িত হয়েছে। আর তখন-ই তাঁর কাব্যে এক উজ্জ্বল অনশ্বর প্রতিমায় আবির্ভূত হয়েছে 'মানুষের আবহমান পৃথিবীর শীর্ষে এই নতুন পৃথিবী', এক সৌরকরোজ্জ্বল আলোপৃথিবী।

জীবনানন্দের কবিচেতনায় বাংলা

সন্তোষ চক্রবর্ত্তী

বাংলার গরিমা, ঐশ্বর্য, ইতিহাস ও পল্লীপ্রকৃতির দৃষ্টিনন্দন রূপ বাংলার কবিকে উদ্বোধিত, অনুপ্রাণিত করেছে বারে বারে; বাংলার সাহিত্য ও শিল্পকলায় তার প্রতিফলন এ ভালবাসা তথা অনুরাগের সূচক। কাব্যে বাংলার যে রূপ চিত্রিত, তা থেকে দু'টি ধারার বিভাজন করা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একটিতে যতীন্দ্রমোহন-কুমুদরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রকৃতির রূপবিভোর কাব্যায়ন, আর অন্যটিতে সত্যেন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের ইতিহাসনির্ভর গৌরবগাথা। যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্যে বাংলার পল্লীপ্রকৃতি যে সহজ সুষমায় উপস্থাপিত, রবীন্দ্রনাথে তার সৌন্দর্য দার্শনিক ব্যাপ্তি। যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে বাংলার রূপের যে নিরাভরণ বর্ণনা দেখি—

দেখ্ ঘাসের ডাঁটায় ফড়িং ঘুমায়
সবুজ-স্বপন সুখে,
দেখ্ পদ্মকোরকে অচেতন অলি
শেষ মধুকণা মুখে!

(স্বপ্ন-দেশ/কাব্য মালঞ্চ)

তার-ই দার্শনিক প্রতিস্থাপন রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালির পদ্মাধৌত বাংলার রূপের বর্ণনায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে নিছক নিরপেক্ষ রূপপিপাসু নন, দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে সেই বাহ্যরূপের অন্তরালে আপাত-দুর্নিরীক্ষ্য অসীমের সন্ধান করেছেন ('সোনার তরী' কবিতাটি স্মরণীয়)। আবার দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় বাংলার ঐতিহ্যময় ইতিহাস-গৌরবের গাথাচিত্র—

একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত
ভ্রমিল ভারতসাগরময়;
সন্তান যার তিব্বত-চীন
জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধুলায় আসন,
তার কিনা এই ছিন্ন কেশ?

(বঙ্গ আমার! জননী আমার!)

জীবনানন্দের কাব্যে এ দ্বিবিধ ধারার কুশলী সমন্বয়, এছাড়া আছে বাংলার রূপকথা-পুরাণের ঐতিহ্যের প্রতি গভীর আবেশ। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও মানসবিহারে লব্ধ বাংলার যে চিত্রলেখ তিনি রচনা করেছেন, তা দেশপ্রীতি ও অনুরাগের এক উন্নত স্তম্ভস্বরূপ। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তা তুলনারহিত। দৃশ্যশব্দ-গন্ধস্পর্শময় বাংলাকে যেসব দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দেখেছেন, সেসব ইতিহাস, লোক-কথা, পুরাণ আর বাস্তব অভিজ্ঞতার বহুকৌণিকতার সূত্রে বাংলার ছবিটি হয়ে উঠেছে অনন্য, অসাধারণ। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি উপভোগ করেছেন বাংলার রূপ, এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার প্রাচীন ঐশ্বর্য। জীবনানন্দের ইন্দ্রিয়মদিরতার (sensuousness) উপমাস্থল একমাত্র জন কীট্‌স্। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের 'মৃত্যুর আগে' কবিতার নিম্নেদ্ধৃত অংশে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের যে সমারোহ দেখা যায়, তা সহজেই জন কীট্‌সের 'Ode to Autumn' কবিতাকে মনে পড়িয়ে দেয়।

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে;—পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;
মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড় য়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে...

এখানে যেসব ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল, সেগুলি হলো—
(ক) দর্শন—১ম, ২য়, ৩য়, ৮ম পংক্তি;
(খ) ঘ্রাণ—৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১১শ পংক্তি;
(গ) শ্রবণ—৭ম পংক্তি।

জন কীট্‌সের 'Ode to Autumn' কবিতাতেও অনুরূপ ইন্দ্রিয়মদিরতার বৈচিত্র্য লক্ষণীয় :

While barred clouds bloom the soft-dying day,
And touch the stubble piains with rosy hue;
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river-sallows. borne aloft
Or sinking as the light wind lives or dies;

And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn,
Hedge crickets sing, and now with treble soft
The redbreast whistles from a garden croft;
And gathering swallows twitter in the skies.

বাংলার যে মুখ কবি দেখেছেন, তা বরিশালের আঞ্চলিক বাংলা। কিন্তু কবির কল্পনাময় আলেখ্যে তা হয়ে উঠেছে সার্বিক, সামগ্রিক বাংলার আন্তরিক প্রতিচ্ছবি। ইন্দ্রিয়মদির রূপাবেশে অনুপুঙ্খ অবলোকন ও অনুভূতি দিয়ে কবি রচনা করেছেন তাঁর এ বাংলার রূপময় আলেখ্য। দৃষ্টির নিবিড়তা আর গভীর তন্নিষ্ঠ প্রেম দিয়ে তিনি দেখেছেন বাংলার অসংখ্য ফুল, ফল, গাছ, পাখি আর নদী, তার সঙ্গে এসেছে শঙ্খমালা, বেহুলা, চন্দ্রমালারা। আরো এসেছে ইতিহাসের গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মৃতি। তাঁর ইন্দ্রিয়সংবেদী চেতনায় ঘুরে-ফিরে এসেছে বাংলার অসংখ্য গাছ, ফুল, পাখি আর অন্যান্য প্রাণী। নিবিষ্ট মনে তিনি লক্ষ করেছেন শালিখা, বাদুড় আর দাঁড়কাকের আসা-যাওয়া। তাঁর চেতনার জগতে আরো যে সব ফুল-পাখিরা ছায়া ফেলেছে, তাদের মধ্যে আছে :

প্রাণিজগৎ—দাঁড়কাক, হাঁস, দোয়েল, খঞ্জনা, পেঁচা, মনিয়া, চাঁদা, সরপুঁটি, গঙ্গাফড়িং, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা, গাংশালিক, ঘোড়া; ভোমরা, নিমপাখি, জোনাকি, গুবরে পোকা, শঙ্খচিল, চড়াই, শামুক, গুগলি, ভীমরুল, মাছরাঙা, গোখুরা, পিঁপড়ে, বউ কথা কও, কোকিল, ঘুঘু, সাপমাসী, মৌমাছি, ইঁদুর, ফিঙা, বেজি, ব্যাঙ, ঝিঁঝি, বোলতা, কুকুর, বিড়াল, মাছি, সুদর্শন, বক, গরু ইত্যাদি।

উদ্ভিদ জগৎ—চালতাফুল, হিজল, কাঁঠাল, ঘাস, ডুমুরগাছ, জাম, বট, অশ্বত্থ, ফণীমনসা, শটিবন, তমাল, ভাঁটফুল, অপরাজিতা, আম, কল্‌মি, আকন্দ, বাসকলতা, কামরাঙা, মুথাঘাস, নাটাফল, ধুন্দুল, চাঁপাফুল, ভেরেণ্ডাফুল, করবী, বইচি, তেঁতুল, কদম, শেফালি, শেয়ালকাঁটা, বাসক, আনারস, কাঁঠালীচাঁপা, হেলেঞ্চা, বাঁশবন, তাল, পলাশ, পদ্ম, পরথুপী, মধুকূপী, ঘাস, রূপশালি ধান, গোলপাতা, আঁশশ্যাওড়া, সজিনা, জারুল, শসা, করমচা, বেলকুঁড়ি, বুনো চালতা, গুপুরি গাছ, ঢেঁকিশাক, চিনিচাঁপা, শ্যাওলা, আলোকলতা, জামরুল, লিচু, বাসমতি ধান, নোনাফল, আতাফল, কাশবন, কাঁটাবহর, বেলগাছ ইত্যাদি।

বাংলার আর যেসব কবি বাংলার রূপমুগ্ধ চিত্র রচনা করেছেন তাঁদের কারোর-ই কবিতায় এতো প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের উল্লেখের অজস্রতা নেই। বাংলার যে রূপ জীবনানন্দ দেখেছেন, তাতে আছে পল্লীপ্রকৃতির চিত্রল বর্ণনা, জনপদের বর্ণনা ও জনজীবনের চালচিত্র। প্রকৃতির অজস্র টুকরো ছবির বর্ণনায় সমৃদ্ধ তাঁর এ বাংলার লেখচিত্র। কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করছি---

১। ...অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ

জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের করে আছে
চুপ
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে....
এ চিত্রের বিশিষ্টতা হল এর সর্বকালীনতা :
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ
রূপ
দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল...

২। সন্ধ্যায় যে দাঁড়কাক উড়ে যায় তালবনে—মুখে দু'টো খড়
নিয়ে যায়—সকালে যে নিমপাখি উড়ে আসে কাতর
আবেগে
...নীল তেঁতুলের বনে—তেমনি করুণা এক
বুকে আছে লেগে;
কদমের ডালে আমি শুনেছি যে লক্ষ্মীপেঁচা গেয়ে গেছে গান
নিশুতি জ্যোৎস্নার রাতে...

৩। দীঘির জলের গন্ধে রূপালি চিতল তার রূপসীর পিছু
জামের গভীর পাতা-মাখা শান্তনীল জলে খেলিছে গোপনে;
আনারস-ঝোপে ঐ মাছরাঙা তার মাছরাঙাটির মনে
অস্পষ্ট আলোয় যেন মুছে যায়; সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু
ঝরে পড়ে পাতা ঘাসে...

৪। ...সন্ধ্যায় ধূসর সজল
মৃদু হাত খেলিতেছে হিজল জামের ডালে—বাদুড় কেবল
করিতেছে আসা-যাওয়া আকাশের মৃদু পথে:—ছিন্ন ভিজে
খড়
বুকে নিয়ে সনকার মতো যেন পড়ে আছে নরম প্রান্তর;
বাঁকা চাঁদ চেয়ে আছে;—কুয়াশায় গা ভাসায়ে দেয় অবিরল
নিঃশব্দ গুবরে-পোকা—সাপমাসী—ধানী শ্যামাপোকাদের
দল...

তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে শ্যামলী বাংলার জনজীবনের শান্তনীরব প্রাণপ্রবাহ। ১৩২৬ সালের কতকগুলো দিনের স্মরণে রচিত একটি কবিতায় বিশেষ কোন স্মৃতির ছায়াবিজড়িত দৃশ্যের মধ্যে একটি নির্বিশেষ রূপ প্রকাশিত, যা বাংলার পল্লীর সন্ধ্যাকালীন চিত্ররূপ :

সন্ধ্যায় পুকুর থেকে হাঁসটিরে নিয়ে আমি তোমাদের ঘরে
গিয়েছি অনেক দিন,—দেখিয়াছি ধূপ জ্বাল, ধর সন্ধ্যাবাতি
থোড়ের মতন সাদা ভিজে হাতে,—এখুনি আসিবে কিনা রাতি
বিনুনি বেঁধেছ তাই—কাঁচপোকাটিপ তুমি কপালের পরে
পরিয়াছ...

রবীন্দ্রনাথের নারীর 'শ্যামলী' রূপের ('গৃহকোণে ছোটো দীপ জ্বালায় নেবায়/দিন কাটে সহজ সেবায়'; 'নাম্নী'/'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ) এ হল জীবনানন্দীয় প্রতিরূপ। এখানে পাড়াগাঁয়ের কিশোরেরা কান্তারে বেতের নরম ফল আর নাটাফল খেতে আসে, আবার ধুন্দুল বীজের খোঁজ করে ঘাসে ঘাসে, কিশোরী ঘুরে বেড়ায় ঘুঙুর পায়ে, কিংবা তুলে নিয়ে যায় করবীর ফুল, যার বোঁটা থেকে ঝরে পড়ে করবীর দুধ ঘাসে ঘাসে, উঠানের ঘাসে খইয়ের ধান ছড়ায় শিশু, আবার রূপসার ঘোলা জলে কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে ডিঙা বায়। কবি দেখেছেন কিশোরীর শাড়ির লাল পাড় চাঁদে ভাসে, সাদা তালশাঁস, নারকেল নাড় বাংলার পল্লীজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আরো দেখেছেন ভীরু প্রেমের উজ্জীবন—'আঁচলে নাটার কথা ভুলে গিয়ে বুঝি/কিশোরের মুখে চেয়ে কিশোরী করিবে তার মৃদু মাথা নিচু।

বাংলার এ শান্ত জীবনের সংস্কৃতিগত আশ্রয়ভূমি হলো কীর্তন—ভাসান গান-যাত্রা-পাঁচালির লোকায়ত জগৎ :

...চারিদিকে বাঙালির ভিড়
বহু দিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালির
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি....

এ জগতের মায়াঘেরা স্বপ্নপরিবেশ কবিকে করে অতীতচারী। আষাঢ়ের বর্ষণমুখর দিনে তাঁর মন আবিষ্ট হয় চাঁদ সদাগরের মধুকর ডিঙা-ভাসা কালীদহের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আকাশের পরিবেশ রচনায়, ধলেশ্বরীর ঘাটে জল নিতে আসা পল্লীরমণীর এলানো খোঁপায় সনকার মুখের প্রতিভাস—'আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার/সনকার মুখ আমি দেখি না কি?' এ লোকায়ত সংস্কৃতি তাঁর অতীতচারিতার একটি প্রধান স্তম্ভ, অপরটি অবশ্যই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঐতিহ্যচেতনা—

লোকায়ত সংস্কৃতি→অতীতচারিতা←ঐতিহ্যচেতনা।

প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে ইতিহাস গৌরব আর রূপকথা-মনসামঙ্গলের কাহিনী মিলে জীবনানন্দের বাংলার রূপচিত্রণে এসেছে নতুন এক মাত্রা। বর্তমানে মজে-যাওয়া কবি কল্পনার জলসিঁড়ি নদীর পাশ দিয়ে ছুটে চলা বল্লাল সেনের ঘোড়ার দর্পিত খুরের শব্দে উত্থিত রাজপ্রতাপ—

...তখন এ জলসিঁড়ি শুকায় নি, মজে নি আকাশ,
বল্লাল সেনের ঘোড়া—ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর জিনের
শব্দ হত এই পথে...

কবি শোনেন অতীতের প্রতাপশালী জমিদার সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়ের ঘোড়ার খুরের দ্রুত ছন্দ—

...আর এই বাংলার ঘাস
রবে বুকে; এই ঘাস : সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়—
ইহাদের ঘোড়া আজো অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙে চলে যায়—
কিংবা অন্য ঘোড়সওয়ারীর ঘোড়ার খুরের শব্দ—
...তবু যদি জ্যোৎস্নায় পেতে থাক কান
শুনিবে বাতাসে শব্দ : 'ঘোড়া চড়ে কই যাও হে রায়রায়ান—

বাংলার অতীতশক্তির দ্যোতনাবাহী। গর্বের সঙ্গে কবি স্মরণ করেছেন দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক দেশবন্ধুকে—

দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার,
কালীদহে ক্লান্ত গাংশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়।

ইতিহাসের সঙ্গে কবির কল্পনায় জড়িয়ে আছে রূপকথার কাহিনীগুলো। রূপকথার অলসমেদুর জগতে শঙ্খমালা কঙ্কাবতী আর রাজকন্যা চন্দ্রমালার নিরুদ্বেগ জীবনযাপন। শঙ্খমালার কড়ি-খেলা ঘরে বাস্তবের সংশয়-জটিলতা নেই। মাঝরাঙা-ঝিলমিল সেসব শতাব্দীতে 'শঙ্খমালা কাঁথা বুনিয়াছে', আর রাজকন্যা চন্দ্রমালার ভোর শুরু হয় আরশিতে মুখ দেখে, আর দিন কাটে দূর কড়ির মতন সাদা হাড়পাহাড়ের দিকে চেয়ে আলস্যের কল্পনাবিলাসে। বাংলার ঘাসের নিচে 'কঙ্কাবতী শঙ্খমালা করিতেছে বাস'। এসব শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালাদের কাঁকনের শব্দে মুখরিত হতো বাংলার অতীতের জনপদ।

এছাড়া শ্মশানের অনুষঙ্গে এসেছে রামপ্রসাদ ও তাঁর শ্যামার প্রসঙ্গ :

পৃথিবীর পথে ঘুরে বহু দিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে,
ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে,
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে....

দেশবন্ধু প্রসঙ্গে কবির স্মৃতিতে উদিত হয়েছেন আর এক সংস্কৃতিসাধক—চণ্ডীদাস :

মধুকূপী ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি—রায়গুণাকর
আসিবে না—...
আসিয়াছে চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার...।

কবির আকর্ষণের প্রাণকেন্দ্র অবশ্য মঙ্গলকাব্য, আর তার বেহুলা-কেন্দ্রিক অভিযান কাহিনী। উল্লেখের পৌনঃপুনিকতা অন্তত তা-ই প্রমাণ করে :

...বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—

... ...

সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়...

বেহুলা-লহনার মধুর জগৎ তাঁর চেতনায় যে আবেশ তৈরি করেছে, তা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে আদর্শ নারীকল্পনায় :

...বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন
বাঙালি নারীর কাছে—চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড়;—ডাঁশা আম কামরাঙা কুল।

এ প্রকৃতিস্নিগ্ধ সংস্কৃতি-ঐতিহ্যঋদ্ধ বাংলার যে রূপ কবিচেতনায় নিত্যজাগরূক, সেই দেশ ছেড়ে তিনি দেশান্তরে যাবার কথা ভাবতেই পারেন না। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/খুঁজিতে যাই না আর', যদিও 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি' (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)-র জীবনানন্দীয় রূপ, তবু এ পংক্তি দু'টিতে কবির বাংলাপ্রেমের ঐকান্তিক আন্তরিকতা প্রকাশিত। আবেগের গভীরতা আরো স্পষ্ট, আরো বিশেষিত নিচের পংক্তিগুলিতে—

এই ডাঙ্গা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে।
বটের শুকনো পাতা যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে;
ছড়ায়ে রয়েছে তারা প্রান্তরের পথে পথে নির্জন অঘ্রাণে;—
তাদের উপেক্ষা করে কে যাবে বিদেশে বল—আমি
কোনো-মতে
বাসমতি ধানক্ষেত ছেড়ে দিয়ে মালাবারে—উটির পর্বতে
যাব নাকো;—...
...পৃথিবীর পথে
যাব নাকো...

তবু বাংলার এ বহুমাত্রিক রূপ আর তার প্রতি জীবনানন্দের সুনিবিড় অনুরাগ একটি আপাত-বৈষম্যে দ্বিখণ্ডিত।

মানবেতর প্রাণীতে মানবের ধর্ম ও অচেতন পদার্থে চেতনা আরোপ করে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে প্রকৃতির অণুতে পরমাণুতে তাঁর অনুরাগের সুর অনুরণিত :

...ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের মনে
শোনাবে লক্ষ্মীর গল্প—ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে;

আবার, কবি কীট্‌স যেমন নাইটিঙ্গেল পাখির গানের অবিনশ্বরতা ও প্রবহমানতা দেখিয়েছেন যুগে যুগে প্রজন্ম, থেকে প্রজন্মে—

The voice I hear this passing night was heard
In ancient days by emperor and clown :
Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when, sick for home,
She stood in tears amid the alien corn,

(Ode to a Nightingale)

তেমনি জীবনানন্দও কাক-কোকিলের শরীরের ধুলার সূত্রে প্রজন্মান্তরের কোকিলের সন্ধান পেয়েছেন :

মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধুল,
কবেকার কোকিলের, জান কি তা? যখন মুকুন্দরাম, হায়,
লিখিতেছিলেন বসে দু'পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়—থেমে থেমে যায়....

অর্থাৎ সেই কোকিলের কুহুতান-মুখরিত বাংলার জাম-লিচু-কাঁঠালের ছায়াঘেরা পথে কবির আকর্ষণ অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য।

তবু প্রকৃতির আশীর্বাদধন্য লক্ষ্মীপেঁচার দেশের তিনি একটি রিক্ত, শূন্য, ধ্বংসপাণ্ডুর রূপও দেখেছেন। কখনো জনপদের রিক্ত ছবি—

...বউও উঠানে নাই—পড়ে আছে একখানা ঢেঁকি।
ধান কে কুটিবে বল—কত দিন সে তো আর কোটে নাকো ধান...
নদীর তীরেও একই শূন্যতা—
...জলসিঁড়িটির পাশে ঘাসে

শাখাগুলো নুয়ে আছে বহুদিন ছন্দোহীন বুনো চালতার :

জলে তার মুখখানা দেখা যায়—ডিঙিও ভাসিছে কার জলে,
মালিক কোথাও নাই, কোনোদিন এই দিকে আসিবে না আর...

ধ্বংসের চিত্র এখানে ওখানে :

...দেখে নাকি তারাবনে পড়ে আছে বিচূর্ণ দেউল,
বিশুষ্ক পদ্মের দীঘি-ফোঁপরা মহলা ঘাট, হাজার মহাল
মৃত সব রূপসীরা...

কোনও আর্থ-সামাজিক কারণ না দর্শালেও কবি দেশবন্ধু-বিষয়ক কবিতায় বাংলার জীবনে সঙ্কটের উল্লেখ করেছেন : 'মনে হয় বাংলার জীবনে সঙ্কট/শেষ হয়ে গেছে আজ।' এ সংকটের অন্তত দু'টি প্রাকৃতিক কারণ খুঁজে নেয়া শক্ত নয় 'রূপসী বাংলা' (সিগনেট সংস্করণ) কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলী থেকে—

(১) নদীর স্রোতঃপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া :

...মাঝপথে জলের উচ্ছ্বাসে
বাধা পেয়ে নদীরা মজিয়া গেছে দিকে দিকে...

(২) পদ্মার ভাঙন :

(ক) ...কীর্তিনাশা খুঁড়ে খুঁড়ে চলে বারো মাস
নতুন ডাঙার দিকে—পিছনের অবিরল মৃত চর বিনা
দিন তার কেটে যায়...

এবং

(খ) ...রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা...

জীবনের নেতিবাচক দিক আরো স্পষ্ট কবির পৌনঃপুনিক মৃত্যুভাবনার মধ্যে :

(ক) একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে
আর, জানি;
হৃদয়ের পথ-চলা শেষ হল সেই দিন—গিয়েছে সে শান্ত
হিম ঘরে

(খ) যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে র'ব—অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে
কাঁঠাল গাছের তলে হয়তো বা ধলেশ্বরী চিলাইয়ের
পাশে—

(গ) ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে
শিয়রে বৈশাখ মেঘ—সাদা সাদা যেন কড়ি-শঙ্খের পাহাড়
নদীর ওপার থেকে চেয়ে রবে—

(ঘ) কবে যে আসিবে মৃত্যু : বাসমতি চালে-ভেজা সাদা
হাতখান
রাখো বুকে, হে কিশোরী, গোরোচনারূপে আমি করিব
যে স্নান—ইত্যাদি

মৃত্যুভাবনার পরিচয়বাহী অনেক অনেক স্তবকের ওপরের চারটি উদ্ধৃতির প্রথম তিনটি সমগোত্রীয় আর শেষোক্তটি ব্যতিক্রমী লক্ষণাক্রান্ত। প্রথম তিনটিতে মৃত্যুর জন্য স্বাভাবিকভাবে অপেক্ষমাণ কবির বাংলার পল্লীপরিবেশে প্রকৃতির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে মৃত্যুর কামনা ধ্বনিত, আর শেষোক্তটিতে মৃত্যুর পথ চেয়ে কাতর কবির মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার প্রস্তুতি প্রকাশিত।

জাম-কাঁঠাল-হিজল গাছের ছায়া-ঘেরা, কল্মি-হাঁসের পালক-চাঁদা-সরপুঁটি-কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাতের ঘ্রাণে ভরা বাংলার স্নিগ্ধ-মেদুর রূপের বর্ণনার পাশাপাশি যে শ্মশান ('শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ') এবং জীর্ণ সমাধি-মন্দিরের

('ভাঙা মঠ নীল হয়ে আছে/শ্যাওলায়') উল্লেখ কবি করেছেন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই সব মৃত্যু-আলম্বিত বিষাদ-করুণ ভাবনাগুলি।

কবিকল্পনার এই যে দ্বৈধতা, চেতনার এ দ্বান্দ্বিকতার পেছনে কবি-জীবনের ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের অবসাদগ্রস্ত আর্থ-মানসিক বৈক্লব্যের দিনগুলির প্রভাব অনুমান করা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৩০ সালে লাবণ্য দেবীকে বিয়ে করার পূর্বে তিনি দিল্লির রামযশ কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতে যান। কিন্তু বিয়ের পর (বিয়ে হয় ৯ মে, ১৯৩০) দিল্লিতে আর ফিরে যাননি। এর পর ১৯৩৫ সালে বরিশাল বি. এম. কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবন কেটেছে প্রায় বেকারত্বে ও আর্থিক ও মানসিক অশান্তির মধ্যে। এর-ই মধ্যে সৃষ্টিশীল কবি রচনা করেছেন 'রূপসী বাংলা' ১৯৩৪ সালে। তাঁর এ আর্থ-মানসিক বৈক্লব্যের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর স্বরচিত দিনলিপি—Literary Notes : July-September 1931থেকে (উৎস : 'বিভাব : জীবনানন্দ স্মরণ সংখ্যা' ১৪০৫)। এখানে উক্ত দিনলিপির প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ তুলে দেয়া হল :

24.7.31

-No way out-No way out...

An unsuccessful man, a failure, an unemployed kicked : show at best success & you will be fawned. 28.7.31

-moneylessness, like a dirty wallowing pig, bespattering me.

-To what social position & status have I arrived now?...A PARIAH-A man who can't incur debts...A nuisance.

1.8.31

-Lavanya's letter (stabbing) : I might flow down the wave of this dark wind & never return,-"Cowardly that"-Give her what she wants, live for that-"your responsibility, মঞ্জু : perhaps I only creature in I world to embosom.

12.8.31

-The mood of total depression & final blank (througout noon & I day & for some days?)...

22.8.31

-The image of home : a scare & failure...6.9.31 & 7.9.31

-I wish I would be I bachelor again-Aghast when I think of the future domestic life-

14.9.31

-Mother's ক্যাট্ ক্যাট্ খ্যাট্ খ্যাট্-the obvious relegation & disgrace of one's manliness or manners-one not entitled to say anything-

এ দিনলিপির ছত্রে ছত্রে যে আত্মগ্লানি, অবসাদ, বিষাদবোধ, পৌরুষের অবমাননা আর দাম্পত্য জীবনের গ্লানির চিত্র পরিস্ফুট, তা থেকে অনুমান করা কষ্টকর নয় কবির

কর্মহীন উপায়হীন নিরুদ্যম জীবনের প্রবাহ। ১৯৩৫ সালে পুনরায় কর্মে নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত (যদিও অধ্যাপনার কাজ তাঁর কখনোই ভাল লাগেনি) তাঁর মানস বৈক্লব্যে ছেদ নেই, অনুমান করা যায়। ১৯৩৪ সালে রচিত 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলিতে ভাবনার যে দ্বৈধতা লক্ষণীয়, তার হেতুও সম্ভবত এ আর্থিক অনিশ্চয়তা ও মানসিক অবসাদ।

তবু তিনি ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে জীবনের অবক্ষয় দেখেননি। বাংলার মাটির ঘাস থেকে, রোদ থেকে জীবনের উজ্জীবনী শক্তির সন্ধান করতে চেয়েছেন :

ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর—
সবুজ ঘাসের থেকে; তাই রোদ ভালো লাগে—তাই নীলাকাশ
মৃদু ভিজে সকরুণ মনে হয়; পথে পথে তাই এই ঘাস
জলের মতন স্নিগ্ধ মনে হয়....

জীবনানন্দের এ ঘাস আর সূর্যালোকের তৃপ্তিদায়িনী তথা প্রাণপ্রবাহিকা শক্তির ভাবনাসারূপ্য আছে রবীন্দ্রনাথে, যদিও একটু গভীর প্রত্যয়ে—

এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে
এক হয়ে ছিলুম—যখন আমার উপর সবুজ
ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে
আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক
রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ
উত্থিত হতে থাকত....তখন শরৎ সূর্যালোকে
আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস,
একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন
এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই
যেন খানিকটা মনে পড়ে।....যেন আমার এই
চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং
গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে
ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে.... *(ছিন্নপত্র, পৃঃ ১৩৮)*

মৃত্যুর ছায়া-ঘেরা এ বাংলাপ্রেমের আলেখ্যে তাই শুধু নেতি-ই শেষ কথা নয়। এক গভীর অস্তিপ্রত্যয়ে এ প্রেম উজ্জীবিত। জাগ্রত চেতনার বিলয় মুহূর্তে কীট্‌স যেমন নাইটিঙ্গেল পাখির গান শোনার তৃপ্তির আবেশ রচনা করে সুখমৃত্যু কামনা করেন—

Now more than ever seems it rich to die,
To cease upon the midnight with no pain,
While thou art pouring forth thy soul abroad
In such an ecstasy! *(Ode to a Nightingale)*

জীবনানন্দও তেমনই কামনা করেন সুখমৃত্যু :

...কুয়াশায় ঝরে পড়ে দিকে দিকে রূপশালি ধান
একদিন;—হয়তো বা নিমপেঁচা অন্ধকারে গাবে তার গান,
আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে...

এ অনুভূতি থেকেই রূপসী বাংলার বুকে ফিরে আসার কামনা উদ্ভূত :

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুক ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়...

কবির এ রূপান্তর-ভাবনা মৃত্যু-উত্তরণেরই অপর নাম।

প্রেমের কবি জীবনানন্দ

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

প্রেম জীবনানন্দের কাব্যে এক প্রধান উপলব্ধি! মানুষের ক্লান্ত, বিষণ্ন, অবসাদজর্জর জীবনে প্রেম আছে বলেই না সংগ্রাম করে টিকে থাকার এ আনন্দ; এমন কি সংগ্রামের প্রেরণার উৎসস্থল-ই হলো প্রেমের অমল উপলব্ধি। প্রেম আছে, তাই জীবনের অর্থ আছে। অন্ধকার রাতে যেমন আকাশের তারকার আলো মর্ত্যলোকে প্রোজ্জ্বল হয়, তেমনই প্রেম আমাদের বিষণ্ন ও অবসাদগ্রস্ত মনে বাঁচার উৎসাহ এবং প্রেরণাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলির বেশিরভাগই দেখি, কেমন এক অজানা বেদনার ভারে করুণ। 'হায় চিল' কবিতাটির কথা মনে করা যাক। এক ভিজে মেঘের দুপুরে চিলের কান্নার সুরে 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে; পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে'; তাকে আর ডেকে আনা কেন? হৃদয় খুঁড়ে বেদনার উজ্জীবন আর কে ভালবাসে?

কবির বিষণ্নমনস্কতার ফলশ্রুতি হিসেবেই এ আর্তির ব্যাখ্যা করতে হবে। এ বেদনাকে নিছক বিরহজনিত বলে ধরে নেয়া ঠিক হবে না। প্রেমের আবেগ-গভীরতায় কবির অবস্থান সংশয়াতীত, তবু তাঁর অতৃপ্তিবোধ, তবু অপূর্ণতা, তবু কেমন ধরনের অচরিতার্থতার আর্তি।

রবীন্দ্রনাথ বিরহভাবুকতার কবি, কিন্তু জীবনানন্দ বিরহকে আদৌ আমল দেননি। তাঁর বিরহ বিষণ্নতার-ই নামান্তর; অপূর্ণতার বেদনাকে কেন্দ্র করে কিম্বা অচরিতার্থতার দুঃখাতীত বোধকে ঘিরে ধরেই তাঁর বেদনা—পুনঃ প্রাপ্তির জন্যে আকুলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে নয়।

অবশ্য একথা ঠিক যে, 'ঝরা পালক' গ্রন্থে তাঁর যে প্রেমের কবিতা, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কবি তাৎকালিক রেওয়াজ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হননি। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মতোই গতানুগতিক বোধের স্রোতে গা ভাসিয়েছেন। (তিনি প্রেমের সার্থকতা দেখেছেন নৈকট্যের মধ্যে, প্রেমের সম্ভোগেই আনন্দের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। 'অস্তচাঁদে' কবিতাটির কথা মনে পড়ছে; সম্ভোগাতুর এক উল্লসিত বিলাসেই কবির তাবৎ স্বপ্ন-কল্পনা :

ভরা গেলাসের সুরা,—তহুরা,—করেছি মোরা চুপে চুপে পান,
চকোরজুড়ির মতো কুহরিয়া গাহিয়াছি চাঁদিনীর গান।

পেয়ালায়-পেয়ালায় সেই নিশি হয়নি উতলা,
নীল নিচোলের কোলে নাচে নাই আকাশের তলা!
কিম্বা অন্য আর একটি কবিতাতে দেখি—
সে কোন্ বালিকা একা অন্তঃপুরে এল অধোমুখী!
পাথারের পারে মোর প্রাসাদের আঙিনার পরে
দাঁড়াল সে,—বাসর রাত্রির বধূ,—মোর তরে, যেন মোর তরে।

অথবা,

করবীকুঁড়ির পানে চোখ তার সারাদিন চেয়ে আছে চুপে,
রূপ-সাগরের মাঝে কোন্‌দূর গোধূলির সে যে আছে ডুবে।
সে যেন ঘাসের বুকে,—ঝিল্‌মিল্ শিশিরের জলে;
খুঁজে তারে পাওয়া যাবে এলোমেলো বেদিয়ার দলে।

কবির কামনা পরিতৃপ্তিকে কেন্দ্র করে বিলসিত হয়েছে। তাঁর মনে জেগেছে প্রজাপতিবৃত্তি, সুখ ও সৌন্দর্যের জন্যেই তাঁর সন্ধানতৎপর লীলাবিলাস। 'যে কামনা নিয়ে মধুমাছি ফেরে'—কবির বুকে সেই উদ্দাম তৃষ্ণা, রূপসুধা পানের তাঁর আকুল পিপাসা; তিনি প্রজাপতির মতোই পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে ঘুরে বেড়ান—

আমি প্রজাপতি,—মিঠা মাঠে সোঁদালে সর্ষেক্ষেতে;
—রোদের শফরে খুঁজি না ক ঘর,
বাঁধি না ক' বাসা,—কাঁপি থরথর
অতসী ছুঁড়ির ঠোঁটের উপর
শুঁড়ির গেলাসে মেতে।

প্রেমের এ অভীপ্সিত উল্লাস অচিরেই শেষ হয়েছে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকেই কবির বিষণ্নতা দেখা গেল। কী যেন হারিয়ে গেছে, হয়তো বা কেউ চলে গেছে জীবনের গ্রন্থি উন্মোচন করে—তবু সেই হারানো সামগ্রীর জন্যে, চলে যাওয়া ব্যক্তির জন্যে কবির বেদনাবোধ শুরু হয়েছে। কেমন একটা স্মৃতিভারাতুর যন্ত্রণার বোঝা কবিকে বহন করতে হয়েছে। বিয়োগ-বেদনার তীব্রতা যেমন, তেমনি অভিমানাহত প্রেমের গভীর আর্তি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেই প্রথম দেখা গেল :

আমি ঝরে যাব, তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেইদিন পৃথিবীর পরে—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!

শুধু নিজের নিষ্ক্রান্ত হবার বেদনা নয়, জীবনের প্রাপ্তির খাতে যখন শূন্যতা আসে—তখনকার চেতনাও কবিকে ব্যথিত করে, যে প্রেম এসে চলে গেছে, বুঝি সে শেষ বারের মতোই চলে গেছে—

সব ছেড়ে দিয়ে আমি তোমারে একাকী ভালবেসে
তোমার ছায়ার মতো ফিরিয়াছি তোমার পিছনে!

তবুও হারায়ে গেছ,—হঠাৎ কখন কাছে এসে
প্রেমিকের মতো তুমি মিশেছ আমার মনে-মনে
বিদ্যুৎ জ্বালায়ে গেছ,—আগুন নিভায়ে গেছ হঠাৎ গোপনে!

কবির মনোভূমিতে যে চিরায়ত বিষাদের ছোপ লেগে আছে—তাঁর প্রেম চেতনাতেও সেই রং বা অনুভূতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। তাই প্রেম যে মানুষের জীবনে অমেয় শান্তি আনে—এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কবি নিজেকে বিষাদক্লিষ্ট ভাবুকতার ঊর্ধ্বে তুলতে পারেন না।

তবে কর্মক্লান্ত জীবনে প্রেম এক দিব্য আশীর্বাদ, সমস্ত দিনের ক্লান্তি ও অবসন্নতার পর প্রেমের অমল সোহাগ মানুষকে নতুন করে সঞ্জীবিত করে গড়ে। জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় এ বোধেরও প্রকাশ আছে। তিনি নিজেকে প্রেমিক ধরে নিয়েই কবিতাগুলি লিখেছেন। সুতরাং তাঁর প্রেম-চেতনা ব-কলমে ব্যক্ত হয়নি, নায়কত্ব করেছেন তিনি নিজেই। তাই কবির মনোভূমিতে উপজাত অনুভূতি দিয়েই প্রেমকে তিনি ব্যক্ত করেছেন—

যতদিন ভালবেসে গিয়েছি তোমারে
কেন যেন লেগুনের মতো আমি অন্ধকারে কোন্ দূর সমুদ্রের ঘর
চেয়েছি চেয়েছি আহা....ভালোবেসে না-কেঁদে কে পারে
তবুও সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চলে চুপে
তুমিও দেখনি ফিরে—তুমিও ডাকনি আর—আমিও
খুঁজিনি অন্ধকারে।

যদিও প্রেমকে কবি মানুষের জীবনে এক অনিবার্য অমৃতময় যন্ত্রণা বলে গণ্য করেছেন, তবু নারী—পুরুষের জীবনকে প্রেমে সোহাগে, শান্তি ও শ্যামলতায় আনন্দময় করে তুলতে পারে। কিন্তু নারী তা করে না কিম্বা করার বাসনা নিয়ে যে নারী আসে, কোথায় বুঝি বা সে হারিয়ে যায়! যে নারী থাকে, সে চিরন্তন পুরুষ-প্রেমিকের জীবনে অক্ষয় স্বর্গ রচনা করতে পারে! কিন্তু থাকে কি কেউ? তাই প্রেমিক পুরুষের মনে বুঝি এমন গভীর বিষাদ বাসা বাঁধে! প্রতীক্ষায় দীর্ঘ সময় কেটে যায়, পার হয় পঁচিশ বছর, তবু প্রার্থিতার দেখা মেলে না।

রহিলাম জেগে
আমি একা, নক্ষত্র যে-বেগে
ছুটিছে আকাশে
তার চেয়ে আগে চলে আসে
যদিও সময়,
পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয়

অবশেষে পঁচিশ বছরও পার হয়, তবু তার দেখা মেলে না; প্রতীক্ষার বেদনা বুকে নিয়ে একা বসে থাকতে হয়—

দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়—ইঁদুর পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে-মাঠে, খুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে!

সব শেষে কবি উপলব্ধি করেন—প্রেমের প্রত্যয় যেমন চিরকালের, তেমনি এর আনন্দটুকু নয়; প্রেমের মেলামেশায় ক্ষণিক দ্যুতি মনকে ক্ষণিক রাঙায়—তারপর-ই সে, হায়, হারিয়ে যায়!

একদিন-এ-জীবন সত্য ছিল শিশিরের মতো স্বচ্ছতায়;
কোনো নীল নতুন সাগরে
ছিলাম—তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে
সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দরে বিকিয়ে গেল হায়।
অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয়
করে ফেলে বুঝেছি সময়
যদিও অনন্ত, তবু প্রেম সে অনন্ত নিয়ে নয়।
তবু তোমাকে ভালবেসে
মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে
বুঝেছি অকূলে জেগে রয় :
ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ হৃদয়।

ক্ষণিক হলেও প্রেমের আশীর্বাদ লাভের জন্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। স্বল্পস্থায়ী হলেও প্রেমের স্মৃতি যে চিরস্থায়ী, সূর্য বা নক্ষত্রের আলোর মতই তা চিরভাস্বর। তাই ভালবাসার গৌরব, তাই প্রেমে মহিমান্বিত জয়ের গর্ব। 'তোমাকে ভালবেসে' কবিতায় কবি সে কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল
এই জীবনের পদ্ম পাতার জল;
তবুও এ-জল কোথার থেকে এক নিমেষে এসে
কোথায় চলে যায়;
বুঝেছি আমি তোমাকে ভালবেসে
রাত ফুরুলে পদ্মের পাতায়।
আমার মনে অনেক জন্ম ধরে ছিল ব্যথা
বুঝে তুমি এই জন্মে হয়েছো পদ্মপাতা;
হয়েছো তুমি রাতের শিশির—
শিশির ঝরার স্বর
সারাটি রাত পদ্মপাতার পর;
তবুও পদ্মপত্রে এ-জল আটকে রাখা দায়।

নিত্য প্রেমে ইচ্ছা নিয়ে তবুও চঞ্চল
পদ্মপাতায় তোমার জলে মিশে গেলাম জল;
তোমার আলোয় আলো হলাম,
তোমার গুণে গুণ;
অনন্তকাল স্থায়ী প্রেমের আশ্বাসে করুণ
জীবন ক্ষণস্থায়ী তবু হায়!
এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিল :
পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল;
আকাশনীল, পৃথিবী এই মিঠে,
রোদ ভেসেছে, ঢেঁকিতে পাড় পড়ে
পদ্মপত্র জল নিয়ে তার—জল নিয়ে তার নড়ে;
পদ্মপত্রে জল ফুঁরিয়ে যায়।

প্রেমের এ আর্তি তাঁর কাব্যে আগাগোড়াই কেমন একটা করুণ-মধুর আস্বাদ এনে দিয়েছে। 'লোকের বোসের জার্নাল' কবিতায় প্রেমের বেদনার-ই প্রকাশ—যদিও এটিকে সকলে তাঁর পরিণত মানসের প্রেমের কবিতা হিসেবে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে অভিহিত করে থাকেন। জানি না, এ কবিতায় কবির ব্যক্তিগত বা প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতার উপলব্ধি ধরা আছে কিনা—তবে একথা ঠিক যে, এখানেও ক্ষণস্থায়ী প্রেমের অচরিতার্থ রূপ এবং তজ্জনিত বিষণ্নতার প্রলেপে ভারাতুর মনের অভিব্যক্তি এ কবিতারও উপজীব্য বিষয়।

অবশ্য এখানে একটা কথা বলা দরকার। জীবনানন্দের কাব্যসমুদ্র মন্থন করলে নিশ্চয়ই প্রেমের পূর্ণতার পরিচয়বাহী কিছু অমৃতকুম্ভেরও সন্ধান মিলবে। তাই তিনি প্রেমের কবিতায় অসফল নায়কের বিপন্ন ও বিষণ্ন বোধ নিয়েই শুধু খেলা করেছেন—এমন কথা বলা চলে না। তবে নায়কের অচরিতার্থ প্রেমের বেদনাই যে তাঁর মানস প্রবণতার প্রধান ধুয়া, ঘুরে ঘুরে সেই বেদনা ও উপবেদনার সুর-ই প্রচ্ছন্নভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। তাঁর 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা', 'সুচেতনা'—সর্বত্রই গোপন কারুণ্যের এক স্নিগ্ধ অবলেপ রয়েছে। 'আমাকে তুমি' কবিতাটির মধ্যে তো বিষণ্নতার কথা কবি স্পষ্ট করেই বলে ফেললেন—যদিও প্রেমের প্রাপ্তির ঘরে শূন্য নয়, পূর্ণতাই আছে; এমন কি প্রেমে অবলীন চিত্ত পৃথিবীতে 'মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে' মনে হয়েছে, দুপুরের বাতাসকে মনে হয়েছে যেন ধানভানা রূপসী নারী—

তারপর
দূরে
অনেক দূরে
খর রৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সীর রূপসীর মতো ধান ভানে
গান গায়—গান গায়
এই দুপুরের বাতাস!

এক-একটা দুপুরে এক-একটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়ে যায় যেন। তবু এই পরম প্রশান্তি ও পরিপূর্ণ জীবনের পটভূমিতেই কবির মনে উপবেদনার ছোঁয়া :

মাঝে-মাঝে অনেকদূর থেকে শ্মশানের চন্দন কাঠের গন্ধ,
আগুনের—ঘিয়ের ঘ্রাণ;
বিকেলে
অসম্ভব বিষণ্নতা।

তবু পরিপূর্ণ প্রশান্তির কথা নিয়ে ছোট্ট একটি কবিতার সাক্ষাৎ মিলবে 'রূপসী বাংলা' গ্রন্থের শেষে। সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশে প্রকৃতির গহন আরামের রাজ্যে নর-নারী কাছাকাছি রয়েছে, পৃথিবীর সব প্রেম তাদের মনে উপচিত, শুধু শান্তি, চারদিকে শুধু শান্তি। প্রেমের এ আনন্দঘন উচ্ছ্বসিত অনুভবও তাঁর কাব্যে আছে—

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে;
আকাশে ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

তাঁর প্রেমের কাব্যে স্মৃতি-আতুরতা আছে, 'লোকেন বোসের জার্নাল' কবিতাটি এ বিষয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন।

পুরানো চিঠির ফাইল আছে :
সুজাতা লিখেছে আমার কাছে,
বারো তেরো কুড়ি বছর আগের সে-সব কথা;
ফাইল নাড়া কী যে মিহি কেরানির কাজ :
নাড়বো না আমি,
নেড়ে কার কী সে লাভ;
মনে হয় যেন অমিতা সেনের সাথে সুবলের ভাব,
সুবলেরই শুধু? অবশ্য আমি তাকে
মানে এই—এই অমিতা বলছি যাকে—
কিন্তু কথাটা থাক;
কিন্তু তবুও—
আজকে হৃদয় পথিক নয় তো আর,
নারী যদি মৃগতৃষ্ণার মতো—তবে
এমন কী করে সব কারাভান হবে।

'তোমাকে আমি দেখেছি ঘুরে ফিরে' কবিতায়ও দেখি কবি মহাকালের সমুদ্রতীরে এসেও পেছনে ফিরে তাকিয়েছেন, এবং কালের কালো সাগর জলে তলিয়ে যাবার আগে অনেক আগের হৃদয়াবর্তন সম্পর্কে বিবিধ ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন।

প্রেমের কবিতাগুলিতে কবি তাঁর কালচেতনা এবং ইতিহাস-বোধকে বাদ দিতে পারেননি। কবি তাঁর মানস-পরিমণ্ডলে প্রেম হোক আর প্রকৃতি হোক, কিম্বা জীবনের বিবিধ বোধের ব্যাপার-ই হোক, কালজ্ঞান এবং ইতিহাস-চেতনার বেধ ও পরিধিতেই তিনি তার রূপদান করতেন।

প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও ইতিহাস-চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করার মতো; শুধু ইতিহাসের অনুভব নয়, ভৌগোলিক পরিসরের ব্যাপ্তিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 'বনলতা সেন' একটি বিখ্যাত প্রেমের কবিতা, এখানে প্রাগৈতিহাসিক কালের সময় থেকে—এমন কি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষ জীবন সংগ্রামে নিরত থেকেছে বটে, সেই সঙ্গে নারীর প্রতি ভালবাসা থেকে মুহূর্তের জন্যেও বিরত থাকেনি। হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে পথ হাঁটার প্রতীকতায় সেই চেতনাই উদ্ভাসিত হয়েছে। অতীত লোকের শ্রাবস্তীপুরীর শিল্পী নিজ অন্তরের সংবেদনশীলতায় যে প্রতিমা নির্মাণ করেছেন—সেই মমতার প্রতিচ্ছবি বনলতা সেনের মুখে। একবার সিংহল-সমুদ্র, পরমুহূর্তেই মালয়সাগরে, বিম্বিসার-অশোকের ধূসর জগতে থেকে অবশেষে বর্তমান-যুগের একেবারে আধুনিক শহর নাটোরের বনলতা সেনকে পাওয়া যায়।

'কবিতার কথা' গ্রন্থে জীবনানন্দ নিজেই তাঁর কাব্যে কালচেতনার কথা প্রকাশ করেছেন; যদিও সময় এবং সীমা-প্রসৃতির ভেতর সাহিত্যের পটভূমিকে তিনি বিমুক্ত দেখতেই ভালবাসেন, তবু তিনি বলেছেন—"কবিতার অস্থি-র ভেতরে থাকবে ইতিহাস-চেতনা এবং মর্মে থাকবে পরিছন্ন কালজ্ঞান।" এ ইতিহাস-চেতনা ও কালজ্ঞান যদি কবির মনোলোক উদ্বেল না করে—তবে কবি তার নিজের যুগকে পারস্পরিক ঐতিহ্যের অধিকারী হিসেবে কী করে নিজেকে গণ্য করবেন। তাই জীবনানন্দ কাল ও ইতিহাস-চেতনার পটভূমিতে আশ্রিত হয়েছেন। আগেই বলেছি—এ শুধু তাঁর প্রেম কাব্যের-ই একটা বৈশিষ্ট্য নয়, তাঁর সমগ্র কাব্যকলাকৌশল সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তিনি নিজের ইতিহাস চেতনা সম্পর্কে ঐ 'কবিতার কথা' গ্রন্থেই বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন—"মহাবিশ্বলোকের ইশারা থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গীতসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময় চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে।"

এ কারণেই তিনি নায়ক-নায়িকার নামের উপাধি বসিয়ে বর্তমান কালের বাস্তবতাকে আমদানি করতেন, সময়ের প্রত্যক্ষগম্য চেতনায় স্থাপিত করতেন;—বনলতা সেন, মৃণালিনী ঘোষাল, অরুণিমা সান্ন্যাল, লোকেন বোস, অনুপম ত্রিবেদী প্রভৃতি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। তিনি অনায়াসেই অতীতের শ্রাবস্তী থেকে বর্তমানের নাটোরে মুহূর্তেই পাড়ি জমাতে পারেন—এর দ্বারা কল্পনার ব্যাপ্তি যেমন আমাদের চমকিত করে, তেমনি প্রসৃত সময়-সীমার এবং উন্নত ভূগোল-চেতনার সমীভবন বিস্মিত করে।

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলিতে দেখা যাবে, পুরুষ কেমন যেন চঞ্চল ও অস্থির স্বভাবের, আর নারী সেই তুলনায় শান্তিতে ও কমনীয়তায় মধুর। নারীকে তিনি

প্রকৃতির-ই আর এক অভিব্যক্তি বলে মনে করেছেন। ইতিহাসের প্রয়োজন সমাধা করার জন্যে পুরুষের প্রয়াস ব্যয়িত হয়, কিন্তু নারী সক্রিয়ভাবে 'ইতিহাসের কুটিল অভিপ্রায়ে'র বলি হয় না। নারী লাবণ্যময়ী, তার দেহ প্রকৃতি থেকেই বুঝি উদ্ভূত, প্রকৃতির সোহাগ ছুঁয়ে ছেনেই বুঝি তার শরীরে লাবণ্য ও কমনীয়তার জোয়ার। 'শঙ্খমালা' নামে যে নায়িকার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—তার নীলাভ দুই চোখ হচ্ছে বেতের ফল, তার দেহ হচ্ছে বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা—

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা;
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা।—
তার মুখ কড়ির মতন সাদা, দু'খানা হাত তার হিম।
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।
চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার।
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো দুধে-আর্দ্র-কবেকার শঙ্খিনীমালার!
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

আবার প্রকৃতির কোমলতা বা শ্যামাভ রূপের সৌন্দর্যের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি নারীত্বের আয়ত আকৃতির সৌকর্য স্থাপিত—করেছেন; সুন্দরী প্রকৃতি এবং লাবণ্যময়ী নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; উভয়েই তাঁর অনুভবে এক এবং একেবারে সমীকৃত।

নক্ষত্রের আলো জ্বেলে পরিষ্কার আকাশের পর
কখন এসেছে রাত্রি!—পশ্চিমের সাগরের জ্বলে
তার শব্দ;—উত্তর সমুদ্র তার,—দক্ষিণ সাগর
তাহার পায়ের শব্দে—তাহার পায়ের কোলাহলে
ভরে ওঠে;—এসেছে সে আকাশের নক্ষত্রের তলে
প্রথম যে এসেছিল, তারি মত;—তাহার মতন
চোখ তার,—তাহার মতন চুল,—বুকের আঁচলে
প্রথম মেয়ের মত; পৃথিবীর নদী মাঠ বন
আবার পেয়েছে তারে,—সমুদ্রের পারে রাত্রি এসেছে এখন!

প্রেমিক তার প্রেমিকার নিবিড় সঙ্গ লাভ করে উপলব্ধি করেন যে, এ নারী প্রকৃতিলগ্ন কিম্বা প্রকৃতিসত্তারই রূপান্তরিত প্রকাশ!

আমরা অনেক দূর চলে গেছি প্রান্তরের ঘাসে,
দ্রোণফুল লেগে আছে মেরুন শাড়িতে তার-নিম-আমলকী
পাতা হালকা বাতাসে

চুলের ওপরে উড়ে-উড়ে পড়ে—মুখে চোখে শরীরের সর্বস্বতা ভরে,
কঠিন এ-সামাজিক মেয়েটিকে দ্বিতীয় প্রকৃতি মনে করে।

সুরঞ্জনা আজ পৃথিবীর বয়সিনী এক মেয়ের মতো, আস্তীর্ণ ফোটা শিউলি ফুল যেন শেফালিকা বোসের ঠোঁটে হীরের প্রদীপজ্বালা হাসি। নারী নদীর মতোই শ্যামল, সেবায় স্নিগ্ধ। কবির কাছে নারী তাই সহজ, স্বাভাবিক। পল্লীপ্রকৃতির চিরায়ত সৌন্দর্যের সঙ্গে নারী যেন লগ্নীভূত, তাই নারীর কাছে পূর্ণ সমর্পণে লোকসান নেই, বরং সুশান্তি মেলে,—কবিও বাঙালি নারীর কাছে নিজেকে ধরা দেন—

বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের গায়ের ধুলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন
বাঙালি নারীর কাছে-চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল,
হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড়; ডাঁশা আম কামরাঙা ফুল।

নারী সম্পর্কে জীবনানন্দের মমতার অভাব ছিল না, কিন্তু নারীর প্রেমকে তিনি ক্ষণকালীন রূপেও দেখেছেন। 'দুজন' কবিতায় দেখা যাবে, নারী-প্রেমের চিরন্তনতার প্রতি তিনি বিশ্বাসী নন। একটি ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, নারীকে তিনি মর্যাদার আসনও দেননি; পুরুষকে বিড়ম্বিত করা এমন কি প্রতারিত করার ইংগিতও করেছেন। তাঁর অতি বিখ্যাত 'ক্যাম্পে' কবিতায় নারীর বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে কোন্ নিষ্ঠুর অথচ দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছায় যেন নারী চালিত হয়! পুরুষের সহজ বিশ্বাসকে প্রতারণা করে—'জোৎস্নায় ঘাই হরিণীর মতো" নারী এসে পুরুষকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যায়। আর একটা ছোট স্বল্পখ্যাত কবিতার উল্লেখ করি—'ইহাদেরি কানে'। নারীর কানে প্রেম ও সৌন্দর্যের বাণীর অমৃত পরিবেশন করে এসেছে পুরুষ চিরকাল ধরে, কিন্তু সেই বাণীর মর্ম কি নারী উপলব্ধি করতে পেরেছে? 'পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে' অর্ধেক কথা শোনে, তারা যেন 'বধির নিশ্চল সোনার পিতল মূর্তি'।

তবু, আহা, ইহাদেরি কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চলে গেলো যুবকের দল :
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।

তবে কবিকে আমরা কোন রকমেই নারী বিদ্বেষী (Misogynist) বলতে পারি না। তবে নারী-প্রেমেই অক্ষয় স্বর্গ এবং চিরশান্তি—এমন স্থির প্রত্যয় স্পষ্টত ঘোষিত হয়নি।

একটা প্রাসঙ্গিক কথা এখানে বলে নিই। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকেই তাঁর বিষাদমাখা প্রেমের কবিতা দেখিতে পাওয়া গেল; এ সময় তিনি যেমন নারী প্রেমে আশ্রিত, তেমনি প্রকৃতিকেও একান্ত করে ভালবেসেছেন, এমনই একান্ত করে আঁকড়ে ধরেছেন, চেয়েছেন। তাঁর এ দুই ধারার প্রেমের মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন প্রকৃতিকে ভালবেসেই তাঁর অপার শান্তি মিলেছে, নারীকে ভালবেসে বেদনায়, অমৃত যন্ত্রণায় জর্জরিত

হয়েছেন। মানবীর প্রেমে গভীর প্রশান্তি নেই, সুষম পরিণতিও আশা করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতিকে ভালবেসে ব্যর্থতা নেই, প্রকৃতি প্রতিদানে বেদনা দিতে শেখেনি। তাই প্রকৃতিকে ভালবাসার মতো নারীর প্রেমকে চিরন্তনতার মূল্যে উজ্জ্বল করা চলে না; প্রকৃতিকে ভালবাসতে গেলে অখণ্ড সময়ের দরকার, অনন্তকালব্যাপী এ ভালবাসা চলতে পারে, কিন্তু নারীর প্রতি প্রেমের জন্য সামান্য সময়সীমা নির্ধারিত হলেই যথেষ্ট।

'আমাকে খুঁজো না তুমি বহুদিন—কতদিন আমি তোমাকে
খুঁজি নাকো; এক নক্ষত্রের নিচে তবু—একই আলো পৃথিবীর পারে,
আমরা দু'জনে আছি; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়।

জীবনানন্দের অনেক প্রেমের কবিতায় দেখা যাবে, নায়িকাকে সম্বোধন করেই কবিতার শুরু। কয়েকটি কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করছি—'শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন'—(শ্যামলী), 'সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছ'—(সুরঞ্জনা), 'সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়ো নাকো তুমি'—(আকাশলীন), 'সবিতা, মানুষ জন্ম আমরা পেয়েছি'—(সবিতা), 'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে'—(সুচেতনা)। প্রেমের কবিতা প্রসঙ্গে এ পদ্ধতির উল্লেখ না করে কবির কাব্যপ্রকরণ প্রসঙ্গেই আমরা এ ব্যাপারটি স্মরণ করলেই পারি। তবু যেহেতু প্রেমের কবিতাতেই সম্বোধন পদের এবম্বিধ কাণ্ড ঘটেছে, তাই এখানে এটির বিচার বা ব্যাখ্যানের দরকার।

কবির যে প্রেম-চেতনা, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পুরুষের তরফ থেকেই আঁচ বা উত্তাপ বেশি। নায়ক সর্বদা বাঞ্ছিত ও আকাঙ্ক্ষিত নারীকে নিবিড় করে পাবার জন্যে ব্যাকুল—এ ব্যাকুলতাই নায়কের কাছে সর্বস্ব, তার কামনার উদগ্রতাই তার কাছে জ্বলন্ত সত্য, ফলে প্রেম আর আর্তির মধ্যে পার্থক্যটুকু ঘুচে গেছে। পুরুষের চোখে নারী হচ্ছে ইন্দ্রিয়সর্বস্বতার বেড়াজালে ধরা-পড়া হরিণীর মতো; তাকে একান্ত করে কাছে পাওয়ার বোধ-ই অভিব্যক্ত হয়েছে—নায়িকাকে ইন্দ্রিয়গম্যতার মধ্যে পেয়ে তাকে বাস্তব সম্বোধনের মাধ্যমে। রোমান্টিক কবিদের মতো প্রেমের উচ্ছ্বাস তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে; শূন্যতা বোধে কাতর এবং বিষণ্ন কবি জানেন, প্রেমের প্রতিদান না-ও মিলতে পারে—তাই প্রতিদানে কিছু না-পাওয়া কবি নায়িকাকে একেবারে কাছে ধরতে চান। মনে হয়, সেজন্যেই তিনি নায়িকাকে হাতের কাছে কল্পনা করেই ডাক দিয়েছেন।

জীবনানন্দের নারীপ্রেম

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

জীবনানন্দ যেমন প্রকৃতির বেদনার আঘাতের ও হিংস্রতার দিকটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও প্রকৃতিলীন জীবনে আস্থা স্থাপন করেছেন, তেমন-ই প্রেমের আঘাত, বেদনা ও দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত থেকেও প্রেমের কাছে পীড়িত হৃদয়ে শুশ্রূষা ভিক্ষা করেছেন।

প্রেম যে ক্ষণিক, এ-কথা আধুনিক কবি জানেন। নশ্বর প্রেমের বিচ্ছেদের যন্ত্রণাও তাঁর অজানা নয়। 'সব প্রেম প্রেম নয়'—একথা তাঁকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, তবু প্রেমের শক্তিতে ও মহত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী। তাঁর কাছে প্রেমের দুর্বলতাও যেমন বাস্তব, প্রেমের শক্তিও তেমন-ই বাস্তব। জীবনানন্দের কাছে প্রেম 'শ্রেয়তর বেলাভূমি'। কবি জানেন, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর প্রেমিকা পৃথিবীতে অগাধ জীবনের মাঝখানে বেঁচে থাকবে, তবুও বলতে পারেন : 'আমার সকল গান তবুও তোমাকে লক্ষ্য করে!'

(নির্জন স্বাক্ষর : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

প্রেম যে স্থায়ী নয়, এ-অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন :

'তুমি শুধু একদিন,—এক রজনীর!
(সহজ : ঐ)

তবু প্রেমের ক্ষণিকতার মধ্যেই যা পাবার তা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় :

'একদিন এসেছিলে,—
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত!
(ঐ)

নারী তো ঘাই হরিণীর মতো। মানব-সমাজ-ই তাকে ছলনা শিখিয়েছে। প্রেমের ছলনায় পুরুষ মুগ্ধ হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোহ তার ভাঙে, মৃত্যুর অধিক ঘৃণা ও যন্ত্রণার অভিজ্ঞতায়।

আধুনিক কবির কাছে প্রেম নিরাবয়ব নয়। শরীরের ভূমিকাকে তিনি যথাযোগ্য মূল্য দেন :

"তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিল একবার—"

(১৩৩৩ : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

অথবা

" আজ শুধু দেহ আর দেহের পীড়নে
সাধ মোর;—চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া,—শুধু পীড়া।—মুকুলে মুকুলে
শুধু কীট,—আঘাত,—দংশন;—
চায় আজ মন!' (পিপাসার গান : ঐ)

প্রেমের রাজ্যে সন্দেহ, হিংসা বাস্তবিক বলেই কবির কাছে মানবিক :

"আমারে চাওনা তুমি আজ আর, জানি;
তোমার শরীর ছানি'
মিটায় পিপাসা
কে সে আজ!—তোমার রক্তের ভালবাসা
দিয়েছ কাহারে!" (ঐ)

প্রেমের মসৃণ মুখোশের আড়ালে কবি স্বার্থের কুটিল মুখ দেখতে পেয়েছেন। অঘ্রাণের রাতে হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক ছিঁড়ে চলে যায়, প্রেমও তেমনই কিছুক্ষণের জন্য হৃদয়কে বীণার মতো বাজিয়ে জীবনকে নির্মম হাতে ছিঁড়ে দিয়ে দূরে সরে যায়—এ-কথা তিনি জানেন। তবু সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের চেয়ে প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি। পাখির মায়ের মতো প্রেম আমাদের বুকের ক্ষতকে ঢেকে রাখে, তাই বলতে পারেন :

"তার ছিঁড়ে গেছে;—তবু তাহারে বীণার মতো করে
বাজাই;—যে প্রেম চলিয়া গেছে তারি হাত ধরে। (প্রেম)

আমাদের রক্তের অসুখ প্রেম-ই সুস্থ করে দিতে পারে। পৃথিবীতে প্রেম আছে বলেই জীবন সুন্দর :

"জীবন আছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি হয়েছে বলে প্রেম,—
... ...
তুমি যদি বেঁচে থাক, জেগে রব আমি এই পৃথিবীর' পর
যদিও বুকের পরে রবে মৃত্যু,—মৃত্যুর কবর!" (ঐ)

প্রেমের মধ্যে বেদনা আছে বলেই বোধ হয় প্রেমকে ভুলে থাকা যায় না। সন্দেহ হয়, কাঁটার জন্যই বুঝিবা প্রেমের ফুলের দুর্নিবার আকর্ষণ। প্রেমের বিশুদ্ধ নির্যাস কোন্‌দিন বাতাসে উবে যেত, যদি না কাঁটার বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রক্তাক্ত পরিচয় ঘটতো। প্রেম চলে গেলে বিচ্ছেদের মর্মান্তিক বেদনা যেমন স্বাভাবিক, তেমন-ই স্বাভাবিক হারানো দিনের ঐশ্বর্যময় অনুভূতির স্মৃতি-রোমন্থন। এক প্রেম চলে যায়, অন্য প্রেম আসে, সে প্রেমও চলে যায়, স্বপ্ন বেঁচে থাকে :

"তুমি, সখি, ডুবে যাবে মুহূর্তের রোমহর্ষে—অনিবার অরুণের স্নানে
জানি আমি; প্রেম যে তবুও প্রেম : স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে রবে,
বাঁচিতে সে জানে।" (রূপসী বাংলা)

এ স্বপ্নই গোধূলিতে নদীর নরম মুখে হারানো প্রেমের কত রেখা খুঁজে পাবে, আর যে-গেছে তার সঙ্গে কোনদিন দেখা হবার সম্ভাবনা নেই—এ-কথা জেনেও মন তখন গেয়ে উঠবে :

'কিবা, হায়, আসে যায়, তারে যদি কোনদিন না পাই আবার। (ঐ)

'বনলতা সেন' রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা। বুদ্ধদেব বসু যেমন প্রেমিকাকে নামের বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন (অমিতা, অপর্ণা, রমা), জীবনানন্দও তেমনই প্রেমকে মূর্ত করেছেন বনলতা, অরুণিমা, শেফালিকা, মৃণালিনী ইত্যাদি পরিচিত নামের মধ্যে। নামের সঙ্গে পদবী যোগ করে (বনলতা সেন, অরুণিমা সান্যাল, শেফালিকা বোস, মৃণালিনী ঘোষাল) জীবনানন্দ তাঁর নায়িকাকে তারও বেশি বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলেছেন। সব শেষে ভৌগোলিক পরিবেশের মাঝখানে স্থাপিত করে (নাটোরের বনলতা সেন) নিবিড়ভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জীবনানন্দ নাম, পদবী ও ভৌগোলিক অবস্থিতির উল্লেখে নায়িকাকে যেমন ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন, তেমনই হাজার বছরের পটভূমিকায় তাকে বিস্তৃতি দিয়ে কম রহস্যময় করে দেখেন নি। প্রেমের মধ্যে দেহসর্বস্বতা ক্লান্তিকর, আর বায়বীয় নিরাবয়বতা অতৃপ্তিকর। বনলতা সেনের মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষ এক বিন্দুতে এসে মিশে গেছে, কেউ কারো ক্ষতি করেনি, বরং একে অপরের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। অথচ তার জন্য কবিকে সবিশেস আয়োজন করতে হয় নি। কত কম আয়োজনে কবি অপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন, ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়।

প্রথমেই নজরে পড়ে 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। জীবনের ক্লান্তিকে প্রকাশ করা জীবনানন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে : 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে', এ স্বীকারোক্তি দিয়ে। এ হাজার বছরে আর কিছু প্রাপ্তি ঘটেছে কিনা জানি না, কিন্তু সব ছাপিয়ে অফুরন্ত ক্লান্তির কথাই আজ মনে পড়ে : 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।" (বনলতা সেন : বনলতা সেন)

এ-ক্লান্তি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের অথবা যুগের ক্লান্তি নয়, মানব-সমাজের হাজার হাজার বছরের ক্লান্তি; মানুষের জীবনে অস্তিত্ববোধের ক্লান্তি। এ ক্লান্তি থেকে কবি মুক্তি চান। জীবনানন্দের কাছে মুক্তির আশ্রয় তিনটি : প্রকৃতি, প্রেম ও অতীতের রহস্যময় সৌন্দর্যের জগৎ। 'বনলতা সেন'-এ এ তিনটি আশ্রয় মিলে কবির জন্য একটি নীড় রচনা করে দিয়েছে।

বনলতা সেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কবি প্রকৃতির গভীর শান্তি অনুভব করেছেন। বনলতা সেন তাঁর কাছে সকল ক্লান্তির শেষে পরম শান্তির আশ্রয়; সে-আশ্রয় দারুচিনি-দ্বীপ ও সবুজ ঘাসের দেশের প্রাণ-সৌরভ মেশানো।

"অতি দূর সমুদ্রের পর
হালভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সুবজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।" (ঐ)

সারাদিন ধরে পাখি রৌদ্রদগ্ধ হয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তার জন্যও একটি নীড় অপেক্ষা করে থাকে, সন্ধ্যায় ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে নীড়ের গভীর প্রশান্তির কাছে ধরা দেয়। বনলতা সেনের পাখির নীড়ের মতো চোখে কবি নিরালম্ব জীবনে আশ্রয় ক্লান্তিজর্জর হৃদয়ে প্রশান্তির আশ্বাস পেয়েছিলেন। পাখির নীড় বনের লতায় তৈরি, সেই সুদূর সূক্ষ্ম সাদৃশ্য নায়িকার নামে ধরা আছে।

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;" (ঐ)

হাজার বছরের দূরের জগৎ থেকে কবি যে কেবল ক্লান্তি এনেছেন, তা হয়তো সত্য নয়; অতীতের দূর অন্ধকার বিদিশার নিশার ধূপের ধোঁয়ার সৌরভ নিয়ে এসেছেন, আর তাই দিয়ে বনলতা সেনের চুলগুলিকে সুরভিত করে তুলেছেন; এনেছেন শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্য দিয়ে বনলতা সেনের মুখখানা মেজে দিয়েছেন। এ সৌন্দর্য ও সৌরভ বহু দূরের বলেই তার সংঙ্গে সূক্ষ্ম রহস্যের অনুভূতি মেশানো। বলা বাহুল্য, প্রতিতুলনার মধ্যে অপ্রাপ্তির হাহাকারও ব্যঞ্জিত হয়েছে বলে এ রহস্যময় সৌন্দর্য ও সৌরভ করুণ বেদনায় রঙিন।

বাস্তবে বনলতা সেনের কাছে কবি দু'দণ্ডের শান্তি পেয়েছিলেন ('আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন'), কেননা ক্ষণিকতাই প্রেমের ধর্ম; কিন্তু সেই দু'দণ্ডের শান্তিই স্মৃতি ও স্বপ্নের জগতে কালের পরিধি ছাড়িয়ে চিরদিনের হয়ে থাকলো। তখন বনলতা সেন যেন কোনো নারী নয়, সে প্রেমের প্রশান্তির প্রতীক।

"সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।" (ঐ)

আজো জীবনে ক্লান্তির অভাব নেই, কিন্তু বনলতা সেন কবির অন্তরে প্রেমের যে নীড় রচনা করেছে, তা চিরসবুজ ও চিরসজীব, কোনো হেমন্তই তাকে ভেঙে ফেলতে অথবা কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে হিম-শীতল করতে পারে না। জীবনের লেনদেন চুকিয়ে দিয়ে কবির ক্লান্তিজর্জর হৃদয় সেখানে নিভৃতে বনলতা সেনের মুখোমুখি বসার অধিকার লাভ করে, প্রেমের স্মৃতি নক্‌শাপাড় শাড়ির আঁচলে তাঁর জীবনের সকল ক্লান্তির চিহ্ন মুছে নেয়।

'বনলতা সেন'-এ ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হয়ে কবিতাটিকে বিস্ময়কর সংহতি দান করেছে।

প্রথম স্তবকের 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'-এর চিত্রকল্পটি দ্বিতীয় স্তবকের দূর সমুদ্রে হালভাঙা দিশেহারা নাবিকের চোখের সামনে দারুচিনি-দ্বীপের ভেতর সবুজ ঘাসের দেশের চিত্রকল্পটির প্রেরণা জুগিয়েছে। আবার দ্বিতীয় স্তবকের পাখির নীড়ের চিত্রকল্পটি তৃতীয় স্তবকের সন্ধ্যায় ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে পাখির ঘরে ফিরে আসার চিত্রকল্প উদ্ভাবনে সাহায্য করেছে। বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ ও দূর অন্ধকারে বিদর্ভনগর পরিক্রমা বিদিশার নিশা ও শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বনলতা সেনের কোনো একটি চিত্রকল্পই বিচ্ছিন্ন নয়; তারা পরস্পর-নির্ভর ও পরস্পর-প্রবিষ্ট।

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন। (ঐ)

পংক্তি দু'টির অন্ত্যানুপ্রাস আমাদের হৃদয়ের নিভৃতে বীণার তারে একটি মৃদু ঝংকার তুলে দেয়। সেই ঝংকার থামে না, বরং

বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। (ঐ)

এ পংক্তি-দু'টির অভাবিতপূর্ব শেষ-মিলের আবেগঘন আলোড়নের সঙ্গে মিশে যায়, আর বনলতা সেনের বীণার ধ্বনির মতো কণ্ঠস্বর আমাদের হৃদয়ের রক্ত চঞ্চল করে। সে-আন্দোলন থামে একেবারে শেষের পংক্তি দু'টিতে এসে :

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন:
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। (ঐ)

তখন আর কোনো আলোড়ন নেই, আছে শুধু স্তব্ধতার ধ্বনি! আধুনিক কবির হাতে উপমা যে কী দৈবশক্তির মতো কাজ করে যায়, বনলতা সেনে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। বনলতা সেনের বিদিশার নিশার মতো অন্ধকার চুল, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো মুখ, আর পাখির নীড়ের মতো চোখ প্রেমের বিস্ময়, রহস্য, সুদূরতা ও প্রশান্তিকে মূর্ত করে তুলেছে।

কবিতাটি পড়তে পড়তে সিদ্ধির পেছনে যে-পরিশ্রম, তার কোনো ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না, আর সেখানেই কবির কৃতিত্ব। তাই আকারে ক্ষুদ্র হলেও 'বনলতা সেন' ইঙ্গিতে সুদূরপ্রসারী। জীবনানন্দ আধুনিক কবি। প্রেমের হতাশা; ক্ষণিকতা, ছলনা, সবকিছু তাঁর জানা। তবু প্রেম যে শাশ্বত, এ-কথা তিনি মানেন। প্রেম যতই ক্ষণকালের জন্য জীবনকে আশ্রয় দিক-না কেন, জীবনকে অন্যলোকে উত্তীর্ণ করার ক্ষমতা তার আছে, এ শাশ্বত অভিজ্ঞতাই জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় সমর্থিত হয়েছে। কাজেই 'রোমান্টিক কবিদের শাশ্বত প্রেমের আদর্শে জীবনানন্দের বিশ্বাস নেই'—এ-কথা

আমরা মানতে পারি না। আসলে আধুনিক কবি প্রতিটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ অথবা পূর্বসূরিদের বিপরীত, এ-ধরনের ভ্রান্ত ধারণাই সমালোচককে বিপথে চালিত করে। 'বনলতা সেন' জীবনানন্দ দাসের সকল রকম বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়েও ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়, তাকে অঙ্গীভূত করেই 'বনলতা সেন' রবীন্দ্রোত্তর যুগের একটি মহৎ কবিতা। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ভূমিকার পটভূমিকায় বনলতা সেন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'বনলতা সেন' পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতাটি পাঠকের মনে পড়বে।

"দূরে বহুদূরে
স্বপ্নালোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে।" (স্বপ্ন : কল্পনা)

রবীন্দ্রনাথ হাজার বছর ডিঙিয়ে বার বার আমাদের কালিদাসের জগতে নিয়ে গেছেন বলেই জীবনানন্দের সঙ্গে হাজার বছর ধরে সিংহলসমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অথবা বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে বা বিদর্ভনগরে পথ হাঁটতে আমরা ক্লান্তি বোধ করি না।

"মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নিবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা। (ঐ)

অথবা,

"অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধ-চ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।" (ঐ)

মালবিকার প্রসাধন-বর্ণনা কালিদাসের কাব্য থেকে নেয়া। উপযুক্ত আবহ সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথের এতো আয়োজন। জীবনানন্দ এর থেকেই নির্যাসটুকু ছেঁকে নিলেন :

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য : (বনলতা সেন : বনলতা সেন)

রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে-অভিজ্ঞতা কাব্য-রসিকের হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে আছে, তা ভাঙিয়েই জীবনানন্দের অল্পকথার রহস্যময় সৌন্দর্যকে অনুভব করা যাবে।

"—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু আছ তো ভালো'?" (স্বপ্ন : কল্পনা)

উজ্জয়িনীর মালবিকা আর নাটোরের বনলতা যদিও এক কালের বা এক দেশের মানুষ নয়, তবু তাদের চোখে-মুখে-দেহে এক-ই ভাষা, যা পড়তে কষ্ট হয় না!

"বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন'?
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"
(বনলতা সেন : বনলতা সেন)

মনে হয় যা সবচেয়ে বেশি পুরাতন, তা-ই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি আধুনিক।

"নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে কুলায় প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো," (স্বপ্ন : কল্পনা)

জীবনানন্দও জানেন, যখন সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের গন্ধের মতন সন্ধ্যা নামে, তখন সব পাখি ঘরে ফেরে, আর সন্ধ্যার পাখির মতো কবিরও কুলায় প্রত্যাশী মন, পাখির নীড়ের মতো চোখে আশ্রয় চায়।

স্বপ্নের জগতে বেশিক্ষণ বাস করার উপায় নেই :

'রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদী তীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।" (ঐ)

পরিপূর্ণ মিলনের মাঝখানেই বিচ্ছেদের কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। তাই থেমে থেমে একটি দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে কবিতাটি শেষ হয়েছে। জীবনানন্দও স্বীকার করেছেন : 'আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।' এ-স্বপ্ন যেখানে সত্য, জীবনানন্দ আমাদের সেই পরাবাস্তবতার জগতে নিয়ে গেছেন, যেখানকার আলো-অন্ধকারে হারানো সৌন্দর্যকে বারবার ফিরে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে যা অনুচ্চারিত হলেও লালিত্যের সঙ্গে আভাসিত। তেমনই রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির শেষ দীর্ঘনিশ্বাসে জীবনানন্দের কবিতাটির বাস্তব ও পরাবাস্তবের মাঝখানের পর্দাটি মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

এর পরেও জীবনানন্দ ট্রাডিশন-বিচ্যুত অথবা তিনি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন পড়েননি, এমন সন্দেহ নিশ্চয়ই মনের মধ্যে জাগবে না। জীবনানন্দের জগৎ রবীন্দ্রনাথের জগৎ নয়, তা মনে রেখেই আমরা এ-কথা বলছি। যথার্থ নতুন কবিতা এভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঐতিহ্যকে অঙ্গীভূত করেই তা কাব্যের কাঠামোকে বদলে দেয়। জীবনানন্দ দাশও তা-ই করেছেন।

'বনলতা সেন' কবিতাটি পড়তে পড়তে পাঠকের Edger Allan Poe-র 'To Helen' কবিতাটির কথাও মনে পড়ে স্বাভাবিক। 'To Helen'-এর প্রথম স্তবক 'বনলতা সেন'-এর প্রথম স্তবকের 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন' ও দ্বিতীয় স্তবকের হালভাঙা নাবিক ও দারুচিনী-দ্বীপের চিত্রকল্পটি মনে পড়িয়ে দেবে, যদিও দারুচিনি দ্বীপের ভেতর সবুজ ঘাসের দেশ ও 'Native Shore'-এর মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। জীবনানন্দের বক্তব্য অনুসারে 'Perfumed Sea' রসাভাস দোষ ঘটাবে, সবুজ ঘাসের দেশ-ই তাঁর কাছে 'Perfumed' (দারুচিনী-দ্বীপ)।

'To Helen'-এর দ্বিতীয় স্তবকের 'Thy hyacinth hair, thy, classic face'-এর সঙ্গে 'the glory that was Greece' 'the grandeur that was Rome' যোগ করলে যে-ফল পাওয়া যায়, তার তুলনায় 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' অনেক বেশি প্রভাবশালী, এ-কথা মেনে নিলেও সাদৃশ্যটি লক্ষ্য করা দরকার।

হেলেন পৌরাণিক চরিত্র, মালবিকাও কালিদাসের কাব্যজগৎ থেকে ছেঁকে তোলা প্রায়-পৌরাণিক চরিত্র। তাদের মধ্যে ধ্রুপদী সৌন্দর্যের আবিষ্কার বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না। কিন্তু নাটোরের বনলতা সেন কবির ও পাঠকের সমকালীন আধুনিক নারী। তার মধ্যে কবি যখন ধ্রুপদী সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন, তখন বিস্ময়ের যে অভূতপূর্ব আবেগের সৃষ্টি করে, তার স্বাদ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। সেই আবেগ ছন্দের মধ্যে বিশেষ করে প্রতি স্তবকের শেষ পংক্তি দু'টির অন্ত্যমিলে যে, ভাবে ধরা পড়েছে তার কোনো প্রতিতুলনা পো-র কবিতায় পাওয়া যাবে না। তাছাড়া 'বনলতা সেন'-এ ওপরে আলোচিত চিত্রকল্প দুটি ছাড়া অন্যান্য যে-সকল বিশিষ্ট চিত্রকল্পগুলি সমাবিষ্ট হয়েছে, পো-র কবিতার সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই।

'বনলতা সেন'-এর ওপর 'স্বপ্ন' অথবা 'To Helen'-এর প্রভাব অস্বীকার করার কথা যেমন ওঠে না, তেমনই সেই প্রভাবের ওপর অনাবশ্যক জোর দেয়াও আমাদের কাছে অর্থহীন ঠেকে। তবু এ-ধরনের আলোচনার প্রয়োজন আছে কেননা, কবিতার জন্মকাহিনী যে কত জটিল ও রহস্যময়, তা এ-ধরনের আলোচনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি; এবং এ-কথা আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় যে, "the mind of the mature poet differs from that of the immature one not precisely in any valuation of 'Personality,' not being necessarily more interesting, or having 'more to say,' but rather by being a more finely perfected medium in which special, or very varied, feelings are at liberty to enter into new combinations.' এক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের কবি-মানস একটি শক্তিশালী পরিশীলিত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে গেছে, যেখানে নানা রকমের বিশিষ্ট ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার রাসায়নিক মিশ্রণে একটি মহৎ কবিতার জন্ম হয়েছে।

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় কেবলমাত্র হারানো প্রেমের শূন্যতাই ব্যঞ্জিত হয়েছে অথবা না পাওয়া প্রেমের আর্তি ও হাহাকার গুমরে গুমরে ফেটে পড়েছে—একথা সত্য

নয়। পরিপূর্ণ প্রেমের প্রশান্তি সমস্ত অভাব-বোধের ঊর্ধ্বে কবির হৃদয়কে ভরে রেখেছে সে-পরিচয়ও তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় :

"পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে। (রূপসী বাংলা)

প্রকৃতি ও ইতিহাস-চেতনা কবিকে শক্তি জুগিয়েছে, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি শক্তি তিনি প্রেমের কাছ থেকেই পেয়েছেন।

'বয়স বেড়েছে ঢের নর-নারীদের;
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো;
তবুও সমুদ্র নীল; ঝিনুকের গায়ে আলপনা;
একটি পাখির গান কী রকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।
(সুরঞ্জনা : বনলতা সেন)

আর সেই সাধনার ফল হলো :

'...সঙ্ঘ নয়, শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।" (ঐ)

বর্তমান নাস্তিক-যুগে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি উজ্জ্বল বিশ্বাসকে হৃদয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি; বোধ হয় তার পুনরুজ্জীবনেরও কোনো আশা নেই। কিন্তু

'যে জিনিস বেঁচে আছে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে :—
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে!
(নির্জন স্বাক্ষর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

তার মৃত্যু নেই। মানবের জ্ঞান, ধর্ম অথবা সঙ্ঘ সকলের-ই পেছনে এ শক্তি আবহমান কাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। প্রেমহীন জ্ঞান, ধর্ম অথবা সঙ্ঘের শক্তি পৃথিবীতে বেশিদিন টিঁকে থাকে না, টিঁকে থাকলেও মানব-সভ্যতার বিশেষ উন্নতি করতে পারে না। জ্ঞান, ধর্ম ও সঙ্ঘ প্রেমের শক্তিতে বলীয়ান। এ-প্রেম হয়তো মানবপ্রেম। কিন্তু মানবপ্রেমেরও মূলে : 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'।

'তোমার সৌন্দর্য নারী, অতীতের দানের মতন।
মধ্য সাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে

শান্তির সঙ্ঘের দিকে—ধর্মে—নির্বাণে;
তোমার সুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।'
(মিত্রভাষণ : বনলতা সেন)

কবি মানব-সভ্যতার মর্মের ক্লান্তিকে অনুভব করেছেন। বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা তাঁর হৃদয়কেও ব্যথিত করে তুলেছে। তিনি চোখ মেলে দেখেছেন, কিভাবে ক্রমশ মানব-সভ্যতা তার স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতাকে হারিয়ে ফেলেছে।

'তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো;
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।' (ঐ)

তাই এখনও ভরসা করতে পারা যায় বলে কবি বলতে পারেন :

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।' (সুচেতনা : বনলতা সেন)

নদীর স্নিগ্ধ শুশ্রূষা আর সূর্যের আলো দিয়ে নারীর যে-হৃদয় তৈরি, সেই হৃদয়ের-ই পথে চেতনার আলো জ্বেলে মানুষকে যাত্রা শুরু করতে হবে : 'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।' পৃথিবীর মুক্তি যে সহজসাধ্য নয়, একথা তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে! 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।' তবু প্রকৃতিলীন জীবনের মধ্যে প্রেম ও ইতিহাস-চেতনার আলো জ্বেলে অনেক অনেক দিন ক্লান্ত হয়েও ক্লান্তিহীন মনে বাতাসের মতো সূর্যকরোজ্জ্বল মানব-সমাজ গড়ে তোলার ভরসা রাখেন। কবির কাছে এ-ভরসার সঙ্গত কারণ বর্তমান :

"মাটি পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।' (ঐ)

অথবা

"অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়।"
এই স্বাদ—গভীর—গভীর।" (পাখিরা : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

জীবনানন্দ বনলতা সেনের মুখে শ্রাবস্তীর কারুকার্য, চুলে অন্ধকার বিদিশার নিশা আর চোখে পাখির নীড়ের মতো শান্তির আশ্রয় আবিষ্কার করেছেন। শ্যামলীর মুখে দেখেছেন সেকালের শক্তি, যার অনুপ্রেরণায় যুবকেরা দ্রাক্ষা, দুধ ও ময়ূরশয্যার কথা

ভুলে রূঢ় রৌদ্রে নতুন দেশের সোনার উদ্দেশে অকূলে জাহাজ ভাসাতো। প্রেমকে তিনি কত বিচিত্র, ব্যাপক ও গভীরভাবে অনুভব করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

"তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।" (শ্যামলী : বনলতা সেন)

উপমার দূরান্বয় সে দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, ওপরের উদ্ধৃতিটি আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপমা বলতে আমরা চিত্রকল্পগুলির কথা বোঝাতে চাইছি। কেননা, চিত্রকল্পও প্রসারিত উপমা ছাড়া আর-কিছু নয়। শ্যামলীর মুখের দিকে তাকালে কবির যে-অনুভব জন্মে, বিভিন্ন চিত্রকল্পের মাধ্যমে (দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা, বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল, ঘর ছাড়া যুবাদের ক্রন্দন ইত্যাদি) সাদৃশ্য-আবিষ্কারের দ্বারা তার পরিচয় দিতে চেয়েছেন। সেই অনুভবের বিষণ্ন সৌন্দর্য উদাসকরা ঘর-ছাড়া বেদনার অনির্বচনীয়তা নিয়ে আসে বলেই শ্যামলীর মুখ অনাস্বাদিত লাবণ্যে ভরে ওঠে। সেই মুখখানি জীবনের শূন্যতার মাঝখানে যৌবনের শ্যামলিমা বিছিয়ে দেয়, তাই নায়িকার নাম শ্যামলী।

"অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রেয়তর বেলাভূমি :
যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতী সৌরভে। (মিতভাষণ : বনলতা সেন)

জীবনানন্দ প্রেমের ক্ষেত্রে প্রায়-ই সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ করেন। তার মধ্যে আন্দোলন, আলোড়ন, বেদনা ও ক্ষয়-ক্ষতির ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়। কিন্তু সবার ওপরে থাকে একটি পরম প্রাপ্তির জন্য মানুষের দুর্জয় অন্বেষণের ইঙ্গিত। ফলে প্রেমের মুখের ওপর আবিষ্কারের আলো এসে পড়ে, তার সঙ্গে স্নিগ্ধ অনুভূতির সৌরভ মিশে যায় বলে তা আরো রমণীয় হয়ে ওঠে। প্রকৃতিলীন জীবন ও ইতিহাস-চেতনা কবিকে আশ্বাস দিলেও প্রেমের মতো তারা অমৃতের আস্বাদ নিয়ে আসে না, তাই প্রেম কবির কাছে : 'শ্রেয়তর বেলাভূমি'।

"তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন;
তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কত পৌত্তলিক খ্রিস্টান সিন্ধুর

অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্য জাগার মতন;
কত কাছে—তবু কত দূর।" (সবিতা, ঐ)

জীবনানন্দের নিজস্ব সমুদ্র-ব্যঞ্জনা ছাড়াও সমুদ্র থেকে পৃথিবী, ভেনাস ও উর্বশীর জন্মকাহিনীর অনুষঙ্গ পাঠকের মনে কাজ করে যায়। তাছাড়া অন্ধকারের বুক চিরে প্রথম উষার আবির্ভাব ও বৈদিক যুগের অনুষঙ্গ পাঠকের উপলব্ধিকে নিবিড়তর করে তোলে।

"সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।" (সুচেতনা : ঐ)

প্রেম দূরের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে বলে আজো মোহময়। 'বনলতা সেন' কবিতায় জীবনানন্দ পাঠকের চোখে প্রেমের যে মোহ-অঞ্জন এঁকে দিয়েছেন, তার কিছু আভা উদ্ধৃত পংক্তিগুলির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। সমুদ্রের মাঝখানে দূরতর দ্বীপ, বিকেলের কোলাহলের মধ্যে অস্ফুট নক্ষত্রের ঝিকিমিকি ও দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে নির্জনতা আমাদের অশান্ত ভিড়াক্রান্ত জীবনে নিভৃত প্রেমের রমণীয়তার আস্বাদ আনে। দারুচিনির সৌরভের সঙ্গে মিশে সে-আস্বাদ সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।

"একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।" (সুদর্শনা : ঐ)

মহিলা, যুগের সঞ্চিত পণ্য ও অগ্নিপরিধি পাঠককে কবির অভিজ্ঞতার অংশভাক্ করে তোলে। তবু যুগের ও দেহের দাবি মিটিয়েও আত্ম-ধিক্কারের প্রয়োজন হয় না। কেননা, দেবদারু গাছের উন্নত শীর্ষ, বাতাসে তার কিন্নর কণ্ঠ এবং ডালপালার ফাঁকে অমৃতসূর্যের আবির্ভাব সব গ্লানি মুছে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'সুদর্শনা'র অনুষঙ্গ বৈচিত্র্য ও নবীনতা এনেছে। প্রকৃতির মতো প্রেমেরও বিচিত্র অনুভূতির ঐশ্বর্যময় গভীরতায় জীবনানন্দ আধুনিক সকল কবিকেই অতিক্রম করে গেছেন।

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা

আবদুল মান্নান সৈয়দ

১. দু-একটি কুঁড়ি

জীবনানন্দ দাশের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'ঝরা পালকে' (১৯২৭) একটিও প্রেমের কবিতা নেই। কিন্তু তবু নারী-কল্পনার তিনটি ধরন এ বইয়ে দেখা যায়। এক, প্রেমের অস্ফুট বোধ ও পিপাসা; দুই, ইন্দ্রিয়ময়ী হিসেবে নারী; এবং তিন, নারী মৃতা ও ভয়ংকরী রূপে।

প্রেমের কবিতা নেই এ বইয়ে। যা আছে তা হচ্ছে, প্রেমের অস্ফুট বোধ; পিপাসা, অনুভূতি। এক রোমান্টিক সুদূরতা, বিষণ্নতা তাঁকে আমূল আচ্ছন্ন করেছিল সেদিন। 'আমি কবি,—সেই কবি' ('ঝরা পালক'-এর প্রথম কবিতা) এবং 'কবি' নামক আত্ম-উন্মোচক কবিতাদ্বয়ে জীবনানন্দ কবির যে-পরিচয় শব্দবদ্ধ করেছেন, সেখানে সুদূরতা, বিধুরতা, নিসর্গপ্রেম, বেদনামুগ্ধতা ইত্যাদি রূপ পেয়েছে, কিন্তু নারীপ্রেম অনুপস্থিত। দ্বিতীয় কবিতাটিতে 'উসখুস এলো চুলে ভরে আছে কিশোরীর নগ্ন মুখখানি,[১]/তারি পাশে সুর ভাসে,—অলখিতে উড়ে যায় কবির উড়ানি' এ দু'টি পঙক্তি আছে বটে, কিন্তু এখানেও প্রেমের চেয়েও প্রাথমিক নারী-বোধই সত্য। 'একদিন খুঁজেছিনু যারে' কবিতায় কবি যাকে সন্ধ্যালোকে, নিসর্গপ্রকৃতিতে, ইতিহাসের পথে খুঁজেছেন, সে যেন ঠিক প্রিয়া নয়—প্রিয়ার ছদ্মবেশে রোমান্টিক সুদূরতার পশ্চাদ্ধাবন। 'ছায়া-প্রিয়া' কবিতায় তার-ই রণন। 'জীবন-মরণ দুয়ারে আমার' কবিতায় সেই-যে বলেছেন, 'জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, কারে যে বাসিব ভালো/একা একা তাই ভাবিয়া মরিছে মন।' তাতে কবি-হৃদয়ের প্রেম-পিপাসাই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

'অস্তচাঁদে', 'চাঁদিনীতে' ও 'দক্ষিণা' কবিতায় যে-সকাম ইন্দ্রিয়ের বহ্ন্যুৎসব, উত্তরকালে তা আর অমনভাবে চিত্রিত হয়নি কবির রচনায়। কিন্তু এসব কবিতায় পূর্ববর্তীদের পদচারণা যতোখানি স্পষ্ট, কবির আত্মতা ততোখানি সুমুদ্রিত নয়। জীবনানন্দের কবিতায় নারী আর কখনো অমন ইন্দ্রিয়ময়ী হিসেবে দেখা দেয়নি। তিনটি উদাহরণ :

১. নটীরা ঘুমায়েছিল পুরে-পুরে, ঘুমে রাজবধূ,
চুরি করে পেয়েছিনু ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু।
সম্রাজ্ঞীর নির্দয় আঁখির দর্প বিদ্রূপ ভুলিয়া
কৃষ্ণাতিথি চাঁদিনীর তলে আমি ষোড়শীর উরু পরশিয়া

লভেছিনু উল্লাস—উতরোল! আজ পড়ে মনে
সাধ বিষাদের খেদ কত জন্মজন্মান্তের,—রাতের নির্জনে!

[অস্তচাঁদে]

২. হয়তো তাহারা মদঘূর্ণনে নাচিত কাঞ্চিবাঁধন খুলে
এমনি কোন এক চাঁদের আলোয়,—মরু 'ওয়েসিসে'—তরুর মূলে!
বীর যুবাদল শত্রুর সনে বহুদিনব্যাপী রণের শেষে
এমনি কোন এক চাঁদিনি বেলায় দাঁড়াত নগরী তোরণে এসে!
কুমারীর ভিড় আসিত ছুটিয়া, প্রণয়ীর গ্রীবা জড়ায়ে নিয়া
হেঁটে যেতো তারা জোড়ায়-জোড়ায় ছায়া-বীথিকার পথটি দিয়া!

[চাঁদিনীতে]

৩. এসেছে নাগর,—যামিনীর আজ জাগর রঙিন আঁখি,—
কুয়াশার দিনে কাঁচুলি বাঁধিয়া কুচ রেখেছিল ঢাকি',
আজিকে কাঞ্চি যেতেছে খুলিয়া,—মদঘূর্ণনে হায়।
নিশীথের স্বেদ সীধুধারা আজ ক্ষরিছে দক্ষিণায়!

[দক্ষিণা]

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় অনেক সময় প্রেমিকা মৃত এবং ভয়ংকরী। এভাবে এ্যালান পো[২]-শোভন ক্ষয়ের ও বিভীষিকার কল্পনা জীবনানন্দকে মাঝে-মাঝে দখল করেছে : 'তরুণীর দুধ-ধবধবে বুকে সাপিনীর দাঁত উঠেছে রেঙে!' ('চাঁদিনীতে) 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কবিতার নায়িকার

অশ্রুর অঙ্গারে তার নিটোল ননীর গাল,—হারায়েছে রুলি
এলোমেলো চুল খসে গেছে খোঁপা তার,—বেণী গেছে খুলি!
সাপিনীর মতো বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ,
ভেঙেছে নাকের ডাঁশা,—হিম স্তন,—হিম রোমকূপ!

এ ভয়াবহ নারীকঙ্কালের কল্পনা কবির পরবর্তী কবিতাতেও পাওয়া যায়।[৩]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ বইয়ে নারী-কল্পনার তিনটি ধরন রূপায়িত। এক, প্রেমের অস্ফুট বোধ ও পিপাসা; দুই, নারী—ইন্দ্রিয়ময়ী হিসেবে; এবং তিন, নারী—মৃতা ও ভয়ংকরী রূপে।

২. পুরো ফোটা ফুল

প্রেমের প্রথম পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটলো 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে। বই খুলেই আমরা পড়ি 'তুমি তো জান না কিছু, না জানিলে,—/আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!' (নির্জন স্বাক্ষর, ধূ, পা,)—একতরফা প্রেমের এ সহজ কিন্তু অসামান্য কাব্যরূপ। 'সহজ' কবিতাতেও এ একতরফা প্রেমের রূপায়ণ : 'আমার এ গান/কোনো দিন শুনিবে না তুমি এসে,—আজ রাতে আমার আহ্বান/ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—/তবুও হৃদয়ে গান আসে।' (সহজ, ঐ)

ক্ষণিকতা, কিন্তু ক্ষণিকতার উত্তরে প্রেমের চিরন্তনতা দেখা দিল 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে। 'কোনো-এক মানুষীর মনে/কোনো-এক মানুষের তরে/যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীরে গহ্বরে।' তারই উদ্দেশে কবির প্রস্থান, সফর। রোমান্টিকতা— বর্তমান ব্যথিত অতীত হয়ে যায়, তবুও দয়িতার শরীর শীতহীন। কবি চলে গেলেও, কবি মৃত হলেও দয়িতা যেন অমর, প্রকৃতপক্ষে—কবি বলছেন—প্রেমই অমর। 'আমি চলে যাব,—তবু জীবন অগাধ/তোমারে রাখিবে ধরে সেই দিন পৃথিবীর পরে;—আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!' ক্ষণিকতা কিন্তু ক্ষণিকতার উত্তরে প্রেমের চিরন্তনতার বোধ জীবনানন্দ এ কবিতাগুচ্ছেই প্রথম আবিষ্কার ও অর্জন করলেন, যা পরে হয়ে ওঠে তাঁর প্রেমের কবিতাগুচ্ছের একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রলক্ষণ।

১. কতবার বর্তমান হয়ে গেছে ব্যথিত অতীত—
তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত।
যে-নক্ষত্র ঝরে যায় তার।

[নির্জন স্বাক্ষর]

২. আমি শেষ হবো শুধু, ওগো প্রেম তুমি শেষ হলে!
তুমি যদি বেঁচে থাকো,—জেগে রব আমি এই পৃথিবীর পর,—
যদিও বুকের পরে রবে মৃত্যু,—মৃত্যুর কবর! [প্রেম]

৩. একদিন—একরাত প্রেমেরে পেয়েছি তবু কাছে!—
আকাশ চলেছে,—তার আগে-আগে প্রেম চলিয়াছে!
সকলের ঘুম আছে;—ঘুমের মতন মৃত্যু, বুকে
সকলের;—নক্ষত্রও ঝরে যায় মনের অসুখে;—
প্রেমের পায়ের শব্দ তবুও আকাশে বেঁচে আছে!
সকল ভুলের মাঝে যায় নাই কেউ ভুলে-চুকে
হে প্রেম তোমারে!—মৃতেরা আবার জাগিয়াছে!—
যে-ব্যথা—মুছিতে এসে পৃথিবীর মানুষের মুখে
আরো ব্যথা—বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে,—
ওগো প্রেম,—সেইসব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে! [প্রেম]

প্রেমের ক্ষণিকতাবোধ জীবনের আচলমান পটভূমিতে এসেছে পরপর :

১. যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের পরে শুয়ে রবে?

[নির্জন স্বাক্ষর]

২. তুমি শুধু একদিন,—এক রজনীর!
একদিন এসেছিলে
দিয়েছিলে একরাত্রি দিতে পারে যত! [সহজ]

৩. একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!
একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুর অবহেলা।
একদিন—একরাত;—তারপর প্রেম গেছে চলে—
সবাই চলিয়া যায়,—সকলের যেতে হয় বলে
তাহারও ফুরাল রাত![৪] [প্রেম]

সময়ের ব্যাপ্তির বোধ, জীবনানন্দ যাকে বলতেন 'সময় চেতনা', প্রথম প্রকাশিত হলো স্পষ্টভাবে 'পঁচিশ বছর পরে' কবিতায়। প্রেমিকাকে পঁচিশ বছর আগে যিনি একদিন বলেছিলেন, 'একদিন এমন সময় আবার আসিও তুমি—আসিবার ইচ্ছা যদি হয়?—/পঁচিশ বছর পরে।' পঁচিশ বছরান্তে প্রেমিকার অনুপস্থিতি ঘোষিত হলো প্রকৃতির চির চলমানতায়। প্রকৃতির চলমানতা কিন্তু প্রেমিকা মৃত কিংবা অনুপস্থিত, পরবর্তী কিছু কবিতায় এ ধারা চলেছে।[৫]

দু'টি ভিন্ন ধরন—আবার ভেতরে কোথাও ওতোপ্রোত বাকি কবিতার সঙ্গে—পাওয়া যাবে 'পরস্পর' এবং 'প্রেম' কবিতায়। এ দু'টি কবিতাই ঠিক প্রেমের কবিতা নয়, কিন্তু 'পরস্পরে'র কেন্দ্র চরিত্র নারী, আর 'প্রেম' প্রেমের বন্দনা। 'পরস্পরে' যে-অতিপ্রাকৃত আবহ, তা জীবনানন্দের আরো কোনো-কোনো কবিতায় আছে : তিনটি মৃতা নারীর কাহিনী। জীবনানন্দের দয়িতা অনেক সময় মৃতা, 'পরস্পরে'ও তা-ই। 'প্রেম' কবিতাটিকে জীবনানন্দের প্রেমের কবিতার প্রাবন্ধিক প্রবেশক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কবি বলেছেন, 'সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি।' জীবনে প্রেমই প্রধানা, 'যতদিন বেঁচে আছি আলেয়ার মতো আলো নিয়ে,—/চলে আস প্রেম,—তুমি চলে আস কাছে প্রিয়ে।' শুধু জীবনেই নয়, 'আমরা ফুরায়ে যাই,—প্রেম, তুমি হও না আহত'। প্রেমের এ মৃত্যুত্তর ভূমিকার জয়গানেই কবিতাটি শেষ হয়েছে।

['ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অপ্রকাশিত কবিতা' নামে সংযোজিত অংশে—ঐ কাব্যের সমকালে রচিত—এমন কতোগুলি কবিতা আছে, যা কবির প্রেম-ভাবনার পরিচায়ক। 'পৃথিবীতে থেকে' নামক কবিতা-চতুরঙ্গে ('তোমার সৌন্দর্য চোখে', 'তোমার শরীরে', 'একরাশ পৃথিবীরে', 'তোমারে দেখেছি, তাই') কবির মৃত্যুমগ্ন প্রেমানুভূতির আশ্চর্য প্রকাশ। জীবনানন্দের প্রেম-কবিতায় অনেক সময় মৃত্যু আছে; কিন্তু মৃত্যু বিচ্ছেদ-রচনাকারী নয়, মৃত্যুর ওপরে উঠে গেছে প্রেমের বিজয়ী মিনার : 'তোমারে দেখেছি, তাই' কবিতাটিতেও জীবনের সমস্ত পরাজয়কে, 'কুয়াশা হতাশা'কে এমনকি মৃত্যুকেও পরাভূত করেছে প্রেমের উপলব্ধি। 'এই শান্তি' কবিতায় প্রেমিকার স্মৃতির বেদনা মন্থিত হয়েছে কবির হৃদয়ে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেমিকার অনুপস্থিতির বেদনা মুছে দিয়েছে প্রকৃতির প্রবাহ—জীবনানন্দের প্রেমভাবনার এটি এক চরিত্রলক্ষণ। সংহত পরিষ্কার জীবনানন্দীয় প্রেম-ভাবনার এ কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করা যাক :

এই শান্তি

এইখানে একদিন তুমি এসে বসেছিলে—তারপর কতদিন আমি
তোমারে রয়েছি ভুলে—একদিন তুমি এসে বসেছিলে কখন এখানে

মুছেছে জীবন থেকে—ফড়িঙের মতো আমি ধানের ছড়ার পরে নামি
জীবনেরে বুঝিয়াছি; আমি ভালোবাসিয়াছি—সেইসব ভালোবাসা প্রাণে
বেদনা আনে না কোনো—তুমি শুধু একদিন ব্যথা হয়ে এসেছিলে কবে
সেদিকে ফিরিনি আর—চড় য়ের মতো আমি ঘাস খড় পাতার আহ্বানে
চলে গেছি; এ-জীবন কবে যেন মাঠে-মাঠে ঘাস হয়ে রবে
নীল আকাশের নিচে অঘ্রাণের ভোরে এক—এই শান্তি পেয়েছি জীবনে
শীতের ঝাপসা ভোরে এ-জীবন ভেলভেট জ্যাকেটের মাছরাঙা হবে
একদিন—হেমন্তের সারাদিন তবুও বেদনা এল—তুমি এলে মনে
হেমন্তের সারা দিন—অনেক গভীর রাত—অনেক অনেক দিন আরো
তোমার মুখের কথা—ঠোঁট রঙ চোখ চুল—এইসব ব্যথা আহরণে
অনেক মুহূর্ত কেটে গেল, আহা; তারপর—তবু শেষে শান্তি এল মনে
যখন বেগুনি নীল প্রজাপতি কাচপোকা আবার নেমেছে মাঠে বনে।৬]

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' জীবনানন্দের আত্মআবিষ্কারের বই। প্রেমের বোধ, চেতনা ও উপলব্ধি এ আবিষ্কারে ছিল এক প্রধান শক্তি।

৩. বিশ্বচেতনা, কালচেতনা

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে জীবনানন্দের প্রেম ছিল একান্ত ব্যক্তিগত, 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' জীবনানন্দের পরবর্তী এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে প্রেমবোধ পরিব্যাপ্ত হলো স্থানে এবং কালে।

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে', 'বনলতা সেন' ('বনলত-সেন')-এর এ প্রথম বাক্যেই একত্র স্থাপিত মহাপৃথিবী ও মহাসময়। এককভাবে 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ প্রেমকাব্য। এ বইয়ে জীবনানন্দের প্রেম স্বপ্ন, আনন্দ, বেদনা, সমকাল ও মহাকালকে স্পর্শ করতে চেয়েছে। 'প্রেম' (ধূ, পা,) কবিতায় যা ছিল তত্ত্বের আকারে ('সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে/প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি'), 'বনলতা সেন'-এর কবিতাগুচ্ছে তা হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ জীবনের রসে সমুজ্জ্বল, সমুচ্ছল। এ বইয়ে কল্পনার ব্যবহার প্রচুর ও বিচিত্র—কল্পনা স্বপ্ন ও সমকাল দুই নিয়েই। বনলতা সেন-এর সঙ্গে যে-মিলন সম্পন্ন হয়, তা হয় স্বপ্নের মধ্য দিয়েই। চিলের ক্রন্দন, বুনো হাঁসের পাখার ঝাপট বা হরিণের খেলা মনে আনে প্রেমিকাদের কথা। 'আমি যদি হতাম' কবিতায় সমকালের দাহ থেকে উত্তরণ ঘটানোর আকাঙ্ক্ষা উচ্চারিত হয়েছে বুনো হাঁস ও নারীহংসী হওয়ার মধ্যে :

আজকের জীবনের এ টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না;
থাকত না আজকের জীবনেব টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;
আমি যদি বনহংস হতাম,
বনহংসী হতে যদি তুমি;
কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

'শঙ্খমালা' কবিতায় কবিকল্পনা পাখা মেলেছে রূপকথার মধ্য দিয়ে, 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতার ইতিহাসের সুদূরতায়।

'বনলতা সেন'-এর মতো আর-কোনো বাংলা কবিতাগ্রন্থে এরকমভাবে এক-ই সঙ্গে প্রেম ও মৃত্যু ওতোপ্রোত হয়ে নেই। বনলতা সেনের সঙ্গে কবির মিলন হয়, যখন 'ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন'; 'হায় চিল' কবিতায় রূপ নিয়ে দূরে চলে-যাওয়া দয়িতার কথা মনে পড়ে; 'বুনো হাঁস' কবিতায় কল্পনায় বুনো হাঁসেরা ওড়ে 'পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর'; আকাঙ্ক্ষিতা শঙ্খমালার রূপ তো প্রেতিনীর মতো : 'কড়ির মতন সাদা মুখ তার,/দুইখানা হাত তার হিম;/চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম চিতা জ্বলে'; 'হরিণেরা' কবিতায় শেফালিকা বোস 'বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা'; 'সুদর্শনা', 'তুমি', 'ধান কাটা হয়ে গেছে' প্রভৃতির কাব্য-নায়িকারা তো স্পষ্টতই মৃত; মৃত্যুত্তর মিলনের কবিতা 'দুজন' ও 'অঘ্রাণ প্রান্তরে'[৭]। 'বনলতা সেন' কবিতার অন্তিম স্তবক আর 'দুজন' কবিতার অন্তিম স্তবকের বাণী এক-ই :

> প্রেমিকের মনে হল : 'এই নারী—অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে;
> যেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
> কুয়াশা রবে না আর—জনিত বাসনা নিজে—বাসনার মতো ভালোবাসা
> খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতেরে তার।'

মৃত্যু জীবনানন্দের প্রেমের পরিমাপ্তি ঘোষণা করে না, অনেক সময়-ই বরং জীবনানন্দের অনেক শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার কেন্দ্রীয় নির্ভর এখানেই। এবং প্রকৃতির পরিব্যাপ্ত পটভূমিও অনেক সময় জীবনানন্দের প্রেমের কবিতার বিশিষ্টতা—শুধু পটভূমি নয়, পটভূমির চেয়ে বেশি। 'আমি যদি হতাম বনহংস/বনহংসী হতে যদি তুমি' ('আমি যদি হতাম')—একদিকে এরকম প্রকৃতির মধ্যে লীন হতে চেয়েছেন তিনি,[৮] অন্যদিকে মেঘার্দ্র দুপুরে সোনালি চিলের ক্রন্দন-কৃণন জাগিয়ে দেয় দয়িতার জন্যে বিচ্ছেদের বেদনা ('হায় চিল'), 'পৌষের জ্যোৎস্না' থেকে 'হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্না'র ভেতরে তিনি চলে যান প্রায় শব্দহীনভাবেই, শেফালিকা বোসের ক্ষণজাগরণ ঘটে ফাল্গুনের জ্যোৎস্নাপ্লাবী পলাশের বনে। প্রকৃতি জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় কখনো-কখনো পটভূমি বটে, কিন্তু অনেক সময় পটভূমি-অতীত নিহিতার্থ মেলে ধরে : প্রকৃতি সেই নির্লিপ্ততম সমাসীন, যেখানে ব্যক্তি-প্রেমের মতো তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়কে সে তার প্রবহমান নির্লিপ্ততার ভেতরে ধারণ করে।[৯] দু'টি কবিতার দু'টি প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করবো—

> ১. মনে হয় তুমি যেন ঐ পাখি—তুমি ছাড়া সময়ের এ উদ্ভাবনে
> আমার এমন কাছে—আমিনের এত বড় অকূল আকাশে
> আর কাকে পাব এই সহজ গভীর অনায়াসে—'
> বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারে পাখি গেল উড়ে
> প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দ—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।
>
> [তুমি]

২. কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলে চোরকাঁটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
যেই স্পষ্ট নির্লিপ্তিতে—দুই-ই ঠিক;—এখানে স্নিগ্ধ হয়
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়—নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব।

[অঘ্রাণ, প্রান্তরে]

'বনলতা সেন' গ্রন্থেই দেখা দিলো আর এক ধরনের কবিতা যেখানে কবির কাব্যনায়িকা বা প্রেমিকারা বিশাল প্রবহমান জীবনের এক মাধ্যম বা প্রতীকের মতো দেখা দিয়েছে। এর আগে জীবনানন্দ তাঁর নায়িকাদের নামকরণ করেননি, সাধারণভাবে প্রেমের কবিতায় (বাংলা) আমরা নায়িকাদের নাম দেখিনি, জীবনানন্দই তাঁদের এক-একটি বিশেষ নামে চিহ্নিত ও বিশেষিত করলেন। 'বনলতা সেন' গ্রন্থেই আমরা পেলাম বনলতা সেন, অরুণিমা সান্যাল, 'সুদর্শনা,[১২] শ্যামলী, শঙ্খমালা, সুরঞ্জনা,[১৩] সবিতা, সুচেতনা ইত্যাদি নাম। তাঁর আরো দুই নায়িকার নাম পাওয়া যায় দুটি অপ্রচারিত কবিতায়। নীহারিকা মিত্র ('হে জননী, হে জীবন','সুদর্শনা') এবং বনচ্ছবি ('শান্তি ভাল', 'সুদর্শনা')।[১৪] বনলতা সেন-অরুণিমা সান্যাল-নীহারিকা মিত্ররা যতোখানি স্বপ্নমগ্ন, ঠিক ততোখানি সত্যসন্ধিৎসু মনে হয় শ্যামলী-সবিতাসুনেতনাদের। প্রথমোক্তরা ব্যক্তিকেন্দ্রী, পরবর্তীরা নৈর্ব্যক্তিক। 'শ্যামলী' তাই শুধু নারী নয়—সে এক শ্যামল পৃথিবীর প্রতিরূপ; 'সুরঞ্জনা' কোনো বিশিষ্ট রমণী নয়—সব নারীত্বের সারাৎসার ; 'সুচেতনা' কোনো দেহধারিনী নয়—আমাদেরই অপরাজেয়-অগ্নিময় চৈতন্য।

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দের প্রেম-চেতনা প্রায় বিশ্ব-চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছিলো। পরবর্তীকালে আমরা এর অন্তঃপরিণতি লক্ষ্য করেছি। ঠিক প্রেমের কবিতা যাকে বলে তা 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে খুব বেশি নেই। 'মহাপৃথিবী'র সুররিয়ালিস্ট 'শব' কবিতায় কবির আর-একজন কাব্যনায়িকার—মৃত্যু কিন্তু চিরজীবিতা ('এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব/ভাসিতেছে চিরদিন')—সাক্ষাৎ পাই আমরাঃ মৃনালিনী ঘোষাল।, 'স্বপ্ন' কবিতায় মৃত্যুত্তর মিলনের স্বপ্নসংগম। তীব্র অপ্রেমের কবিতা ব'লেই 'মহাপৃথিবী'র দুটি কবিতায় উল্লেখ করতে চাই—প্রেম-কবিতার প্রসঙ্গেইঃ 'ইহাদেরি কানে' ও 'আদিম দেবতারা'। এই দুই কবিতায় নারীর প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা রূপায়িত হয়েছে।[১৫] 'সাতটি তারার তিমির'-এর 'আকাশলীনা' জীবনানন্দের আর একটি ব্যতিক্রমধর্মী কবিতা, যেখানে প্রেমিক আন্তরবিহারী না-হ'য়ে বাইরের একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন।

'বনলতা সেন', মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির'—এই তিনটি গ্রন্থে জীবনানন্দ আত্মকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসেছেন ইতিহাস ও ভূগোলের, কাল ও দেশের বিস্তীর্ণ

৪. শেষ স্পর্শ

জীবনানন্দের নারী বা প্রেমভাবনা একেবারে শেষ পর্যায়ে একটি নির্মেদ অনুভূতি বা উপলব্ধির সারাৎসারে পরিণত হয়েছিলো। স্মরণীয় যে, জীবনানন্দের কবিতায় প্রেম এক কেন্দ্রীয় বিষয়, কিন্তু তা কখনোই নয় জীবনের অন্য-সব আচরণ, ভাবনা বা বেদনা থেকে একেবারে বিমুক্ত ও স্বতন্ত্র কোনো জিনিস। ফলে যে কবি সারাজীবন অস্তি আর নাস্তির আলোছায়ায় কাটাকুটিতে জর্জরিত হয়েছেন ('অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ ; /তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণশোধ।' —'আবহমান' 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'), তিনি জীবনের একেবারে অন্তিম পর্যাযে একটি শমশান্তিতে উপনীত হয়েছিলেন যেন, যেন দীর্ঘ দিবসের খররৌদ্রের পরে অপরাহ্নের সুশান্তি নেমে এসেছিলো তাঁর চেতনায়। নারী বা প্রেম তখন এক অনন্ত আশ্রয়ের মতো দেখা দিয়েছিলো :

১. মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হ'য়ে গেলে
মুখে যা বলোনি, নারি, মনে যা ভেবেছো তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

[মাঘ সংক্রান্তির রাতে, বেলা অবেলা কালবেলা]

২. হে আকাশ,হে সময়, তোমার আলোকবর্ষব্যাপ্তি শেষ হ'লে
যখন আমার মৃত্যু হবে
সময়ের বঞ্চনায় বিরচিত সে এক নারীর
অবোলা রাত্রির মত চোখ মনে রবে।

[এই পথ দিয়ে, সুদর্শনা[১৬]]

জীবনানন্দের একেবারে শেষ পর্যায়ের কবিতা গীতিকবিতার মতো নির্ভর ও স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে। উদ্যমের ব্যথা, মননের জটিলতা, আশা-নিরাশার দোলাচল এইসব ক'মে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে কবিতার দীর্ঘ জটিল শব্দবাক্যপংক্তির গঠন ও কারুকুশলতা ঝ'রে যায়, ভাষা হ'য়ে ওঠে অন্তর্গত বাণীর মতোই স্বচ্ছ। 'তরু', 'আলো', 'জল'-এর প্রতীক ঘুরে-ফিরে আসে বাববার, জীবনের ক্ষণিকত্ব জীবনের অনন্ত অস্তি-তে শান্তি পেতে চায়। আর নারী বা প্রেমও হ'য়ে ওঠে এক প্রতীকের মতো, জীবনের আনন্দ ও কল্যাণের এক সুদর্শন সুচেতন প্রতিমার মতো :

১. এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিল;
পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল।
আকাশ নীল, পৃথিবী এই মিঠে,
রোদ ভেসেছে, ঢেঁকিতে পাড় পড়ে;
পদ্মপত্র জল নিয়ে তার—জল নিয়ে তার নড়ে;
পদ্মপত্রে জল ফুরিয়ে যায়।

[তোমাকে ভালোবেসে, জী, দা, শ্রে.ক.]

২. জানি আমি তুমি রবে—আমার হবে ক্ষয়
পদ্মপাতা একটি শুধু জলের বিন্দু নয়।
এই আছে নেই—এই আছে নেই—জীবন চঞ্চল;
তা তাকাতেই ফুরিয়ে যায় রে পদ্মপাতার জল
বুঝেছি আমি তোমায় ভালোবেসে।

[তোমায় আমি, সুদর্শনা]

৩. এখানে মরণশীল হংস নেই আর;
আর পাখপাখালির নীড় নেই গাছে;
এখানে পৃথিবী নেই, সৃষ্টি নেই, তুমি
আমি আর অনন্ত রাত্রির বৃক্ষ আছে।

[অমৃতযোগ, সুদর্শনা]

জীবনানন্দ একই সঙ্গে হৃদয়বাদী ও মননশীল কবি, হৃদয়ের ব্যবহারই তাঁর কবিতায় বেশি। এবং শেষ পর্যন্ত তাতেই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন : 'ভালোবাসা, তোমাকে ভালোবাসা;/না হলে সব জ্ঞানের নিষ্ফলতা।' ('অনেক রক্তে', 'সুদর্শনা') কিংবা 'জলের মরণশীল ছলছল শুনে/কম্পাসের চেতনাকে সর্বদাই উত্তরের দিকে রেখে/সমুদ্রকে সর্বদাই শান্ত হতে বলে/আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই—প্রেমে।' ('পৃথিবীতে এই', জী. দা. শ্রে. ক.)

৫. অবিনাশ স্বর

জীবনানন্দের প্রেমে শারীরিকতা নেই, আধ্যাত্মিকতাও নেই। আছে এক অন্তহীন বোধ ও চেতনা, যাকে কবি অস্ত্রের মতো ব্যবহার করেছেন জীবনের সমস্ত বিষয়ের গ্রন্থিমোচনে। ফলে তাঁর প্রেমচেতনা আত্মকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে বিশ্বব্যাপ্ত হয়, তাঁর প্রেমের কবিতা কালজ্ঞান ও ইতিহাসচেতনায় হয় ধনী। জীবনানন্দ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও উত্তরব্যক্তিক। প্রেমের মতো অতি ব্যক্তিগত বিষয়েও জীবনানন্দ ব্যক্তিগত, আবার ব্যক্তি-ঊর্ধ্ব। এখানেই তাঁর মহত্ত্ব। কবির সারাজীবনের অন্তর্গত দোলাচল শেষদিকে নারী ও প্রেম-ভাবনার একটি দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ সুশান্তিতে স্থিত হয়, জন্ম ও মৃত্যুর দুই কালো সাগরের ঢেউয়ের মধ্যবর্তী ক্ষণিক আলোকোজ্জ্বল মুহূর্তগুলিকে করে তোলে 'অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্য-সাগর।'[১৭] বড় অর্থে প্রেমের উপলব্ধিতে তিনি শেষ-পর্যন্ত আস্থা স্থাপন করেছিলেন, তার মধ্য দিয়েই শুনতে পেয়েছিলেন 'পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর'॥

তথ্যনির্দেশ

১. যে-কোনো কবির ধারাবাহিকতার মতো জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যেও তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপসমূহের কিছু ছায়াভাস আছে। 'কবি' কবিতায় লিখেছেন 'নগ্ন মুখখানি', 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কবিতায় লিখেছেন 'নগ্ন হাত'। অনেক পরে 'মহাপৃথিবী'র একটি বিখ্যাত কবিতার নাম 'নগ্ন নির্জন হাত'।

২. এডগর এ্যালান পো]১৮০৯-১৮৪৯]. জীবনানন্দকে একাধিকভাবে প্রভাবিত করেন। বুদ্ধদেব বসুর রচনা থেকে একটি সাক্ষ্য :
প্রসঙ্গত উল্লেখ না-করে পারছি না যে, এ্যালান পো-র কবিতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করেছেন একজন আধুনিক বাঙালি কবি : 'বনলতা সেন' ও 'Helen, thy beauty is to me'—এ দু'টি কবিতার সাদৃশ্য স্বয়ংপ্রকাশ। 'চুল', 'মুখ', 'সমুদ্র' ও 'ভ্রাম্যমাণ'—এ-সবই আক্ষরিক অর্থে অ্যালান পো-র, কিন্তু যেমন 'হায়, চিল' কবিতায়, তেমনি এ-ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ তাঁর উত্তমর্ণকে বহুদূরে অতিক্রম করে গেছেন। জীবনানন্দ-এর প্রথম জিৎ তাঁর নায়িকার স্থানীয়তা ও সমকালীনতায় (ধ্রুপদী সৌন্দর্য পৌরাণিক হেলেনে অপ্রত্যাশিত নয়), এবং দ্বিতীয় ও আরো বড় জিৎ উভয় স্তবকের শেষ পংক্তি দু'টির আবেগময় আন্দোলনে, যার তুলনায় পো-র শেষ স্তবক বর্ণলিপ্ত পুত্তলির মতো নিষ্প্রাণ।
[পৃ—৭, 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা']

৩. জীবনানন্দের পরবর্তী কবিতা থেকে এ অনুবর্তনের দু'টি উদাহরণ উৎকলিত হলো এখানে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পরস্পর' কবিতায় :

আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেলে
নিবানো মাটির দীপ জ্বেলে
চলে এল কাছে,—
জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে,—
আজো এত চুল!
চেয়ে দেখি, দু'টো হাত, ক'খানা আঙুল
একেবারে চুপে তুলে ধরি;
চোখ দু'টো চুণ-চুণ,—মুখ খড়ি-খড়ি!
থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—
সব বাসি,—সব বাসি,—একেবারে মেকি!

আরো পরে, 'মহাপৃথিবী'-র 'শঙ্খমালা' কবিতায় :

কড়ির মতন সাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে; দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে-আগুনে হায়!

৪. প্রেমের এ ক্ষণিকতাভেদী চিরত্বের ফলেই 'বনলতা সেন' ('বনলতা সেন') এ কবিতার শেষে এরকম লেখা হয় :

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরোয় এ জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

'স্বপ্ন' ('মহাপৃথিবী') কবিতায় :

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেল পরে
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :
সেই মুখ আর আমি রবো সেই স্বপ্নের ভিতরে।

৫. দ্রষ্টব্য 'বনলতা সেন'-এর 'তুমি' এবং 'ধান কাটা হয়ে গেছে'।

৬. জীবনানন্দের ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ লিখেছেন "রূপসী বাংলা"র ভূমিকায় (৩১শে জুলাই, ১৯৫৭) : 'রূপসী বাংলা'র অন্তর্ভুক্ত 'এসব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল। 'রূপসী বাংলা'র এক-ই মেজাজে লেখা বারোটি চতুর্দশপদী 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অপ্রকাশিত কবিতা' গুচ্ছে স্থান পেয়েছে—এরা অনায়াসে 'রূপসী বাংলা'য় স্থান করে নিতে পারতো। চতুর্দশপদীগুলো এই : ১. অঘ্রাণ; ২. শীত শেষ; ৩. এইসব; ৪. তাই শক্তি; ৫. পায়রারা; ৬. যেন এক দেশলাই; ৭. এই শান্তি; ৮. বুনো হাঁস; ৯. নদীরা; ১০. তোমার শরীরে; ১১. একরাশ পৃথিবীরে; ১২. তোমারে দেখেছি, তাই।

৭. এরকম আর-একটি কবিতা : 'জর্নাল : ১৩৪৬' ('জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৬৩)। আরো একটি কবিতা : 'নদী নক্ষত্র মানুষ' 'সুদর্শনা'। গোপালচন্দ্র রায়-সম্পাদিত, ১৯৭৩)।

৮. এক-ই বইয়ের 'ঘাস' কবিতায়ও এ অভীপ্সা : 'আমারো ইচ্ছা করে.../ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।'

৯. আমাদের মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কিছু ছোটো গল্প—যেখানে বিশাল প্রবহমান প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ফুটে উঠেছে মানবজীবনের তুচ্ছতা।

১০. রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' গ্রন্থভুক্ত 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছের কথা অবশ্য মনে পড়ে যাবে কাব্যপাঠকের, কিন্তু তাদের নাম চরিত্রজ্ঞাপক বা বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক, কিন্তু নামের সঙ্গে এমনকি বংশগত উপাধি যোগ করে জীবনানন্দ এবং তাঁর সমকালীন কবিরা এক ধরনের বাস্তবতা প্রয়োগ করলেন। বিষ্ণু দে-র নায়িকাদের নাম লিলি রমা-অলকা বসু, অজিত দত্তের মালতী, বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী, আর জীবনানন্দের বনলতা-সুদর্শনা-সুরঞ্জনা-সুচেতনা ইত্যাদি। এ প্রবণতা তিরিশের কবিদের হাতেই সূচিত হয়েছিল।

১১. 'বুনো হাঁস' ('কবিতা', আষাঢ়, ১৩৫৩) কবিতার প্রথম পাঠে নাম ছিল অশ্রুকণা সান্যাল।

১২. 'সুদর্শনা'কে এ বইয়ের বাইরে কয়েকবার উল্লিখিত হতে দেখা যায় আরো বেশ কয়েকটি কবিতায়। সুদর্শনাকে নিয়ে অন্তত এ ক'টি কবিতা লিখেছিলেন কবি :

১. 'সুদর্শনা'। 'কবিতা', আষাঢ়, ১৩৫৮। (ব. সে, গ্রন্থর্ভুক্ত)
২. পৃথিবী, জীবন, সময়। 'গণবার্তা', শারদীয়া, ১৩৫৮।
৩. অন্ধকারে। 'পূর্বাশা', আশ্বিন, . ৩৬৮।
৪. 'সুদর্শনা'। ('মনবিহঙ্গম' গ্রন্থর্ভুক্ত)।

১৩. 'সুরঞ্জনা'-কে 'বনলতা সেন' গ্রন্থের বাইরে বার-একবার দেখা যায় 'আকাশলীনা'য় ('সাতটি তারার তিমির')। 'আকাশলীনা' কবিতার প্রথম প্রকাশকালে ('কবিতা', আশ্বিন, ১৩৪৫) সুরঞ্জনার নাম ছিল হৈমন্তিকী।

১৪. অন্য একটি কবিতা, 'লোকেন বোসের জার্নাল'-এ ('জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'), অবশ্য সুজাতা-অমিতা প্রভৃতি কয়েকটি নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তারা কোনো অর্থেই জীবনানন্দের নায়িকা নয়। তারা বরং কোনো-কোনো দিক থেকে বিষ্ণু দে বা বুদ্ধদেবের কাব্যনায়িকাদের মনে পড়িয়ে দ্যায়! এ কবিতাটিও সমগ্র জীবনানন্দীয় প্রেম-কবিতার ধারায় ব্যতিক্রম। জীবনানন্দ তাঁর কোনো-কোনো গল্প-উপন্যাসে প্রেম প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন—এদের মিল বরং তাদের সঙ্গেই বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি যে, জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের সঙ্গে তাঁর কাব্যনায়িকাদের কোনো মিল নেই।

১৫. 'মাল্যবান' উপন্যাসের নায়িকা উৎপলার কথা মনে পড়ে—জীবনানন্দীয় স্বপ্ননারীর সঙ্গে যার তিলমাত্র সাযুজ্য নেই। কিন্তু জীবনের মধ্যপর্যায় থেকে জীবনানন্দের স্বপ্নকল্পনা কিছু-কিছু ঝরে যাচ্ছিল বাস্তবতার তীব্র চাপে। ঘৃণার কবিতাগুলিও এ সময়ের লেখা।

১৬. 'সুদর্শনা' গোপালচন্দ্র রায়-সংকলিত চল্লিশটি অগ্রন্থিত প্রেমের কবিতা (১৯৭৩, কলকাতা)। জীবনানন্দ দাশের 'প্রেমের কবিতা' শিরোনামে আর-একটি বইও বেরিয়েছিল—সেগুলো অবশ্য সব-ই চেনা কবিতা।

১৭. এ বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত হলো জীবনানন্দের শেষ কবিতা 'দুদিকে'র কিছু পঙ্ক্তি ও পঙ্ক্তি-অংশ।

জীবনানন্দের কাব্যে প্রেম

প্রদ্যুম্ন মিত্র

প্রকৃতি, ইতিহাস, সময় ও সমাজ-অনুধ্যানের পাশাপাশি অনেকটা সমান্তরাল, কখনো বা কিছুটা উচ্চতর ভূমিকায়, যে বিষয়টি জীবনানন্দের কাব্যে পূর্বাপর প্রাণরস সঞ্জীবিত করেছে, তা হলো প্রেম। এমন অনেক পাঠক-ই আছেন, যাঁদের কাছে জীবনানন্দের কাব্যের মুখ্য আবেদন প্রকৃতি নয়, প্রেম। কাব্যের রসাস্বাদনে পাঠকের মনে যে আবেদন প্রাথমিক ও অতি প্রত্যক্ষ, তার গুরুত্ব কোনো সময়েই অস্বীকার করা যায় না। তাই জীবনানন্দের কাব্যের যদি কোনো দু'টি মৌল বিষয় বেছে নিতে বলা হয়, তা হবে প্রকৃতি ও প্রেম। অথবা কবি স্বয়ং যেমন লিখেছিলেন, 'প্রকৃতির শোভাভূমিকায় প্রেম'। অন্তত তাঁর সৃষ্টির মধ্যপর্ব পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত অবশ্যমান্য। তবু যে প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে আসে, তা হলো, যে কবি কাব্যের মধ্যে মানব অস্তিত্বের 'উৎসনিরুক্তি' সন্ধান করেছেন বার বার, তাঁর সৃষ্টিতে প্রেমের মুখ্যতম স্বরূপ কী। একমাত্র পরম্পরা ও প্রবণতাসাপেক্ষ বিশ্লেষণেই জীবনানন্দের বিকাশপ্রবণ কবিচেতনায় প্রেমের স্থান ও মহিমা নিরূপিত হতে পারে।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'-এর প্রভাবিত পদ্য প্রয়াসগুলিতে কোনো স্বকীয় উচ্চারণের সন্ধান পাওয়া দুরূহ। তবু ছন্দচাপল্য এবং দূরাবগাহী ভাবপ্রবণতার (যা দেশজ পরিসীমা থেকে পাঠককে ভুলিয়ে নেয় পরদেশী আবহের বৈচিত্র্য ও রহস্যময়তার মোহে) পাশাপাশি 'ঝরাপালকে' রয়ে গেছে এমন কিছু ধ্বনি ও ভাববিশিষ্টতা, যা উত্তরসূরি জীবনানন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তেমনই কিছু উদাহরণ থেকে যে-কবি সামনে এসে দাঁড়ান, তিনি প্রেমের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উত্তাপ কবিতায় সঞ্চারিত করে দিতে পারেন নি, পরিবর্তে নিয়ে এসেছেন এক অস্পষ্ট, অনির্দেশ্য প্রেম-ব্যাকুলতা, যা ঈপ্সিতাকে খুঁজে ফিরেছে অতীতের লুপ্ত গরিমা, বিষাদ ও মৃত্যু স্পৃষ্ট এমন এক অলীক জগতে, যা বাস্তব থেকে দূরস্থিত অথচ কল্পনার যথার্থ উজ্জীবনে স্বপ্নেও আশ্বস্ত নয়। তাই 'ঝরাপালকে'র 'বিহ্বল বিরহী' চলেছে 'কত শত যুগজন্ম বহি', অথচ তার ঈপ্সিতা তবুও হয়ে ওঠেনি কোনো স্বপ্ন, প্রত্যয় কি নিশ্চিত অন্বিষ্টের প্রতিমা। তাই, 'প্রেমপিপাসার অগ্নিঅভিসার' 'হৃদয়ের পাণ্ডুলিপি' রচনা করেছে 'অনন্ত অঙ্গারে'। 'কারা কবে বেসেছিল ভালো' কি 'যুগ যুগ ছুটিতেছে কার অন্বেষণে' জাতীয় চরণের অজস্র বিক্ষিপ্ত উদাহরণ পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তোলে 'ঝরাপালকে'র কবির প্রেম-ভাবনার অনিশ্চয়তা ও অপরিণতির রূপটি।

'অস্তচাঁদ' বা 'ছায়াপ্রিয়া'র মতো কবিতা পাঠ করলেই দেখা যায়, এ সময়কার রচনায় প্রেমের কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে নায়ক আত্মবিস্মৃত ভাবাতিশয্যে আপনাকে দেখেছে 'দূর উর ব্যবিলোন মিশরের মরুভূসংকটে' 'ইতিহাস বেদিকার মূলে' আসীরীয় সম্রাটের বেশে; কখনো সে তাতার কি স্পেনীয় জলদস্যুর মতো দাবিতে নির্মম, আবার কখনো 'বাংলার মাঠে ঘাটে' বেণু হাতে ময়ুরপঙ্খচূড়া চিরকিশোরের মতো মায়াবী। এভাবে অতীত ও ইতিহাস, পুরাণ ও লোককথার উচ্ছ্বাসপ্রবণ, কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন মিশ্রণে, 'ঝরাপালকে' প্রেম ব্যক্তিগত আবেগের উত্তাপও প্রাণস্পন্দন হারিয়ে ফেলেছে। তবুও তার-ই মধ্যে কখনো 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দলে'-এর মতো কবিতা দীর্ঘায়িত অক্ষরবৃত্তের বিষাদভারাবনত পদচারণায় অভ্রান্ত জীবনানন্দীয় আমেজ নিয়ে আসে :

চুল যার শানের মেঘ আর—আঁখি গোধূলির মতো গোলাপিরঙিন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে'—স্বপ্নে—কতদিন।

উদ্ধৃত চরণ বুদ্ধদেব বসুর আলোচনার ফলে আজ যথেষ্ট পরিচিত ও প্রচারিত। কিন্তু 'রাজার দুলাল, যাকে ঘিরে কবির স্বকণ্ঠ উচ্চারিত হতে শুনেছেন বুদ্ধদেব, তাঁকে অতিক্রম করে এ কবিতামধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন অভ্রান্ত জীবনানন্দীয় নায়িকা—সেই শঙ্খমালা নারী, যাকে বার বার দেখি কবির স্বপ্নে ও জাগরণে বিষণ্ন প্রত্যাবর্তনে :

মীনকুমারীর মতো কোন দূর সিন্ধুর অতলে
ঘুরেছে সে মোর লাগি।
...নরম লালিমা!
জ্বলে গেছে, নগ্ন হাত,—নাই শাখা, হারায়েছে রুলি
এলোমেলো কালোচুল খসে গেছে খোঁপা তার, .
বেণী গেছে খুলি'।
সাপিনীর মতো বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ,
ভেঙেছে নাকের ডাঁশা,—হিমস্তন,—হিম রোমকূপ!

এ কবিতার ত্রুটি তার রয়েছে অন্যত্র; সে ত্রুটি দৃষ্টিকোণের; অসংলগ্ন সংস্থান ও ভাবকেন্দ্রহীনতার 'ডালিমফুলের মতো ঠোঁট যার' সেই রাজার দুলাল, যাঁকে দিয়ে কবিতার সূচনা ও শেষ, যিনি নায়িকার ঘুমপথে, স্বপ্নে বারবার ফিরে আসেন—তাঁকে বিস্মৃত হয়ে কবিতার মধ্যপথ হতে কবির চেতনায় বড় হয়ে উঠেছেন এক বিষাদময়ী নারী। সেই ম্লান বিষণ্ন নারীর রূপ চোখ ভরে দেখে নিয়ে ছবি এঁকেছেন কবি স্বয়ং—কিন্তু কবিতার প্রারম্ভিক ও অন্তিম উচ্চারণে আছেন নায়িকা নিজেই। এ ভাবসংস্থানগত বিচ্যুতি কবিতাটিকে যথোচিত সংযম ও ভারসাম্য দেয়নি, যদিও যথার্থ জীবনানন্দীয় কাব্যধ্বনি 'ঝরাপালক'-এর পাঠক এখানেই প্রথম শুনে নেন। এ নারীকে আবার দেখি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পরস্পর' কবিতায়, 'বনলতা সেন'-এর 'শঙ্খমালা'য়। 'রূপসী বাংলা'র চতুর্দশপদীগুলিতে তাঁর-ই মুখমণ্ডলের প্রচ্ছায়া বিষাদ ও প্রতিভারাতুরতার এক অপরূপ রোমান্টিক আবহ রচনা করে দেয়।

'ঝরাপালক' থেকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এসে জীবনানন্দের পাঠক কবিকে আবিষ্কার করেন তাঁর নিজস্ব মনোভঙ্গি ও স্বকীয় শৈলীতে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র চিত্রের পর চিত্রে ছড়িয়ে রয়েছে বিষণ্ন শীত ও নৈসর্গিক পৃথিবীর রূপ। সেই প্রাকৃতিক পটভূমিকায় প্রেম বারবার নিয়ে এসেছে এক রোমান্টিক দীর্ঘশ্বাস। এ কাব্যের প্রথমতম কবিতা 'নির্জন স্বাক্ষর', যেখানে এক পরিব্যাপ্ত নৈসর্গিক নশ্বরতার প্রেক্ষাপটে মানবিক প্রেম তার মৃত্যুহীনতার এমন দ্যোতনা আনে, যা 'নক্ষত্রের আকাশ' কিংবা 'সমুদ্রের জল' কখনো জানেনি। চারপাশের সবুজ মাঠ ঘাস আর আকাশে ছড়ানো নীল আকাশ, ইন্দ্রিয়গোচর সব জাগতিক মাধুরিমার চেয়েও ঢের বড় বিস্ময় যেন এই প্রেম :

কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে।
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।

লক্ষণীয়, আদি পর্বের এ কবিতাটিতে জীবনানন্দ প্রেমকে জৈব নশ্বরতার ঢের উর্ধ্বে রেখেছেন। নিসর্গের যে সৌন্দর্য, তা স্পষ্টতই ইন্দ্রিয়গোচর, সাম্মোহনীক। কিন্তু 'জীবনের রঙ্', কবির প্রশ্ন, 'ফলানো কি হয় এইসব ছুঁয়ে ছেনে'? উত্তরও তিনি দিয়েছেন :

সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল—
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রের জল।

অর্থাৎ প্রেমের আসন মানবহৃদয়ের গভীরে—জৈব এবং ইন্দ্রিয়গোচর রূপাবিষ্টতার চেয়ে বড় এই প্রেম। তাই কবির অনুভবে, যদিও প্রকৃতির বুকে নিত্য নবীনের আনাগোনা, নতুন সময় আর নতুন নক্ষত্রের ভিড়, তবু 'কোনো এক মানুষীর তরে' পুরোহিত হয়ে যে প্রেমের' পূজাদীপ তিনি জ্বালিয়েছেন তার শিখা চির-অম্লান। এভাবেই প্রেম কবির চেতনায় জড় এবং জৈব অস্তিত্ব ও কামনার উর্ধ্বে স্থিত এক অপরিবর্ত দিব্যসত্তায় মূর্ত হয়েছে। এভাবেই কবি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন চির আকাঙ্ক্ষিত অপ্রাপণীয়তার রোমান্টিক বোধ। প্রেমানুভূতির এ বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাকে আশ্রয় করেই 'নির্জন স্বাক্ষর' এবং ঐ জাতীয় আরো কয়েকটি কবিতায় ঘনীভূত হয়েছে বিষাদ ও স্মৃতিভারাতুরতার রোমান্টিক অনুষঙ্গ। জীবনানন্দ যখন বলেন, 'জীবনের স্বাদ লয়ে জেগে আছ—তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে পার তুমি'—তখনই আমাদের মনে পড়ে শেলী, কীট্স, হাইনে, হুগো, গতিয়েের, হোল্ডারলিন প্রমুখ রোমান্টিক কবিকুলের কথা, যাঁরা প্রেমকে জেনেছিলেন এক অপ্রতিরোধ্য মরণাকর্ষ, এক চিরঅতৃপ্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষার স্বরূপে যার হাত থেকে প্রেমিকের কোনো পরিত্রাণ নেই। মৃত্যু ও জীবনের প্রবল বিষমানুপাতিক টানে দীর্ণ হতে হতেই যেন 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর নায়ক বলে ওঠেন :

আমি চলে যাবো, তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেইদিন পৃথিবীর পরে;
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে :

জীবনানন্দের এ পর্যায়ের কবিতাবলীতে প্রেমের এ ক্ষণশাশ্বতী স্বরূপ কবিতার চরণে চরণে সঞ্চারিত করেছে আত্মবিদারী অনুভবের গাঢ়তা। প্রেমের যে লোকোত্তর মহিমার উপলব্ধি 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর নায়ককে শেষ পর্যন্ত প্রত্যয়ী করেছে, ঠিক তার বিপরীত সংক্ষোভ 'সহজ', 'কয়েকটি লাইন' প্রভৃতি কবিতায় নিয়ে এসেছে তীব্র, অপরিতৃপ্ত বাসনার প্রহার, প্রেমের ক্ষণউদ্ভাসের বেদনা। এসব কবিতার নায়িকা নিতান্তই মানুষী, দেহবদ্ধ বাসনার প্রতিমা। এখানে পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তিতে ধ্বনিত ভালবাসার ক্ষণউল্লাস, নশ্বরতার বেদনা :

ক. তুমি শুধু একদিন,—এক রজনীর।
খ. একদিন এসেছিলে,—
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত!
গ. একদিন দিয়েছিলে যেই ভালোবাসা,
ভুলে গেছ আজ তার ভাষা।

তবু ক্ষোভ, সংশয়, হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনাই কেবলমাত্র 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রেম-ভাবনাকে বিশিষ্টতা দেয়নি, তার-ই পাশাপাশি আছে ভালোবাসার চিরন্তনতার জন্য প্রেমিকের সেই ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা, যা সর্বকালীন :

তুমি যদি রহিতে দাঁড়ায়ে।
নক্ষত্র সরিয়া যায়,—তবু যদি তোমার দু'পায়ে
হারায়ে ফেলিতে পথ-চলার পিপাসা।
একবার ভালোবেসে—যদি ভালোবাসিতে চাহিতে তুমি
সেই ভালোবাসা।

জৈব দেহবদ্ধ বাসনার বিপরীত এ অনুভূতি দেহজ উপভোগের ক্ষণিক উল্লাসবোধ থেকে মুহূর্তের আনন্দকে উত্তরিত করে নিতে চায় চিরকালীন সম্পদে। তাই জীবনানন্দের আদিপর্বের প্রে-মকাব্যে কখনো কখনও যুক্ত হয়েছে বাস্তবতার অতিরিক্ত লোকোত্তরতার মাত্রা। রচনারীতির কিছু অপসৃয়মান মুদ্রায় এবং মানসিকতার কোনো কোনও পুনরাবৃত্ত প্রকাশে এসময়কার কাব্যেও কল্লোলকালীন দেহবাদিতার ভাবানুষঙ্গ স্পষ্ট। তবু রোমান্টিক প্রেমকাব্যের বিশিষ্ট কুললক্ষণ যে নিয়তিতাড়িত আকাঙ্ক্ষার মরণাকর্ষণ, এবং তার-ই বিপরীত মেরুতে আশ্রিত যে অতীন্দ্রিয় লোকোত্তর সৌন্দর্যের প্রতিভাস রোমান্টিক কবি তাঁর ইপ্সিত নারীর মধ্যে খুঁজে পান, অপ্রাপণীয় বলেই যা আকাঙ্ক্ষাকে করে নিরন্তর অচরিতার্থতায় তীব্রতর, জীবনানন্দের এ সময়কার প্রেমের কবিতাগুলিতে তার লক্ষণ আদৌ অপরিস্ফুট নয়।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাবলীর যে স্বতন্ত্র চেতনা ও আসক্তি বাংলা নিসর্গ-কাব্যে এক অশ্রুতপূর্ব ধ্বনিগভীরতা যুক্ত করেছে, তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিতে। এ কবিতায় নিসর্গ-রূপের অজস্র উদ্ভাসন ও মাধুরিমার অনুপুঙ্খ ভাষ্যকার কবি পাঠকের আবিষ্ট দৃষ্টি আলেখ্য থেকে আলেখ্যান্তরে চালিত করে নিয়ে যান এক ভারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাসে :

...জানিনা কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ, ...

কামনার আগে 'রাঙা' বিশেষণ মৃত্যুর মুখ ধূসরতর করেছে এ চিত্রে; সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'দেয়ালের মত' শব্দ দু'টির আঘাতের ব্যঞ্জনা। যেন এতক্ষণ যে আলো-ছায়ার খেলা হিজলের জানালা থেকে নেমে এসেছিল জ্যোৎস্নার উঠানে, বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাস আর নীলাভ নোনার বুকে আকাঙ্ক্ষায় গাঢ় হওয়া রস, ঘনান্ধকার বটের নিচে লাল লাল ফল—পৃথিবীর মাস ঋতু বৎসরের এ বর্ণাঢ্যতাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে কবিতাটিতে আর এক প্রচ্ছায়া—যেদিকে 'বিকেলবেলার ধূসরতায়' 'পৃথিবীর কঙ্কাবতী'কে কেড়ে নেয় 'অন্ধকার নদী' : 'পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর'। লক্ষণীয়, কী আশ্চর্য অনায়াস কল্পনায় একটি সহজ-সরল গ্রাম্য নিসর্গচিত্রের বর্ণনার মধ্য দিয়েই কবিতার মধ্যে জীবনানন্দ সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন তন্নিষ্ঠ নিসর্গ-বর্ণনার অতিরিক্ত অন্য ব্যঞ্জনার মাত্রা। বিকেলের ক্রমক্ষীয়মান আলোয় নদীর ওপর জমে ওঠা অন্ধকার আর তার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যাওয়া নারীর শরীর—এ পরিচিত সাধারণ গ্রাম্য ছবিটি থেকে উঠে এসেছে মৃত্যুস্পৃষ্ট সৌন্দর্যের এক অপরূপ প্রতিমা—'ধূপের শরীর' পাওয়া পৃথিবীর 'কঙ্কাবতী' নারী। 'কঙ্কাবতী' শব্দটির সুপ্রয়োগে লোক-কাহিনীর রূপসী নায়িকা বিয়োগান্তক বেদনায় সর্বকালীন ও সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। তবু সাধারণভাবে বলা যায়, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে জীবনানন্দের কাব্যের নায়িকারা সকলেই প্রবলভাবে মানবী, দেহজ বাসনার বন্ধ, ঈর্ষা, বঞ্চনা, অবহেলা, ব্যর্থতায় চরিত্রায়িত। দেহাতীত প্রেমের দিব্যতা সেখানে ক্ষণিক বিদ্যুৎ দ্যুতির মতই কখনো কখনও আবির্ভূতমাত্র।

মৃত্যুর দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নিসর্গ-নিবিষ্টতাকে যেমন বিষাদঘন করেছে, তেমনই সেই মৃত্যুস্পৃষ্ট নিসর্গভূমিতে আবির্ভূত হয়ে কবির প্রেম-ভাবনাও হয়ে উঠেছে মৃত্যু আহত। এ পর্যায়ে জীবনানন্দের কাব্যে প্রেম মরণজয়িতার অনুভবে বলশালী নয়, যতটা মরণার্ত নশ্বরতার বোধে পীড়িত। কবি জানেন, 'সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি'; এবং মানুষের জীবন 'প্রার্থনার গানের মতন' হয়ে ওঠে 'তুমি আছ বলে প্রেম'। তবু সেই সঞ্জীবনী—'সকল ক্ষুধার চেয়ে বড়, সকল শক্তির আগে' যে প্রেম, সেও মৃত্যুর কাছে পরাহত :

আমি শেষ হবো শুধু ওগো, তুমি শেষ হলে।
তুমি যদি বেঁচে থাক, জেগে রব আমি এই পৃথিবীর পর—'
যদিও বুকের পরে মৃত্যু রবে,—মৃত্যুর কবর।

এ সর্বায়ত মরণশীলতার বোধ-ই কবিচেতনায় সঞ্চারিত করেছে নশ্বরতার বেদনা, ক্ষণউল্লাসে অতৃপ্তি। একটির পর একটি কবিতায় 'সিন্ধুর-জল', 'সমুদ্রের ঢেউ' প্রেমের উপমেয় হয়ে আসে :

ক. তুমি জল—তুমি ঢেউ—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
খ. জলের আবেগে তুমি চলে যাও—

কারণ, ঢেউয়ের-ই মতন প্রেম চিরপলাতক, উদ্বেল, অস্থির; আবার ঢেউয়ের-ই মতন প্রত্যাবর্তিত হতে জানে 'স্মৃতির হাড়ের মাঠে—কার্তিকের শীতে'।

অতএব দেখছি, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'রূপসী বাংলা' পর্যায়ে জীবনানন্দের প্রেমচেতনা দু'টি বিপ্রতীপ বিন্দুতে আবর্তিত। একদিকে প্রেমের ঐশ্বর্যময় আবির্ভাবের লোমহর্ষ নৈসর্গিক প্রেক্ষাপটে মুদ্রিত :

যখন সবুজ অন্ধকার,
নরম রাত্রির দেশ, নদীর জলের গন্ধ কোন্ এক নবীনাগতার
মুখখানা নিয়ে আসে—মনে হয় কোনোদিন পৃথিবীতে প্রেমের
আহ্বান
এমন গভীর করে পেয়েছি কি : প্রেম যে নক্ষত্র আর নক্ষত্রের গান,
প্রাণ যে ব্যাকুল রাত্রি প্রান্তরের গাঢ় নীল অমাবস্যার—
চলে যায় আকাশের সেই দূর নক্ষত্রের লাল নীল শিখার সন্ধানে,
প্রাণ যে আঁধার রাত্রি আমার এ—, আর তুমি স্বাতীর মতন
রূপের বিচিত্র বাতি নিয়ে এলে,—তাই প্রেম ধুলায় কাঁটায় যেইখানে

'হৃদয়ে প্রেমের দিন' মৃত হয়ে পড়েছিল, পৃথিবীর শূন্যপথে পেল সে গভীর শিহরণ। অন্যদিকে বিচ্ছেদকাতরতা, নশ্বরতার বেদনা, অচরিতার্থতার ভারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাস :

ক. শরীরে ননীর ছিরি,—ছুঁয়ে দেখো—চোখা ছুরি, ধারালো
হাতির দাঁত!
হাড়ের-ই কাঠামো শুধু,—তার মাঝে কোনোদিন হৃদয় মমতা
ছিল কই! ['পরস্পর' : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি']

খ. জানি তবু,—নদীর জলের মতো পা তোমার চলে,—
তোমার শরীর আজ ঝরে
রাত্রির ঢেউয়ের মতো' কোনো এক ঢেউয়ের উপরে!
যদি আজ পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই,

যদি আমি চলে যাই
নক্ষত্রের পারে,—
জানি আমি, তুমি আর আসিবে না খুঁজিতে আমারে!

['১৩৩৩' : ধূসর পাণ্ডুলিপি]

গ. জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে
আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়, আমার কাতর চোখ,
আমার বিমর্ষ ম্লান চুল
এই নিয়ে খেলা করে : জানে সে যে বহুদিন আগে আমি
করেছি কি ভুল
পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালোবেসে,

['এইসব ভালো লাগে....' 'রূপসী বাংলা']

চিরঅলভ্য প্রেম আর চিরঅতৃপ্ত হৃদয় উভয় মিলে রচনা করেছে জীবনানন্দের প্রথম পর্যায়ের কাব্যে স্মৃতিভারাতুরতার এমন আবহ, যা স্বাভাবিকভাবেই রোমান্টিক কাব্য-ঐতিহ্যের ধারায় আশ্রিত।

রোমান্টিক প্রেমকাব্যের নায়িকা নিষ্ঠুরা মোহিনী; 'লা বেল্ দাম্ সাঁ মের্শি' (অকরুণা এক রূপসী)। সেই 'ফাম্ ফাতাল' বা সর্বনাশীর প্রতি রোমান্টিক কবি অনুভব করেছেন অপ্রতিরোধ্য নিয়তিতাড়িত জৈব-বাসনা-সংরাগক্ষুব্ধ মৃত্যু-আকর্ষণ। সেই তীব্র একাগ্র আকাঙ্ক্ষা আপন অতৃপ্তি থেকে রচনা করেছে এমন এক অধরা মোহিনী-প্রতিমা, যা কাম্য তবু অপ্রাপণীয়, চিরঅধরা তাই দিব্য। এভাবেই দেহজ বাসনায় প্রোথিত থেকেও শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যে প্রেম হয়ে উঠেছে দেহাতীত দিব্য এক অন্বিষ্টের প্রতীক—ঈপ্সিতা নারী সেখানে মানবাত্মার চিরন্তন সৌন্দর্য পিপাসার গরীয়সী দেবী। মনে করা যাক, শেলীর সেই বিশ্রুত পঙ্‌ক্তিগুলির কথা :

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow?

রোমান্টিক প্রেমকাব্যের মূল্য ও মহিমার শিখরস্পর্শী তাৎপর্য এ চরণগুলিতে অভিব্যক্ত। এখানে উষার পশ্চাতে ধাবমান রাত্রির চিত্রকল্পে এক নিরবচ্ছিন্ন একাগ্র অন্বেষার কথা উচ্চারিত, যা কিন্তু নিয়তিতাড়িত সর্বনাশের ইঙ্গিত বহন করছে প্রথম চরণের 'বহ্নিমুখবিবিক্ষু' পতঙ্গের উল্লেখে। আবার, এ সবকিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে, অতীন্দ্রিয় দেহাতীত ব্যঞ্জনা : কারণ শেলী লিখলেন না অগ্নিশিখার প্রতি ধাবমান পতঙ্গের কাহিনী, নিয়ে এলেন নক্ষত্র-আলোকমুখী পতঙ্গের চিত্র, যা শেষ দু'টি চরণে আরো বিস্তারিত, ব্যাখ্যাত হয়েছে : প্রেম যেন এক অর্মত্য আকাঙ্ক্ষা, যা আমাদের শোক-দুঃখপীড়িত এ ভূলোক থেকে উত্তীর্ণ করে নেয় অন্য এক সুদূর জগতে;

অন্যতর মহত্তর অনন্যমুখী অন্বেষায়। একদিকে স্পর্শগন্ধময় এ নশ্বর মর্ত্যভূমির সহস্র আকর্ষণ আর সহস্র প্রহারে ধূলিম্লান মানব-হৃদয়ের আকুতি, অন্যদিকে মরণাতীত দিব্য সৌন্দর্যের প্রতিভাস ভালবাসায় ঐশ্বর্যময়ী এক নারীর প্রতিমায়—দেহ ও দেহাতীত, ইন্দ্রিয়গোচর ও অতীন্দ্রিয় এ দুই বিপ্রতীপ টানে রোমান্টিক প্রেমকাব্য গভীর ব্যঞ্জনাবহ।

জীবনানন্দ দাশ সময়ের দিক থেকে আধুনিককালের কবি। তবু কবিচেতনার নানা লক্ষণে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেম-কবিতাগুলিতে রোমান্টিক ভাবনার স্পষ্ট স্বাক্ষর লক্ষ্য না করে উপায় নেই। অবশ্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেম-কবিতাগুলি খুঁজে নিতে আমাদের পেরিয়ে আসতে হয় তাঁর কাব্যের আদিপর্যায়—'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা'র মানসিকতা—পৌঁছাতে হয় মধ্যপর্যায়ে, 'বনলতা সেন'-সমকালীন কবিতাগুচ্ছে, যার অনেকটাই উদ্ধৃত হয়েছে সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেন' গ্রন্থটিতে : তবু তাঁর আগেই, রোমান্টিক প্রেম-ভাবনার কিছু কিছু সর্বকালীন বিশিষ্টতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগেও অনুপস্থিত নয় তাঁর কাব্যে। আমরা দেখেছি, নৈসর্গিক ক্ষয়-বিলয়ের প্রেক্ষাপটে নিয়তিকে অতিক্রম করে সম্ভোগের ক্ষণ-উল্লাস খুঁজে পেতে চায় শাশ্বতের অভিজ্ঞান। মুহূর্তের মধ্যে চিরন্তনকে ধরার আকুতি, দেহজ রমণীয়তাকে কেন্দ্র করে বৈদেহী সৌন্দর্যের রহস্যময়তার উদ্ভাস—এ সবকিছুই উনিশশতকী রোমান্টিক মানসচেতনার মনোবীজ বহন করছে।

লক্ষণীয়, জীবনানন্দের আধুনিক মন সনাতন দেশজ রীতিতে প্রেমকে কামগন্ধহীন কোনো 'নিকষিত হেম' প্রমাণে আগ্রহ দেখায়নি। দেহ এবং সম্ভোগের উল্লাসানুভূতি দুই-ই তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। 'পিপাসার গান'-এর মতো কবিতায় জীবনানন্দ কোন রকম সংশয়ের অবকাশ না রেখেই বলেন : 'দেহের পীড়নে/সাধ মোর—চোখে ঠোঁটে চুলে/শুধু পীড়া—শুধু পীড়া'। আবার, 'নারীর অধরে/চুলে চোখে—জুঁয়ের নিঃশ্বাসে/ঝুমকোলতার মতো তার দেহ ফাঁসে' একদিন কবি 'রক্ত-মাংসের স্পর্শ-সুখভরা' 'পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা' জেনেছেন। কিন্তু তখনকার মতো রোমান্টিক ভাবুক এ কবি কোনো জৈব বাসনা কি দেহোল্লাসকেই প্রেম বলে চিহ্নিত করেননি; আরো পরিণত ভাবনায় উচ্চারিত করেছেন : 'দেহ ঝরে—তার আগে আমাদের ঝরে যায় মন'। এ 'মন'ই তাঁকে শিখিয়েছে জৈবতা-অতিরিক্ত সংবেদ : 'এ জীবন ইহা যাহা, ইহা যাহা নয়'; এবং সেই বোধের নিরন্তর অনুভাবনাতেই তাঁর কাব্য আধুনিক। আসলে জীবনানন্দের কবিতায় প্রেম কোনো দেহবাদী প্রতিন্যাসেই আবদ্ধ থাকেনি, যদিও কাব্য-সাধনার শিক্ষানবিশী যুগে তিনি ছিলেন মোহিতলাল, নজরুল প্রমুখের শৈলী ও বিষয়গত অনুকারী। দেহসর্বস্ব দেহবাদিতা জীবনানন্দকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেনি বলেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে তাঁর কাব্যে শোনা যায় দেহকে স্বীকার করে নিয়ে উচ্চারিত বৈদেহী প্রার্থনা : 'সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে নিয়া/তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া'। সেই সঙ্গে একথাও অবশ্যমান্য যে, এ সময়ে তাঁর কাব্যে প্রেমের অতীন্দ্রিয় দেহাতীত উপলব্ধি ক্ষণভাসিতমাত্র। স্বপ্নপ্রয়াণের অন্তিম আবেদন সত্ত্বেও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রেম ঐহিক অস্তিত্বের সীমারেখা প্রবলভাবে লঙ্ঘন করেনি। কারণ, জীবনানন্দ জেনেছেন : নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে/পথ ভুলে পৃথিবীর পথে/জন্মিতেছি

আমি এক সবুজ ফসল। ('স্বপ্নের হাতে') 'জন্মিতেছি' এ ক্রিয়াপদটির অনবদ্য প্রয়োগে অন্তহীন ও প্রবহমান মানব জীবনধারার ইঙ্গিত, যেখানে একের 'পিপাসার ধার' অন্যের বুকে জাগিয়ে তুলেছে বার বার 'প্রেমের পিপাসা'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নায়িকা তাই শেষাবধি এক মর্ত্যনারীই থেকে যান—যাঁর চোখে ঠোঁটে অসুবিধা ভিতরে অসুখ'। কবিরা যে রূপসীর কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন তাঁদের কাব্যে, তিনি এক রূপকথার নায়িকা। 'আমরা সাধিয়া গেছি যার কথা—পরীর মতন এক ঘুমানো সে মেয়ে'। কিন্তু জীবনানন্দ যার কথা আমাদের শোনালেন, সে—'এ ঘুমানো মেয়ে/পৃথিবীর,—ফোঁপরার মতো করে এরে লয় শুষে/দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষে। তাই শেষ পর্যন্ত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রেম লৌকিক বাসনাসংরাগে মথিত মৃত্যুআহত সৌন্দর্যানুভূতির বিষণ্ন আবহ রচনা করেছে; যা একান্তভাবেই মর্ত্যমুখিন :

তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাব পৃথিবীর থেকে
রূপ ছেনে তখনও হৃদয়ে কোন আসে নাই ক্লান্তি অবসাদ
('পৃথিবীতে থেকে' : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

এমন কি সব আহত ব্যর্থতার গ্লানিও উত্তীর্ণ এ নিবিড় মর্ত্যপ্রাণ রূপপিপাসায় :

তুমি প্রেম দাও নাই—জানি আমি—তবুও রক্তাক্ত কোনো রেখা
সোনার ভাঁড়ারে আমি রাখি নাই শীতমধু মোমের সঞ্চয়ে
কুয়াশা হতাশা নিয়ে সরে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে;

যে অগাধ ইন্দ্রিয়মগ্ন সৌন্দর্য উপলব্ধি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—'রূপসী বাংলা'র নিসর্গ-বর্ণনায় সঞ্চারিত করেছে আঞ্চলিক স্বাদ আর অনুপুঙ্খতার রমণীয় জাদু, তা-ই যেন জীবনানন্দের এ সময়কার প্রেমের কবিতায় যুক্ত করেছে এক গভীর বিস্ময়বোধ :

তোমারে দেখেছে ভালোবেসেছে অনেকে
তাহাদের সাথে আমি—আমিও বিস্ময় এক পেয়েছি যে টের
গভীর বিস্ময় এক শুধু তার ম্লান হাত-চুল-চোখ দেখে।
এ বিস্ময়বোধেই কবি বলে ওঠেন :
তোমার মুখের রূপ নিয়ে তুমি বেঁচেছিলে তোমার শরীরে
তাইতো মসৃণ তুলি হাতে লয়ে জীবনেরে এঁকেছি এমন
অনেক গভীর রঙে ভরে দিয়ে, চেয়ে দেখ ঘাসের শোভা কি
লাগেনি সুন্দর আরো একবার তোমার মুখের থেকে ফিরে
যখন দেখেছি ঘাস ঢেউ রোদ মিশে আছে তোমার শরীরে।

এ অশ্রুতপূর্ব উচ্চারণের পর 'প্রকৃতির শোভা ভূমিকার প্রেম' বলে জীবনানন্দ কী বোঝাতে চেয়েছেন, তার আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে জীবনানন্দের কাছে প্রকৃতিই ছিলেন সমস্ত প্রতীকের জননী; 'মেঠো চাদ, শিঙের মতো বাঁকা চাঁদ', 'কার্তিকের মাঠ' কিংবা তাদের নিজস্ব নৈসর্গিক পরিমণ্ডলের অতিরিক্ত কিছু দ্যোতনায় কবিতার ভাববস্তুতে সঞ্চারিত করেছে

প্রতীকী ব্যঞ্জনা। 'বনলতা সেন' পর্যায়ে প্রতীকায়নের সেই প্রবণতা আরো প্রবল ও পরিণত এবং বিষয়ের সঙ্গে গাঢ় সাযুজ্যে উপস্থাপিত। এ পর্যায়ে প্রতীক আর শুধুমাত্র কিছু নৈসর্গিক উপকরণের মধ্য দিয়ে শব্দের অভিধার অতিরিক্ত মাত্রাযোজনার কারণ হয়নি; প্রায়শই তা বিষয় বা ভাববস্তুর উপস্থাপনার মধ্য হতেই উৎসারিত। প্রতীকী রীতির এ নবপ্রসৃতি অনেকগুলি কবিতার নামকরণেই আভাসিত। 'বনলতা' এ নামের মধ্যেও যে এক নিসর্গপ্রতিম নারী উপস্থিত, তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি; প্রেম ও প্রকৃতি এ কবিতাটিতে এক অভিন্ন প্রতিমায় উপস্থিত থেকে কবিতাটির ভাববস্তুতে যোগ করেছে তাৎপর্য-গভীরতা। আর সেভাবে গৃহীত হলেই কবিতাটি যথার্থ অর্থময় হয়ে ওঠে। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে বা জীবনানন্দের সেই সময়ের অন্য রচনায় প্রেম প্রকৃতির 'শোভাভূমিকা'য় উপস্থিত শুধুমাত্র এটুকু বললে তা অর্ধসত্যের মতো শোনাবে। 'বনলতা সেন' গ্রন্থের কবিতাবলীতে নারী এসেছেন বার বার নানা মূল্যবোধের আধারিকারূপে। প্রকৃতির প্রশান্তির সম্ভার নিয়ে 'বনলতা সেন' অপেক্ষা করে আছেন অন্বেষাক্লান্ত মানবাত্মার জন্য। 'সুরঞ্জনা', 'সুদর্শনা', 'সুচেতনা' প্রভৃতি কবিতার বাহিরের আয়োজনে কোনো নারী, কোনো মানবীয় প্রেম বিষয়ীভূত বলে মনে হলেও নিবিষ্ট অনুধাবনে এসব কবিতার প্রতীকী আবরণ উন্মোচিত হয়ে যায়। দেখা যায়, মানবজীবনের কোনো না কোনো অভীপ্সার শক্তি বা প্রেরণা এখানে নারীর প্রেমের রূপকে আশ্রিত; নারী হয়ে উঠেছেন প্রতীক। 'সুরঞ্জনা' কবিতায় 'সুরঞ্জনা'কে সম্বোধন করে কবি মানব-হৃদয়ের দুর্মর প্রেম-বাসনাকেই তাঁর কবিতার উপজীব্য করেছেন এবং তাকে ইতিহাস-চেতনায় জারিত করে নিয়েছেন ('সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো')। কিংবা 'সুচেতনা' কবিতাটিতে পৃথিবীর গভীরতর অসুখের যুগে মানব-হৃদয়ের সুচৈতন্য তথা শুভ চেতনা দূরতর দ্বীপের প্রতীকে অবসিতপ্রায়, এ কথাটিই কবি জানাতে চেয়েছেন।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'রূপসী বাংলা' পর্যায়ের প্রেমের কবিতাবলী থেকে 'বনলতা সেন'-এর অন্তর্ভুক্ত প্রেম বিষয়ক কবিতার স্বাদ তাই ভিন্নতর। পূর্ব পর্যায়ের কাব্যের অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণের অবিরল প্রবাহের পরিবর্তে এ পর্যায়ের কবিতায় এসেছে মিতভাষণ আর প্রতীকী ব্যঞ্জনার নবীন বিস্তার। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবির ভূমিকা এক মুগ্ধ আবিষ্ট দর্শকের; প্রকৃতির ক্ষয়-বিলয়ের পটভূমিতে তাঁর সেই 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' রূপান্তরিত হয়েছে বিষণ্ন সংবেদনায়। ধূসর ম্লান হিমার্ত নিসর্গজগতে আবির্ভূত হয়ে প্রেম সেখানে বহন করে এনেছে 'বঞ্চনা, হতাশা, ক্ষোভ, যন্ত্রণার বিষ'। প্রেমের মৃত্যুহীনতার কথা সেখানেও আছে; আছে তার অমর্ত্যপ্রসাদ আর ক্ষণভাসিত উল্লাসের কথাও। কিন্তু অপ্রাপণীয়ের জন্য আর্তি আর বঞ্চিত প্রেমের সংক্ষোভ-ই সেখানে প্রবল, নেই কোনো গাঢ় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বাণী। 'বনলতা সেন' পর্যায়ে প্রেম আরো বড়, আরো গভীর চেতনার আলোকে মূল্যায়িত। নিসর্গ তাঁর একালের কাব্যে[১] শুধু প্রেক্ষিত-ই রচনা করেনি, হয়ে উঠেছে জীবনের মূলাধার। ফলে 'বনলতা সেন' গ্রন্থটিতে ও

১। 'বনলতা সেন'—'মহাপৃথিবী' পর্যায়ের কাব্যের রচনাকাল ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮ সন : কবির নিজের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী। দ্রষ্টব্য : মহাপৃথিবী, ১ম সং ভূমিকা।

পরবর্তীকালের অনেক কবিতায় বহু সময়েই জীবনানন্দের প্রেম ভাবনা প্রকৃতিলীন এ জৈবিক অস্তিত্বের চেতনায় নিরাপত্তা ও শান্তি খুঁজেছে।[২] আবার, জায়মান এক ইতিহাসচেতনায় এ সময়কার কাব্যে প্রেম এক স্থির প্রতিশ্রুতির স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, পরিণত হয়েছে প্রশান্ত বিশ্বাসদীপ্ত উপলব্ধিতে। ফলে কবিতার পর কবিতায় প্রেম আবির্ভূত এক গাঢ় আবেগার্দ্র উচ্চারণে।

এ পর্যন্ত জীবনানন্দের কাব্যে প্রেম-প্রতিরোধের প্রকাশনায় সংবেদনা ও মননের নবীন বিস্তারের কথাই বলেছি। 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কবিতায় ভাবের প্রকাশ মাধ্যমগুলিকেও জীবনানন্দ নূতন শক্তি ও ব্যঞ্জনায় সঞ্জীবিত করেছেন। ঠিক যতটা অংশে মাধ্যমে বা রীতির নবীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য বিষয়বস্তুকে এ যাবৎ দুর্লক্ষ্য কোনো ব্যঞ্জনা ও শক্তিতে চিহ্নিত করে, ততটাই তা আমাদের বর্তমান আলোচনার অংশভুক্ত হবার দাবি রাখে। তেমনই একটি প্রসঙ্গ : 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে প্রতীকের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও তাৎপর্যময়তা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত জীবনানন্দের বিবর্তনশীল কাব্যপ্রবাহে এ প্রতীকী তাৎপর্যের উপলব্ধি কাব্যের অর্থ-অনুধাবনের বিশেষ সহায়ক। 'সুচেতনা'কে সম্বোধন ('সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ') করে এ জাতীয় উচ্চারণের অর্থোদ্ভাস কোনো রসবেত্তা পাঠকের কাছে গোপন থাকে না। কিন্তু কেন জীবনানন্দ বিশেষ করে নারীকেই বেছে নিলেন মানুষের চেতনানিহিত কোনো মূল্যবোধ তথা প্রেরণা-শক্তির বিমূর্ত উপস্থিতিকে তাঁর কবিতায় একটি অবয়ব দিতে, কেন কোনো মানবীর প্রেমের সাঙ্গীকরণে রূপায়িত করলেন মানব-সভ্যতার সম্মুখ-যাত্রার অন্তর্জাত শক্তিরূপী মূল্যবোধগুলি—সেসব প্রশ্ন স্বাভাবিক। উত্তরে বলা যায়, সৌন্দর্য ও কল্যাণের সমাহারে নারী মানব-হৃদয়ের চির আদরণীয়া, তার আকাঙ্ক্ষার অভীষ্ট, যেমন মানব-মনের মূল্যবোধগুলি ইতিহাসের ঘনঘটায় কখনো কখনও দুর্নিরীক্ষ্য হলেও চিরন্তন; নাবিকের কাছে সৈকতের সত্যের মত, ধ্রুবতারকার মতো অকম্প্র ও দিশারী; আবার প্রেমের-ই মতো তারা যন্ত্রণাহত ও মৃত্যুস্পৃষ্ট হয়েও দুর্মর ও চিরজীবিত। জীবনানন্দের এ পর্যায়ের কবিতায় নারী শুধু তাঁর সৌন্দর্যরূপেই আবির্ভূতা নন, তিনি এসেছেন তাঁর কল্যাণস্বরূপে। তাঁর কাব্য নায়িকাদের অনেকের-ই নামের আগে তাই 'সু' শব্দটি উপস্থিত, যথা—'সুদর্শনা', 'সুরঞ্জনা', 'সুচেতনা'।

নারীর প্রেমের রূপককে আশ্রয় করে কবিতাবস্তুর এ প্রতীকী বিস্তার ('বনলতা সেন' পর্যায়ে) জীবনানন্দের প্রেমচেতনায় নবীনতার স্বাদ ও তাৎপর্য সংযুক্ত করলেও বাংলাকাব্যের পূর্ব ঐতিহ্যে তা একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। মনে করা যেতে পারে, 'মহুয়া'র সেই 'নারী', কবিতাগুচ্ছ : 'শামলী', 'কাজলী', 'জয়তী', 'উষসী', 'করুণী' ইত্যাদি কবিতাগুলি। লঘুভার হলেও এসব রচনায় নারীর ভাবরূপের এক একটি দিক চিহ্নিত এবং সেই ভাবানুযায়ী নামে নায়িকা সম্বোধিত। এভাবেই কোনো অব্যবহিত প্রয়োজনে রচিত হয়েও কবিতা সেই প্রয়োজনের বাস্তব সীমারেখা অতিক্রম করে যায় :

২। 'আমি যদি হতাম' ও 'ঘাস' কবিতা দুটি দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব
নিখিলের অস্তিত্ব্ গৌরব।
অন্তহীন কাল আর অসীম গগন
নিদ্রাহীন আলো
কী অনাদি মন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলাল।
যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়,
অগ্নিময়ী বেদনায়,
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা,
ওই মুখে ওই চক্ষে ওই হাসিটিতে।[৩]

রবীন্দ্রনাথের হাতে যা ছিল বিমূর্ত ভাববস্তুর রূপাধার, জীবনানন্দের কাব্যে সেই রীতিতে সংযুক্ত হলো প্রতীকী দ্ব্যর্থকতার অতিরিক্ত মাত্রা। রূপকায়ণের মধ্যে অর্থের সমান্তরাল সাযুজ্য বা বিস্তার অনেক সময়েই আরোপিত বা যুক্তিসৃত, তাই কৃত্রিম বলে মনে হয়। জীবনানন্দের আধুনিক শিল্পী-মনস্কতা সেই রীতিগত কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে প্রতীকের গহনতায় ও অভেদে। কবিতার বহিরঙ্গের আয়োজন তিনি সম্পূর্ণ করেছেন বাস্তবের পরিচ্ছেদে; কিন্তু তার অন্তরঙ্গ আবেদন এ বাইরের বেশ খুলে ফেলেই মেলে ধরে শব্দের প্রতীকী রহস্য-গভীরতা ও ভাব-তাৎপর্য। তাঁর নারী-নায়িকাদের নামের সঙ্গে জীবনানন্দ কখনো যুক্ত করেছেন পদবী ('সেন', 'সান্যাল', 'ঘোষাল'), কখনো বা আঞ্চলিকতার আবহ ('নাটোরের বনলতা সেন', কবেকার পাড়াগার অরুণিমা')। এ সব-ই কিন্তু এসেছে শিল্পরূপসিদ্ধির সম্পূর্ণতার প্রয়োজনে। প্রতীককে একটি নাতিস্পষ্ট বাস্তবসম্ভব যাথার্থ্য দেবার জন্য যেন কবিতার ওপরে বিস্তৃত রাখা হয়েছে শরীরী বিশ্বাসযোগ্যতার এক আবরণ।

রবীন্দ্রনাথ 'শক্তির মহিমা'কে নারীর চোখ, মুখ ও হাসিতে, এক কথায় নারীর আবয়বিক রূপের সীমায় প্রকাশিত হতে দেখেছিলেন। জীবনানন্দ মানবের চৈতন্যগত শুভবোধ বা প্রেরণাগুলির 'কল্যাণশক্তি ও ঐশ্বর্য নারীর প্রতীকে উদ্ভাসিত করেছেন। তাঁর 'সুরঞ্জনা', 'সুচেতনা', 'সুদর্শনা', 'বনলতা', 'শ্যামলী', 'সবিতা'রা তাই শুধু রক্ত-মাংসের মর্ত্যমানবীমাত্র হয়েই কবিতার পর কবিতায় উপস্থিত হননি, এনেছেন যথাক্রমে মানব-হৃদয়ের দুর্মর প্রেমবোধ, শুভচেতনা, সৌন্দর্য-পিপাসা, আদি নিসর্গমুখিনতা, মানবেতিহাসের অন্তর্লীন যৌবন-অভীপ্সা ও প্রেমের সৌরপ্রেরণার ব্যঞ্জনা। এসব কবিতার অর্থবোধ সহজতর হয় এবং যৌক্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ায় যখন আমরা কবিতার এ প্রতীকী ব্যঞ্জনার দিকটি সম্পর্কে অবহিত থাকি। এ কবিতাগুলির পূর্ণতর ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র মনোযোগের দাবি রাখে, যা এ পর্যালোচনার বর্তমান ধাবার পক্ষে প্রক্ষিপ্ত মনে হতে পারে বলেই এখানে সে চেষ্টায় বিরত থাকাই উচিত মনে করেছি।

৩. 'সৃষ্টিরহস্য' : মহুয়া : রবীন্দ্রনাথ।

প্রেমচেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতাই রোমান্টিক ভাবাদর্শে চিহ্নিত। এক পরিপূর্ণ জীবন ও সৌন্দর্য-জগতের কল্পনা, সেই জগতে প্রয়াণের আকাঙ্ক্ষা এবং অনুষঙ্গী অপ্রাপণীয়তার বোধ, স্মৃতিভারাতুরতা ও বিষাদ, মধ্যযুগীয় গরিমা ও সৌন্দর্যের জগতে বিচরণ এবং তার লুপ্ত জীবনৈশ্বর্যের বোধন—এ চেতনালক্ষণ জীবনানন্দের একালের কবিতাবলীকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

স্মৃতিভারাতুরতা ও ব্যর্থতার বিষাদ 'কুড়ি বছর পরে', 'দুজন', 'অঘ্রাণপ্রান্তরে' কবিতাগুলিতে নিজস্ব জীবনানন্দীয় আমেজ সঞ্চার করেছে। 'দুজন' ও 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতা দু'টি দীর্ঘ অক্ষরবৃত্তের চলনে, হৈমন্তিক নিসর্গপট ভূমির বিস্তারে, চিত্রকল্পে ও ধ্বনির নানা অনুষঙ্গে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ক্ষয়িষ্ণু নিসর্গ-সৌন্দর্যের জগতের স্মৃতি বহন করে। তবে এখানে আর শুধু 'চিত্ররূপময়' প্রাকৃতিক পটভূমিতে 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ'ই শেষ কথা নয়; তার সঙ্গে যুক্ত হলো মানবিক অনুভাবনার মাত্রা :

> অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে,
> সে সবের ঢের আগে আমাদের দু'জনের মনে
> হেমন্ত এসেছে তবু,[৪]

এখানে অঘ্রাণপ্রান্তর আর ঘাসের ভেতরে পড়ে থাকা শুকনো ছেঁড়া পাতা যেন নিষ্প্রেম হৃদয়ের-ই শূন্য প্রান্তর আর 'জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি'র ভাববহ। মেজাজের দিক থেকে 'কুড়ি বছর পরে' কবিতাও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ভাবানুষঙ্গ নিয়ে আসে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রেমিক পঁচিশ বছর ঈপ্সিতা নারীর প্রতীক্ষায় কাটিয়ে শীতের শিশিরে ভেজা মাঠে পাখির ঠাণ্ডা কড়কড়ে ডিম, নষ্ট সাদা শসা, ছেঁড়া মাকড়ের জাল দেখতে দেখতে ব্যর্থ ক্লান্তিতে বলেছেন : 'পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে'—নারী তাঁর প্রতীজ্ঞা রাখেননি। 'কুড়ি বছর পরে' কবিতার নায়ক কার্তিকের শস্যরিক্ত নৈশ প্রান্তরে পাঠককে ডেকে নিয়ে এসে হঠাৎ স্মৃতি-বিস্মৃতির সরু আলপথে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেয়, যখন শিরীষের ডালপালার ফাঁকে মধ্যরজনীর চাঁদ উঁকি দিয়ে যায়। তখন কবির সঙ্গে পাঠকও অনুভব করেন স্মৃতিমথিত আবেগ :

> জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার
> তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার।[৫]

যে তিনটি কবিতার কথা এতক্ষণ উল্লেখ করেছি, তার কোনোটিই কিন্তু জীবনানন্দের প্রেমচেতনার কোনো নতুন দিকনির্দেশ করে না; 'প্রকৃতির শোভাভূমিকায়' তার মানবিক প্রেমকে উপস্থাপিত মাত্র করে, প্রায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের কবিতাবলীর-ই মত। তবু কবির নিজের-ই কথায়, 'হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে ক্রমে সেখানে মানুষ আশ্বাস খুঁজেছে এসে'। এই 'সেখানে' অবশ্যই নিসর্গের বিলয়ধূসর রূপের জগৎ, যেখানে 'ঝরিছে মরিছে সব—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের

৪. 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' : বনলতা সেন।
৫. 'কুড়ি বছর পরে' : বনলতা সেন।

বলে'। 'দুজন'[৬] কবিতার নায়ক-নায়িকাকে কবি ডেকে এনেছেন প্রকৃতির হৈমন্তিক বিষণ্ণতার জগতে, কারণ হেমন্তের শস্যহীন মাঠের সঙ্গে প্রেম-অবসিত মানব-হৃদয়ের সার্থক সাযুজ্য তিনি অনুভব করেছেন : আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে/প্রাণ তার ভরে গেছে। এই 'দুজন' কবিতাটির কয়েকটি উচ্চারণ-ই পাঠককে সচেতন করে তোলে জীবনানন্দের প্রেম-ভাবনার নবনীত মনন-রূপটির দিকে। কবির কাছে 'পৃথিবী ও আকাশ', অর্থাৎ নিসর্গভুবন 'চিরস্থায়ী'। মানুষের মনোজগতে ভালবাসার জন্ম-মৃত্যুর চঞ্চল নশ্বরতার পাশে পরিকৃতির শান্তি ও সান্ত্বনার অপরিবতর্নীয় আশ্বাসের বাণী এখানেই যেন প্রথম উঁকি দিয়ে যায়। আবার, এ কবিতায় নায়িকা যখন বলে ওঠেন, 'আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না/হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের', কিংবা তাঁর প্রেমিকের যখন মনে হয়, 'এই নারী অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে' যেখানে 'অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ইপ্সিতাকে' খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রেমের সেই চিরন্তন দিব্যতার আদর্শ, যা এক অপ্রাপণীয়ের সৌন্দর্যমূর্তি ঘিরে উৎসারিত হয়েছে রোমান্টিক কাব্যের দেশকাল নিরপেক্ষ সম্ভারে।

জীবনানন্দের কল্পনা এবং চেতনায় ('বনলতা সেন' গ্রন্থটিতে বা সেই পর্যায়ের কবিতাবলীতে) নিসর্গ শুধু সৌন্দর্যের জগৎ নয়; শান্তি ও নিশ্চিতির এক আশ্রয়ভূমি। এ পরিবর্তিত চেতনাভূমির ওপর-ই কবির প্রেম-ভাবনা নবাঙ্কুরিত হয়েছে মননোজ্জ্বলতায় এবং ইতিহাসবেদী বিশ্বাসে। 'শুদ্ধ প্রতর্কের ইঙ্গিত' (বা যুক্তিবাদী মনন) এবং 'চতুর্দিককার প্রতিবেশ-চেতনা' কিভাবে কবি-কল্পনায় সঞ্চারিত হয়ে তাকে পরিণতি ও সারবত্তা দেয়, সে প্রসঙ্গে জীবনানন্দের অভিমত 'কবিতার কথা' নিবন্ধে অভিব্যক্ত। সেই মনন ও প্রতিবেশচেতনার অভিঘাত পরোক্ষ ধারণ করেছে তাঁর একালের কাব্য। চতুষ্পার্শ্বের বিরুদ্ধবাস্তব, খণ্ডচৈতন্যের গ্লানি ও অপূর্ণতা থেকে প্রেম এখানে এক পূর্ণতর জীবন-অভিজ্ঞতার আস্বাদ ও আশ্রয় খুঁজেছে নিসর্গের জৈব প্রাণরঙে। নিসর্গের নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন প্রণপ্রবাহের মধ্যে আত্মনিমজ্জনের অভীপ্সা 'আমি যদি হতাম' ও 'ঘাস' এ দুটি কবিতায় অভিব্যক্ত। 'ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে' জন্মানোর যে ঈপ্সা কবির চেতনায় ধ্বনিত, তার-ই স্পষ্টতর, সরলতর প্রকাশ ঘটেছে 'আমি যদি হতাম'-এর মতো রোমান্সধর্মী কবিতায়। একটি কবিতার বিষয় প্রেম; প্রেক্ষিত প্রকৃতি। প্রেম এখানে মুক্তি ও শান্তির আশ্রয় খুঁজছে নিসর্গলোকে, মনুষ্যভিন্নঅস্তিত্বের প্রকৃতিলীন জৈব সম্পূর্ণতার মধ্যে : "কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে ধানক্ষেতের কাছে/ছিপছিপে শরের ভিতরে/এক নিরালা নীড়ে"। বনহংসমিথুনের জৈব প্রাণোল্লাস, প্রতীকের অন্তরাল থেকে আভাসিত করে নিসর্গ-জীবন প্রবাহের মধ্যে নিমজ্জনে কিভাবে কবির চেতনা খুঁজছে বাধা-বন্ধনহীন জীবনের পরিপূর্ণতা। কবি জানেন, নিসর্গ-জীবন নানা মারণ-আকস্মিকতায় ভরা, যে কোন মুহূর্তে নেমে আসতে পারে মৃত্যুর যবনিকা : 'হয়তো গুলির শব্দ আবার/আমাদের স্তব্ধতা,/আমাদের শান্তি'। তবু সেই জীবন-ই কবির অভিপ্রেত; কারণ সেখানে মানুষের জীবনের 'টুকরো টুকরো মৃত্যু', 'টুকরো টুকরো

৬. 'দুজন' : বনলতা সেন।

সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার' নেই। এভাবেই মানুষের আধুনিক জীবনের ক্ষুদ্র খণ্ডত্বের বিপরীতে নিসর্গলীন অস্তিত্বের সপ্রাণ পূর্ণতার বাণী 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থেই পরিণত মননের মধ্য দিয়ে কাব্যরূপ নিয়েছে। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় সংবেদিতার মধ্য দিয়েই প্রকৃতি জীবনানন্দের একালের কাব্যে তার ঐশ্বর্য অবারিত করেনি, নিয়ে এসেছে পূর্ণতব মনন অভিজ্ঞতায় লব্ধ এক নিশ্চিতি, অখণ্ড পরিপূর্ণ অস্তিত্বের বোধ ও প্রশান্তির আশ্বাস। মানবের ইহজাগতিক অস্তিত্বে নিসর্গের এ নবমূল্যায়িত মহিমার পরিপ্রেক্ষিতেই এ পর্বে প্রেমের আবির্ভাব এমন উজ্জ্বল। 'বনহংস-মিথুন', 'বুনোহাঁস', 'হরিণ' হয়ে উঠেছে এক মুক্ত, নির্বাধ, পূর্ণতর জীবন-বাসনার প্রতীক। বুনোহাঁসের প্রতীকটি এক-ই সঙ্গে বন্য জৈব কামনা ও বাধা মুক্ত বাসনার উল্লাস আভাসিত করে। বুনোহাঁস তখন-ই পাখা মেলে, যখন 'পেঁচার ধূসর পাখা' উড়ে যায় 'নক্ষত্রের পানে'। পেঁচা এখানে বিচক্ষণতা, বুদ্ধি বা সংস্কার-আশ্রিত জীবনের প্রতীক, যে জীবন 'নিয়মের রূঢ় আয়োজনে' বা নিষেধের শাসনে অবদমিত রেখেছে মানব-হৃদয়ের প্রেমের মুক্তি-স্পৃহা। 'পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে গেলে' অর্থাৎ বিচারপ্রবণ বিচক্ষণ সতর্কতার অবরোধ অপসৃত হলে, 'বুনোহাঁস পাখা মেলে'—মগ্ন-চৈতন্যের গহনতা থেকে বেরিয়ে আসে বুনো হাঁসের দল। নির্বাধ উল্লসিত বাসনার পাখিরা তখন মুক্তির আনন্দে ডানা মেলে দেয় 'পউষের জ্যোৎস্নায়'। এ কবিতার শিল্পসিদ্ধি এমন-ই অনায়াস যে, কখন বুনোহাঁসের দল। নির্বাধ উল্লসিত বাসনার পাখিরা তখন মুক্তি আনন্দে ডানা মেলে দেয় 'পউষের জ্যোৎস্নায়'। এ কবিতার শিল্পসিদ্ধি এমন-ই অসহায় যে, কখন বুনো হাঁসের দল কল্পনার হাঁসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে পউযের জ্যোৎস্না ছেড়ে হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভেতর উড়তে থাকে, তা বুঝে ওঠার অনেক আগেই কবিতার যাদুকরী চরণগুলি পাঠকের কল্পনায় মুদ্রিত করে দেয় 'কবেকার পাড়াগাঁয় অরুণিমা সান্যালের মুখ'—দূরকালের ব্যবধান ভেঙে উঠে আসে হারানো প্রেম, ভালবাসার নারী, তার লজ্জারুণ মুখশ্রী। কিন্তু এখানেও দেখি, নিসর্গের অবারিত জৈব প্রাণপ্রবাহের মধ্যে বুদ্ধিগত চেতনাকে নিমজ্জিত করে দিয়েই হৃত, অবদমিত প্রেম-বাসনা কথা কয়ে উঠেছে। বুনোহাঁসের প্রতীকটির ব্যবহার সেই নিমজ্জনের-ই ইঙ্গিতবহ। যা কিছু চেতনার গভীরে বন্যতায় মূলবদ্ধ, তা-ই যেন হঠাৎ উড্ডীন ডানায় নির্বাধ, স্বাধীন।

ব্যবহারিক জীবনের অবলেপে দমিত প্রেম-বাসনার ক্ষণজীবী মুক্তির উল্লাসের সাক্ষ্য বহন করছে এ গ্রন্থের সমধর্মী আর একটি কবিতা : "হরিণেরা'। হরিণ শুধু তার লোকপ্রসিদ্ধ সৌন্দর্যের জন্যই নয়, প্রেয় ও অপ্রাপণীয়ের প্রতীক হিসেবেও আবহমান মানব চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠ। আবার দ্রুতচারী এ প্রাণীটি মুক্তির দ্যোতনাও বহন করে তার উল্লাসস্পৃষ্ট গতির ইঙ্গিতে। কিন্তু ভুললে চলবে না, হরিণ নিসর্গচারী—জীবনানন্দের কবিতাটিতে সে স্বপ্নের মধ্য হতে উঠে এসেছে ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় পলাশের বনে। চারদিককার নিসর্গ মাধুরিমার মধ্যে ক্রীড়াচঞ্চল হরিণদের নির্বাধ উল্লাস কবির চেতনায় জাগিয়ে তুলছে হারানো প্রেমের জন্য আর্তি : 'বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা বোস' নিসর্গের এ রম্য অন্তরাল থেকে তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। এক

দূরাপসারিত স্বপ্নের জগৎ অবদমিত প্রেম-বাসনার মুক্তির মধ্য দিয়ে আবার বাঙ্ময় হয়ে ওঠে :

> বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
> ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

আলোচিত দুটি কবিতাতেই দেখা যায়, ভালোবাসা বা ব্যর্থ বাসনার বিষাদভার যে জগতে মুক্তি খুঁজছে, তা প্রাত্যহিকতায় অবলীন আমাদের পরিচিত পৃথিবী নয়, এক কল্পজগৎ ('পৃথিবীর সব রঙ ধ্বনি মুছে গেলে পর') যেখানে নৈসর্গিক প্রশান্তির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে বয়ে চলেছে এক পরিপূর্ণ প্রাণপ্রবাহ, যা ইন্দ্রিয়সংবেদী, প্রতর্কতাড়িত নয়।

'প্রকৃতির শোভাভূমিকায় প্রেম'-এর উপস্থাপনা জীবনানন্দের পূর্বপর্যায়ের কাব্যেও দেখা গেছে। সে প্রকৃতিলোক ছিল ধূসর, হৈমন্তিক বিষাদ ও মৃত্যুর ভারাবলীন। নিসর্গসৌন্দর্যের ক্ষণজীবী রমণীয়তায় কবি তখন অনুভব করেছিলেন বিষাদ, আর তার-ই সঙ্গে মিলেয়ে দিয়েছেন ভালোবাসার নশ্বরতার বেদনা। জীবনানন্দের কাব্যের প্রাথমিক পর্বে প্রেম মৃত্যুস্পৃষ্ট। তাঁর মধ্যপর্যায়ের কাব্যে, অর্থাৎ 'বনলতা সেন' ও সমসাময়িক কবিতাবলীতে, প্রেমের এ মৃত্যুআহত নশ্বর রূপটিই বড় নয়। একালে প্রকৃতি-পৃথিবী জীবনানন্দের কাছে হয়ে উঠেছে প্রশান্তি ও নিশ্চিতির কেন্দ্র, এক পরিপূর্ণ প্রাণরঙের দ্যোতক। নিসর্গ-নিমগ্ন প্রেমকে সেই পূর্ণ জীবনলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কবি। তাই প্রেম 'বনলতা সেন' গ্রন্থে ও পরবর্তী পর্যায়ের বহু কবিতাতেই মৃত্যুর বৈনাশিক বিষাদকে অতিক্রম করে মরণজয়িতার শক্তিতে আবির্ভূত। আহ্মান মানবচেতনার সৌল অপরাহত বোধের স্বরূপেই যেন তার প্রকাশ। প্রেমের মরণজয়িতার বোধ পরিপুষ্ট হয়েছে কবির ইতিহাসচেতনায়—জীবনানন্দের একালের কাব্যে যার একটি সুনির্দিষ্ট ও মননঋদ্ধ বিগ্রহ পাওয়া যায়। এবং প্রকৃতি যেন সংযুক্ত করেছেন মানবচিত্ত-গহনবাসা এ মৃত্যুত্তীর্ণ প্রেমবোধে তাঁর প্রশান্তির সম্পদ। এভাবেই জীবনানন্দের মধ্যপর্যায়ের কাব্যে 'প্রেম' হয়ে উঠেছে প্রেয় অন্বিষ্টের এক গরীয়সী প্রতিমা। তাঁকে আমরা আবিষ্কার করি দীর্ঘ ক্লান্ত সহস্রবর্ষব্যাপী অন্বেষার পরে 'সবুজ ঘাসের দেশে' বনলতা সেনের ইতিহাসমণ্ডিত অবয়বে, তার 'পাখির নীড়ের মতো চোখে'র প্রত্যাশিত প্রশান্তির আশ্রয়ে।

এ কবিতার প্রথম স্তবকে যুগ-যুগান্তরব্যাপী মানব-অন্বেষার উত্তর-ব্যক্তিক আবহ; দ্বিতীয় স্তবকে দিশাভ্রান্ত নাবিকের ঘাসের দেশে আশ্রয়-গ্রহণের চিত্রকল্প, নায়িকার ইতিহাসমণ্ডিত মুখচ্ছবি, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইতিহাসচেতনায় অভিষিক্ত প্রেমবোধের মূল্যমহিমার কথা। এ প্রেম চিরজীবিত; তাই 'দুদণ্ডের শান্তি'র প্রসঙ্গ অতিক্রম করে নায়ক শেষ পর্যন্ত 'বনলতা সেন'কে পুনরাবিষ্কার করেন, কবিতার শেষ স্তবকে, ইহজাগতিক বিনিময়ের ঊর্ধ্বেস্থিত চিরন্তনতার মধ্যে। আবার প্রথম স্তবক থেকেই নায়ক যখন নিজেকে যুক্ত করে নেন 'হাজার বছর ধরে' পথ-হাঁটা মানবসত্তার সঙ্গে, তখন-ই 'বনলতা সেন' হয়ে ওঠেন আবহমনকালব্যাপী ভ্রাম্যমাণ মানবসত্তার

অন্বিষ্টের প্রতীক, চিরমানবাত্মার প্রেয়সী। 'বিদিশা-শ্রাবস্তীর উল্লেখ তখন তাঁকে ঐশ্বর্যময়ী করে তোলে; কবির ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হয়ে ওঠে মানব-প্রেয়সীর প্রত্নপ্রতিমা। জীবনানন্দ যেন ঐহিক প্রেমের আয়োজন স্বীকার করে নিয়েই 'বনলতা সেন'কে ঘিরে রচনা করেছিলেন মানব-হৃদয়ের চিরন্তন অভীপ্সার পরিমণ্ডল। প্রেয়সী নারী হলেন শ্রেয় অন্বিষ্টের ও নিশ্চিতির প্রতীক।

কিন্তু 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে প্রেম মুক্তি ও শান্তির আশ্রয় খুঁজেছে নিসর্গলোকে, প্রকৃতি পৃথিবীর নির্বাধ ও অখণ্ডিত প্রাণপ্রবাহে। নাম-কবিতাটির তাৎপর্য তাই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রণিধেয়। 'বনলতা' নামটির মধ্যেই রয়েছে প্রকৃতি-পৃথিবীর অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতির ব্যঞ্জনা। এ 'বনলতা সেন' শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ অন্বেষার সফেন সমুদ্র পেরিয়ে আবিষ্কৃত হন 'সবুজ ঘাসের দেশের' মতন, আর অন্বেষাক্লান্ত মানবপ্রেমিকের প্রতি অভ্যর্থনা জানায় তাঁর 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'। দু'টি চিত্রকল্পই নিসর্গপৃথিবী থেকে আহৃত ('ঘাস ও পাখি) হয়ে 'বনলতা'কে আরো সুনিশ্চিতভাবে করে তোলে প্রকৃতি স্বরূপিনী। এ কবিতাটিতে এক প্রকৃতি (নিসর্গলোক) ভাব-সাযুজ্য পেয়েছে আর এক প্রকৃতির (নারী) মধ্যে। জীবনানন্দের বিবর্তনশীল কাব্যপ্রবাহের পূর্বপর প্রকৃতিমুখিনতা এবং 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে অভ্রান্তভাবে লক্ষণীয় প্রকৃতির জীবন-অস্তিত্বের পূর্ণতা ও প্রশান্তির প্রসঙ্গটি স্মরণে রাখলে এ দাবি স্বীকার্য মনে হয়। কিভাবে লৌকিক প্রেম-আখ্যানের বহিরঙ্গ ও আঞ্চলিক ভৌগলিক স্বাদের বাস্তবতা ('নাটোর' ও 'সেন'—উপাধির প্রয়োগ) বজায় রেখেও জীবনানন্দ তাঁর এ অনবদ্য কবিতাটিতে সঞ্চারিত করেছেন লোকোত্তর ব্যঞ্জনা, তা ভেবে আমরা বিস্ময়াবনত হয়ে পড়ি ঠিকই, তবু নিছক ব্যক্তিগত প্রেম-কাহিনীর কবিতা হিসেবে 'বনলতা সেন' কবিতাটি সমস্ত রোমান্টিকতা ও উত্তাপ নিয়েও তার অর্থের বহুতলবিস্তার উন্মোচিত করে না।

'বনলতার সেন' পর্যায়ে জীবনানন্দের প্রেমচেতনা ইতিহাসবেদে আশ্রিত ও পরিপুষ্ট। মানবসভ্যতার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানবসত্তার প্রেয় অন্বিষ্টের জন্যে সম্মুখযাত্রার চিত্রকল্পটি 'বনলতা সেন' কবিতার প্রথম স্তবকেই ইতিহাসবেদিতার ভূমিতে আশ্রিত হয়ে মহত্তর ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে। এ হাজার বছর ধরে পথহাঁটা মানবপথিকের চিত্রটি 'পথহাঁটা' কবিতাটির শেষ দু'টি চরণে সহসা এক অপ্রতিরোধ্য অভিঘাতে পাঠককে পৌঁছে দেয় অব্যবহিত নাগরিক অস্তিত্ব থেকে আবহমান মানবঅস্তিত্বে : 'বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর/কেন যেন, আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।' কিন্তু সেই কবিতার প্রসঙ্গ প্রেম নয়, শুধু হাজার বছরের ভ্রাম্যমাণতার চিত্রকল্পটি কেমনভাবে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে-তাই দেখানোর প্রয়োজনে বিষয়টি উল্লিখিত হলো। অন্যদিকে, 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটি অভ্রান্তভাবে সময়ের বিলয়ধর্মী পটভূমিতে চিররাত্রির আবহে ('চারিদিকে চির দিন রাত্রির নিধান') মানবচেতনায় দীপ্যমান রেখেছে প্রেম। ইহজাগতিক লেনদেনের পরও, ব্যক্তি মানবের মৃত্যু হলেও ('শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের') যেন এক মরণাতীত

সত্তায় বিরাজ করেন বনলতা সেন—মানবচেতনার গভীরে নিহিত দুর্মর প্রেমবোধ : 'মনে আছে'? শুধাল সে—শুধালাম আমি শুধু—বনলতা সেন'?

'পৃথিবীর বয়সিনী' যে মেয়েটিকে কবি 'সুরঞ্জনা' বলে সম্বোধন করেছেন, তিনিও এ চিরন্তন প্রেমের-ই প্রতিমা। 'সুরঞ্জনা' নামটির বাগর্থ বিশ্লেষণেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নারীপ্রতীকের অন্তরালবর্তিনী প্রেমের মুখশ্রী। তিনিই সুরঞ্জনা, যিনি আমাদের হৃদয়কে সুন্দরভাবে রঞ্জন করেন। (মনে রাখা ভাল, 'রঞ্জন' আর 'রাগ' এ দু'টি শব্দ এক-ই ধাতু থেকে সংগঠিত)। 'বনলতা সেন' গ্রন্থে প্রেম বার বার আবির্ভূত হয়েছে নারীত্বের প্রত্নপ্রতিমায়, ইতিহাসচেতনার সারাৎসারে পরিপুষ্ট হয়ে। 'সুরঞ্জনা' কবিতাটিতে জীবনানন্দের দৈবী উচ্চারণে মানবসভ্যতার অন্তর্লীন প্রেরণা-স্বরূপিণী এ প্রেম অঙ্গীকৃত হয়ে ওঠে কবির ইতিহাসবেদে; ধর্মাশোকের সন্তান মহেন্দ্রের সমুদ্রযাত্রা ও সভ্যতাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষার পেছনে প্রেরণার মতো কাজ করেছে এ কল্যাণী প্রেমের-ই শক্তি :

তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

পূর্ব স্তবকের নৈসর্গিক প্রেক্ষাপটে এই বক্তব্যকেই কবি উপস্থাপিত করেন যখন তিনি জানান, মানুষের সভ্যতার বয়স বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য-নক্ষত্রের আলোও ক্রমক্ষীয়মান; তবু প্রকৃতির-ই জগতে আছে চিরপ্রাণরঙ্গলীলা। সমুদ্রের নীল, ঝিনুকের গায়ের আল্পনা, পাখির গান নবীন মানব-মানবীকে ডেকে নেয় ভালবাসায়। কারণ, 'মানুষ কাউকে চায়' তার জায়মান বিশ্বচেতনার কেন্দ্রে এক নিশ্চিতির আশ্রয়। একদিন তার ছিল ঈশ্বরে উজ্জ্বল। বিশ্বাস; সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়চ্যুত মানব নতুন আশ্রয় খুঁজেছে 'অন্য কোনো সাধনার ফলে', যা হলো প্রেম। আর এ প্রেম বলতে জীবনানন্দ যদিও বোঝেন 'মানুষের তরে কে মানুষীর গভীর হৃদয়', তবু তার অমর্তদাক্ষিণ্য, মৃত্যুহীনতা ও প্রয়াণের শক্তি সম্পর্কে তিনি আশ্বস্ত করেন পাঠককে ইতিহাস-প্রদক্ষিণ পথে :

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নবসভ্যতায় ফিরে আসে,—
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

'মিতভাষণ' ও 'সবিতা' কবিতা দু'টির কেন্দ্রেও রয়েছেন জীবনানন্দের এ ইতিহাসবেদী প্রেম-চেতনায় উদ্ভিন্ন শ্রেয়সী নারী। 'মিতভাষণ' কবিতাটির প্রথম

স্তবকেই প্রেয়সী নারীর সৌন্দর্যদীপ্তিকে কবি চিনেছেন তার ঐতিহ্য মহিমায় ('তোমার সৌন্দর্য, নারি, অতীতের দানের মতন')। প্রেম যেন এক 'শ্রেয়তর বেলাভূমি', যা 'সময়ের শতকের মৃত্যু' হলেও, অর্থাৎ মানবেতিহাসে যুগ থেকে যুগাবসানের পরেও, 'ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো' মানবকে ডেকে নেয় উজ্জ্বল বিশ্বাসে ও প্রেরণায়। নারীর মুখশ্রীর 'স্নিগ্ধ প্রতিভায়' কবি সেই বিশ্বাস ও প্রেরণার শক্তি দেখেছেন। তাই কবিতার অন্তিম স্তবকে সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় উত্তরণের যাত্রায় মানবের ভ্রান্তি, হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের বিকল্পে কবি রেখেছেন প্রেমের মৃত্যুমথিত উদ্বর্তনের ঘোষণা :

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে,
বড় বড় নগরীর বুক ভরা ব্যথা
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সংকল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রুষার জল, সূর্য মানে আলো :
এখানো নারীর মনে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো

লক্ষণীয়, জীবনানন্দ এখানে জল, আলো কিংবা সেসবের উৎস নদী সূর্যের মতো প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত রেখেছেন নারীর প্রেমের প্রেরণাশক্তিকে। এভাবেই 'বনলতা সেন' গ্রন্থটিতে বারেবারেই নারী ও নিসর্গ—'প্রকৃতি' শব্দটির এ দুই অভিধা-ই খুব কাছাকাছি এসেছে, সাঙ্গীকৃত হয়েছে একে অপরের ভাব ও শক্তির সাযুজ্যে (যে কথা আমরা পূর্বেই 'বনলতা' নামকরণটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছি)। 'সবিতা' কবিতাটিতেও নর-নারীর প্রেম জীবনচর্যার প্রেক্ষাপটে এসেছে ইতিহাসের বিস্তৃত প্রান্তরে সভ্যতা থেকে নবসভ্যতার যাত্রায় মানব-যুগলের পরস্পরকে চেনা। তাই প্রেয়সী নারীর মুখের রেখায় আভাসিত 'মৃত কত পৌত্তলিক খ্রিস্টান হিন্দুর/অন্ধকার থেকে এসে সব সূর্যে জাগার মতন' অগ্রসরনের, সম্মুখযাত্রার প্রেরণার শক্তি; তার নিবিড় কালো চুলের ভিতর 'কবেকার মুদ্রের সন'। ইতিহাসচেতনার উৎসারে ও বিস্তারে নারী হয়ে উঠেছেন শক্তি ও প্রেরণার প্রত্নপ্রতিমা—শুধুমাত্র সৌন্দর্য আর নিয়তিতাড়িত প্রেম-বাসনার চির-অলভ্য প্রতীক নন তিনি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে প্রেম যদি হয়ে থাকে প্রেয় ও অপ্রাপণীয়, একালের কাব্যে তা হয়ে উঠলো শ্রেয় ও আরাধ্য। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে প্রেমের ক্ষণজীবি অমর্ত আস্বাদের উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে কবিতার পর কবিতায়, নশ্বরতার বেদনাবহ উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে। 'বনলতা সেন' পর্যায় কবিতার পর কবিতায় প্রেম তার মরণজয়িতার শক্তিতে উপলব্ধি এবং প্রেমের শক্তির এ মরণাতীত মহিমার আনন্দবোধ জারিত হয়েছে কবির ইতিহাসচেতনায়। তাই প্রেমিক নায়ক হয়ে উঠেছেন আবহমান মানবসত্তার প্রতিভূ, প্রেয়সী নারী হয়েছেন এক পরমা অন্বিষ্টের প্রতীক। ইতিহাসচেতনায় বলয়িত হয়ে এ প্রেম মানবাত্মাকে ডেকে এনেছে প্রকৃতি-পৃথিবীর আশ্রয়ে; প্রেমের প্রেরণার শক্তি ও নৈসর্গিক 'পূর্ণপ্রাণে'র শক্তি যেন সাঙ্গীকৃত হয়েছে একটি বিন্দুতে। 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কাব্যে এভাবেই জীবনানন্দের প্রেমচেতনা স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণতর পরিণতি চিহ্নিত হয়েছে।

তবে কোনো কবিই, যদি তিনি মানব অভিজ্ঞতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, তাঁর প্রেমের কবিতাবলী হতে সম্পূর্ণভাবে হতাশা, বিষাদ ও মৃত্যুর বোধগুলিকে মুছে দিতে পারেন না। তাই বিষাদ ও মৃত্যুর প্রচ্ছায়া, ব্যর্থতা, আহত বাসনার আর্তি 'বনলতা সেন' গ্রন্থের অনেক কবিতার সুরেই আবর্তিত। তবে সে সবকিছুই আগের মতো সংবেদনার প্রবলতায় প্রেমের শুভ প্রেরণাশক্তির নবজাত বোধকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। 'দুজন' বা 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতা দু'টি পাঠককে ফিরিয়ে আনে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র হিমার্ত, মৃত্যুস্পৃষ্ট জগতে। 'শঙ্খমালা' কবিতার নারী যেন পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল', কিংবা 'পরস্পর' কবিতায় জীবনানন্দীয় নায়িকার অনুষঙ্গে, যাঁকে ঘিরে মৃত্যুর আবহ। তবু তিনি আমাদের হৃদয়-সন্ধানে অব্যর্থ, ঘোর মায়াবিনী নিষ্করুণা এক নারী। 'সোনালি ডানার চিল' এ মায়াবিনীর-ই অপ্রাপণীয় মুখচ্ছবি বহন করে আন 'ভিজে মেঘের দুপুরে'। পৃথিবীর যত রূপকথার রাজকন্যার সৌন্দর্যের সুদূরতা ও চির অলভ্যতা যা মানবকে চিরদিন করেছে হতাশ স্বাপ্নিক, তা এ শঙ্খমালার প্রতীকেই হাহাকার করে ওঠে জীবনানন্দের কবিতায়। শঙ্খমালাও রূপকথা থেকে উঠে এসেছেন; তিনি সুদূরিকা, অপ্রাপণীয় সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক। এ চির-আকাঙ্ক্ষিতা অথচ চির অলভ্যা নারী হয়ে ওঠেন অপ্রাপণীয়ের প্রত্নপ্রতিমা। কবি যখন তাঁর চোখে দেখেন 'শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার', তার মধ্যে খুঁজে পান 'কবেকার শঙ্খিনীমালা'কে।

'শঙ্খমালা' কবিতাটি কয়েকটি কারণে আরো নিবিষ্ট মনোযোগ দাবী করে। 'শঙ্খমালা'কে আমরা অপ্রাপণীয়ের প্রতীক বলে দেখেছি; কবিতার শেষচরণে ('এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায়নাকো আর') তার সমর্থন মেলে। শঙ্খমালা লোককাহিনী বা রূপকথার কল্পনাভূমি থেকে উঠে এসেছেন। তিনি 'কবেকার শঙ্খিনীমালা'র অনুষঙ্গ বহন করেন, আর সেই অনুষঙ্গ হলো : 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে'। সেই সুদূরে কালের রূপসীকে কবি ডেকে এনেছেন তাঁর স্বকালে। কিন্তু 'বনলতা'; 'সুরঞ্জনা' 'সবিতা'র মতো 'শঙ্খমালা' কবিকে মিলন ও প্রাপ্তিতে পূর্ণ করেননি, রেখে গেছেন কবিতার চরণে চরণে ব্যবধানে, হাহাকার, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। কোনো একদিন যে মানব শঙ্খমালার মতো নারীকে ঘিরে রচনা করেছিল সৌন্দর্য ও প্রেমের রূপকথা, প্রাপ্তির আনন্দে এ অবিশ্বাসী সময়ে কবি তাঁকে স্বচেতনায় আবির্ভূত হতে দেখলেন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে, বিষাদ ('বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা তার দেহ'), চঞ্চল নশ্বরতা ('শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ'), আর মৃত্যুর আয়োজনে : 'কড়ির মতন সাদা মুখ তার,/দুইখানা হাত তার হিম;/চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম/চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়/সে আগুনে হায়।' এ সব-ই যেন ইঙ্গিতে পাঠককে জানিয়ে দেয় এক রিক্ত বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিহীনতার যুগে পূর্ণ সৌন্দর্য আর প্রেমের অপমৃত্যুর কথা।

আর লক্ষণীয়, কিভাবে এ কবিতায় দুই নারী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী 'কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে' যে নারী কবিকে আহ্বান করেছেন 'নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে',

তার-ই চোখে 'হিজল মাঠের রক্তিম চিতা জ্বলে', যার আগুনে 'শঙ্খমালা' পুড়ে যায়। অন্যদিকে, জীবনানন্দের কবিতায় যে পেঁচা বারবার উপস্থিত বিজ্ঞতা ও জাগতিক বিচক্ষণতার প্রতিভূরূপে, সেই পেঁচার প্রাণের সঙ্গে সাযুজ্য দেখেছেন কবি কান্তারে আবির্ভূত নারীর, যাঁর যুগপ্রতিবেশসম্ভূত বিচক্ষণ মানসতা মানব-হৃদয়ের চির-আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বপ্নপ্রতিমা শঙ্খমালাকে দগ্ধ করে। একদিকে কঠিন জাগতিক আধুনিক; অন্যদিকে স্বপ্নবাসনা শঙ্খমালা—এই দুই নারীর ট্রাজিক অনন্বয় থেকে "শঙ্খমালা" কবিতাটি আহরণ করেছে তার অর্থগূঢ়তা। এ 'শঙ্খমালা' নারীকেই কবি 'হাওয়ার রাতে' আবিষ্কার করেছেন এশিরিয়া মিশর বিদিশার মৃত রূপসীদের মধ্যে, যারা 'দীর্ঘ বর্শা' হত, কাতারে কাতারে হানা দিয়েছে কবির 'আধোঘুমের' স্বপ্নে—

মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করার জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ গভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?

এই নারীকে ঘিরেই গুঞ্জরিত 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতার স্মৃতিভারাতুর অতীতচারিতার আনন্দ-বিষাদ : 'তোমার মুখে রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না, খুঁজি না'। এমনকি নিতান্তই স্বকালে, কুড়ি বছরের ব্যবধান ভেঙে, কবি যাকে 'ধানের ছড়ার পাশে কার্তিকের মাসে', হেমন্তের নতুন কুয়াশার ভিড়ে ফিরে পেতে চান, সেই নারীও মানব হৃদয়বাসিনী চিরন্তন স্বপ্নের প্রেয়সী এ 'শঙ্খমালা'। তাঁকে আমাদের কবি পুড়ে যেতে দেখেন 'হিজল কাঠের রক্তিম চিতায়'—যেন তার নিজের-ই সমকালবদ্ধ ঐহিক অভিজ্ঞতার আগুনে! তাই 'শঙ্খমালা'কে বলেছি, সৌন্দর্য ও প্রেমের এক প্রত্ন-প্রতিমা বা Archetype। এ ব্যাখ্যার সমর্থন জানাবে 'মহাপৃথিবী'র 'সিন্ধু সারাস' কবিতার শেষতম স্তবকটি—যেখানে শ্রেয়সী নারী হয়েছেন 'পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী, যাঁর সঙ্গে তার মানবপ্রেমিকের চিরন্তন ব্যবধানের যন্ত্রণা। শঙ্খমালার প্রেমিকের মুখের রূপ তাই ম্লান নিঃসঙ্গ, 'বিশুষ্ক তৃণের মতো তার প্রাণ'।

জীবনানন্দের বিবর্তনশীল কাব্যপ্রবাহে 'বনলতা সেন' গ্রন্থটি কবির প্রেম-ভাবনাকে রেখেছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের বিপরীতে; কিন্তু প্রথম যুগের সেই প্রকৃতিলোক ক্ষয়িষ্ণু রূপের বেদনায় মৃত্যুস্পৃষ্ট। অন্যদিকে 'বনলতা সেন' ও তৎপরবর্তী 'মহাপৃথিবী' এবং সমসাময়িক অন্যান্য কবিতাবলীতে প্রকৃতির বিষণ্ন ম্লান মৃত্যুপীড়িত রূপটিই বড় হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে এক শান্ত সুষমা ও পরিপূর্ণ প্রাণলীলা : 'অকূল সুপুরি বন স্থির জলে ছায়া ফেলে এই মাইল শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' এখানে; 'এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ'; এখানে 'ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায়' পলাশের বনে 'হাওয়া আর মুক্তার আলোকে' 'হরিণেরা' খেলা করে, এখানে 'কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয়' ভোরের পৃথিবী জেগে ওঠে; এখানে 'নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো' অজস্র তারার সমারোহ। এভাবেই অপরাজেয় শান্তি ও সৌন্দর্যের এক প্রকৃতি-পৃথিবী নিজের আসন নিঃশব্দে বড় করে নিয়েছে জীবনানন্দের

কাব্যে। প্রেমের উপস্থাপনাও ঘটেছে এক শান্ত নিরুদ্বেগ নিসর্গ পটভূমিতে। শুধুমাত্র নর-নারীর প্রণয়, বিরহ মিলন প্রসঙ্গই নয়, মানবেতর প্রাণীকূলের মধ্যে এ প্রেমের বিস্তার ঘটিয়েছেন কবি কাব্যের শিল্পপ্রসাদ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হতে দিয়ে। অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখ, মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জন, বনহংসমিথুনের উল্লাস, সুন্দর বাদামি হরিণের সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেয়া—নিসর্গ আবহ নির্মাণের মধ্যে এসব ছোট ছোট অনুপুঙ্খ কারুকর্ম কবিতার পর কবিতায় রমণীয় চমক-ই শুধু নিয়ে আসেনি, প্রকৃতির বিরাট সজীব নিরবচ্ছিন্ন প্রাণরঙ্গপ্রবাহের শান্তি ও নিশ্চিতির মধ্যে অস্তিত্বের মৌল তাড়না বা প্রেরণাশক্তিটিকে উপস্থাপনার উপযুক্ত পটভূমিক্ষেপ-ই সে সবের লক্ষ্য।

প্রাকৃতিক জীবনের আদিম প্রাণময়তা ও পূর্ণতার সঙ্গে অন্বয়ের উৎসাহ 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে কবির চেতনায় এনেছে স্বাতন্ত্র্য ও অপূর্বতা। নর-নারীর প্রেম যেমন নিসর্গ-জীবনের পূর্ণতা ও সজীবতার পটে চিত্রিত হয়ে মানবিক অস্তিত্বের দুর্বলতাগুলিকে স্পষ্টতর করেছে; অন্যদিকে তেমনই এ মানব-পৃথিবী ঘনিষ্ঠতর ও একাত্ম হয়েছে। যেমন, 'বনলতা সেন' কবিতাটিতেই এক প্রকৃতি (নিসর্গ) অন্য প্রকৃতির (নারী) সঙ্গে ভাব-সম্মিলনে অভেদাত্ম ও অভিন্নকায় হয়ে উঠেছে। মানব ও প্রকৃতির এ মিলনে মৃত্যুও 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে কোনো অন্তরাল রচনা করেনি। জীবনের অমোঘ সত্যের মতো মৃত্যু এখানে উপস্থিত ঠিক-ই; কিন্তু অখণ্ড প্রাণপ্রবাহ-চেতনার উন্মেষে তার নিজের ভূমিকাটিতে সীমিত। কবি জেনেছেন এক 'ব্যাপ্ত নিয়মের' কথা, যার ফলে সবকিছুই একদিন বিদায় নেয়। কিন্তু তবু আকাশ ও পৃথিবী 'চিরস্থায়ী', যেখানে মানুষ বারবার ফিরে আসে 'যেন কিছু চেয়ে কিছু একান্ত বিশ্বাসে'।[৭] এভাবেই ব্যক্তিক প্রেমের স্বপ্ন ও হতাশা', 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানে' ও 'ইতিহাসবেদে' জীবনানন্দকে ফিরিয়ে আনে 'মাটি-পৃথিবীর টানে'। স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের কল্পজগৎ ছেড়ে সেখানে ফেরার ইচ্ছা কবির প্রবল ছিল না।[৮] কিন্তু প্রত্যাবর্তিত হয়ে তিনি জেনেছেন মানবেতিহাসের সারসত্য, সু-চৈতন্যের উদ্বোধনে সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় বার বার উত্তীর্ণ হওয়া।[৯] এ 'মানবজন্মের ঘরে' ফিরে আসা তাই কবির কাছে হয়ে উঠলো, 'গভীরতর লাভ'। তার-ই আলোকে মানবের প্রেমানুভূতিকে ঘিরে বিষাদ, হতাশা ও মরণাধীনতার গ্লানিকে জীবনানন্দ যেন অনেকটাই অতিক্রম করেছেন শান্ত প্রজ্ঞায়। এ প্রজ্ঞার একটি উৎস ইতিহাসচেতনা, একটি পরিপূর্ণ নিসর্গমগ্নতা। প্রিয় যে নারীটির সঙ্গে 'হৃদয়ের খেলা নিয়ে' একদিন 'কত অপরাধ' করেছেন,[১০] তার মুখ মনে পড়ে 'এরকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর পাতাপতঙ্গের কাছে এসে'।[১১] তবু অনর্গলিত যন্ত্রণার হাহাকার নেই; কারণ কবি জানেন কাচপোকা গঙ্গাফড়িঙের মতো 'সেও' আজ

৭. 'দুজন'—বনলতা সেন
৮. 'হাওয়ার রাত'; 'আমি যদি হতাম'—বনলতা সেন।
৯. 'সুচেতনা'—বনলতা সেন।
১০. 'ধান কাটা হয়ে গেছে'—বনলতা সেন।
১১. 'শিরীষের ডাল পালা'—বনলতা সেন।

'ঘুমে'—'আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছে'—'প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো'।[১২] মানুষের জীবন যে চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অসংখ্য অভিঘাতে কাতর এবং দিশাভ্রান্ত, তার থেকে ঢের গভীরতর এক শান্তির মধ্যেই শুয়ে আছেন কবির প্রেয়সী :

শান্তি তবু—গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।[১৩]

'শিরিষের ডালপালা', 'ধানকাটা হয়ে গেছে' ও 'তুমি'—এ তিনটি কবিতায় মৃত্যু শুধু দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়াই ফেলেনি, এসেছে চিরবিচ্ছেদের রূপে। তবু সব কবিতার কোনটিতেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' 'রূপসী বাংলা' পর্যায়ের কবিতার মৃত্যু-আক্রান্ত আর্তি ও হাহাকার নেই—আছে মৃত্যুর শান্ত সম্মত অভিগ্রহণ, যার অন্তরাল হতে স্ফুরিত হয় দীর্ঘশ্বাস। মৃত্যুর শেলতীব্রতাকে অতিক্রম করে জৈব সংসক্তির মধ্যে তাকে দেখা সম্ভবপর হয়েছে নিসর্গ-জীবনে নিমজ্জন ও প্রকৃতি পৃথিবীর সঙ্গে অন্বয়ের চেতনার উদ্বর্তনের ফলেই, একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

'শঙ্খমালা' কবিতাটিকে কেন্দ্র করে 'বনলতা সেন' পর্যায়ে জীবনানন্দের প্রেমের কাব্যের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ স্পষ্ট করতে চেয়েছি। এ গ্রন্থে প্রশান্তিমগ্ন প্রকৃতিভুবনের দাক্ষিণ্যে স্মিত, লাবণ্যে স্নিগ্ধ 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা', শ্যামলী' প্রমুখ নারী-প্রতিমাদের মাঝখানে 'শঙ্খমালা' দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিষাদ ও মৃত্যুর পরিমণ্ডলে। 'বনলতা সেন' কবির কাছে 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' হয়ে উঠেছেন তাঁর কল্যাণ ও প্রশান্তির আশ্বাসে, 'শঙ্খমালা'কে ঘিরে কিন্তু অপ্রাপণীয়তার দীর্ঘশ্বাস ('এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায়নাকো আর') আর স্বপ্নবিনাশের আর্তি ('শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়')। এ কবিতায় নেই নিসর্গ-জীবনের সঙ্গে একায়নের প্রত্যয়; পেঁচা এখানে রচনা করেছে ব্যবধান স্বপ্নের শ্রেয়সী নারী আর কান্তারের পথ থেকে উঠে আসা সেই স্বপ্নের প্রেতপ্রতিমার মধ্যে। 'শঙ্খমালা'-এ অনন্বয় আর ব্যবধানের মধ্য দিয়ে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় কবির আদিপর্বের কাব্যে অপ্রাপণীয় সৌন্দর্য আর পরিপূর্ণ জীবনের রোমান্টিক আদর্শের অনুধ্যানে; স্বপ্ন আর বাস্তব আবার রচনা করে দূরপনেয় ব্যবধান, যার পরিণতি ঘটে 'মহাপৃথিবী'র 'সিন্ধুসারস' কবিতাটিতে। সিন্ধুসারসের গান কবির চেতনায় বহন করে আনে স্বপ্নের প্রবলতা :

নতুন সমুদ্র এক সাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে

তার নৃত্যময় দু'টি ডানার ছন্দে মানুষের মনে জেগে ওঠে প্রয়াণের নবীন উদ্যম। তবু জৈব প্রাণেষণা ও উল্লাসের প্রতীক এ সিন্ধুসারসের সঙ্গে মানবের কোনো আত্মিক যোগাযোগ নেই। কারণ, সিন্ধুসারস স্বপ্ন দেখতে জানে না; সিন্ধুসারস জানে না বাস্তবের অপর পিঠে আছে মানবের কল্পনার জগৎ, যেখানে দেখা মেলে পৃথিবীর শঙ্খমালার নারীর :

১২. 'তুমি'—বনলতা সেন।
১৩. 'ধান কাটা হয়ে গেছে'—বনলতা সেন।

স্বপ্ন তুমি দ্যাখোনি তো—পৃথিবীর সব সিন্ধু সব পথ ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক;

তাই সিন্ধুসারসের সাদা ডানা ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীকে আনন্দ জানায় বটে, তবে সেই 'আনন্দের অন্তরালে' নেই মানবাস্তিত্বের 'প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত'। এভাবেই প্রকৃতি-পৃথিবীর জৈব প্রাণোল্লাসময় জীবনের সঙ্গে মানব-পৃথিবীর জীবনের আত্মিক সংযোগ, যা 'বনলতা সেন' গ্রন্থে অর্জিত হয়েছিল, তা যেন ছিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতি-পৃথিবীর কান্ত আবাস ও আশ্রয় থেকে কবি চলে আসেন 'মহাপৃথিবী'র বৃহদায়তন জীবন প্রান্তরে, যেখানে নিসর্গ এবং মানব আর একাত্ম নয়। বরং তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতে দুই ভিন্ন জীবন অস্তিত্বের মৌল ব্যবধানের চারিত্র বড় হতে থাকে। 'মহাপৃথিবী'র কবিতার পর কবিতায় নিসর্গ-জীবনের নিবিড়তা ও প্রশান্তির মধ্যে হানা দিয়েছে রূঢ় বাস্তব, পারিপার্শ্বিক মানব জগতের নানা সমস্যার অভিঘাত দীর্ণ করেছে প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রাচীন প্রশান্তির আশ্বাস। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানব-মানবীর প্রেম আবার ক্লিন্ন দেহবাদিতায় প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যয়হীনতার অভিশাপে জান্তব ও রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে; সঙ্গে সঙ্গে আর্ত ও বাঙ্ময় হয়েছে কবির আহ্বান। প্রেমকে তিনি ফিরিয়ে আনতে চান 'স্বপ্নে', 'ডাইনির মাংসের' থেকে 'কল্পনার অবিনাশ মহনীয় উদগীরণে'[১৪] 'আম নিম ঝাউয়ের জগতে'[১৫]। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা দেখি, 'শঙ্খমালা' (যিনি অভ্রান্তভাবেই জীবনানন্দীয় নায়িকা) 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রশান্ত ভূখণ্ডে আবির্ভূত হয়ে আমাদের সচকিত করে তোলে, বিষমানুপাতিক টানে। একদিকে অপ্রাপণীয় সৌন্দর্য : প্রেমের রোমান্টিক আদর্শ ঘিরে নিয়তিতাড়িত মৃত্যুর পরিমণ্ডল, অন্যদিকে প্রাকৃতিক জৈব প্রাণরঙের সঙ্গে বিশ্বাস ও চিন্তার সংকটে দীর্ণ মানব জীবনের পূর্ণ আত্মিক অন্বয়ের অসম্ভাব্যতার ব্যঞ্জনা যেন 'শঙ্খমালা' বহন করেন কবির কল্পনায় বিধৃত তাঁর প্রত্নপ্রতিমার সংকেতময় নির্দেশে।

জীবনানন্দের অধিকাংশ প্রেমের কবিতাই রোমান্টিক প্রেম-কবিতার চারিত্রে চিহ্নিত এ কথা আদি সংস্করণ 'বনলতা সেন' গ্রন্থ সম্পর্কেই বিশেষভাবে সত্য। প্রেমের কবিতামাত্রেই স্বপ্নের কবিতা। জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির ইতিহাসে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা' ও 'বনলতা সেন' পর্যায়ে সেই স্বপ্ন বিশেষভাবে অপ্রাপণীয় ও প্রেয়কে ঘিরে গুঞ্জরিত। উনিশ শতকী মহাদেশীয় রোমান্টিক কাব্যের আরো একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল, অতীত গরিমা ও সৌন্দর্যের জগতে প্রত্যাবর্তন। মধ্যযুগীয় শৌর্য ও ঐশ্বর্যবহুল জীবনচর্যার কাব্যিক পুনঃনির্মাণ ঘটেছিল সেই যুগের কবিতায়। রোমান্টিক কাব্যের সমালোচকরা কল্পনার এ জাতীয় স্ফুরণের পশ্চাতে দেখেছেন পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্যের কল্পজগৎ পরিনির্মাণের শৈল্পিক প্রয়াস। আধুনিককালের কাব্যে অতীতচারিতা কোনো সময়েই মুখ্য প্রসঙ্গ হয়নি; স্মৃতিভারাতুরতার অনুষঙ্গ সেখানে নিয়ে এসেছে

১৪. 'মনোবীজ' : মহাপৃথিবী।
১৫. 'ফিরে এসো' : মহাপৃথিবী।

বিগতের জন্য শোচনার পাশাপাশি সাম্প্রতের গ্লানিদীন খণ্ড জীবনের প্রতি প্রগাঢ় অনীহার প্রকাশ। 'বনলতা সেন' গ্রন্থে বা তার পরবর্তী কাব্যেও অতীতচারী আবেগ বারবার উচ্ছ্বসিত হয়েছে বটে, তবে সে আবেগ মহিমামণ্ডিত অতীত জীবনের শোচনায় বা স্বপ্নপ্রয়াণে অবসিত না হয়ে প্রকাশ করেছে বর্তমানের খণ্ডিত জীবনের গ্লানি, চেতনার শূন্যতা। 'হাওয়ার রাতে' এবং 'নগ্ননির্জন হাত'-এর মতো কবিতা দু'টি এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার্য। 'নগ্ননির্জন হাত' কবিতাটিতে 'মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ'-এর ধূসররূপ কবির মনে জেগে ওঠে, যার অনুষঙ্গে বাঙ্ময় হয়েছে লুপ্ত স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার স্মৃতি। দু'টি নিটোল গদ্য পঙ্‌ক্তি পাশাপাশি রেখে জীবনানন্দ বিগত ও বর্তমানের অনপনেয় ব্যবধান ও তজ্জনিত শোচনার অনুভূতি মুদ্রিত করে দেন পাঠকের মনে :

> পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্ত প্রবাল,
> আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা

বিগতকালের ঐশ্বর্যবহুল জীবনোপকরণের উল্লেখমাত্র প্রথম চরণটির অবলম্বন; কিন্তু দ্বিতীয় চরণ তাকে অতিক্রম করে উদ্বর্তিত করে গত জীবনের পরিপূর্ণতার সম্পদ, যা থেকে কবি ভ্রষ্ট হয়েছেন এ অধুনায়। এভাবেই তুলনামূলক বৈপরীত্যে অতীত ও অব্যবহিত জীবন তাদের ব্যবধান প্রকট করে অপরূপ খিলান ও গম্বুজ হয়ে ওঠে বেদনাময় রেখা। এ ক্লিন্ন সাম্প্রতে অনধিগম্য সেই ঐশ্বর্যময় জীবনচর্যা; তাই তার কাহিনী যেন এক 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', তাকে ঘিরে 'লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ'। কিন্তু লক্ষণীয়, 'নগ্ননির্জন হাত'-এ এই লুপ্ত ঐশ্বর্যে জগতের কেন্দ্রে রয়েছেন এক নারী, সেই চির অপ্রাপণীয়া প্রেয়সী, যার মুখের রূপ কত শত শতাব্দীর বিস্মৃতির অন্তরাল পেরিয়ে হানা দিয়ে কবির অনুভাবনায়। 'হাওয়ার রাত' কবিতার পরাবাস্তব বিস্তারেও এ অতীত ঐশ্বর্যের জগতের প্রবল উপস্থিতি কবির হৃদয়ে। পৃথিবী তথা অব্যবহিত অস্তিত্বের বন্ধন ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাঁকে এক দুরন্ত 'শকুনের মত, উপমাটি ব্যগ্র ক্ষুধার ইঙ্গিত বহন করে এবং মৃত জীবনের অনুষঙ্গ গাঢ়তর করে। 'হাওয়ার রাতে' কবির সংবেদনা রয়েছে এক 'আধোঘুমে'র ভেতর, এবং এ 'আধোঘুম' কবিচেতনায় জাগরণ ও স্বপ্ননিমজ্জনের বহির্সাক্ষ্য বহন করছে। কবি দেখেন মৃত রূপসীদের কাতারে কাতারে বর্শা হাতে দাঁড়াতে—মৃত রূপসীরা এক লুপ্ত সৌন্দর্য জগতের প্রতিভূ; তাদের হাতে বর্শার মতো মারণাস্ত্র পাঠককে প্রস্তুত করে তোলে 'হাওয়ার রাতে'র প্রবল নীল অত্যাচারেব কাহিনী শোনাবার জন্য। এ অত্যাচার কবির আধ-জাগরিত চেতনার ওপর; তা 'প্রবল', কারণ অতীতের ঐশ্বর্যময় জীবনের বলশালী উদ্বোধনে তা বর্তমানকে নিক্ষেপ করে এক তুচ্ছ গ্লানিময়তার দৈন্যে। আবার এ 'অত্যাচার' 'নীল'—'নীল' বিশেষণটি নিয়ে আসে স্বপ্নের অনুষঙ্গ—যে স্বপ্নের প্রবলতায় 'পৃথিবী কীটের মতো' মুছে যায় এক অখণ্ডিত পূর্ণ 'নীল মত্ততায়'।

জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির ধারায় প্রেমচেতনার উদ্বর্তনের প্রসঙ্গে 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কবিতাবলীর আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘতর হয়ে পড়ে! তার অন্যতম

কারণ, একালের কাব্যেই কবির প্রেমচেতনা পূর্ণতর প্রেক্ষিত, পরিণতি ও স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল হয়েছে। রোমান্টিক প্রেম আদর্শের প্রভাব নিঃসন্দেহে তার এ সময়কার কবিতায় এনেছে এমন এক বিশিষ্টতা, যা বাংলা কাব্যের বহতাধারায় সহজদৃষ্ট নয়। নিয়তিতাড়িত প্রেম-বাসনার আর্তি ও মরণাকর্ষ, অচরিতার্থতার বেদনা ও প্রেমের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিশ্বাসযোগ্য উত্তাপ ও তীব্রতা জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় যতটা প্রবলভাবে ও শিল্পপ্রসাদে অভিব্যক্ত, তা বাংলা কবিতার আর কোথাও, এমন কি রবীন্দ্রনাথেও তেমন সুলভ নয়। তবু জীবনানন্দ প্রথমাবধি প্রকৃতিমগ্নপ্রাণ এবং প্রেমকে তিনি 'প্রকৃতির শোভাভূমিকায়' দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন। 'বনলতা সেন' পর্যায়ে সেই প্রকৃতিনিমগ্নতা পূর্বের চেয়ে গভীরতর—ইন্দ্রিয় সংবেদনার ঐশ্বর্যের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে মননের দীপ্তি। সেই মননোদ্ভাসিত প্রকৃতিচেতনার আলোকে প্রেম হয়েছে তাৎপর্য-গভীর। ইতিহাসচেতনার অঙ্গীকারে এবং প্রকৃতি-জীবনের একাত্মতার মধ্য দিয়ে প্রেম, বঞ্চনা ও প্রাপ্তির, বিষাদ ও উল্লাসের ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমারেখা পেরিয়ে বিশ্বজনীন মূল্যমহিমায় অভিষিক্ত ও অভিব্যক্ত হয়েছে। এর-ই ফলে অধিকাংশ প্রেমের কবিতা, যেমন 'বনলতা সেন', 'সুরঞ্জনা', 'মিতভাষণ' 'সুবিতা' বা 'শ্যামলী'—এমন এক ভাব-অনন্যতা পেয়েছে, যা কবিতার স্নিগ্ধ সুষমামণ্ডিত বাণীরূপেও প্রতিফলিত।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মহাপৃথিবী'কে কবি একটি সংলগ্ন বা পরিপূরক গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তবু 'মহাপৃথিবী'র অন্তর্গত কবিতাবলী, মৌল ভাব ও সুরের বিচারে বহুলাংশেই বিচ্যুত হয়েছে 'বনলতা সেন' গ্রন্থের নিবিষ্ট প্রকৃতিমুখিনতার প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা থেকে। 'মহাপৃথিবী'র আপদকালীন প্রেক্ষাপট বিপন্ন মানব অস্তিত্বের গ্লানিদীনতা, উদভ্রান্তি ও অনিশ্চিত মানব-মানবীর প্রেম প্রসঙ্গ করে তুলেছে গৌণ। অন্যদিকে নৈসর্গিক অস্তিত্বের জৈবতা ও নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিতি, প্রশ্ন, সংশয় ও নিশ্চয়তাহীনতায় দীর্ণ বিশ শতকী মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে কবির সংকল্পনা-সৃষ্টি প্রকৃতি পৃথিবীর ব্যবধান প্রকট করে দেয়। সিন্ধুসারসেরা জানে না, মানবের রক্তাক্ত অন্বেষা ও ব্যর্থ স্বপ্নের কাহিনী। যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের, তার সঙ্গে মানুষের কোনওদিন দেখা হয় নাকো জেনেই আত্মঘাতী চলে আসে অশ্বত্থের কাছে। প্রেম ও প্রকৃতির নিকট হতে ক্রমাপসারিত, অন্যদিকে রূঢ় বাস্তব পৃথিবীর সন্নিকটবর্তী কবি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের বিরতিহীন অচরিতার্থতার শ্রম। তাই 'লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে'[১৬] তিনি প্রার্থনা করেছেন 'মনোবীজ'। আর সেই বীজ যখন উপ্ত হয়েছে চেতনায়, তখন 'কান্তারের পথে সৌন্দর্যের ভূতের মতন'[১৭] তিনি আবিষ্কার করেন 'প্রণয়ের সম্রাজ্ঞী'দের। এক বিপন্ন পৃথিবী যখন 'সৌন্দর্যকে ফেলিতেছে ছিঁড়ে', তখন 'পৃথিবীর বয়সিনী' সুরঞ্জনাদের জীবনানন্দ হারিয়ে যেতে দেখেন কুশ্রীতার মধ্যে :

—তুমিও তো পৃথিবীর নারী/কেমন কুৎসিত যেন[১৮]

১৬. 'সিন্ধুসারস' : মহাপৃথিবী।
১৭. 'আট বছর আগের একদিন' : মহাপৃথিবী।
১৮. 'মনোবীজ' : ম, পৃ.।

একদা যারা ছিল অপ্সরা উর্বশীর মত, ক্রমে বাদুড়ের খাদ্য যায় তারা; 'পৃথিবীর মানুষীর রূপ' ব্যবহৃত হতে হতে শেষ পর্যন্ত 'শুয়ারের মাংস' হয়ে যায়।[১৯] এভাবেই 'মহাপৃথিবী'র জগতে প্রেমের সৌন্দর্য আর মাহাত্ম্য যুগবৈগুণ্যে ক্ষুণ্ন হয়েছে; প্রেম হয়েছে নির্দেশে পরাহত, অচরিতার্থ, প্রেরণাবিহীন নিরাশ্বাস এক বোধ।

প্রেমের এই নিরর্থকতা ও প্রেরণাবিচ্যুতির বোধ 'মহাপৃথিবী'র 'প্রেম অপ্রেমের কবিতা' শীর্ষক তিন স্তবকবন্ধেই স্ফুট হয়েছে। কবি অনুভব করেছেন 'পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি' বদলে ফেলেছে যেন 'দানবের মায়াবলে'। পুরনো বিশ্বাস, বোধ, সংকল্প ও স্বপ্নের জগৎ মৃত; নতুন কোনো প্রত্যয়ও জন্ম নেয়নি :

একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির করে নিতে হলে লাগে
সকালের আকাশের মতন বয়স,
সে সকাল কখনো আসেনি ঘোর স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে!

এ ঘোর অমাময়ী রাত্রির দেখা জীবনানন্দের পাঠক পান 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'র জগতে পৌঁছে। কিন্তু তার আগে এ সন্ধিপর্বে, যখন সবকিছুই ধ্বংস ও পতনের তীরে, তখন মানব-হৃদয়ের প্রেমচেতনাও অপসৃত নিরালোক প্রত্যয়হীনতায়, যার প্রতিধ্বনি 'মহাপৃথিবী'র কবিতার চরণে চরণে :

ক. তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চলে গেলে কবে
সেই থেকে অন্য প্রকৃতির অনুভবে

খ. সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চলে গেছে।
ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।

গ. তোমার সংকল্প থেকে খসে গিয়ে ঢের দূরে চলে গেলে তুমি,[২০]

- এ সবের বিকল্পে 'মহাপৃথিবী'র কাব্যজগতে নেই কোনো তীব্র অন্বেষার আর্তি, নেই অন্যতর প্রত্যয়ের আহ্বানও; আছে এক বিপন্ন মানব-অস্তিত্বের কাহিনী, যা আমাদের জানিয়ে দেয় 'নারীর হৃদয় প্রেম শিশু গৃহ নয় সবখানি'।[২১] উদ্‌ভ্রান্তি, বিমূঢ়তা, প্রেমের আলোকদেশিতা বা অন্য কোনো উদ্দীপ্তির অভাবে 'মহাপৃথিবী' যেন মোহভঙ্গের তিক্ততা ও বিবমিষায় সংক্ষুব্ধ। প্রেমের অন্তর্ধানের পর :

ক. হলেও বা হয়ে যেতো এ জীবন দিনরাত্রির মতো মরুভূমি
খ. তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা,
জীবনেও নেই কো অন্যথা,

১৯. 'আদিম দেবতারা' : ম, পৃ.।
২০. 'প্রেম অপ্রেমের কবিতা' : ম. পৃ।
২১. 'আট বছর আগের একদিন' : ম. পৃ।

গ. হেমন্তের সহোদর রয়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি
উদাসীন।[২২]

আসলে 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে কোনো শুদ্ধ প্রেমের কবিতাই নেই। যা আছে, তা প্রকৃতির সান্ত্বনা ও প্রশান্তির জগৎ থেকে উৎপাটিত মানবের অনিকেত অস্তিত্বের মধ্যে অপসৃয়মান, ব্যবধানদীর্ণ প্রেমানুভূতির আকস্মিক আবির্ভাব, যা সাম্প্রতের গ্লানি এবং অবক্ষয়ী জীবনের স্বরূপ আরো উলঙ্গ করে উন্মোচিত করে দেয়। একটি কথা উল্লেখ না করে পারি না, নারীর প্রেমের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসভ্রষ্ট কবি প্রেমপাত্রীর জীবন থেকে সরে যাওয়ার পর প্রকৃতি ('অন্যপ্রকৃতির অনুভবে') ও গ্রন্থের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন প্রেরণা ও প্রত্যয়ের প্রার্থনায়। কিন্তু সেখানেও যথেষ্ট উদ্দীপ্তির অভাবে কবিকে শেষে বলতে হয়, 'হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে'। এ পরিপ্রেক্ষিতেই 'ফিরে এসো' কবিতাটির আর্ত আহ্বানের স্পষ্ট আন্তরিকতা বিচার্য। প্রেমকে সেখানে তিনি প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন সেই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নিসর্গ-জীবনের প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের জগতে ('আম নিম ঝাউয়ের জগতে')। প্রেমের অবক্ষয়, বিশ্বাসভ্রষ্ট পৃথিবীতে তার দূরাপসারণ তথা অন্তর্ধানের স্থির, স্পষ্ট অথচ শোকাবহ কাব্যোচ্চারণেই পরবর্তী গ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমির'-এর মুখবন্ধী কবিতা 'আকাশলীনা'কে আধুনিকের মানস অভিজ্ঞতার প্রতিনিধি করেছে। অন্যস্তরে মানব-হৃদয়ের মৃত্যুহীন প্রেমচেতনাকে এক সমকাল চিহ্নিত অথচ চিরন্তন বাণীরূপ দিয়েছে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 'বনলতা সেন' গ্রন্থের 'শঙ্খমালা' কবিতাটিতে কবি প্রেম ও সৌন্দর্যের নারী 'কবেকার শঙ্খিনীমালা'কে চিতার আগুনে পুড়ে যেতে দেখেছিলেন; সে চিতা কান্তারের পথে সন্ধ্যার আঁধারে আবির্ভূতা এক রমণীর চোখের আগুন। এ রমণীর পরিচয় আরো স্পষ্টতর হয় 'মহাপৃথিবী'র অন্তর্গত 'মনোবীজ' কবিতাটির অনুধাবনে। "মনোবীজ" কবিতায় এ রমণীর দেখা মেলে আবার সেই কান্তারের পথে। এখানে কবি তাকে আবিষ্কার করেন 'সৌন্দর্যের ভূতের মতন'। যে পৃথিবীতে স্বপ্ন অবসিত, সৌন্দর্য ছিন্নভিন্ন ('পৃথিবী আজ সৌন্দর্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে') সেখানে প্রণয়ের সম্রাজ্ঞীরা তো যুগবিলীন মালিন্যেই উপস্থিত হবে। এ কবিতাটিতে এবং অন্যত্র ('আদিম দেবতারা') জীবনানন্দ তাঁর পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি প্রেমের সমুজ্জ্বল মহিমার অবক্ষয় ও দেহসর্বস্বতায় হারিয়ে যাওয়ার কথা। একদিকে পৃথিবীর মানুষীর রূপ 'স্থূল হাতে ব্যবহৃত' হয়ে 'শূয়ারের মাংস' হয়ে যায়; অন্যদিকে অপ্সরা উর্বশীরা 'ডাইনির মাংসের মতন' তাদের 'জঙ্ঘা ও স্তন' মেলে ধরে। 'মহাপৃথিবী'র প্রধান উচ্চারণ তাই, অন্যান্য প্রসঙ্গে যেমন কবির প্রেম-ভাবনার ক্ষেত্রেও তেমনই, মূল্যবোধ ও আদর্শ বিচ্যুতির অনুষঙ্গে ঘনীভূত হয়ে হয়ে ওঠা এক শোকাবহ নিস্পৃহা, কবি নিজে যাকে বলেছেন, 'জীবনের হেমন্তকাল'—'সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন' এক নৈরাশা।

২২. 'প্রেম অপ্রেমের কবিতা' : ম. পৃ.।

'সাতটি তারার তিমির'—'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্বে (আনুমানিক (১৯৩০-১৯৫০) পৌঁছে জীবনানন্দের কবিতার পাঠক বিশ্বসঙ্কটের, বিশ্বাসভঙ্গ ও মূল্যবোধের বিষমানুপাতিক টানে তাঁর কাব্যের ভাব ও বাণীরূপ, বিষয় ও চারিত্র আমূল পরিবর্তিত হতে দেখেন। পূর্ববর্তী কাব্যজগতের নৈসর্গিক শান্তি ও সৌন্দর্যের সমাহিতির রূপ ভেঙে দিয়ে এখন তাঁর রচনায় প্রবলভাবে প্রবেশ করতে চাইছে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের অভিঘাতে বিপর্যস্ত বিশ্বমানবের বিপন্ন নাগরিক অস্তিত্ব। সে বিপন্নতা, 'মহাপৃথিবী'র পাঠকমাত্রেই জানেন, তীব্রতম উপলব্ধির প্রহারে এক-ই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও উত্তরব্যক্তিক, যুগ-যন্ত্রণার উদ্‌ভ্রান্তি ও নৈরাশা থেকে সঞ্জাত। জীবনানন্দের এ সময়ের কাব্য সৃষ্টির পরিধির মধ্যে 'মহাপৃথিবীতে'ই এ বিপন্নতার বোধ গাঢ়তর এবং নাগরিক জীবনের বাস্তবতার দংশনে তীব্র। তবু 'মহাপৃথিবী'কে জীবনানন্দ 'বনলতা সেন'-এর সংলগ্ন গ্রন্থ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতিলোক ও নগরজীবন উভয়ের-ই অন্তঃসারে কবিচেতনা তখনও পর্যন্ত দুই ভিন্নাবর্তে ঘূর্ণিত। একদিকে 'আট বছর আগের একদিন'-এর মতো কবিতায় আধুনিক মানবের তীব্র বিপন্নতার বোধ; অন্যদিকে, 'সিন্ধুসারস', 'ফিরে এসো", 'শ্রাবণরাত' কিংবা 'বলিল অশ্বত্থ সেই' প্রভৃতি কবিতার নিসর্গ অভীপ্সার মদিরতা। উপলব্ধির এ দ্বিচারণিক স্পৃহা ও প্রবণতায় 'মহাপৃথিবী'র কবিচেতনা 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে' অবলীন হলেও নিসর্গ পৃথিবীর প্রশান্তি ও কল্যাণবহ আকাঙ্ক্ষার একাগ্রতা সেখানে যে দুর্লভ ছিল না, তার স্বপক্ষে একটি উদাহরণ উপস্থিত করছি :

অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনেনা—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?

'আদিম দেবতারা' নামক বিখ্যাত কবিতাটির থেকে উদ্ধৃত এ চরণগুলির তাৎপর্য অনেক পাঠকের-ই চোখ এড়িয়ে যায়। 'নির্জন দেবদারু দ্বীপ' ও 'নক্ষত্রে'র উল্লেখ 'সুচেতন' কবিতাটির ভাবানুষঙ্গ বহন করে আনে :

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁক
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা,
সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে,
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

মানবহৃদয় তথা সমাজ থেকে যে সু-চৈতন্য দূরনির্বাসিত, তাকে কবি 'নির্জন দারুচিনি বনানী' তথা প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের জগতে পুনরাবিষ্কার করেন। আবহমান মানবসত্তা যে তার-ই প্রেমে চিরপ্রাণিত 'বনলতা সেন' গ্রন্থের

কবিতাবলীর মৌল ভাব-প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্ধৃত চরণগুলিতে সেই কথাটিই অভিব্যক্ত। 'মহাপৃথিবী'র ধ্বস্ত আধুনিক পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কবি আহত বিমূঢ়তায় যেন প্রশ্ন করেন : পৃথিবীর মানুষীর রূপ তথা সৌন্দর্য কেন সেই নির্জন দেবদারু দ্বীপের (নিসর্গ ভুবনের) নক্ষত্রের (যা ধ্রুবতার প্রতীক) ছায়া চেনে না, অর্থাৎ এককথায়, সু-চেতনার প্রচ্ছায়ে আশ্রিত নয়। সৌন্দর্য ও মঙ্গলের চির অন্বয়ের প্রাচীন বেদনাই এখানে আধুনিক মানবের অভিজ্ঞতার নিকষে প্রতীকী কবিতার তির্যক উচ্চারণে অভিব্যক্ত। অনুরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে 'বনলতা সেন' গ্রন্থের 'সুদর্শনা' কবিতাটিও বিচার্য হলে গভীর অর্থময় হয়ে দেখা দেয়। আরো বহু অনুদ্ধৃত উল্লেখের সমর্থন পাঠককে জীবনানন্দের মধ্যপর্যায়ের কাব্যের অন্তিমপর্বে, অর্থাৎ 'মহাপৃথিবী'র কবিতালীর রচনাকালের শেষ পর্যায়ে, কবিমানসে প্রকৃতি-ভুবনের সৌন্দর্য ও শান্তি ফিরে পাবার অন্তঃশীল প্রত্ন-আকাঙ্ক্ষাটি স্পষ্ট করে।

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থ্ বা তৎপরবর্তী কবিতা কিন্তু এ সন্ধিপর্ব সুলভ দ্বিধা বা দ্বিচারণা থেকে মুক্ত। নৈসর্গিক অভিকর্ষের বাইরে, সমকাল ও প্রতিবেশের অগ্নিপরিধির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে জীবনানন্দের কাব্য-জীবনের এ উনশেষতম পর্যায়, দুই বিশ্বমহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী ও সমসাময়িক তাঁর কাব্যে, যার কিছুটা সংকলিত 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) ও 'বেলা অবেলা' (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে। এসব রচনায় নিসর্গ জীবনের শান্তি, সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার প্রসঙ্গ তিরোহিত। পরিবর্তে এসেছে ভয়াল অন্ধকারময় এ নাগরিক জগৎ, যেখানে মানুষের সংকটময় জীবন কেবল-ই জেগে ওঠে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে', যেখানে 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো' অস্তিত্বে নিমজ্জিত মানব সভ্যতার স্মরণীয় উত্তরাধিকারের দিকে তাকিয়ে দেখে 'সেইসব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু'—যেখানে 'হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে'। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের অজস্র অনুরূপ উল্লেখ এক সমাচ্ছন্ন অন্ধকার, সভ্যতার জান্তব অধঃপতন ও মূল্যবোধ-বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবহ। এ পরিব্যাপ্ত মূল্যবোধহীনতা ও বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে 'সাতটি তারার তিমির' চিত্রকল্পটি অর্থবহ হয়ে ওঠে। 'সাতটি তারা' আমাদের মনে আনে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অনুষঙ্গ, যা চিরকাল অন্ধকার রাত্রিতে, সমুদ্রে, বিপর্যয়ের ঘনঘটায় মানবকে দেখিয়েছে পথ। তেমনই যে সমস্ত মূল্যবোধের আশ্রয়ে মানুষের সমাজ এতকাল লালিত ও প্রাণিত হয়েছে, যুদ্ধ-অবলীন পৃথিবীর এ সংকট লগ্নে যে সবকিছুই আজ নির্দেশে ব্যর্থ, তাই নিরর্থক। সপ্তর্ষিমণ্ডল বা 'সাতটি তারা' আজ আর আলোকদেশি নয়, তিমিরাচ্ছন্নতায় অবলীন। স্বাভাবিকভাবেই এ আবিশ্ব ঘোর অমানিশায় পথভ্রষ্ট মানবিক পৃথিবীতে প্রেম ও প্রকৃতির ভূমিকা গৌণ ও অনুল্লেখ্যপ্রায় হয়ে পড়েছে, জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্য রচনায় সেই প্রেম ও প্রকৃতিই কিন্তু বারংবার আবির্ভূত হয়েছে প্রেরণা ও শুভচেতনার কল্যাণ-ভূমিকায়। এ প্রসঙ্গে কবি নিজে মনে করেছেন তাঁর 'শেষের দিকের কবিতায়' 'পারিপার্শ্বিক-চেতনা' 'প্রৌঢ় পরিণতি' লাভ করেছে। সেই পারিপার্শ্বিক অবশ্যই সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে।

'সাতটি তারার তিমির' ও তৎপরবর্তী কাব্যের আলোচনায় এ দিক পরিবর্তন ও কালপ্রেক্ষিত বিস্মৃত হওয়া যায় না। এ সময়কার কাব্যে প্রেমের ভূমিকা নির্ণয়ে আগ্রহী

পাঠক কবিকে বলতে শোনেন, 'প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে' কিংবা 'প্রেমিককে শিখায়েছি ফাঁকির কৌশল'। প্রেমের দিব্যপ্রেরণা, তার মূল্যমহিমার এ অপহ্নব, 'আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে জেনে' সপ্রতিভ রূপসীর মতো 'বিচক্ষণ' করে তুলেছে; তারা যে কোনো 'রাজার কাজে উৎসাহিত নাগরের তরে'। এক দিৎসাহীন প্রেমবিবিক্ত অন্ধকার আধুনিক পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে 'অচল অভ্যাসের ভিতর' চেতনা ও বিবেক হারিয়ে যেতে দেখে কবির মতন পাঠকও যেন বলে ওঠেন : 'প্রেম নেই/প্রেমব্যসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে'। 'সাতটি তারার তিমির' তাই বীতপ্রেম বিশ্বাসরিক্ত আধুনিকের মনের ছবিটিই প্রবলভাবে এঁকেছে। কখনো ক্ষীণ বিদ্যুৎ-দীপ্তির মতো হয়তো বা শোনা যায় প্রেমের প্রত্যয় ও স্বপ্ন ফিরে পাবার ব্যাকুল আহ্বান : 'কোথায় প্রেমিক তুমি দীপ্তির ভিতরে'। লক্ষণীয়, 'দীপ্তি' শব্দটি এখানে কীরকম অর্থবহভাবে সুপ্রযুক্ত। শুধুমাত্র জ্যোতি বা আভা নয়, শব্দটির উদ্দিষ্ট অভিধা এখানে উদ্দীপ্তি বা প্রেরণার ইঙ্গিত নিয়ে আসে, যে প্রেরণা, কবি তাঁর ইতিহাসবেদী প্রজ্ঞায় জানেন, প্রেম-ই ফিরিয়ে দিতে পারে অবিশ্বাসী মানবসমাজকে। এ উপলব্ধির আলোকে যখন 'দীপ্তি' ও 'জনান্তিকে'' কবিতা দু'টি পড়া যায়, তখনই তারা উন্মোচিত হয় তাৎপর্যে। 'জনান্তিকে' কবিতাটির আরম্ভে রয়েছে এক প্রেমবিবিক্ত অন্ধযুগের উদ্‌ভ্রান্ত মানব-অভিজ্ঞতার কথা; মানুষের চেতনার গভীরে তবু নিহিত রয়েছে এক শুভ প্রেমবোধ :

তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই তুমি
আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।

আধুনিক মানবের বিপন্ন অভিজ্ঞতার ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেছেন, মেশিন ও মেশিনের দেবতার জোরে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে নিতে গিয়ে তবু মানুষ এখনো বিশৃঙ্খল। যুদ্ধ-আলোড়িত পৃথিবীতে কোথাও নেই সান্ত্বনা ও শান্তির নীড়। এ রিক্ততা ও উদ্‌ভ্রান্তির মূলে কিন্তু আছে জাতি ও নেশনের প্রতিভূদের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিবেকবর্জিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তার থেকেও যা বড় মর্মঘাতী, সেই আধুনিক মানুষের যান্ত্রিক জীবনচর্যা আর হৃদয়হীনতা। তাই 'মানুষের হৃদয়কে না জাগালে', প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেম ও সৌন্দর্যের 'সুনিবিড় উদ্বোধনে' জাগরিত করতে না পারলে মানবতার মুক্তি নেই; মুক্তি নেই মানুষের অন্তর্লোকের চির মানবের :

মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল বলে
আজ তার মানবকে কী করে চেনাতে পারে কেউ।

চারদিকে রণরক্ত, মৃত্যু ও অন্ধ উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে জীবনানন্দ অনুভব করেন 'আরো এক আভা', যা আমাদের 'এ ধৃষ্ট শতাব্দীর, হৃদয়ের জিনিস না হয়েও চিরন্তন মানবতার 'হৃদয়ের নিজের জিনিস' হয়ে রয়ে গেছে। সংস্কার, গ্রন্থ বা বিজ্ঞানের কাছে

নয়, মানুষকে ফিরে যেতে হয় মানব-হৃদয়ের সেই শাশ্বত প্রেমবোধের উদ্দীপ্তি বা প্রেরণার-ই কাছে শুভ ও শান্তির প্রত্যাশায়। প্রেয়সী নারী হয়ে ওঠেন যেন তার-ই প্রতিভূ ও প্রতীক :

অপর নারীর কণ্ঠ তোমার নারীর দেহ ঘিরে
অতএব তার সেই সপ্রতিভ অমেয় শরীরে
আমাদের আজকের পরিভাষা ছাড়া আরো নারী
আছে। আমাদের যুগের অতীত এক কাল
রয়ে গেছে।

'জনান্তিকে' কবিতার এ 'আদি নারী শরীরিণী' যাকে কবি 'মানবের হৃদয়ের ভাঙা নীলিমায়' কিংবা 'বকুলের বনে অপার রক্তের ঢলে'র মধ্যেও চির জীবিতের মতো আবিষ্কার করেছেন, 'দীপ্তি' কবিতাটিতে তাকেই আবার পাঠক দেখেন সাম্প্রত ও শাশ্বতের অন্বয়ের পটভূমিতে : 'তুমি যত বহে যাও/আমি তত বহে চলি/তবুও কেহই কারো নয়'। এ অন্বয়ের পশ্চাদ্‌ভূমিতে রয়েছে বিশ্ব-সংকট ও মূল্যবোধের বিপর্যয় : 'কলকাতা থেকে দূর/গ্রীসের অলিভবন' 'রক্তের সমুদ্রে' যখন একাকার এবং অগণন মানুষের নিরন্তর মৃত্যুর ঘটনাও যখন 'ব্যাসনের মতো মনে হয়', তখন মৈত্রেয়ীও ভূমার চেয়ে 'অন্নলোভাতুর' হয়ে দেখা দেন। তবুও এ গ্লানি-অবলীন সাম্প্রতের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকের দিৎসাহীন অনিশ্চিতির মধ্যেও মানুষের অন্তর্লোকের মানব তার চেতনায় অনুভব করে :

'তবু এক দীপ্তি রয়ে গেছে'।

'সাতটি তারার তিমির' বা এ পর্যায়ের কাব্য সৃষ্টির চেতনা পটভূমিটির উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। যে অন্ধ দেশকালে মানুষ কেবলি জেগে উঠেছে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে', সেখানে সমাজ চাইছে সকলের কাছ থেকে নিরন্তর 'তিমির বিদারী অনুসূর্যের কাজ'। যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে মূল্যবোধের ব্যাপক বিনষ্টিতে যখন ঘরে ও বাইরে নিরন্তর তমসা এবং সেই ভীষণ অমার উৎস শুধু বহির্জাগতিক বিপর্যয়-ই নয় ('এই দিকে ঋণ, রক্ত লোকসান, ইতর, খাতক'),[২৩] মানবের হৃদয় থেকে 'মহৎ সত্য বা রীতি' অর্থাৎ, সব মূল্যবোধের অন্তর্ধান, যার পরিণামে বিশ শতকী মানুষের নাগরিক বাসভূমি হয়ে যায় 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো,[২৪] এবং কবি অনুভব করেন, সত্যদ্রষ্টার মতো, সভ্যতার এই জান্তব অধঃপাতের পেছনে আছে 'হৃদয়বিহীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস,[২৫]। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে যে নিরন্ধ্র তিমিরাচ্ছন্নতার সম্মুখীন হন জীবনানন্দের পাঠক, তা প্রতিবেশজাত এবং সমকালবদ্ধ। কবি এ অমারাত্রির উৎস দেখেছেন মানুষের-ই অধঃপতিত 'ইতিহাসবিবর্ণ' হৃদয়ে—'বেবুনের রাত্রি নয় তার

২৩. 'নাবিকী' : সা, তা, তি,।
২৪. 'রাত্রি' : সা, তা, তি।
২৫. 'সূর্যপ্রতিম' : সা, তা, তি।

হৃদয়ের রাত্রির বেবুন'[২৬]। কিন্তু যুগতমসা ও বীতবিশ্বাস উদভ্রান্তি থেকে মানবের অন্তর্লোকের প্রেমবোধ-ই যে মুক্তির পথ দেখাতে পারে, এ কথাটিও বারম্বার উচ্চারিত হয়েছে জীবনানন্দের শেষ পর্যায়ের কাব্যরচনায়, কিছুটা ক্ষীণ ও বিক্ষিপ্তভাবে 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে, প্রবলতরভাবে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় এবং একেবারে অনন্য নিরপেক্ষভাবে তাঁর শেষতম রচনাসম্ভারে। প্রেমের শক্তি ও প্রেরণায় এ আস্থাশীলতা 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের কাব্যের প্রবল বিবমিষা, বিদ্রূপ ও উদ্‌ভ্রান্তির বিপরীতে কবিচেতনার অন্তঃশীল মৌল আস্তিকতার প্রতিই সংবেদনশীল পাঠকের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে।

'সাতটি তারার তিমির'-এর নাগরিক জগৎ ভাব ও আবহে যেমন জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির পূর্ব-পর্যায়ের শান্ত নির্জন প্রকৃতি-ভুবন থেকে দূরস্থিত, তেমনই প্রেমও এ জগতে তার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও মহিমা থেকে স্খলিত হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রন্থের প্রারম্ভিক কবিতা 'আকাশলীনা'র নায়িকা সেই 'পৃথিবীর বয়সিনী', প্রেমস্বরূপা 'সুরঞ্জনা'কে কবি দেখেন যুবকের বাহুলগ্না, দূরাপসৃয়মানা। স্পষ্টতঃই যুবক এখানে দেহী বাসনার, জৈব জীবনের প্রতিভূ; 'সুরঞ্জনা' যুগাবলীন মালিন্যে অধঃপতিত মনে পড়ে 'বনলতা সেন' গ্রন্থে আমরা যে 'সুদর্শনা' নারীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, তিনি 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে' লীন হতে না দিয়ে তাঁর প্রেমিকের চেতনাকে করেছিলেন অমৃত সূর্যমুখী। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে সেই কবির-ই উপলব্ধিতে প্রেম মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মহিমাবিহীন, জৈব জীবন উপচারে পর্যবসিত। 'বনলতা সেন' কাব্যের ইতিহাস-উদ্বর্তিত চিরশ্রীময়ী 'সুরঞ্জনা'র হৃদয় তাই 'সাতটি তারার তিমির'-এর জীবনানন্দের কাছে 'ঘাস', ইতর প্রাণের খাদ্যবস্তু হয়ে দেখা দেয়। এ গ্রন্থের অন্তিম কবিতা 'সূর্যপ্রতিম'—সেখানেও যুগের যন্ত্রণাহত মানবচেতনার নিকষে প্রেমের অবমূল্যায়নের অভিব্যক্তি—'প্রেমিককে শিখায়েছি ফাঁকির কৌশল। শেখাইনি?'[২৭] শতাব্দীর যুদ্ধধ্বস্ত সামাজিক ভূখণ্ডে মূল্যবোধবিবিক্ত নাগরিক দুনিয়ায় 'মুর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম'ই স্বাভাবিক। তাই 'নিবিড় রমণী' তার 'জ্ঞানময় প্রেমিকে'র খোঁজে, 'অনেক রক্তমলিন পথ' হেঁটে 'আজ এই সময়ের পারে' খুঁজে পায় 'আবহমানের ভাঁড়'কে।[২৮] জ্ঞানও প্রেমের যে শুভ অন্বয় বা মিলনের স্বপ্ন ও নির্মাণ জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্যে অভিব্যক্ত, 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যায়ের রচনায় তাদের ব্যবচ্ছেদ ও অন্বয়ের যন্ত্রণা-ই প্রধান।

প্রেমের এ অবনমন ও নিরর্থকতার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দের একালের কাব্যে তমসার আধিপত্য। কারণ, নারীকে জীবনানন্দ বারবার দেখেছেন জ্যোতি স্বরূপ—প্রেমের আন্তরমূল্যেই নারীকে ঘিরে এ উদ্ভাসনা, এ আলোকদেশিতা। তাঁর 'সুরঞ্জনা' ('বনলতা সেন') 'দেহ দিয়ে ভালোবেসে' তবু 'ভোরের কল্লোল' হয়ে ওঠেন; তার

২৬. 'উন্মেষ' : সা, তা, তি।
২৭. 'সূর্যপ্রতিম' : সা, তা, তি ; পৃঃ—৭৯।
২৮. 'উন্মেষ' : সা, তা, তি,; পৃঃ—২৪।

আলোকদেশি আহ্বান কোনো একদিন ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রকে যেমন, তেমনই অন্ধকার সমুদ্রের অন্বেষাক্লান্ত মানবকে, যুগ যুগে নবসভ্যতার উদয়সৈকতে ডেকে নিয়ে আসে। তাঁর 'মিতভাষণ' কবিতার নায়িকার হাতে সেই 'মণিকা-আলো', যা 'শ্রেয়তর বেলাভূমি'তে নাবিককে আহ্বান জানায়। 'শ্যামলী' বা 'মিতভাষণ'-এর নায়িকার মুখশ্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিকে ব্যবহার করতে হয় 'প্রতিভা' শব্দটি, যা অভ্রান্তভাবেই বিভার ঔজ্জ্বল্যের দ্যোতক। আর 'সবিতা'র নায়িকার মুখ স্পষ্টতই 'অন্ধকার থেকে এসে নবসূর্যে জাগার মতন' বলে কবির কাছে মনে হয়েছে।

এভাবে জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্য সৃষ্টিপটে নারী বার বার আবির্ভূতা এক উজ্জ্বল আলোকবৃত্তে। এ আলো অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে, প্রযাণের পথ-নির্দেশী; সে প্রয়াণ ইতিহাসবেদে জারিত প্রেমচেতনার আলোকে, অথবা যেমনটি জীবনানন্দের পাঠক জানেন, নব সভ্যতার শ্রেয়তর বেলাভূমির অন্বেষায়। স্বভাবতই আলোক-মহিমাময়ী প্রেরণাদাত্রী ও সভ্যতার ধাত্রী এ জীবনানন্দীয় নারী 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে অনুপস্থিত। কারণ, এ কাব্য সমাচ্ছন্ন আঁধারের কাব্য—যেখানে পৃথিবী প্রতিভা হয়ে আকাশের মতো শুভ্রতাকে' চেয়ে শেষ পর্যন্ত 'ভঙ্গুর হয়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায়'। তবু এখানেও কবির চেতনালোক থেকে সেই 'আদি শরীরিণী নারী' সম্পূর্ণ নির্বাসিত নন। কবি গভীর বিস্ময়ে টের পান, প্রেম এখনও এ পৃথিবীতে রয়ে গেছে। 'দীপ্তি' ও 'জনান্তিকে' এ দু'টি কবিতাই এ প্রসঙ্গে আবার স্মর্তব্য। তবে প্রেম তথা নারী 'সাতটি তারার তিমির'-এ ঈপ্সিত ভূমিকায় অবতীর্ণ নয়—প্রেমের সেই প্রাচীন প্রেরণাশক্তির অন্তর্ধান-ই বরং প্রকটতর। এর একটি কারণ ইতিহাসবেদী চেতনার আলোকে স্বকাল ও প্রতিবেশে নিবদ্ধ কবি জেনেছেন : 'তিমির হননে' অগ্রসর হয়ে আমরা আজ 'তিমিরবিলাসী' বলেই 'কোথাও দিৎসা নেই', 'প্রেম নেই'। পুনরাবৃত্তির মতো শোনালেও বলতে হয়, জীবনানন্দ প্রেমের দিব্য-প্রেরণার শক্তিতেই যুগ-বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও সম্পূর্ণ আস্থাভ্রষ্ট হতে পারেন নি :

> চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনো ভোরের জনান্তিকে
> চোখে থেকে যায়
> আরো-এক আভা :
> আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর
> হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজের জিনিস,
> হয়ে তুমি রয়ে গেছ![২৯]

এখানে সচেতন পাঠককে লক্ষ্য করতে হয়, নারীর প্রেম-প্রতিমা ঘিরে 'আভা'; তাঁর আবির্ভাবের পটভূমি ভোরের আলোকলগ্ন। জীবনানন্দের চেতনায় প্রেম তাই সর্বদাই এক আলোকবৃত্তের অনুষঙ্গে সৌন্দর্য ও পবিত্রতার মেলবন্ধনে আবির্ভূত। প্রেমকে কেন্দ্র করে নারীর রূপ-বর্ণনায় কবি 'আভা' 'দীপ্তি', 'প্রতিভা'র মতো

২৯. 'জনান্তিকে' : সাতটি তারার তিমির।

ঔজ্জ্বল্যদ্যোতক শব্দগুলিকে বেছে নিয়েছেন। যা আলোকদেশি, তা-ই তিমির হন্তারক। তাই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ নারীকেই জীবনানন্দ 'তিমির-পিপাসী' রমণীর চিত্রকল্পে অঙ্কিত করেছেন 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে। তিমিরপিপাসী নারী-প্রেয়সীকে হারিয়ে নাবিক-মানবতা আজ পথভ্রান্ত; সভ্যতার প্রয়াণ ও উত্তরণও তাই যেন স্তব্ধ,

পরবর্তী গ্রন্থ 'বেলা অবেলা কালবেলা'র [রচনাকাল ১৯৩৪-১৯৫০ বলে গ্রন্থে উল্লিখিত হলেও কবিতাগুলির আন্তরসাক্ষ্যে] কালপ্রেক্ষিত মনে হয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত অগ্নিমুহূর্ত নয়, এক উত্তর-সামরিক অধ্যায়, যেখানে বহির্জাগতিক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিপর্যস্ত মানব-চেতনা নির্মাণ ও সৃজনের মৃত্যুহীন শক্তিগুলি চিনে নিতে, সংঘবদ্ধ করে নিতে চাইছে। স্বাভাবিকভাবেই মানব-হৃদয়ের দুর্মর প্রেমবোধ, যা জীবনানন্দের কাব্যে চিরদিন-ই সৃজনের প্রতীতি ও উৎসবের প্রতীকে অভিব্যক্ত, এ গ্রন্থে আরো প্রবল ও প্রয়াণমুখী ভূমিকায় উপস্থিত। প্রেমের আধারস্বরূপা প্রেয়সী নারীও অঙ্কিত হয়েছেন সৃষ্টির প্রেরণাদাত্রী ও সভ্যতার ধাত্রীর আলোকদীপ্ত দ্বৈত ভূমিকায়। তবে এখানেও জীবনানন্দ সমসাময়িককালের তিমিরাচ্ছন্ন রক্ত-অবলীন রূপটিকে বিস্মৃত হননি, উপেক্ষা করতে পারেননি। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে প্রেমের মূল্যমহিমা খণ্ডিত, দেশকালের আপাতিক দৌরাত্ম্যে অধঃপতিত। 'বেলা অবেলা'য় সেই প্রেম যেন ইতিহাসচেতনার সঞ্জীবনে তার সনাতন কল্যাণশক্তিতে কিছুটা পুনরুজ্জীবিত। 'বেলা অবেলা'র মুখবন্ধী কবিতায় ঘোর তমিস্রার মহাবিশ্বপটে একটি পবিত্র নারীবোধনের সুর অনুরণিত; জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল আলোকবৃত্তের মতো সৃষ্টির নিদ্রাহীন ধাত্রীর ভূমিকায় আবিষ্কৃত হয়েছেন শাশ্বত মানব-প্রেয়সী :

> মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
> মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছে তার প্রতি
> লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
> দেহ হবে মন হবে তুমি হবে সে সবের জ্যোতি।[৩০]

এ মূল সুরটি গ্রন্থের অন্যান্য কবিতাতেও প্রতিধ্বনিতে। 'তোমাকে' কবিতাটির সমকালীন অবক্ষয়ের চিত্রে বিচ্ছিন্নতা ও বিনাশের অপশক্তিগুলিই সক্রিয় ('প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো')। তবু তার-ই মধ্যে কবি নারীকে চেনেন 'ইতিহাসের শেষে' এসে 'মানব-প্রতিভার নিষ্ফলতার অক্ষম অন্ধকারে' এক মৃত্যুহীন সৌন্দর্যদীপ্তির পরিচয়ে :

> মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালবেসে
> বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

'মানবকে নয়, নারি'—কথাগুলি লক্ষণীয়। সমকাল ও যুগপ্রতিবেশবদ্ধ মানবকে জীবনানন্দ দেখেছেন ঐতিহ্যবিস্মৃত ('ব্যর্থ উত্তরাধিকারে'), মানবতা বর্জিত ('রক্তনদীর

৩০. 'মাঘ সংক্রান্তির রাতে' : বেলা অবেলা কালবেলা।

পারে') এবং জৈব জীবনে অধঃপতিত ('ক্রম-পরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী')। পৃথিবীকে যখন 'বলয়িত মরুভূমি' বলে কবির মনে হয়েছে এবং ইতিহাসবোধের মধ্যেও যখন তিনি বাণী খুঁজে পাননি, বরং 'মৃতোপম মানুষের ভিড়' থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি নারীর মধ্যেই পেয়েছেন স্থির শুভ প্রেরণার আশ্বাস ও উদ্দীপ্তির বাণী :

মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন :
আমি যাকে ভালবেসেছি আবহমান কাল সেই নারীর।

আমার পূর্ব-বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, 'সাতটি তারার তিমির'-এর নিরন্ধ্র আঁধারে আবৃত পৃথিবী কবির প্রেমচেতনার আলোকে প্রয়াণের পথ খুঁজে পায় যেন 'বেলা অবেলা কালবেলা'-এর জগতে পৌঁছে—

যে নারী দেখেনি কেউ—ছ'সাতটি তারার তিমিরে
হৃদয়ের এসেছে সেই নারী।.....
সৃষ্টির গভীর গভীর হংসীপ্রেম
নেমেছে—এসেছে আজ রক্তের ভিতরে।[৩১]

'খণ্ডিত রক্তবণিক পৃথিবীতে' 'অন্ধকারে যে শরণ সবচেয়ে ভালো' ,সেই শরণ-ই বেছে নিয়েছেন জীবনানন্দ, আর তা' হল : 'যে প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো'।[৩২] এ জ্ঞানসিঞ্চিত প্রেম-ই প্রয়াণের শক্তিতে বলীয়ান, কারণ এ প্রেম-ই মানুষকে জানায় 'মানব ক্ষয়িত হয়না জাতি ব্যক্তির ক্ষয়ে' এবং খণ্ড সময়ের আপতিত আঁধারের আধিপত্য ভেঙে পৃথিবীতে বার বার 'জ্যোতির তারণ কণা আসে'। প্রেমেই এ পৃথিবীতে নিয়ে আসে বার বার 'ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি'।[৩৩] এভাবেই একটির পর একটি কবিতায় আশ্চর্য অর্থ-গভীর সব উচ্চারণ ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে সভ্যতার প্রয়াণে ইতিহাসের প্রেমপ্রাণিত ভূমিকার কথা জীবনানন্দ তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যের উপান্ত পর্বে। স্বকাল চিহ্নিত অভিজ্ঞতায় 'আদি নারী শরীরিণী' প্রেমকে কবি নতুন করে চেনেন :

অন্ধ অন্ধকার তুষারপিচ্ছিল এক শোণ নদীর নির্দেশে।
সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
স্বর্গীয় শিখার মতো,
সকল সময় স্থান অনুভবলোক অধিকার করে সে তো থাকবে
এইখানেই,
আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে। ('সময়ের তীরে')

৩১. 'অনেক নদীর জল' : বেলা অবেলা
৩২. 'যতদিন পৃথিবীতে' : বে. অ. কা.।
৩৩. 'অনেক নদীর জল' : বে. অ. কা।

লক্ষ্য করা যায়, এ কবিতায় নারী জেগে উঠেছেন মানবের 'অনুভবলোকে', জেগে উঠেছেন ক্লিন্ন পার্থিব অভিজ্ঞতার ঘর্ষণ থেকে ('মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে') এক 'স্বর্গীয় শিখার মতো' এবং তাঁকে ঘিরেই আজ আমাদের এ কঠিন পৃথিবীতেও এক চিরন্তন স্বপ্নময়তা ('নীল' ও 'স্বর্গীয়' দু'টি সুনির্বাচিত বিশেষণেই জীবনানন্দ চিনিয়ে দিয়েছেন নারীর স্বকাল-অতিক্রমী অনৈহিক চরিত্রটি)।

'সাতটি তারার তিমির'-এর পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যসৃষ্টিতে প্রেম-ই প্রবলতম বিষয় হিসেবে আবির্ভূত, যদিও কখনো কখনও কবির দৃষ্টি প্রত্যাবর্তিত স্মৃতি, নির্জনতা ও সর্বোপরি প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের অনুষঙ্গময় প্রকৃতিলোকে। নিবিষ্ট পাঠক আরো অগ্রসর হয়ে কবির অন্তিমতম কবিতাবলীতে পৌঁছালে আবিষ্কার করবেন মানবীয় প্রেমের হৃদয়মূল্য এবং নৈসর্গিক প্রশান্তির সমাহারে এক নবজায়মান 'আলোক পৃথিবী'। কবিচেতনায় সে সংকল্পনা আন্তরিক প্রত্যয়ের শক্তিতে ও মন্ত্রকল্প ভাষার ধ্বনিময়তার প্রসাদে উজ্জ্বল বিগ্রহরূপ ধারণ করেছে। সেসবের পর্যালোচনার আগেই 'বেলা অবেলা'র চেতনা-গোধূলি উজ্জ্বল হয়েছে কবি-মানসে প্রেমের ইতিহাসপ্রাণিত প্রেরণার আবির্ভাবে। মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন, 'বেলা অবেলা' বা তৎপরবর্তীকালের কাব্যেও ব্যক্তিগত প্রেমের বিশ্বাসযোগ্যতার উত্তাপ অনুপস্থিত বা অস্বীকৃত হয়নি; তবে ব্যক্তিক উপলব্ধির খণ্ডিত সীমায় কবির প্রেমবোধ আবদ্ধ থাকেনি, আত্মস্থ হয়েছে ইতিহাসবেদী চিরমানব-চেতনার ঐতিহ্যে। তাই 'এই পৃথিবীর সাটিনপরা দীর্ঘগড়ন' কোনো নারীকে দেখে কবির মনে হয়, 'সকল অলাত ইতিহাসের হৃদয় ভেঙে বৃহৎ সবিতা'র মতো সে আত্মপ্রকাশিত অথবা অন্যত্র :

> কোথাকার মহিলা সে? কবেকার? ভারতী নর্ডিক গ্রীক
> মুশ্লিম ও মার্কিন?

অর্থাৎ, সময় তাকে সনাক্ত করে না আর, ('অবরোধ'/বে.অ.কা.) বলেই দেশ-কাল-নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন চিরন্তনতায় ব্যক্তিগত প্রমানুভূতির তাৎক্ষণিক সীমারেখাগুলি অতিক্রান্ত হয়ে যায়, এবং অনন্তকালের পটে অপরাহত আলোকবৃত্তের মধ্যে নারী এসে দাঁড়ান উদ্দীপ্তি ও প্রয়াণের বাণী বহন করে :

> নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
> একটি মুহূর্ত যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্ক জগতে।[৩৪]

পঙ্‌ক্তি দু'টি মনে করিয়ে দেয় ব্রাউনিঙের সেই 'The instant made eternity' প্রত্যয়টির কথা। ব্রাউনিঙে যেমন, জীবনানন্দের কবিতাতেও তেমনি, এ-জাতীয় উচ্চারণ ফিরে ফিরে এসেছে; পাঠক দেখতে পারেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র 'জীবন' কবিতাটি।

'সাতটি তারার তিমির'-এর মুখবন্ধী কবিতাটিতে অপসৃয়মানা এক নারীর প্রতীকেই জীবনানন্দ আমাদের জানিয়েছিলেন সমরোত্তর নাগরিক পৃথিবীতে প্রেমের

৩৪. 'সূর্য নক্ষত্র নারী' : বেলা অবেলা কালবেলা।

অবক্ষয় ও অধোগতির কথা। তবে 'ধৃষ্ট' স্বকালের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়েও তিনি ভুলতে পারেননি কুয়াশা ভেদ করে 'সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে' এগিয়ে যাওয়া এক অনন্যা নারীকে। সেই সূর্যপ্রতিভ প্রেরণাময়ী নারীকে জীবনানন্দ বার বার আহ্বান জানিয়েছেন প্রথমাবধি, এবং অন্তিম পর্যায়ের কাব্যেও। 'বেলা অবেলা'র কবি প্রেমচেতনার সেই নবীন বিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করেছেন অজস্র কবিতায়। এ নবাঙ্কুরিত প্রেম 'ইতিহাসবেদে' 'আশ্রিত ও পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানে' শীলিত হয়েই দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। সে উৎক্রান্তি ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির আন্তরিকতা আত্মস্থ করেই ঘটেছে। সময়াতীতের বোধে ও উত্তর-ব্যক্তিক অন্বিষ্টপ্রবণ অনৈতিকতার স্পর্শে লৌকিক প্রেম-ভাবনা থেকে জীবনানন্দ পাঠককে নিয়ে যান লোকোত্তর 'প্রেমচেতনায়। 'সকল প্রতীতি উ'সবের চেয়ে বড়' কোনো ভূমিকায় তিনি নারীকে চিনতে পারেন বলেই শুধুমাত্র 'মিলন ও বিদায়ের প্রয়োজনে' প্রেয়সী নারীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। অখণ্ড কাল ও মানবেতিহাসের মহাবিশ্বপটে তিনি নারী তথা প্রেয়সী তথা প্রেমের শক্তি উপলব্ধি করেন আপন চেতনায় :

> তুমি তো জাননা, তবু, আমি জানি, একবার তোমাকে দেখেছি
> পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
> শেষনাগ ছিল, নেই, বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
> নিভে যায়, মানুষ অপরিজাত সে অমায়, তবুও তাদের একজন
> গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায়।[৩৫]

সেই অভিজ্ঞান সাময়িকতা ও ব্যক্তিক প্রয়োজনের দাবী সীমারেখার বাইরে নিয়ে আসে কবির প্রেম চেতনাকে :

> সুপার কালের স্রোতে না পেলে, কী করে তবু, নারি,
> তুচ্ছ, খণ্ড, অল্পসময়ের স্বত্ব কাটায়ে অঋণী তোমাকে কাছে পাবে,[৩৬]

উদাহরণ বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। 'মাঘসংক্রান্তির রাতে' 'তোমাকে', 'অনেক নদীর জল', 'সূর্য নক্ষত্রনারী', 'অবরোধ', 'উত্তর সামরিকী', 'নারীসবিতা' 'গভীর এরিয়েলে'— একটির পর একটি কবিতায় ইতিহাসবেদে অন্তর্দীপ্তি প্রেমের প্রয়াণোজ্জ্বল কালাতীত ভূমিকাই উপজীব্য। প্রেম এক 'তিমির-বিদারী' অভিজ্ঞতা; প্রকৃতির বিকীর্ণ শক্তিগুলির মতো প্রেমও এক অবিনাশী সত্তায় বিরাজমান। জীবনানন্দের কাব্যের অভিনিবিষ্ট পাঠকের কাছে এ বক্তব্য অপরিচিত নয়। কারণ, সেই 'বনলতা সেন' পর্যায় থেকেই জীবনানন্দ নারী ও নিসর্গকে শুধুমাত্র প্রথাসিদ্ধ পটভূমিগত সামীপ্যের পরিবর্তে আন্তরমূল্যের সততায় উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তী ও উত্তরকালীন কাব্যরচনার কালে জীবনানন্দের চেতনাভূমি থেকে আপদকালীন বিমূঢ়তায় অপসৃত হয়েছে নিসর্গের প্রশান্তি ও নারীর কল্যাণ-সুন্দর ধ্রুবতার আদর্শ। কিন্তু এ অপসৃতি দীর্ঘ বা স্থায়ী হয়নি।

---

৩৫. 'সূর্য নক্ষত্র নারী'; এক : বেলা অবেলা।
৩৬. 'সূর্য নক্ষত্র নারী'; দুই : বেলা অবেলা।

'সাতটি তারার তিমির'—'বেলা অবেলা'র (১৯৩৪-১৯৫০) পরবর্তী পর্বে নারী তাঁর সমুজ্জ্বল মহিমায় প্রত্যাবর্তিত হয়েছেন প্রবলভাবে, কবিতার পর কবিতায় :

> জ্বলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে দেখেছি
> শুনেছি বিরাট শ্বেত-পাখি সূর্যের
> ডানার উড্ডীন কলরোল
> আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠেছে।[৩৭]

এই সেই চিরদীপ্তিময়ী নারী, যাকে ঘিরে 'অপার আলোকবর্ষ'; তিমির-পিপাসী অগ্নিপরিধির মধ্যে যাঁর দৈবী সাক্ষাৎ একদা কবিকে জানিয়েছিল 'অমৃতসূর্যে'র 'আহ্বান'। 'বেলা অবেলা'য় এ শাশ্বতীর আবির্ভাব 'বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল প্রাণনে', এ কথা ঠিক। তবে তা ছিল বিদ্যুতের-ই মতো, আবির্ভাবে আকস্মিক ও অস্থায়ী। সংশয়, হতাশা ও দিশাহীনতার যে তিমিরে সমাজ ও রাষ্ট্রের মতো কবির চেতনাও উদভ্রান্ত ছিল 'সাতটি তিমির' এবং 'বেলা অবেলা' পর্বে, প্রেমের আলোকদেশি প্রত্যয়ের নবজাগরণেই তার থেকে উজ্জ্বল উদ্ধার যেন সম্ভব হয়ে ওঠে। কবির কাব্যের এ দিক পরিবর্তনের পাশাপাশি আরেকটি প্রসঙ্গও লক্ষণীয় : প্রেমের উজ্জ্বল পরাক্রান্ত আবির্ভাবের জন্য পাঠককে অপেক্ষা করতে হয় জীবনানন্দের উত্তরপঞ্চাশী (১৯৫০ পরবর্তী) কবিতাবলীর জন্য, যার সিংহভাগ কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত (এবং ইদানীং 'আলোপৃথিবী' সঙ্কলনটির অন্তর্ভুক্ত)। নিসর্গের নিঃশব্দ পুনরাধিষ্ঠান একালের রচনাতেই ঘটেছে। নারীকে জীবনানন্দ 'উজ্জ্বল পাখিনী', 'বনহংসী', 'সৃষ্টির মরালী'র চিত্রকল্পে অধিষ্ঠিত করেছেন। কখনো তাকে 'জলের উৎসারণের মতো', কখনো 'আভা আলো শিশিরের মতন' নিসর্গের নানা অনুষঙ্গে চিনেছেন। 'মহাপ্রাণের বৃক্ষে'র ওপর অধিষ্ঠিত এক 'উজ্জ্বল পাখিনীর' মতো এ নারীকে আরো পরিচ্ছন্ন প্রাণান্ত রঙে জীবনানন্দের পাঠক চিত্রিত হতে দেখেন কবির কাব্যসৃষ্টির শেষতমলগ্নে : 'একটি বৃক্ষে সময় মরুভূমি/লীন দেখেছে, গভীর পাখি গভীর বৃক্ষ তুমি'।[৩৮] অথবা "মহাপ্রাণের বৃক্ষ ও তার পাখি তো বারবার ভস্ম হয়ে জাগছে হরিৎ-নবহরিৎ আছে"।[৩৯] এ জাতীয় চিত্রকল্প অসংখ্যবার আবৃত্ত হয়েছে জীবনানন্দের শেষতম পর্যায়ের কবিতা-সংরচনায়। এ সময় তাঁর চিত্রকল্পের ও প্রতীকের প্রিয় বিষয়গুলি ছিল, নদী ও নীলিমা, সূর্য, বৃক্ষ ও পাখি; অন্য অর্থে জল, আলো ও নিসর্গ শ্যামলিমার এক উজ্জ্বল প্রেক্ষাপট। বিষয়গুলি সব-ই জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্যের পাঠকের কাছে পরিচিত ও প্রিয়। শুধু অন্তিম পর্যায়ের কাব্যে সেসব বিষয়ের নবীন সম্বন্ধের অর্থদ্যোতনাই কবির চেতনার সাম্প্রতিক, উদ্বর্তনটিকে পরিস্ফুট করে। সেই অন্তিমতম চেতনাবিবর্তনে এক নবীন সূর্যকরোজ্জ্বল 'আলো-পৃথিবী'র সংকল্পনাই অভিব্যক্ত; এবং নারী ও তার প্রেমান্বেষী মানবপুরুষ আছেন এ পৃথিবীর জ্যোতির্বলয় কেন্দ্রে।

---

৩৭. 'সময়ের তীরে' : বেলা অবেলা।
৩৮. 'সূর্য নিভে গেছে' : একক, ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৩৫৯।
৩৯. 'নবহরিতের গান' : একক, শারদীয়, ১৩৬০।

জীবনানন্দের কবি-মানসে প্রকৃতিচেতনার বিবর্তন প্রবাহে আমরা দেখেছি, যুদ্ধ-অবলীন পৃথিবীর বিপন্নতা, উদ্‌ভ্রান্তি ও নিরাশার বোধকে অতিক্রম করে তাঁর অন্তিম পর্যায়ের কাব্য পাঠককে আহ্বান জানিয়েছে নিসর্গের প্রশান্তি ও মানব-হৃদয়ের চিরন্তন ভালোবাসায় লালিত এক 'সুচেতনা'-ভাসিত আলো-পৃথিবীতে :

আমাদের পৃথিবীর পাখলী ও নীলডানা নদী
আমলকী জামরুল বাঁশ ঝাউয়ে সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন; হৃদয়কে সেখানেও করে না অবহেলা
বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি; শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি
নর-নারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে—
অশ্রু রক্ত নিষ্ফলতা মরণের খণ্ড খণ্ড গ্লানি
তাহলেও রবে; তবু আদি ব্যথা হবে কল্যাণী
জীবনের নবনব জলধারা-উজ্জ্বল জগতে।[৪০]

এ অনির্বচনীয় কবি-স্বপ্নের জগতেই আমাদের প্রেমচেতনার পর্যালোচনা পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে আসে চিত্রকল্পের অপ্রতিরোধ ভাবানুষঙ্গে :

সে সঞ্চিত মানবতা আজ প্রায় শূন্যে ফুরালো
অনুভব করে মানুষ তবুও
মৃত্তিকায় মূল রেখে লক্ষ্য রেখে আদি নীলিমায়
শ্যামল গাছের থেকে অবিনাশ ধর্ম শিখবে?
অথবা নশ্বর প্রেম ভালবেসে বসবে ছায়ায়।[৪১]

নিসর্গের অবিনাশী প্রাণ আর মানবিক প্রেমের আলোক উদ্বর্তনাই মানবকে দিতে পারে রক্তনদীর তীরে এ ধ্বস্ত পৃথিবীতে ধ্রুব জীবনের দিশা। তাই জীবনানন্দকে মন্ত্রোচ্চারণের পবিত্রতায় বলতে শুনি : 'মুখ থেকে রক্তের ফেনা/পায়ের নিচের থেকে ক্ষমতা যশের মরুভূমি/ফেলে দিয়ে হে হৃদয় কখন বসেবে/কয়েক মুহূর্ত নীল শ্যামল বৃক্ষের নিচে তুমি'।[৪২]

এ নিসর্গচ্ছায়ায় মানবচেতনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন জ্যোতিঃস্বরূপিণী সূর্যপ্রতিভ নারী, যার কথা আমরা এ যাবৎ আলোচনা করেছি :

যে নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনদিন কেউ
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়ালো
কবে যেন—আজকে হারিয়ে গেছে সব,[৪৩]

৪০. 'আলোপৃথিবী' : দেশ, কার্তিক; ১৩৬১।
৪১. 'বৃক্ষ' : দেশ, কার্তিক; ১৩১১।
৪২. 'বৃক্ষ' : ঐ
৪৩. 'দু'দিকে ছড়ায়ে আছে' : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় (নাভানা), গ্রন্থিত।

সভ্যতার সঙ্কটে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মূল্যবোধ-বিপর্যয়ে, এ 'নারীসবিতা'কে কবি সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেললেও ইতিহাসবেদী চেতনার প্রসাদে মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে তাকে চিরভাস্বর স্বরূপে আবিষ্কার করেন :

মনে হয় যেন কোন হরিতের—নব হরিতের
সঙ্গীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানুষের ভাষা
এ জন্মের আরো দূর জন্ম-জন্মান্তের মুখোমুখি ফিরে এসে
অনাদি আলোর ভালবাসা
সামাজিক অন্তহীন আকাশের নিচে
জ্বালিয়ে শ্যামলনীল ব্যথা হতে চায়।
আমি সেই মহাতরু লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
উঠে তুমি জাগিয়েছো অনাদির সূর্য নীলিমায়।[৪৪]

এ গম্ভীর মন্দ্র উচ্চারণে বোধনের পবিত্রতার সঙ্গে উপলব্ধির তীব্র আন্তরিকতা একাত্ম হয়েছে। কবির প্রেম-ভাবনা বৃক্ষের মতো দিব্য নীলিমার অন্বেষায় ঊর্ধ্বমুখী—লৌকিক প্রেমোপলব্ধির সত্যে সংযুক্ত হয়েছে বিশ্বজনীনতা ও লোকোত্তরতার ব্যঞ্জনা। বৃক্ষের প্রতীকটি এদিক থেকে সার্থক। মাটিকে আশ্রয় করে বৃক্ষের যে ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা, জীবনানন্দের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে মৃত্তিকা ও নীলিমা, পার্থিব ও স্বর্গীয়, জৈব ও আত্মিক-এর সহজ অন্বয়ের প্রতীকসূত্র।

জীবনানন্দের আদ্যন্ত কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত পাঠকের কাছে এ বৃক্ষটি সুপরিচিত। 'সুদর্শনা' কবিতাটিতে শুনেছি 'কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে', পঙক্তিটি যে দিব্যরমণীয়তার উদ্ভাস নিয়ে আসে পাঠকের মনে। 'লাবণ্যসাগর থেকে নিজে উঠে জাগানো মহাতরু'টি তারই আরো ব্যঞ্জনাগভীর বিকাশের সাক্ষ্য বহন করছে। বৃক্ষের অনুষঙ্গে, 'শ্যামল নীল' বা 'নবহরিৎ'-এর মতো শব্দের প্রয়োগে, প্রকৃতি লালিত জীবনচর্যার ইঙ্গিত; অন্যদিকে, পাখি, শ্বেতহংসী বা সৃষ্টির মরাল-এর চিত্রকল্পগুলি প্রয়াণ ও প্রাগ্রসরমানতার ভাববাহী। সূর্য, নক্ষত্র বা রৌদ্রস্বচ্ছল ভূখণ্ডের প্রতীকে উচ্চারিত এক নতুন পৃথিবী অন্বিষ্টের ব্যঞ্জনা। এ সবকিছুর কেন্দ্রে বা এগুলির কোনো একটি আশ্রয় করে বা তাদের হার্দ্য সমন্বয়ে রূপায়িত হয়েছে চিরন্তন এক নারীপ্রতিমা—যার ভালবাসার ঐশী প্রসাদে মানবচিত্তে অঙ্কুরিত শুভ-প্রয়াণের শক্তি ও প্রেরণা। এভাবেই শুভ ও সুন্দরের প্রেরণায় মানবচেতনার যে দেশকালাতীত অন্বেষা, তার-ই মহত্তর পরিসরে জীবনানন্দের প্রেম-ভাবনা শেষ পর্যন্ত উত্তরিত হয়ে চিরমানবের যুগযুগ ধাবিত সৌরপ্রয়াণের অংশভাক হয়ে উঠেছে। কবির ব্যক্তিক প্রেমোপলব্ধি, লৌকিক ও লোকোত্তরের আততি ও অন্বয়ের মধ্য দিয়ে, দিব্যপ্রেরণাস্বচ্ছল হয়েও মর্ত্য-বিমুখী হতে দেয়নি কবির সৃষ্টিকে। মানুষের পৃথিবী তথা ঐহিক অভিজ্ঞতার বাস্তবতা থেকেই বৃক্ষের মতো উদ্বর্তিত, ঊর্ধ্বায়িত হয়েছে তাঁর কল্পনায়। মানবের শুভ ও সুন্দরের সৌরচেতনা যার অপর নাম, জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রে অন্তত, প্রেম :

---

৪৪. 'দু'দিকে ছড়ায়ে আছে' : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় (নাভানা), গ্রন্থিত।

ইতিহাসের অন্ধকারে প্রথম শিশু মানুষ জাগিয়ে
চলছে আজো একটি সূর্য হঠাৎ হারিয়ে ফেলার ভয়ে;
হয়তো মানুষ নিজেই স্বাধীন অথবা তার
দায়ভাগিনী তুমি;
ওরা আসে, লীন হয়ে যায়; হে মহাপৃথিবী
সূর্যকরোজ্জ্বল মানুষের প্রেম চেতনার ভূমি।[৪৫]

৪৫. 'সূর্যকরোজ্জ্বলা'/মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৫৬।

জীবনানন্দের কাব্যে ইতিহাস ও ঐতিহ্য

দীপ্তি ত্রিপাঠী

জীবনানন্দ ইতিহাস সচেতন। 'ঝরাপালক'-এর বিভিন্ন কবিতায় তা লক্ষ্য করা যায়।

> দূর উর—ব্যাবিলোন—মিশরের মরুভূ সঙ্কটে,
> কোথা পিরামিড তলে,—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
> ... .
> আমারে দেখেছে সে যে আসীরীয় সম্রাটের বেশে
> ... ...
> আমি ছিনু 'ক্রবেদু'র কোন দূর 'প্রভেন্স' প্রান্তরে!
> ('অস্তচাঁদে', 'ঝরা পালক')

কিন্তু 'ঝরা পালক'-এর যুগের এ ইতিহাসচেতনা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র যুগের মৃত্যু-চেতনার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। 'বনলতা সেন'-এ তার পুনরাবির্ভাব দেখে মনে হয় কবি মৃত্যুচেতনাকে অতিক্রম করার জন্যই ইতিহাসচেতনাকে আশ্রয় করেছেন।

ইতিহাসচেতনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এলিয়ট একদা বলেছিলেন—'a perception not only of the pastness of the past, but of its presence' এবং এ ইতিহাসচৈতন্য কাব্যকে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে সমৃদ্ধ ও প্রাণবান করে : 'This historical sense which is a sense of the timeless as well as the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional.'[১]

আধুনিক কবিরা এ-রীতিকে অবলম্বন করেছেন, তার কারণ তাঁরা চান :

> 'to recover what has been lost
> And found and lost again and again.'[২]

জীবনানন্দ নিজে এ-প্রসঙ্গে বলেছেন :

'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়-চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।[৩]

১. Eliot, "Tradition and the Individual Talent', Points of View, p. 25
২. Maxwell, The Poetry of T.S. Eliot, P. 22.
৩. জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা,' পৃ ৪০।

অন্যত্র :

'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।'[১]

তিনি ইতিহাসচেতনাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন বর্তমান পৃথিবীর আত্মিক শূন্যতায় (Spiritul Barrenness) রুদ্ধশ্বাস হয়ে। ম্যাথু আর্নল্ডের মতো তাঁর মনে হয়েছিল, এখানে আনন্দ, প্রেম, আলো কিছু নেই, না আছে ব্যথায় নিরাময়তা, না বিক্ষোভে শান্তি, না চিন্তার নৈরাজ্যে বিশ্বাসের ধ্রুবতারা। অথচ স্বপ্নজগৎ রচনা করে তার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করাও সম্ভব নয়।

বাইরের বস্তুজগৎ অন্তরের স্বপ্নজগৎকে যে মুহূর্তে ভ্রান্তি বলে প্রমাণ করে দেবে, জীবনানন্দ তা জানতেন। আর বাইরের বস্তুজগৎ যদি আমাদের কাছে নঞর্থক হয়ে যায়, তাহলে আমাদের অন্তরচেতনাও হয়ে যাবে নঞর্থক। কিন্তু বাইরের জগৎ কেবল বর্তমান যুগের মূল্যবোধেই সীমাবদ্ধ নয়। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব, সমগ্র যুগ-যুগান্ত, রয়েছে আবিষ্কৃত-অনাবিষ্কৃত সভ্যতা, উর, ব্যাবিলন, নিনেভে, মিশর, বিদিশা, উজ্জয়িনী। অতএব তিনি প্রাণদায়িনী উৎসের সন্ধানে যাত্রা করলেন, খুঁজলেন তাকে বিভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে—পেগান গ্রিস, কনফশিয়াসের চীন, ধর্মাশোকের ভারতবর্ষে। স্টিফেন স্পেন্ডারের ভাষায় :

'Man is forced on to another level of truth, outside society, outside contemporary history, where he rejects the idea that he is a ghost and reasserts the dream that the world is various and beautiful and new, and that it should have certitude and peace and help for pain. For this is the dream of his flesh as well as his spirit, and it finds confirmation in geography as well as history. It is the dream which affirms life, and without such an affirmation life contradicts itself, denying its own existence, and men turn in on themselves, becoming mechanic ghosts moving in a machine made society.'

অনুরূপ অবস্থায় ইয়েট্স খুঁজেছিলেন তাঁর Byzantium:[২]

ইতিহাসচেতনার কবিতাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'বনলতা সেন'। Timeless এবং Temporal-এর সময় সমন্বয় বাংলা সাহিত্যে ইতঃপূর্বে হয়নি। বর্তমান যুগে প্রেমের অচরিতার্থ রূপ দেখে কবি ব্যথিত, সৌন্দর্যহীনতায় পীড়িত। তাই তিনি প্রেমের ও সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপকে খুঁজেছেন ভূগোল ও ইতিহাসের বৃহত্তর পটে। দেশকালে সীমাবদ্ধ নাটোরের বনলতা সেনের পশ্চাতে রয়েছে ভূগোলের বিস্তৃত ও ইতিহাসের বেধ (depth)। এ দুই আয়তনের যোগে একটি ক্ষুদ্র লিরিক কবিতা মহাকাব্যের ব্যাপ্তি পেয়েছে।

১. ঐ, পৃ ৩২
২. W. B. Yeats, Sailing to Byzantium' দ্রষ্টব্য।

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
... ...
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;
('বনলতা সেন', 'বনলতা সেন')

এ কবিতাটির সঙ্গে এডগার অ্যালান পো-র 'হেলেনের প্রতি' তুলনা করা চলে।

প্রাচীন ও বর্তমানের সেতু রচনা পো ও জীবনানন্দ উভয়ের-ই উপজীব্য। যেমন পো লিখেছেন 'Thy hyacinth heir, thy classic face', তেমনি জীবনানন্দ লিখছেন 'চুল তার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। এখানে বিদিশা এবং শ্রাবস্তী শব্দ দু'টি তিনি ব্যবহার করেছেন রোমান্টিকদের দূরযানী ধর্মের জন্য নয়, ক্ল্যাসিক চৈতন্যকে উদ্বোধিত করার জন্য। পো যে জন্য গ্রিস ও রোমের স্মৃতিকে জাগাতে লিখেছিলেন : 'To the glory that was Greece! And the grandcur that was Rome!'

'শ্রাবস্তী' 'বিদিশা কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে কোনো মন্ত্রবলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক 'Dream-heavy land' যেখানে ইচ্ছা, অনুভূতি ও কল্পনা পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায়। ইয়েট্স যেমন প্রিয়ার আলিঙ্গনের মধ্যেই যুগ-যুগান্তরের কথা স্মরণ করেছিলেন, তেমনি প্রিয়ার স্মৃতিচারণার মধ্যে জীবনানন্দের চোখেও ভেসে উঠেছে হারানো-সৌন্দর্যের, হারানো-পূর্ণতার নানা চিত্র।

'হাওয়ার রাত' এবং 'নগ্ন নির্জন হাত'-এও এ প্রেম ও সৌন্দর্যের ক্ষান্তিহীন অনুসন্ধান চলেছে দেখি :

ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোনো এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ:
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।
('নগ্ন নির্জন হাত', 'বনলতা সেন')

কমলা রঙের রোদ, রামধনু রঙের কাচের জানালা, রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ— মন্ত্রবলে আমাদের সামনে পেগান যুগের বর্ণোজ্জ্বল পূর্ণজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর একটি নগ্ন নির্জন হাত মানসিক ব্যাকুলতায় সমস্ত কবিতাটিকে স্পন্দিত করে তুলেছে।

প্রেমের সৌন্দর্যরূপের মতো ব্যর্থতাকেও কবি ইতিহাসের মধ্যে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, যেমন 'শ্যামলী'তে। যুগে-যুগে মানুষ প্রেমের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছে, প্রেমের শুল্ক দিতে 'দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার কথা ভুলে' গিয়েছে দুঃসাহসিক অভিযানে। হয়তো সাফল্য মেলেনি। ব্যক্তির মতো জাতিগণও তিল-তিল ঐশ্বর্য দিয়ে যে তিলোত্তমা সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, তার মর্মে ক্লান্তি নেমেছে।

গ্রিক হিন্দু ফিনিশীয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে? কী পেয়েছে?—গিয়েছে হারায়ে।
('সুরঞ্জনা', 'বনলতা সেন')

প্রতি সভ্যতা তার সংকল্প, উদ্যম একদা কালের ধর্মে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু নারীর প্রেম মানুষকে যে-প্রেরণা দেয়, তার ক্ষয় নেই।

সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি :
('মিতভাষণ', ঐ)

তাই ধর্ম, সংঘ, শক্তির চেয়েও মানুষ চায় 'আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।' এখানে ধর্মাশোক, মহেন্দ্র, ভূমধ্যসাগর, গ্রিক, হিন্দু, ফিনিশীয় প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে যা ব্যক্তিগত ছিল, তাকে কবি করে তুলেছেন বিশ্বের।

হাজার বছর শুধু খেলা করে এক-ই অভিজ্ঞতার কথা। শত-শত জন্মের চারপাশে সফেন মৃত্যুর সমুদ্র। প্রেমের অভিজ্ঞতাই শুধু অনির্বাণ জেগে থাকে, আর সবই ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। 'দ্বারকা' কথাটির ব্যবহার লক্ষণীয়। 'মহাপৃথিবী'তে 'এশিরিয়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। অবশ্য তাতে অর্থের তারতম্য হয়নি—দু'টি শব্দই ধ্বংসগ্রস্ত সভ্যতার প্রতীক। 'বিচূর্ণ থামের মত' কথাটির মধ্যে এলিয়টের Broken Columns-এর প্রতিধ্বনি শুনি।

জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষের জীবন থেকে প্রকৃতিকে বাদ দিলে জীবন যেমন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, জ্ঞান থেকে প্রেমের বর্জনে খণ্ডিত হয় জীবন, তেমনই মানুষকে মানবসভ্যতার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সম্পূর্ণ জীবনের আস্বাদ পাওয়া যায় না। জীবনানন্দ তাই প্রকৃতি, প্রেম ও ইতিহাসের পটভূমিকায় বৃহত্তর ও ব্যাপকতর জীবনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

প্রাচীন ইতিহাস তাঁর কাছে রূপকথার ঐশ্বর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ইতিহাস বাস্তব ও রূপকথা অবাস্তব, এ-ধরনের একটি মনোভাব বিনা বিচারে আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অথচ ইতিহাস সম্পূর্ণ বাস্তব নয়, ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্য পায়, তেমনই আবার রূপকথাও সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়, তার মধ্যে অনেক যুগের অনেক মানুষের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়। সেজন্য অনেকের কাছে ব্যক্তি-রচিত ইতিহাসের তুলনায় পুরাণ কাহিনী, রূপকথা, ছড়া ইত্যাদি অনেক বেশি মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ যেমন উপনিষদ ও কালিদাসের যুগকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন, জীবনানন্দও তেমনই প্রাচীন বাংলা, প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন বিশ্বকে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসকে তিনি কীভাবে ব্যবহার করেছেন, আমরা তার আলোচনা করেছি। এখানে কেবলমাত্র দু'টি উদাহরণ দেয়া হলো, যেখানে তিনি ইতিহাসের তথ্যের জটিলতা কাটিয়ে একেবারে ইতিহাসের মর্মে গিয়ে হাত রাখতে পেরেছেন :

(ক) '—নদীটির জল
বাঙালি মেয়ের মতো বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর কপাটে
আঘাত করিয়া যাবে ভয়ে ভয়ে—' (রূপসী বাংলা)

(খ) '—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদীমাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায় (ঐ)

ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অশোকের যুগ তাঁকে উদ্দীপনা দিয়েছে, কেননা সে-যুগ হলো প্রেমের উদ্দীপনার যুগ, যার পেছনে কবি মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার ব্যক্তিগত প্রেমের শক্তি দেখতে পেয়েছেন :

(ক) 'মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড় সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয়, শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।'

(সুরঞ্জনা : বনলতা সেন)

(খ) 'উৎসব হৃদয় মনে কাজ করে গেছে একদিন :
সমুদ্রের নীল পথে মহেন্দ্র চলেছে—
সমস্ত ভারত শিলালিপির উদ্যমে আনন্দে ভরে গেছে;'

(এইখানে সূর্যের : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

(গ) 'তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন।
মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে—ধর্মে—নির্বাণে;
তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।' (মিতভাষণ :বনলতা সেন)

বাংলা ও ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে চীন, মিশর, গ্রিস, বেবিলন, এসিরিয়া সর্বত্রই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। এদের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার প্রতিই তাঁর আকর্ষণ প্রবল :

(ক) 'যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নবসভ্যতায় ফিরে আসে;' (সুরঞ্জনা : বনলতা সেন)

(খ) 'সবিতা, মানবজন্ম আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে :
ভূমধ্যসাগর ঘিরে সেই সব জাতি,
তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন;
মনে পড়ে নিবিড় মেরুণ আলো, মুক্তার শিকারী
রেশম, মদের সার্থবাহ্,
দুধের মতন সাদা নারী।' (সবিতা : ঐ)

পৃথিবীতে একদিন যা ছিল, আজ আর নেই, তার জন্য মানুষের পবিত্র আকাঙ্ক্ষার বেদনা অনুভব করলে মনে হয় : 'মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানা কী যে :/

ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে।' এ 'বিরল কিছু'র জন্যই কবিতা হিসেবে এদের মূল্য সমধিক।

'ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'
রামধনু রঙের কাঁচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায়-পর্দায়
কক্ষ ও অক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।' (নগ্ন নির্জন হাত : মহাপৃথিবী)

আকস্মিক হাওয়ার ঝাপটায় বর্তমানের পর্দা উড়ে গিয়ে অতীতের অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠেছে। অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা, অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি, দূরতর কক্ষ ও কক্ষান্তরের ক্ষণিক আভাস কবিকে ধূসর সৌন্দর্যের আভাসিত বেদনার জগতে নিয়ে গেছে। সন্দেহ নেই, বর্তমানের পর্দা আবার অতীতকে ঢেকে ফেলবে, তবু ক্ষণিকের রহস্যময় অভিজ্ঞতা তাঁর মনে যে আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, তা চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রেরণা হয়ে হৃদয়ে জেগে থাকবে। পংক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর কথা স্মরণে আনে। দু'টি সৃষ্টির পেছনে এক-ই মন কাজ করেছে : রোমান্টিক সৌন্দর্যের জন্য বাস্তবপীড়িত মনের হাহাকার। জীবনানন্দের 'লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ' ক্ষুধিত পাষাণের 'লুপ্তাবশিষ্ট মাথা ঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধে'র কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ক্ষুধিত পাষাণের 'মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া' জীবনানন্দের ঘাসের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে 'মৌরির গন্ধমাখা ঘাসে' পরিণত হয়েছে। ক্ষুধিত পাষাণে আরাবলী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে অনেক কোমল স্পর্শ নিভৃত অন্ধকারকে পূর্ণ করে তুলতো, জীবনানন্দের গন্ধের জগতে সেই মেয়েলি হাতের স্পর্শ প্রায় সর্বত্রই অনুভব করা যায়। জীবনানন্দের কাছে ইতিহাস যে রূপকথায় পরিণত হয়েছে, তারও পেছনে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর প্রভাব অনুমান করা যেতে পারে। এ-সকল দৃষ্টান্ত থেকে সেই এক কথাই নতুন করে প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক কবিতা ঐতিহ্যহীন ভুঁইফোড় সৃষ্টি নয়, ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তা দিগন্তকে আলিঙ্গন করেছে।

কেবলমাত্র অতীত ইতিহাসে কবি পরিতৃপ্ত নন। আবহমান ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করে তিনি বর্তমানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বেবিলন, এসিরিয়া গুঁড়ো হয়ে গেছে। কোনো কোনো সভ্যতা অন্ধভাবে সত্যকে পেয়ে নির্দেশের ভুলে বিপথে চালিত হয়েছে। বর্তমান সভ্যতা মুমূর্ষু, তার দেহে অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান :

'দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে
গ্রামপতনের শব্দ হয় ;

মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।' (পৃথিবীলোক : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

পৃথিবীতে প্রেম নেই, আছে শুধু হিংসা, দ্বেষ, সন্দেহ আর ভয় : 'সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।' শুধু যুদ্ধে আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আমরা মানুষকে খুন করেছি তা নয়, স্বার্থান্ধ হয়ে মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে মন্বন্তর সৃষ্টি করে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি। সকলের চেয়ে বেশি ভয়াবহ, মানুষের আত্মিক মৃত্যু : 'আমরা বেদনাহীন,—অন্তহীন বেদনার পথে।' আমরা-ই গণিকাকে ফাঁদ দেখিয়েছি, প্রেমিককে শিখিয়েছি ফাঁকির কৌশল। সামাজিক বিশৃঙ্খলা আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের পৃথিবীর বারগৃহ ধরে উঠে যেতে পরামর্শ দেয়। আজ হৃদয়বিহীনভাবে মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর। আমরা প্রত্যেকেই সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দুর্গে বন্দী, তাই 'আমাদের সন্ততিও আমাদের হৃদয়ের নয়।'

সভ্যতার উজ্জ্বল প্রভাতে একদিন মানুষ স্বর্গের পানে সিঁড়ি তৈরি করেছিল, কিন্তু সে-সিঁড়ি ভেঙে গেছে। অথবা সিঁড়িটি যদি টিকেও থাকে, পৃথিবী ও পৃথিবীর সন্তান মানুষ এরা দু'জনেই যখন মৃত, তখন সিঁড়ির ঐশ্বর্যে কার কী লাভ! ভরসা করার মতো আশ্রয় আধুনিক কোনো সভ্যতার কাছে পাওয়া যাচ্ছে না—প্রত্যেক নেশন-ই জাতিগত স্বার্থে বন্দী : 'শতাব্দীর রাক্ষসী-বেলায়/দ্বৈপ-আত্মা-অন্ধকার এক-একটি বিমুখ নেশন।' মানবসভ্যতার আদিম ভোরের উজ্জ্বলতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, আবার সূর্যের মধ্যদিন ভাস্বরতাও এখনো খুঁজে পাই নি। যে-সপ্তর্ষিমণ্ডল আমাদের কাছে ধ্রুববিশ্বাসের আশ্রয় হয়ে ছিল, আজ ক্রান্তিকালে সে আর পথ দেখাচ্ছে না। তাই 'আলো আর আলো নয়, অন্ধকার।' সপ্তর্ষিমণ্ডল খড়্গের মতো একটি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে মাথার ওপর ঝুলছে। সেই সন্দেহের হাত থেকে, জিজ্ঞাসার হাত থেকে আজ আর রেহাই নেই :

(ক) সূর্য যদি কেবলি দিনের জন্ম দিয়ে যায়,
রাত্রি যদি শুধু নক্ষত্রের,
মানুষ কেবলি যদি সমাজের জন্ম দেয়,
সমাজ অস্পষ্ট বিপ্লবের,
বিপ্লব নির্মম আবেশের,
তা হলে শ্রীজ্ঞান কিছু চেয়েছিল?'

(মানুষের মৃত্যু হলে : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

(খ) 'এ কোন্ সিন্ধুর সুর :
মরণের জীবনের?
এ কি ভোর?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।' (সূর্যতামসী : সাতটি তারার তিমির)

(গ) 'মানুষেরা বারবার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে;
নবনব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে;
তবুও কোথায় সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর?"
(সময়ের কাছে : ঐ)

(ঘ) 'একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে
আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে?' (ভাষিত : ঐ)

কবি এ-সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন বলে মনে হয়। দেখা যাবে, ক্রমশ তাঁর কবিতায় নৈরাশ্যের কুয়াশা কাটিয়ে আশার আলো ছড়িয়ে পড়ছে। ক্রান্তিকালের অন্ধকারকে তাঁর সৃষ্টির অন্ধকার বলে মনে হয়েছে। পৃথিবীর বুকে নবীন সৃষ্টির সম্ভাবনায় তিনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন।

'সকালে শিশির কণা যে-রকম ঘাসে
অচিরে মরণশীল হয়ে তবু সূর্যে আবার
মৃত্যু মুখে নিয়ে পরদিন ফিরে আসে।'
(অনেক নদীর জল : বেলা অবেলা কালবেলা)

তেমনই মানবসভ্যতাও অন্ধকার যুগ পার হয়ে আলোর জগতে উত্তীর্ণ হয়, যদিও আরও এক অন্ধকারের দিকেই তার প্রয়াণ। এভাবে চক্রকারে মানবসভ্যতা আবর্তিত হচ্ছে। অন্ধকার যুগে বাস করে মানুষকে আলোর জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে :

'জীবনকে সকলের তরে ভালো করে।
পেতে হলে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই।'
(পৃথিবীতে : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সময়ের পথে চলা মানেই প্রগতি নয়, উত্তরণ নয়। তাই অপেক্ষা করা ছাড়া সর্বজনীন কল্যাণের যদিও অন্যপথ নেই, তবুও জ্ঞানের আলোকে অধিকতর নির্মল করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চেতনার কম্পাসকে সর্বদাই প্রেমের দিকে অনড় করে রাখতে হবে। শুধু অপেক্ষা করা, ধৈর্য ধরা কোনো কাজের কথা নয়। শোককে স্বীকার করে অবশেষে অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে ফেলার সাধনা চাই।

'অন্তহীন অপেক্ষার চেয়ে তবে ভালো
দ্বীপাতীত লক্ষ্যে অবিরাম চলে যাওয়া।'
(সূর্য নক্ষত্র নারী : বেলা অবেলা কালবেলা)

সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে জ্ঞানপাপ মুছে ফেলার উপায় হলো প্রেম। 'প্রেম ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি'। তাই 'আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই প্রেমে'। কবি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারেন :

'অন্ধকারে সবচেয়ে সে-শরণ ভালো :
যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরতর আলো।'
(যতদিন পৃথিবীতে : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

জ্ঞানের দ্বারা মার্জিত প্রেম-ই মানুষের শেষ আশ্রয়। ইতিহাস যদিও চক্রাকারে আবর্তিত হয়, তবু নবতর মানবের প্রাণ প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ করে এক তিল বেশি চেতনার আভা নিয়ে আসে, তার তা-ই আমাদের পরম লাভ। হয়তো প্রথমে তা নজরে পড়ে না, পায়ের চলার পথে দিন আর রাত্রির মতন নতুন যুগের ফসলকে নেহাত-ই মামুলি তার সাদাসিধে মনে হয়, তবুও গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়, প্রতিবার-ই উত্তর-সমাজ 'ঈষৎ অনন্যসাধারণ'। ইতিহাসের কাছ থেকে হয়তো আমরা অর্ধসত্য লাভ করি, 'তবু অগণন অর্ধসত্যের

উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।'
(পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে : বেলা অবেলা কালবেলা)

এ বিশ্বাসের জোরে কবির দৃষ্টি অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হয়েছে।

মানবিক হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার বর্জন হয়, অঙ্গীকারেই মানবসভ্যতা হবে নতুন অর্থে প্রোজ্জ্বল :

'শতকের ম্লানচিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি
নর-নারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে
সব গ্লানি না কাটলেও,
তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে।' (আলোপৃথিবী)

প্রকৃতি ও হৃদয়ের সমাহারে, প্রকৃতির প্রশান্তির সঙ্গে মানবের হৃদয়-মূল্যের যোগ হলেই পৃথিবী হবে আলোয় আলোময়।

যদি ধরে নেয়া যায় অন্ধকার-ই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা, রক্তের পিপাসা-ই স্বাভাবিক, মানুষও রক্তাক্ত হতে চায়, তবু আমরা শুনতে পাই, কবি বলছেন :

'আমি তবু বলি :
এখনও যে-ক'টা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আধারের থেকে আনে কী করে যে মহা-নীলাকাশ,
ভাবা যাক—ভাবা যাক—

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।' (হে হৃদয় : বেলা-অবেলা-কালবেলা)

প্রকৃতি, প্রেম ও ইতিহাস সর্বত্রই কবি নশ্বরতা দেখেছেন, দেখেছেন ক্ষণিকতা ও মৃত্যু; কিন্তু সমস্ত গ্লানির উর্ধ্বে প্রকৃতি-প্রেম-ইতিহাসে তিনি খুঁজে পেয়েছেন অবিনশ্বরতার স্পর্শ, পেয়েছেন প্রশান্তি—পথ চলার পাথেয়। যে সত্য বা আলো তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, তাকেই লোক-সাধারণ করা হলো কবির একমাত্র কর্তব্য, এ-কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন :

'সকল আলোর কাজ বিষণ্ন জেনেও তবু কাজ করে—গানে
গেয়ে লোক-সাধারণ করে দিতে পারি যদি আলোকের মানে।'
(হেমন্ত রাতে : ঐ)

জীবনানন্দ যে-সত্য আবিষ্কার করেছেন, তা হয়তো আমাদের কাছে নতুন নয় (কবিকে নতুন সত্য আবিষ্কার করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই); কিন্তু 'নিজে না ম'লে যেমন স্বর্গে যাওয়া যায় না' তেমনই যে-কোনো সত্যে পৌঁছতে গেলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মারফত-ই পৌঁছতে হয়, এ-ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। আর এ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ থাকে বলেই কবিতার 'পুরনো সত্য' আমাদের কাছে বিশিষ্ট রূপে 'নতুন সত্য, হয়ে ওঠে। তখন বুঝতে পারা যায়, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তি-চেতনার মূল্য বেশি কেন; কেনই বা রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত; শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের ওপরেই জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে, তা-ই ব্যক্তি; সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।' (সাহিত্যের পথে)

জীবনানন্দের কবিতায় ইতিহাস-ঐতিহ্য

প্রদ্যুম্ন মিত্র

যে মননঋদ্ধ আবেগ ও ভাবনা জীবনানন্দের কাব্যে স্বকীয় উদ্ভাস এনে দিয়েছে, তার নিরবচ্ছিন্ন ও স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে কবির সুস্থির ইতিহাসচেতনায়। কাব্য বিষয়ক নিবন্ধাবলীতে ও কিছু ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত চিঠিপত্রে জীবনানন্দ নিজেই বেশ কিছু আলোকসম্পাতী নির্দেশ রেখে গেছেন এ ইতিহাসচেতনার সপক্ষে। সেসবের যথার্থ অনুধাবনই তাঁর নিজের কাব্যে ইতিহাসচেতনার সঠিক পরিপ্রেক্ষিত দিতে পারে।

জীবনানন্দ নিজেকে 'লিরিক' কবি বলেই মানতেন : 'কিন্তু আজো আমি লিরিক কবি'। তিনি আরও জানতেন, 'লিরিক কবি ত্রিভুবনচারী'।[১] অর্থাৎ প্রকৃতি, সমাজ ও সময়ানুধ্যান—এ তিন জগতে বিচরণ করেন যে 'কবি', তিনি যখন 'মানবসমাজকে চিনে নেবার ও চিনিয়ে দেবার মুখ্যতম প্রয়োজনে' কোনকিছুকে 'চরম' বলে গ্রহণ করেন, তখন তাঁর সংকল্পনার মধ্যে থাকে কবিজগৎ সৃষ্টির এক প্রয়াস, যেখানে 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরে' কবি বাস্তবকে 'ফলিয়ে দেখতে' চান। সেভাবেই গড়ে ওঠে তাঁর চেতনা ও সৃষ্টির নিজস্ব জগৎ, কারও সৃষ্টিতে 'কোনো পরিনির্বাণের দিকে', 'অল্পাধিক শুভ পরিচ্ছন্ন সমাজপ্রয়াণের দিকে, অন্য কারু ধারণায়'![২] জীবন ও সাহিত্যের তাগিদে জীবনানন্দ নিজেও কখনও কখনও 'চরম' বলে গ্রহণ করেছেন এমন কিছু, যা তিনি 'শেষ সত্য'[৩] বলে মানতে পারেন নি, তবু যে তা' মেনে নিয়েছেন তার কারণ, তার-ই মধ্যে তিনি সাময়িকভাবে হলেও অনুভব করেছেন 'আধুনিক ইতিহাসের দিকনির্ণয় সত্তা'। অর্থাৎ 'সময়-প্রসৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা' করেছেন।[৪] অন্তহীন সময়ের পটভূমিতে বহমান মানবসমাজের ক্রমাগ্রগতির এ বোধ, পরিপূর্ণতার অন্বেষা ও শুভপ্রয়াণের ব্যগ্রতা, পৃথিবীর রণরক্ত কোলাহলের অন্তর্লীন তাড়নার প্রকৃত তাৎপর্যের সচেতন অনুধাবন—এ সমস্ত কিছুই জীবনানন্দের কাব্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছে এক বিবর্তমান ইতিহাসচেতনা। এ 'ইতিহাসবেদের' বিশদ শিক্ষা তাঁর কবিতাবলীর মূল্যায়নের সাহায্যেই সম্ভবপর। কিন্তু সে আলোচনায় পৌঁছার আগে আরো কিছু ধারণা স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন।

---

১. 'ময়ূখ'/জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, পত্র ২।
২. 'কবিতা প্রসঙ্গে'/কবিতার কথা।
৩. 'ময়ূখ' জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, পত্র ২।
৪. 'কবিতার আত্মা ও শরীর'/ক. কথা।

লিরিক কবি হিসেবে জীবনানন্দ অন্তঃপ্রেরণার দাবি স্বীকার করেছেন বার বার। কবি-মানসে অন্তঃপ্রেরণার প্রবল ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েও জীবনানন্দ জানিয়ে দেন, 'কিন্তু ভাবপ্রতিভাজাত এ অন্তঃপ্রেরণাও সব নয়। তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ প্রতর্কের ইঙ্গিতে শুনতে হবে, এ জিনিস ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই'।[৫] সৎ কাব্যসৃষ্টির পক্ষে ইতিহাসমনস্কতা, যে জীবনানন্দ কত জরুরি মনে করতেন, তার আরও পরিচয় রয়েছে বাংলা কাব্য নিয়ে লেখা তাঁর দু'টি নিবন্ধে, 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা'। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কবিতা নিয়ে আলোচনায় তিনি আমাদের জানিয়ে দেন, 'সময় ও সীমাপ্রসৃতির ভেতর সাহিত্যের পটভূমি বিমুক্ত দেখতে' তিনি ভালোবাসেন। তাঁর অনুধ্যানে 'কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান'। যেমন স্বকালের ও সহযাত্রী কবিকুলের রচনায় তিনি দেখতে চেয়েছেন ইতিহাস ও সময় সম্পর্কিত সঠিক চেতনা, তেমনই অতীত ও অব্যবহিত অগ্রজ কালের কাব্যেও তিনি খুঁজছেন সময়, সমাজ ও ইতিবৃত্তের যথার্থ প্রেক্ষিত : 'যে সময়ে সে কাল কাটাচ্ছে এবং যেখানে সে কাটায়নি, যে ঐতিহ্যে সে আছে এবং যেখানে সে নেই—এ সকলের কাছেই সে (কবি) ঋণী'।[৬] কাব্যের অস্থি-মজ্জার মধ্যে লালিত এ ইতিহাসচেতনাই কবিকে করে এক-ই সঙ্গে যুগ-মানসের প্রবক্তা ও ক্রান্তদর্শী; দান্তে, শেক্‌স্‌পিয়ার ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে নানা উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ এ বিশ্বাস বার বার ব্যক্ত করেছেন।[৭] জীবনানন্দের রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনায় যে অপরিসীম বিস্ময় ও শ্রদ্ধার দ্যুতি ছড়িয়ে আছে, তা কোনও মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটিতে তিনি যথার্থই বুঝেছেন, রবীন্দ্রকাব্যে রয়েছে 'একটি বিস্তৃত যুগের প্রাণ-পরিসর এবং এমন অনেক কিছু, যা সময়াতীত'। তবু তাঁর সচেতন বয়স্ক শ্রদ্ধা তাঁকে বিস্ময়ে বিহ্বল হতে দেয়নি এবং তিনি এ-ও বুঝেছেন, 'তাঁর প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ ও ইতিহাস চেতনা একটি নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে'। এ জাতীয় উপলব্ধি সুলভ নয় এবং লভ্য হলেও যথার্থ সমালোচনার পরিমিতি নিয়ে কদাচ উচ্চারিত হয়। জীবনানন্দের পক্ষে রবীন্দ্র কাব্যলোকের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এরকম অনুত্তেজিত সদুক্তি সম্ভব হয়েছিল সৎ কাব্যের ইতিহাসচেতন চরিত্রে প্রগাঢ় আস্থা থেকেই। আসলে কবিতা রচনার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই জীবনানন্দ কয়েকটি সত্য প্রত্যয়ে আশ্বস্ত হতে পেরেছিলেন। কাব্যের নিজস্ব নিয়ামক সংহতি ('ইনটিগ্রিটি') ও অন্তপ্রেরণার (ইনস্‌পিরেশন) দাবি স্বীকার করে নিয়েও জীবনানন্দ মহৎ ও সৎ কবির 'ব্যক্তি' ও 'উত্তরব্যক্তি' সত্তাকে একটি 'কৃতার্থ সংস্থানের'[৮] (যাকে আমরা বলতে পারি, সিগনিফিক্যান্ট হারমনি) মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। কবির এ উত্তরব্যক্তি সত্তাই কবিতাকে পৃথিবীর এ জীবনের যত নিকটে নিয়ে আসে, আর কিছুই ততো নয়।

৫. 'কবিতা প্রসঙ্গে'/ক. কথা।
৬. 'মাত্রাচেতনা'/ক. কথা।
৭. 'কি হিসেবে শাশ্বত' ও 'দেশ কাল কবিতা'/ক. কথা।
৮. 'কবিতার আলোচনা'/ক. কথা।

'যেখানে যা কিছু ভালো সাহিত্য হচ্ছে সেটার স্থিরতা, ইতিহাসে যা হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, যা হয়নি সেসব দুঃসাধ্য স্বর্গ রচিত হতে পারে স্বীকার করেও, বিশ্বাসের মাত্রারক্ষা ও অভিনিবেশের ফলেই হচ্ছে'।[৯] যে কোন রচনাই সৎ, গভীর ও সার্থক হয়ে ওঠার জন্য স্রষ্টার চেতনায় ইতিহাসের প্রকৃত প্রেক্ষিত-জ্ঞান যে কত জরুরি সে সম্পর্কে জীবনানন্দের সমীক্ষায় ছিল না কোনও দ্বিধা। সমকালীন কাব্য আলোচনায় অগ্রসর হয়ে 'ইতিহাসচেতনা' শব্দটি সুচিন্তিভাবে বার বার তিনি ব্যবহার করেছেন। এ সব-ই তাঁর মননপ্রবণতার এক বিশিষ্ট লক্ষণের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে—সেটি তাঁর ইতিহাসবোধ।

এ ইতিহাসচেতনা বলতে স্বয়ং জীবনানন্দ তাঁর সচেতন জিজ্ঞাসায় কিম্বা অনুপ্রাণিত কাব্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, সে প্রশ্ন এসে পড়ে। জীবনানন্দের কাব্যলোকে ইতিহাসের উপস্থিতি স্বীকৃত বিষয় হওয়া সত্ত্বেও সে চেতনার যথার্থ মূল্যায়নের অভাব আজো লক্ষণীয়। এক জাতীয় উচ্ছ্বাসপ্রবণ সদুক্তি, ভাসা ভাসা পারম্পর্যহীন উল্লেখ বা উদ্ধৃতির মধ্যে তৃপ্ত থাকার ফলেই আধুনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য এ ক্রান্তদর্শী 'চেতয়িতা' কারও কারও কাছে হয়ে যান 'এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি'।[১০]

ইতিহাসচেতনার সংজ্ঞা নির্ণয়ে যে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসে, তা হলো ইতিহাস বলতে আমরা কী বুঝি। সকল ঐতিহাসিক-ই জানেন, ইতিহাসচর্চা এক জাতীয় গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ। সেভাবে দেখলে ইতিহাস বিজ্ঞানের-ই অনুবর্তী; কারণ বিজ্ঞানের কর্তব্য অনুসন্ধান ও আবিষ্কার।

যা অজ্ঞাত, তার অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান-ই বিজ্ঞান। ইতিহাস বিজ্ঞানের স্বগোত্র; শুধু তা সন্ধিৎসার ক্ষেত্র ভিন্নতর। অতীতে সংঘটিত মানবিক কর্মকাণ্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর খুঁজে বের করাই ইতিহাসের বিবেচনাধীন। ইতিহাস এ দায়িত্ব পালন করে তথ্য ও প্রমাণের, ব্যাখ্যা ও মীমাংসার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এ অতীত-অনুসন্ধান ও মীমাংসার কাজ জানায় মানবের এতকালের কর্ম ও তার ফলশ্রুতি; এবং সেভাবেই উন্মোচিত করে দেয়, আরও মহত্তর ও ব্যাপকতর অর্থে, মানব-স্বভাব ও মানবেতিহাসের মর্মকথা। অনুসন্ধান ও মূল্যায়নজাত এ জ্ঞানমূল্যই ইতিহাসকে তাৎপর্যময় করে তোলে; মানবচেতনায় জন্ম দেয় ইতিহাসবোধের।

ইতিহাস যে বৃত্তান্ত মাত্র নয়, বিবরণ তার প্রধান কর্তব্য হলেও বিবরণী প্রণয়নই তার একমাত্র লক্ষ্য নয়—এ জাতীয় ভাবনা উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে মানব-মনকে আলোড়িত করলেও, প্রতীচ্যের আদি ইতিহাসবেত্তা হেরোডাটাসও যেন এ বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের আদিতেই তিনি বলে নিয়েছেন, গ্রিক ও অনার্যদের মধ্যে সংঘর্ষের স্মারক-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হলেও তাঁর উদ্দেশ্য হবে সে সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ নির্ণয়। এভাবেই ইতিহাসচর্চা উদ্দেশ্যমুখী হয়ে যায় একেবারে তার জন্মলগ্ন থেকেই। তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে কার্যকারণ সূত্র-নির্দেশ আমাদের নিয়ে যায় ঘটনার মূল্যায়নে এবং সেভাবেই ইতিবৃত্তে তথ্যের একচ্ছত্র প্রাধান্য খণ্ডিত হতে থাকে।

৯. 'সত্য বিশ্বাস ও কবিতা'/ক. কথা।
১০. 'আধুনিক বাংলা কবিতা'/দীপ্তি ত্রিপাঠী।

এ শতাব্দীর শুরুতে ইতিহাস জিজ্ঞাসার নতুন তাগিদ আসে ইতালী থেকে। বেনেদেতে ক্রোচে-র ইতিহাস-দর্শনের নবীন ভাষ্যে ক্রোচে আমাদের জানালেন, 'সব ইতিহাস-ই সমকালীন'। এ বিশ্রুত উক্তিটির প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করা যাক : 'যে কোনও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে যে ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলি, তা-ই ইতিহাসকে দেয় তার সমকালীন সত্তা। কেননা, যত দূরবর্তী হোক না কেন বিবৃত ঘটনাবলী, প্রকৃত ইতিহাস সব সময়েই বর্তমানের প্রতিবেশ ও প্রয়োজনের মধ্যেই অনুরণিত হতে থাকে'।[১১] ক্রোচে যা বলতে চেয়েছেন, তা হয়তো এই যে, ইতিহাস হলো বর্তমানের চোখ দিয়ে অতীতকে দেখা, এবং ঐতিহাসিকের প্রধান দায়িত্ব মূল্যায়ন, পঞ্জিভুক্তিকরণমাত্র নয়। ক্রোচের প্রভাব ধীরে ধীরে হলেও সর্বত্র ইতিহাস-আলোচনায় অনুভূত হতে থাকে। বৃটিশ ইতিহাসবেত্তা কলিংউডের 'দি আইডিয়া অফ্ হিস্ট্রি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। সেখানেও ইতিহাসচর্চাকে শুধুমাত্র অতীত বা ঐতিহাসিকের অতীত অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে সমার্থক করে দেখা হয়নি; বরং অতীত ও ঐতিহাসিকের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ পারস্পরিক সাযুজ্যে অবস্থান করবে, এটাই বলতে চাওয়া হয়েছে। অতীতের যে কোনও ঘটনা বা কীর্তি মৃত, নিরর্থক হয়ে যায় যদি ইতিহাসবেত্তা সেসবের পেছনে যে শক্তি বা ভাবনাগুলি কার্যকরি ছিল, সেগুলির অনুধাবনে বিরত থাকেন। সেই কারণেই কলিংউডের কাছে, 'ইতিহাস হলো ঐতিহাসিকের মননে অতীত-ঘটনার পুনর্সংঘটন।[১২] এ সংঘটনা তো শুধু মৃত কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়; এর সঙ্গে জড়িত হয়ে যায় নির্বাচন ও মূল্যায়নের গোচর-অগোচর এক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া আবার ঐতিহাসিকের মননের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এভাবে দেখা হলে ইতিবৃত্তকথায় শেষ পর্যন্ত ইতিহাসবেত্তার মনন-অভিজ্ঞতার-ই প্রতিফলন ঘটে।

এ বিচারে ইতিহাস যদিও ইতিবৃত্তকারের মননসঞ্জাত, তবু তথ্য ও ঘটনাই সেই মননসৌধের ভিত্তি। তথ্যের অভাব ইতিহাসকে করে তোলে অনিকেত, নিরালম্ব কল্পনামাত্র; আবার ঐতিহাসিকের মূল্যায়ন ছাড়া তথ্যগুলি হয়ে পড়ে মৃত ও অর্থহীন। জীবনানন্দ যাকে 'কল্পনামনীষা' বলেছেন, সেই 'ইমাজিনেশন' বা কল্পনাদৃষ্টি ইতিহাসবেত্তার পক্ষে জরুরি একটি প্রয়োজন, যার সাহায্যে তিনি অধীত অতীত, তার মানব-যুগ, তাদের সমাজজীবন ও মনোভঙ্গিকে সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন। এ কল্পনাদৃষ্টির অনুপস্থিতি ইতিবৃত্তকে করে তোলে ভারী, অস্বচ্ছ, নিরর্থক এক ধারাভাষ্য। আবার কোনও ঐতিহাসিক-ই যেহেতু স্ব-কাল ও স্ব-সমাজের চেতনাভূমি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করে নিতে পারেন না, অধুনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত থেকেই তিনি অতীতের প্রেক্ষিত হৃদয়ঙ্গম করে নিতে চান, তাই ইতিবৃত্তের অতীতে অধুনার সংশ্লেষ ঘটে যায়। আবার নিটশের কথায়ও ভুল নেই : 'কেউ কেউ ইতিবৃত্তের সভ্যতা

১১. The Philosophy of History : B. Croee.

১২. 'History is the re-enactment in the historian's mind of the thought whose history he is studying'. : Collingwood.

১৩. Experience and its Modest M. Oakeshott: 1933; P. 99. History is the historian's experience. It is made by nobody save the historian; to write history is the only way of making it.'

কি অতীত-স্মৃতি-চারণায় মুক্তি খুঁজে থাকেন'[১৪]। কিন্তু ঐতিহাসিকের কর্তব্য অতীতের মুগ্ধ প্রেম নয়, নয় কোনও অতীত অনীহাও। তাঁর দায়িত্ব অতীতকে, ইতিহাসের ঘটনা ও শক্তিগুলি ঠিকমত চিনে নেয়া, যাতে তিনি নিজের যুগ ও পৃথিবীকে সঠিক বুঝে নিতে পারেন। ইতিহাস তাই ঐতিহাসিকের মননলব্ধ চেতনার দান, অতীত ও অধুনার প্রাণবন্ত কথোপকথনের মিলনভূমি। ইতিহাসচেতনা বলতে জীবনানন্দও যে এ রকম একটি সম্বোধির কথা ভেবেছেন, তা তাঁর অনেক নিবন্ধ থেকেই স্পষ্ট হয়। 'কবিতার আত্মা ও শরীর' নিবন্ধটিতে তিনি বলেন, মানুষের আবহমান পৃথিবীর শীর্ষে এ নতুন পৃথিবী এবং মানুষের অনেকদিনের চেনা সত্য-মিথ্যার কুয়াশা ভেদ করে আজকের নতুন মিথ্যা ও সত্যের শরীরে অংকিত বিজ্ঞানের স্বাক্ষর—এসব নিয়েই আজকের কবির সৃষ্টিবলয়। 'মাত্রাচেতনা' প্রবন্ধটিতে জীবনানন্দের নির্দ্বিধ প্রশ্ন, ইতিহাসধারার অনুগত কবি ইতিহাস ও সমাজ পরিচ্ছন্নভাবে মর্মস্থ করতে পেরেছেন কি? কোনও স্পষ্ট পলায়নপ্রবণ উত্তরে তিনি আস্থাবান নন। তাই যাঁরা বলেন, 'এ যুগের ইতিহাস অন্তঃসার হারিয়ে ফেলেছে এবং এসবের আশ্রয়ী শিল্পও তাই এই রকম', তা তিনি সদুত্তর বলে মানতে পারেন নি। তিনি জানেন-সমাজ ও ইতিহাসকে মর্মস্থ করতে হলে 'মাত্রাচেতনায় পৌছান চাই', যে চেতনার বলে 'জীবনের ও ইতিহাসের সত্যের ওপিঠ ও এপিঠের অন্তিমবর্ণে নিজেকে মানবকে ফলিয়ে তুলে একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায়'। কবির পক্ষে এ চেতনা সার্থক ইতিহাসবেত্তার কাছে যতখানি, তার চেয়ে কম জরুরি নয়। কারণ, জীবনানন্দ চেয়েছিলেন : 'কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান'। কারণ, উপলব্ধি ও মননের যে সমস্ত অনুকণা নিয়ে মানবতা ও কবি-মানসের ঐতিহ্য, তার 'পবিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার' পক্ষে ইতিবৃত্তধারা ও সময়বিস্তার সম্পর্কে কবিকে স্বচেতনায় প্রতিষ্ঠ হতেই হয়।[১৫] আর সাহিত্য তথা কবিতায় সেই ঐতিহ্য রূপায়িত করতে হলে প্রয়োজন ভাবপ্রতিভার—'যা প্রজ্ঞাকে স্বীকার করে নিয়ে নানা রকম ছন্দে অভিব্যক্ত হয়'। এ ভাবপ্রতিভা বা ইমাজিনেশনের কাজ হলো 'কবিমানসে আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে মানুষের আবহমান অভিজ্ঞতাকে আরো ঠিকভাবে বুঝবার সুযোগ করে দেয়া'।[১৬] আবহমানকালের মানবসমাজ এবং তার ঐহিক ও আত্মিক জীবনধারার ক্রমবিকাশী অনুবর্তনের এ বোধ-ই জীবনানন্দের কাব্যে ইতিহাসচেতনারূপে উপস্থিত।

এ ব্যাপ্ত ইতিহাসবোধ জীবনানন্দের মননে একক ও অবিবর্ত কোনো উপাদান নয়। নিজের সমাজ ও স্বকালের সংশ্লেষ তাকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত দিয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে।

জীবনানন্দ আবহমানকালের মানবেতিহাসকে কখনই স্বকাল ও যুগনিরপেক্ষ বিশেষত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন নি। ইতিহাস প্রসঙ্গে তাঁর সকল সদুক্তির সঙ্গেই বিজড়িত হয়ে আছে 'সমাজ ও সময়-অনুধ্যানের' কথা। তিনি বলেন, 'ইতিহাস বেদের দরকার এবং সমাজ বেদের'; কিংবা বলেন, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার' এমন এক

১৪. Thoughts out of Season; 1909; PP 65-6.
১৫. 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য'/কবিতার কথা।
১৬. 'কবিতার আত্মা ও শরীর'/ঐ।

প্রসঙ্গে, যখন 'কবিতার অস্থির ভিতরে' তিনি খুঁজছেন ইতিহাসচেতনা।[১৭] অনুরূপভাবেই দেখানো যায়, কাব্যস্রষ্টার ইতিহাসবেদকে তিনি পরিচ্ছন্ন সময়চেতনার নিকষেই যাচাই করে নিয়েছেন। যে অর্থে ক্রোচে বলেন, 'সব ইতিহাসই সমকালীন', প্রায় অনুরূপ অর্থেই বলা যায়, জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা 'দেশ কালের সীমা-প্রসৃতির', মধ্য হতেই উদ্ভূত : 'গত এক হাজার বছরের দর্শন ও সাধন সংকল্পে অবিশ্বাস, নতুন বিজ্ঞান ও সংকল্পের ভূমিতে বিশ্বাস—কবিদের চেতনার দেশে এ দু'রকম টানের মর্মান্তিক উপলব্ধি হবে বিপ্লবের দান ও কবিতার প্রেরণা'।[১৮] জীবনানন্দের কাব্যের ক্ষেত্রেও ইতিহাসচেতনার এক পা এ আলোড়িত, বিপর্যস্ত অধুনায়, অপরটি মানব-ইতিহাসের অতীত ঐতিহ্যে; এবং এই দ্বিলোকচারী চেতনা মানব-ভবিষ্যের পাথেয় আহরণ করে নেয় ইতিবৃত্তের ঘনঘটার অন্তরালবর্তী প্রাণশক্তি থেকে। ইতিহাসের ঘটনাবহুল বহিরঙ্গে জীবনানন্দের কল্পনা কদাচিৎ উচ্চকিত হয়েছে; তিনি প্রবেশ করেছেন তার আন্তর রহস্যে এবং কল্পনামনীষার আলোকে খুঁজে নিয়েছেন মানবেতিহাসের অপ্রতিরোধ ক্রমউত্তরণের প্রাণবর্তিকাটিকে।[১৯] তাই সমাজচেতনা ও সময়ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনাকে তার যথার্থ বিস্তারে তথা উদ্ভাসনে বোঝা যায় না।

কবি-আলোচক জীবনানন্দের কাছে যে ইতিহাসচেতনার গুরুত্ব এমনই অপরিসীম, তাঁর নিজের কবিতার জগতে সে চেতনার কি জাতীয় উদ্ভাস ঘটেছে, তা-ই হবে আমাদের অনুসন্ধানের পরবর্তী বিষয়। তাঁর কাব্যের পূর্বাপর অনুশীলনে একটি ইতিহাসবোধ সক্রিয় দেখি। কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও বা খুব-ই স্পষ্টভাবে কাব্যঅবয়বকে অধিকার করে থাকা সেই বোধ তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনও আকস্মিক আবির্ভাবে চিহ্নিত নয়। আদিগ্রন্থ 'ঝরাপালক' থেকে শেষতম রচনাটি পর্যন্ত সর্বত্রই এ চেতনার আসা-যাওয়া লক্ষ্য করা যায়। আবার সমাজবোধের সংশ্লেষে এ ইতিহাসচেতনার পরিণত ও উজ্জ্বলতর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে 'সাতটি তারার তিমির' ও তার পরবর্তীকালের কবিতাবলীতে। আমাদের এ পর্যালোচনায় জীবনানন্দের যেসব কবিতায় ইতিহাসবোধ স্পষ্টতর চেহারায় উদ্বর্তিত মাত্র, সেগুলিই বিশ্লেষিত হবে। সেদিক থেকে তাঁর আদিতম গ্রন্থের 'পিরামিড' এবং কবির জীবৎকালে প্রকাশিত শেষতম গ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমিরে'র, 'মকর সংক্রান্তির রাতে' কবিতা দু'টি জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনার উদ্ভব ও পরিণতির পথে দুটি দিশারী দিকচিহ্নের মত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তাঁর কাব্যের আলোচকদের অনেকেই এমন কিছু কবিতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন, যেখানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্র বা স্থানের উল্লেখ রয়েছে এবং সেরকমভাবেই শ্রাবস্তী বিদিশা-সিংহল-সমুদ্র কি কাঞ্চী-কুরুবর্ষের উল্লেখে তাঁরা ইতিহাসচেতনার অভিজ্ঞান পেয়ে যান। সবিনয়ে বলবো, এ জাতীয় স্থান-কাল-পাত্রোল্লেখ যতটা ঐতিহাসিক, প্রায় ততটাই ভৌগোলিক। জীবনানন্দ যখন বলেন, 'চীনে কুরুবর্ষে বেথলেহেমে', তখন সেই

---

১৭. 'কবিতাপাঠ' এবং 'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য'/ক.কথা।

১৮. 'সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা'/ক. কথা।

১৯. 'সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা'/ক. কথা।

উল্লেখমাত্রই তাঁর ইতিহাসচেতনার পরিচয় রাখে না। তাঁর নিজের সৃষ্টির পরিধিতে ইতিহাসচেতনা ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক উল্লেখমাত্রকে অতিক্রম করে মননের গভীরে লালিত এক উত্তরণপ্রয়াসী অন্বেষার বোধ। এ বিষয়ে জীবনানন্দ নিজেই লিখেছেন, 'সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে আমার কবিতা চেতনা হয়তো দেখিয়েছে, আরো বড় চেতনায় উত্তরপ্রবেশ করেছে, কিন্তু সেই জ্ঞানদৃষ্টি কি পেয়েছে, যা সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে? কিন্তু কোন কবি তাঁর কবিতায় সেই অমোঘ বিজ্ঞানদৃষ্টির প্রভাবে সমাজ ও পৃথিবীকে নতুন পথ দেখিয়েছে—কবি লক্ষিত সেই পথ বেয়ে মানুষ তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত সমাজ পেয়েছে? প্রয়াণের প্রথমদিন থেকে শুরু করে আজো আমরা সে সমাজ পাইনি'।[২০] এ উচ্চারণের পর আর দ্বিধার অবকাশ থাকে না, জীবনানন্দের কাছে ইতিহাসচেতনার অর্থ নিছক অতীত ইতিহাসের আবহ পরিমণ্ডল রচনা নয়, মানবেতিহাসের অন্তর্লীন প্রেরণা ও প্রয়াণের সুরটিকে চিনে নেয়া ও চিনিয়ে দেয়া। তাঁর সৃষ্টিতে ইতিহাসের এ ভাবসত্যের উপস্থাপনার পর্যালোচনাতেই আমাদের আগ্রহ।

'পিরামিড' কবির আদিতম গ্রন্থ 'ঝরাপালকে'র একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হলেও তখনো জীবনানন্দ তাঁর নিজের কাব্যভাষা খুঁজে পাননি। তবু সেই শিক্ষানবিশী যুগের অনতিসার্থক কবিতাটিতে স্ফুট হয়ে আছে কবির ইতিহাসবোধের প্রথম অঙ্কুরিত রূপ। কবিতাটি তার বিশিষ্ট মিশরীয় পরিমণ্ডল ও প্রাচীন লোকাচারের বিষয়বস্তুকে অধিগত করে ইতিহাসের একটি বিশেষ ভাবসত্যকেই প্রতিষ্ঠা করেছে। ইতিহাসের মধ্যে আছে লুপ্তি ও বিনাশের মধ্য দিয়ে নব জাগরণের ইঙ্গিত। মৃতদেহ অবিকৃত ও সংরক্ষিত রাখার যে মিশরীয় আচার, তার মধ্যেও রয়েছে পুনরুত্থানের একটি প্রত্যাশা : 'খুলে যাবে কবে রুদ্ধ মায়ার দুয়ার/মুখরিত প্রাণের সঞ্চার/ধ্বনিত হইবে কবে কলহীন নীলার বেলায়—/বিচ্ছেদের নিশি জেগে আজও তাই বসে আছে পিরামিড হায়'। 'পিরামিড' জীবনানন্দের কাছে শুধুমাত্র 'অবিচল স্মৃতির মন্দির' নয়, তার অতীতের স্তব্ধ 'প্রেত-প্রাণে'র মধ্যেও রয়েছে একটি স্বপ্নময় প্রত্যাশা : 'মিশর অলিন্দে কবে গরিমার দীপ যাবে জ্বলে'। এভাবেই পিরামিড হয়ে উঠেছে ইতিহাসের ভাবসত্যের প্রতীক, পুনরভ্যুদয়ের ইঙ্গিতবহ। প্রায় অনুরূপ একটি বক্তব্য এ গ্রন্থের 'মিশর' কবিতাটিতেও ধরা পড়ে : 'শীতল পিরামিডের মাথা গীজের মূরতি/অংক-বিহীন যুগসমাধির মূক মমতা মথি'/আবার যেন তাকায় দূরে উদয়গিরির পানে/'মেম্ননের' ঐ কণ্ঠ ভরে চারণ বীণার গানে।' 'ঝরাপালক'-এর 'নাবিক' ও 'সিন্ধু' কবিতা দুটিও প্রাসঙ্গিক উল্লেখের দাবি রাখে। আরও বড় চেতনার লোকে মানবসভ্যতার যে উত্তরপ্রবেশের কথা পরিণত জীবনানন্দ বার বার শুনিয়েছেন, তার পরিণত কাব্যরূপ 'নাবিক' ও 'নাবিকী' এ দুটি কবিতায়, 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থটিতে বিধৃত। নাবিকীর সেই চিত্রকল্প অপরিণত, প্রভাবিত কাব্যশৈলীর মধ্য থেকেও 'ঝরাপালকে'র উল্লিখিত কবিতা দু'টিতে আবদ্ধ : 'কোন দূর দারুচিনি লবঙ্গের দ্বীপ লক্ষ্য করি ছুটিতেছে নাবিকের হৃদয়মাস্তুল'।[২১] আবার সমুদ্র তার 'উলঙ্গ নীল তরঙ্গের গানে/কালে কালে দেশে মানুষ-সন্তানে/শিখায়েছে

---

২০. 'ময়ূখ'/জীবনানন্দ সংখ্যা : পত্র ৪।
২১. 'নাবিক'/ঝরাপালক।

দুর্দম দূরাশা দুশ্চর তটের লাগি' ।[২২] অভিযান ও প্রয়াণের যে ভাব দুটিকে আশ্রয় করে জীবনানন্দের ইতিহাসবোধ তাঁর পরিণত কাব্যসৃষ্টিতে সক্রিয়, তার অস্বচ্ছ, মণ্ডনহীন রূপ 'ঝরাপালকে'র কবিতাবলীতে। কাব্যের বহিরঙ্গ প্রসাধনেও জীবনানন্দ কখনও কখনও ইতিবৃত্তের উপাদান গ্রহণ করেছেন, যদিও অনেক সময়-ই সেসব কবিতা রোমান্টিক প্রেম ও স্বপ্নের হর্ষ-বিষাদের চেয়ে বড় কোনও উচ্চারণ রাখেনি। 'অস্তচাঁদ' কবিতাটিকে কবি চিরকালীন প্রেমিকসত্তাকে খুঁজতে গিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন 'আশীরীয় সম্রাট', 'ক্রুবাদুর কবি', 'স্পেনীয় দস্যু' কি 'কিশোর কৃষ্ণের' বেশে। কিন্তু নিজস্ব কাব্যভাষার অভাবে এবং অনুভাবনার দুর্বলতায় এ জাতীয় রচনা শুধু কৌতূহল-ই উদ্রিক্ত করে, নান্দনিক তৃপ্তি আনে না। পরিমিতি ও শিল্পচেতনার অভাবে ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনার প্রয়াসও অপটু হয়ে পড়ে।

'ঝরাপালক' থেকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—প্রকাশকালের ব্যবধান মাত্র নয়টি বছর হলেও রচনাকালের ব্যবধান বিস্তৃততর বলেই মনে হয়। বাংলা কবিতার পক্ষে অভিনব, কিন্তু আপন অন্তর্মুখী ও ইন্দ্রিয়সংবেদী প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত, একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব কাব্যভাষা শেষোক্ত গ্রন্থে জীবনানন্দের করায়ত্ত। অধিগত সেই বিষয়বস্তুও, যা তাঁর স্বকীয় উচ্চারণের পক্ষে যথার্থ; নিসর্গ ও তার প্রেক্ষাপটে প্রেম। কিন্তু যে পারিপার্শ্বিকচেতনার অন্তঃপ্রবেশে তাঁর কবিতা 'প্রৌঢ় পরিণতি' লাভ করেছে বলে জীবনানন্দ নিজেই মনে করেন[২৩], এবং যে পারিপার্শ্বিক অবশ্যই সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে, তার লক্ষণীয় অনুপস্থিতি এ কাব্যগ্রন্থেও। যদিও 'হূন'[২৪]-এর মত স্পষ্ট ঐতিহাসিক শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, তা কোনও ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল বা ইতিহাস সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, নিছক শৈল্পিক প্রয়োজনে। জীবনানন্দের ইতিহাসস্পর্শী প্রথমদিকের অনেক রচনাতেই যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যের অবিমৃষ্যকারিতা ও অসারতা ধ্বনিত,[২৫] রণরক্ত কোলাহলের ঊর্ধ্বে মানবাত্মার অবিনাশী প্রত্যয় ও শুভ অন্বিষ্টের কথাও তিনি বার বার শুনিয়েছেন তাঁর পরিণত রচনায়। সেই পরিণত মানবিক উপলব্ধির একটি নাটকীয় প্রক্ষেপণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অবসরের গান' কবিতাটিকে সহসাই উদ্বেলিত করে :

জানিতে চাইনা আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে,—
কোথায় নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়;
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের আগুনের রং
দামামা থামায়ে ফেল—পেঁচার পাখার মত অন্ধকারে
ডুবে যাক্ রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ।

তবু মনে রাখা ভাল, এখানে উচ্চারণ কোনও ইতিহাসচেতনাজাত প্রত্যয়ে সুদৃঢ় নয়, সংগ্রাম ও রণকোলাহলের উদ্দামতা থেকে কবি-মানস শুধু আশ্রয় খুঁজে নিতে চায়

২২. 'সিন্ধু'/ঝরাপালক।
২৩. 'ময়ূখ'/জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা—পত্র ৪।
২৪. 'শকুন'/ধূসর পাণ্ডুলিপি।
২৫. 'চাঁদিনীতে'/ঝরাপালক।

নিসর্গলোকের রূপ আর কামনার গানে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র জীবনানন্দ প্রেম আর পিপাসার কবি; তিনি 'পৃথিবীর পথ' ছেড়ে দিয়ে 'মায়াবীর নদীর পারের দেশে' ছুটি পেতে চান। তবু চকিত হতে হয় কখনও তাঁর উপলব্ধিতে ইতিহাস-সত্যের ক্ষণিক বিদ্যুৎ উদ্ভাসে : 'যোদ্ধা-জয়ী-বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে—পাশাপাশি জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি'। কবির ইতিহাসচেতনার এ আরেকটি মনোবীজ—ইতিহাসের যে ঘনঘটা, যে লিপ্সা ও রক্তাক্ততা যুগে যুগে সাম্রাজ্যের পতন-উত্থানের কারয়িত্রী শক্তি যে সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন না; তবে বিপুল সময়ের পটে সেসবের অসারতা এবং মনুষ্যত্বের অন্তর্জাত প্রেরণার কথা তিনি আরও গভীরভাবে জেনেছিলেন বলেই পরবর্তী পর্যায়ে 'রূপসী বাংলা'য় পৌঁছে অভিনিবিষ্ট পাঠক এধরনের মননজীবিতার অনুবর্তন বার বার অনুভব করেন :

ক. বেবিলোন্ কোথা হারায়ে গিয়েছে—মিশর অসুর কুয়াশা কালো,
['চাঁদিনীতে'/ঝরাপালক]

খ. এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।
['মুখপত্রিকা'/রূপসী বাংলা]

গ. পিরামিড ধুলো আজ—ঝরে গেল কতবার প্রান্তরের ঘাস
['সনেট'/রূপসী বাংলা]

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। 'পিরামিড'-এ যে ইতিহাসচেতনার অঙ্কুরোদ্গম এবং পরিণত কাব্যসৃষ্টিতে যে চেতনা সমাজ ও সময়-ভাবনার সংশ্লেষে একটি প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে অভিষিক্ত, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়সংবেদী অবগাহনে 'হৃষ্ট' জীবনানন্দের কবি-মন সেই চেতনার কোনও উজ্জ্বলতর অভিজ্ঞান রাখেনি।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কাব্যধারার অনুগত কিছু কবিতা মরণোত্তরকালে প্রকাশিত 'রূপসী বাংলা' গ্রন্থে সংকলিত; বাগ্‌রীতি ও বিষয়সাযুজ্যে এগুলি পূর্বগ্রন্থের স্বগোত্র। এখানেও তিনি একদিকে যেমন নৈসর্গিক মাধুরীর তৃষিত রূপকার, অপরদিকে তেমনই মানবিক প্রেমের ব্যথা-বেদনা-আনন্দের ঘনিষ্ঠ আস্বাদনে ব্যগ্র। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শেষ কবিতাটিতে জীবনানন্দ নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন 'পৃথিবীর পথ' থেকে। 'পৃথিবীর যত ব্যথা-বিরোধ-বাস্তব' সেসবের থেকে কবি 'স্বপ্নের হাতে' নিজেকে সমর্পণ করেছেন, কারণ—

পৃথিবীর পুরনো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়। ('স্বপ্নের হাতে'/ধূসর পাণ্ডুলিপি)

সমাজ ও ইতিহাসঘটিত যে 'পারিপার্শ্বিক চেতনা', জীবনানন্দের নিজের-ই মতে, তাঁর ইতিহাসচেতনার প্রধান উপাদান।[২৬] 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগের কাব্যে তার অনুপস্থিতি

২৬. 'ময়ূখ'—চিঠিপত্র—৪।

প্রকৃতিপ্রেমিক জীবনানন্দ নিজেকে আবিষ্কার করেছেন দুই মহাযুদ্ধ আলোড়িত পৃথিবীর তীব্র সচেতন যন্ত্রণাদীর্ণ আধুনিকের চেতনার প্রবক্তা হিসেবে। অন্তিমপর্বের রচনায় জীবনানন্দের ইতিহাস সচেতনতা 'কালজ্ঞানে'র পরিচ্ছন্নতায় সবচেয়ে স্পষ্ট ও পরিণত। সেখানে পৌঁছার আগে, 'বনলতা সেন' যুগেও কবির ইতিহাসবোধ সচেতন মননোদ্ভাসিত, যদিও তা স্বকাল ও সমাজ অভিজ্ঞতার আশ্লেষে ততোটা যন্ত্রণাদীর্ণ নয়, যেমনটি তাঁর সৃষ্টির শেষ অধ্যায়। 'বনলতা সেন'-যুগে জীবনানন্দের কাব্যের প্রতীকায়নের শিল্পসিদ্ধ প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং কবিতাকে একটি পরাবাস্তব ব্যঞ্জনায় পৌঁছে দিতে তা কেমনভাবে সাহায্য করেছিল, সে আলোচনা অন্যত্র করেছি।[২৯] এ পর্বের সৃষ্টিতে একটি সক্রিয় ইতিহাসবোধ একদিকে যেমন কাব্যের পরিমণ্ডল রচনায় জীবনানন্দকে সাহায্য করেছে, যেমন 'বনলতা সেন' কবিতাটিকে খুব-ই স্পষ্টতার সঙ্গে, অন্যদিকে তেমনই ইতিহাসের নিগূঢ়তার ভাবসত্যে অভিষিক্ত করেছে কাব্যকে, যেমন 'সুচেতনা'য়।

'বনলতা সেন' নাম কবিতাটি জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা প্রসঙ্গে প্রায়ই উল্লিখিত হয়। সেসব উল্লেখ অবশ্য কিছু বিকীর্ণ ইতিহাস-উপাদানের চয়নেই নিরস্ত হয়—'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, 'বিদিশা' বা শ্রাবস্তীর' নামোল্লেখের মতন। কিন্তু ইতিবৃত্তস্পর্শী এ জাতীয় উল্লেখ একটি মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনা ছাড়াও এ কবিতার ভাববস্তুতে সঞ্চারিত করেছে ব্যাপ্তি ও গভীরতা। 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে কবি যখন-ই বলেন, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' তখন-ই কবিতাটির মধ্যে কবির ব্যক্তি ও উত্তরব্যক্তি সত্তা একটি 'কৃতার্থ সংস্থানের' মধ্যে আশ্বস্ত হয়; স্রষ্টা তখন নিজেকে আবহমান মানবাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে নেন। এ পথ হাঁটা, যা দেশকালের সীমারেখা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত (বিম্বিসার অশোকের জগৎ থেকে সিংহলসমুদ্র কি মালয়সাগর পার হয়ে), কোনও 'দুশ্চর তটের' সন্ধানে, কোনও প্রার্থিতের-ই অন্বেষায় স্বীকৃত। কবিতার রূপকল্পের গণ্ডিতে সেই অন্বিষ্ট বনলতা সেন স্বয়ং; কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপ্ত পটভূমিতে তা মানবের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সমুদ্র ও নাবিকীর অনুষঙ্গ এ ব্যাকুল অথচ দিশাভ্রান্ত অন্বেষার ব্যঞ্জনা ঘনীভূত করেছে। কবির ইতিহাসচেতনা এখানে কবিতাটিকে সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় মানবাত্মার ক্লান্তিহীন যাত্রা ও উত্তরণের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধতর করেছে। বনলতা যে শেষাবধি কবির ব্যক্তিসত্তার প্রেমার্ত নিবেদনকে অতিক্রম করে হয়ে ওঠেন মানবাত্মার চিরকালীন শ্রেয় ও প্রেয় অন্বিষ্টের প্রতীক, একটি প্রত্যয়ী ঐতিহাসবোধের সংশ্লেষেই সেই 'ইঙ্গিতের দিব্যতা।'[৩০] সম্ভবপর হয়েছে।

মানুষের আবহমান অভিজ্ঞতাকে যুগ প্রতিবেশিচিহ্নিত সমাজ এবং আনন্ত্য উৎসারী সময়ের প্রেক্ষিতে ঠিকমত বুঝে নেয়াই জীবনানন্দের কাছে ইতিহাসের সঠিক বোধ বলে মনে হয়েছিল। সেভাবে দেখলে, মানবেতিহাসের মধ্যে একটি ক্লান্তিহীন অন্বেষার স্বর এবং নবসভ্যতায় উদ্বর্তনের প্রাণনা তিনি গভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন। 'বনলতা সেন' গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায়, চিত্রকল্পের ইঙ্গিতে এবং উচ্চারণের স্পষ্টতায় এ চেতনা কাব্যরূপায়িত। অন্বিষ্টের সন্ধানে মানবতার চিরযাত্রার ব্যঞ্জনাটি স্পষ্ট করতে

২৯. 'অন্যতর মূল্যায়নে'—প্রদুম্ন মিত্র; প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, ১৯৫৫।
৩০. 'কবিতার কথা', পৃ : ২১।

লক্ষণীয় হলেও নবীনতর ও সমৃদ্ধতররূপে সে 'ইতিহাসবেদ' পুনরাবির্ভূত 'বনলতা সেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে। সন্ধিপর্বে 'রূপসী বাংলা'র চতুর্দশী স্তবকবন্ধগুলির অবিরল স্রোতে ভাসমান থাকে তবু উপলব্ধি ও মননের এমন কিছু কণিকা, যা তাঁর ইতিহাসবোধের পুনরুদ্বর্তনে সাহায্য করে। 'রূপসী বাংলার' হৃষ্টকবি এ পৃথিবীতে 'অবসর নিতে' এসেছেন। তাঁর সেই অবসরের জগৎ রূপ-গন্ধ-বর্ণচ্ছটায় মনোরম, স্বপ্নঘন; তবু তা একান্তই আঞ্চলিক। তিনি বাংলার রূপ, তার অপরাজিতার মত নীল আকাশ, তার 'নরম ধানের গন্ধ', 'কলমির ঘ্রাণ', 'হাঁসের পালক', পুকুরের জলে 'চাঁদা-সর-পুঁটিদের মৃদুঘ্রাণ', 'কিশোরীর চাল ধোয়া ভিজে হাত'—এসবের মধ্যে অনুভব করেছেন 'বাংলার প্রাণ'।

কিন্তু 'পৃথিবীর পথ থেকে' বহুদূর ক্ষুদ্র এক ভৌগোলিক খণ্ডের অধিবাসী 'হৃষ্ট কবি' সময়ের বহতাধারায় বৈনাশিকতার পটে সৌন্দর্যের যে নশ্বরতা অনুভব করেন তীব্র গাঢ় মৃত্তিকামাটির প্রেমে, তা-ই যুদ্ধ আর সাম্রাজ্য-বিস্তারের অসার তুচ্ছতা তাঁর চেতনায় প্রতিফলিত করে দেয়। বাংলার 'হৃষ্ট, কবির মন তখন 'দূর পৃথিবীর গন্ধে ভরে ওঠে'।[২৭] কবির চেতনাজগতের এ প্রসারণ, আঞ্চলিক সীমা-বিমুক্তির পটে ইতিহাসের সত্যের নতুন উদ্ভাসনাই[২৮] তাঁকে মানুষের অক্লান্ত স্বপ্ন, এবং সেই স্বপ্নের রক্তাক্ত জটিল পথের রেখা চিনে নিতে বলে :

> আমরা মিনার গড়ি-ভেঙে পড়ে দু-দিনেই স্বপনের ডানা ছিঁড়ে ব্যথা
> রক্ত হয়ে ঝরে শুধু এইখানে-ক্ষুধা হয়ে ব্যথা দেয় নীল নাভিশ্বাস
> ফেনায়ে তুলিছে শুধু পৃথিবীতে পিরামিড যুগ থেকে আজো বারোমাস;
> কবি জেনেছেন, স্বপ্নে 'রক্তাক্ততা' আছে, তবু স্বপ্নই সত্য :
> জানি আমাদের স্বপ্ন হতে অশ্রু ক্লান্তি রক্তের কণিকা
> ঝরে শুধু, স্বপ্ন কি দেখেনি বুদ্ধ নিউসিডিয়ায় বসে দেখেনি মণিকা?
> স্বপ্ন কি দেখেনি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড় বাংলা, দিল্লি, বেবিলন?

মানুষের হৃদয়ের এ ক্লান্তিহীন স্বপ্নের উদ্যম-ই শেষ পর্যায়ের কাব্যে পারিপার্শ্বিক চেতনার সংশ্লেষে 'প্রৌঢ় পরিণতি' লাভ করে 'প্রয়াণের শুভ স্বপ্ন' হয়ে ওঠে। মানবেতিহাসের অন্তরালবর্তী অন্বেষা ও অগ্রসৃতির চেতনাবহ কবির সেই উপলব্ধি :

> নচিকেতা জরাথুস্ত্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
> হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
> ['সময়ের কাছে'/'সাতটি তারার তিমির']

মনে হয়, 'রূপসী বাংলা' যেন কবির নিজেরও পরিস্ফুট কামনার অগোচরে ধরে রেখেছে সময় ও ইতিহাসচেতনার কিছু কণিকা। পরবর্তী কাব্যযুগের প্রতিনিধিত্ব করছে 'বনলতা সেন' গ্রন্থটি। জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টিতে এ গ্রন্থ একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। 'মহাপৃথিবী'র প্রায় সমকালীন রচনায় সংকলন হয়েও কবির সৃষ্টি-পরিসরে আর একটি সন্ধিপর্বের সূচনা করছে। কারণ, এ সংকলনেয় কবিতাগুলি রচনার সময় থেকেই

---

২৭. রূপসী বাংলা; (সিগনেট সং/পৃঃ ৫১)।
২৮. 'নতুন আগ্রহে গন্ধে ভরে ওঠে পৃথিবীর শ্বাস'/রূপসী বাংলা, পৃ: ৫৯।

কবিতায় তিনি বার বার ব্যবহার করেছেন নাবিক ও নাবিকীর চিত্রকল্প। অন্যদিকে প্রার্থিতকে চিহ্নিত করেছেন সৌরচেতনার হিরন্ময় আলোকে, যা হলো 'অন্ধকার থেকে এসে নবসূর্যে জাগার মতন'। 'ভোরের কল্লোল', 'অনন্ত সূর্যোদয়', 'অন্তিম প্রভাবে'-এর মত শব্দবন্ধনির্মাণ 'সিন্ধুরাত্রি মৃতদের রোল' কিংবা 'শাশ্বত রাত্রির' চিত্রের বিপরীতে বার বার যা রাখা হয়েছে এ গ্রন্থে, তা মানবাত্মার তিমিরাভিযান ও নবসভ্যতার তিমির বিনাশী ভাবনা কণিকাকে বহন করেছে। 'বনলতা সেন', 'সুচেতনা', 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা', 'মিতভাষণ', এবং 'হাজার বছর শুধু খেলা করে'—এ কবিতাগুলির একত্রিত এবং অভিনিবিষ্ট পাঠে যে ধারণা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, তা হলো : সময় একটি অবিরল বিশাল প্রবাহ, মানব সেই কালস্রোতে ভাসমান 'নাবিক' এবং তার লক্ষ্য এক 'নবপৃথিবী'। কবি নিজেকে আবহমানকালের মানবাত্মার প্রতিভূরূপে দেখেছেন এবং সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় মানবের অক্লান্ত অন্বেষাকে প্রেমের রূপকে উপস্থিত করে তার চিরন্তন আর্তি ও অভীপ্সাকে পরিস্ফুট করেছেন :

> সবিতা, মানুষ জন্ম আমরা পেয়েছি
> মনে হয় কোন এক বসন্তের রাতে
> ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেই সব জাতি
> তাহাদের সাথে সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন;
> আবার,
> অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা
> সিন্ধুর রাত্রির জল জানে
> আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে[৩১]

কিম্বা অন্যত্র,

> যেন সব মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
> ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
> আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে,—[৩২]

এ 'নবপৃথিবী' বা' 'নবসভ্যতা' বা 'বনলতা সেন' কবিতার 'দারুচিনি দ্বীপ', বা 'মিতভাষণ' কবিতার 'শ্রেয়তর বেলাভূমি'—সব ক'টি চিত্রকল্পই একটি প্রার্থিত অন্বিষ্টের প্রতীক, যার জন্য 'হাজার বছর ধরে' কিম্বা 'হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর'[৩৩] ও মানুষ সংগ্রামরত।

মানবসভ্যতার জয়যাত্রায় পথ যে 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থ্য', জীবনানন্দ তা জানতেন। ফরাসী বিপ্লবের আলোচনা করতে গিয়ে কার্লাইল বিস্মিত হয়ে ভেবেছেন, একদা যা ছিল সুস্থিত, শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত সমাজ তা কী করে ভয়াবহ সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কার্লাইল জেনেছিলেন এ ধ্বংসের অনিবার্যতা : 'Inevitable; it is the

---

৩১. 'সবিতা'/বনলতা সেন।
৩২. 'সুরঞ্জনা'/বনলতা সেন।
৩৩. 'পথহাঁটা'/বনলতা সেন।

breaking up of the world solecism, worn out at last."[৩৪] কবির অনুভবজারিত মননশীলতায় জীবনানন্দ জানান :

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে
বড় বড় নগরীর বুক ভরা ব্যথা,[৩৫]

যে শক্তি বা শৃঙ্খলা একটি যুগকে ধারণ করে রাখে, অন্যযুগের পক্ষে প্রায়-ই তা হয়ে পড়ে অপ্রয়োজনীয় শৃঙ্খলের মত; তখন ভাঙনের মধ্য দিয়েই আসে শৃঙ্খলামুক্তি ও নবীন জাগরণ। 'গ্রিক হিন্দু ফিনিশিয়া নিয়মের রূঢ় আয়োজনে'[৩৬] এ'ভাবেই পুরনো পৃথিবী পুড়ে যায়। ইতিহাসচেতনার আলোকেই জীবনানন্দ এসব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বলতে পারেন,

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন,
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে'[৩৭]

এ অসুস্থ বিকল পৃথিবীর ধ্বংস ও ভাঙনের শক্তিগুলিই পরোক্ষে কাজ করে যায় 'নবপৃথিবী'র উদ্বোধনের জন্য, এ সত্যই বার বার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

আগেই বলেছি, 'বনলতা সেন' পর্যায়ে জীবনানন্দের কাব্য গভীরভাবে প্রতীকাশ্রিত। 'সুচেতনা' কবিতাটি ইতিহাসচেতনায় নিষিক্ত হয়ে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় 'সু-চৈতন্যে'র উদ্বোধন ঘোষণা করে। এ সুচৈতন্য 'ইতিহাসবেদের'ই দান; কবিমানসে 'আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে' সে চেতনা মানবসভ্যতার শুভ ও কল্যাণবহ সম্পদগুলি চিনে নিতে সাহায্য করে। রণরক্ত কোলাহলে আলোড়িত ইতিহাসের ঘনঘটা যে মানবেতিহাসের শেষ কথা নয়, কবি তা জানেন। এ রক্তাক্ত কাজের আহ্বান, মারণপ্রবণতা আর অসার স্বর্ণলিপ্সার গ্লানি বুদ্ধ কনফুশিয়াসের মতো সাধকদের প্রাণ হয়তো বিমূঢ় করে দিয়েছে বার বার—তবু এ সংঘর্ষ, মৃত্যু আর অন্তহীন অন্বেষার পথেই আছে মুক্তি :

এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে,
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় ততদূর ভালো মানব সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

ইতিহাসচেতনার এর চেয়ে কাব্যসুষমাময় উচ্চারণ জীবনানন্দের নিজের কাব্যে অন্য কোথাও, এমন কি সমগ্র বাংলা কাব্যেও দুর্লভ। একটি সুস্থির ইতিহাসচেতনার

---

৩৪. The French Revolution, I, Ch. 4.
৩৫. 'সবিতা'/বনলতা সেন।
৩৬. 'মিতভাষণ'/বনলতা সেন।
৩৭. 'সুচেতনা'/ব. সেন।

অনেকগুলি দিক-ই এখানে শৈল্পিক তৃপ্তির কিছুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটিয়েই উচ্চারিত হয়েছে। 'ক্রম মুক্তি' এবং 'অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ' শব্দপ্রয়োগগুলি লক্ষণীয়। মানব-চৈতন্যের বিস্তারে মনীষীদের যে অবদান, তার জন্যেই সভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকা তাৎপর্যমণ্ডিত। হেগেলের সেই অনবদ্য সদুক্তিটি উদ্ধৃত করার প্রলোভন রোধ করা গেল না :

'The great man of the age is the one who can put into words the will of his age, tell his age what its will is and accomplish it. What he does is the heart and essence of this age; he actualizes his age.'[৩৮]

অতীতসমাজের সঠিক অনুধাবনের ফলে বর্তমান সমাজের শক্তিগুলির যথাযথ বিচার ও নিয়ন্ত্রণ, এ দ্বিবিধ দায়িত্বই ইতিহাসচর্চার দায়িত্ব। কোনো বিশেষ যুগের চিন্তা ও কর্মনায়কেরা সেসব সামাজিক শক্তির উদ্বর্তনে সাহায্য করেন তাদের ভাবনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে, যেগুলি পৃথিবীর স্থায়ী চেহারাটা বারেবারেই পাল্টে দেয়। ইতিহাসের শক্তিগুলি যে মানবসভ্যতাকে নিয়ে চলেছে নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং ইতিহাস যে কোনও আকস্মিক ও প্রক্ষিপ্ত পরিবর্তনের বিস্ফোরণ ঘটায় না—এ সবকিছুই উদ্ধৃত পঙক্তিগুলিতে উচ্চারিত। কিন্তু শিল্প-সৌকর্যের লেশতম ব্যত্যয় কবি সে উচ্চারণে ঘটতে দেননি। জীবনানন্দ এখানে সার্থকভাবেই স্বনির্দিষ্ট নিরীখের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আবেগ ও প্রজ্ঞাদৃষ্টির নিটোল 'সুরসাম্যে' 'সুচেতনা' কবির ইতিহাসভাবনার আর একটি অনবদ্য শিল্পকর্ম।

'সুচেতনা' কবিতার ইতিহাস-ভাবনা সম্পর্কে আরও একটি কথা থেকে যায়। হেরোডোটাস, থুসিডাইডিস প্রমুখ ধ্রুপদী ইতিহাসবিদরা মনে করতেন, যে সময়ের ইতিহাস তাঁরা লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন, তার আগে বা পরে তেমন অর্থবহ তাৎপর্যপূর্ণ কোনকিছু নেই। এ বিশ্বাসের প্রতিফলন লুক্রেশিয়াস-এর রচনায় :

'ভেবে দেখ অনন্তকালের অন্তর্গত অতীত যুগনিচয়, যা আমাদের জন্মপূর্ববর্তী, কিভাবে আমাদের চিন্তা-বিবেচনার বাইরের বিষয়। এ থেকেই বোঝা যায়, কিভাবে প্রকৃতি তুলে ধরে তার মুকুর সেই কালের দিকে, যা আমাদের মৃত্যুর পরবর্তী।'[৩৯] ধ্রুপদী কালের মানবযূথ অধুনার বাইরে অতীত কি ভবিষ্যৎপ্রমাণে নিজেদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেনি। সাহিত্য ও শিল্পকর্মে তাই উজ্জ্বল আগামীকালের কল্পনা প্রত্যাবর্তিত হয় কোনও অতীত স্বর্ণযুগের বোধনে। শুধু ভার্জিলিই তার ইনিডের প্রথম সর্গে এ ইতিহাসের চক্রাবর্ত গতিপথ থেকে কল্পনাকে মুহূর্তের জন্য মুক্তি দিয়ে বলেন : Imperium sine fine dedi. খ্রিস্টীয় চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশের সঙ্গে ইতিহাসকে দূরবীক্ষণী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার শুরু; আর তখনই ইতিহাস-চিন্তার মধ্যে ক্রমাগ্রগতির ধারণাটি প্রসার লাভ করে। ইতিহাস যখন অগ্রগমনের প্রতীক, তখনই

৩৮. Hegel : Philosophy of History : P. 295.

৩৯. Lucretius : De Rerum Natura (The Kingdom of Nature)", iii* his ego nec metas rerum nec tempora pono : Imperium sine fine dedi (I, 278-9) To them I give no bounds in space or time, But empire without en'-Maurice Bowra's translation in From Virgil to Milton'.

মানব-সমাজের অতীত কর্মকাণ্ডগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যমুখিনতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব—ইতিহাসের অন্তর্গূঢ় শক্তিগুলি তখন সভ্যতা থেকে নব-সভ্যতার অর্থহীন চক্রাবর্তে মানব-সমাজকে পৌঁছে দেয় না, উত্তরিত করে দেয়, যেমন জীবনানন্দ বলেছেন : 'আরো বড় চেতনার লোকে, শুভ ও পরিচ্ছন্ন সমাজ প্রয়াণের দিকে'। 'সুচেতন' কবিতায় জীবনানন্দ যখন সিদ্ধান্ত নেন :

দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়।

তখন ইতিহাসের চক্রাবর্ত তত্ত্বটিই বড় হয়ে ওঠে সে ভাষণে। তখন মনে হয়, কবি যদিও 'রণরক্ত কোলাহল শেষ সত্য' নয় বলে ঘোষণা করেছেন, যদিও 'ক্রম-মুক্তি'র বিশ্বাসে উদ্দীপিত, তবু যেন ইতিহাসের ঘনঘটার মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতার উত্তরণপ্রয়াসের বিশ্বাসদীপ্তি তেমন গভীর রেখাঙ্কিত নয় কবির মননে। সেই 'উদ্দীপ্তি' 'উত্তর-প্রবেশ' বা 'নবপ্রয়াণের' কথা শোনার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত, যেখানে প্রতিবেশ-চেতনার আশ্রয়ে তাঁর ইতিহাস-বোধ উজ্জ্বলতার পরিণতি পেয়েছে।

'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে পৌঁছলে জীবনানন্দের কাব্যে পালা-বদলের চেহারাটা স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ধরা পড়ে; এবং নিবিষ্ট পঠনে প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে অনুভব করা যায় এ গ্রন্থের প্রতীকী ইঙ্গিতময়তা। প্রতীকের সূক্ষতার উন্মোচন ছাড়া 'সাতটি তারার তিমির' নামকরণটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। সাতটি তারা আমাদের মনে নিয়ে আসে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ভাবানুষঙ্গ, যে সপ্তর্ষি ধ্রুবতারার সাহচর্যে মানবের কাছে ইতিহাস-কাল হতে পথের দিশারী। কিন্তু এ দিশারী সপ্তর্ষির আলোকের কথা কবি বলেন নি, বলেছেন তার তিমিরময়তার কথা। সধ্রুবসপ্তর্ষিমণ্ডল শাশ্বতকালের দিশারী; তার আলোক দিক্‌দর্শিন, দিশাহীনতার দ্যোতক নয়। জীবনানন্দ এখানে সাতটি তারার তিমিরময়তার প্রতীকে জানাতে চাইলেন সেসব রীতি, নির্দেশ আর মূল্যবোধের অর্থহীনতার কথা, যা এতকাল মানবকে তার সভ্যতা থেকে নবসভ্যতার উত্তরণের যাত্রায় পথ দেখিয়েছে। বিপন্ন অন্ধকারে, বিক্ষুব্ধ কালস্রোতের কলরোলে, মানুষ এতদিন নির্ভর করেছিল তার বিশ্বাস বোধ সংস্কার রীতির আলোকিত নির্দেশে; কিন্তু 'এই বিশ শতকে এখন আলো অন্ধকারের আর এক রকম মানে।'[৪০] এখন 'আঁধার নেপথ্য সব চারিদিকে/কূল থেকে অকূলের দিক নিরূপণে শক্তি নেই আজ আর পৃথিবীর—'।[৪১] প্রাচীন পথনির্দেশক সপ্তর্ষিমণ্ডল তথা মানবের বিশ্বাস ও মূল্যজ্ঞান আজ নির্দেশে পরাহত; তার আলো আজ মূল্যহীন, তাই তিমিরময়। যা আলোকদেশি, তার অন্ধকারময় হয়ে যাওয়ার এ মানস-অভিজ্ঞতাটি এ পর্যায়ের কাব্যে নানাভাবেই ধরা পড়েছে, কখনও কবিতার নামকরণে ('সূর্যতামসী', 'অন্ধকার থেকে'), কখনও বা চিত্রকল্পের পৌনঃপুনিক আবির্ভাব ('অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির' চিত্রকল্পটি একাধিক কবিতার ভরকেন্দ্রে রয়েছে—যথা

৪০. 'এইখানে সূর্যের', শ্রেষ্ঠকবিতা।
৪১. 'মানুষ যা চেয়েছিল'/বেলা অবেলা।

'রিস্টওয়াচ', 'সূর্যপ্রতিম'।) এসবের একটি কারণ, দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী ও অব্যবহিত পরে রচিত 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের[৪২] রচনায় যে 'তুমুল জটিল' পৃথিবীতে আধুনিকের বাস, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের যে টানে তার মানবসত্তা আলোড়িত, তার অবারিত প্রতিফলন ঘটেছে। ইতিহাসচেতনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ বার বার যে 'সমাজবেদ', 'প্রতিবেশ-চেতনা' বা 'পারিপার্শ্বিক-চেতনা'র কথা বলেছেন, তার সংশ্লেষেই উত্তর-পর্যায়ের কাব্য এমন আলোড়িত ও ভিন্ন মেরুবিন্দুতে আশ্রিত। কবিতাকে 'সমাজের মুখপাত্রে'র মত দাঁড় না করিয়েও তাঁর কাব্য 'নতুন যুগের প্রয়োজনে নতুনভাবে উপজাত' এবং 'সমাজের মর্মের ভিতরে' প্রবেশ করেছে।[৪৩] ফলে একালের কাব্যে 'ঝরাপালকে'র মত কোনও প্রয়াত স্বর্ণযুগে স্বপ্নপ্রয়াণের কথা নেই; নেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'রূপসী বাংলা'র ইন্দ্রিয়সংবেদী কোনও নিসর্গ-নিমজ্জন, পরিবর্তে রয়েছে 'মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাস'[৪৪] যা 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে' জেগে উঠে দেখে 'বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে'।[৪৫] আবিশ্ব মূল্যবোধের বিপর্যয়ে অভিভূত এ পৃথিবী যেখানে 'পংকিল সময় স্রোতে',[৪৬] 'ক্ষমাহীন রক্তে নিরুদ্দেশে', 'সীমাহীন ভ্রান্তিবিলাসে ক্ষতবিক্ষত জীব।'[৪৭] 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবি দাঁড়িয়ে রয়েছেন সমকালের তীক্ষ্ণাগ্রমুখ অসিফলকের মত চেতনার ভূমিতে; তাঁর সংবেদনশীল মন ধারণ করেছে আপন চেতনালোকে এক সমাচ্ছন্ন আঁধারের প্রহার : 'চোখের ওপরে/রাত্রি ঝরে/যেদিকেই তাকাই/কিছু নাই/রাত্রি ছাড়া'। 'কোথাও দিৎসা নেই', কোনো 'উদ্দীপ্তিও নেই'। মানুষের জীবনের উত্তরণ যেন মাঝপথে থেমে গেছে; মৃত্তিকার এ দিকে শুধু ঋণ রক্ত লোকসান ইতর খাতক—জীবনের মানে জীবনের নিকটে ব্যাহত। এ অবক্ষয়ের রলরোল 'বেলা অবেলা কালবেলা'র কবিতাগুলিতেও ধ্বনিত। সেখানে কবি প্রত্যক্ষ করছেন, 'জনমানব-সভ্যতার এক ভীষণ নিরুদ্দেশ যাত্রা'। 'ইতিহাসের গোলকধাঁধায় বন্দী মরুভূমি'র বাসিন্দা যেন মানব—স্খলিত নিহত তার মনুষ্যত্ব—'এক দুরপনেয় স্খলনের রক্তান্ধের বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি', যেখানে 'হয়তো বা অন্ধকার-ই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা/হয়তো বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক'। এ 'রক্তবণিক' পৃথিবীবাসের অভিজ্ঞতা যখন ইতিহাসবেদী চেতনায় অভিঘাত আনে, তখন জীবনানন্দকে লিখতে হয়, কিভাবে চেঙ্গিস আজও 'করুণ রক্তের অভিযানে'—'খোঁড়া পায়ে' তৈমুর চলেছে আগ্রাসে। রাষ্ট্রসমাজ 'অতীত অনাগতের কাছে তমসুকে বাঁধা', আর 'প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো'—ক্রমপরিণতির পথে মানব আজ শুধু 'লিঙ্গশরীরী' হয়ে গেছে।[৪৮]

৪২. সা. তা. তি; বেলা অবেলা ও অগ্রন্থবদ্ধ কবিতাবলী।
৪৩. 'রুচি বিচার ও অন্যান্য কথা'/ক. কথা।
৪৪. 'মনোসরনি'।
৪৫. 'সোনালি সিংহের গল্প'।
৪৬. 'কবিতা'।
৪৭. 'প্রতীতি'।
৪৮. 'গভীর এরিয়েলে', 'সময়ের তীরে', 'মহাত্মা গান্ধী , 'তোমাকে', 'যতিহীন'/বেলা অবেলা কালবেলা।

ওপরের উদ্ধৃতিবহুল অনুচ্ছেদটিতে, শুধুমাত্র কবির স্বকীয় উচ্চারণের সাহায্যেই, তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যের তীব্র সমাজ-সচেতন অস্তিত্ব-অভিজ্ঞতা স্পষ্ট করতে চেয়েছি। চারদিককার প্রতিবেশ-চেতনার আঘাতে পূর্ব পূর্ব পর্যায়ের অনেকটা গ্রন্থবলিভুক ইতিহাস বোধ এখানে বাস্তব অভিজ্ঞতার অগ্নিপরিধির মধ্যে দাঁড়িয়ে শুদ্ধতাভিক্ষু। কিন্তু আঘাত যেমন সচেতন করে, তেমনই আকস্মিকতায় বিমূঢ়ও করে। সেই বিহ্বলতার প্রাথমিক জাড্য ও দ্বিধা এসময়কার বেশ কিছু কবিতার জিজ্ঞাসাসংকুল চরণগুলিতে রেখাঙ্কিত। ইতিহাসের রণরক্ত কোলাহলে (যা কবির কাছে কখনই মনে হয়নি শেষ কথা) মহামানব-মনীষার নিরলস প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মানব ভবিষ্যের যে 'ক্রমমুক্তির' বাণী তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন 'সুচেতনা' কবিতায়, নাবিক-মানবাত্মার জন্য যে 'শ্রেয়তর বেলাভূমি'র আশ্বাসে নিশ্চিত ছিলেন তিনি 'বনলতা সেন' বা 'মিতভাষণ'-এর মত রচনায়, তা যেন পরবর্তীকালে কখনও কখনও 'অনাথ ইতিহাসের কলরবে' দূরশ্রুত, 'অন্তহীন অবক্ষয়ে' অবসিত, 'অলঙ্ঘ্য অন্ত্যশীল অন্ধকারে' লক্ষ্যভ্রষ্ট।[৪৯] মানুষের সভ্যতার উপরে তিমিরাচ্ছন্নতার যে বোধ এ পর্বের সৃষ্টিতে প্রকট, তারই স্বাভাবিক অনুষঙ্গে এসেছে এই দ্বিধা দিশাভ্রান্তি। কোনও প্রাককল্পিত বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্যে হিরন্ময় হয়ে উঠতে পারেন না অন্তঃপ্রেরণার কাছে বিশ্বস্ত জীবনানন্দের মত কবি। সমকাল ও স্বযুগের সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলি নিখাদ প্রতিফলিত হয় তাঁর কাব্যে। অনুভব ও আবেগের আদি আলোড়নের সঙ্গে ঐতিহ্যজ্ঞান ও প্রজ্ঞার মিলনে ঘনীভূত যে চেতনা মানবভবিষ্যে আস্থাশীল, প্রয়াণোন্মুখ এবং সৌর-করোজ্জ্বল ('কামানের ঊর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল' অর্থাৎ এক আলোকিত পৃথিবীর স্বপ্নে ভাস্বর), জীবনানন্দের সেই ইতিহাসচেতনা আবহমান মানব-অভিজ্ঞতায় 'পরিদীক্ষিত'। অতীত, অধুনা ও অনাগতের যথার্থ অনুধাবন তাঁর কাব্যে সুরসাম্যে সুস্থিত। ইতিহাসের নিরর্থক রক্তাক্ততার দিকেও তিনি যেমন অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন ('আত্তিলা চেঙ্গিস'), তেমনই ইতিহাসের অন্তর্জাত মনীষার উৎসবে সভ্যতার নিঃশব্দ প্রয়াণমুখী বিকাশের কথাও শোনাতে বিস্মৃত হননি ('বুদ্ধ কনফুশিয়াস, জরাথুস্ট্র-এঞ্জেলো-রুশো লেলিনের মনের পৃথিবী')। এভাবেই তাঁর চেতনালোকে শেষ পর্যন্ত তিনি শুনেছেন এক অবিনাশী আলোকদেশি গতির স্তব, যা 'সৃষ্টির অমল মরাল' বা 'আকাশহংসী'র প্রতীকে বার বার ফিরে এসেছে তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতাবলীতে। গতিই যে ইতিহাসের অন্তিম সত্য, জীবনানন্দ সেকথা ঘোষণা করতে ভোলেননি। ইতিহাসের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন দ্বন্দ্বের শক্তি। দ্বান্দ্বিক গতির ধারণায় আপন প্রজ্ঞা ও ইতিহাসবোধের দ্বারস্থ ছিলেন বলেই তিনি অনায়াসে উচ্চারণ করেছেন 'গতির গুণগান'। স্থিতির শান্তিতে মানব মুগ্ধ হতে চেয়েছে বার বার, কিন্তু 'কোথাও আঘাত ছাড়া তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই'। জীবনানন্দের উজ্জীবিত আহ্বান তাই বাঙ্ময় চিরমানবের সম্মুখ যাত্রার উৎসবে :

হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে, সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে;

৪৯. 'হেমন্ত রাতে', 'দেশকালসন্ততি'/বেলা অবেলা।

এ গতি কিন্তু ইতিহাসের চক্রাবর্তগতির ধারণা সঞ্জাত নয়; এ নবীন গতিচেতনা প্রয়াণমুখী, প্রত্যাবর্তনপ্রবণ নয়। এক অতীতমুখী ইতিহাসচারিতা জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির আদি পর্যায় থেকে 'বনলতা সেন' যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ নিশ্চেতন আবিষ্ট ইতিহাসবোধ কবিকে ডেকে নিয়েছিল বার বার প্রাচীন ও মধ্যযুগের শৌর্য ও সৌন্দর্যের জগতে, উদ্বোধিত করেছিল তাঁর কাব্যে অতীতগরিমার এক রোমান্টিক বিষাদঘন বোধন ('নগ্ননির্জন হাত', 'হাওয়ার রাত', 'সিন্ধু সারস', 'শ্যামলী')। আবার, কখনও বা মানবেতিহাসের অন্তহীন বলয়িত আবেষ্টনে আবৃত্ত তাঁর আপতিক অভিজ্ঞতা বলে : দেখেছি যা হল হবে মানুষের হবার নয়' বা 'আরেক গভীরতার শেষরূপ চেয়ে দেখেছে সে তোমার বলয়'।[৫০] জীবনানন্দের মননে ইতিহাসচেতনার স্ফুটনে ইতিহাসের বলয়িত গতির প্রত্নবোধই তাঁকে একদা মিশরের অতীতগরিমার পুনর্জাগরণের প্রত্যাশী করেছিল; সেই প্রত্যাশারই পরিণত কাব্য-উচ্চারণ 'বনলতা সেন' বা 'মহাপৃথিবীর' কবিতায় পর কবিতায় :

ভূপৃষ্ঠের এই দিকে জানি আমি নতুন ব্যবিলন
উঠেছে অনেক দূর—শোনা যায় কর্নিশে সিংহের গর্জন[৫১]

অথবা

আমাদের প্রভু বিরতি দিও না, লাখো লাখো যুগ
রতিবিহারের ঘরে
মনোবীজ দাও : পিরামিড গড়ে—পিরামিড ভাঙে গড়ে।[৫২]
বা
পৃথিবীর রাজপথে—রক্তপথে—অন্ধকার অববাহিকায়
এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মত বার হয়।[৫৩]

কবির পরিণত ইতিহাসবোধের কিন্তু দূরান্বিষ্টমুখী, ক্রমবিবর্তমান ও উত্তরণপ্রয়াসী। কবি জেনেছেন, 'ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা' রোল/উত্তর প্রবেশ করে আরো বড় চেতনার লোকে'[৫৪]। ইতিহাসের সত্য হলো, 'নব নব মানবের তরে/কেবলি অপেক্ষাতুর' হয়ে পথ চিনে নিতে চাওয়া।[৫৫] তাই, 'মানবহৃদয়' চলেছে এক 'নবপ্রস্থানের দিকে', যদিও তার কবি-সত্তা প্রতিবেশের বিরুদ্ধতা, সমাজ ও সময়ের অপশক্তিগুলি সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি জেনেছেন, মানুষের 'চলার পথে বাধা দিয়ে অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা'[৫৬] রয়েছে; 'মাঠের ফসলগুলো বারবার ঘরে তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে';[৫৭] দেখেছেন, 'অনন্ত

৫০. 'বিভিন্ন কোরাস'/সাতটি তারার তিমির।
৫১. 'পরিচায়ক'/মহাপৃথিবী।
৫২. 'প্রার্থনা'/মহাপৃথিবী।
৫৩. 'আবহমান'/মহাপৃথিবী।
৫৪. 'উত্তরপ্রবেশ''/সা. তা. তি।
৫৫. 'সময়ের কাছে'/সা. তা. তি।
৫৬. 'সময়ের কাছে'/সা. তা. তি।
৫৭. 'সময়ের কাছে'/সা. তা. তি।

রৌদ্রের অন্ধকারে' মানব আজ দিশাহীন। মনে হয়, সে যেন জেগে উঠেছে 'জীবাণুর থেকে' এক 'হেতুহীন সম্প্রসারণে'; এবং সবই তো,

> নদীর ও নগরীর
> মানুষের প্রতিশ্রুতির পথে যত
> নিরুপম সূর্যালোক জলে গেছে তার
> **ঋণ শোধ করে দিতে গিয়ে—**

তবুও অপেক্ষাতুর হৃদয়স্পন্দন আছে। আছে 'কোথাও সূর্যের ভোর', 'অলক্ষিতে কোন্‌খানে জীবনের আশ্বাস', 'সূর্যালোকিত সব সিন্ধু পাখিদের শব্দ'।[৫৮] তাই 'নিদ্রায় আসক্ত হতে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক'। কবির চেতনালোকে এ প্রয়াণ প্রতিজ্ঞা ও ইতিহাসবেদের গভীর সংশ্লেষে সৃষ্ট হয়েছে নাবিকী ও সৌরকরোজ্জ্বলতার ভাবনায় সমৃদ্ধ দু'টি মৌল চিত্রকল্প, যা তাঁর শেষপর্বের কবিতাগুলিতে পুনরাবৃত্ত।' আবহমানের নাবিক মানবাত্মার যাত্রা তিমিরসমুদ্র থেকে এক সূর্যালোকিত সৈকতের দিকে, সৌরচেতনাময় ভোরের প্রয়াণে : 'হে নাবিক, হে নাবিক কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য করে শুধু'?

> 'বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে
> অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চলে যাও—দুপুর বেলায়,
> বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেকজান্দ্রিয়ায়
> মোমের আলোকগুলো রয়েছে পেছনে পড়ে অমায়িক সংকেতের মতো,
> তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর দিকচক্রবাল হৃদয়ে পাবার
> প্রয়োজন রয়ে গেছে—যতদিন স্ফটিক পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
> উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে;
> এরোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস
> নীলিমাকে খুলে ফেলে যতদিন; ভুলের বিনুনি থেকে আপনাকে মানব হৃদয়
> উজ্জ্বল সময় ঘড়ি নাবিক অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।'[৫৯]

আমরা আগেই বলেছি, জীবনানন্দের ইতিহাসবোধে নাবিকীচেতনা একটি মনোবীজের মত তাঁর কাব্যসৃষ্টির জন্মলগ্নেই উপ্ত হয়েছিল। পরিণত কাব্যপ্রয়াসে সে চেতনার নানা নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে কাব্যের ভাববস্তু ও চিত্রকল্পের নতুন নতুন বিস্তারে। 'বনলতা সেন', 'সবিতা', 'শ্যামলী', বা 'সুচেতনা'র মতো রোমান্টিক আবেগে স্ফূর্ত, কবিতাবলীতেও নাবিক ও তার অবিরত অন্বেষার ভাবনাটি ঘুরে-ফিরে এসেছে। কিন্তু শেষপর্যায়ের কবিতায় যেখানে শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও গ্লানিতে প্রেম ও মঙ্গলবোধের ব্যঞ্জনাময় কাব্যপ্রয়াস অন্তর্হিতই বলা চলে, সেখানেও মানবেতিহাসের অন্তরালবর্তী মৃত্যুহীন শুভ শক্তিগুলির নিরন্তর সংগ্রাম ও অন্বিষ্ট সন্ধানের উদ্যমকে জীবনানন্দ নাবিক ও নাবিকীর চিত্রকল্পে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিমূর্ত করেছেন। এ সব-ই কিন্তু তর্কাতীত করেছে

৫৮. 'সূর্যপ্রতিম সূর্যতামসী'/সা. তা. তি
৫৯. 'নাবিক' সাতটি তারার তিমির

মানব-ভবিষ্যে কবির প্রগাঢ় আস্থা। সমকাল ও স্বযুগের গ্লানিদীন রক্তাক্ত মানবাভিজ্ঞতাকে তিনি কাব্যে ধারণ করেছেন, সে অভিজ্ঞতার কাছে সৎ ও আন্তরিক থাকার প্রয়োজনে। আধুনিক মানবের যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা, বিপন্নতা ও বিশ্বাসহীনতার বোধ তাঁর কবিতায় কখনও কখনও এমন তীব্র আপোসহীন উচ্চারণে ধরা পড়েছে যে. কেবলমাত্র শেষ পর্যায়ের রচনাপাঠে কোনও পাঠকের-ই মনে হবে না, এ জীবনানন্দ একদা ইন্দ্রিয়সংবেদনাঘন নিসর্গ-মাধুরী অথবা প্রয়াত সৌন্দর্যের 'হৃষ্ট' রূপকার ছিলেন :

একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে,
উঠে ভেঙে গেছে।
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসেনাকো।[৬০]
বা.
স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো,
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী।[৬১]

এ সর্বায়ত হতাশা ও নৈরাজ্যের সমাজমনস্ক উপলব্ধি 'সাতটি তারার তিমির' ও সমসাময়িক কাব্যে প্রতিবেশচেতনার শক্তিতে এতো প্রবলভাবে অন্তপ্রবিষ্ট যে, এমন কি ইতিহাসের অন্তর্গূঢ় প্রয়াণ-প্রেরণায় জীবনানন্দ কখনও কখনও আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হতে পারে :

ইতিহাস ঢের দিন প্রমাণ করেছে
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে
হয়তো বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চলে যাওয়া—গোলক ধাঁধার
ভুলের ভিতর থেকে আরো বেশি ভুলে।[৬২]

কিন্তু যে নিগূঢ় ইতিহাস সত্যে তিনি আস্থাশীল, যা তাঁকে সিন্ধুসারসের গানে একদা শুনিয়েছিল হতাশ্বাস রাত্রির অবসান সঙ্গীত, যার অমেয় প্রেরণায় কোনও অন্তিম সূর্যকরোজ্জ্বল মানবসমাজের স্বপ্নরচনা করেছেন কবি বার বার, সেই প্রত্যয়ের শক্তিতেই তিনি আবার বলতে পারেন :

'ইতিহাসে মাঝেমাঝে এ রকম শীতঅসারতা
নেমে আসে চারিদিকে জীবনের শুভ অর্থ রয়ে গেছে তবু'।[৬৩]

৬০. 'রাত্রির কোরাস'/সা. তা. তি।
৬১. 'গভীর এরিয়েলে'/বেলা অবেলা।
৬২. 'যতদিন পৃথিবীতে'/বেলা অবেলা।
৬৩. 'পৃথিবী ঘিরে'/বেলা অবেলা।

ধ্বংস ও মূল্যবিপর্যয়ের শ্মশানে দাঁড়িয়ে কবি দেখেছিলেন যেমন 'চকিত রৌদ্রে জেগে উঠেছে শালিধান', তেমনই ইতিহাস-ধুলো-বিষ থেকে উৎসারিত হয়ে যায় 'নব-নবতর মানুষের প্রাণ'।[৬৪] সমকালীন ইতিহাস যখন 'ব্যাপক অবসাদে' অসাড়, তখন 'নরনারীর ভিড়' 'ক্রেমলিনে লন্ডনে দেখে' 'নতুন অমল পৃথিবীর আলো'।[৬৫] তাই গভীর আস্থায় তিনি উচ্চারণ করেন :

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।[৬৬]

সে চেতনার যথার্থ স্বরূপটিও জীবনানন্দ চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন অভিনিবিষ্ট পাঠককে। সে চেতনা নিরন্তর প্রয়াসের ও প্রয়াণের, নব উত্তরণের : 'অনন্ত যাত্রার কথা মনে হয় সে সময়/দীপংকর শ্রীজ্ঞানের,/চলেছে চলেছে।' এ অগ্রসৃতির বোধটিকে তিনি 'ইতিহাসের গোলকধাঁধা' বা 'অন্ধবলয়' থেকে উত্তীর্ণ করে নিয়েছেন অন্বিষ্টমুখী প্রয়াণে। এ কোন 'অলীক প্রয়াণ' নয়, যা ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন কালের কিনারায়' এ ধারণায় মানবকে করে তোলে 'তিমির বিলাসী', যখন মনে হয় 'মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;/যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল'';/কিম্বা যখন সমস্ত 'পদচিহ্নময় পথ', মনে হয়, 'দিকচিহ্নহীন'। কোনও নিরর্থক বলয়িত গতি, কোনও নিরুদ্দেশ অগ্রসৃতি জীবনানন্দের ইতিহাসবেদের মর্মে নেই :

সকল রৌদ্রের মতো ব্যাপ্ত আশা যদি
গোলকধাঁধায় ঘুরে প্রথম মানে ফিরে আসে
শ্রীজ্ঞান কী তবে চেয়েছিল?

অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সভ্যতার উত্তরণ-প্রয়াসী ধাবমানতার যথার্থ অনুধাবন-ই জীবনানন্দের মানসিকতাকে দীক্ষিত করে :

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো—আরো স্থির দিক নির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতদূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে।

এ প্রয়াণপ্রবণ বোধ এবং মানব-ভবিষ্যে আস্থাশীলতা কবির পরিণত ইতিহাসবেদের কুলক্ষণ। নাবিকীচেতনা ইতিহাসের অগ্রসরমান, প্রয়াণমুখী চরিত্রটি বিশেষিত, বস্তুরূপময় করতে সাহায্য করেছে অন্ধকার সমুদ্র, তিমিররাত্রির যাত্রী, ঢেউ, ঝঞ্ঝা, ব্যাত্যা-বিক্ষুব্ধ জলরাশি সৈকত, দিকচক্রবাল, দিকনির্ণয়ক কম্পাস প্রভৃতি

৬৪. 'পটভূমির অন্ধকার থেকে'/বেলা অবেলা।
৬৫. 'প্রাচীন পটভূমির''/বেলা অবেলা।
৬৬. 'মানুষের মৃত্যু হলে'/শ্রেষ্ঠ কবিতা।

চিত্রকল্পের সুপ্রযুক্ত ব্যবহারে। মানবের শাশ্বত শুভচেতনার স্পর্শে ইতিহাসের প্রসৃতির শক্তি একটি কাব্য অন্বিষ্টমুখী হতে পেরেছে : 'মানুষের মন/জানে জীবনের মানে : সকলের ভালো করে জীবনযাপন'।[৬৭] মানুষ চেয়েছে 'এক সাহসী পৃথিবী/সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ'। তাই 'মানব সমাজের শেষ পরিণতি', জীবনানন্দের কাছে, 'গ্লানি নয়/হয়তো বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে শান্তি আছে মানুষের অগ্রসর আছে'।[৬৮] এ বিশ্বাসের দ্বিধাবিমুক্ত প্রতিভাস 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে ক্বচিৎ ও পরবর্তী অগ্রন্থবদ্ধ অজস্র কবিতায় অবিরলভাবে উপস্থিত। এককথায়, অগ্রসৃতি ও শুভপ্রয়াণের প্রজ্ঞায় চিহ্নিত এ ইতিহাসবেদের অনুধাবন ছাড়া তাঁর পরিণত কাব্যসৃষ্টির যে কোনও আলোচনা অর্থহীন। আবার এ চেতনার আলোকেই উজ্জীবিত সময়, প্রেম ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মননের অন্তিম বিকাশ।

'সমাজ ও ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতা দোষে দুষ্ট হলেও কবিতা ও সাহিত্য তার ভেতরে লালিত হয়েও যদি তাকে প্রয়োগ প্রতিভার শেষ বৈচিত্র্যে কোনো না কোনো একরকম সঞ্চার, ইঙ্গিতের দিব্যতা না দিতে পারে, তাহলে তা শ্লেষ বা ধ্বংস বা গঠনাত্মক গুরুতর প্রবন্ধ বা প্রচারপত্র হতে পারে, কিন্তু তাকে কাব্যসৃষ্টি বলা যেতে পারে না'। এ স্বকৃত নিরীখের মানদণ্ডেই জীবনানন্দের শেষ জীবনের কবিতা 'ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ ও সুরকে অন্তর্গ্রহিত করে' 'চেতনার গভীর অন্তর্যামী আলোয়' আবহমান মানব-অভিজ্ঞতাকে চিনে নিতে চেয়েছে। অন্যত্র আবার লিখেছেন, 'বিশ শতকে জন্মগ্রহণ করেছে ও কাজ করেছে বলে উনিশ শতককে কৃপার পাত্র বা কোনো অনেক আগের সুন্দর অতীতকে একমাত্র সাধ ও শ্রদ্ধার জিনিস মনে করার তাগিদ অতিক্রম করে এসব কবিতা রামমোহন যখন ছিলেন বাংলাদেশে বা বাংলার পট যখন তৈরি হয়েছিল অথবা দীপংকর শ্রীজ্ঞান যখন আলোড়িত হয়ে ফিরছিলেন, আজকের দিল্লি, ক্রেমলিন ও ন্যুইয়র্কের পরিণতি, কাল যারা জন্ম নেবে—সব মানুষেরই নাড়িকম্পন অনুভব করেছে যেন, আজকের সূর্য জল ও নক্ষত্রদের দেখতে দেখতে অনেককালের প্রকৃতিকে, বিফলতা দুঃখ ও আশাকে; এসব কবিতায় বৃত্তান্ত, আজকের স্বভাবী বা নিদারুণ বৃত্তান্তও প্রধান নয়, যা হয়ে গেছে, যা হতে পারে, সবের ভেতরে খতিয়ে খতিয়ে আজকের বিশেষ উপলব্ধির পথ পরিষ্কার করে রাখবার চেষ্টাই আসল'।[৬৯]

একদিকে এসব উক্তি-প্রত্যুক্তির নির্দেশ, অন্যদিকে তাঁর নিজের কাব্যসৃষ্টির মধ্যে প্রত্যাশিত যে পরিপার্শ্ব-চেতনা, উভয়-ই জীবনানন্দের ইতিহাসবোধকে মণ্ডিত করেছে তাৎপর্যে। এক অব্যয় গতি ও আস্থাকরোজ্জ্বল ভবিষ্যতে প্রয়াণের দুর্মর আশাবাদ জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনার চারিত্র নির্ধারণ করেছে। ইতিহাসের উত্থান-পতনের ঘনঘটা মানবকে দিয়েছে 'বহির্মুখ চেতনার দান'[৭০] যার আলোকে এখন 'আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়'। এ অন্তর্দীপ্ত আশাবাদিতার সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে কবিতার পর

৬৭. 'এইখানে শ্রেষ্ঠ কবিতা।
৬৮. 'মহাত্মা গান্ধী'/বেলা অবেলা।
৬৯. 'কবিতাপাঠ'/কবিতার কথা।
৭০. 'মহাত্মা গান্ধী'/বেলা অবেলা।

কবিতায়; সূর্যরশ্মিচ্ছটা লক্ষ্য করে উড্ডীন 'সৃষ্টির বন-হংসী' বা 'আকাশহংসীর' বা 'অমল মরালে'র চিত্রকল্পে। অজস্র উল্লেকের মধ্যে আমরা একটিদুটি মাত্র তুলে ধরতে পারি, যা সার্থকভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছে শেষ পর্যায়ের কবিতাবলীর অন্তর্গ্রথিত ভাবনার। কবির নিজের মতে, 'মকরসংক্রান্তির রাতে' সেই রকমই কবিতা,[৭১] যার অনুপুঙ্ক্ষ, বিশ্লেষণে আমরা অগ্রসর হবো।

'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটিতে জীবনানন্দ মানব-মনের আবহমান ইতিহাসচেতনাকে একটি পাখির রূপকে অধিষ্ঠিত করেছেন—কবিতার উপশিরোনামাটি লক্ষণীয়। প্রথম স্তবকে এ ইতিহাসচেতনারূপ পাখিকে কবি সম্বোধন করেছেন কিছুটা বিস্মিত জিজ্ঞাসায় : সে কোন্ পাখি সূর্য থেকে নবসূর্যে, যুগ থেকে যুগান্তরে বার বার পৃথিবীতে এনেছে আলোড়ন? সে আলোড়ন অবশ্যই সৃজনের— তারপর অন্তহীন কালের গভীরে সে আলোড়ন বিসর্জন দিয়ে নব নব বিষয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে। 'কী এক গভীর সুসময়'—বার বার তার-ই সন্ধানে যেন মানবেরা অগ্রসর সৃষ্টি এবং আরও নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায়। মানুষের ইতিহাসচেতনাই মানবকে দিয়েছে অবিরাম যাত্রার নির্দেশ, এমন একটি বক্তব্যকে আভাসিত করে কবি বললেন :

মকরক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন :
—তবুও তা পৃথিবীর নয়;
এখন গভীররাত হে কালপুরুষ,
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

এ পঙ্ক্তিগুলি আপাতদুর্বোধ্য। মকরসংক্রান্তির রাত পৃথিবীর নয়, গভীর রাত পৃথিবীর, এ বক্তব্যকে কারও কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সংক্রান্তি অর্থে সম্যকরূপে অতিক্রমণ; সূর্যাদির এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন প্রসঙ্গেই কথাটি ব্যবহৃত। 'মকরসংক্রান্তি' সূর্যের দক্ষিণায়ন বৃত্ত অতিক্রম করার দিন; সেই অর্থে পদবন্ধটি উত্তরণের দ্যোতক। এ উত্তরণ সূর্য-নক্ষত্রাদির গতিপথে আজো স্পষ্ট; মকরক্রান্তির রাত 'অন্তহীন তারায় নবীন। তাই সূর্যপরিক্রমার পথে এ উত্তরণ যেন নবীন সব নক্ষত্রে শোভিত করে দেয় রাত্রির আকাশ। কিন্তু এই রাত, এই উত্তরণের রাত পৃথিবীর নয়। মানুষের পৃথিবীতে সব উত্তরণ আজ স্তব্ধ, জড়ীভূত। তাই পৃথিবীতে 'এখন গভীর রাত'—গভীর অন্ধকারের রাত, যে রাত নতুন তারার আলোয় নবীন নয়। মানুষের জীবনের উত্তরণ অভিভূত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কথা কবিতাটির শেষ স্তবকেও উচ্চারিত। তিমিরাচ্ছন্নতার এ প্রাথমিক পটভূমি রচনার পর কবিতার দ্বিতীয় স্তবক আমাদের নিয়ে যায় সেই তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রির সঠিক চেহারাটি চিনিয়ে দিতে। যে অন্ধকারময় নৈশপৃথিবীর আমরা অধিবাসী, সেখানে এক গভীর অন্ধকারের রাত বিরাজমান, এক নক্ষত্রহীন নিরালোক। রাত্রি আনে বিশ্রাম ও নিদ্রা; যে নিদ্রা শেকস্‌পীরীয় উচ্চারণে, আমরা জানি, মানবের এক পরম কাম্য :

Sleep that knits up the ravell'd sleave of care,
The death of each day's life, sore labour's bath

৭১. চিঠিপত্র নং ২, 'ময়ূখ'/জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা।

Balm of hurt minds, great nature's second course,
Chief nourisher in life's feast,-

কিন্তু আজকের মানব 'ঘুমাবার মতন হৃদয় হারিয়ে ফেলেছে'। আধুনিক মানব এক নৈশতায়, তন্দ্রাহীনতায় পীড়িত; তার রাত, বিচিত্র অভিজ্ঞতার রাত, যা উদ্বেগে কণ্টকিত। মানুষের জীবনে রাত এখন নিদ্রা নয়, উদ্বেগের কথা বলে। শত্রু কি শহর ঘিরেছে, নগরীর প্রতিরোধ কি চূর্ণ হলো; না কি আক্রান্ত নাগরিকেরাই বিজয়ী? আক্রান্ত অবরুদ্ধ চিত্রকল্প এনে মানুষের চেতনার বন্দীত্ব তার আজকের নিদ্রাহীনতা ও জীবনসঙ্কট-ই কবি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তবু ঐসব আঘাতে মানবিক পৃথিবী যখন বিপর্যস্ত, তখনো মানবের ইতিহাসচেতনা সৌরমণ্ডলের নক্ষত্রের মতন-ই অমর হয়ে আছে :

মানুষের মৃত্যু ক্ষয় প্রেম বিপ্লবের ঢের নদীর নগরে
এই পাখি আর এই নক্ষত্রেরা ছিল মনে পড়ে,

এ ইতিহাসচেতনা কেবল-ই যাত্রা আর উত্তরণের কথা বলে। শেষ স্তবকে এ পাখি তথা ইতিহাসচেতনা সম্বোধন করে কবি এ বিপন্ন সভ্যতা নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করতে আহ্বান জানান। মানুষের আধুনিককালের অভিজ্ঞতা দেখেছে যুদ্ধ আর অবক্ষয়ে দীর্ণ এ পৃথিবী, কখনও 'ভঙ্গুর হয়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায়', আবার কখনও বা 'প্রতিভা হয়ে আকাশের মত শুভ্রতায়' যেতে চায়। এ দুই ভিন্ন, বিপরীতমুখী, 'বিষমানুপাতিক' টানে মানুষের জীবনের উত্তরণ যেন 'অভিভূত হয়ে মাঝপথে থেমে' গেছে 'মহান তৃতীয় অঙ্কে'। 'তৃতীয় অঙ্ক' নাটকের সংকটকালকে চিহ্নিত করে। মানুষের সভ্যতার সমাধি এ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সংকট-সংশয়ের মধ্যেই রচিত হবার আশঙ্কা রয়েছে। তবুও এ 'তৃতীয় অঙ্কই' 'মহান'—তা 'আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়' এক অগ্নিপরীক্ষার অঙ্ক, যে অগ্নিপরিধির মধ্য হতে নাটক উত্তরিত হয় তার চূড়ান্ত বক্তব্যের সার্থকতায়। কিন্তু প্রাণশক্তি যে অভিভূত; তাই উত্তরণও স্তব্ধ। একমাত্র ইতিহাসচেতনাই পারে বেগের আবেগ সঞ্চারিত করে দিতে মানবসভ্যতার এ সঙ্কট-গভীর তৃতীয় অঙ্কে। তাই কবি ইতিহাসচেতনারূপ পাখিকে আহ্বান জানান; সে চেতনা অগ্রসরমানতার দ্যোতক এবং সেকারণেই সঞ্জীবনী :

সূর্যে আরো নবসূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি!

শেষ পর্যায়ের কাব্যের প্রতিবস্তুরূপে 'নাবিক' ও 'পাখির' চিত্রকল্প দু'টি পুনরাবৃত্ত হয়েছে সভ্যতার অন্তর্লীন অন্বেষা ও প্রয়াণের আহ্বান পরিস্ফুটনের প্রয়োজনে—একথা আমরা পূর্বেই জানিয়েছি। পাখির অনুষঙ্গে এসেছে ভোরের কাকলি, 'পুনরুদয়ের ভোর' বা সূর্যোদয়ের ছবি, যা বিকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর একালের কাব্যে। এভাবেই ইতিহাসবোধে দীপ্ত এক নবীন প্রত্যুষের আস্থাবাণী বার বার ঘোষিত হয়েছে তাঁর অন্তিমপর্যায়ের কবিতাবলীতে[৭২] যে প্রবল আস্তিক্যবোধ শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিণত

৭২. সে ধরনের কিছু কবিতার নাম : 'ইতিহাস যান', 'পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে', 'মহাত্মা গান্ধী', 'সময়ের কাছে'; 'রাত্রির কোরাসে', 'একটি কবিতা'।

রচনাগুলিকে উত্তীর্ণ করেছে সকল তিমিরাচ্ছন্নতার উর্ধ্বে তিমিরবিদারী সৌরকরোজ্জ্বতায়, তা কবির গভীর ইতিহাসচেতনা থেকেই উৎসারিত। এই এক আস্থাপ্রোজ্জ্বল গতিরাগের গানই জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনাকে অর্থবহ করে দেয়। তেমনই দু'টি উল্লেখে আমরা এ আলোচনার ছেদ টানতে পারি :

ক. নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে
মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির
ষাট বসন্তের তরে
সেইসব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে'
এই বোধের ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি মানুষের বিষয় হৃদয়,
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ্ অরুণোদয়, জয়।
['সময়ের কাছে'/সাতটি তারার তিমির]

এ কবিতার পাঠক লক্ষ করুন, 'নেই' যখন একটি 'অনুভব' মাত্র কবির কাছে[৭৩] 'আছে' কে তিনি 'বোধি' বলে উপলব্ধি করলেন :

খ. ইতিহাস-সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানবজীবন,
এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায়—চলা যায় সময়ের পথে,
তত বেশি উত্তরণ সত্য নয়—জানি; তবু জ্ঞানের বিষণ্নলোকী আলো
অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সফল মানব-প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে!
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।[৭৪]

জীবনানন্দের কাছে ইতিহাসের শিক্ষা মানবচেতনায় জ্বালিয়ে দেয় এক বিষণ্নলোকী আলো, যে আলো মানবের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে স্খলিত করে (কালের উদ্‌ভ্রান্তি) ইন্দ্রিয়ব্যসনের মত্ততা; এবং তার চেতনায় সঞ্চারিত করে সৌরপ্রয়াণের আকাঙ্ক্ষা, 'উজ্জ্বল সূর্যের অনুভব'।

তাই, জীবনানন্দ বলতে পারেন

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শতশত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।[৭৫]

৭৩. 'লোকসামান্য'—সা. তা. তি।
৭৪. 'অন্ধকার থেকে'/বেলা অবেলা কালবেলা
৭৫. 'হে হৃদয়'—বেলা অবেলা কালবেলা।

জীবনানন্দ : প্রথম বাঙালি সুররিয়ালিস্ট কবি

দীপ্তি ত্রিপাঠী

জীবনানন্দ বাংলা কাব্যে সুররিয়ালিস্ট কবিতার প্রবর্তক বলা যেতে পারে। তাঁর সুররিয়ালিস্ট কবিতাগুলি বিশ্লেষণের পূর্বে এ ভাবধারাটির ইতিহাস জানা আবশ্যক। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আধুনিক যুগের প্রবণতা এ ধারাটির মধ্যেও প্রকট।[১]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ফরাসি দেশে ইমপ্রেশনিজমের আদর্শ ও রীতির বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। প্রধানত চারটি ধারায় তা প্রবাহিত হয়—১. ফবিজম (১৯০৫), ২. ফিউচারিজম (১৯০৯), ৩. কিউবিজ্‌ম (১৯০৭-১৪), ৪. এক্সপ্রেশনিজ্‌ম (১৯১২-১৩)। ফবিস্টরা রং-কে প্রাধান্য দিতেন—ফিউচারিস্টরা গতিকে—কিউবিস্টরা গঠনকে এবং এক্সপ্রেশনিস্টরা বিকারকে। ভ্যান গ' প্রমুখ expressionist বা প্রকাশবাদী শিল্পী আকৃতি ও বর্ণকে অনুভূতি প্রকাশের বাহন বলে মনে করতেন এবং তার ফলে প্রাকৃতিক আকার বা বর্ণকে বিকৃত করতেও পশ্চাৎপদ হননি। ভ্যান গ'র 'সাইপ্রেস গাছ' বা 'তারালোকিত রাত্রি' ছবি দেখলে মনে হবে সব-কিছু যেন বিশ্বজগতের ছন্দে স্পন্দমান হয়ে উঠছে। এ দলের গগ্যাঁ'র ধারণা ছিল, সংগীত এবং চিত্রের ধর্ম এক এবং চিত্র বর্ণের সুসংগতি (harmony); অতএব চিত্রের কোনো দৃশ্য-বর্ণনা বা কাহিনী-বর্ণনার দরকার নেই। মাতিস এবং কান্ডিনস্কি এ ধারার বাহক। সেজান চেয়েছিলেন চিত্রের মধ্যে একটা স্থাপত্যসুলভ ঘনত্ব প্রকাশ করতে। ক্রমশ-ক্রমশ এর থেকে কিউবিজ্‌মের জন্ম হলো। কিন্তু তখনো বাস্তব জগতের সঙ্গে চিত্রের সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়নি। পিকাসো, গ্রিস, ব্রাক্‌ প্রভৃতি চিত্রকরেরা বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দু থেকে বিষয়বস্তুকে দেখে তার খণ্ড-খণ্ড রূপ নতুন করে জোড়া দিতেন। তবে বিভিন্ন তলের (plane) সেই কোণ-সমাকুল (angular) নকশায় একটি চাবিকাটি থাকতো যা দিয়ে সমস্ত ছবিটির অর্থ বোধগম্য হতো, যেমন—গ্রিসের Chess Board। অবশ্য তাঁদের এ চিত্র আন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়েছিল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ (law of relativity)। এ হেন সময়ে ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের যুগান্তকারী আবিষ্কার চিত্র শিল্পীদের সামনে অবচেতন জগতের দ্বার খুলে দিল। সুর্‌রিয়ালিজ্‌ম[২] এ ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান থেকেই প্রেরণা লাভ করে, যেমন কিউবিস্টরা প্রেরণা লাভ করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ থেকে। বস্তুবাদীরা (Realist) নির্ভর করতেন যথাযথ বর্ণনার ওপর, ইমপ্রেশনিস্টরা ব্যস্ত ছিলেন আলো-ছায়ার খেলা নিয়ে, প্রকাশবাদীরা প্রকাশ করতে চাইলেন অনুভূতির আবেগময়

১. ১৮৬৩ খ্রিঃ মানের অঙ্কিত ছবি 'অলিম্পিয়া' এ আন্দোলনের প্রথম রূপ প্রকাশ করে।
২. আঁদ্রে ব্রেঁত (১৯২৩-২৪ খ্রিঃ) এ আন্দোলন শুরু করেন।

অভিঘাতকে (Emo-tional Effect), কিউবিস্টরা জোর দিলেন আকৃতির বিন্যাসের ওপর, আর সুর্‌রিয়ালিস্টরা ডুব দিলেন মগ্নচৈতন্যের গভীরে। হার্বার্ট রীডের ভাষায় :

'The artist, whether poet or mystic or painter, does not seek a symbol for what is clear to the understanding and capable of discursive exposition : he realizes that life, especially the mental life, exists on two planes, one definite and visible in outline and detail, the other—perhaps the greater part of life—submerged, vague, indeterminate. A human being drifts through time like iceberg, only partly floating above the level of the consciousness. It is the aim of the Surrealiste, whether as painter or as poet, to try and realize some of the dimensions and characteristics of his submerged being, and to do this he resorts to various kinds of symbolism.[১]

ম্যাক্স আর্নস্টের মতে, সুর্‌রিয়ালিস্টের লক্ষ্য অবচেতনার বাস্তব চিত্র আঁকা নয় কিংবা অবচেতনার বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে কল্পনার একটি পৃথক জগৎ সৃষ্টিও নয়। তার লক্ষ্য হলো চেতন ও অবচেতন, অন্তর ও বহির্জগতের মধ্যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক বেড়া ভেঙে দেয়া :

'...and to create a super-reality in which real and unreal meditation and action, meet and mingle and dominate the whole of life.'[২]

আর আঁদ্রে ব্রেঁত চেয়েছিলেন, মনোবিকলনে যেমন অবচেতনের প্রতীকগুলি

ভেসে ওঠে, কবিতার মধ্যেও তেমনি স্বপ্নবিশ্লেষণের চিত্রকল্পগুলি আনতে হবে। 'A method of spontaneous writing' এবং 'Dream-analysis' প্রয়োজন। স্বপ্নের চিত্রকল্পগুলিকে স্বয়ংক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ততার স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে হবে : তাতেই দেখা দেবে এক উচ্চতর বাস্তব—'Super-reality'—যুক্তির বাইরে যে সত্য আছে। সুর্‌রিয়ালিজ্‌মের সংজ্ঞা হলো : 'Pure psychic automation by which it is intended to express, whether verbally or in writing or in any other way, the real process of thought. Thought's dictation, free from any control by the reason independent of any aesthetic or moral preoccupation.'

জীবনানন্দ সত্যকে সারাজীবন ধরে সন্ধান করেছেন ইতিহাসচেতনার মধ্যে, সমাজচেতনার মধ্যে, ইন্দ্রিয়ঘনতার মধ্যে, এমনকি মগ্নচৈতন্যের গভীরেও। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পরস্পর' কবিতা থেকেই শেষতম পন্থায় অন্বেষার আরম্ভ, অর্থাৎ সুর্‌রিয়ালিজ্‌মের শুরু। পূর্বেই বলেছি. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' অচরিতার্থতার কাব্য। "পরস্পর'-এ সেই অচরিতার্থতার বেদনার অন্তরালে নতুন এক অনুভূতি বা বোধের জন্ম হচ্ছে দেখে। রোম্যান্টিসিজ্‌মের যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, রিয়ালিজ্‌ম ফিরে আসছে। আবার রিয়ালিজ্‌মের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে আর-এক তীক্ষ্ণ বোধের উপলব্ধি হচ্ছে, তা হলো সুর্‌রিয়ালিজ্‌ম বা অতিবাস্তব চেতনা।

১. Herbert Read, The Meaning of Art, P—233.
২. Op. cit. PP.—237-38.

কিন্তু আর্নস্ট যে-কথা বলেছেন, অর্থাৎ Super-reality হচ্ছে তা-ই, যেখানে Real and unreal, Meditation and action মিশ্র হয়ে যায়, তার চমৎকার উদাহরণ হল— 'বনলতা সেন', 'হরিণেরা' কিংবা 'অবশেষে''। স্বপ্ন যেমন স্বপ্নের সঙ্গে মিশে যায়, এ কবিতাগুলিতেও চিত্রকল্পগুলি তেমনি মিশে গেছে। সেই অতি-বাস্তবের রাজ্যে 'বনলতা সেন'-এর প্রসঙ্গে ভেসে ওঠে শ্রাবস্তীর কারুকার্য, হরিণের খেলা আর শেফালিকা বোসের হাসি একাকার হয়ে যায়, ভারত-সমুদ্রের তীরে কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে এক অপরূপ প্রাসাদে ভেসে ওঠে একটি নগ্ন নির্জন হাত; গাছেরা হয় একবার হরিণ, একবার বাঘিনী।[১] সুর্‌রিয়ালিজ্‌মের অন্যতম দান এ fantasy রচনা। যুক্তিগ্রাহ্যও নয়, বিশ্বাসযোগ্যও নয়, অথচ মনকে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করে। যেমন :

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে
হরিণেরা,
...   .
পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।
হিরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,—
('হরিণেরা', 'বনলতা সেন')

অথবা :

চেয়ে দ্যাখো যদি:
অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো;
লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেচে চিরদিন; নীল, লাল রূপালি নীরব। ('শব', 'মহাপৃথিবী')

'শ্রাবণ রাত' কবিতাটিতে এ সচেতন ও অবচেতন মনের মাঝখানের সীমারেখার কপাট খুলে যাওয়ার ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন।

শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতে
ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙে যায়
কোথায় দূর বঙ্গোপসাগরের শব্দ শুনে।
...   .
মনে হয়
কারা যেন বড়ো কপাট খুলছে,
বন্ধ করে ফেলেছে আবার; ('শ্রাবণ রাত', 'মহাপৃথিবী')

১. অবশেষ ('বনলতা সেন')

অবচেতনার স্তরে প্রবেশ করার আর-একটি ইঙ্গিত নিম্নলিখিত পঙ্ক্তিগুলিতে পাওয়া যায় :

চোখ তুলে আমি
দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মত প্রবেশ করলাম·
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।

(ঐ)

মুখের ভেতর প্রবেশ করা স্বাপ্নিক বাস্তবতায় সম্ভব হয়েছে। অন্ধকারের 'দুই স্তর' কথাটি লক্ষণীয়। রাতের অন্ধকার ছাড়িয়ে গিয়ে অন্য কোনো অন্ধকারের প্রতি কবি ইঙ্গিত করেছেন। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রেমের স্মৃতিও অবচেতনার গভীরে প্রবেশ করে। 'স্বপ্ন' কবিতাটি এ পর্যায়ের নামকরণও সেই ইঙ্গিত বহন করছে।

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন
সেই মুখ আর আমি রব এই স্বপ্নের ভিতরে।

('স্বপ্ন'', ঐ)

'সাতটি তারার তিমির'-এ এ জাতীয় কবিতার আরো অনেকগুলি নিদর্শন দেখি : যেমন—''ঘোড়া', 'সেই সব শেয়ালেরা', 'হাঁস' ইত্যাদি। প্রথমে 'ঘোড়া' কবিতাটির আলোচনা করা যাক। ঘোড়ার চিত্রকল্প 'মহাপৃথিবী'র সময় থেকেই কবির মনে উদিত হয়েছিল।

১। সে যেন উঠিল হেঁচে,—হাম্দিের মরকুটে কানা ঘোড়া বুঝি!
সারাদিন গাড়ি টানা হল ঢের—ছুটি পেয়ে
জ্যোৎস্নায় নিজ মনে খেয়ে যায় ঘাস
যেন কোন ব্যথা নেই পৃথিবীতে

('নিরালোক', 'মহাপৃথিবী')

২। মরকুটে ঘোড়া ঐ ঘাস খায়,—ঘাড়ে তার ঘায়ের উপরে
বিনবিনে ডাঁশগুলো শিশিরের মত শব্দ করে।

('পরিচায়ক', ঐ)

৩। যে ঘোড়ায় চড়ে আমরা অতীত ঋষিদের সঙ্গে
আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাব
সেই সব সাদা সাদা ঘোড়ার ভিড়
যেন কোন জ্যোৎস্নার নদীকে ঘিরে
নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে কোথাও;

('আজকের এক মুহূর্ত', ঐ)

'সাতটি তারার তিমির'-এ হামিদের ঘোড়াই রূপান্তরিত হয়েছে মহীনের ঘোড়ায়। সে-ঘোড়া নিয়ে এসেছে যুগ-যুগান্ত পূর্বের প্রস্তর-যুগের স্মৃতি। স্বপ্নে যেমন বাস্তব-ই

কিম্ভূত হয়ে দেখা দেয়, কবিতাটিও তদ্রূপ। পৃথিবীর কিমাকার ডায়ানামোর ওপর নিওলিথ ঘোড়া যেন কবির যৌবন কামনার প্রতীক, যে যৌবন কামনা ঘোড়ার মতোই তেজোবন্ত ছিল, আজ তা প্রস্তরীভূত ফসিলের মতো নিষ্প্রাণ হলেও—'এখনও ঘাসের লোভে চরে'। অর্থাৎ, কামনা নেই, কিন্তু তার স্মৃতি এখনো আকাঙ্ক্ষা জাগায়। সুর্‌রিয়ালিস্ট চিত্রে ঘড়ি যেমন তরল হয়ে যায় বা চায়ের কাপ তৈরি হয় কার দিয়ে, তেমনি এ-কবিতাতেও দেখি, চায়ের কাপ সহসা বেড়ালছানা হয়ে যায়।

'সেই সব শেয়ালেরা' কবিতাটির মধ্যে একটি অবোধ্য হেঁয়ালি সবকিছু আবৃত করে আছে। রাত্রি, পাহাড়, বন, জ্যোৎস্না, শেয়ালের ত্রস্ত পদসঞ্চার আমাদের মনকে এক স্বপ্নালোকের কুহকে নিয়ে যায়। এখানে 'শেয়ালেরা' হতমান, পঙ্গু মানুষের প্রতীক। যারা শিকারের খোঁজে নিস্থিদ্র তারার পথে মৃত জ্যোৎস্নার বীভৎসতায় নানান গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা যদি কোনোদিন 'মানবের মতো আত্মা'য় ফুটে উঠতে পারতো তবে প্রেমের আনন্দ বোধ করতো—সৌন্দর্য দেখতো—উপলব্ধি করতো বিচিত্র বিস্ময়।

'হাঁস'কে কবি পূর্বেও প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যথা—'বুনোহাঁস' বা 'পরিচায়ক' কবিতা। 'সাতটি তারার তিমির'-এ 'হাঁস' কবিতাটিতে যে নয়টি হাঁসের কথা বলা হয়েছে তারা কাব্যের নবধা রস বা কবির সৃষ্টিপ্রতিভার প্রতীক। গাণিতিক মাপকাঠি দিয়ে তার পরিমাপ করা যায় না, তা জাদুর মতো আশ্চর্য! কোথায় সে-সব হাঁস খেলা করে?

'সে নদীর জল খুব গভীর-গভীর'

('হাঁস', 'সাতটি তারার তিমির')

অর্থাৎ, অবচেতনার স্তরে।

প্রেমের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় কবির মনে হয়েছিল প্রেমের সঙ্গে সৃষ্টির যুগও বোধ হয় শেষ হয়েছে :

সুদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল
মিশে গেছে অপরাহ্নে রোদের ঝিলিকে;

('হাঁস', ঐ)

কিন্তু সহসা কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার অবসান হয়নি।

সহসা নদীর মত প্রতিভাত হয়ে সব
নয়টি অমল হাঁস নদীতে রয়েছে মনে পড়ে।

('হাঁস', ঐ)

এ কবিতাটির সঙ্গে ইয়েট্‌স-এর 'The Wild Swans At Coole' কবিতাটির কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

জীবনানন্দের কবিতায় পরাবাস্তবতাবাদ

বাঁশরী রায়চৌধুরী

আধুনিক যুগের 'তিমিরবিনাশী' কবি জীবনানন্দ একান্তভাবেই হিমার্ত রাত ও হেমন্তের বিষণ্ন সন্ধ্যার কবি। তাঁর কবিতায় অতীতের রূপকথার শঙ্খমালা এসে যায় Archetype হয়ে। আবার 'লাশ কাটা ঘরে' কবি দোয়েল ও ফড়িঙের জীবনের মতো তুচ্ছ পুনরাবৃত্ত এক যুবকের শব দেখেন। তাঁর কবিতার রূপকল্পে মরা জ্যোৎস্না, নক্ষত্র, সমুদ্রের নীল মরুভূমি, 'সূর্য গোল রাঙা'র ব্যবহার যেমন মানুষকে প্রকৃতির স্বপ্নলোকে ঊর্ধ্বায়িত করে, তেমনি পাওয়া যায় সব Grotesque বর্ণনা—মাংস, কৃমি, খুঁটি, বেশ্যালয়, নৃমুণ্ডের হেঁয়ালি, শয়তানের সুন্দর কপাল প্রভৃতি।

রবীন্দ্র-উত্তর যুগের কবি জীবনানন্দের কবিতায় পরাবাস্তবতাবাদ বা 'সুররিয়ালিজম', বিশিষ্ট সাহিত্যান্দোলনরূপে বিশ্বযুদ্ধের পর যা পাশ্চাত্যের কবিদের উজ্জীবিত করেছে, তার প্রভাব স্পষ্ট। 'সুররিয়ালিজম' সাহিত্যান্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, ফ্রান্সে আঁদ্রে ব্রেঁত, লুই আরাগঁ প্রমুখ কবিরাই এ কাব্যান্দোলনের পুরোধা পুরুষ। ফরাসি কবি আঁদ্রে ব্রেঁত ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন 'Manifest du Surrealism'। এর আগে ১৯১৭-তেই কবি গীয়ম আপলোনীয়র 'Surrealist' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন বাস্তবের সীমা অতিক্রম করার প্রয়াস বোঝাতে। যুক্তির অনুশাসনের বাইরে যে এক মগ্নচৈতন্যের অধিবাস্তব জগৎ আছে মানুষের মনে, সেখানে ডুব দিয়ে তার অতলস্পর্শী রহস্যকে যথাযথভাবে উন্মোচন করাই ছিল সুররিয়ালিস্ট কবিদের লক্ষ্য। সাহিত্যিক অভিধানেও এর সংজ্ঞা মেলে : (A movement in the 20th Century literature and art which attempts to express and exhibit the workings of the sub-conscious mind especially as manifested in dreams and uncontrolled by reason or any conscious pricess, characterized by the incongruous and startling arrangement and presentation of subject matter.' অবচেতন মনে বিশেষ করে স্বপ্নে মানুষ এমন এক লোকে চলে যায়, যখন বাস্তব জীবনের যুক্তিপরম্পরা শিথিল হয়ে পড়ে। বিষয়বস্তুর বিস্ময়জনক ও উদ্ভট ক্রমবিন্যাস কবির কবিত্বকে প্রভাবিত করে। চিত্রশিল্পী এবং ঔপন্যাসিকদের রচনাতেও আপাত-অসংলগ্ন অথচ বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত এক গভীর জীবনবৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ডাডাবাদের অভ্যন্তরেই ছিল সুররিয়ালিজমের বীজ। 'ডাডা' হলো ফরাসি শব্দ। এর অর্থ হলো কাঠের খেলনা-ঘোড়া। ডাডাবাদীরা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প ও সাহিত্যের প্রচলিত সব রীতি, বিষয় ও ভাবনাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। বুর্জোয়া সমাজও সংস্কৃতির নির্লজ্জ নগ্নতার বিরুদ্ধে ডাডাবাদীরা যা কিছু সনাতন ও নিয়মানুগ, সে সবকে তছনছ করে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ ও অবচেতন মনের যথাযথ উন্মোচনে বিশ্বাসী হন। ১৯২২-এ ডাডাবাদী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হয়। দুই ডাডাবাদী ব্রেঁত ও আরাগ পরাবাস্তববাদ (Surrealism)-এর সূচনা করেন।

সুররিয়ালিস্টিক কবিরা জেগে জেগেও দিবাস্বপ্ন দেখেন এবং যখন ঘুমোন, তখন প্রতীক এবং অদ্ভুত কল্পনার রাজ্যে চলে যান। স্বভাবতই এ পরাবাস্তববাদ ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। স্বপ্ন ও বাস্তবের বিরোধী অবস্থানকে নস্যাৎ করে দিয়ে পরাবাস্তববাদীরা এক উচ্চতর অধিবাস্তবের কথা শোনালেন : 'To create a super reality in which real and unreal, meditation and action meet and mingle'।

ফ্রয়েড-কথিত মানুষের মনের Super-ego বিচারবুদ্ধি দিয়ে জীবনের সমস্যার সমাধান করে। আবার ফ্রয়েড-বর্ণিত মানব মনের ইড (Id) হলো অবচেতন মানস, যা স্বতঃস্ফূর্ত হলেও নানা অসঙ্গতিতে পূর্ণ। একে রূপায়িত করতে হলে কবিকে যুক্তিশৃঙ্খলামুক্ত একটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। পরাবাস্তবতার মূল উপায়টি ব্রেঁত-র ভাষায় 'Psychological automatism'। চেতন মনের খোলস ছেড়ে কবির অবচেতনের জগতে এলোমেলো ছবি ও কল্পনা থাকে। কবিতা ও ছবি যদি প্রকৃত Reality-কে প্রকাশ করতে চায়, তবে তা হবে 'Automatic writing'। পরাবাস্তববাদীদের মতে, মানুষের চৈতন্য যখন শিথিল হয়, তখন মগ্ন চৈতন্য থেকে মানব মনের শিশুসুলভ মানসিকতা ও পশুসুলভ নগ্নতা মনের রাজ্যে প্রাধান্য পায়। যুক্তি থাকলেও আবেগ-ই পরাবাস্তববাদী কবির প্রতীক ও চিত্রকল্পসমূহের যোগসূত্র। অনুষঙ্গ ও ইঙ্গিতের সাহায্যে তৈরি হয় সুররিয়ালিস্ট কবির আবহ।

চিত্রকলার ক্ষেত্রে পরাবাস্তববাদী শিল্পী হলেন ম্যাক্স আর্নস্ট। এছাড়া স্পেনের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী সালভাদর দালি ও সুইস চিত্রশিল্পী পল ক্লে পরাবাস্তববাদী আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। এঁরা শিকারের ছবি এঁকেছেন—বনের পাখী, সঙ্কর পশুরা এঁদের ছবির উপজীব্য বিষয়! সুররিয়ালিস্টরা অরণ্যপ্রেমিক। ফরাসি কবি পল এলুয়ারের কবিতাতেও মানসিক অসংলগ্নতার পরিচয় পাই। ১৯৬৬ পর্যন্ত এ সুররিয়ালিজম সজীব ছিল। ব্রেঁত এবং আরাগঁ দু'জনেই কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। কাজেই এঁদের সুররিয়ালিস্টিক কবিতার পাশাপাশি সাম্যবাদের কবিতাও আছে।

আরাগঁ বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Poet of the French Resistance' ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়। এতে পরাবাস্তববাদ সম্পর্কে বিপ্লবাত্মক সব ভাবনা আছে।

জীবনানন্দের এক শ্রেণীর কবিতাকে আমরা এ পরাবাস্তবতার আলোকে বিচার করতে পারি। প্রথমেই 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের 'ঘোড়া' কবিতাটির উল্লেখ করছি। এ কবিতার অধিবাস্তব দিকটি হলো এরকম—মহীনের ঘোড়ারা ঘাস খায়

পৃথিবীর মাংসের কিমাকার ডাইনামোর ওপর। 'এক ভিড় রাত্রির হাওয়া'য় আস্তাবলের গন্ধ ভেসে আসে। একটু এগোলেই সালভাদর দালির একটা ছবি মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। মোটরগাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি অন্ধ ঘোড়ার জন্ম এবং সে টেলিফোন চিবিয়ে খাচ্ছে (১৯৩৮)। দালির এ ছবি জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের আগেই চিত্রিত হলেও জীবনানন্দের সময় ছবিটি বুদ্ধিজীবী মহলে খুব-ই সমাদৃত। নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে প্রাণীচেতনার সংঘর্ষ এই প্রথম আধুনিক শিল্পায়নে এক তীব্র আকার নিয়েছে। যন্ত্রজাত ঘোড়া যন্ত্রকে ধ্বংস করে পরানিসর্গের জগতে চলে যেতে চায়। বিদ্যুতের বাল্বটাকে চূর্ণ করে দিতে চায় সেই যন্ত্রজাত ঘোড়া—সে ঘাড় বাঁকিয়ে ধ্বংস করছে আর তার সংগ্রামী মনোভঙ্গিকে। সমর্থন জানাচ্ছে রাত্রি ও চন্দ্রের শোভা। মহীনের নামটা শুনলে কি মনে হয় না যে, সে সম্পদশালী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি। কর্তৃত্বের খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়েছে ওই মুক্তিচর ঘোড়াগুলি। 'জ্যোৎস্নার প্রান্তরে' তারা নিঃশঙ্ক ও স্বাধীন। যদিও বাস্তবে তারা শুনতে পাচ্ছে 'ইস্পাতের কলে' ঝরে পড়া বিষণ্ন খড়ের শব্দ। বৈষম্যের ভেতর থেকে ফুটে ওঠে ছবি : 'চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানার মতো'। অর্থাৎ, উপভুক্ত মানুষের স্পষ্ট কর্তৃত্ব কোনোরকমে এড়িয়েছে বেড়ালের মতো মানুষগুলো। কিন্তু ঘুমে তারা ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবজায় ধরা পড়ে। বেশিদূর তারা যেতে পারে না; 'ও পাশের পাইস্-রেস্তোরাঁতে' অবসিত হয়ে পড়ে। কানাগলির সেই অধ্যুষিত আবহাওয়া থেকে তারা ত্রাণ পেয়ে যেতেও পারে। এই বোধে প্যারাফিন লণ্ঠনের আলো নিভে যায়। আস্তাবল আর মহীনের নয়, তা 'নিওলিথ স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে' বিরাজ করে 'সময়ের প্রশান্তি'। এই যে নাগরিক জীবনের যত Cvil যেখান থেকে কবি উন্নীত হয়েছেন নব্য প্রস্তর-যুগের প্রশান্তিতে—এ হলো একান্তভাবেই পরাবাস্তববাদী কল্পনা।

'নগ্ননির্জন হাত' কবিতায় সুররিয়ালিজমের স্বপ্নজগৎ ও ইতিহাসচেতনা কবির মগ্নচৈতন্যে ধরা পড়েছে। কবি দেখেছেন 'অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল'। তাছাড়া কবির স্বপ্নে ছিল ভারতসমুদ্রের তীরে/কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে/অথবা 'টায়ার সিন্ধুর পারে'। এগুলিই কবিতার ড্রিমওয়ার্ক। সব মিলিয়ে যে সত্য বেরিয়ে আসে, তা হলো কবির প্রেমচেতনা :

পর্দার গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ননির্জন হাত।
তোমার নগ্ননির্জন হাত।
(নগ্ননির্জন হাত—'বনলতা সেন')

'শিকার' কবিতায় সুররিয়ালিস্টিক ছবির রং যেন জীবনানন্দের মতো নিপুণ শিল্পীর তুলির টানে শিল্পিত। আকাশের রং ঘাসফড়িঙের মতো। একটি তারা আকাশে রয়েছে, সে যেন পাড়াগাঁয়ের বাসরঘরে সবচেয়ে 'গোধূলি মদির মেয়েটির মতো'। কিংবা মিশরের মানসী তার বুকের থেকে যে মুক্তো কবিকে দিয়েছিল, তারাটা হলো তেমনি

উজ্জ্বল। 'সুন্দর বাদামি হরিণ'—কচি বাতাবিনেবুর মতো সবুজ ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। কিন্তু নাগরিক মানুষরা সেই বাদামি হরিণকে হনন করে। উষ্ণ লাল 'হরিণের মাংস তৈরি হয়ে গেল'। এলোমেলো কয়েকটা বন্দুকের শব্দে নিরাপরাধ হরিণ ঘুমে ঢলে পড়লো। স্নিগ্ধ সকালের বৈপরীত্যে হিমার্ত হরিণের মরণ ঘুম সত্যই পরাবাস্তববাদী ভাবনা।

(শিকার—'বনলতা সেন')

'হরিণেরা' কবিতার স্বপ্নক্রিয়াটি আরও পূর্ণাঙ্গ। এ কবিতার চিত্রকল্প ও প্রতীকগুলি বাস্তব পৃথিবীর নয়। সুররিয়ালিজম অনুযায়ী এ হলো fantasy :

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে।
*　　　　*　　　　*
হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,—
বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

হরিণের খেলা যে প্রতীকী। এ যৌবনের রাজ্যে কবি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত কোনও নারীকে দেখেছেন—সেই নারীর প্রতীক শেফালিকা বোস। যৌবনের যে চিত্র কবির কাছে স্বপ্নলব্ধ, সেই পৃথিবী কখনও ছিল, আজ আর নেই। তাই কবি-কল্পনার পৃথিবী হলো বিলুপ্ত ধূসর কোনও পৃথিবী।

লুই আরাগঁ সুররিয়ালিস্ট কবিদের মধ্যে অন্যতম, যিনি জীবনানন্দের মতো বিশ্ব-পর্যটক। জীবনানন্দকে ডাকে মিশর, ব্যাবিলন, ভূমধ্যসাগর. গ্রিসের দ্বীপগুলি —আর আরাগঁকে হাতছানি দেয় স্পেন, রোমিও ফিরে আসে তাঁর স্বদেশী ফরাসি কাব্যে। ত্রুবাদুরের কাব্যলক্ষ্মী সেই রূপসী আরাগঁর কবিপ্রেয়সী; যেমন জীবনানন্দের বনলতা সেন বা শেফালিকা বোস। তাঁর একটি কবিতার অংশবিশেষ :

Song for a barrel Organ
The girls at home what will they do?
The men sleep with their photographs
The sky outlasts the swallows do?
The men sleep with then photographs
*　　　　*　　　　*
each with a pictured girl who laughs
On canvas strechers head by head
Each with a pictured girl who laughs
*　　　　*　　　　*
We will take, them away, The young man.
Whose skin is green whose bellies red.

ঠিক এ ধরনের অবক্ষয়ের ছবি জীবনানন্দের কবিতাতেও লভ্য :

'আমার শরীরের ভিতর অনাদি সৃষ্টির রক্তের গুঞ্জরণ শুনে,
কোথায় শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম আমি।
যেখানে মাতাল সেনানায়কেরা
মদকে নারীর মতো ব্যবহার করছে, নারীকে জলের মতো',
(সময়ের তীরে—বেলা অবেলা কালবেলা)

এখানে আরাগঁর মতোই কবি ভূপর্যটক :—'তোমাকে আমেরিকার কংগ্রেস-ভবনে দেখতে চেয়েছিলাম

কিংবা ভারতের

অথবা ক্রেমলিনে কি বেতসতন্বী সূর্যশিখার কোনো স্থান আছে' (সময়ের তীরে)

আমেরিকা ভারত ক্রেমলিন কিম্বা অন্য কোনও ভূস্বর্গে তিনি সেই নারীকে দেখতে চেয়েছেন কিন্তু কিন্তু হতাশায় ক্ষিণ্ন :

'কোনো নগরী নেই
সৃষ্টির মরালীকে যা বহন করে চলেছে মধু বাতাসে
নক্ষত্রে—লোক থেকে সূর্যলোকান্তরে।'
(সময়ের তীরে—'বেলা অবেলা কালবেলা')

সুররিয়ালিস্ট কবি লুই আরাগঁর মত ছিল দানবদের বিরুদ্ধে যাবার ন্যায়শক্তি কবিতায় থাকাবে। এবং পল এলুয়ারের মতে—লুই সত্যের পূজারী—অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম।—আশায় প্রস্ফুট জীবনের জন্য আরাগঁর আহ্বান জীবনানন্দের মতোই বিশ্বমানবতার পথের অন্বেষণ : জীবনানন্দও সেই 'জয়জয়ন্তীর সূর্য'কে আহ্বান করেছেন :

'মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে—আরো এসে যেতে পারে;
মহান সাগর গ্রাম নগর নিরুপম নদী;
যদিও কাহারো প্রাণে আজ রাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয় অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা যাবে,
অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধরে চলে
কাজ করে ভুল হলে রক্ত হলে মানুষের অপরাধ
ম্যামথের নয়
কত শত রূপান্তর ভেঙে জয়জয়ন্তীর সূর্য পেতে হলে।'
('জয়জয়ন্তীর সূর্য'—'বেলা অবেলা কালবেলা')

কবি জীবনানন্দ 'রাত্রি' কবিতায় কাব্যে অপ্রচলিত শব্দের সঙ্গে কাব্যিক শব্দকে [illegible] তাঁর অন্ধকারের ভুবনে। প্রচলিত ভাষায় বাঙালির আত্মিক অবক্ষয়কে ধরা [illegible] না। [illegible]বাদে জীবনানন্দের কবিতা জীবন পুনর্নির্মাণের বাহন। 'সাতটি

তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থেই নতুন বোধ ও পরাবাস্তবের বোধের জগতে উপনীত হবেন—তিনি ভঙ্গুর সমাজের গভীর থেকে নতুন মূল্যবোধ রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন 'রাত্রি' কবিতায় :

এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে
*   *   *
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে; সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে পড়ে গেছে জলে।
*   *   *
ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চলে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে
বুড়ো এক গরিলার মত বিশ্বাসে
*   *   *
নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
('রাত্রি'—'বেলা অবেলা কালবেলা'—কাব্যগ্রন্থ)

পরাবাস্তববাদের আর একটি কবিতা 'নাবিক'। এ নাবিক মানুষের যুগান্তরের নিয়ন্তা পুরুষ। এখানেও স্বপ্ন ও জাগরণের মগ্নচৈতন্যের লীলা জেগেছে কবিপ্রাণে—

'নিদ্রায় আসক্ত হতে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে উঠে পরাস্ত নাবিক;
সূর্য যেন পরম্পরাক্রমে আরো—অই দিকে—সৈকতের পিছে
বন্দরের কোলাহল-পাম সারি, তবু তার পরে স্বাভাবিক
স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে;
গোধূম—খেতের ভিড়ে সাধারণ কৃষকের খেলার বিষয়;
তবু তার পরে কোনো অন্ধকার ঘর থেকে অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়
বল্লমের মত দীর্ঘ রশ্মির ভিতরে নিরাশ্রয়
*   *   *
উজ্জ্বল সময় ঘড়ি—নাবিক—অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।'
('নাবিক'—'সাতটি তারার তিমির')

এরোপ্লেনের চেয়েও বেশি গতিতে নিটোল নীলিমাকে খুলে ফেলে মানুষের হৃদয় ক্রমাগত ভুলের বুনুনি বুনে গেছে পৃথিবীর ইতিহাসে। কবির হৃদয়-নাবিক উজ্জ্বল সময় ঘড়িকে কেন্দ্র করে অনন্তের পথে অগ্রসর হয়।

আবার পাঠক চোখ খোলা রাখুন 'হাঁস' কবিতাটির দিকে :

নয়টি হাঁসকে রোজ চোখ মেলে ভোরে
দেখা যায় জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জলে;

*　　　　　*　　　　　*

সে নদীর জল খুব গভীর—গভীর;
সেই খানে শাধা মেঘ—লঘু মেঘ এসে
*　　　　　*　　　　　*
যেতে পারে নাকো কোন সময়ের শেষে

অনেক সময় চুপ থেকে হেমন্তের জল
*　　　　　*　　　　　*
সদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল
*　　　　　*　　　　　*
সহসা নদীর মতো প্রতিভাত হয়ে যায় সব
নয়টি অমল হাঁস নদীতে রয়েছে মনে পড়ে
('হাঁস'—কাব্যগ্রন্থ 'সাতটি তারা তিমির')

'হাঁস' কবিতার নটি অমল হাঁস অমল শিশুপ্রাণের প্রতীক, যারা নারীর কোলে আশ্রিত। খইরঙা নয়টি অমল হাঁস, যখন জীবন নদীর মধ্যে মায়াবীর মতো জাদুবলে ধরা দেয়। এ হাঁসের বহমানতা, ভোরে চোখ খোলা, স্নিগ্ধ জলের নয়টি অমল হাঁসের সঞ্চরণ—সবকিছু জমিয়ে দিচ্ছে এক চিরমুক্ত শিশুপ্রাণের ছবি। কবিও পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন বোধ হয় একান্ত একাগ্রতায়। ফ্রয়েডের দ্বিতীয় সংখ্যা পবিত্র—তা হলো তিন সংখ্যা। তিনবার 'তিনগুণে নয় হয়'—শিশুর প্রতীকী শুভ সংখ্যা বোধ হয়। আরাগঁ যেমন A BC D দিয়ে পরাবাস্তববাদী কবিতা রচনা করেছেন, তেমনই এখানে অক্ষরের বদলে জীবনানন্দর অঙ্কের গাণিতিক দিকটি মূর্ত। এ কবিতার সঙ্গে ইয়েট্সের 'The Wild Swans at Coole' কবিতার সাদৃশ্য স্মরণীয়।

'সিন্ধুসারস' কবিতায় সেই পরাবাস্তববাদীদের মতো জীবনানন্দের স্বপ্নের প্রকৃতি এবং স্বপ্নভঙ্গের পরিমাণ ও প্রদর্শিত। বাস্তব ও পরাবাস্তবের দ্বন্দ্বে দ্বান্দ্বিক কবির আকাঙ্ক্ষার স্বদেশ-বরিশালে কীর্তনখোলা নদীর সুবাতাস কবির স্মৃতিকে এক দূরত্বের ইশারা জাগায়। প্রথমদিকে সুররিয়ালিস্টিক শ্রোতা :

স্বপ্ন তুমি দ্যাখোনি তো,—পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু
ছেড়ে দিয়ে একা
হে সিন্ধুসারস

'সিন্ধুসারস' কবিতায় লক্ষ করলে বোঝা যায়, সিন্ধুসারস একটি সাদা প্রেক্ষাপটের মতো। এ কবিতার সমস্যা মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ দুঃখের কথা। সিন্ধুসারস যেন যুদ্ধপূর্ব যুগের কোনো বনেদী মানুষের প্রতীক। আধুনিক জনযুথের উন্মার্গী উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিশ্লেষণ রয়েছে ছত্রে ছত্রে। সিন্ধুসারস সম্ভ্রান্ত পুরনো কালের মানুষ। তাকে সম্বোধন করে পরাবাস্তববাদী কবিদের মতো কবি শব্দ ব্যবহার করেছেন, শব্দ নিয়ে খেলায় মেতেছেন, কিছুটা Grotesque ব্যাপারও আছে :

হে সিন্ধুসারস
জানো নাকো আজো কাঞ্চি বিদিশার মুখশ্রী মাছির মত ঝরে;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে;
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের,
—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

'নীলাভতম চেষ্টা', 'মাছির মত ঝরে', 'ক্ষুধার বিবরে' ও 'হেমন্তের কুয়াশায়'—এ সব শব্দ, রং ও আবহ সব-ই অধিবাস্তববাদী। পরে বলছেন কবি জীবনানন্দ :

'পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ
হে সিন্ধুসারস
*　　*　　*
*　　*　　*
সমুদ্রের নীল জানালায়
আমারই শৈশব আমারেই আনন্দ জানায়।'

মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে Postimpressionistic চিত্রকর পল গগ্যাঁর কথা। নীলাভ সমুদ্রের তটে শুয়ে আছে জ্যামিতির আকৃতির পৃথিবীর আদিম নারী। সমুদ্র সেই আদিম প্রাণের প্রতীক। এ বিষণ্ণ কালবেলায় সুযোগ সন্ধানী অন্ধ প্যাঁচারা দিব্যি আছে। যুদ্ধবাজ যদুবংশের রাজত্ব, মারী মন্বন্তরের পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতায় ভেঙে যায় কবির শিল্পপ্রকরণ—তাই আসে 'আমিষ তিমিরে', 'মনের মুদ্রাদোষে', 'সময়ের তীরে', 'রূপ কেন নির্জন দেবদারু', 'ভাঙা নীলিমায়', 'অন্ধকার ডাইনি মাইলের পাড়ি দেওয়া পাখিদের মতো', 'লবণাক্ত পালকের ডানায় কাতর', 'রৌদ্রের তিমির'। তাঁর কবিতায় 'পায়রা', 'শালিখ', 'প্যাঁচা', 'ফড়িং', 'জোনাকি', 'শ্বেতপক্ষিসূর্যের', 'বকবধূ', 'টুনটুনি', 'মধুমাছি', 'বাদুড়ের কালো ডানা' প্রভৃতি প্রাণী প্রতীকী চেতনায় দ্যোতিত। Impressionism-এর সঙ্গে মিশে যায় Surrealism। তাই অসুন্দরও সুন্দরে বিধৃত। শীত ও হেমন্ত পরাবাস্তববাদী কবিদের প্রিয় ঋতু।

'বেড়াল' কবিতায় বেড়ালও প্রতীকী। সারাদিন যে বেড়ালের সঙ্গে কবির দেখা হয়, সে হলো কবির অন্তরাত্মা :

'সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় :
গাছের ছায়ায় রোদের ভিতরে,
বাদামি পাতার ভিড়ে';
(বেড়াল—'বনলতা সেন')

গাছের ছায়ায় রোদের ভেতর সে মাছের কাঁটা খোঁজে। বেড়ালের কাজের জায়গা হলো গাছের ছায়া। রোদের মধ্যেই বেড়ালের জীবনসংগ্রাম। অর্থাৎ, মানুষের জীবনও এরকমই রৌদ্রগন্ধ গাছের নিচে চিরন্তন জীবনদ্বন্দ্ব। কিন্তু সেই বেড়াল কৃষ্ণচূড়ার গায়ে

নখ আঁচড়াচ্ছে—মানুষ এভাবে ধ্বংস করে বিপ্লবের প্রেরণায়। কিন্তু হঠাৎ কবি স্বপ্নবিলাসী হয়ে যান :

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে
সাদা থাবা বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের
মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল
('বেড়াল'—জীবনানন্দ দাশ/'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ)

সম্প্রতি প্রয়াত স্প্যানিশ কবি অকটেভিও পাজও সুররিয়ালিস্টিক কবি। সুররিয়ালিস্ট কবি লুই আরাগঁ মার্ক্সীয় দর্শনে পরে বিশ্বাসী হন। পাজের কবিতাতেও সুররিয়ালিস্টিক সুর যেমন আছে, তেমন আছে কম্যুনিস্ট শাসনের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা। তাঁর একটি অনূদিত কবিতা উদ্ধৃত করছি :

প্রভাতসঙ্গীত

বাতাসের হাত আর ঠোঁট
জলের হৃদয়
ইউক্যালিপটাস
সেই জীবন, যা প্রত্যহ জন্মায়
সেই মৃত্যু, যা প্রত্যেক জীবনে
আমি চোখ ঘষি
মাটি দিয়ে চলেছে আকাশ।
(অনুবাদ—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

এ কবিতার সঙ্গেই জীবনানন্দের পরাবাস্তববাদের বহু কবিতা পড়া যায়। তবে পাজের কবিতাটি যেহেতু ছোট, তাই জীবনানন্দেরও একটা ছোট কবিতা বেছে নেয়া হচ্ছে :

'আমাদের হাড়ে এক নির্ধূম আনন্দ আছে জেনে
পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছি ভেসে
তা না হলে সকলি হারায়ে যেতো ক্ষমাহীন রক্তে নিরুদ্দেশে
('মহিলা'—'সাতটি তারার তিমির')

একই হতাশা আছে, কিন্তু বৈপরীত্যে এক নির্ধূম আনন্দ। দুই কবির কবিতাতেই উপভোক্তা পাঠকের বিস্ময়কর আস্বাদন।

জীবনানন্দের কবিতা বহু বর্ণাঢ্য প্রকৃতি ও পৃথিবীর রং, ঘ্রাণ, শব্দ ও স্পর্শের কীট্সীয় ইন্দ্রিয়ময়তায় পরিপূর্ণ। তবু কবি যে অনেকাংশেই পরাবাস্তববাদী, বিশেষ করে শেষের কাব্যগ্রন্থগুলিতে, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। সালভাদর দালির ছবির মতো

তাঁর কবিতার ছবিতে নীল ও কমলা রঙের সমারোহ, রূপোলি হীরের মতো রঙে নারীরা ও পুরুষরা শয়ান অথবা আসীন :

পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দেখে সোনার বলের মত সূর্য আর
রূপার ডিবের মত চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।
*　　　*　　　*
কয়েকটি নারী যেন ইশ্বরীর মতো :

('গোধূলি সন্ধির নৃত্য'—'সাতটি তারার তিমির')

জীবনানন্দের কবিতায় সুররিয়ালিস্টিক বা ইম্প্রেশনিস্টিক শিল্পরীতির প্রকাশ থাকলেও সেই শিল্পরীতির মূলে আছে কবির প্রখর বিস্ময়বোধ। এ বিস্ময়বোধের জন্যই এ বাস্তব পৃথিবীকে দেখে কবি শান্তি পাননি—ইমাজিনেশনের নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছেন। মগ্নচৈতন্যের স্বপ্নলোক তাই তাঁর কবিতায় এতো গভীর বর্ণময় ও পরাবাস্তববাদে মায়াবী।

সহায়-পঞ্জি

1. Standard Literary Dictionary.
2. Waverly literary Encyclo-paedia.
3. Socialist Verse-Penguin (Collection of poems).
4. Biographical dictionary.
5. Glossary of literary terms-Abrams.

জীবনানন্দ—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ—বিষ্ণু দে

গল্প নিয়ে কবিতা নিয়ে—শ্রী হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকা

দেশ-১৬ মে, ১৯৯৮ সংখ্যা

ঋণস্বীকার : সালভাদর দালি ও গর্গ্যার ছবির প্রসঙ্গটি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন ভাস্কর শ্রীমতী রীতা সিনহা।

জীবনানন্দের পরাবাস্তবতা

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

বাংলা কাব্যে প্রথম খাঁটি সুররিয়লিস্ট কবি কিন্তু জীবনানন্দ।

ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা চিত্রে বস্তুরূপের বাইরের কাঠামোটাকে যথাযথ রূপ দান করার চেষ্টা না করে শিল্পীর মনে ও মননে তার যে অস্তিত্বের সংবেদনলগ্ন রূপ ধরা পড়ে, তারও আভাস দিলেন তাঁদের আঁকা ছবিতে। বস্তুরূপের সবটা তো আমরা দেখতে পাই না। শিল্পী কল্পনায়, অনুমানে সেই না-দেখা রূপের ছবিও তুলে ধরলেন আমাদের চোখের সামনে তুলির সাহায্যে। আর তা করলেন প্রচলিত পথে না গিয়ে, রঙের আর রেখার নানারকম উল্টোপাল্টা ব্যাপার ঘটিয়ে। বাংলা-কাব্যসৃজনেও এ ব্যাপারে এগিয়ে এলেন জীবনানন্দ। শব্দকে তার নিজের অর্থের ঘেরাটোপ থেকে তুলে এনে তার গায়ে শব্দাতীত ব্যঞ্জনার আংরাখা পরিয়ে দিলেন। বস্তুজগৎকে তখন তিনি তার নিজের আলোয় না দেখে কল্পনা-শলাকার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তুললেন। অন্তরের গহন গোপন রহস্যের যে একটি মায়ালোক আছে, তার ইঙ্গিত জীবনানন্দ প্রথম বহন করে আনলেন কাব্যে।

মন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকরা তথ্য উদঘাটন করে বললেন, মনের আছে তিনটি স্তর—চেতন, অবচেতন আর অচেতন। ইম্প্রেশনিস্ট কবিরা মনের শেষ-দু'টি স্তরকে প্রকাশ করার ব্যগ্রতা দেখালেন। অচেতন ও অবচেতন স্তরের অনুভবলোক অবিন্যস্ত—তার সার্বিক পরিচয় সহজ ও সম্ভব নয়। তাই তার পরিচয় দেবার জন্যে শব্দকে অর্থপ্রকাশের চলতি সড়ক ছেড়ে কিছু বাঁকা রাস্তায় বা বন্ধুর পথে পাড়ি জমাতে হয়। চিরাচরিত অভ্যস্ত অর্থের গণ্ডি থেকে শব্দ ছাড়া পায়, সে শব্দকে তখন হয়তো উদ্ভট বা আজগুবি মনে হতে পারে। কবি তখন এক-একটি শব্দে এক-একটি বোধ বা বস্তুকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—এভাবে প্রতীকতার নির্মিতি চলে।

প্রতীকের ব্যাপারটা ভালো করে রপ্ত না করলে খাপছাড়া ঠেকতে পারে। কবি মনোলোকের রূপতৃষ্ণা ও রহস্যময়তার খবর দিতে চান নিজের অভীপ্সিত শব্দের উল্লেখে, পাঠকের কাছে তা দুরূহ ঠেকতেই পারে। বরং বলা চলে, প্রথম প্রথম দুরূহ ঠেকবেই। কারণ, এক-ই শব্দের সাহায্যে বিপরীত ধারণাও কখনো-কখনো ব্যক্ত হয়ে থাকে। জীবনানন্দের কাছে এক-ই হেমন্ত কখনো বন্ধ্যাত্বের প্রতীক, কখনো আবার ভরা ফসলের ঋদ্ধির ঘোষক। পেঁচা কখনো প্রাজ্ঞতার প্রতীক, কখনো অসফল বা অচরিতার্থ প্রেমিক। আবার চিলের করুণ কান্নার মাধ্যমেও কখনো-কখনো অসফল প্রেমিকের হৃদয়-সংরাগের নিরুত্তাপ অসহায়তা অথবা কারুণ্যের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

শূন্য মাঠ জীবনানন্দের কাছে কখনো বিরহব্যঞ্জক, কখনো আবার সভ্যতার অন্তঃসার শূন্যতার প্রকাশক। 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' কবিতাটি (দরদালানের ভিড়—পৃথিবীর শেষে/যেইখানে পড়ে আছে—শব্দহীন—ভাঙা/সেইখানে উঁচু-উঁচুহরিতকী গাছের পিছনে/হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল—রাঙা—/চুপে-চুপে ডুবে যায় জ্যোৎস্নায়।) বিভিন্ন পাঠক ও কবির কাছে ভিন্ন অর্থ বহন করে নিয়ে এসেছে। কেউ-কেউ বলেছেন, এটি নৃত্যপ্রধান কবিতা, কারো কাছে এটি প্রতিভাত হয়েছে প্রগাঢ় ঠাট্টার কবিতা হিসেবে, কেউ বা এর মধ্যে পরিব্যাপ্ত বিষাদের ছায়া দেখেছেন।

জীবনানন্দের কাব্যে প্রতীক ব্যবহারের কিছু আধিক্য রয়েছে। সুররিয়ালিস্ট কবি হিসেবেই প্রতীক-রচনার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ, এমনকি তাঁর সব নায়িকার নামেও তিনি প্রতীকতা আরোপের চেষ্টা করেছেন,—বনের লতা যেমন চিরকালীন শ্যামলতার আকর, তেমনি বনলতা মানবীয় সৌন্দর্যের দীপ্তিময় প্রকাশ। শেফালিকা বোসের হাসি হীরের প্রদীপের মতো জ্বলন্ত-বলার মধ্যে ছড়ানো শিউলি ফুলের হীরকশুভ্র দ্যুতির প্রতীকতা আরোপিত হচ্ছে না? জলে একটি মৃত পদ্মকে ভাসতে দেখে কবির মনে হয়েছে, মৃণালিনী ঘোষালের শব। মানুষের মনের চেতনার রূপকার্থেই সুচেতনার উল্লেখ।

পাখি তাঁর কাছে আবহমান ইতিহাস চেতনারূপে প্রকটিত হয়েছে। 'মকর সংক্রান্তির রাতে' কবিতায় কবি তো স্পষ্টই উৎপ্রেক্ষা অলংকারের মাধ্যমেই প্রতীকতার কথা ব্যক্ত করলেন—

(আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতো যেন)
কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে
নক্ষত্রের থেকে আরো নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে-জাগিয়ে
আরো বড় বিষয়ের হাতে
সে-সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কী এক গভীর সুসময়।

আলো-কে কবি কখনো নির্মল চেতনার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আদর্শহানি হলে, অসত্যের প্রতি আসক্তি জাগলে, চরিত্রহনন ঘটলেই সভ্যতার প্রতীক আলো নিভে যায়। 'সৃষ্টির তীরে' কবিতাটির মধ্যে কবি ব্যঙ্গ করেছেন প্রতীকের ছায়া-গুণ্ঠনের আড়ালে।

প্রতীক কখনো একটি দ্রব্যের রূপ ধরে বর্ণিত হয়েছে, কখনো বা গোটা একটি ঘটনা বা ব্যাপারকেই প্রতীকায়িত করা হয়েছে। হেমন্ত বন্ধ্যা ঋতুর প্রতীক হিসেবে গৃহীত হলো। প্রতীকতার স্পষ্টতা ও ঋজুতা স্বাভাবিক। আবার 'শিকার' কবিতায় কোনো একটি বস্তুর মধ্যে প্রতীকতা আরোপিত নয়, গুলি চালিয়ে প্রাণি হত্যা করার ঘটনাকেই প্রতীকচেতনার ঘেরাটোপে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। শিকারের গুলিতে প্রাণি হত্যা চলছে, এ গুলি যেন নির্দয়-নিষ্ঠুর যান্ত্রিকতা—মানুষকে মেরে ফেলাই যার কাজ। আর হত্যাকর্মের ব্যাপারটা হচ্ছে—আমাদের হৃদয়বৃত্তিকে আমরা মেরে ফেলছি,

জীবনের যে, সব স্নিগ্ধবোধ, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, করুণা-মমতা—সবকিছুই আজ খুনে যান্ত্রিকতার বলি। 'শিকার' শিরোনামাটিও তাই তাৎপর্যপূর্ণ।

আরো বিস্তৃত বিন্যাসের পরিব্যাপ্তিতেও প্রতীকের ব্যবহার জীবনানন্দের কাব্যে অনুপস্থিত নয়। 'বনলতা সেন' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। আমাদের বিধ্বস্ত জীর্ণ জীবনে প্রেম সুগভীর শান্তি আনে, নারীর সান্নিধ্য শান্তি দেয়। কবির এ বিশ্বাস ছিল যে, প্রকৃতি যেমন মানুষের ক্লান্তি ও অবসাদ ঘুচিয়ে প্রশান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়, তেমনি প্রেমের আশ্রয়েও মানুষের ক্লান্তি দূর হয়। 'বনলতা সেন' গ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রেমের ভুবনের এ স্নিগ্ধ আশ্রয়ের ইঙ্গিত আছে। নাটোরের বনলতা সেন তাই নিঃসন্দেহে আশা ও বিশ্বাস, আরাম ও প্রশান্তির প্রতীক হয়েছে হাজার বছর ধরে পথ-হাঁটা ক্লান্তপ্রাণ মানুষের কাছে। এ মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত জীবন-যুদ্ধের যে-কোনো ক্লান্ত-আহত সৈনিক, বনলতা সেনও তার অভীপ্সিত নারী, পৃথিবীর প্রেমের বয়সিনী সেই নারী চরম ক্লান্তির অপনোদন ঘটিয়ে পরম শান্তির নীড় রচনা করতে পারবে; যেখানে মানুষ দু'দণ্ড শান্তি পাবে তার জীবনে।

সুরঞ্জনার হৃদয়কে যখন তিনি ঘাস বলে বর্ণনা করেন, তখন মনে হয়, ঘাসকে তিনি শূন্যতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতাকে তিনি শকুনের প্রতীকে বর্ণনা করে বলেছেন—

মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে—সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে-আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে।

'সেই সব শেয়ালেরা' কবিতায় প্রতীক-চেতনা কিছুটা কবির মনো-ভাবনার আড়ালেই থেকে গেছে, তবু ব্যাখ্যাকারদের তথা সমালোচকদের কাছে দুরূহতারও অর্থ-সন্ধান চলে। ঐ কবিতায় কবি জীবন-যুদ্ধে পরাজিত, ক্ষত-বিক্ষত মানুষগুলিকেই প্রতীকে বর্ণনা করেছেন। দরিদ্র জনসাধারণ সত্যিই জন্ম-জন্ম শিকারের বলি হবার জন্যেই জীবন ধারণ করে এসেছে, যারা দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে যন্ত্রণা ও জীর্ণতায় শামিল হয়—তারা কি কখনো মানবের মতো আত্মায় উন্নতি হতে পারবে? কবি সেই বেদনাকে ঘুরপথে প্রতীক-দ্যোতনার উত্তাপেই অবশেষে প্রকাশ করলেন—

সেই সব শেয়ালেরা জন্ম-জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে,—বার হয়,—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে; উঠিত পারিত যদি সহসা প্রকাশি
সেই সব হৃদযন্ত্র মানবের মতো আত্মায় :
তাহলে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিতো;—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

প্রতীক-চেতনার পরবর্তী স্তর হলো সুররিয়ালিজম্। রোমান্টিক অনুভূতির পরে কবির মন যখন বাস্তবতায় আবার ফিরতে চায়, তখন সে কল্পনার রং নিয়েই

বাস্তবাশ্রিত হয়ে থাকে। ফলে বাস্তব তখন অতিবাস্তবের চেহারা নেয়, Real তখন Super real হয়ে ওঠে। বাস্তব জীবনের দিকে নজর দিতে গিয়ে অবচেতন মনের কার্যকারিতা প্রাধান্য লাভ করে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা মনে করি, কবি বুঝি খেয়াল-খুশি মতোই তাঁর কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। সুররিয়ালিস্ট কবিদের ধর্মই হচ্ছে এই।

জীবনানন্দের কাব্যের ক্রম-পরিণতির পথটি এ রোমান্টিক পদ্ধতি থেকে পরাবাস্তবতার জগতে উত্তরণ। কবি নিজের অবচেতন মনের বিবিধ বোধের পরিচয় দিলেন নতুন উপাদানে, যার মধ্যে চেনা-জানার কোনো বালাই নেই। তাঁর সুররিয়ালিস্ট কবিতায় তাই প্রতীকের কিছু আধিক্য। সুররিয়ালিস্ট কবিদের বৈশিষ্ট্যই হলো প্রতীক ব্যবহারে। তাদের কবিতায় প্রজ্ঞা-লোকের চেতনার রূপ তাঁদের মানস-গভীরতা থেকে উদ্ভূত হয়—জীবনানন্দের কবিতায় এসব লক্ষণ স্পষ্ট। তাঁর কাব্যের বিষয় শুধু প্রকৃতি বা প্রেম নয়, ইতিহাসচেতনা ও ভৌগোলিক ব্যাপ্তির পরিসীমায় বিধৃত জীবনের জটিলতা নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন; এবং রোমান্টিক মনন পর্বের উত্তরকালে, অর্থাৎ 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবেলা কালবেলা' রচনাকালে তিনি পরা-বাস্তববাদী কবিতা লিখেছেন। ফলে তাঁকে প্রতীকের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

আরও একটা কারণের কথা, যা আমার মনে হয়েছে, তার উল্লেখ করে সুধী পাঠকের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করতে চাইছি। জীবনানন্দের বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ আত্মা এক নির্জন অধিপথের যাত্রী, যে চিরন্তন আলোকের পিপাসু, অথচ অস্তিত্বের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করতে না পেরে ক্লান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত। পৃথিবীকে সে এক Wasteland বলে ভাববেই। এ পৃথিবীর এ শতকের প্রতিটি মানুষ-ই আত্মা-থেকে দেয়া জীবন-পথের নির্দেশ হারিয়ে ফেলেছে। সেই হারানো পথ-নির্দেশিকা খোঁজার জন্যেই বিব্রত, ব্যাকুল, কিছুটা বিভ্রান্তও। এ অভিনব জীবন-জিজ্ঞাসা এবং নতুন পথ-নির্দেশ-আকুতি সার্থকভাবে রূপদান করতে নতুন বিন্যাসের দরকার এছাড়া হয় না। কেননা, যুগ-যন্ত্রণার এ বেদনা সম্পূর্ণ একালিক। তাই নাট্যকার য়্যান্টি প্লে, এবসার্ড নাটক প্রভৃতি রচনা করেন, গল্পকার ফ্যান্টাসি রচনার পথ নেন, কবি কখনো রূপক ও প্রতীকতার আড়ালে আশ্রিত হন, কখনো বা সুররিয়ালিস্টিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। জীবনানন্দের বিষণ্নমনস্কতার আলোচনায় আমরা দেখেছি, কবির ম্লান নিঃসঙ্গ মনের অবসন্নতা কত গভীরে বিস্তৃত। তাঁর পক্ষে সুররিয়ালিস্টিক কবিতা রচনা করা তাই অস্বাভাবিক নয়।

এ প্রসঙ্গের উপসংহার হিসেবে জীবনানন্দের অতিশয় বিখ্যাত একটি সুররিয়ালিস্টিক কবিতার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করে কথান্তরে যাই। যে কবিতাটির উদ্ধৃতি দিচ্ছি, তার নাম 'ঘোড়া'। এটি যেমন প্রসিদ্ধ, তেমনই সুররিয়ালিস্টিক।

> আমরা যাইনি মরে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়;
> মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;
> প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
> পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।
> আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়;
> বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে;

চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়াল ছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে নড়ে গেল ও-পাশের পাইস্ রেস্তোরাঁতে;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

জীবনানন্দের কাব্য-ফসলের মধ্যে এটি একটি দুরূহ এবং দুর্বোধ্য রত্ন। কবি নিজের অচেতন এবং অবচেতন মনের যে অনুভবরাজিকে কাব্যায়িত করেছেন, সেগুলি যুক্তিজালের ওপর কেমন করে দাঁড়িয়ে আছে, তা দেখতে হবে। কবির স্বপ্নময় মগ্নচৈতন্যের মঞ্জুষার অর্গল ভেঙে যে রত্ন বের হলো, তা বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ঘষে পাঠককে চিনে নিতে হবে। কবি তো স্বপ্নকে সরাসরি হাজির করতে চাইছেন—ফলে যুক্তি এবং পারম্পর্যের সূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। চায়ের কাপ বেড়াল হয়ে গেল, স্বপ্নে বাস্তব জিনিস এমন হামেশাই তো কিম্ভূত চেহারা ধারণ করে। সুররিয়ালিজমের চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্যই এমন।

'ঘোড়া' কবিতাটি সুররিয়ালিস্ট কবিকর্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বার-দু'চার পড়বার পর আরো যেন বেশি দুরূহ ঠেকছে—মনে হবে। পরাবাস্তবতার রহস্যভেদের চেষ্টা করলে পাঠকের কাছে এ কবিতাটির রসলোকের ঠিকানা মিলবে। আমার কাছে এটি একরকমের অর্থ নিয়ে হাজির হয়েছে, অন্যের কাছে এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে। ঘোড়াকে প্রস্তরযুগের বা প্রাগৈতিহাসিককালের স্মৃতি বহনকারী মনে হয়েছে কারো কারো। কিন্তু ঘোড়াকে নির্জ্ঞান মন ভাবা যেতে পারে। প্রাক্তন পটভূমিতে লালায়িত নির্জ্ঞান, আর এ নির্জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা কিম্বা ক্ষুধা—ঘটনা, দৃশ্য অথবা ইতিহাসের স্রষ্টা। এ ইতিহাসের মধ্যে কোনো পারম্পর্য নেই। বিশৃংখল, অযৌক্তিক—তাই কিমাকার। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে স্বপ্নস্রষ্টা এ নির্জ্ঞান স্রোতে অস্তিত্বের মৌলিক সত্তাকে অনুভব করতে পারে। মহীন বলতে আমরা কবিকেই বুঝেছি, কবির নির্জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা আজো আছে, প্রবৃত্তির চরিতার্থতার লোভ রয়েছে, তাই ঘাসের লোভে চরতে চায়। যাঁরা ঘোড়াকে কবির যৌবন কামনার প্রতীক ভাবছেন—তাঁরা নিশ্চয়ই অর্থ করবেন যে, সেই যৌবন এখনো কামগন্ধী, আকাঙ্ক্ষামদির। এখনো ঘাসের লোভে সেই ঘোড়া চরে বেড়ায়। গোল আস্তাবল হলো পৃথিবী কিম্বা নির্জ্ঞানের লীলাভূমি। প্যারাফিন লণ্ঠন, অর্থাৎ সুচেতনা নিভে যায়, নির্জ্ঞানও হারায়! সব মিলিয়ে আবার এরকম একটা অর্থও হতে পারে—'পৃথিবীর ডাইনোমোর পরে' অর্থাৎ যান্ত্রিক জীবনের একঘেয়েমির মধ্যে সুদূর কালের অতীতের বা প্রাগৈতিহাসিক কালের নিশ্চলতা রয়েছে, সেই অতীত যুগের 'নিওলিথ স্তব্ধতার' ঘোড়াগুলি ঘাসের লোভে বর্তমানের পৃথিবীতে এসে জড়ো হয়। কিন্তু এলোমেলো বা অবিন্যস্ত পৃথিবীতে কোনো সুবিধার আঁচ না পেয়ে আবার অতীতের স্তব্ধতার জ্যোৎস্নায় মিশে যায়।

জীবনানন্দের পরাবাস্তবতা, কোন্ অর্থে?

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

প্রধানত তাঁর চিত্রকল্পের ব্যাখ্যা-সূত্রে জীবনানন্দ দাশকে বাংলা কবিতায় পরাবাস্তব বা সুরিয়ালিজমের 'প্রবর্তক' বলে বারংবার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বিষয়টির পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।

আন্দ্রে ব্রেঁতর নেতৃত্বে কয়েকজন ফরাসি লেখক দাদাবাদ থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন সুরিয়ালিজম। দাদা আন্দোলনের উৎসভূমি ছিল জুরিখ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন জাতির দেশান্তরী একদল তরুণ জুরিখে দাদা আন্দোলন শুরু করেন।—

Dada was 'against everything' (including Dada) and had been composed in unequal proportions of an under-standable disgust with world conditions, boredom and the desire of individuals for self-advertisement.

দাদাবাদ প্যারিসে আনেন ত্রিস্তান জারা। জারাকে বাদ দেবার পর বিশের দশকে ফরাসি সুরিয়ালিজমের সুনির্দিষ্ট রূপ দাঁড়ায় এরকম .

Pure Psychic automatism by means of which it is proposed to express, either verbally, in writing, or in any other way, the real process of thought—in the absense of all control exercised by reason and outside all aesthetic or moral considerations.

সুরিয়ালিজমের এ তত্ত্ব অবচেতনের ওপরে গুরুত্বারোপ এসেছে ফ্রয়েডের তত্ত্বের ভিন্নার্থক প্রয়োগ-প্রয়াস থেকে; 'স্বপ্নের গুরুত্ব' ও 'স্বয়ংক্রিয় লেখা' সুরিয়েলিস্টদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে সুচিহ্নিত হলো। অচিন্ত্যপূর্বের উপরিস্থাপনে বিশ্বাসী ফরাসি সুরিয়েলিস্টদের ডিলান টমাস অভিহিত করেছেন 'সুপাররিয়ালিস্ট' অর্থাৎ 'those who work above realism' বলে। ফরাসি সুরিয়েলিস্টরা রিয়েলিস্ট, অর্থাৎ যাঁরা 'Tried to put down in paint or words an actual representation of what they imagined to be the real world in which they tried'[১৪] এবং ইম্প্রেশনিস্ট, অর্থাৎ যাঁরা 'Tried to give impression of what they imagined to be the real world'—এ উভয়ের-ই বিরুদ্ধে। সুরিয়েলিস্টরা ডুব দিতে চাইলেন সচেতন মনের উপরিস্তরের নিচের অবচেতন মনে, সেখান থেকে তুলে আনতে চাইলেন ইমেজ : 'without the aid of logic or reason, and put them down, illogically and unreasonably in paint and words.'

দাদাবাদ ছিল ধ্বংসাত্মক, সবকিছুর 'এন্টি'; সুরিয়ালিজম রিয়ালিজম ও ইম্প্রেশনিজমের 'এন্টি', তবে দাঁড়াতে চেয়েছে ফ্রয়েডের অবচেতন মনের তত্ত্বের ভিত্তিতে। ফ্রয়েডের তত্ত্বানুযায়ী যেহেতু মনের তিন-চতুর্থাংশই অবচেতন, সুতরাং সুরিয়েলিস্টরা চেতন এক-চতুর্থাংশের বদলে অবচেতন তিন-চতুর্থাংশ থেকে কবিতার উপাদান সন্ধানী হলেন। তাঁদের প্রক্রিয়া ডিলান টমাসের ভাষায় :

One method the surrealists used in their poetry was to juxtapose words and images that had no rational relationship; and out of this they hoped to achieve a kind of subconscious. or dream, poetry that would be tmer to the real imaginative world of the mind, mostly submerged, than is the poetry of the conscious mind, which relies upon the rational and logical relationship of ideas, objcets and images.

ফরাসি সুরিয়েলিস্টরা মানব-প্রকৃতিকে 'অধিকতর সত্য' স্বরূপে উপস্থাপনের প্রয়াসী হয়েছেন। ব্রেরেটনের মতে, তাঁদের অবচেতনের স্বীকৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান এবং প্রতীকীদের আবিষ্কার-অতিক্রমী। তাঁদের সীমাবদ্ধতা এই যে, তাঁরা ফর্মের সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাননি। ব্রেরেটনের ভাষায় :

The problem it has never solved is the problem of form. Here it could not innovate since it expressly disclaimed 'aesthetic considerations'. Neither could it reject entirely, since to write at all is to use a form, however unplanned it may appear. So it has simply taken over existing forms and has used them very loosely, free verse drifting into the prose poem and the prose poem sometimes expanding into the long personal symbolic or doctrinaine work which may look like a novel but for which no satisfactory name has been found. The distinction between poetry and prose is largely abclished as being of small importance; but because of the stress laid on symbols and images most surrealist writing appears 'poetic' to readers accustomed to associate prose with the realistic and the rational.

সুরিয়েলিস্টদের এ প্রকৃত পরিচয়সূত্র স্মরণ রাখলে জীবনানন্দ দাশের কোন কবিতাকেই আদ্যন্ত সুরিয়েলিস্ট বলা যায় না। সন্দেহ নেই, জীবনানন্দের বহু চিত্রকল্পে পরাবাস্তব চেতনা লক্ষণীয়। ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৫৬) ও ডক্টর অশ্রুকুমার শিকদার (১৩৮২) কর্তৃক উদ্ধৃত কিছু কাব্যাংশ নিম্নরূপ :

১. কারা এসে বলে গেল : 'নেই
গাছ নেই—রোদ নেই—মেঘ নেই—তারা নেই—আকাশ তোমার
তরে নয়।'
('নদীরা', কাব্য সম্ভার, পৃ.—৯৯)

২. স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে
হরিণেরা, রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝরে যায়
পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।
('হরিণেরা', কাব্য সম্ভার, পৃ—১৫৬)

৩. মনে হয়
কারা যেন বড়ো-বড়ো কপাট খুলেছে,
বন্ধ করে ফেলেছে আবার;
কোন দূর—নীরব—আকাশরেখার সীমানায়।
... ...
চোখ তুলে আমি
দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো প্রবেশ করলাম :
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।
('শ্রাবণ রাত', কাব্য সম্ভার, পৃ—১৮০-৮১)

৪. কিন্তু এই নদী
রাঙা মেঘ—হলুদ-হলুদ জ্যোৎস্না; চেয়ে দ্যাখো যদি;
অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো;
লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রূপালি নীরব।
('শব', কাব্য সম্ভার, পৃ—১৮৩)

৫. তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন
মানুষ রবেনা আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন:
সেই মুখ আর আমি রবো সেই স্বপ্নের ভিতরে।
('স্বপ্ন', কাব্য সম্ভার, পৃ—১৮৪)

কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ উল্লেখ করেছেন 'বিভিন্ন কোরাসের' একটি চরণ :

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস

ডক্টর দীপ্তি ত্রিপাঠী 'ঘোড়া' ('নিরালোক', মহাপৃথিবী), 'শেয়ালেরা' ('যেই সব শেয়ালেরা', সা. তা. তি.) 'হাঁস' ('হাঁস', সা. তা. তি.) প্রভৃতি প্রতীক ব্যবহারের কথাও পরাবাস্তব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন; অবশ্য নিজেই নির্দেশ করেছেন প্রতীক বলে।

কবিতার অনুষঙ্গ থেকে আলাদা করে ঐভাবে তুলে ধরলে ঐসব চরণ বা কবিতাংশ সুরিয়েলিস্ট মনে হতে পারে; যদিও লক্ষণীয় উদ্ধৃতাংশে অন্বয়ের অভাব নেই। 'স্বপ্ন' কবিতাটিতে সুরিয়েলিস্টের মতো স্বপ্ন-ধ্যান আছে। কিন্তু সমগ্র কবিতায় সুরিয়েলিস্ট 'ক্যাওসের' (Choas) কোন পরিচয় নেই। বরং সব সময়-ই আছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যৌক্তিক পারম্পর্য এবং অবশেষে অর্থময় ভাষা। অর্থাৎ, পরাবাস্তব জীবনানন্দকে আমুণ্ড গ্রাস করেনি। তিনি বাংলা কবিতায় পরাবাস্তবের উপমা-রূপক-চিত্রকল্প প্রথম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ঐ সব প্রয়োগ ছিন্নভিন্ন অবিন্যস্ত অশোধিত নয় এবং তাঁর কবিতা অবশেষে সুনির্দিষ্ট বক্তব্যের মোজায়েকে দাঁড়িয়েছে। খুব-ই ন্যায়সঙ্গত যে, জীবনানন্দ তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় সমালোচক-উক্ত কোন এক বা একাধিক বিশেষণে ধরা দিতে অসম্মতি জানিয়েছেন।

তাঁর কবিতা সুরিয়েলিজম-জাত—এ অভিমত খণ্ডন করতে ডিলান টমাস যা বলেছিলেন, তা জীবনানন্দ সম্পর্কেও প্রয়োগযোগ্য বলে আমার মনে হয়। ডিলান টমাস বলেছেন :

I do not mind from where the images of a poem are dragged up : drag them up, if you like, from the nethermost sea of the hidden self; but before they reach paper, they must go through all the rational process of intellect. The surrealist on the other hand, put their words down togather on paper exactly as they emerge from chaos; they do not share these words or put them in order : to them, chaos is the shape and order. This seems to me to be exceedingly presumptions, the Surrealist imagine that whatever they dredge from their subconscious selves and put down in paint or in words must, essentially, be of some interest or value. I deny this, One of the arts of the poet is to make comprehensible and articulate what might emerge from Subconscious sources; one of the great main uses of the intellect is to select, from the amorphous mass of subconscious images, those that will best further his imaginative purpose, which is to write the best poem he can.

জীবনানন্দ দাশের উপমা-রূপক-চিত্রকল্প এই অর্থেই সুরিয়েলিজম-আক্রান্ত কিন্তু তাঁর কবিতা সুরিয়েলিজম-অতিক্রান্ত।

প্রসঙ্গ : জীবনানন্দের সুররিয়ালিজম

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

পরাবাস্তববাদীকে যদিও আর সকলের মতোই নিছক বাস্তবের নিরেট অভিজ্ঞতার স্তর থেকেই যাত্রা শুরু করতে হয়, তবুও তার লক্ষ্য এমন এক স্তরে উন্নীত হওয়া, যেখানে বাস্তবের সংগে কোনো সম্পর্কই আর থাকবে না। ফরাসি দেশে প্রথম সুররিয়ালিস্ট কবিতার উদ্ভব। ফরাসি-চরিত্রে বোধ হয় সবকিছুতেই একটা আতিশয্যের ভাব আছে। ফরাসি সুররিয়ালিস্ট কবিরা কবিতায় চেতন-মনের নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করে অবচেতন মনের জটিল ও মগ্ন উপাদানের সাহায্যে মহৎ কবিতা রচনার সম্ভাবনায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। চৈতন্যকে দাবিয়ে রেখে তাঁরা স্বয়ংক্রিয় রচনার আশ্রয় নিতেন এবং ক্রমশ এমন-একটা অবস্থায় উপনীত হতেন, যখন চৈতন্যের অবদমন-শক্তি শিথিল হওয়ার ফলে মগ্নচৈতন্যের নানা উপাদান চেতনার স্তরে ভেসে উঠতো। সেই সমস্ত উপাদান বা চিত্রকল্পগুলিকে তাঁরা নির্বিচারে কবিতায় স্থান দিতেন। ফলে কবিতা হলো আকারহীন, ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করলো, শব্দের অর্থ অভিধানের সীমানাকে ছাড়িয়ে গেল। কোথাও কোথাও গাঢ় রঙের অভিজ্ঞতার ছবি ফুটে উঠলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব কবিতা অর্থহীন প্রলাপে পরিণত হলো। জটিলতা আর অসংলগ্নতাই হলো কবিতার মূল চরিত্র। বলা বাহুল্য, সুররিয়ালিজম ফ্রয়েডের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ওপর কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। এডলার-ইয়ুং প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কারকেও কবিরা কাজে লাগাতে চাইলেন। কিন্তু চেতনা-মনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে গেলে বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু লাভের সম্ভাবনা থাকে না। কবিতা মানব-মনের চৈতন্যের ফসল। অবচেতন মন মানব-অভিজ্ঞতার অনেক ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার সন্দেহ নেই, অবচেতনের ঐশ্বর্যময় উপাদান কবিতাকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করতে পারে, কিন্তু কবিতা একটি শিল্প-সৃষ্টি, যার পেছনে চেতনার সক্রিয়তার প্রয়োজন আবশ্যিক। আধুনিক ইংরেজ কবিরা ফরাসি সুররিয়ালিস্ট কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা একটা রফা খুঁজেছেন। তাঁরা এটুকু মেনে নিয়েছেন যে, তাঁদের মনে যে সমস্ত চিত্রকল্প আপনাআপনি ভেসে ওঠে, তাদের বোঝার কোনোরকম সজ্ঞান চেষ্টা না করেই কবিতায় তাদের ব্যবহার করবেন: কবিতার কাঠামোকে যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না করে চিত্রকল্পের ওপর-ই ছেড়ে দেবেন—একটি চিত্রকল্প অন্য একটি চিত্রকল্পের আভাস এনে দেবে; তারপর সমস্ত চিত্রকল্পগুলি মিলে একটি অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তুলবে। কিন্তু ফরাসি কবিরা যেমন নির্বাচনের ওপর খহস্ত ছিলেন, ইংরেজ কবিরা তা নন। মনে যে সমস্ত চিত্রকল্প ভেসে ওঠে, তাদের মধ্যে যেগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, তাদের তাঁরা বাদ দেবার পক্ষপাতী—এক কথায়

তাঁরা চেতন স্তরের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছেন। ইংরেজ কবিদের মতো জীবনানন্দের সুররিয়ালিস্ট কবিতাতেও সক্রিয় চেতনার চিহ্ন বর্তমান।

প্রশ্ন উঠতে পারে : সুররিয়ালিস্ট কবিতার সঙ্গে অন্য কবিতার পার্থক্য কী? ফ্রয়েডের আবিষ্কারের আগে ও পরে সুররিয়ালিস্ট না হয়েও কবিরা নির্জ্ঞান মনের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়েছেন। পূর্ববর্তী যুগের কবিরা যে-কাজ অজ্ঞাতসারে করেছেন, ফ্রয়েডের আবিষ্কারের পর বর্তমান যুগের কবিরা অনেক সময় তা সচেতনভাবে করে থাকেন। অনেক সময় ফ্রয়েডের থিয়োরিটিকেই কবিতায় নানারূপে উপস্থাপিত করা হয়। যাহোক, আমরা বলেছি যে, কবির অভিজ্ঞতাই কবিতা। কিন্তু জীবনে যা ঘটে, তা-ই অভিজ্ঞতা নয়, বাইরের ঘটনা কবির অন্তর্জগতে এসে যে রূপান্তর লাভ করে, তার-ই নাম অভিজ্ঞতা। কবির অন্তর্জগৎ বলতে কেবলমাত্র চেতন মন বোঝায় না, চেতন-অবচেতন নির্জ্ঞান সব মিলিয়েই তাঁর অন্তর্জগৎ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য এ অন্তর্জগৎকে চেতন-অবচেতন ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা প্রয়োজনীয় হতে পারে, কিন্তু এদের সীমারেখা যে কোথায়, তা কে বলবে। চেতন, অবচেতন ও নির্জ্ঞান মনের প্রতিনিয়তই যোগাযোগ ও বোঝাপড়া চলছে, এক ঘরের বাসিন্দাকে অন্য ঘরের বাসিন্দা বলে ভুল করা খুব-ই সম্ভব। তাছাড়া সত্যিই কি ছাপ মারা যায়। সত্যিই কি জোর করে বলা যায়, কবিতায় বিশেষ একটি চিত্রকল্প নির্জ্ঞান মনের, চেতন মনের নয়! যাহোক, মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কার কবিদের নূতনত্ব সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই। যেখানে কবিরা মনোবিজ্ঞানকে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন, সেখানে কাব্যের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু যেখানে তা পারেননি, কবিরা মনোবিজ্ঞানের দাসত্ব স্বীকার করেছেন। সেখানে কবিতার নামে অ-কবিতা রচিত হয়েছে মাত্র।

যে-কোনো বিষয় বা বস্তু কবিতার উপাদান হতে পারে, কাজেই মগ্নচৈতন্য অথবা মগ্নচৈতন্যের উপাদানের কাব্যের উপাদান হতে বাধা নেই। কিন্তু কবিতার নিজস্ব একটি জগৎ আছে, যে-কোনো উপাদানকেই সেখানে কাব্যজগতের নিয়ম মেনে চলতে হবে। বাস্তবকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করা যেমন কবিতার ধর্ম নয়, তেমনই পরাবাস্তবকেও সম্পূর্ণ অনুকরণ করা তার ধর্ম-বিরুদ্ধ হবে। মগ্নচৈতন্যের প্রতীকগুলিকে কাব্যজগতের নিয়ম মানতে হলে তাদেরও কিছু পরিবর্তন ঘটবে। এ রূপান্তরকে যদি আমরা স্বীকার করে নিই, তাহলে কেবলমাত্র উপাদানের স্বাতন্ত্র্যের জন্য কবিতায় কোনো রকমের শ্রেণীবিভাগ মানা চলে না। সেজন্য সুররিয়ালিজম অথবা যে-কোনো '—ইজম্' আমাদের কাছে একটি প্রবণতা ছাড়া আর কিছু নয়। মগ্নচৈতন্যের গভীরে ডুব দিয়ে কবি যে-সকল চিত্রকল্প অথবা প্রতীক আহরণ করে নিয়ে আসেন, সাধারণত যুক্তির পারম্পর্যের ওপর নির্ভর না করে সরাসরি তাদের সাজিয়ে যে-সকল কবিতা রচনা করা হয়, মোটামুটি তাদের-ই নাম 'সুররিয়ালিস্ট কবিতা'। সেখানে একটি চিত্রকল্প অন্য একটি চিত্রকল্পকে টেনে নিয়ে আসে। এ চিত্রকল্পগুলির মধ্যে নিকট সাদৃশ্য নেই, হয়তো বা আছে একটা দূরসাদৃশ্য। প্রত্যেক মানুষের-ই স্বপ্নজগতের অভিজ্ঞতা আছে। স্বপ্নের জগতে যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলি পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ গ্রহণ করে, কবিতাতেও চিত্রকল্পগুলি তেমনই বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও নতুন আকারে

উপস্থিত হয়। কবি এখানে চিত্রকল্পগুলির মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করতে সচেষ্ট নন। আমাদের যে-সকল বাসনা অসামাজিক, তাদের আমরা প্রশ্রয় দিতে চাই না, দমন করে রাখি। তারা অবদমিত হয়ে মগ্নচৈতন্যের স্তরে চলে যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। মাঝে মাঝে চেতনার স্তরে ভেসে উঠতে চেষ্টা করে। চৈতন্যের হাত এবার জন্য অনেক সময় তারা ছদ্মবেশ ধারণ করে। সেজন্য চিত্রকল্পগুলির মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার সহজসাধ্য নয়, প্রতীকের চাবিকাঠিও সকল সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। কবির চেতন-মন যদি কিছুটা সক্রিয় থাকে, তাহলে আভাসে ইঙ্গিতে তিনি পাঠককে অনেকখানি সাহায্য করতে পারেন। এ আলোচনার থেকে আমরা অন্তত এটুকু বুঝতে পারি, চেতন ও অবচেতন সীমানা ভেঙে দিয়ে কবিরা মানুষের সমগ্র অন্তর্জগতের পরিচয় জানতে ইচ্ছুক। জীবনানন্দ জীবনকে প্রকৃতির মধ্যে প্রসারিত করে, প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে ব্যাপ্ত করে, মানবসভ্যতার আবহমান ইতিহাস চেতনার পটভূমিকায় বিস্তৃত করে সর্বাঙ্গীণভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। জীবন তাঁর কাছে সংকীর্ণ নয়, বরং অনেক ব্যাপক ও গভীর। সুতরাং 'সুররিয়ালিজম' যে তাঁকে আকৃষ্ট করবে, তাতে সন্দেহ কী! মানুষকে শুধু চেতনার স্তরে নয়, মগ্নচৈতন্যের স্তরেও জানতে হবে, তবেই হবে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে জানা। চেতনার স্তর তো মানুষের মনের ভগ্নাংশ মাত্র। সুতরাং কেবলমাত্র চেতন-স্তরকে জানা মানুষের ভগ্নাংশকে জানা।

জীবনানন্দের প্রকৃতি-পর্যায়ের কবিতায় যেখানে প্রকৃতি নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে নারী হয়ে উঠছে, তার মধ্যে মগ্ন চৈতন্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে। তাছাড়া তাঁর অনেক চিত্রকল্পে অবচেতনার স্পর্শ পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ কবিতা হিসেবে 'বুনো হাঁস', 'হরিণেরা', 'ঘোড়া', 'অবশেষে', 'শব', 'হাওয়ার রাত' ইত্যাদি কবিতার নামোল্লেখ করা যায়, যেখানে সুররিয়ালিস্ট কবিতা-আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। আমরা প্রথম তিনটি কবিতার আলোচনা করবো :

'পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—
জলামাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে
বুনো হাঁস পাখা মেলে শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার :
এক-দুই তিন-চার-অজস্র-অপার—
রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা।
তারপরে পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু-একটা কল্পনার হাঁস;
মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ;
উড় ক উড় ক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড় ক
কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড় ক উড় ক তারা হৃদয়ের জ্যোৎস্নার ভিতর।' (বুনোহাঁস : বনলতা সেন)

আমরা পর পর কয়েকটি ছবি পাচ্ছি। পেঁচা ডানা মেলে নক্ষত্রের দিকে উড়ে গেল। পেঁচাকে উড়ে যেতে দেখে চাঁদ হাতছানি দিয়ে বুনো হাঁসদের ডেকে নিল।

অজস্র বুনো হাঁস জলা মাঠ ছেড়ে চাঁদের দিকে উড়ে চললো। ('শাঁই শাঁই শব্দ শুনি'র শ-ধ্বনির মধ্যে যেমন উড়ন্ত হাঁসের ডানার শব্দ শোনা যায়, তেমনই 'এক-দুই-তিন-চার-অজস্র-অপার'-এর ড্যাস্‌চিহ্নগুলি হাঁসদের উড়ে-চলার ছবি ফুটিয়ে তুলেছে।) রাত্রির নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছুটে বেরিয়ে গেল একটি এঞ্জিন। নক্ষত্রের বিশাল আকাশে পড়ে রইলো দু-একটি হাঁস। সবশেষে সেই দু-একটি হাঁস গড়ে তুললো একটি মেয়ের লজ্জারুণ মুখ।

পেঁচা প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ। সে বিচক্ষণতার সতর্ক প্রহরী। দূর নক্ষত্রের স্বল্পালোকে পেঁচা উড়ে গেলে, অর্থাৎ বিচক্ষণ বুদ্ধির শাসন শিথিল হয়ে পড়লে অবদমিত বাসনাগুলির চেতনার স্তরে ভেসে ওঠার উপযুক্ত অবসর। জলামাঠ মগ্নচৈতন্যের প্রতীক—চাঁদ অবচেতনার স্তর (চেতনস্তরের সূর্যালোকে স্বপ্ন-চিত্রের আবির্ভাব সম্ভব নয়)। বুনো হাঁস অবদমিত কামনা-বাসনার প্রতীক। এরা অসামাজিক বা বন্য বলেই তো অবদমনের প্রয়োজন। রাতের বিস্তব্ধতা ও অন্ধকারের বুক চিরে ছুটন্ত এঞ্জিন যেমন আমাদের হঠাৎ ঝাঁকি মেরে ঘুম ভাঙিয়ে বিহ্বল করে তোলে, এদের সহসা আবির্ভাব-ও তেমনই। অন্ধকার থেকে এসে হঠাৎ সচকিত করে তুলে আবার অন্ধকারেই তারা ডুব মারে। নক্ষত্রের বিশাল আকাশে কেবল দু-একটি প্রতীক যারা ভেসে উঠে আবার ডুবে গেল, তাদের সৌরভ নিয়ে বেঁচে থাকে। এ-সৌরভ কোনো একটি মেয়ের স্মৃতির সৌরভ। অনেক অনেকদিন আগে যে-মেয়েটিকে ঘিরে কবির যৌবন-বাসনা রাঙা হয়ে উঠেছিল অথচ সামাজিক লজ্জায় হৃদয়ের গোপন গহ্বরে যে-ইচ্ছাকে নির্বাসন দিয়ে ভুলে যাবার স্বস্তি পেয়েছিলেন, আজ এতদিন পরে সেই মেয়েটির মুখ স্বপ্নে এসে হানা দেবে, তা-ই বা কে জানতো! সচেতন মন যে-ইচ্ছাকে ধিক্কার দেয়, চেতনা ও অবচেতনার আলো-আঁধারিতে সেই ইচ্ছাকে নীরবে লালন-পালন করতে কবি ভালবাসেন। 'নীরবে' শব্দটি লক্ষণীয়। সেই ইচ্ছাটি যদি সরব হয়ে ওঠে, তাহলে আবার তাকে অন্ধকারে ঠেলে দিতে হবে।

একে আদর্শ সুররিয়ালিস্ট কবিতা বলা যাবে না। 'দু-একটা কল্পনার হাঁস' অথবা 'কল্পনার হাঁস সব'—একথা বলে কবি আমাদের হাতে সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে, কবির সচেতন মন নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই, তা কাজ করে যাচ্ছে। এরা যে বাস্তবিক বুনোহাঁস নয়, কল্পনার হাঁস, তা তিনি বিচার করে দেখেছেন। আদর্শ সুররিয়ালিস্ট কবিতায় আমরা ছুটন্ত এঞ্জিনটিকেই দেখতে পেতাম, 'এঞ্জিনের মতো' বলে ব্যাখ্যার প্রয়োজন স্বীকৃত হতো না। 'মনে পড়ে কবেকার অরুণিমা সান্যালের মুখ'—এ পংক্তিতে 'মনে পড়ে' একজন আদর্শ সুররিয়ালিস্টের কাছে অনাবশ্যক; শুধু অনাবশ্যক নয়, ক্ষতিকর-ও। বুনোহাঁস আর অরুণিমা সান্যালের মুখের মাঝখানে চেতন-মন একটি পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। স্বপ্নের জগতে তারা পৃথক হয়ে থাকবে না, একাকার হয়ে যাবে। কবি যে নির্বাচনের পক্ষপাতী, তারও প্রমাণ আছে। অজস্র বুনোহাঁসগুলিকে ধরে রাখলে জটিলতা বাড়তো, তাই তিনি তাদের অধিকাংশকে উড়িয়ে দিয়ে মাত্র দু-একটিকে ধরে রেখেছেন, যারা অরুণিমা সান্যালের মুখটিকে গড়ে দিয়েছে। তাছাড়া ছন্দ, মিল ও ভাষা-ব্যবহারেও জীবনানন্দ নিয়ম মেনে চলেছেন। এক্ষেত্রে কাব্যজগতের শৃঙ্খলাকে অস্বীকার না করে কবি স্বপ্নজগতের উপাদান ব্যবহার করে কাব্যের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

'স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে
হরিণেরা; রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝরে যায়
পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।
হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,—
বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।
বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা জ্বলে হরিণের চোখে—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।'

(হরিণেরা : বনলতা সেন)

পলাশের বনে জ্যোৎস্নায় হরিণেরা খেলা করছে। হরিণদের দেখে মনে হলো, হিজল ডালের পেছনে অগণন বনের আকাশে হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসছে। এ শেফালিকা বোস বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর মেয়ে, যার পরিচয় আর কেউ জানে না, শুধু এ হরিণেরা জানে।

শেফালিকা বোসের যে-সকল টুকরো টুকরো স্মৃতি হাঁপ-ধরা অন্ধকার জগতে অবরুদ্ধ হয়ে ছিল, তারা হরিণের প্রতীক মুক্তি পেয়ে বিস্তীর্ণ হাওয়া আর জ্যোৎস্নার অফুরন্ত মুক্তার আলোকে খেলা করে বেড়াচ্ছে। হরিণ সৌন্দর্য, চঞ্চলতা ও ভীরুতার জন্য বিশিষ্ট। শেফালিকা বোসের স্মৃতিও সুন্দর, কোমল ও লোভনীয় ('আহা' শব্দটির মধ্যে সমস্ত অনুভূতিগুলি একত্র মিলিত হয়ে গেছে)। হরিণের মতো তা চঞ্চল। তাকে দূর থেকে দেখতে হয়, পা টিপে টিপে তার কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু পায়ের সামান্য শব্দ পেলেই সে বাতাসের সঙ্গে জ্যোৎস্নার আলোকে মিলিয়ে যাবে। হরিণের মতোই তা ভীরু। অবচেতন স্তর থেকে সে হয়তো কখনো কখনো উঁকি মারে, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে সকল সময় সঙ্কুচিত। কখনো যদি তাকে ধরে ফেলা যায়, মুক্তির জন্য তার শরীরে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। চেতন মনকেই তার ভয়। চেতন মন যখন নিষ্ক্রিয়, তখন চেতন-অবচেতনের রহস্যময় সীমান্তে নিশ্চিন্তে খেলা করতে তার বাধা নেই।

এখানের চাঁদও জ্যোৎস্না অবচেতনার প্রতীক। 'স্বপ্নের ভিতরে বুঝি' এ-কথা বলে কবি খেই ধরিয়ে দিয়েছেন। 'হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে'-পংক্তিটিতে 'যেন' শব্দ যোগে কবি সামান্য ব্যাখ্যারও প্রয়োজন বোধ করেছেন।

'বুনো হাঁস' ও 'হরিণেরা' কবিতা-দু'টির তুলনায় 'ঘোড়া' কবিতাটিতে কবির অনুভূতির কিছু জটিলতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

ঘোড়া যৌবন-শক্তির প্রতীক। প্রস্তর-যুগের ঘোড়া বলতে আমরা এটুকু বুঝি যে, যে-যৌবন অশ্বের মতো তেজোদৃপ্ত ছিল; আজ তা প্রাণহীন প্রস্তরীভূত। তবুও কামনা নিঃশেষিত হয়নি, তাই 'এখনও ঘাসের লোভে চরে'। কিন্তু ঘাসের ঘ্রাণ ভেসে আসে

না, ভেসে আসে আস্তাবলের ঘ্রাণ, যেখানে ঘাস নেই, শুধু 'বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে'। সে-ঘ্রাণ নিশ্চয়ই গুমোট, কেননা ঘ্রাণ ভেসে আসে 'এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়।'

'এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়'-এর মধ্যে মগ্নচৈতন্যের প্রভাব লক্ষণীয়।

এ আস্তাবল নিশ্চয়ই পৃথিবী, কেননা কবি তাকে 'গোল আস্তাবল, বলেছেন। কিন্তু আস্তাবল শব্দটি তাঁর মনে বিশেষ এক আস্তাবলের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, যার সঙ্গে তিনি একদিন পরিচিত ছিলেন। পরিচিত আস্তাবলটির ওপাশে ছিল একটি পাইস্ রেস্তোরাঁ, যার মেঝেতে অনেক অনেকদিন ধরে চায়ের পেয়ালা কটার পাশে কয়েকটা বেড়ালছানাকে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেখেছেন। মনে হয়েছে, চায়ের পেয়ালা আর বেড়াল ছানার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বুঝি : দুই-ই যেন প্রাণহীন। খালি চায়ের পেয়ালা থেকে কখনো সামান্য ভাপ ওঠে, তখন তাদের প্রাণের উত্তাপের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। তেমনই ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন বেড়াল ছানা স্বপ্ন দেখে, ঘেয়ো কুকুরের কবলে পড়েছে, আর অমনি ভয়ে হিম হয়ে সামান্য নড়ে উঠে হয়তো বা প্রাণ-চাঞ্চল্যের পরিচয় দেয়।

'চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়াল ছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে নড়ে গেল ওপাশের পাইস্ রেস্তরাঁতে;' (ঘোড়া : সাতটি তারার তিমির)

আস্তাবলের সঙ্গে সঙ্গে পাইস্ রেস্তোরাঁ, তার চায়ের পেয়ালা আর বেড়াল ছানা সমেত কবির চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, যার ফলে প্রস্তর যুগের ঘোড়া বেড়াল ছানায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

যে-যৌবন প্রস্তরীভূত, তার কামনাও ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলের মতোই অস্বস্তিকর। পৃথিবীতে যৌবন নেই, প্রাণ নে আছে এই অবাঞ্ছিত অস্বস্তি, যাকে প্রাণ-চাঞ্চল্য বলে ভুল হতে পারে!

এরপর আমরা ফ্রয়েডের থিয়োরিতে আসতে পারি। 'ঘোড়া' কবির আরক্ত বাসনার প্রতীক। মনে হয়, মগ্নচৈতন্যে তারা প্রস্তরীভূত হয়ে আছে। অবদমিত কামনাগুলি অতীত জীবনের হলেও বিনষ্ট হয়ে যায়নি। চেতনা-অবচেতনার সীমান্তে তার 'এখনও ঘাসের লোভে চরে'। কিন্তু পৃথিবীর মতো চেতনা জগৎও নিষ্করুণ, তাই তাদের আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির কোনো উপায় নেই। যে-সকল কামনা-বাসনাকে অবদমিত করা হয়েছে, আজ আর তাদের বাস্তবে চরিতার্থ হবার কোনো সম্ভাবনা-ই নেই, বড়জোর স্বপ্নের জগতে আকাঙ্ক্ষা-পরিপূরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু তাতে পরিতৃপ্তির বদলে পাওয়া যায় ক্লেদাক্ত অস্বস্তি মাত্র।

বারবার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে

সুজিৎ ঘোষ

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' (১৯২৭)—এ বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তোমার কবিত্ব শক্তি আছে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই।—কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এতো জবরদস্তি কর কেন, বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে।'

'বড় জগতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে। যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি, সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ, তা নয়, বরঞ্চ উল্টো।'

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থ পাঠের পরে রবীন্দ্রনাথ দু'টি বাক্যের যে পত্র জীবনানন্দকে পাঠিয়েছিলেন, তা হলো, ''তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।'—এ দ্বিতীয় চিঠির তারিখ ১৯৩৭ সালের ১২ই মার্চ।

কিন্তু এ সময়ের আগে, অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের অক্টোবরের ৩ তারিখে 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৪২ সনের আশ্বিন সংখ্যাটি পড়ে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠিতে প্রকাশিত কবিতাগুলি সম্পর্কে মন্তব্যে জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।' 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি আরো সংস্কারের পরে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন জীবনানন্দ।

আমাদের স্মরণে আসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্বে এসে চিত্রকলায় নিমগ্ন চিত্রশিল্পী হিসেবে এক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তিনি অর্জন করেন। তাই ১৯৩৫-৩৭ সালে শুধু রঙের ক্ষেত্রে নয়, শব্দের মধ্যেও যে দৃশ্যমানতা, সেই দৃশ্যরূপের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সচেতন-অচেতন আকর্ষণ ও পক্ষপাত লক্ষ করা যাবে। একথাও বললে অত্যুক্তি হবে না, রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার আবেদন কবিতা পাঠকের বোধের চেয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভবের কাছে। এ-রকম এক মানসিক সময়কালে জীবনানন্দের 'চিত্ররূপময়' কবিতা,—'তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে'—এমন কবিতা সহজেই রবীন্দ্রনাথের নজর কেড়ে নেবে স্বাভাবিকভাবেই। 'পুনশ্চ'র রচনাগুলির মধ্যে একটা শান্তি আছে ঠিক-ই, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের পরম্পরায় 'পুনশ্চ' কাব্যকে অনেক কবিতা পাঠক-ই খুব 'বড় জাতের রচনার' শ্রেণীভুক্ত করতে দ্বিধান্বিত। সমকালে অঙ্কিত রবীন্দ্র চিত্রাবলী যে খুব 'বড় জাতের রচনা'—এ স্বীকৃতি আজ স্বতঃসিদ্ধের মতোই

গ্রাহ্য। অথচ সেই চিত্রসমূহে এক অশান্ত, প্রবল সত্য ও স্বপ্নসম্ভব বাস্তবের রূপদানে রবীন্দ্রনাথের আঙ্গুল ও দৃষ্টি চঞ্চল। রবীন্দ্রনাথের চিত্রের জগৎ 'এ এক আশ্চর্য নির্ভীক বিশ্ব, এক প্রবল ব্যক্তি স্বরূপের নিবিড় ঐশ্বর্যে বিস্ময়কর ও বিস্মিত জগৎ। এ জগতে বস্তুর প্রকাশ বহুরূপে অন্তহীন, কখনো-বা বস্তুর পেলব প্রায় মেয়েলি লালিত্য, কখনো-বা সরল বস্তু, সন্ত্রাসের বা দুঃস্বপ্নের বিশ্বের সূক্ষ্ম কল্পনীন বস্তু।" (চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ : বিষ্ণু দে)

রবীন্দ্রনাথের শব্দে-সমর্পিত যে সৃষ্টি, সেখানে সর্বদাই নৈতিকতার তথা স-হিতত্ত্বের অনিবার্য উপস্থিতি। কিন্তু চিত্রকলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ভিন্ন, 'ছবি কী—এ প্রশ্নের উত্তর এই যে—সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, যতই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় ভাল। তার ভাল-মন্দের আর কোনো রকম যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু—সে অবান্তর—অর্থাৎ যদি সে কোনো নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান।' (যামিনী রায়কে চিঠি : ৭. ৬.৪১)!

অর্থাৎ, যে কালে কাব্য রচনার উৎকর্ষের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একটি শান্তি-প্রশান্তির রূপায়ণ দাবি করছেন, সেই এক-ই সময়ে চিত্রের ক্ষেত্রে এক অশান্ত সৃজন-প্রয়াসে 'বড় জাতের' চিত্র রচনা করছেন।

দুই

পূর্বাপর রবীন্দ্রানুরাগী হয়েও জীবনানন্দ শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্ত 'বড় জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি থাকার বক্তব্য মেনে নেননি, প্রত্যুত্তরে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, 'পত্রে আপনি যে কথা উল্লেখ করেছেন, সেই সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন মনে আসছে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনো আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন,—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনো তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এ বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এ জ্যোতি-লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তা তো মনে হয় না।....Mood-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে, তাতে Serenity অনেক সময়-ই থাকে না—কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন, বুঝতে পারছি না।....শান্তি বা Serenity-র সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলেও হয়তো তা-ও নিষ্ফল হয়ে যায়।—বীটোফেনের কোনো কোনো Symphony বা Sonata-র ভেতর অশান্তি রয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু আজো তো টিকে আছে—চিরকাল-ই থাকবে টিকে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিল বলে।'

চিত্রের দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে যামিনী রায়কে পূর্বোক্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি। এজন্য তার একটি অহেতুক আনন্দ আছে। চোখে দেখি—সে যে কেবল সুন্দর দেখে বলি, খুশি হই তা নয়। দৃষ্টির ওপরে দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্রেক করে রাখে।...যে রূপের

রেখা এড়াবার জো নেই, যা মনকে অধিকার করে নেয় কোন একটা বিশেষত্ব বশতঃ তা সুন্দর হোক বা না হোক, মানুষ তাকে আদর করে নেয়, তাতে তার চারদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে।'—রবীন্দ্রনাথের চেতনায় শব্দে রচিত কাব্য সাহিত্যের জগতের শিল্প-মাধ্যম ও রঙে রচিত শিল্প মাধ্যমের মধ্যে একটি ভেদরেখা থেকে গেছে। কিন্তু জীবনানন্দ কাব্য ও চিত্রের শিল্পমাধ্যমগত প্রভেদের বাস্তবতা জেনেও ভাবগত পার্থক্যকে বড় করে দেখেননি; রবীন্দ্রনাথকে লেখা উদ্ধৃত চিঠিতেই জীবনানন্দ লিখেছিলেন, 'সকল বৈচিত্র্যের মতো সুরবৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভেতর। কোনো একটা বিশেষ ছন্দ বা সুর অন্য সমস্ত সুর বা ছন্দের চেয়ে বেশি করে স্থায়ী স্থান কী করে দাবি করতে পারে? আকাশের নীল রং, পৃথিবীর সবুজ রং, আলোর শ্বেত রং কিম্বা অন্ধকারের কালো রং—সমস্ত রংগুলিরই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ আছে। একটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি সুন্দর বা সুচির বলা চলে বলে মনে হচ্ছে না।'—এ চিঠি লেখার প্রায় ন' বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল জীবনানন্দের দৃশ্যকল্প চিত্ররূপে সমৃদ্ধ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং সেই কাব্যগ্রন্থের 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' বোধের কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন।

তিন

কিন্তু শুধু 'চিত্ররূপময়' কাব্যের জগতে জীবনানন্দ স্থির হয়ে থাকতে চাননি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলি রচনার কালপর্বেই জীবনানন্দের মধ্যে দৃশ্যকল্প থেকে ভাবকল্পে উত্তরণের প্রয়াস লক্ষ করা যাবে। অর্থাৎ, শুধু দৃশ্যের প্রত্যক্ষতা থেকে ভাবের বিমূর্ততায় কবিতার প্রকাশকে পরিণত করার প্রয়োজন জীবনানন্দ বোধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রথম চিঠিতেই 'সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণা' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন দু'বার। কিন্তু আধুনিক কবি হয়ে প্রেরণার বশে কবিতা রচনার পরেও, প্রকাশের ঐকান্তিক নির্ভরতা প্রেরণার ওপর ন্যস্ত করতে পারেননি। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটির 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত রূপ এবং গ্রন্থভুক্তিকালীন রূপের ভিন্নতায় এ প্রবণতা লক্ষণীয় :

চতুর্থ স্তবকের প্রথম পাঠ :

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ/শুকনো গুঁড়ির পরে চৈত্রের দুপুরে বেজী করিয়াছে খেলা/ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,/চাল-ধোয়া গন্ধ পেয়ে ঘাটে এসে মাছগুলো ভিড়েছে দু' বেলা,/শামুক গুগলি ভরা পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে/শুনেছে ঘরের ডাক—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;/

ওই স্তবকের গ্রন্থভুক্ত পাঠ :

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ/হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,/ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,/চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু' বেলা/নির্জন মাছের চোখে;—

পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে/পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;

—'শুকনো, গুঁড়ির পরে চৈত্রের দুপুরে বেজী', 'চাল-ধোয়া গন্ধ', 'শামুক গুগ্‌লি ভরা পুকুরের পাড়ে', 'শুনেছে ঘরের ডাক' যথাক্রমে 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি', 'চালের ধূসর গন্ধে', 'নির্জন মাছের চোখে', 'পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। দু'টি পাঠেই চিত্র রূপময়তার সমৃদ্ধ রূপ, কিন্তু প্রথম পাঠের আলোচ্য পঙ্‌ক্তিগুলির চিত্রকল্পের গ্রামীণ বাংলার প্রত্যক্ষতা অধিক, গ্রন্থভুক্ত পাঠে সেক্ষেত্রে চিত্রকল্পের সচেতন বিমূর্ততা সংযোজিত হয়েছে। এভাবেই পঞ্চম স্তবকের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি পরিবর্তিত হয়েছে,—

'দেখেছি ভোরের আলো খেজুরগুঁড়ির পরে দোয়েলের ডাকে,/বেতের লতার নিচে চড় য়ের ডিমগুলো মুখগুঁজে আছে—/

পরিবর্তিত হলো, 'মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে/বেতের লতার নিচে চড় য়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে।/'বা ষষ্ঠ স্তবকে 'নিঃসহায় রাঙা মাঠ নেমে গেছে নদীর ভিতরে:/কাঁচ পোকা-টিপ পরা গেঁয়ো মেয়েটির মুখ হয়েছে উজ্জ্বল,/" রূপান্তরিত হয় 'নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে;/যত নীল আকাশেরা রয়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল"/

সপ্তম স্তবকে 'একটিও নম্র মুখ কাছে এসে অন্ধকারে আন্তরিক কথা/কয়ে গেছে; আমরা বুঝেছি যারা পৃথিবীর আলোর ভিতর/পথে পথে মেঘলা দিনের মতো রয়ে গেছে মুগ্ধ সজলতা;/সোঁদা ভিজে ধুলো মাঠ-কলমির ঘন দাম ডাহুকের নীড়/ভাঙা মন্দিরের ইট, সাদা শাঁখা, স্নিগ্ধ হাত, ঘাসের শরীর' রূপান্তরিত হয় :

'পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা/কয়ে গেছে; আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর/আরো এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা;/চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির;/পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর'/

—এ সপ্তম স্তবকে প্রথম পাঠের চিত্র রূপকল্পের সংখ্যা রূপান্তরে কমে গেছে, গ্রাম বাংলার প্রত্যক্ষতাও বহুল পরিমাণে বিমূর্ত হয়ে গেছে।

অষ্টম স্তবকে প্রথম পাঠ :

'মৃত্যু এসে একদিন মৃদুকীট জীর্ণ প্রজাপতিটির আগে/রুক্ষ হাতে ভেঙে দেবে পৃথিবীর পথে পথে ছড়ায়েছে যাহা/রঙিন ডানায় ভরে একদিন ফড়িঙের মতো অনুরাগে :/

পরিবর্তিত রূপে 'সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে/ধূসর মৃত্যুর মুখ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা/নিরুত্তর শান্তি পায় যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।'/

জীবনানন্দের জীবৎকালে প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ কবিতার্থ' (নাভানা সং) পঞ্চম স্তবকে গ্রন্থভুক্ত পাঠ 'চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে' পরিবর্তিত হয়েছে 'চড় য়ের ডিম যেন নীল হয়ে আছে।'—'শক্ত' থেকে 'নীল'-এ—স্পৃশ্যমান রূপ থেকে দৃশ্যমান রূপে পরিবর্তিত হয়েছে।

—এ দৃশ্যকল্প চিত্ররূপ থেকে ভাবকল্প চিত্ররূপের প্রতি সচেতনভাবে কবিতাকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে জীবনানন্দ 'প্রেরণার' প্রবর্তনায় শুধু থেমে থাকেননি, সচেতন কবি-ব্যক্তিত্ব চূড়ান্ত রূপাবয়ব নির্মাণে এগিয়ে এসেছে।

প্রেরণায় রচিত কাব্য ও তার প্রকাশের চূড়ান্ত রূপের মধ্যে আধুনিক কবি অনুভব করেন এক বিরোধের উপস্থিতি, বার বার কবিতাকে পুনর্লিখন করে তিনি সেই অন্তর্গত বিরোধ থেকে কবিতার রূপটিকে পূর্ণতা দিতে চান। বিষ্ণু দে এ বিরোধকে বুঝেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'টি, ই, হিউমের অর্থেই আততি বা টেনশন কথাটা ব্যবহৃত হলো। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী আমার দুই পরলোকগত বন্ধুর মধ্যেও আততির এ সত্য ভিন্নভাবে বিধৃত। জীবনানন্দের কাব্য-রচনার ইতিহাসে এর-ই উদাহরণ, ঝরা পালক-এর যুগ থেকে তাঁর শোকাবহ মৃত্যুর সময় অবধি। এমন কি তাঁর রচনারীতির অভ্যাসেও....হ্যাবিটেও এ কবি ধর্মের বিশেষ আত্মপ্রকাশ। তাই তো জীবনানন্দ প্রেরণাবশত কবিতাটি লিখেই বিরত হতেন না, অনেক সময়েই তার মানসধৃত মৌলরূপের কাঠামোতে—হিউমের অর্থে—লৌহতন্ত্রীর মতো তাকে মেলাতে মেলাতে ক্লান্তিহীনভাবে স্বকীয়তায়, আধুনিকতায়, পুনর্লিখিত করতেন।' (মুখবন্ধ, একালের কবিতা, ১৯৬৩)

এ-কারণেই জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩ সন) অপ্রকাশিত ষোলোটি কবিতা সংযোজনকালে 'ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ' করেছিলেন। 'কেননা, প্রকাশ করার পূর্বে প্রত্যেকটি কবিতাকে পরিমার্জিত করার অভ্যাস কবির ছিল।...তাই সংযোজিত কবিতাগুচ্ছ যে স্রষ্টার প্রখর অভিভাবকতা লাভের সৌভাগ্য থেকে একেবারেই বঞ্চিত, সহৃদয় পাঠককে এ কথাটি স্মরণে রাখতে অনুরোধ' তিনি করেছিলেন।

'বেলা অবেলা কালবেলা' নামে কাব্য সংগ্রহের প্রকাশ ১৯৬২ সালে (১৩৬৮ সনে) —কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০ সাল। কবিভ্রাতা গ্রন্থে জানিয়েছিলেন এ গ্রন্থের সব কবিতা পূর্ব প্রকাশিত। কয়েকটি তাঁর মৃত্যুর পরে, 'জীবৎকালে প্রকাশিত প্রায় সব ক'টি কবিতাই পরে কবি-কর্তৃক কম-বেশি পরিমার্জিত হয়েছিল,...গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্যে কবি নিজেই কবিতাগুলি বাছাই করেছিলেন। এ কবিতাগ্রন্থের নামটি কবি-কর্তৃক মনোনীত।'

'রূপসী বাংলা' (১৯৫০) সম্পর্কে অশোকানন্দ লিখেছিলেন —'কবিতাগুলি প্রথমবারে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত ছিল; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত।...এসব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।' এবং 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলির প্রতিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কবিতাগুলির মতো 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' পাঠকেরা পেতে পারেন। কিন্তু জীবিতকালের পরে প্রকাশিত সমস্ত কবিতাই 'স্রষ্টার প্রখর অভিভাবকতা লাভের সৌভাগ্য থেকে একেবারেই বঞ্চিত'—অন্যভাবে বলা চলে, জীবনানন্দের অপ্রকাশিত সমস্ত কবিতাই, যেগুলি গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ক্রমাগত প্রকাশিত হয়ে চলেছে, সেগুলি জীবনানন্দের কাব্যপ্রতিভার প্রেরণার স্বতোৎসার। এবং একটি পরিমাণগত পরিবর্তনের পরে

সবকিছুর গুণগত পরিবর্তনের যে নিয়ম, সেই নিয়মেই যেক্ষেত্রে জীবনানন্দের প্রেরণাজাত অপরিমার্জিত কবিতার সংখ্যা বেশি—সেক্ষেত্রে কবি জীবনানন্দের দু'টি রূপ পাঠকের কাছে ধরা পড়ে :

এক. কবির দ্বারা জীবৎকালে পরিমার্জিত কবিতা;
দুই. কবির অপ্রকাশিত সমস্ত কবিতা।

'প্রেরণা'র প্রতি জীবনানন্দের সুধীন্দ্রনাথের মতো আদৌ কোনো অনাসক্তি ছিল না। কিন্তু আধুনিক কবির মনন-অভ্যাসও তাঁর স্বভাবের-ই অন্তর্গত। 'রূপসী বাংলা'র প্রেরণা-উৎসারিত কবিতাগুচ্ছের অসংশয় আস্বাদ্যতা রয়েছে। কিন্তু 'রূপসী বাংলা'র দেবেশ রায় সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি সংস্করণ দেখিয়ে দেয় কত শব্দ, কত পঙ্‌ক্তি জীবনানন্দের পরিমার্জন-স্বভাবের অপেক্ষায় নিম্নরেখিত হয়ে রয়েছে জীবনানন্দের দ্বারাই। উপরিউক্ত জীবনানন্দের দুই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে তরতমত্বের বিচার জীবনানন্দ চর্চায় অচিরেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে।

চার

জীবনানন্দের শোকাবহ মৃত্যুর তারিখ ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪—মৃত্যুর ছ'মাস আগে ২০ এপ্রিল, ১৯৫৪ সালে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি লেখেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ছাপ্পান্ন, কবি-মন পরিণত, সৃষ্টিশীলতাও অব্যাহত। এ ভূমিকাতেই কবির সেই বহুল উদ্ধৃত বক্তব্যটি আছে, 'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেয়া হয়েছে।

কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজচেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সব-ই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্পর্কে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। কিন্তু কবিতা সৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার। কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এতো তারতম্য;.....ভালো কবিতা যাচাই করবার বিশেষ শক্তি সংকলকের থাকলেও আদি নির্বাচন অনেক সময়ই কবির মৃত্যুর পরে খাঁটি সংকলনে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায়। কিন্তু কোনো-কোনো সংকলনে প্রথম থেকেই যথেষ্ট নির্ভুল চেতনার প্রয়োগ দেখা যায়।.....শেষ পরিচয় লাভ সমসাময়িকদের পক্ষে নানা কারণেই দুঃসাধ্য।'

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'গুলি বিরাম মুখোপাধ্যায় কবির প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনা থেকে সঞ্চয় করলেও, নির্বাচনের ব্যাপারে জীবনানন্দের 'প্রখর অভিভাবকতায়' তাঁর 'মানসধৃত মৌলরূপে'র যাত্রার স্পষ্ট চিহ্ন এ সংকলনে রয়ে গেছে। আগেই আমরা বলেছি, 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় চড় য়ের ডিম 'শক্ত' থেকে 'নীল'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। 'অশত্থের' হয়েছে 'অশথের'-এ রূপান্তর। সংকলনে 'সে' কবিতাটির (১৫০ পৃঃ)

পাশাপাশি, খসড়ার ক্লান্তিহীন কাটাকুটির ফটোগ্রাফ এ বক্তব্যের-ই প্রমাণ। এমনকি 'বনলতা সেন' (১৯৪২) পর্বে লিখিত তিনটি কবিতা স্রষ্টার বহু অপেক্ষার পরে পরিমার্জিত রূপ লাভ করে শ্রেষ্ঠ কবিতায় 'বনলতা সেন' পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করলো (আবহমান, ভিখিরী, তোমাকে) বারো বছর পরে। 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) পর্বের ছ'টি কবিতার (একটি নক্ষত্র আসে, জর্নাল : ১৩৪৬, পৃথিবীলোক, মনোকণিকা, সুবিনয় মুস্তফী, অনুপম ত্রিবেদী) মানসধৃত মৌলরূপ পেয়ে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় মহাপৃথিবী পর্যায়ে স্থান করে নিতে পারলো দশ বছর পরে। এবং যেহেতু এ পরিমার্জনা 'সাতটি তারার তিমির, (১৯৪৮) এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা'র (১৯৩৪-১৯৫০) কবিতাসমূহের মানসপর্বে, সে-কারণে এ পর্বের প্রধানত ইতিহাস ও সমাজচেতনার প্রভাব পরিমার্জিত উক্ত কবিতাগুলিতেও ক্রিয়াশীল। প্রকৃতপক্ষে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের ১৯৫২ সালে সংযোজিত কবিতাগুলিও (সুদর্শনা, অন্ধকার, কমলালেবু, শ্যামলী, দু'জন, তুমি, ধান কাটা হয়ে গেছে, শিরীষের ডালপালা, হাজার বছর শুধু খেলা করে, সুরঞ্জনা, মিতভাষণ, সবিতা, সুচেতনা, অঘ্রাণের প্রান্তর, পথ হাঁটা) জীবনানন্দের মানস-জীবনের এক-ই কালবৃত্তে বিধৃত।

জীবনানন্দের মতো আত্মসচেতন কবির কবিতায় ইতিহাস ও সমাজচেতনা প্রত্যাশিত। বিশেষত, ১৯৩৫ থেকে ১৯৫০ সাল স্বদেশের ও বিশ্বের ইতিহাসের ওষ্ঠ সমাজের উথাল-পাথাল ঘটনাপ্রবাহ এ গ্রহবাসী প্রায় প্রতিটি মানুষকেই প্রভাবিত করেছে। আশা-নিরাশার দোলনে ইউরোপ-এশিয়ার মানুষ দোলায়িত—ফ্যাসিবাদের উত্থান, সোভিয়েতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনা, ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি থেকে যুদ্ধের সূচনা, এশিয়ায় জাপানের প্রসারণ-আগ্রাসন, চীনে গৃহযুদ্ধ-মুক্তিযুদ্ধ, সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ, ভারতে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, দেশ-বিভাগ ও স্বাধীনতা, গান্ধীর হত্যা—এ জটিল অস্থির কালপর্বে একই সঙ্গে মানুষের সুচেতনাবোধ ও অশুভের আশু প্রতাপ অতি দ্রুত ও পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে। সককালে প্রতিটি সচেতন স্পর্শকাতর মানুষ-ই বাস্তবের এ ঘটনা ধারার অভিঘাতে ভেতরে-বাইরে চঞ্চল হয়েছেন। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশের রূপ এক-একজনের ক্ষেত্রে এক-একরকম হলেও সমকালে সকলেই ব্যষ্টিচেতনা থেকে সমষ্টির চেতনায় ভাবিত। জীবনানন্দও এ সাধারণ ইতিহাসের শরিক।

১৯২৭-২৮ সালে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে জীবনানন্দ প্রশান্তি বা Serenity প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'কবি কখনো প্রকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন,—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনো তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এ বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এ জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তা তো মনে হয় না।.....

...রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে, তাতে Serenity অনেক সময়েই থাকে না—কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন, বুঝতে পারছি না।

—এ সপ্তর্ষি ও অন্ধকার বিষজর্জর পাতালের উপমায় মানব অস্তিত্বের, শিল্পীর প্রকাশের আশা-নিরাশা এবং অশান্ত যন্ত্রণার ভাবলোকের রোমান্টিক এ্যাগনি হিসেবে জীবনানন্দের চেতনায় এসে থাকলেও, ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সালের ইতিহাসে বাস্তব বারে বারে কবিকে সপ্তর্ষি ও পাতালের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কাব্যিক উপলব্ধিতে সচেতন করেছে।

১৯৪৪ সালে পৌঁছেও প্রশান্তি বা সামাজিক প্রগতির দায় জীবনানন্দ কবিতার ওপরে ন্যস্ত করেননি। তিনি লিখেছিলেন, 'কবিতার ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসে বুঝে নিতে পারা যায় যে, কবিতা মানুষের জীবনের কল্যাণ-মানসকে অপরোক্ষভাবে চরিতার্থ করবার সুযোগ না দিয়ে বরং জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা সবেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকট পরিস্ফুট করে; আমাদের হৃদয়, ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সৎ কি অসৎ পরিণতির পথে কৃষ্ণপক্ষের সূর্যের মত...উপস্থিত হয়; আমাদের জ্ঞানপিপাসু স্বভাবকে সর্বমানবীয় পরিসর দেয়; অভিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদের ভেতর আত্মনাশ ও সকলের সর্বনাশ রয়েছে জানিয়ে দিয়ে তাকে মহত্তরভাবে গ্লানিহীন করে দিতে চায়; হৃদয়কে ক্রমশই শুদ্ধ করে।' (কেন লিখি : জীবনানন্দ দাশ : ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৪) 'সপ্তর্ষি ও 'পাতালে'র উপমার পরিবর্তে এখানে জীবনানন্দ এনেছেন 'স্বর্গ ও আঘাটা'র উপমা, 'ভয়াবহ স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক ভীষণতার' ভাবকল্প, 'সৎ কি অসৎ পরিণতির পথে কৃষ্ণপক্ষের সূর্যের মতো, ভাবকল্পের উপমা এবং এক-ই সঙ্গে ব্যষ্টি ও সমষ্টির 'আত্মনাশ ও সকলের সর্বনাশ' সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা—আমরা বুঝতে পারি পনেরো বছর পেরিয়ে এসেও, প্রকাশের রূপ ভিন্ন হলেও প্রশান্তি বা Serenity-র প্রতি পূর্বের মতোই জীবনানন্দ কাব্যের ক্ষেত্রে এক-ই রকম অনাসক্ত।

এই পর্বে কবি অগ্নির উল্লাস প্রত্যক্ষ করেছেন :

'সকলেরই চোখ ক্রমে বিজড়িত হয়ে যেন
আসে ;
যদিও আকাশ সিন্দু ভরে গেল অগ্নির
উল্লাসে...
সেই আদি অরণির যুগ থেকে শুরু করে
আজ
অনেক মনীষা, প্রেম, নিমীল ফসলরাশি
ঘরে
এসে গেছে মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়।
পৃথিবীর রাজপথে—রক্তপথে অন্ধকার
অববাহিকায়
এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের
মতো বার হয়।'

(আবহমান)

এর মধ্যেই কবি প্রত্যক্ষ করেছেন, 'চারিদিকে আমিষ তিমিরে' "একটি আলোক নিয়ে বসে থাকা চিরদিন;'

সে সবের দিন শেষ হয়ে গেছে
এখন সৃষ্টির মনে—অথবা মনীষীদের প্রাণের
ভিতরে।....
আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিলো ইতিহাসে;
সৃষ্টির নাড়ীর পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে
অমোঘ আমোদ
তবু তারা করে নাকো পরস্পরের
ঋণ শোধ।' (আবহমান)

সময় বা কাল সম্পর্কে এবং কালপ্রবাহে সৃষ্টি সম্পর্কে জীবনানন্দের এ চেতনাই তাঁর ইতিহাসবোধ। চলিত কোনো একটি সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামোয় তাঁর সমাজচেতনা ও ইতিহাসবোধ গড়ে ওঠেনি। এর আগে 'সুচেতনা' কবিতায় তাঁর ইতিহাসের দর্শন এক বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে :

'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে/সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;'/

—এ পর্বে শুধু তাকিয়ে দেখার আনন্দের চিত্ররূপময়তা থেকে ক্রমেই ভাবকল্পের ওপর কবি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন; যেমন 'একটি নক্ষত্র আসে' কবিতায় :

'একটি নক্ষত্র আসে; তারপর একা
পায়ে চলে
ঝাউয়ের কিনার ঘেঁষে হেমন্তের
তারাভরা রাতে
সে আসবে মনে হয়;—আমার
দুয়ার অন্ধকারে
কখন খুলেছে তার সপ্রতিভা হাতে!
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা মেয়েটির হাতের আঘাতে
সকল সমুদ্র সূর্য সত্বরতাকে ঘুম পাড়িয়ে
রাত্রি হতে পারে
সে এসে দেখিয়ে দেয়;
শিয়রে আকাশ দূর দিকে
উজ্জ্বল ও নিরুজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহের আলোড়নে
অঘ্রাণের রাত্রি হয়:
এ-রকম হিরন্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে।'

'জর্নাল : ১৩৪৬' কবিতায়ও 'ব্রহ্মাণ্ডের পরিশ্রম ধুলোর কণা', মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানা কিযে;/ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে' 'রাত্রি' অন্ধকার জলের মতন' যেখানে 'সময়ের মুখপাত্রীর মতো সেই অপূর্ব শরীরে নদী নেই', 'নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর।'— ভাবকল্পের ক্রমশ বৃদ্ধির সঙ্গে ভাষায়ও চলে আসে কথ্য ভঙ্গি—জীবনানন্দের কাব্যে প্রকাশের আপাত রূপ আরো সহজ হয়ে আসে।

'সাতটি তারার তিমির'-এও নক্ষত্র, আকাশের চিত্ররূপ বারে বারে আসে, যা অদ্যতনকে অতিক্রম করে চিরন্তনকে প্রকাশের প্রতীকী রূপ হয়ে ওঠে। এ পর্বে চিরন্তন-অদ্যতনের এক দ্বান্দ্বিক বোধ কবিতায় লক্ষ করা যাবে :

'নীলাভ জলের রোদে কুয়ালালুম্পুর,
জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীন, বালি
অনেক ঘুরেছি আমি—তারপর এখানে
বাদামি মলয়ালী
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে
সারাদিন।...
বাণিজ্যবায়ুর গল্পে একদিন শতাব্দীর শেষে
অভ্যুত্থান শুরু হলো এইখানে নীল সমুদ্রের কটিদেশে;
বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো একদিন,
চারিদিকে পাম গাছ—ঘোলা মদ—
বেশ্যালয়—সেঁকো—কেরোসিন
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে রোখে সারাদিন।
সারাদিন দূর থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায়
সে উনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয় উদীচীর বিকীর্ণ বাতাস;
লাল কাঁকরের পথ—রক্তিম গির্জার মুণ্ড
দেখা যায় সবুজের ফাঁকে
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে নীলিমায় নীল।

কবিতাটির নামেও—'নিরঙ্কুশ'—শ্বেতসাম্রাজ্য সমগ্র সমুদ্র মেখলার দক্ষিণ এশিয়াকে গ্রাস করে নানা বিষে আচ্ছন্ন করে ফেলছে এবং চারটি স্তবকেই শেষ পঙ্ক্তিতে চক্রাকার চিত্রকল্পের আধারে কবি ইতিহাসের এ পরিণতির ভাবকল্প সৃজন করেন :

১। সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।
২। সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।
৩। সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে রোখে সারাদিন।
৪। সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে নীলিমায় নীল।

অদ্যতনেও একটি ব্যাপ্ত কালে বিশ্বকে আগ্রাসী ইউরোপায়নের বিরুদ্ধে অসহায়তা ('কাঁদে সারাদিন'), তারপরে প্রতিরোধ ('রোখে সারাদিন'), তারপরে সে-প্রতিরোধ নানা প্রভাবে লুপ্ত হয়ে যায় (নীলিমায় লীন)।

'একটি কবিতা'য় এ-পর্বেও জীবনানন্দের প্রিয় চিত্রকল্প নদীর উপস্থিতি, সে নদী রাত্রে প্রবাহিত, 'রাত্রির সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায় আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে/আমারো নৌকোর বাতি জ্বলে;'—এই চিত্ররূপে নিরালোকে আশার প্রত্যাশিত প্রস্তাবনা থাকে না। কেননা, এর পরেই কবির উপলব্ধি :

'সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বৃষের'
পরে ছুটে সারাদিন
হয়ে গেছে এখন পাথর;
যে সব যুবারা সিংহীগর্ভে জন্মে পেয়েছিলো
কৌটিল্যের সংযম'
তারাও মরেছে—আপামর।......
তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের
হেঁয়ালিকে
আঘাত করিবে কোন্‌খানে?'
অথচ এই বিপন্নতার মধ্যেও, সমস্ত কীর্তির
ভঙ্গুরতার মধ্যেও
"আবার বিকেল বেলা নিভে যায়
নদীর খাড়িতে;
একটি কৃষক শুধু খেতের ভিতরে
তার বলদের সাথে সারাদিন কাজ করে
গেছে;
শতাব্দী তীক্ষ্ণ হয়ে পড়ে
সমস্ত গাছের দীর্ঘ ছায়া
বাংলার প্রান্তরে পড়েছে;
এদিকের দিনমান—এ যুগের মতো শেষ
হয়ে গেছে;
না জেনে কৃষক চোত-বোশেখের
সন্ধ্যার বিলম্বনে পড়ে
চেয়ে দেখে থেমে আছে তবুও বিকাল;
উনিশশো বেয়াল্লিশ বলে মনে হয়
তবুও কি উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল;....
কৃষাণের বিবর্ণ লাঙল,
ফালে ওপড়ানো সব অন্ধকার ঢিবি,

পোয়াটাক মাইলের মতন জগৎ
সারাদিন অন্তহীন কাজ করে নিরুৎকীর্ণ মাঠে
পড়ে আছে সৎ কি অসৎ।'

(খেতে প্রান্তরে)

একই সময় বিশেষ দেশ ও কালে বিধৃত এ বাংলার ভূখণ্ডে নামহীন কৃষকের বলদের সঙ্গে অন্তহীন সারাদিন পশুবৎ শ্রম, যা কোনদিন কীর্তির গৌরবে চিহ্নিত হবে না, যে শ্রম দুর্ভিক্ষে ব্যর্থ হয়, যে শ্রমের বিলয়ে নৈতিকতা বা নীতিশাস্ত্রে সদসতের বির্তক পর্যন্ত অবান্তর—সেই 'জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ/জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে''—তা লক্ষ করেও কবির প্রশ্ন যে সেই সংপ্রসারণ 'ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে?''

'সাতটি তারার তিমিরে' ক্রমেই বক্তব্যে গভীরতর ব্যঞ্জনা ও উপলব্ধি ব্যক্ত করতে চেয়ে জীবনানন্দ চিত্ররূপকল্পগুলিকে ভাবরূপকল্পের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন, যে ক্ষেত্রে আপাতভাবে সহজবোধ্য রূপগুলি এক-ই সঙ্গে চেতনার উদ্বোধন ও কর্মপ্রবর্তনার দিকে পাঠকের বোধকে ধাবিত করতে প্রয়াসিত, যা তাঁর ভাষায় 'হৃদয়কে ক্রমশই শুদ্ধ করে।'

'সাতটি তারার তিমিরে'র বহু আলোচিত কবিতা 'তিমির হননের গান' কবিতার শেষ স্তবক :

'তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।'

—ভাবকল্পকেও কবি এখানে চক্রাকার চিত্রকল্পের মতো 'তিমির' শব্দটিকে চারবার পরিক্রম করান এবং 'বিনাশী' শব্দের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে 'তিমির বিনাশী হতে চাই'—এ ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ থেকে 'আমরা তো তিমির বিনাশী' এ অসংশয় ঘোষণায় পৌঁছে যান।

এ ধরন লক্ষ করা যাবে 'সূর্যতামসী' কবিতায়ও :

'সৃজনের ভয়াবহ মানে;
তবুও জীবনের বসন্তেব মতন কল্যাণে
সূর্যালোকিত সব সিন্ধু-পাখিদের শব্দ শুনি
ভোরের বদলে তবু সেইখানে
রাত্রি-করোজ্জ্বল
হিয়েনা, টোকিও রোম মিউনিখ—তুমি?'

—এ পর্বে এসে, জীবনানন্দের কাব্যের ভাষারও বিবর্তন ঘটে যায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বা 'বনলতা সেন'-এ তৎসম, অর্থতৎসম, দেশী, বিদেশী শব্দের পাশাপাশি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ শব্দের যে দীর্ঘায়িত রূপ, সাধুরূপের ব্যবহার জীবনানন্দের কাব্যভাষা বা ডিকশানের অন্যতম অভিজ্ঞান বলে মনে হতো, এ পর্বে জীবনানন্দ তা ত্যাগ করেছেন। কাব্যভাষাকে আপাতভাবে অত্যন্ত সহজ-সরল রূপ দিতে চেয়েছেন, প্রকাশের রীতিতে মৌখিক কথ্য বাক্‌ভঙ্গির কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন।—

'অনেক শ্রমিক আছে এইখানে।
আরো ঢের লোক আছে
সঠিক শ্রমিক নয় তারা
স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত
শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝরে
এরা তবু মৃত নয়; অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ
ঘোরে।'

(এইসব দিন রাত্রি)

অথবা,

'মনীষীরা এরকমভাবে আজ শুদ্ধ
চিন্তা করে
সমাজের কল্যাণ চায়
দিক নির্ণয় করে।'

(এইখানে সূর্যের)

ইন্দ্র আজ এরা—ওরা
ইন্দ্রের আসনে আজ বেটপ্‌কা অন্তত
বসা যায়
শুল্ক আয়কর সুদ—বেশি খুদ অল্পকে
অস্পষ্টভাবে দিলে'

(এইখানে সূর্যেরা)

'১৯৪৬-৪৭'-এর মতো কবিতা বিশেষ দেশ-কালের প্রেরণায় উদ্বোধিত হয়েও এক-ই সঙ্গে জীবনানন্দ মিলিত করেন অদ্যাতন ও চিরন্তনকে। তাই গ্রাম ও শহর, নাগরিক ও শাসক, পুরুষ ও নারী, স্বদেশ, ও বিদেশী শোষক, সম্প্রদায়গত ভেদ সত্ত্বেও শ্রমের অভেদ্য ঐক্যশক্তি—এক মহান বিসারণ এ কবিতায় বিধৃত—'এ যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ় ক্লান্ত লোক-সমাজের ভিড়ে চাপা পড়ে মৃতপ্রায় গ্রাম্য সন্ততিদের পাশাপাশি ইয়াসিন, হানিফ, মকবুল, করিম, আজিজ, গগন, বিপিন, শশী যারা

'সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে
এইসব প্রাণকণা জেগেছিল—

বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর বলে মনে হয়েছিল কোনো
উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে
এইসব অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত
জীবনগুলোকে।'

—এসব 'প্রাণকণা'দের প্রতি জীবনানন্দের সচেতন দরদ লক্ষণীয়,—এদের প্রতি মমতা, আকুলতা এবং এদের জীবনের তুচ্ছতা ও ব্যর্থতায় কবির মধ্যেও এক বিষণ্ণতা প্রকাশিত। তবু এ সাধারণ মানুষের সংঘশক্তির প্রতি বামপন্থী কবিদের মতো তিনি কোনো সুস্পষ্ট আস্থা, আশাবাদ প্রকাশ করেননি। কিন্তু মানুষের প্রজাতিসত্তার চিরন্তনতা, ব্যষ্টি মানুষের তাৎক্ষণিকতায় নয়, সমষ্টি মানুষের শাশ্বত অস্তিত্বে কবির বিশ্বাস স্থিত থাকে, মানুষের চেতনা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অনন্ত যাত্রার মতো :

"মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে
আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।'

(মানুষের মৃত্যু হলে)

'মানুষ' এবং 'মানব' এ সমার্থ শব্দের মধ্যেও জীবনানন্দ ব্যক্তিসত্তা ও প্রজাতিসত্তার অনস্তিত্ব-অস্তিত্ব মূর্ত করে তোলেন। মানুষের প্রজাতি সত্তার অস্তিত্বের কালপ্রবাহই তো ইতিহাস। জীবনানন্দ বাহ্যত প্রচলিত ইতিহাসের দর্শনের কোনো বিশেষ রূপকেই অঙ্গীকার করেননি। সমকালের রাজনৈতিক ইতিহাসের যুক্তিহীন স্থূলতা, মানুষের জিঘাংসা ও গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের অভাববোধ তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যে প্রখর।

'বাহক নেই—দুরন্ত কাল নিজেই রয়েছে
নিজেরি শব নিজে মানুষ,
মানবপ্রাণের রহস্যময় গভীর গুহার থেকে
সিংহ শকুন শেয়াল নেউল সর্পদন্ত ডেকে।'
(অনন্দা)
অথচ, মানুষের হৃদয় আছে বলেই,
"দ্যাখো, কেমন বিচলিত হয়ে
বোন ভায়েকে খুন করে সেই রক্ত দেখে
আঁশটে হৃদয়ে
জেগে ওঠে ইতিহাসের অধর্ম স্থূলতাকে
ঘুচিয়ে দিতে জ্ঞানপ্রতিভা আকাশপ্রেম
নক্ষত্রকে ডাকে।'

ইতিহাসের অগ্রগতি কবির কাছে স্বতঃসিদ্ধ মনে হয়নি, আবার ইতিহাস মূল্য-নিরপেক্ষও নয়। এ কালবেলায় 'ইতিহাসের অধর্ম স্থূলতার' পাশে মুক্তির জন্যে মানুষ জ্ঞানপ্রতিভা, আকাশ প্রেম নক্ষত্রকেও আহ্বান করছে। অন্যদিকে যন্ত্রনির্ভর যান্ত্রিকতা—স্থায়ী মূলধন, যা মানুষের শ্রমের-ই জমাট বাঁধা রূপ, সেই যন্ত্র সমাসোক্তিতে আধিপত্যকারী হয়ে উঠেছে,

"...যে-কোনো পরিচয়
আজ পৃথিবীর মানবজাতির ক্ষয়ের বলয়ে
অন্তবিহীন ফ্যাক্টরি ক্রেন ট্রাকের শব্দে
ট্র্যাফিক কোলাহলে
হৃদয়ে যা হারিয়ে গেছে মেশিনকণ্ঠে তাকে
শূন্য অবলেহন থেকে ডাকে।'
'তুমি কি গ্রিস পোল্যান্ড চেক প্যারিস মিউনিখ
টোকিও রোম ন্যুইয়র্ক ক্রেমলিন আটলান্টিক
লন্ডন চীন দিল্লি মিশর করাচী প্যালেস্টাইন?
একই মৃত্যু, এক ভূমিকা, একটি
শুধু আইন।'
বলছে মেশিন। মেশিন প্রতিম অধিনায়ক
বলে :
'সকল ভূগোল নিতে হবে নতুন করে গড়ে
আমার হাতে গড়া ইতিহাসের ভেতরে
নতুন সময় সীমাবলয় সবই তো
আজ আমি;
ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আমার
সত্ত্বাধিকারকামী;
আমি সংঘ জাতি রীতি রক্ত হলুদ নীল;
সবুজ সাদা মেরুন অশ্লীল
নিয়মগুলো বাতিল করি; কালো কোর্তা
দিয়ে
ওদের ধূসর পাটকিলে এবং কোর্তা তাড়িয়ে
আমার অনুচরের বৃন্দ অন্ধকারের বার
আলোক করে কী অবিনাশ দ্বৈপ পরিবার।

(অনন্দা)

স্বাজাত্যের বিনাশ ('মানব ভ্রাতাবোনকে বুকে টেনে নেবার ছলে/তাদের নিকেশ করে অনির্বচন রক্তে এই পৃথিবীর জলে/নানারকম নতুন নামের বৃহৎ ভীষণ নদী হয়ে গেল'—অনন্দা), ব্যক্তিত্বের বিনাশ, 'মেশিন-প্রতিম অধিনায়কের' তথাকথিত

যন্ত্রসভ্যতার দাপট, প্রতিষ্ঠান, আইন, মতবাদ ('সংঘ জাতি রীতি রক্ত হলুদ নীল'—অনন্দা) মানুষকে মানবিকতায় উত্তীর্ণ না করে তার বিনাশের কারণ হয়ে উঠছে। মানুষের বিশ্ব বিস্তার কার্যত তাকে দ্বীপের মতো সংকীর্ণতায়, ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে সীমায়িত করে ফেলেছে। মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে, তবু 'ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়তো হৃদয়ে' (অনন্দা)—ইতিহাসের গতিতে বিশ্বাস সত্ত্বেও দ্বান্দ্বিক ইতিহাসবাদের নিয়তিবাদে (Determinism) জীবনানন্দের আস্থা নেই। সাধারণ 'প্রাণকণা' মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা, শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, তাদের সংঘশক্তিতেও অগ্রগতি নিহিত বলে জীবনানন্দ ভাবেননি। মানুষের সুচেতনার পথে আলো জ্বেলেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে বলে কবি ভেবেছেন, কিন্তু 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ''—(সুচেতনা)—মনীষীদের বহু শতাব্দী ব্যাপীকর্ম-ভাবনার ওপরে ইতিহাসকে ন্যস্ত করে জীবনানন্দ আর এক ধরনের নিয়তিবাদেই স্থিত হয়েছেন। কিন্তু কবির আশাবাদের ভুবন কখনো হারিয়ে যায় না :

"...আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই—প্রেমে;
পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান
লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত
আমিষ গন্ধ ঠেলে
সময়ের সমুদ্রকে বারবার মৃত্যু থেকে
জীবনের দিকে যেতে বলে'।"
(পৃথিবীতে এই)

জীবনের সম্ভাবনা খুঁজে তিনি কবি

কৃষ্ণগোপাল রায়

বিগত শতাব্দী থেকে এ শতাব্দীর পড়ন্ত বেলা অবধি দেশে-বিদেশে কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস বৈচিত্র্যে বিপুল; বিষয় নিয়ে, প্রেরণা নিয়ে, আয়তন আবয়ব নিয়ে, সৌষ্ঠব-সংস্থান কিংবা মণ্ডন কলা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা এবং আন্দোলনের পর আন্দোলন এ কাল-পরিধির কাব্যলোক আলোড়িত করেছে প্রায় নিরন্তর। কিন্তু এ ইতিহাস ক'জনকে যথার্থ কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেল ? ক'জনের লেখা ঠাঁই পেল লাস্যময়ী মহাকাল-নাবিকার সোনার তরীতে? ক'জনের কাব্য-মনীষার আলো আমাদের নিয়ে চলেছে যুগান্ত পেরিয়ে?—কেউ কেউ! কারণ, সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি—ওপরের প্রশ্নগুলি আমাদের, কিন্তু উত্তরটি সবার-ই জানা—জীবনানন্দ দাশের। জীবনানন্দ দাশ—তিনি সেই কবি, দেশ-বিদেশের নানা আন্দোলন সম্পর্কে যাঁর স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট সংবিৎ ছিল অথচ যিনি নিজেকে কোনো বিশিষ্ট আন্দোলন বা কবিতাগত মতাদর্শের মধ্যে আটকে রাখেননি, যিনি যথেষ্ট আধুনিক হতে চেয়েছেন অথচ কবিতার আবহমান স্বরূপ থেকে সামান্য বিশ্লিষ্ট হতে চাননি। কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় না; কবি সত্যদ্রষ্টা, বৈদিক 'কব্য' থেকে 'কবি' শব্দের উৎপত্তি; কালের প্রবাহে শব্দটির অর্থ সংক্রাম যতটাই হোক—মূলের ব্যঞ্জনা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়নি। জীবনানন্দই লিখছেন—'কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভেতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য বিকিরণ তাদের সাহায্য করেছে'। (কবিতার কথা/৪র্থ সং/পৃঃ—১)।—কল্পনা এবং কল্পনার ভেতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তাতেই 'সত্যদ্রষ্টা' কথাটির ভাব-ব্যঞ্জনা নিহিত বলে মনে হয়।

কল্পনার ভেতরে 'চিন্তা ও অভিজ্ঞতার' যে স্বতন্ত্র সারবত্তার কথা বলেছেন জীবনানন্দ, তার বস্তু-আশ্রয় কী—অর্থাৎ কী নিয়ে চিন্তা, কিসের অভিজ্ঞতা—এ প্রশ্ন জাগে তাঁর ভাবনাকে স্পষ্ট করে নেবার জন্য। 'মাত্রা-চেতনা' প্রবন্ধে এ প্রশ্নের উত্তরও তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই। তিনি লিখেছেন, 'সময় ও পৃথিবী অভিজ্ঞতার আধার।' অর্থাৎ, যে চিন্তা ও অভিজ্ঞতায় কবির সৃজনী-কল্পনা সারবান হয়ে ওঠে, তার বস্তু-আশ্রয় সময় ও পৃথিবী। 'পৃথিবী' কথাটিও অত্যন্ত ব্যাপক, তবে তার যে দিকটি নিয়ে আমরা সতত চিন্তাশীল, তা মানব-পৃথিবী। মানব-পৃথিবীর অতীত ইতিহাসকে আবহমান সময়ের পটভূমিতে পর্যালোচনা করে নিজস্ব চেতনার নির্মাণ, এবং এ চেতনার আলোকে সময় প্রসৃতির পটভূমিতে বর্তমান মানব পৃথিবীকে বিচার করে ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি

পরিচ্ছন্ন বোধ লাভ করেই কবি-মনীষীর জ্ঞানলোক নির্মিত হয়। কল্পনা-প্রতিভা এ জ্ঞানলোকের ঐশ্বর্য আত্তীকরণ করে বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং বিগত অনেক শতাব্দীও আধুনিক জগতের নব নব কাব্য বিকিরণের অভিজ্ঞতায় নিজের অনন্য প্রকাশপথ গড়ে নেয় বলে মনে করেছেন জীবনানন্দ। কবিতা কোনো মতবাদের বাহন হোক—এ তিনি কোনক্রমেই মানতে রাজি নন। কিন্তু কবিতার বস্তু আশ্রয় যে মানব-পৃথিবী, অর্থাৎ মানুষ ও তার সমাজ—এই তাঁর বিশ্বাস। এজন্য 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাস-চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।' (ঐ/পৃঃ ৩৩)।

—বিগত দুই শতাব্দীর দিকে ফিরে তাকালে পাওয়া যাবে জীবনানন্দের এ বক্তব্য-সত্যের সমর্থন, অর্থাৎ যাঁরা সমাজকে বুঝতে পেরেছেন, যাঁদের কবিতার অস্থির ভেতরে ইতিহাস-চেতনা এবং মর্মে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান যত গভীরভাবে ক্রিয়াময় হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, তাঁদের কবিতা ততোই মহৎ প্রতিপন্ন হয়েছে। কল্পনা-প্রতিভাহীন সমাজ-হিতৈষীর হাত থেকে যেমন মহৎ কবিতা আসেনি, তেমনই সমাজের প্রতি মুখ ফিরিয়ে কেবল কল্পনাজীব্য—অবয়ব-সৌষ্ঠব ধন্য মণ্ডনকলানিষ্ঠ বা বিভিন্ন আন্দোলনের পথ দিয়েও মহৎ কবিতা দৈবাৎ আসতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। বাংলা কবিতার এ সময়ের কতিপয় কবিমাত্রই—জীবনানন্দের সমকালের কবিদের মধ্যেও তিনি ছাড়া বিষ্ণু দে-ই আজো কম-বেশি সেই আলো দেখাতে পারছেন, যাতে ভবিষ্যতের প্রতি প্রচলিত ধারার থেকে ভিন্নভাবেও আস্থালাভের প্রেরণা পাওয়া যেতে পারে। জীবনানন্দের কল্পনা-প্রতিভার অন্তর্গতের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সেই মৌল আশ্রয় পর্যালোচনা করে দেখাটাও যুগক্রান্তির পূর্বে বিশেষ জরুরি এজন্য যে, তাঁর কবিতার অপরাপর গুণপনার বাইরে তার-ই হীরকদ্যুতি অদ্যাবধি সামাজিকদের টেনেছে এবং মানব-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক নতুন সমীকরণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

যে-সময় পরিধিতে কবি হিসেবে জীবনানন্দের জন্ম ও বিকাশ, সেই সময় পৃথিবী বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। বিশ্ববাজারে মন্দা, বেকারত্ব, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি মানুষের দীর্ঘলালিত স্তম্ভগুলিতে ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, ঐশী নিষ্ঠা হ্রাস পেয়েছে, কল্যাণের বাণী পরিহাসের মতো শোনাচ্ছে, প্রেমের কুঞ্জে চলছে কামুকের উৎসব। ভেতরের দিকে—ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর সাহস নেই মানুষের—ইচ্ছেও হারিয়ে গেছে। সামূহিক প্রাণপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ব্যথার প্রস্রবণ আর্ত হয়ে উঠছে শুধু।

কবিতা লেখায় তন্নিষ্ঠ হয়ে কিছুদিন এলোমেলো ভাবের—পরস্পর সম্পর্কশূন্য বিষয়ের বেশ কিছু কবিতা লিখে গিয়েছেন জীবনানন্দ এবং সেসব কবিতায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের পাতা ভরেছে। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ (ধূসর পাণ্ডুলিপি) প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪৩-এ, যদিও এ-গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন. ১৩৩২ থেকে ১৯৩৬-এ লেখা কবিতাগুলিই এতে স্থান পেয়েছে। আবার অশোকানন্দ দাশ জানিয়েছেন—'রূপসী বাংলা'র 'সার্বিকবোধে একশরীরী' কবিতাগুলো 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষের দিকে ফসল (ভূমিকা/রূপসী বাংলা)। সেটাই হওয়া স্বাভাবিক। 'ঝরাপালকে'র পর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এক স্বতন্ত্র জগৎ,—কবিতার এক স্বতন্ত্র আঙ্গিক তৈরি হয়েছে এখানে, যার

কৌলীন্যে কবিতার ভাবার্থ অনুধাবন করার আগেই জীবনানন্দের কবিতা বলে এদের শনাক্ত করা সম্ভব। আর কবিতার বিষয়ের দিক থেকেও এসেছে সংহতি, 'ঝরাপালকে'র বিষয়ের দিশেহারা ভাব আর নেই। ব্যর্থ প্রেমের বেদনাই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রধান বিষয়—এ বেদনার দর্পণেই জীবনের রূপকে ফলিয়ে দেখার আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে। পাশাপাশি আরো দুটি ভাব রয়েছে—একটি মৃত্যুর, অন্যটি সৌন্দর্য পিপাসার, এবং এতে পারে এ দু'টি ভাবকে সঞ্চারিত করতে ব্যর্থ প্রেমের সেই বেদনাই মনের গভীর প্রদেশে কোথাও প্রণোদনকারীর ভূমিকাও নিয়েছে। হয়তো প্রেমের হতাশায় ক্লিন্ন মনের কোনো গহীন থেকে এ অনুভূতি উঠে এসেছে যে,'এ জীবনের আয়ু দীর্ঘ নয়। সুতরাং পৃথিবীর প্রকৃতিতে—জীবনাচারে, যেখানে যা সৌন্দর্য আছে, তাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে—মন দিয়ে উপভোগ করে নেয়া ভালো (...'জানি না কি আহা,/সব রাঙা কামনার শিয়রে সে দেয়ালের মতো এসে জাগে। ধূসর মৃত্যুর মুখ—মৃত্যুর আগে)। আবার কখনো পৃথিবীর বেদনা থেকে মুক্তি পেতে স্বপ্নের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়ার প্রবণতাও প্রশ্রয় পেয়েছে। সুতরাং সৌন্দর্য এবং স্বপ্নচারিতায় জীবনানন্দ পুরোপুরি রোম্যান্টিকদের মতো নন, এসবের পেছনে তাঁর মনে এক নিষ্কৃতি বা অবগতি পাওয়ার গোপন অনুক্রিয়াও রয়েছে। নিজনিতা, সৌন্দর্য, স্বপ্নময়তা ইত্যাদির প্রতি তাঁর কবি-স্বভাবের টান রয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি সেই টানটাই সব নয়, জীবনের বাস্তব রূপের—এখানে মূলত যা ব্যর্থ প্রেমের মুকুরেই প্রতিফলিত, আঘাতে এক শম্বুক-প্রবণতাও ওই টানের-ই ভেতরে ক্রিয়াশীল বলে তাঁকে নির্দ্বিধায় 'নির্জনতার কবি', 'চিত্ররূপময়তার কবি', 'স্বপ্নময়তার কবি' ইত্যাদি লেবেল লাগিয়ে দেয়া যায় না। তিনি পুরোপুরি জীবনের কবি। লক্ষণীয়, তিনি নিজে তাঁর কোনো আলোচনাতেই নির্জনতা, চিত্ররূপময়তা, স্বপ্নচারিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কোনো কথাই বলেননি—যেমন কীট্স তাঁর চিঠিতে-রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্র বা নানা প্রবন্ধে সৌন্দর্য সম্পর্কিত নিজেদের অনুভূতি উপলব্ধির কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে জীবনানন্দকে জীবনের কথা, সমাজ-দেশ-পৃথিবী ও সভ্যতার কথা বার বার বলতে শুনছি। যেমন—১. 'কবিতা ও জীবন এক-ই জিনিসের-ই দুই রকম উৎসারণ' (কবিতার কথা/৪র্থ সং/পৃঃ ১৩)। ২. 'সময় ও পৃথিবী অভিজ্ঞতার আধার। কবিও সঞ্চয়ী। কিন্তু তার আনীত অভিজ্ঞতা কতখানি সার্বিক, কতখানি তার নিজেস, এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে কতদূর অপরের করে তুলতে পারা যায়—সকলকে না হোক, অনেককেই পরিদীক্ষিত করতে পারা যায় নিজের মূল্যজ্ঞানের চেতনায়—এ দায়িত্ব কবির।' (মাত্রাচেতনা/কবিতার কথা/ঐ/পৃঃ ৩১)। ৩. 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।'—(উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য/ঐ/পৃঃ ৩৩)। ৪. 'সময়-প্রসূতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছি।'—(কবিতা প্রসঙ্গে/ঐ/পৃঃ ৪৪)। ৫. 'আমাদের দেশে যেসব নতুন কবি দিব্যানুভূতিকে ঘৃণা করেন এবং স্থূল ও চিক্কণ সুর মিশিয়ে কবিতা লেখেন—পদ্যে বা গদ্যছন্দে—তাঁদের কবিতা প্রধানত শ্লেষাত্মক এবং বর্তমানকালের সমগ্র পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থার অন্যায় ও অত্যাচারের মুখোশ বার করে ফেলবার জন্যে

প্রযুক্ত। রবীন্দ্রনাথও তা-ই চান, কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন প্রায়শই বিশুদ্ধ কাব্যের আবেগে।'—(রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা/ঐ/পৃঃ—১৯)

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জীবনানন্দের এই যে মূল্যায়ন—এদিক থেকেই প্রধানভাবে তিনি তাঁর উত্তরসূরি। শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে দেশ-কাল-মানুষের প্রতি প্রতিবদ্ধ তেমন প্রতিবদ্ধতা প্রাথমিকভাবে জীবনানন্দের মধ্যে না থাকলেও প্রায় সমধর্মী একটি পরিণতির দিকেই এগিয়ে চলেছে তাঁর কবিতা চিন্তা এবং প্রত্যয়ের পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু লক্ষ্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে অনেকখানি মিল রয়ে গেছে। উভয়েই মানব-সভ্যতার 'নতুন উষার স্বর্ণদ্বার' (রবীন্দ্রনাথ) বা 'শুভ্র মানবিকতার ভোর' (জীবনানন্দ)-এর প্রত্যাশী।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে যে, জীবনানন্দকে ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় দীর্ণ, নির্জনতার মধ্যে আত্মলীন বা আত্মবিলোপকারী, স্বপ্নজগতে—কল্পলোকে আত্ম-অব্যাহতিকামীরূপে দেখেছিলাম আমরা, তিনি কী করে ক্রমশ 'শুভ্র মানবকিতার ভোরে'র চারণ হয়ে উঠলেন—তা লক্ষ করার বিষয়। লক্ষ করার বিষয় তাঁর চিন্তা-প্রকৃতির ক্রমের অনিবার্যতা, যে অনিবার্যতা তার চিন্তা-প্রকৃতির ক্রমোত্তরণের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভরশীল। যদি দেখি, অকস্মাৎ একদিন পুরনো ভাব-চিন্তাধারার সংস্রব ঝেড়ে ফেলে সম্পূর্ণ নতুন কোনো চিন্তায় উদ্‌বেজিত হতে চাইছেন তিনি, অর্থাৎ তাঁর চিন্তাক্রমে বিচ্ছিন্নতা আছে, তবে তাঁকে আমাদের অস্থিরমতি মনে হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাঁর নতুন বক্তব্যের উপরেও ভরসা করা মুশকিল। কারণ, তিনি নিজে এ চিন্তায় কতখানি ভরসা করছেন, সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যাবে না।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেক কবিতায়—এমনকি যে কবিতা অচরিতার্থ প্রেমের বেদনায় আকুল—যেখানে মৃত্যুর কালো ছায়া জীবনকে জড়িয়ে নিতে উদ্যত, সেখানেও কবিচিত্তে আভাসিত ও সংগঠিত হতে দেখা যাচ্ছে এক অভিনব সময় চেতনা। যেমন—

'আমি চলে যাব,—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেই দিন পৃথিবীর
'পরে,'

(নির্জন স্বাক্ষর)

কিংবা,

'....একদিন আমি যাব চলে
কল্পনার গল্প সব বলে;
তারপর,—শীত হেমন্তের শেষে বসন্তের
দিন
আবার তো এসে যাবে;
এক কবি,—তন্ময়,—শৌখিন,—
আবার তো জন্ম নেবে তোমাদের দেশে!'

(পরস্পর)

কিংবা,
'সে কোন প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে
সন্তান
অঙ্কুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের
বেগে!
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের
ঘ্রাণ,—' (জীবন)

অতীত এসেছে আজকের মধ্যে, আবার এ 'আজ'-ও অতীত হয়ে থাকবে অনাগত কালের ভেতর। অন্যদিকে 'বর্তমান' 'অতীত' হয়ে যাবে ভবিষ্যৎকে বর্তমান হওয়ার স্থান ছেড়ে দিয়ে। সময়ের প্রবাহ নিরবধি বয়ে এসেছে—বয়ে চলবে। প্রায়ানুরূপ সময় চেতনা লক্ষ করা যাবে টি, এস, এলিয়টের মধ্যে। 'Time Present' এবং 'Time Eternal'— সময়ের এ দ্বি-অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন তিনিও। খ্রিস্ট-নিষ্ঠরা Time Etenal'-এ স্থান পায় এ ছিল তাঁর বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, যে জীবনানন্দে কোনো ধর্মবিশ্বাস প্রশ্রয় পায়নি, কিন্তু সময়ের দ্বি-অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনিও সচেতন। সমকাল ব্যথা-প্রদায়ী হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে জগদ্দল নয়, আবহমান সময়ের ধারায় সে-ও বয়ে যাবে; নতুন সময় আসবে নতুন স্বরূপ নিয়ে। জীবন মন্থন করে প্রকৃতিকে ভেবে সময় সম্পর্কিত এ বোধ ধীরে ধীরে জীবনানন্দের চিন্তা-মনীষার একটি স্থায়ী আলোকস্তম্ভ হতে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়েছিল এ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সময় থেকেই। দেখছি তিনি নিজেও সে সম্পর্কে পূর্ণ-ওয়াকিবহাল : 'মহা-বিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়-চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো। কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।'—(কবিতা প্রসঙ্গে/ঐ/পৃঃ—৪৩)

সময়-চেতনা যতই সংগঠিত হয়েছে, কবি নিজের ভেতর ততোই শক্তি—সাহস লাভ করেছেন। 'বনলতা সেন'-এ এসে তাই দেখা যাচ্ছে, প্রেমের ব্যর্থতাজনিত বিলাপ ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যদিবা কোনো অনুষঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে অপগত প্রেমের স্মৃতি, সেই অনুষঙ্গের প্রতি কবি প্রশ্ন করছেন, 'আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে ?' (হায় চিল)—অর্থাৎ বেদনার ওপরে উঠে আসতে চাইছেন কবি। পুরনো ব্যথা নিয়ে বসে থাকা জীবনের চলে না। 'আমি যদি হতাম' কবিতার 'হতাম' শব্দটি খেয়াল করবে, এ শব্দই প্রমাণ করছে, কবি যা হওয়ার কল্পনা করছেন, তিনি যে তা নন, সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন, অর্থাৎ আর তিনি বলছেন না 'এই স্বপ্নের জগৎ চিরদিন রয়'—(স্বপ্নের হাতে/ধূ. পা.)। জীবন-চেতনায়নের পক্ষে এ সময়ের সবচেয়ে বড় ব্যাপার 'বনলতা সেন'-এর মতো কবিতা লিখে ওঠা। সুরঞ্জনা, সুদর্শনা, মিতভাষণ, সুচেতনা ইত্যাদি কবিতার কথা বলছি না। কারণ, এরা এ সময়ের লেখা কবিতা নয়, 'মহাপৃথিবী'র সময় বা আরো পরেকার লেখা, 'বনলতা সেন'-এর ১৩৫৯ সংস্করণে সন্নিবেশিত। যাহোক, 'বনলতা সেন'কে কবির জীবন-চেতনায়নের ক্ষেত্রে বড় ঘটনা বলার কারণ এখানেই। প্রথম প্রেমকে তিনি সদর্থক ভূমিকায় লক্ষ করলেন। স্বীকার ও উচ্চারণ করলেন, জীরন বা সভ্যতার বোধিসত্ত্ব সন্ধানী পুরুষের যাবতীয় ক্লান্তি

অপনোদন করে প্রেম, সংকট সমস্যার টালমাটাল তরঙ্গাঘাতে বিপন্ন জীবনকে রক্ষা করে প্রেম, জীবনের সব লেনদেন শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাঙ্ক্ষিত অন্ধকারের মধ্যে প্রশান্তির সমাহিতিও দেয় প্রেম। জীবনানন্দের কাব্য-যাত্রার ইতিহাসে একথা কান খাড়া করে শোনার মতো এবং স্মৃতিপটে উজ্জ্বল করে ধরে রাখার মতো। কারণ, অনুভবের এ বাঁক ফেরা কবিকে এরপর সদর্থক জীবন প্রত্যয়ে অতি দ্রুত অনমনীয় করে তুলবে। কিন্তু যে-কবিকে এতদিন আমরা ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় জর্জর দেখেছিলাম, তিনি এ দৃষ্টিভঙ্গি পেলেন কোথায়? কিভাবে পেলেন? সে ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয় যদিও, তবুও স্মরণ করা যেতে পারে, প্রেম তাকে ব্যথা দিলেও প্রেমের প্রতি কোনোদিনই তিনি নিষ্করুণ ছিলেন না—'আমি চলে যাব,—তবু জীবন অগাধ/তোমারে রাখিবে ধরে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে;—/আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!'—(নির্জন স্বাক্ষর)। প্রেম-প্রদত্ত ব্যথা সহ্য করেও এ ভালোবাসার ভেতর থেকেই হয়তো নারী ও প্রেমের ভূমিকাকে নতুন করে ভাববার—দেখবার প্রেরণা পেয়েছেন জীবনানন্দ; কিংবা প্রেমের এ ভূমিকা তাঁর ভাবনায় উজ্জ্বল করে তুলেছে তাঁর ইতিহাস-চেতনা, কবিতায় যার প্রয়োগও সম্ভবত এ থেকেই। একথা মনে করার পেছনে আরেকটি ইতিহাসের সুবিস্তৃত পটভূমিতে বিচরণশীল।

ইতিহাস-চেতনা জীবনানন্দের কবি-মনীষার আরেক আলোকস্তম্ভ। একদিন থেকে সে সময় চেতনার অববাহী, কারণ সময় নিরলম্ব নয়, তার তীর ধরে ঘটনার নদী বয়ে চলেছে। এ ঘটনা বহু সভ্যতার অভ্যুত্থান-বিলয়-নবায়ন-চেতনা-কিরণে বিশুদ্ধতর সভ্যতার সাধনা। ইতিহাস-চেতনা একজন মনীষীকে প্রাজ প্রগতিশীল করে তোলে। 'মহাপৃথিবী'র যুগে কবির ইতিহাস-চেতনা ক্রমশ পরিপুষ্ট হলো এবং কবিতার ভেতর ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে লাগলো। জীবনানন্দ চেয়েছিলেন 'কবিতার অস্থি-র ভেতরে থাকবে ইতিহাস-চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।'—এ-জিনিস দেখা গেল 'মহাপৃথিবী'র কবিতায়, যদিও এ সময়েও 'আদিম দেবতারা', 'সিন্ধুসারস', 'ইহাদের কানে', 'অন্ধকার'-এর মতো কবিতা বেরিয়ে এসেছে তাঁর হাত থেকে; তবু এসময় থেকেই তাঁর কবিতার রোম্যান্টিক স্নিগ্ধতা কমতে শুরু করেছে এবং বেড়ে গেছে প্রজ্ঞার গভীরতা। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কাছে এদের আবেদন কমেছে, বেড়েছে মননের অধিকার। 'শহর' কবিতায় তাঁকে বলতে শুনছি—

'হৃদয়, অনেক বড়ো বড়ো শহর দেখেছো তুমি;
সেইসব শহরের ইট-পাথর,
কথা, কাজ, আশা, নিরাশার ভয়াবহ হৃত চক্ষু
আমার মনের বিস্বাদের ভিতর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
কিন্তু তবুও শহরের বিপুল মেঘের কিনারে সূর্য উঠতে দেখেছি?''

শহর সম্পর্কিত কবির ইতিহাস-অভিজ্ঞতা থেকে জেগেছে ওই 'বিস্বাদ'। কিন্তু ওই ইতিহাস-অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে এসেছে আশার কিরণ, যাকে কবির প্রগতিশীলতা বলে চিহ্নিত করলে ব্যঙ্গের কারণ হবে না। প্রায় সমানুরূপ বক্তব্য আরো সরল করে বোধ হয় সংলগ্ন কোনো সময়েই জীবনানন্দ এ দুই পংক্তিতে তুলে ধরেছিলেন; 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে/তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।'—(সুচেতনা)। 'শহর'

কবিতার সূর্যোদয় এখানে প্রেমের আত্মসমর্পণ। শহর গড়ে মানুষের সভ্যতা এগোবে না, সভ্যতা এগোবে সেই পথে, যে পথে শান্তি-প্রেম-চেতনা আলোকিত হওয়ার অফুরন্ত উৎস।

জীবন-চেতনায়নে প্রকৃতির কাছেও প্রচুর লাভবান হয়েছেন জীবনানন্দ। একদিন জীবনের কাছে—মূলত প্রেমের কাছে ব্যথা পেয়ে প্রকৃতির মধ্যে শুশ্রূষা খুঁজেছিলেন, এবং সে শুশ্রূষা তিনি প্রকৃতির মধ্যে এতো নিবিড় করে পেয়েছিলেন যে, 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে/এখানে তৃপ্ত হতেছে কান' বলে উঠেছেন বিহ্বলতায়। শুধু চোখ-কান নয়, মনও, এককথায় সমগ্র অস্তিত্ব লীন হয়ে গেছে প্রকৃতি লালিত বাংলার করুণ শ্রী-তে, 'রূপসী বাংলার ছত্রে ছত্রে যার সাক্ষ্য। কিন্তু এ নিবিষ্টতায় তিনি শুধু আবহমান বাংলার শ্রী-সম্ভোগ করেননি, পরিপুষ্ট করে নিয়েছেন তাঁর সময়-ভাবনাকে; জীবন-সংক্রান্ত কিছু মূল্যবোধও পেয়েছেন দেখা যায়; যেমন মহাপৃথিবীর সুবিখ্যাত 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা। পেঁচার কাছে কবি শিখে নিয়েছেন দুঃসময়ের দিনে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হয় সুসময়ের জন্যে, যেমন পেঁচা চাঁদ ডোবার অপেক্ষা করেছিল। অবক্ষয়ের পৃথিবীতে জাগা অন্তর্গত রক্তের বিপন্ন বিস্ময়ের সমাধান করতে না পেয়ে কবিতার নায়ক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু ইতিহাস ও সময় চেতনার প্রাজ্ঞ পেঁচার কাছে দীক্ষা নিয়ে তীব্র জীবনাকাঙ্ক্ষায় কবি উদ্দীপিত।

'মহাপৃথিবী'তে এসে জীবনানন্দ সদর্থক জীবন-প্রত্যয়ের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ এবং সূক্ষ্ম চিন্তায় শাণিত-পরিশুদ্ধ করে নিয়েছেন। বুঝে নিয়েছেন, মানুষকে সাহায্য করার জন্য নিরন্তর বয়ে চলেছে সময়ের প্রবাহ, আশ্চর্য রূপ আর ঘটনারাশি ছড়ানো রয়েছে প্রকৃতির সুনিয়মিত আবর্তন-বিবর্তনে, রয়েছে ইতিহাস,—এদের-ই অর্থময়তা থেকে প্রাজ্ঞ করে নিতে হবে চেতনাকে। তাহলেই বোঝা যাবে, জীবনের সম্ভাবনা রয়ে গেছে কিনা। যদি থাকে, তবে ওই নিঃশ্রেয়স চেতনার আলোক-আয়ুধে যুগ বিথারিত তিমির বিনাশ করে এগিয়ে চলতে হবে। তাহলে চেতনাকে আলোকিত করে তোলাই প্রধান কাজ, 'এ পথেই আলো জ্বেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।' এ ক্রমমুক্তিকে জীবনানন্দ বিপ্লব বলেই মনে করেছেন। কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ,/.....আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে/গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।'—(সুচেতনা)। আর প্রবন্ধে বলেছেন এভাবে--'বিপ্লব অবশ্য শান্তভাবেও হতে পারে—অনেকখানি সময় লাগিয়ে ছোট-মাঝারি কিস্তিতে। বহু শত বৎসর পরে যোগফলে মহাবিপ্লবের চেহারাটা অনুমান করা যাবে।'—(সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা/ঐ/পৃঃ—৮৫)

সেখানেই তিনি আরো বলেছিলেন—'আমরা এখনো কোনো বিপ্লবের যুগে বাস করছি না, আমাদের সন্ততিরা করবে বলে মনে করছি।' কোনো বিপ্লবী দর্শনের সঙ্গে জীবনানন্দের বক্তব্য যে একটুও মেলে না, তা বলা বাহুল্য; শ্রেণী-সংঘর্ষ, মিশ্র-অর্থনীতির ধর্ম, সেখানে সংঘবদ্ধ বিপ্লবীদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁর জানাশোনা কতদূর ছিল বা আদৌ ছিল কিনা, তা বোঝার উপায় নেই, কিন্তু এসব বিষয় ও তর্ক-প্রতর্ক যে তাঁর প্রত্যয়লোক নির্মাণের কোনো কাজেই আসেনি, তা সতত স্পষ্ট। তবে তিনি নিছক বিবর্তনবাদের হাতে হাল ছেড়ে দিয়েও বসে নেই, সুচেতন মানুষের সক্রিয়তা দাবি করেছেন তিনি। তাঁর নিজের সক্রিয়তার ছবি রয়েছে 'সাতটি

তারার তিমির'-এর ভেতর। যুগের অন্ধকার পর্যালোচনায় কখনো ডিটেল্‌সের কাজ করেছেন জীবনানন্দ, কখনো সামূহিক ও প্রতীকী। যেমন—

১. কুইসলিং বানালো কি নিজ নাম—হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল;
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল;
পৃথিবীতে নেই কেন বিশুদ্ধ চাকরি।

২. মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।
... ...
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে—
অন্ধকারে—
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।'

(তিমির হননের গান)

৩. প্রেম নেই—প্রেমব্যসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে;
একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের আকাশে উঠেছে;
উঠে ভেঙে গেছে। (রাত্রির কোরাস)

৪. মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্ত লোভাতুর।
রক্তের সমুদ্র চারিদিকে; (দীপ্তি)

উদাহরণ অনেক হতে পারে; কিন্তু যুগগত এ তিমিরে জীবনানন্দ আর দিকভ্রান্ত হন না। সময়-চেতনা তাঁকে বলে—'এইসব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গুণে নিতে/ব্যাপ্ত হতে হয়'। আর ইতিহাস-চেতনায় প্রাজ্ঞ তিনি অক্লেশে বলতে পারেন—'জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয় জয়।' কিংবা 'বেলা অবেলা কালবেলা'তে গিয়েও বলেন—'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়', কিংবা, 'প্রেম/ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি', অথবা—

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি। (হে হৃদয়)

তাই শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দকে যেমন নির্জনতার বা স্বপ্নময়তার বা বিষণ্ণতার কবি বলা যায় না, তেমনই তাঁকে 'কবিদের কবি' বলাও অসমীচীন। অসমীচীন—কেননা 'সময়-প্রসূতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে' যে বোধি তিনি লাভ করেছিলেন, তাতে 'সকলকে না হোক, অনেককেই পরিদীক্ষিত' করার আন্তর তাগিদ ছিল তার, কেবল কবিদের নয়। 'মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থালাভ করা' যাঁর লক্ষ্য, ব্যাপক মানুষের মধ্যে সংব্যাপ্ত হয়েই তাঁর চরিতার্থতা।

জীবনানন্দের সমাজচৈতন্য

দীপ্তি ত্রিপাঠী

সমাজচৈতন্য জীবনানন্দের কাব্যে প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়। ইতিহাসচেতনা তাঁকে সমাজচেতনার পথে নিয়ে গেছে, অতীত থেকে করেছে ভবিষ্যৎমুখী। সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে কবিতা তিনি 'ঝরা পালক'-এ রচনা করেছিলেন, যেমন—'দেশবন্ধু', 'বিবেকানন্দ', 'পতিতা' ইত্যাদি। কিন্তু সে কবিতাগুলি ছিল প্রধানত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণ এবং গতানুগতিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে সমাজচৈতন্য প্রথম দানা বাঁধতে শুরু করে, যেমন—'শকুন', 'অবসরের গান'-এর কিয়দংশ, 'ক্যাম্পে'। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ অথবা যান্ত্রিক যুগের হৃদয়হীনতা কবিকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদকে তিনি দেখেছিলেন 'এশিয়ার মাঠে চরা' শকুনের প্রতীকে। কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে মৃত্যুচেতনা এত বেশি প্রবল ছিল যে, সমাজচেতনা সেখানে প্রসারিত হতে পারেনি। 'বনলতা সেন'-এর প্রথম সংস্করণে ইতিহাসচেতনা মৃত্যুচেতনার স্থান গ্রহণ করেছিল। কবি বর্তমানকে ছেড়ে অতীতকে আশ্রয় করেছিলেন। 'মহাপৃথিবী'তে তিনি অতীত ও বর্তমানকে ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করে দেখলেন।

নিপীড়িত, শোষিত মানবাত্মার দুঃখ ও অপমান আফ্রিকার প্রতীকে কবি ব্যক্ত করলেন :

কতবার হটেনটট-জুলু-দম্পত্তির-প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম;

('আজকের এক মুহূর্ত', 'মহাপৃথিবী')

অথবা :

অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানবপ্রাণ
সূর্যতাড়সে ভ্রূণকে যদিও করে ঢের ফলবান,—
তবুও আমরা জননী বলিব কাকে?
গড়িয়া উঠিল মানবের দল সূর্যসাগরতীরে
কালো আত্মার রহস্যময় ভুলের বুনুনি ঘিরে।

('সূর্যসাগরতীরে', ঐ)

কবি পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন, দম্ভের ব্যাবিলন উঠছে, শুনছেন সাম্রাজ্যবাদী সিংহের হুংকার। মানুষ তার আদিম লোভ, হিংসা এখনো ত্যাগ করতে পারেনি।

মানুষ এখনও নীল, আদিম সাপুড়ে;
রক্ত আর মৃত্যু ছাড়া কিছু পায় নাক' তারা
খনিজ, অমূল্য মাটি খুঁড়ে। ('পরিচায়ক')

রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি কবির আস্থা নেই:

উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের মতো যারা তাহাদের দিশা
স্থির করে কর্ণধার?—ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা। (ঐ)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে কখনো মনে হয়েছে 'কালরাত্রি' ('বিভিন্ন কোরাস'), কখনো 'অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন' ('সবিতা'), কখনো 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ'।

'সাতটি তারার তিমির'-এ সমাজ-সচেতনতা অনেক বেশি বেড়েছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু প্রভৃতি অকল্যাণ কবিকে আরো এক কঠিন জীবন-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করেছে। জীবনানন্দের ভাষায়—'সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কবিতা চেতনা হয়তো দেখিয়েছে, আরো বড় চেতনায় উত্তরপ্রবেশ চেয়েছে।'[১] 'নাবিক' কবিতাটিতে এ শ্রান্তিহীন পথ সন্ধানের চিত্র পাই :

হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য করে শুধু?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরসী থেকে ফেঁসে
অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চলে যাও—দুপুর বেলায়;
বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেক্‌জান্দ্রিয়ার
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে পড়ে অমায়িক সঙ্কেতের মত,
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার
প্রয়োজন রয়ে গেছে,—
('নাবিক', 'সাতটি তারার তিমির')

পৃথিবীর সমাজের, মানবতার গতি কোন্ দিকে মুক্তি কিসে এ-প্রশ্ন তিনি বারংবার তুলেছেন এবং উত্তর দেয়ার চেষ্টাও করেছেন। তিনি যেমন দেখেছেন বর্তমান জীবনের ক্ষয়িষ্ণু অসুস্থ রূপ ও অসংগতি, তেমনি খুঁজেছেন এক সুসঙ্গতিময় দিব্যজীবনের পথ। কখনো তা প্রত্যয়ের আলোতে সমুজ্জ্বল, কখনো বা সংশয়ের কুয়াশায় আচ্ছন্ন। ফলে আঙ্গিকেও দেখি কখনো ঋজু ভাষণ, কখনো বক্রোক্তি, কখনো শুধুই ইশারা দিয়েছেন চিত্রকল্পের মাধ্যমে, কখনো অর্ধোচ্চারিত প্রতীকে।

কয়েকটি কবিতা আলোচনা করলে প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হবে। 'নিরঙ্কুশ' কবিতায় দেখি, মালয় সমুদ্রের নীলাভ জল বণিক-সভ্যতার শোষণে মলয়ালীর কাছে মরুভূমির মতো হয়ে গেছে। নারিকেল-মর্মরিত, দারুচিনি-সুবাসিত দ্বীপময় ভারতের আদিম প্রাণতপ্ত idyll ভেঙে গেছে। সেখানে আজ :

চারিদিকে পামগাছ—ঘোলামদ—বেশ্যালয়—সেঁকো—কেরোসিন
('নিরঙ্কুশ', 'সাতটি তারার তিমির')

১. জীবনানন্দ দাশ, 'ময়ূখ', পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১, পৃ—২৩০

উক্ত কবিতার 'রক্তিম গির্জার মুণ্ড' পদাংশটি সাম্রাজ্যবাদী ও মিশনারীর সহযোগিতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস রূপ হংকং-এর পণ্যা নারীর মধ্যে তিনি দেখেছেন, আবার আফ্রিকার দিকে তাকিয়ে দেখেছেন—'কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হল রক্তে—উপেক্ষায়!' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কত অসহায়, নিরীহ মানুষকে বাধ্যতামূলক সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করতে হচ্ছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে :

সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে ;
সচ্ছল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর;

('সৃষ্টির তীরে', 'সাতটি তারার তিমির')

পারিবারিক জীবনও তার আঘাতে ভেঙে পড়ছে;
আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন
বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে জেনে
সপ্রতিভ রূপসীর মতো বিচক্ষণ,
যে কোনো রাজার কাজে উৎসাহিত নাগরের তরে;

('সোনাচল সিংহের গল্প', ঐ)

আমাদের ক্ষেতের ধানও হয়ে গেছে বেহাত।
আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিষ
মিড্‌লম্যানদের কাছে পর নয়।

(ঐ)

১৯৪২-এর দুর্ভিক্ষে শহরের পথে-পথে তাই জমে উঠেছে চাষীদের মৃতদেহ। আর মৃত্যুর চেয়েও কবির কাছে ভয়াবহ বলে মনে হয়েছে মৃত্যু সম্বন্ধে শহুরে মানুষের নির্মম ঔদাসীন্য। এ যেন দ্বিতীয় মৃত্যুর মতো।

তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।

('বিভিন্ন কোরাস', ঐ)

অথবা :

লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।

('তিমির হননের গান', 'সাতটি তারার তিমির')

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্নায়ুযুদ্ধ (Cold War) সব-কিছুতেই কবি যুগের অপরাহ্নকে প্রত্যক্ষ করেছেন :

চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।
কেবলি আসন থেকে বড়ো, নবতর
সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো।
মানুষের দুঃখ কষ্ট মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে যায়!

('এই সব দিনরাত্রি', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

এ-যুগ তাই কবির কাছে প্রতীয়মান হয়েছে 'খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি'।

কিন্তু যুগের অন্ধকার দিকটাই তাঁর চোখকে আচ্ছন্ন করেনি। 'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।' এ-কথা প্রথমে আভাসে, পরে দৃঢ় প্রতীতির সঙ্গে তিনি বলেছেন : যেমন ''নিরঙ্কুশ'-এ মলয়ালী সাম্রাজ্যবাদের শোষণে সমুদ্রকে নীল মরুভূমি হতে দেখে যে ভীত হয়েছে, তা 'ভ্রান্তিবশত'। নিরঙ্কুশ শুভযাত্রা সভ্যতার মর্মকেন্দ্রের জিনিস—তা মলয়ালীর বুঝতে দেরি লাগলেও সে পরে আপনার অবশ্যম্ভাবী মুক্তিতে বিশ্বাস ফিরে পায়।

সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে নীলিমায় লীন।

('নিরঙ্কুশ', 'সাতটি তারার তিমির')

অথবা 'ক্ষেতে প্রান্তরে' কবিতাটি ধরা যাক। ১৯৪২-এর মন্বন্তরের পটভূমিকায় এ-কবিতাটি রচিত বলে মনে হয়। যদিচ কৃষকের দিকে তাকিয়ে কবির মনে হয়েছে :

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই;
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিল ক্ষেতে;
সূর্যাস্তের সাথে চলে গেছে।

('ক্ষেতে প্রান্তরে', 'সাতটি তারার তিমির')

আর 'পোয়াটাক মাইলের মতন জগতে' তাদের জীবনের সমস্ত প্রকাশ সংকীর্ণ, সীমায়িত। তথাপি সেই 'করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়' কাস্তের শব্দই এ যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের একমাত্র প্রতিশ্রুতি।

কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। (ঐ)

"জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ' হেতুহীন সম্প্রসারণে জাগেনি। এখানে বক্রোক্তিটি লক্ষণীয় :

জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে—

(ঐ)

এর সঙ্গে তুলনীয় আর-একটি বক্রোক্তি :

না হলে উচ্ছল সিন্ধু মিছে?

('বিভিন্ন কোরাস", ঐ)

বলা বাহুল্য, কোনোটিই প্রশ্ন নয়। এখানে সংশয়-মুক্তিরই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। Owen-এর 'Was it for this the clay grew tall?'-এর মতো এ-প্রশ্ন নিরুপায় নয়।

পূর্বেই বলেছি, কবির মনে এ আশার আলো ধীরে-ধীরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। 'উন্মেষ' কবিতায় মনের আকুলতা ও সিদ্ধির স্তরগুলি সুস্পষ্ট। কবি প্রথমে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না :

চোখের উপরে
রাত্রি ঝরে;
যে দিকে তাকাই
কিছু নাই
রাত্রি ছাড়া;

('উন্মেষ', 'সাতটি তারার তিমির')

অচিরাৎ মঙ্গল সংঘটন হয়ে যাবে—এমন বিশ্বাস তাঁর নেই। যুগের পর যুগ মানুষ খুঁজছে কল্যাণ, সঙ্গতি, কিন্তু সে কি তা পেয়েছে? 'নিবিড় রমণী', অর্থাৎ মানবাত্মা তার 'জ্ঞানময় প্রেমিক' অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যের সন্ধানে এসে দেখছে এ-যুগেও সেই মূঢ়তার অভিনয় চলছে।

নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে
অনেক মলিন যুগ—অনেক রক্তাক্ত যুগ সমুত্তীর্ণ করে,
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দেখে
আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে।

(ঐ)

কেন জন্মালাম, কোথায় যাবো, তার কোনো ইঙ্গিত-ই যদিও জীবন দেয় না, তবু এ অন্ধকার এ অজ্ঞানতা তো বাইরের পৃথিবীর নয়, মানুষের-ই অজ্ঞানতা—'তার হৃদয়ের রাত্রির বেবুন'। অন্ধকারেই যে আমরা আছি, সেই চেতনাটুকু কবির মনে জাগ্রত হয়েছে বলেই কবিতাটির নাম 'উন্মেষ'। এ উন্মেষ, এ চেতনা নিয়ে কবি পুনশ্চ

অন্ধকার জীবন-সমুদ্রে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন। মাটির অন্ধকারে বীজ হতে উদ্গত হয়ে অঙ্কুর যেমন চারদিকে দেখে অন্ধকার, কিন্তু সে-অন্ধকার তাকে অতিক্রম করতে হয়—যাত্রা করতে হয় উন্মুক্ত আলোর রাজ্যে—কবি-মানসও তেমনি আলোকতীর্থে যাত্রার জন্য উন্মুখ। 'প্রতীতি' কবিতায় প্রত্যয়ের সুর আরো দৃঢ় হয়েছে। যুদ্ধ ও ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে মানুষের যদিও মনে হয়েছে কোনো কিছুর-ই মূল্য নেই :

নীলিমার অনুকল্পে আজ যারা সয়েছে বিমান,—
কোনো এক তনুবাত শিখরের প্রশান্তির পথে
মানুষের ভবিষ্যৎ—এই জ্ঞান
পেয়ে গেছে;—

('প্রতীতি', 'সাতটি তারার তিমির')

তবু বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতি সাধনা মানুষকে মোহমুক্ত করে তাকে সত্য সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছে :

সময় কাটায়ে গেছে মোহ ঘোচাবার
আশা দিয়ে মঞ্জুভাষা, ডোরিয়ান গ্রিস,
চীনের দেয়াল, পিঠ, পেপিরাস, কারারা-পেপার।

('প্রতীতি', 'সাতটি তারার তিমির')

'বনলতা সেন'-এ (সিগনেট সংস্করণ) সংযোজিত 'সুচেতনা'তেও কবি এ বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন :

'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে'; কিন্তু সহজে এ-মুক্তি আসবে না—'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'; তার জন্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিকেই 'অনুসূর্য' হতে হবে। কিন্তু যেহেতু এমন যুগ সহসা আসবে না, কবি তাই মধ্যে-মধ্যে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন, যেন পারিপার্শ্বিক অন্ধকারকে আর সহ্য করতে পারছেন না :

এ কি ভোর?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।

('সূর্যতামসী', ঐ)

অথবা :

তবুও কোথায় সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর?

('সময়ের কাছে', ঐ)

এ টানাপোড়েনের মধ্য থেকে জীবনানন্দ একটি জীবন-দর্শন খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর উপলব্ধি, মানুষের অগ্রগতি কোনো সরল রেখায় হয় না। তার ভাগ্য চক্রাকারে আবর্তিত। তার ইতিহাসে এক-একটি স্মরণীয় যুগের পরেই নেমে আসে ধ্বংসের

অন্ধকার। বর্তমান যুগ সেরকম-ই এক অন্ধকার ক্ষণ। কিন্তু তার চেতনার পরিধি ক্রমশ বিস্তৃততর হবে এবং এক মহত্তর ও বৃহত্তর চেতনায় উত্তরপ্রবেশ করলে তার মুক্তি হবে। এ চৈতন্যের জাগরণে প্রেম হবে অন্যতম প্রধান শক্তি :

আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই প্রেমে

('পৃথিবীতে এই', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

"তিমির হননের গান', 'সৌর করোজ্জ্বল", 'সূর্যতামসী', 'সময়ের কাছে', 'মকর সংক্রান্তির রাতে', 'দীপ্ত', 'উত্তরপ্রবেশ' প্রভৃতি কবিতায় এ আশার আলো ক্রমশ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তরপ্রবেশ করে আরো বড় চেতনার লোকে;
অনন্ত সূর্যোর অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

('উত্তরপ্রবেশ', 'সাতটি তারার তিমির')

কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেলা অবেলা কালবেলা', 'সাতটি তারার তিমির'-এর সমসাময়িক এবং পরবর্তী পর্যায়ের কবিতার সংকলন। রচনাকাল ১৯৩৪-১৯৫০। অর্থাৎ, পরাধীন ভারতবর্ষের বেদনা, দ্বিতীয় মহাসময়ের ব্যর্থতা, উত্তর-স্বাধীনতার যন্ত্রণা এ কাব্যগ্রন্থেরও পশ্চাৎ পটভূমিকা। 'স্বর্গগামী সিঁড়ি' আজ 'রক্তনদীর মতো'। মানুষ মাত্রই 'বিরাট অবক্ষয়ের সাগরে নিঃসঙ্গ দ্বীপ'। ইতিহাসের যত অন্ধকার যুগ সব মিশে এক অন্ধকারতম যুগের শুরু হয়েছে। তবে ইতিহাসের এ ব্যাপক অবসাদের অধ্যায়েও 'নব নবীনের প্রাক সাধনা' চলেছে ক্রেমলিনেম, লন্ডনে। ইতিহাসের রাশি রাশি দুঃখের খনি ভেদ করে শত শত জলঝর্ণার শব্দ কবি শুনেছেন। কখনো তাঁর মনে হয়েছে একমাত্র অমৃত প্রেম :

১. মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

('তোমাকে', 'বেলা অবেলা কালবেলা')

২. প্রেম
ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি

('অনেক নদীর জল', ঐ)

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিভ্রান্তির সঙ্গে প্রত্যয়ের একটা টানাপোড়েন যেমন 'সাতটি তারার তিমিরে' শুনি, এ-গ্রন্থেও তা-ই। তবে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় তাঁর কণ্ঠ অনেক মৃদু—যেন অনেকটা স্বগত। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন :

এমন নিষ্প্রভ হয়ে সময়ের বুনোনিতে অন্ধকার কাঁটার মতন
কাকে বোনে? কেন বোনে? কোন্ দিকে কোথায় চলেছে?
('পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে', 'বেলা অবেলা কালবেলা')

আবার বলেছেন :

—মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।
('পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে', ঐ)

কখনো বলেছেন—"আমার শরীর ভেঙে ফেলে নতুন শরীর কর'...। আবার কখনো শুধু ব্যক্তিগত পুনর্জন্মেই সমাধান পাননি। একটা শান্ত বিষণ্ণ মৃত্যুচেতনা প্রদীপের মৃদু আলোর মতো তবু ঝিলিক দিয়েছে শেষের কবিতাগুলিতে :

১। কোথাও পাবে না শান্তি—যাবে তুমি এক দেশ থেকে দূর দেশে?
এ মাঠ পুরনো লাগে—দেয়ালে নোনার গন্ধ—
পায়রা শালিক সব চেনা?
('বেলা অবেলা কালবেলা')

২. —স্নিগ্ধ কালো অঙ্গারের গন্ধ এসে মনে
একদিন আগুনকে দেবে নিস্তার।
('বেলা অবেলা কালবেলা')

ততক্ষণ কবি 'সূর্যে সূর্যে' চলবেন, চাঁদ যেমন মেঘ কেটে কেটে পথ খোঁজে.। শান্তি খুঁজবেন হিজলে, শিরীষে, নদী নারী নক্ষত্রে। প্রেম-ই একমাত্র 'সৃষ্টির বনহংসী'। যে-শক্তি রাতের আকাশে জ্যোতিষ্ক-শিখা সৃষ্টি করে, কবির অন্তরে তা কবিতার স্ফুলিঙ্গ ফোটায়। আকাশ, রাত্রি, নক্ষত্র, কবি-হৃদয়, জীবন, সব-ই এক সুরে বাঁধা—সে-সুর প্রেমের সুর, সৃষ্টির সুর।

একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে

সুব্রত রাহা

আজন্ম রোমান্টিক বাঙালি সাহিত্য থেকে সিনেমা সমস্ত কিছুতেই রোমান্টিক ইমেজ খুঁজে-বেড়ায়। অনেকক্ষেত্রে এ রোমান্টিক ইমেজ হয়ে পড়ে শিল্প-সাহিত্যের রসোপভোগের একমাত্র উপাদান। বিশেষত কবিতায় রোমান্টিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে দূরবাসিনী অস্পষ্ট মোহিনীমায়ার নায়িকা চরিত্রের। রবীন্দ্রোত্তর যুগে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি বাংলা আধুনিক কবিতার শেষতম সার্থক রোমান্টিক নায়িকা। ইতিহাস চেতনায় ধূসর উজ্জ্বলতায় উদ্‌ভাসিত এ 'বনলতা সেন' রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়ার' নাম্নী পর্যায়ের কবিতাগুলি একটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি, যেমন বনলতা সেন হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, এখানে জীবনানন্দ দাশের কবি পরিচয়ের বিড়ম্বনা ঘটেছে। এহেই শতবর্ষেও 'বনলতা সেন'-এর কবি বলেই জীবনানন্দকে বেশি করে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, তাঁর পরিণত ও সময় সংক্ষুব্ধ কবিতাগুলির পরিচয় সাধারণের কাছে অনুল্লেখ রেখে। পশ্চিমবঙ্গে স্বনামখ্যাত শিল্পীরাও ছবি আঁকছেন 'বনলতা সেনের' কবির সৃষ্টিকে অমর করে তুলতে। চিত্রশিল্পীদের এহেন প্রচেষ্টা খুব-ই প্রশংসনীয়, তবে জীবিত জীবনানন্দ তাঁর 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের নামী শিল্পীর আঁকা প্রচ্ছদের বনলতা সেনের মুখের সঙ্গে রাজকুমারী অমৃত কাউরের সাদৃশ্য দেখে খুশি হতে পারেননি। যাহোক, বনলতা সেনের রোমান্টিকতাই সাধারণ কবিতা পাঠক থেকে বিদগ্ধ শিল্পীর কল্পলোককে আলোড়িত করেছে। সম্প্রতি আরো এক হাস্যকর প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেল কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার রবিবারের পাতায় বাংলার এক খ্যাতনাম্নী রোমান্টিক চিত্রতারকার সঙ্গে বনলতা সেন'-এর সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাতে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী'র শেষ পর্যায় থেকে 'সাতটি তারার তিমির' কিংবা 'বেলা অবেলা কালবেলা'র অনেক কবিতাই আধুনিক শিল্পীর মনন কল্পনার বিষয় হতে পারতো। সেসব চিত্রশিল্প এক তীব্রতর বিমূর্ত কালচেতনার ছবি হয়ে উঠতে পারে, যেমনভাবে রবীন্দ্রচিত্রকলা যুগ-মানসিকতার সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিল। রবীন্দ্রচিত্রকলার আধুনিকতা রবীন্দ্র সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবালুতা বর্জিত। জীবনানন্দ যদিও আধুনিক ছবি আঁকেননি, কিন্তু ছবির বিষয়বস্তু হলো তার শেষ পর্যায়ের কবিতা।

জীবনানন্দ প্রসঙ্গে আর একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচারিত। তিনি নাকি নির্জনতার কবি, নিসর্গ তন্ময় চিত্ররূপধর্মী কবি। এ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত হয়েছিল একসময় কবি বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নে—'All poets in a senses, are poets of Nature, but

Jibanananda is so in a rather Special Senses, he is absorbed in Nature, Physical nature and certain aspect of it. (An Acre of Green Grass : 1948)

এভাবে জীবনানন্দ নিসর্গের কবি হয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে জীবনানন্দের কবিতার স্বরান্তর ঘটে গেছে। 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের সময় সংক্ষুব্ধ ক্রান্তিকালের কবিতাকে আবার বুদ্ধদেব বসুই বলছেন—'ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত করে তিনি এইটেই প্রমাণ করবার প্রাণান্তর চেষ্টা করেছেন যে, তিনি 'পিছিয়ে' পড়েননি। করুণ দৃশ্য এবং শোচনীয়। এর ফলে তাঁর প্রতিশ্রুত ভক্তের চোখেও তাঁর কবিতার সম্মুখীন হওয়া সহজ আর নেই। দুর্বোধ্য বলে আপত্তি নয়, নিঃসুর বলে আপত্তি। নিঃস্বাদ বলে।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব বসুর মতো কবি-সমালোচকের কাছে জীবনানন্দ দাশের কবিতার রোমান্টিক উপাদান-ই ছিল একমাত্র কবিসত্তার মৌলগুণ। যেখানেই তিনি সময় ও সমাজমনস্ক হয়ে উঠেছেন, সেখানেই তিনি 'দুর্বোধ্য' বলে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছেন। অথচ সেই পরিণত সময় চেতনার কবিতাই জীবনানন্দের কাব্যসিদ্ধি বলেই চিহ্নিত হওয়া উচিত ছিল। কারণ, কবি এখানেই সমাজ সম্পৃক্ত, নিসর্গ থেকে মুখ ফিরিয়েছেন।

ব্যক্তি-জীবনে জীবনানন্দ এক বিড়ম্বিত মানুষ—এ বিড়ম্বনার ভয়াবহতায় সমাকীর্ণ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত একটি দিনলিপি ('বিভাব' জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, ১৯৯৮) থেকে যেমন জানা যায় দিন যাপনের যন্ত্রণা, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সংশয়। জীবনানন্দ পাঠক সমাজেও ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছিলেন। 'শনিবারের চিঠি' কিংবা 'পরিচয়' কোনো পত্রিকা গোষ্ঠীই জীবনানন্দকে যথাযথ মূল্যায়ন করেনি। এ প্রসঙ্গে একটু ভিন্নতর পরিবেশে এক আধুনিকতম বিদেশী কবির উল্লেখ করছি,—বোদলেয়ার স্বসমাজে নিন্দিত ও অপব্যাখ্যাত হচ্ছেন, চরমতম অবক্ষয়িত জীবনের ভার বহন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হন, তখন তাঁর এক চিঠিতে লিখেছেন—'I am killing myself because I am useless to others and dangerous to myself... ।' অথচ সেই বোদলেয়ার কবিকৃতী সম্পর্কে টি. এস. এলিয়ট বলছেন—'The greatest examplar in modern poetry in any language', তাই-জীবনানন্দ আজ যেভাবে গৃহীত হচ্ছেন, মূল্যায়িত হচ্ছেন এবং ক্রম প্রকাশিত হচ্ছেন, তাঁকে যেন আড়াল না করে রোমান্টিকতার মায়াবী পর্দা। তাঁর সময়চেতনা কখনই রোমান্টিকতার ঊর্ধ্বে স্থান পেতে পারে না।

জীবনানন্দের আর একটি কবিপরিচয় পরবর্তীকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের মূল্যায়নে প্রকট হয়, তা হলো তিনি অবক্ষয়ের কবি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দর কবিতাকে এভাবে দেখেছেন, 'প্রাচীনকালে গৌড়ীয় শুঁড়িখানায় থাকতো এক রকমের চিহ্ন, সেই চিহ্ন দেখে ভেতরে ঢুকতেন পানরসিকেরা। জীবনানন্দের কবিতার দুর্বোধ্য সংকেত অনেকটা সেই চিহ্নের মতো। ভেতরে ঢুকলে নেশাগ্রস্ত হওয়া যায়। তখন বেলের খোলায় পৃথিবীকে মনে হয় তালগোল পাকানো এক অসংবদ্ধ

প্রলাপ, প্রেম যেন হারানো অতীতের ছায়াচ্ছন্ন স্মৃতি, আক্রান্ত মানুষের শেষ আশ্রয় 'প্রকৃতির নির্জন গুহা'।' অবক্ষয় ও দুর্বোধ্য অভিযোগে অভিযুক্ত জীবনানন্দ। অথচ জীবনানন্দের কবিতার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঘটে চলেছিল স্বরান্তর, 'মহাপৃথিবী'-শেষ পর্যায় থেকে এর সূচনা। এখানেও জন মিডিল্টন মারির বোদলেয়ার প্রসঙ্গে বক্তব্যটি উল্লেখ করা যায়। মারির মতে—'Baudelaire is the poet of an historical lecadence; he is not in any useful sense of the word a decadant poet' (Baudelaire/Jhon Middleton Marry, Page—95). বোদলেয়ারের সঙ্গে জীবনানন্দের তুলনায় যাচ্ছি শুধু এ কারণেই, কবিতার 'চিরপদার্থ' এ দুই কবির মধ্যে ছিল অথচ এ দুই কবিই তাঁদের স্বকালে ও স্বসমাজে অপব্যাখ্যাত ও সময় সময় নিন্দিত হয়েছেন ভীষণভাবে। বিড়ম্বিত কবি জীবনে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, জীবনের শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়ে সমাজ বিচ্ছিন্ন বলে প্রতিভাত হয়েছেন। কিন্তু একথা কেউ বলেননি যে, জীবনানন্দের অবক্ষয় চেতনা ছিল ঐতিহাসিক।

জীবনানন্দের কবিপ্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সমাজ-ব্যবস্থায়। দু'টি মহাযুদ্ধ তাঁর কৈশোর ও যৌবনের কবি-জীবনে ছায়া ফেলেছিল। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় জীবনানন্দকে নিদারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। যার থেকে তাঁর প্রতীতির জন্ম এক অদ্ভুত আঁধারের বাস্তবতা। সমস্ত শুভকল্যাণবোধ ও মূল্যবোধ বিপর্যস্ত;—

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—
প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

(অদ্ভুত আঁধার এক)

যুদ্ধ, কালোবাজারি, ঠিকাদারি মিডিলম্যান কালচারের সব ক'টি উপসর্গ সমাজ-জীবনে যখন প্রকট হয়ে উঠেছে, জীবনানন্দ গ্রামীণ জীবনের নিসর্গতন্ময়তা ও ইন্দ্রিয়জচেতনা থেকে উৎচ্ছিন্ন হয়ে নাগরিক অস্থিরতায় তাঁর কবিতার জগৎকে খুঁজছেন, তখন যুদ্ধ, দাঙ্গা ও খণ্ডিত স্বদেশ তাঁর চেতনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে এক বিধ্বস্ত নাগরিক প্রেক্ষাপটে;—

নাগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোন মরণের কাছে।
আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চলে যায় যে কাহার স্বর্গের সন্ধানে,
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই—পথ নেই বলে,
যথাস্থানে থেকে খসে তবুও সকলই যথাস্থানে

রয়ে যায়—শতাব্দীর শেষ হলে এরকম
অবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে—বিকালের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নর-নারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে;
খণ্ডহীন মডেলের মতো বেলোয়ারি।

... ...

রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ,
কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?
মহাসাগরের জল কখনো কি সৎবিজ্ঞতার মতো হয়েছিল স্থির—
নিজের জলের ফেনশিব
নীড়কে কি চিনেছিল তনুবাত নীলিমার নিচে?

(বিভিন্ন কোরাস/সাতটি তারার তিমির)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সারাবিশ্বের রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তরের সূচনা হয়। এ সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এক কঠিন চাপের সম্মুখীন। ভারতে ও ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ চাপের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক চাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা নেয়। এ আন্তর্জাতিক চাপের মূলে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন। যুদ্ধে জয়লাভ করলেও অর্থনীতিকভাবে ব্রিটেন খুব নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ব্রিটেনকে বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। এসব রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাংলা আধুনিক কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছিল, তা জীবনানন্দের কবিতায় দেখতে পাই।

পশ্চিম প্রেতের মতো ইউরোপ
পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা
ইয়াঙ্কির লেন-দেন ডলারে প্রত্যয়—
এইসব মৃত হাত তবে
নব নব ইতিহাস উন্মেষের নাকি?

যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক মন্দার ফলে গ্রামবাংলার বিপন্ন কৃষক সমাজ ও ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে প্রতিফলন জীবনানন্দের কবিতায় ছায়া ফেলেছিল। অথচ সে ব্যাপারে জীবনানন্দের কবিতা বিশ্লেষণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায় না। 'রোমান্টিক' থেকে 'অবক্ষয়ের' কবিতার কবি বলেই সিলমোহরের ছাপ পড়ে যাওয়া কবি জীবনানন্দ। আবার কখনো কখনও প্রকৃতির কবি বলে তাঁর সজীব ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিশ্লেষণ, কিন্তু জীবনানন্দই একমাত্র কবি, তখন বাংলার গ্রামগুলির ভূমি ব্যবস্থার চরম বিপর্যয় কবিতাতে তুলে ধরেছেন :

আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিড্‌লম্যানদের কাছে পর নয়।
আমাদের গড়পড়তার সব পড়তি কৌতুক
তাহারা বেহাত করে ফেলে সব।

(সোনালি সিংহের গল্প/সাতটি তারার তিমির)

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পর গ্রাম-বাংলার ব্যাপক জমি হস্তান্তরিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ক্ষিতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক সমীক্ষায় জানিয়েছিলেন, ১৯৪৩-এ দুর্ভিক্ষের প্রভাবে প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল ১৫টি দুর্গত অঞ্চলে। গ্রামীণ অর্থনীতি তখন ভেঙে পড়েছে। কৃষি ব্যবস্থায় এলোমেলো অবস্থা এবং গ্রাম-জীবনে ঢুকে পড়েছে এক মানবিক দূষণ।

নিরন্ন বছর নামে—
বর্গাদার—মহাজন—প্রজার মহলে
হুলুস্থুল পড়ে যায়;
এখানে ভাগচাষ—শহরের হুন্ডি-ঠিকাদার
ভূশণ্ডির মাঠ—ঘাঁটি—বারভূঞাদের ভূত-ব্যবচ্ছেদ-শব—
হাতুড়ে ডাক্তার—
ফিসফিস ষড়যন্ত্র-রাস্তায় কানাচ—
এইসব সূর্যের চেয়েও বেশি—বালুকার আঁচ :
এরা সব হুলুস্থুল করে যায়।

(নিরীহ, ক্লান্ত ও কর্মন্বেষীদের গান/কৃত্তিবাস পত্রিকা, ১৯৭৮)

এছাড়া সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু, পতনোন্মুখ বাংলার গ্রাম-জীবন, যা ১৯৪৬-৪৭-এর সময় থেকে এক নতুন আর্থ-সামাজিক দিকে মোড় নিয়েছিল, গ্রামের নিরুদ্বেগ জীবনে এসেছিল এক শিকড়চ্ছিন্ন জীবনের আবর্তন। তখন জীবনানন্দের কবিকণ্ঠে এক ভিন্নতর উচ্চারণ (Diction), যা বাংলা তৎকালীন আধুনিক কবিদের থেকে সম্পূর্ণ-ব্যতিক্রমী, যেন সমস্যার ভেতর থেকে দ্যাখা এক ইতিহাসের ট্রাজিক বিবর্তন।

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
সূর্য অস্তে চলে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে?
আলুলায়িত হয়ে চেয়ে থাকে—
কিন্তু কার তরে?
হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা,
পটলচেরা চোখের মানুষী
হতে পেরেছিল প্রায়; নিভে গেছে সব।

(১৯৪৬-৪৭/বেলা-অবেলা কালবেলা)

জীবনানন্দের '১৯৪৬-৪৭'-এর কবিতার প্রথমদিকে দেখতে পাই নাগরিক জীবনের মূল্যবোধহীন আর্থ সর্বস্ব সুযোগ সন্ধানী শ্রেণীর ইঁদুর দৌড়। সমাজের স্কবন্ধ ভোগবাদ, যা বহুকে বঞ্চিত করে কয়েকজনের জন্যে সুযোগের দরজা খুলে দেয়;—প্রাপ্তির জন্যে চলে হুলুস্থূল; এ কবিতায় শ্রেণী চরিত্রের উন্মোচন। আধুনিক বাংলা কবিতায় এভাবে শ্রেণী-চরিত্রকে উন্মোচিত হতে কম দেখা যায়।

দিনের আলোয় এই চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা;
পথে ঘাটে ট্রাক ট্রামলাইনে ফুটপাতে;
কোথাও পরের বাড়ি এখনি নিলাম হবে—মনে হয়,
জলের মতন দামে।
সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছুবে
সকলের আগে সকলেই তাই।
অনেকেরই ঊর্ধ্বশ্বাসে যেতে হয়, তবু
নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব—অথবা যা নিলেমের নয়
সে সব জিনিস
বহুকে বঞ্চিত করে দু'জন কি
একজন কিনে নিতে পারে।

পৃথিবীতে সুদ খাটে; সকলের জন্যে নয়। অনির্বচনীয় হুন্ডি একজন দু'জনের হাতে। পৃথিবীর এসব উঁচু লোকদের দাবি এসে সব-ই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।

(১৯৪৬-৪৭/বেলা অবেলা কালবেলা)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ও ফ্যাসিবাদের কফিনে পেরেক ঠোকার কাজ এক-ই সময় সমাপ্ত হলো। ভারতের মাটিতে এক নতুন রাজনৈতিক কালপর্বের সূচনা হয়েছিল। যদিও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এক অদ্ভুত মন্তব্য করেছিলেন—'১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের-ই সমাপ্তি সূচিত করেছিল—এ মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছিল প্রায় সিকি শতাব্দী আগে।' কিন্তু ঘটনার একটা বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা যায়। ভারতে তখন কমিউনিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকসভার প্রাধান্য পাচ্ছিল জনচিত্তে। এ সময় আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন, নৌবাহিনীর জাহাজীদের বিদ্রোহ, শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট, জঙ্গী কৃষক সংগ্রামের ডাক।

মধ্যবিত্ত জীবনের এক দোলাচল অবস্থা। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের আগে থেকেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সংকট দেখা দিয়েছিল। দু'টি মহাযুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে শোষণের প্রতিভূ হিসেবে; জীবনানন্দের কবিতাতে কি তার প্রতিধ্বনি আমরা পাই না;

দুইটি বৃহৎ কুরুক্ষেত্র এই পৃথিবীর পরে
আধো অসমাপ্ত হয়ে মানুষের মনে

মিশে আছে আজ এই বিকেলের
আলোর ভিতরে।

একটি কৃষক তার হৃদয়ের কঠিন স্পন্দনে দাঁড়ায়েছে এই কালে মহা সূর্যাস্তে মুখোমুখি।

শববাহকের কাঁধে একজন বুর্জোয়ার মৃত্যু
চলে যায়। (১৯৪১)

জীবনানন্দ উপলব্ধি করেছেন তাঁর অবস্থানকে, এক নষ্ট পৃথিবীতে, আর একটি পৃথিবীর দাবি করেছেন। কারণ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাই বলতে চেয়েছেন;—

একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির করে নিতে সময় লাগে
সকালের আকাশের মতন বয়স
সে সকাল কখনো আসে না ঘোর,
স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।

(বিভিন্ন কোরাস; দুই মহাপৃথিবী)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সমাজ-সচেতনতার কাব্যিক প্রকাশ হয়তো কখনই স্পষ্ট উচ্চারিত হয়নি। পরাবাস্তবমুখী কবিগণ ও মনন অনেকক্ষেত্রে ভাষা, চিত্রকল্প, উপমা প্রভৃতি এক আলো-আঁধারির জাফরিতে ঢাকা। তবু জীবনানন্দ সময়চেতনার কবি এবং যথার্থ আধুনিক সময় মানসিকতার কবি। বাঙালি পাঠক সমাজে তিনি সবচেয়ে অপব্যাখ্যাত এক বিড়ম্বিত উত্তরাধিকারহীন কবি। যাঁকে সমকালে সব রকম কাব্য আন্দোলন থেকে ভিন্নবোধ বিচ্ছিন্ন করেছিল, তাই কি তিনি একক ও নির্জনতম কবি? নাকি রোমান্টিক বাঙালি পাঠক মানসে সময়চেতনা দুর্বোধ্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল, কাব্যের তথাকথিত লাবণ্য হারানো সংশয় আত্মপীড়িত উচ্চারণই জীবনানন্দ দাশের পরিণত সকল উত্তরণ, বাংলা আধুনিক কবিতায় যার সার্থক মূল্যায়ন আজো হয়নি।

জীবনানন্দের মৃত্যু-ভাবনা

রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের আকাশে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম জীবনানন্দ। শিক্ষা ও অধ্যাপনা সূত্রে ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় তাঁর মানসলোককে আলোকিত করেছে মাত্র, অনুচিকীর্ষা জাগায়নি। তবে মাঝে মাঝে তাঁর ভাবনা, বোধ ও প্রকাশ একাধিক ইংরেজ কবির সান্নিধ্যে এসেছে। এতে যদি কেউ মনে করেন, জীবনানন্দের স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাহলে বলতে হবে তিনি ভ্রান্ত।

রোম্যান্টিক কবি জন কীট্‌সের সঙ্গে জীবনানন্দের সাযুজ্য চোখে পড়ার মতো। এই দু'কবির-ই জীবনের পথরেখা প্রায় এক। স্বীকৃতির তীর্থে পৌঁছাবার আগে বিদ্রূপ, অবজ্ঞা, উপেক্ষার কাঁটাগাছের দামাল বিস্তারে সে-পথ বারবার বিপন্ন হয়েছে। তথাপি দু'জনের একনিষ্ঠতা, কাব্যের সঙ্গে আত্মিক যোগ, জীবন ও কল্পনার স্বচ্ছন্দ বয়ন ও আত্মসমীক্ষায় অলৌকিক অতিক্রমণ—এ সবই নিঃসন্দেহে দেবতাদের কাছেও বরণীয়। প্রকৃত কাব্য যদি হয় 'that synthesis of fantasy and reality achieved through suffering, and self Knowledge, তাহলে সে কাব্যের কবি বলতে হবে এঁদেরই।

কীট্‌সের লক্ষ্য : 'I wish to give myself up to other sensations.' এবং 'I wish to devote myself to another verse.' জীবনানন্দও তেমনই নতুন কিছুর সন্ধানী শিল্পী—

> 'একদিন শুনেছ যে সুর—
> ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোন এক নতুন কিছুর
> আছে প্রয়োজন,
> তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
> আর নাই কেউ।
> ... ...
> আমার পায়ের শব্দ শোনো,—
> নতুন এ,—আর সব হারানো—পুরানো।'

[কয়েকটি লাইন, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

কবি মাত্রই সংবেদনশীল। প্রতি মুহূর্ত তাঁকে তাড়না করছে 'Pains of turning blood into ink'। প্রকৃতি প্রেম ও রূপের বিলাসে মগ্ন থাকতে থাকতে তিনি দেখেন চাওয়া-পাওয়ার অঙ্কের হিসেবে গরমিল, স্বপ্নে অতৃপ্ত মন ভূমার জন্য আর্ত, বাইরের ও

ভেতরের অভিজ্ঞতার বলয়ে ভূমিকম্পের প্রকোপে নিয়ত ভাঙা-গড়ার প্রবহমান প্রক্রিয়া। তার ওপরে আছে কালের চক্রের ধ্বনি :

> "At my back I always hear
> Time's winged chariot hurrying near."

স্বাভাবিকভাবেই কবির সৃষ্টির তালুকে অনুপ্রবেশ করে হিমেল অবসাদের বিষণ্ন বাতাস, তাঁর অনুভূতিগুলো হেমন্তের ঝরা পাতার মিতালির জন্য কাঙাল হয়। হারানোর বেদনা, ক্ষয়, লয় ও বিনষ্টির চেতনা কবিচিত্তকে আতুর করে তোলে। এগুলোই মিলেমিশে যা তৈরি হয়, তার-ই নাম মৃত্যু-চেতনা। সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, প্রকট-মৃত্যুর ঘোষণা হয় তো থাকে না, তবে এমন একটা ক্ষয়-লয়ের বোধ কবির সৃষ্টির শরীরের সঙ্গে লেপ্‌টে থাকে, যা পাঠকের মনের তন্ত্রীকে নির্ভুলভাবে আহত করে। পাঠকের সজাগ উপলব্ধি হয়—কবির কল্পনার জলাধারে খলবল করছে, ঝিলিক মারছে এক ঝাঁক মাছ, মৃত্যু-চেতনার টুকরো টুকরো অংশ।

প্রকৃতি, নারী ও বোধ—এ তিনই জীবনানন্দের প্রায় তিন দশকব্যাপী কবি-জীবনের সৃষ্টিকর্মের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। তাঁর মৃত্যু-ভাবনা প্রায় ছায়ার মতো এ তিন মৌল বিষয়কে অনুসরণ করে এসেছে। প্রায় প্রতি কবিতায় মৃত্যুর উল্লেখ কোনও-না-কোনও ঠাঁটে উপস্থিত—কখনও স্পষ্ট উচ্চারণে, কখনো বা তির্যক প্রতীকে।

> 'জীবন মরণ দুয়ারে আমার, কারে যে বাসিব ভালো!'

[ঝরা পালক]

> 'তরুণীর দুধ-ধবধবে বুকে সাপিনীর দাঁত উঠেছে রেঙে।'

[ঝরা পালক]

> 'ঘুমন্ত বাঘের বুকে বিষের বাণের মতো বিষম সে-ক্ষত!'

[ধূসর পাণ্ডুলিপি]

> 'একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব,
> আমার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?'

[বনলতা সেন]

> 'সমস্ত পৃথিবী ভরে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস
> দোলা দিয়ে গেল কবে!—বাসি পাতা ভূতের মতন
> উড়ে আসে! কাশের রোগীর মতো ধুঁকে মরে মানুষের মন!'

[ধূসর পাণ্ডুলিপি]

শেলির Ode to the West Wind-এ এই উদ্ধৃত শেষ তিন পংক্তির যেন ইশারা পাই—

> Thou, from whose unseen presence
> the leaves dead
> Are driven, like ghosts from an
> enchanter fleeing,
> Yellow, and black, and pale, and

Hectic red,
Pestilence-stricken multitudes :'

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'আদিম দেবতারা' কবিতায় দেখতে পাওয়া যায় সমকালীন যুগের আবহাওয়ায় সৌন্দর্যের বিনষ্টি দেখে এবং মূল্যবোধের ক্রমশ অবলুপ্তির অভিঘাতে কবি নিরাশ, অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন।

'স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে

ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল; আদিম দেবতারা
হো-হো করে হেসে উঠলো :
'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়?'
কবির উপলব্ধি হচ্ছে—
'পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির
মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো'

এবং তিনি ও তাঁর প্রেয়সী দুজনই বদলে যাচ্ছেন, হারিয়ে যাচ্ছেন—

'স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছো;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের
ছায়ার ভিতর।'

'ধূসর পাণ্ডুলিপির' '১৩৩৩'-এ-ও কবির ক্লান্তির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়—

'ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি—
পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে'

এ বেদনাপীড়িত পংক্তির উচ্চারণে Shelley-র বেদনার্ত হাহাকার যেন ধ্বনিত হচ্ছে—

"I tall upon the thorns of life! I bleed!"

ছায়ায় ঘেরা নিজের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ অনুভব করেন, 'একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে'। নতুন পৃথিবীটাকে মানিয়ে নিতে গেলে, তার মূল্যবোধের দাবি মেটাতে গেলে লাগে নতুন অভ্যাস, নতুন দৃষ্টি। কিন্তু সময় তো দাঁড়িয়ে নেই; বয়স যে শরীর ও মন জীর্ণ করতে করতে ফুরিয়ে যাচ্ছে। 'আরেকটি পৃথিবীর দারি/ি্র করে নিতে গেলে লাগে/সকালের আকাশের মতন বয়স।'

কবি নিজের যুগকে পরিচিত করেছেন ব্যাঘ্র-যুগ বলে। সে যুগ যান্ত্রিক, মানবতাহীন, প্রেমছুট।

'ব্যাঘ্র-যুগে শুধু মৃত হরিণীর মাংস পাওয়া যায়।'

এই যখন পরিস্থিতি, তখন কোনো কোনও মুহূর্তে কবির উচ্চারণে আমরা শুনতে পাই রাত্রির অন্ধকারের কাছে, মৃত্যুর কাছে আশ্রয় নেবার অভিলাষের কথা। 'হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে' ঘুমাতে চেয়েছেন তিনি।

"ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—
ধীরে—পউষের রাতে—
কোনোদিন জাগব না জেনে—
কোনোদিন জাগব না আমি—
কোনোদিন আর!'

অথবা

'মৃত্যুরে বন্ধুর মতো ডেকেছি তো—
প্রিয়ার মতন!—'
এখানে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের
'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।'

অথচ 'শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ' কবি-নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন, 'ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের' পরে হাত রেখেছেন, 'সন্ধ্যায় কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায়' ঘরে ফিরেছেন। অর্থাৎ জীবন-প্রীতির আকর্ষণও যথেষ্ট। নতুন মুহূর্ত জন্মাচ্ছে; তবে জন্মলগ্নেই তার মৃত্যুঘণ্টা বাজছে। এ যেন ববার্ট হেরিকের 'We die,/As your hours do, and dry/Away'। জীবনের দেহে নিত্য হাত বোলাচ্ছে হিমেল মৃত্যু।

'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে
হয়েছে হলুদ
... ...
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের
মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ।'

জীবন-বাসনা ও মৃত্যু-বাসনা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিকে এক সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়েছে। প্রতীক হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন হেমন্ত ঋতুকে। সময় গোধূলি—দিন ও রাত্রি যেখানে হাত মিলিয়েছে। জীবনানন্দের হেমন্ত কীট্সের Autumn থেকে আলাদা। ইংরেজ কবির ঋতুটি রসালো, শাঁসালো, পরিতৃপ্ত, নিশ্চিন্ত, পরিপূর্ণ ও প্রশান্ত। জীবনানন্দের হেমন্ত গর্ভবতী জননীর মতো :

'আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝরে পড়ে তার
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে।'

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'আট বছর আগের একদিন, জীবনানন্দের মৃত্যু-ভাবনার এক শিহরণ জাগানো দিক। কবিতাটিতে আছে একজন মানুষের আত্মহননের কাহিনী। পঞ্চমীর চাঁদ ফাল্গুনের রাতের আঁধারে ডুবে গেছে। বিছানায় ঘুমন্ত স্ত্রী ও শিশুকে ফেলে মানুষটি সহসা উঠে পড়লো। তার মনে হলো, বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তখনই 'একগাছা দড়ি হাতে' সে একা একা অশ্বত্থ গাছের কাছে গিয়ে উদ্‌বন্ধনে আত্মহত্যা করলো। এরপর প্রশ্ন—কেন মরলো লোকটা? কীসের দুঃখে, কীসের ব্যর্থতায়? ওর তো সবই ছিল। তার সংসারের আনাচে-কানাচে

তো কোনো না-পাওয়ার বেদনা ছিল না। নারীর হৃদয়, প্রেম, শিশু, গৃহ, অর্থ, কীর্তি, স্বচ্ছলতা তার জীবন ভরিয়ে রেখেছিল। তবে কেন তার এ আত্মহনন? কবির ব্যাখ্যাস্বরূপ উত্তর—

'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;
...   .
তাই'

এ লোকটি একটু অসাধারণ। যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের, সে-জীবনের সঙ্গে মানুষের দেখা হয় না। একথা জেনে সে আত্মহত্যা করেছে! পশু-পাখির জীবন ও ধর্ম কখনো চৈতন্যশীল মানুষের জীবন ও ধর্ম হতে পারে? প্রাত্যহিকতার স্থূল প্রাপ্তি সেই অসাধারণ মানুষটির মহৎ জীবন-ক্ষুধাকে প্রতি মুহূর্ত গলা টিপে আক্রমণ করতো, আর তার ফলে প্রতি পলে 'বিপন্ন' বোধ করতো তার মহৎ জীবন-তৃষ্ণা, যার আর এক নাম 'বিস্ময়'। তাই এ আত্মহনন। সাধারণের চেনা যে-মৃত্যু এ মৃত্যু, তা নয়। এ মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয়। এ মৃত্যু বরণীয় বাহন, যার সাহায্যে লোকটি চির-অব্যয় অনাহত বিস্ময়ের রাজ্যে গিয়ে পা রাখতে পেরেছে। এ আত্ম-অতিক্রমণেরই স্বাক্ষর বুকে নিয়ে আছে কবিতাটি।

জীবনানন্দের মৃত্যু-ভাবনাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে তাঁর অখণ্ড দেশকালের চেতনা। এ চেতনার আলোয় দেখা বস্তুজগতের বিভেদ-চিহ্নগুলি সতত অপসৃয়মান। জীবনের রূপ ক্ষণকালের আলোয় নির্দিষ্ট আকার পেয়ে প্রতিভাত হলেও নিত্যকালের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ত রূপান্তরিত হচ্ছে। সে কারণেই কবির অনুভূতি বহুমাত্রিক ও বহুতল এবং সাবয়বত্ব ও অনবয়বত্ব কবির শিল্পকর্মে হাত ধরাধরি করে চলেছে। ফলে 'কেবল-দৃশ্যের জন্ম হয়'।

জীবনানন্দ সেই কবি, যাঁর মধ্যে 'একটি-পৃথিবীর অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয় এবং ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।' তিনি তাত্ত্বিক দার্শনিক নন, নন বিজ্ঞানীও। মৃত্যু-চেতনাকে নিত্য সাথী করে ইন্দ্রিয়ানুভূতির পঞ্চপ্রদীপের আলোয় 'জীবনের সমুদ্র সফেন' পাড়ি দিয়েছেন। কীট্‌সের মতোই তিনি বলিষ্ঠ বোধ ও কল্পনার হাত ধরে আত্ম-অতিক্রমণের পথের পথিক। জীবনানন্দ বাংলা কাব্যে এক পরম বিস্ময়। তাঁর যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন ও মৃত্যুকে তিনি একীভূত করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই যুগপৎ ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তিনি আমাদের অভিভূত করে গেছেন, অনুগত করে গেছেন।

'জেগে জেগে যা জেনেছ,—জেনেছ তা—
জেগে জেনেছ তা,
নতুন জানিবে কিছু হয় তো বা
ঘুমের চোখে সে!
সব ভালোবাসা যার বোঝা হল
—দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে!'   ['জীবন' : ধূসর পাণ্ডুলিপি]

‘চিত্ররূপময়’

দীপ্তি ত্রিপাঠী

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে বলেছিলেন—‘চিত্ররূপময়’। প্রশ্ন এই, তিনি কোন ধরনের চিত্র এঁকেছেন? তিনি কি এঁকেছেন ক্লাসিক রীতিতে, যেমন দেখি গ্রিক পাত্রে (Vase), অথবা গথিক রীতিতে যেমন দেখি মধ্যযুগীয় গির্জার চিত্রিত কাঁচে (Stained Glass), অথবা রেনেশাঁস রীতিতে যেমন দেখি দা ভিঞ্চির ভার্জিন অব দি রক্‌সে—পরিপ্রেক্ষিতের আবিষ্কারে প্রাণবন্ত? তিনি কি এঁকেছেন দিব্যজীবন রাফায়েলের মতো অথবা মানব প্রতিকৃতি রেম্‌ব্রান্টের মতো?

জীবনানন্দের কবিতা পড়তে-পড়তে ইমপ্রেশনিস্টদের ছবির কথাই মনে হয়। যে-দৃশ্য শিল্পী আঁকছেন, তা যেন তিনি ঝলকে দেখে নিয়ে রং, আলো, ছায়া যেমনটি দেখেছেন তেমনটি এঁকে বসিয়ে দিতে চান। এজন্যই এ-ছবিগুলির খণ্ডাংশের কোনো অর্থ হয় না, সব মিলিয়ে একটা সামগ্রিক আবেদন (Total Effect) সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য।

ইমপ্রেশনিস্ট ছবি যেমন কাছ থেকে কিছুই বোঝা যায় না, দূরে গেলেই তার আদ্যন্ত রূপটি অকস্মাৎ ভেসে ওঠে, আর তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় একটা আলো—কখনো স্নিগ্ধ, কখনো প্রভাময়—জীবনানন্দের কাব্যের স্বরূপটিও তেমনি। তাঁর কবিতা হঠাৎ পড়লে মনে হয়, কিছু বোঝা গেল না, অসংলগ্ন ছেঁড়া-ছেঁড়া রেখার টানের মতো, কিছুটা হয়তো বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করে, কিন্তু কবিতা পাঠের শেষে একটা গুঞ্জন মনের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে। সেই গুঞ্জন-ই শেষ পর্যন্ত রেখাগুলিকে সংলগ্ন করে পৌঁছে দেয় অর্থের উপকূলে।

দ্বিতীয়, ইমপ্রেশনিস্টদের মতোই কবির সৃষ্টির পটভূমিকা খোলা আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র। যে-প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে রাত্রি থেকে ভোরের আলোয়, ধূসর গোধূলি থেকে সন্ধ্যার গভীরে, কবি কত তাড়াতাড়ি তাদের রূপটি ধরে রেখেছেন ইমপ্রেশনিস্টদের দ্রুত সোজা টানের মতো, সুমিত ভাষার বা প্রকরণের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কৌশলের প্রতি খরদৃষ্টি না রেখেই। সবুজ পাতার হলুদ হয়ে আসা, হেমন্তে চিলের সোনালি ডানার খয়েরি ছোপ-ধরা, ‘সেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হিরে হয় ঘের—’ কিছুই জীবনানন্দের দৃষ্টি এড়ায়নি।

তৃতীয়ত, ইমপ্রেশনিস্টদের মতোই সাধারণ বলে কোনো বস্তুকে তিনি অবহেলা করেননি, বরং তার প্রতি কবি একটা আকর্ষণ অনুভব করেছেন। দেশজ এবং গদ্যগন্ধী

শব্দের নিরঙ্কুশ ব্যবহার যদিও আধুনিকতার লক্ষণ, তবুও তা এ কারণে গৃহীত হয়েছে। শরীর, শেমিজ, থুতনি, গাড়ল প্রভৃতি সাধারণ মৌখিক ভাষার শব্দ অতি সহজেই তিনি ব্যবহার করেছেন। এমনকি ইংরেজি শব্দের ব্যবহারেও কত তুচ্ছ বস্তু তিনি গ্রহণ করেছেন, যেমন—রবারের বল, গ্যাসলাইট, লেন্‌স, ফসফরাসেন্স ইত্যাদি। এসব শব্দেই প্রাত্যহিক ব্যবহারের গন্ধ। বিষ্ণু দে-র মতো দেশী-বিদেশী পুরাণের বা সাহিত্যের উল্লেখ দিয়ে কবিতাগুলিকে মহৎ হবার মর্যাদা তিনি কোথাও দান করেননি। তাঁর 'মাঠের গল্প', 'ঘাস', 'বেড়াল', 'আট বছর আগের একদিন' প্রভৃতি কবিতাগুলির কথা স্মরণ করলেই ওপরের বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে। এমনকি কাব্যস্মৃতিও (Allusion) যখন তিনি ব্যবহার করেছেন, তখনো অতি সাধারণ রূপকথার শঙ্খমালা বা কঙ্কাবতীর চেয়ে বড় কোনো মহিমাময়ীকে দেখি না।

চতুর্থত, আঙ্গিকের দিক থেকে ধ্রুপদী শিল্পীদের সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল শৈলীর অনুকরণ না করাই ছিল ইমপ্রেশনিস্টদের লক্ষ্য। জীবনানন্দের ছন্দ এবং শব্দ সম্বন্ধে অসাধারণ দখল থাকা সত্ত্বেও তাঁর পয়ারের বিস্তৃতির মধ্যে এমন একটা এলানো-ছড়ানো ভাব আছে, যার জন্য এ দৃঢ়বদ্ধতা দেখানো অসম্ভব। এমনকি যখন তিনি সনেট লিখেছেন, তখনো তাকে বাইশ বা ছাব্বিশ মাত্রার বিস্তৃতি দিয়েছেন। অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে, বক্তব্যের দাবিতেই এমন ধরনের ছন্দ রচনা অপরিহার্য ছিল এবং কথ্যরীতি ও কাব্যরীতির যে-মিশ্রণ আধুনিক কবিদের প্রধান লক্ষ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও এমন ছন্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর চিত্রধর্মের ইমপ্রেশনিজ্‌ম এ-কারণে আরো বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কবিতাগুরির মধ্যে তার প্রাকৃতিক পটভূমিকার মতোই একটা অস্পষ্টতা শেষ পর্যন্ত থেকে গেছে, যেমন আছে টার্নারের কোনো সমুদ্রের দৃশ্যে বা হুইসলারের নকটার্ন বা রাত্রির রূপায়ণে অথবা মোনের সাঁ লাজ্যয়ার স্টেশনের আলেখ্যে।

পঞ্চমত, ইমপ্রেশনিস্টদের মতো রূঢ় বৈপরীত্য সৃষ্টি জীবনানন্দের আর-একটি বৈশিষ্ট্য। 'ক্যাম্পে' কবিতায় নম্র জ্যোৎস্নায় মিলনাতুর হরিণ ও ঘাই হরিণীর কামনার রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেই কবি দেখিয়েছেন, সেই হরিণের-ই স্বাদু মাংস শিকারীদের ডিশে পরিবেশিত হয়েছে। অথবা 'বনলতা সেন'-এর 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতাটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কবি বর্তমান যুগের ম্লান পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে স্মরণ করেছেন কমলালেবু রঙের রোদ, তরমুজ মদ ও রক্তাভ স্বেদ—সেই অতি উজ্জ্বল রূগ-রস-গন্ধ-স্পর্শের হারানো জগৎকে।

কিন্তু ইমপ্রেশনিস্টদের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হলো আলো-ছায়ার স্বরূপ প্রকাশ। চোখের দেখায় তাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা বিশ্বাস করেননি পূর্বপোষিত ধারণাকে। স্টুডিওর বদ্ধ ঘরে স্কাই-লাইটের আলোয় যে-রূপ দেখা যায়, বিস্তীর্ণ আকাশের অজস্র আলোর তলায় সে-রূপ অন্য রং নেয়। আকাশে মেঘের আনাগোনায় সূর্যের রং পর্যন্ত কখনো মলিন কখনো উজ্জ্বল হয়; দ্বিপ্রহরে নদীর পরপারে যে-তীরভূমি সবুজ দেখায়, গোধূলির পড়ে-আসা আলোয় তা হয়তো হয়ে ওঠে বেগুনি। যাঁরা সেজানের ল্যান্ডস্কেপ দেখেছেন, তাঁরা এ-উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করবেন। জীবনানন্দ এভাবেই তাঁর

কবিতায় আলো-ছায়ার রূপটি এঁকেছেন। বদ্ধ ঘর নয়, তাঁর পশ্চাতের পটভূমিকা হলো ইমপ্রেশনিস্টদের মতোই বিস্তীর্ণ, মুক্ত প্রকৃতি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায়—'অন্তরের গহন গোপন মহারহস্য আবিষ্কার করতে হলে মাঝে মাঝে এসে বসতে হয় সমুদ্রের তীরে কিংবা খোলা আকাশের নিচে। আমাদের জীবনে জীবনানন্দ সেই সমুদ্রতীর, সেই অনবরুদ্ধ দীপ্ত আকাশ।'[১] এ-কথা প্রত্যক্ষভাবে সত্য। এ আলো কোনো কবিপ্রসিদ্ধি অনুসরণ না করেই কবির একান্ত ব্যক্তিগত চোখের আলো, আপন অভিজ্ঞতার রঙে রঙিন।

জীবনানন্দের কাব্যে আলোর প্রকাশ ত্রিবিধরূপে দেখা যায়।

যাকে আলংকারিকেরা স্বভাবোক্তি অলংকার বলেন, অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন আলো, যেমন—রোদ, জ্যোৎস্না, তারার আলো প্রভৃতির বর্ণনা। এ-ক্ষেত্রেও তিনি কবিপ্রসিদ্ধি অনুসরণ করেননি। ইমপ্রেশনিস্টদের মতো কখনো তাঁর চোখে ভোরের আলো সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে, কখনো বা নীল।

(ক) কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা :

('ঘাস', 'বনলতা সেন')

(খ) ভোর;
আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল;

('শিকার', ঐ)

রোদের রং কখনো রাঙা, কখনো কমলা ('নগ্ন নির্জন হাত'), কখনো নটকানরক্তিম ('জুহু'), কখনো স্ফটিকবর্ণ ('মনোসরণি')। বেলা বাড়ার সঙ্গে রোদের উত্তাপও বৃদ্ধি হয়, আবার তার রং বদলায়—জীবনানন্দের কাব্যে তার প্রতিটি স্তর-ই যেন বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল!

('অবসরের গান', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

তার পরের স্তবকে :

মাঠে মাঠে ঝরে পড়ে কাঁচা রোদ,—ভাঁড়ারের রস?

প্রথম সকালের আলো ধীরে-ধীরে বেলা বাড়ার দিকে চলেছে এ হেন আমরা স্বচক্ষে দেখলুম।

দুপুরের রং কখনো মেঘমলিন ভিজে ('হায় চিল'), কখনো কমলা ('আবহমান'), সূর্য কখনো সোনার বলের মতো ('গোধূলি সন্ধির নৃত্য'), কখনো যেন স্বর্গীয় পাখির ডিম ('নাবিক')। চাঁদ হেমন্তের সন্ধ্যায় বরফের ফোয়ারার মতো ('মাঠের গল্প'), ফাল্গুনের সন্ধ্যায় সোনার ডিমের মতো ('আমি যদি হতাম')। জ্যোৎস্না কখনো নম্রনীল ('মৃত্যুর আগে'), কখনো হলুদ-হলুদ ('শব')। তারাদের দেখে কখনো কবির মনে হয় :

---

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—'ময়ূখ' জীবনানন্দ সংখ্যা পৌষ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

নীল আকাশের খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো
('আমি যদি হতাম', 'বনলতা' সেন')

কখনো মনে হয় 'রূপালি আগুন ভরা' ('আকাশলীনা')। শুধু সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র নয়, আরো কত আলো আছে। জোনাকির আলো, উল্কার আলেয়া, মোমের আলো, গ্যাসলাইট, সৈন্যদের মশালের রং, রক্তিম চিতার আগুন, সব-ই কবির কাব্যে স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রেম, হতাশা, স্মৃতি, প্রেরণা, জীবন, মৃত্যু প্রভৃতি ভাবনা ও অনুভূতিকে আলোর মাধ্যমে দেখা। প্রেমকে তিনি বলেছেন 'মণিকা-আলো' ('মিতভাষণ') :

আরে আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।
('সুরঞ্জনা', ঐ)

প্রিয়ার শরীরকেও তিনি আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন :

এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীব; ('সুদর্শনা', ঐ)

প্রেমের ব্যর্থতা নিবন্ত আলোর মতো, খসে-যাওয়া নক্ষত্রের মতো:

যে আগুন উঠেছিল তাদের চোখের তলে জ্বলে
নিভে যায়—ডুবে যায়—তারা যায় স্খলে!
... ...
নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝরে—[১] ('নির্জন স্বাক্ষর', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

প্রেমের হতাশা উল্কার আলেয়ার মতো সর্বনাশী :

তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে,—কতদূরে!
কোন সমুদ্রের পারে, বনে—মাঠে—কিম্বা যে আকাশ জুড়ে
উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে!—
('সহজ', ঐ)

প্রেরণাকেও তিনি আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সে কখনো বিদ্যুতের মতো—

হে ক্ষমতা,—বিদ্যুতের মতো তুমি সুন্দর—ভীষণ!
('জীবন', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

কখনো আগুনের মতো :

সোনালি আগুন
চুপে জলের শরীরে

১. তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ, 'তারকার আত্মহত্যা', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'

নড়িতেছে—জ্বলিতেছে—মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে আগুন জ্বলে যায়—দহে নাক' কিছু।
সে আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্বলে যায়—দহে নাক' কিছু।[১]

('একটি কবিতা' 'সাতটি তারার তিমির')

জীবনকে তাঁর মনে হয়েছে :

দুই শব্দহীন শেষ সাগরের
মাঝখানে কয়েক মুহূর্ত এই সূর্যের আলো :

('পৃথিবীতে এই', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

আবার মৃত্যুও আর-এক রহস্যময়ী আলো :

আরো এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির:

('মৃত্যুর আগে', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

তৃতীয়ত, তাঁর ইতিহাসচেতনা এবং সমাজচেতনাও অনেক ক্ষেত্রে আলোর প্রতীকে প্রকাশ পেয়েছে। সময়কে তাঁর মনে হয়েছে জোনাকির আলোকের মতো :

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :

('হাজার বছর শুধু খেলা করে', 'বনলতা সেন')

যুগপরিবর্তনকে দিনের বিভিন্ন অহ্নের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি দেখেছেন :

অনন্ত রৌদ্রের থেকে তারা
শাশ্বত রাত্রির দিকে তবে
সহসা বিকেলবেলা শেষ হয়ে গেলে
চলে যেত কেমন নীরবে।
চারিদিকে ছায়া ঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র;
মধ্যযুগের অবসান
স্থির করে দিতে দিয়ে ইউরোপ গ্রিস
হতেছে উজ্জ্বল খ্রিস্টান। ('সবিতা', 'বনলতা সেন')

বর্তমান যুগসংকটকে তিনি দেখেছেন অপরাহ্নের প্রতীকে।

(ক) বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নর-নারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে;
খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।

('বিভিন্ন কোরাস', 'সাতটি তারার তিমির')

১. এখানে 'Burning Bush'-এর চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে

(খ) এ বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময়!

('সৃষ্টির তীরে', ঐ)

শুধু অপরাহ্ন নয়, শ্মশানের চিতার আলো এবং রাত্রির সঙ্গেও তুলনা করেছেন।

শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে;

('পিরামিড', 'ঝরা পালক')

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে তাঁর মনে হয়েছে সর্বধ্বংসী আগুন:
এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে;
কী এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন!

('সবিতা', 'বনলতা সেন')

আর নতুন যুগের সম্ভাবনাকে কবির মনে হয়েছে ভোরের আলো। সে-যুগ আমাদের বর্তমানের খণ্ডিত চেতনার অন্ধকার থেকে বৃহত্তর চেতনার আলোকের মধ্যে 'উত্তরপ্রবেশ'।

অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

('উত্তরপ্রবেশ', 'সাতটি তারার তিমির')

উপরিউক্ত উদাহরণ থেকে পরিস্ফুট হয় জীবনানন্দের বিষয়বস্তু ও চিত্রধর্ম অত্যন্ত বেশি অন্যোন্যনির্ভর! বুদ্ধদেব বসু এজন্যই বলেছিলেন—'তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।' ইম্প্রেশনিজমের পরবর্তী ইউরোপীয় শিল্প-চিন্তা আন্দোলনগুলির ছায়াও জীবনানন্দে দেখা যায়। যেমন ফবিজম। ফবিস্টরা ছিলেন ইম্প্রেশনিস্ট বিরোধী। 'ফব' কথাটির অর্থ বন্যজন্তু। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সমালোচক লুই ভক্সেলেস কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। ফবিজমের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন মাতিস। ফবিস্টরা চাইতেন বিষম ও পাশবিক রঙে অঘটন ঘটিয়ে এক উদ্দাম গতিবান বাস্তবকে প্রকাশ করতে। রং-ই যেখানে হয়ে উঠবে প্রাণ-নাটক-গতি। ইম্প্রেশনিজমের মিষ্টি ফুরফুরে রং এঁদের মতে প্রাণহীন, জোলো। চিত্রে আনতে হবে বলিষ্ঠ আবেগ, কর্কশ তথা ধাতব রূপ। সেটা কী রকম? যেমন জীবনানন্দ যখন বলেন :

তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে।

('কুড়ি বছর পরে', 'বনলতা সেন')

সেখানে 'হলুদ' বর্ণটি ইম্প্রেশনিস্ট। অপরাহ্নের আলোয় নদীর রং এখন নরম প্রায় মিলিয়ে যাওয়া হলুদ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু পরে তার রূপ বদলে যাবে। Movement—একটা চলন্তভাব ইম্প্রেশনিস্ট লক্ষণ। শর কাশ হোগলার আঁশ কাটা রূপটিও মনে

একটা ফুরফুরে ভাব জাগায়। (এজন্য রেনোয়া ব্যালেরিনাদের ফুরফুরে ট্রশো আঁকতেন)। কিন্তু জীবনানন্দ যখন বলেন :

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে

('দুজন', ঐ)

তখন 'হলুদ' বর্ণটি ফবিস্ট। হলুদ কঠিন ঠ্যাং বাক্যাংশের মধ্যেই আছে একটা কর্কশ ভাব—এ লক্ষণ ফবিস্টদের। এরকম আর একটি উদাহরণ দিই। যখন বলছেন—ধূসর পেঁচা, তখন সেই প্রায় মিলিয়ে যাওয়া রং ইম্প্রেশনিস্ট। যখন বলেন—সোনালি চিল, তখন সেই বর্ণাঢ্যতা ফবিস্ট।

শুধু কাঠিন্য নয়, বর্ণাঢ্যতাও ফবিস্টদের অন্যতম লক্ষণ। জীবনানন্দে তার যথেষ্ট পরিচয় পাই। যেমন :

রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
...   .
পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!

('নগ্ন নির্জন হাত', 'বনলতা সেন')

এ জোরালো রং তাঁর রচনায় ছড়িয়ে আছে।

১। চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।

('শিকার', ঐ)

২। জ্যোৎস্না রাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল
চামড়ার শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ।

('হাওয়ার রাত', ঐ)

৩। নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।

('আমি যদি হতাম', ঐ)

জাফরান রঙের সূর্য ('বেড়াল', 'বনলতা সেন'), মেহগনির মতো অন্ধকার ("শিকার", 'বনলতা সেন'), হেলিওট্রোপের মতো দুপুর ('সিন্ধু সারস'. 'মহাপৃথিবী'), নিবিড় মেরুন আলো ('সবিতা', 'বনলতা সেন')—এগুলি সব-ই ফবিস্ট স্পর্শে উদ্ভাসিত।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, সাদা রংটি জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহার করেছেন।

১। জানি পাখি, সাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,

('সিন্ধু সারস', 'মহাপৃথিবী')

২। বরফের মতো সাদা ঘোড়াদের তরে

('পরিচায়ক', ঐ)

৩। দুধের মতন সাদা নারী।

('সবিতা', 'বনলতা সেন')

৪। মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে সাদা বকের মতো উড়ছে সে।

('হাওয়ার রাত', 'বনলতা সেন')

৫। চেয়ে দেখি বরফের মতো সাদা ডানা দু'টি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীর আনন্দ জানায়।

('সিন্ধু সারস', 'মহাপৃথিবী')

সাদা রং 'সিন্ধু সারস' কবিতায় ফবিজম ও ফিউচারিজমের অপূর্ব মেলবন্ধন করেছে।

আগেই বলেছি, ফবিস্টরা রংকে প্রাধান্য দিতেন, আর ফিউচারিস্টরা প্রাধান্য দিতেন গতিকে—Motion, Speed-কে। ইম্প্রেশনিস্টরা অবশ্য Movement বা চলন্ত ভাবকে প্রকাশ করেছেন। যেমন সকাল থেকে দুপুর হয়ে আসা। কিন্তু ফিউচারিস্টরা চাইলেন Age of speed-কে প্রকাশ করতে। গতির দুর্দম রূপকে ফোটাতে। ফিউচারিস্টদের দার্শনিক ছিলেন বের্গসঁ। তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপরেও পড়েছিল। 'বলাকা', 'চঞ্চলা'—এ দু'টি বিখ্যাত কবিতা বাংলা সাহিত্যে ফিউচারিস্ট কবিতার উজ্জ্বল উদাহরণ। পাখির গতি এবং নদীর গতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এ যুগের গতি ধর্মের সুন্দর রূপ দিয়েছেন। অথচ রোম্যান্টিক সৌন্দর্যকে খর্ব করেন নি। শুধু ধাও শুধু ধাও বেগে ধাও ('চঞ্চলা') অথবা পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ('বলাকা') ইত্যাদি চরণে ফিউচারিস্ট রূপ বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

জীবনানন্দ রোম্যান্টিক নন। 'হাওয়ার রাত' কবিতার মধ্যে উড়ন্ত মশারির চিত্রকল্পে সেই ফিউচারিস্ট গতিবাদের আধুনিক রূপ দিয়েছেন। যেমন :

এক একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতরে হয়তো—
মাথার উপরে মশারি নেই আমার
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে সাদা বকের মতো উড়ছে সে।
('হাওয়ার রাত', 'বনলতা সেন')

গতির রূপ তাঁর কাব্যে আরো দু'-এক জায়গায় সুন্দর ফুটে উঠেছে।

১. আমাদের তির্যক গতি স্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস,

('আমি যদি হতাম', 'বনলতা সেন')

২. বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার,
এক—দুই—তিন—চার—অজস্র—অপার— ('বুনো হাঁস', ঐ)

৩. আধো নীল আকাশের বুকে
হরিণের মতো দ্রুত ঠ্যাঙের তুরুকে
অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে তারা বটে;

('অবশেষে', ঐ)

ফিউচারিস্টদের আর একটি লক্ষণ ছিল যুগজ্বরকে প্রকাশ করা। এ যুগ যেমন Age of speed and steel, তেমনি এ যুগ Age of fever। দুর্দম গতি যেমন মানুষকে উদ্দীপিত করে, তেমন অবসন্নও করে। জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনার কবিতাগুলি এক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা দরকার। একে ঠিক পলায়ন বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-চেতনা যেমন উপনিষদের দীপ্তবোধে এক নূতন জীবনের সিংহদ্বার, জীবনানন্দের মধ্যে ঠিক তা পাই না। তিনি জীবনের অভিজ্ঞতায় ক্লান্ত। তাই তিনি কখনো কমলালেবু হয়ে পুনর্জন্ম চেয়েছেন—কখনো চেয়েছেন শঙ্খচিল শালিকের জন্ম।

'উপমাই কবিত্ব'

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

জীবনানন্দের একটি কথা 'উপমাই কবিত্ব' আজ বাংলা কাব্যের রাজ্যের স্বতঃসিদ্ধ এক প্রবচন বাণীর মতো স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর নিজের কয়েকটি অপূর্ব উপমার মাধ্যমে ঐ কথাটার যাথার্থ্য বিচার করবার চেষ্টা করি। 'বনলতা সেনে' দেখি কবি লিখছেন—'পাখির নীড়ের মতো চোখ।' অনেকেই এ উপমার বিশ্লেষণে অনেক নতুন ও সুন্দর কথা বলেছেন। [এ রকম লেখাও আমি দেখেছি—'বনের লতা দিয়ে পাখির নীড় তৈরি; তাই যে নায়িকার চোখ পাখির নীড়ের মতো, কবির কাছে সে বনলতা সেনের মূর্তিতে ধরা দেয়'—বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়।]

'পাখির নীড়ের মতো চোখ' বলায় শুধু যে উপমেয় এবং উপমানের বর্ণনাসর্বস্ব কারুকার্যেই কবি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমার তা মনে হয় না। ক্লান্তপ্রাণ মানুষ, জীবনের চারদিকে যার সফেন সমুদ্র, তাকে যে নারী দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল, তার-ই চোখ পাখির নীড়ের মতো! সমস্ত দিনের ক্লান্ত সঞ্চরণ শেষে পাখি যখন ঘরে ফেরে—তার কাছে নীড় আশা ও বিশ্রামের আশ্রয়, নির্ভয় স্থিতির প্রতীক। তেমনি বনলতা সেনের চোখ—ঐ ক্লান্তপ্রাণ মানুষের কাছে, সমস্ত দিনের শেষে আশা ও ভালবাসার ইঙ্গিতবহ চোখ দু'টিতে নবায়মান প্রীতির প্রতীক দ্যোতনা কবি কত সহজেই ব্যক্ত করেছেন।

উপমা কবির হাতে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ধরা দিয়েছে,—এতটুকু চেষ্টা নেই; কবির আত্মায় এ উপমাগুলির যেন জন্ম, বিরাট জলাশয়ের জল বুদ্বুদের মতো উপমাগুলি যেন কাব্য-সাগরেরই অংশীভূত স্ফোটধ্বনি। কখনো বস্তু জগতের উপমা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে পাঠকের মনে ধরা পড়ছে, কখনো সহৃদয়তার চাবি দিয়ে ভাবলোকের কুলুপ খুলতে হচ্ছে, কবির ধ্যান পাঠকের ধারণার পর্দায় না ধরতে পারলে চিত্র-সৌন্দর্য ফুটবে না—একথা মনে রাখতে হবে। 'বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা', কিম্বা 'নরম জামের মতো চুল তার', 'ঘুঘুর বুকের মতো অস্ফুট আঙুল', অথবা 'তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে', বা 'নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা'—সর্বত্রই আমরা চোখ দিয়ে উপমেয় এবং উপমান—উভয়কেই দেখি, এবং সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষতায় কবির বক্তব্য সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। দ্বিতীয় ধারার উপমার কয়েকটি উল্লেখ করি;—'তোমার সংস্পর্শের মানুষদের রক্তে ছিল মাছির মতো কামনা', কিম্বা 'তাই রাখিয়াছি ঢেকে পাখির মায়ের মতো প্রেম এসে আমাদের বুকে', অথবা 'হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো' বা 'চারিদিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন এখন দয়ার

মতো'। পাঠকের উপলব্ধির জগতে এ নির্বস্তুক উপমানগুলিকে কবি কত অনায়াস ও সাবলীল ভঙ্গিতে গ্রথিত করেছেন!

উপমা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে জীবনানন্দের আর-এক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা দরকার। তিনি প্রচলিত উপমানকে উপমেয় হিসেবে এবং উপমেয়কে উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন; অর্থাৎ সাধারণ উপমার বিপরীত কাজটি বহু ক্ষেত্রে পরম সার্থকতার সঙ্গেই সিদ্ধ হয়েছে। এ জাতীয় সাদৃশ্যমূল অলংকারের শাস্ত্রীয় নাম প্রতীপ অলংকার। জীবনানন্দ 'প্রতীপ' ব্যবহারে সূক্ষ্ম ও সুচারু মনন-ধর্মের পরিচয় দিয়ে তাঁর ঔপম্যকে অনাস্বাদিতপূর্ব নবত্ব দান করেছেন। 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় অন্ধকারকে বলছেন— 'আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো'। এখানে আলো ও অন্ধকারের মধ্যে বৈপরীত্যের কথা বলার কায়দাটুকুতেই যা সৌন্দর্য রয়েছে—ভাবনার দিক থেকে তেমন নতুনত্ব নেই। কিন্তু পরের স্তবকে এ অন্ধকারকে যখন কোনো নারীর সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে, তখন সেখানে প্রচলিত উপমানকে উপমেয়রূপে উপস্থিত করা হয়েছে; পাঠকের মন সেই অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য আবিষ্কার করার পর কবির প্রতি বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। আলোর রহস্যময়ী সহোদরা অন্ধকার কেমন? কবি বলছেন—

> যে আমাকে চিরদিন ভালবেসেছে
> অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
> সেই নারীর মতো
> ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে।

যে প্রেমিকা নারী আড়ালে অবস্থান করে অদৃশ্য অবস্থাতেই তার পুরুষকে নিবিড়ভাবে ভালবেসে গেছে, সেই অসূর্যম্পশ্যা নারীর মতোই নিবিড় অন্ধকার। অন্ধকারের মতো নারী নয়, নারীর মতো অন্ধকার।

> আরো দু'-একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—
> ভোর;
> আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল;
> চারদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।
> একটি তারা এখনও আকাশে রয়েছে :
> পাড়াগার বাসর ঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো।

ঘাস ফড়িঙের দেহের নীল রঙের মতো আকাশের রং; টিয়ার পালকের সবুজ রঙের মতোই গায়ে সবুজ রং, গোধূলি মদির মেয়ের মতো আকাশের তারা—কবির কাছে প্রচলিত বা প্রসিদ্ধ উপমানের মর্যাদা বেশি মনে হয়নি, সহজভাবে তা তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি অনায়াসেই বলেন—'রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল'। প্রতীপ অলংকারের সঙ্গে পাঠকের কিছু উপরি পাওনাও জোটে, রোদের রঙের কোমল স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, সকালের রোদের রং যে কাঁচা—এমন মদির ঘোষণা আমরা আর কোন কবির কাছে পেয়েছি?

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অনেক আকাশ' কবিতায় হেমন্তের নদীর বর্ণনায় কবি বললেন, আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে হেমন্তের নদী বয়ে চলেছে বটে, তার ঢেউগুলি ক্ষুধিত ব্যক্তির মতো, হতাশ প্রাণের মতো অন্ধকারে নিঃশ্বাস ফেলছে তীরে আছড়ে পড়ে; নির্জন নদীর বিষণ্ন প্রবাহের স্তিমিত ধারাটি যেন পাঠকের হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশ ছুঁয়ে বয়ে যায়।

আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে চলিতেছে বয়ে
হেমন্তের নদী—ঢেউ ক্ষুধিতের মতো এক সুরে।
হতাশ প্রাণের মতো অন্ধকারে ফেলিছে নিঃশ্বাস।

তিনি নদীকে জলসিঁড়ি নদী কিম্বা ধানসিঁড়ি নদী বলেছেন : এ উপমা গত বিশেষণাত্মক বর্ণনা নদীকে ছবির মতো আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত করে তুলেছে।

'আট বছর আগের একদিন' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি :

এই কথা বলছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চলে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা এসে।

অন্ধকার গবাক্ষপথে হঠাৎ কুদর্শন কদাকার উটের গ্রীবা দেখলে মানুষ চমকে ওঠে এবং ভীত হয়। কাব্যে বর্ণিত সেই লোকটির কাছে নিস্তব্ধতা তেমনি যেন ভয়ার্ত বোধ নিয়ে হাজির হলো।

বাংলার প্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবি এ দেশের সৌন্দর্যের ক্রমাবলুপ্তি লক্ষ্য করে ব্যথিত হতেন, অতীতের রূপ যেন ক্রমেই নষ্ট হতে চলেছে, সেই বেদনাও তিনি 'রূপসী বাংলা'র কয়েকটি সনেটে প্রকাশ করেছেন এবং প্রসংগক্রমে গ্রামবাংলার বিজন পথের বর্ণনায় এমন একটি বিষণ্ন উপমার সংস্থান হয়েছে, যার ছবি পাঠকদের মন থেকে কোনদিন-ই মুছে যাবে না।

বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে;
পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি, হায় এমন বিজন
সাদা পথ—সোঁদা পথ—বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে।
চলে গেছে—শ্মশানের পারে বুঝি।

বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে গ্রামবাংলার মেঠো পথ—সাধারণতঃ সে পথ ফাঁকা, নির্জন; মেঠো বলেই সেখানে সোঁদা গন্ধ, সব-ই সাধারণভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু কবির কৃতিত্ব হলো, বাঁশঝাড়ের জন্যে স্বল্পালোকিত পথটুকুকে নারীর অবগুণ্ঠিত মুখের মতো কিছু ঢাকা মনে হয়েছে। আর যেহেতু অন্তর্লগ্ন বিষণ্নতার বোধ-ই বর্ণিতব্য বিষয়, তাই সেই নারী বিধবা বলেই কল্পিত,—আর পথটিও চলে গেছে শ্মশানের দিকে, সহজ ও সাধারণ দৃশ্য। শ্মশানের দিকে চলে যাওয়া কাঁচা মাটির পথ, দু'পাশে তার বাঁশঝাড়। কিন্তু কবি স্বল্পান্ধকার পথকে বিধবা নারীর ঘোমটা ঢাকা মুখের সঙ্গে উপমা করে যে মাধুর্য সৃষ্টি করলেন, তার দ্বারা সাধারণ, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েও অসাধারণ গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে

উঠলো। কবি নিজে যে কাব্যকলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে উপমা অলংকারের জয়গান করেছেন কেন, বার বার তার উদাহরণ দিতে কার্পণ্য করেননি। ফর্সা নারী পুকুর থেকে হাঁস তুলে নিয়ে ফিরছে—কবি দেখলেন, 'থোড়ের মতন সাদা ভিজে হাতে' সে নারী হাঁস ডেকে নিয়ে গেল। যেহেতু ভিজে, তাই হাত থোড়ের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। কবির মনে এই অলংকার কবিত্বের সহজাত, পৃথক্কৃত যত্নজ নয়। তিনি অনায়াসেই চাঁদ বা তারাকে আকাশের রূপালি শস্য বলতে পারেন। 'জার্নাল ১৩৪৬' কবিতায় আর একটি আশ্চর্য উপমার খবর দিই। খড়ের সুসমাচার বুকে নিয়ে গরুর গাড়ি 'লাল বটফলে থ্যাতা মেঠো পথে জারুল ছায়ার নিচে নদীর সুমুখে' কতক্ষণ থেমে আছে, নদীতে তার ছায়া পড়েছে; নিঃশব্দ মেঘের পাশে সে-ও যেন একখানি মেঘ হয়ে গেছে, উপমেয়কে উপমানের সঙ্গে একীভবনের মধ্যে কবির শুধু দর্শনেন্দ্রিয় নয়, মনোভাবনার পরিচয়ও উদ্ঘাটিত হয়েছে।

গোরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে
লাল বটফলে থ্যাঁতা মেঠোপথে জারুল ছায়ার নিচে নদীর সম্মুখে
কতক্ষণ থেমে আছে; চেয়ে দ্যাখো নদীতে পড়েছে তার ছায়া;
নিঃশব্দ মেঘের পাশে সমস্ত বিকেল ধরে সেও যেন মেঘ এক, আহা,
শান্ত জলে জুড়োচ্ছে।

বস্তুগত রূপ আর চিন্তার বিষয়ে এখানে কবির ভাবনা সমীভূত হচ্ছে—এ কবিতার অন্যত্র দেখা যাবে উপমা তাঁর মননের উপলব্ধিজাত হয়ে এসেছে। যে আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, পরিপূর্তি নেই,—সে যেন মা-মরা শিশু :

মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানা কী যে :
ক্লান্তি আনে, তবুও ব্যথা আনে, বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে।

পরেই এক জায়গায় আবার বলছেন—'কী-এক শান্তির মতো স্নিগ্ধ হয়ে আছে এই মহিলার মন।' 'শান্তির মতো স্নিগ্ধ'—আমরা ধারণা করতে পারি, প্রত্যক্ষ করতে পারি না। 'মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষা' কেমন, তার স্বরূপ আমাদের মননের জিনিস—তা রূপ বর্ণনা দৃষ্টিগোচর বস্তুর মাধ্যমে সম্ভব নয়। তবু কবি সহজেই এসব মনের অনুভবগুলিকে ইন্দ্রিয়গোচর করার জন্যে উপমা অলংকারের ব্যবহার করেছেন। 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায় কবি হাজার বছরকে জোনাকির সঙ্গে তুলনা দান করেছেন। সময়-সীমাকে আমরা ধারণায় বুঝি, তার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ নেই, কাল অনুভবেদ্য, কিন্তু হারিয়ে-যাওয়া-অতীতের হাজার বছর স্মৃতিপথে কখনো আসে, ভাসে, কখনো বা হারায়। কবি এ হাজার বছরকে জোনাকির সঙ্গে উপমিত করে বলেছেন, এ কালসীমা অন্ধকারে ক্রীড়ারত—'হাজার বছর শুধু অন্ধকারে খেলা করে জোনাকির মতো।' জোনাকির মিট মিট করে জ্বলা এবং নেভা, আর অতীত হাজার বছরের স্মৃতি ও সত্তায় ভেসে ওঠা এবং ডুবে যাওয়ার ছবিটি স্পষ্ট হয়েছে, ধারণাগত সময়ের সঙ্গে দৃষ্টিগ্রাহ্য জোনাকির ঔপম্যের ব্যঞ্জনায় এক নতুন সুষমার সঞ্চার ঘটেছে। অবশ্য ঐ কবিতার আরো কয়েকটি উপমায় এ সৌন্দর্য নেই, যদিও নতুনত্ব রয়েছে, যেমন—'দেবদারু' ছায়া ইতস্তত বিচূর্ণ থামের মতো"—এখানে উপমার নূতনত্ব রয়েছে, যেমন আগের উপমার অনির্বচনীয়ত্ব নেই।

জীবনানন্দের শিল্প-প্রকরণ

দীপ্তি ত্রিপাঠী

জীবনানন্দের প্রকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য গদ্যগন্ধি শব্দের ব্যবহার। কবিপ্রসিদ্ধির অনুসরণ না করেই অতিচলিত, গ্রাম্য, দেশজ শব্দ কিংবা ইংরেজি শব্দ নিয়ে তিনি এমন একটি নিজস্ব শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন, যা বাংলাভাষার বিশিষ্ট সম্পদ হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

'আমাদের কবিতায় এখনো সুন্দরীরা বাতায়ন-পাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলায়িত করে দেয় মুকুরে মুখ দেখে, চরণ অলক্ত-রঞ্জিত করে, শুভ্র শীতল শয্যায় শোয়।...সংস্কৃতের দুয়ারে এ কাঙালপনা করে আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোটো করে রাখবো? আমাদের ভুল জীবনানন্দ দাশ বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাংলা করে তোললার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়।'[১]

বলা বাহুল্য, আধুনিক কবিদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুখের ভাষা এবং কাব্যের ভাষার ব্যবধান বিলোপ। মৌখিক ভাষার ইডিয়ম, অর্থাৎ বিশিষ্ট দেশজ রীতি ব্যবহারে কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ করে তোলার প্রচেষ্টা তাঁরা সকলেই করেছেন। তবে জীবনানন্দের মতো এমন স্বচ্ছন্দ ও প্রচুর ব্যবহার আর কেউ-ই করতে পারেননি। তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ-বিষয়ে কৃতকার্যতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথে যা ছিল সম্ভাবনা, জীবনানন্দ তাকে দিয়েছেন সিদ্ধি। 'ছিঁড়ে ফেঁড়ে', 'নটকান', 'শেমিজ', 'থুতনি' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার যে কবিতায় করা যেতে পারে, এ-কথা বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথও ভাবেননি। বুদ্ধদেব বসুর প্রতিক্রিয়া এ-ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে :

'মনে পড়ে 'পাখিরা' কবিতা প্রথম পাঠেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিল 'স্কাইলাইটে'র জন্য, 'প্রথম ডিমে'র জন্য, 'রবারের বলের মতন' ছোট বুকের জন্য। আর সেখানে 'লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের বুকে' মৃত্যু ছিল বলে।....এমনকি মৌখিক ভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাতে কাব্যের স্পন্দন তিনি এনেছিলেন;—'তোমার শরীর—তাই নিয়ে এসেছিলে একদিন' এ পঙ্ক্তিটি পড়ে আমি 'শরীর' কথাটিকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরের' অস্তিত্ব আমরা শুনিনি, শুনেছি 'দেহ', 'দেহলতা'', 'তনুলতা', 'দেহবল্লরী'। এ উদাহরণ আমাদেরও রচনার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিল।'[২]

---

১. বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা', পৌষ, ১৩৬১, পৃ—৬৮ এবং 'প্রগতি', ভাদ্র,১৩৩৬।
২. বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা', পৌষ, ১৩৬১, পৃ.—৭০।

'জ্যান্ত', 'ছুঁড়ি', 'নাকের ডাঁশা', 'পাখির ডিমের খোলা', 'নষ্ট শসা' প্রভৃতি শব্দকে অনায়াসে তিনি কাব্যে সীমানায় স্থান দিয়েছেন। 'বনলতা সেন'-এ এবংবিধ কয়েকটি দুঃসাহসিক প্রয়োগ লক্ষণীয়।

১। টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা
২। উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর
৩। হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে

'টেরিকাটা', 'হাঁটুভর', 'ঠ্যাং' কথাগুলি কবি কত সহজে এখানে ব্যবহার করেছেন! শব্দচয়ন সম্বন্ধে শুচিবায়ু ত্যাগ করে কাব্য-সীমানাকে অনেকখানি বিস্তৃত করে দিলেও কোন্ শব্দটি কিভাবে বসালে ভারসাম্য বিনষ্ট হবে না, রসানৌচিত্য দোষ ঘটবে না, সে-সম্বন্ধে জীবনানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। যোগ্য জহুরির মতো তিনি শব্দগুলির রুক্ষতা ও অশালীনতা মসৃণভাবে পালিশ করে দিতেন শুধু সুষ্ঠু বিন্যাসের গুণে। ওপরে বর্ণিত তৃতীয় উদাহরণের 'হলুদ কঠিন ঠ্যাং'-এর স্থানে আর-কোনো শব্দই বসানো সম্ভব নয়, তাতে সমস্ত কবিতাটি ধসে পড়বে।

বিশেষণ ব্যবহারেও তিনি দেশজ শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যথা—'মেঠো' চাঁদ, 'পাখির ডিমের খোলা ঠাণ্ডা কড় কড়', 'মরকুটে কানা' ঘোড়া, 'ছাতকুড়ো মাখা ক্লান্ত' জামের শাখা ইত্যাদি। অবশ্য বিশেষণে তৎসম শব্দের প্রয়োগ-ই আধুনিক কবিরা বেশি করেছেন চলিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বৈপরীত্য দেখাবার জন্য। জীবনানন্দ তাতেও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, যথা—'তিলোত্তমা'-নগরী, 'রূঢ়' রৌদ্র, 'তনুবাত' নীলিমা ইত্যাদি।

ক্রিয়ার ব্যবহারে আধুনিক কবিরা শুধু যে চলিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা নয়, তার সম্পূর্ণ রূপ প্রয়োগেরও পক্ষপাতী। ক্রিয়ার অপভ্রংশ ব্যবহারের (যথা—ছিনু, গেনু, ইত্যাদি) তাঁরা বিরোধী। জীবনানন্দের নৈপুণ্য অবশ্য এ-বিষয়ে অবিসংবাদিত। যথা :

১। জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে
২। আমি সেই সুন্দরীরে দেখে নেই নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই,
৩। কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।

এমনকি তিনি তাঁর দেশ বরিশালের ক্রিয়ারূপও মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করেছেন, যথা :

১। টলতে আছিস, দলতে আছিস, জ্বলতে আছিস ধূ ধূ
২। হয়তো চেঙ্গিস আজো বাহিরে ঘুরিতে আছে করুণ রক্তের অভিযানে

ফলানো, ছুঁয়ে, ছেনে, ফেঁসে, ছিঁড়ে, ফেঁড়ে ইত্যাদি কয়েকটি গ্রাম্য ক্রিয়ার ব্যবহার তিনি বহু স্থানেই করেছেন। বলতে কি, ঐ ক্রিয়াগুলি পাঠ করলেই জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য মনে জেগে ওঠে।

কিন্তু শুধুই দেশজ শব্দ নয়, বিদেশী শব্দ বা ইংরেজি শব্দও তিনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে রচনার আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'ক্যাম্পে' এবং 'পাখিরা' কবিতা দু'টি এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেয়া গেল—

১। আমাদের পাখায় পিস্‌টনের উল্লাস
২। তাদের প্রায়ান্ধ চোখে আজ রাতে লেনস্‌
চেয়ে দেখে চারিদিকে অগণন মৃতদের চক্ষের ফসফোরেসেন্‌স
৩। অকূল সুপুরিবন স্থির জ্বলে ছায়া ফেলে একমাইল শান্তি

কল্যাণ হয়ে আছে,—

জীবনানন্দের শব্দবিন্যাস কখনো তাঁর বক্তব্যকে চমক সৃষ্টির জন্য অতিক্রম করে না। তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে যেমন দেশজ শব্দের ছড়াছড়ি, 'সাতটি তারার তিমির'-এ তেমনি ইংরেজি শব্দের। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে ব্যক্তিগত ব্যথা প্রকাশের জন্য দেশজ শব্দ ছিল অনুকূল, আর 'সাতটি তারার তিমির'-এ বিশ্বগত ব্যথা প্রকাশের জন্য আন্তর্জাতিক শব্দ ব্যবহার সঙ্গত হয়েছে। এ-গ্রন্থে তাই ডাইনামো, অ্যামিবা, ভিটামিন, পার্টি পলিটিক্স, ম্যাগ্নেটিক মাইন, বজেট, মিটিং, কনভয় প্রভৃতি শব্দকে কাব্যের সীমানায় দেখা যায়।

যদি শব্দালংকারের তরবারি খেলা জীবনানন্দের কাব্যে অদৃশ্য, তবুও অনুপ্রাস রচনাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

১। হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা
২। উঁচু উঁচু উলুবন
৩। নরম নদীর নারী
৪। মনুমেন্ট মিনারের মাথা

কিন্তু জীবনানন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য উপমা-রচনায়। শব্দভাণ্ডারের মতো জীবনানন্দের উপমাগুলিও বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ঐশ্বর্য। তাঁর উপমাগুলির পেছনে এমন এক গভীর জীবন-দর্শন ও আবেগের আন্তরিকতা আছে যে, মনেই হয় না, এগুলি কাব্যের বহিঃপ্রসাধন মাত্র। জীবনানন্দ একদা বলেছিলেন—'উপমাই কবিত্ব'; বস্তুত এ দুইয়ে পার্থক্য তিনি বোধ হয় কোনোদিন-ই করেননি। 'অনেক আকাশ" বা 'জীবন' কবিতা দু'টি পড়লে ওপরের মন্তব্য আরো বিশদ হবে। অথবা 'শিকার' কবিতাটি—যেখানে বত্রিশটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে চোদ্দটি উপমা, 'মতো' শব্দের তেরোবার ব্যবহার দেখা যায়।

কোনো কবিপ্রসিদ্ধির অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশ থেকে রসঘন উপমার সৃষ্টিতে তাঁর তুলনা বিরল।

১। আতার ক্ষীরের মতো সোহাগ সেথায় ঘিরে আছে।
২। তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে
৩। নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা

কেবল দেশজ শব্দ দিয়ে সৃষ্টি বলেই জীবনানন্দের উপমা অনন্যসাধারণ নয়। তাঁর উপমাগুলি অনেক ক্ষেত্রে গভীর জীবন-দর্শনকেও ব্যক্ত করেছে। এজন্য বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—'তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দূরগন্ধবহ'। অর্থাৎ, তাঁর উপমাগুলি কেবল চিত্র নয়, তাঁর চিন্তা। যেমন :

বলেছে সে এতদিন 'কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

এখানে উপমাটি তুলনাগত নয়, মনগত। চোখের রূপের বর্ণনা কবি করেননি, করেছেন মনোভাবের বর্ণনা। নীড়ের শান্ত, স্নেহ-মমতাপূর্ণ আশ্রয় যেমন পাখির কাম্য, বনলতা সেনের চোখও তেমনি স্নেহ-মমতাময় আশ্রয়। এ-উপমাকে উপলব্ধি করতে হলে তাই হৃদয় ও মন দিয়ে অনুভব করতে হবে।

এমন আর-একটি উদাহরণ :
এই কথা বলেছিল তারে
চাঁদ ডুবে চলে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোন-এক নিস্তব্ধতা এসে।
('আট বছর আগের একদিন', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

এখানেও উপমাটি শুধু তুলনাগত নয়। চিত্র, চিন্তা ও অতি-বাস্তবতার স্পর্শে জড়িত হয়ে এমন সার্থকতা লাভ করেছে, যার সামগ্রিক প্রভাবে আমরা আচ্ছন্ন না হয়ে পারি না। 'উটের গ্রীবা' বলার মধ্যে কবি এমন এক অচেনা, অসুন্দর ও অশুভের গম্ভীর দ্যোতনা দিয়েছেন যে, পাঠকের মন এক আসন্ন সর্বনাশের সম্ভাবনায় স্তম্ভিত হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তিকে আত্মহত্যার পরামর্শ দিয়েছিল এ নিস্তব্ধতা। উটের চিত্রকল্পে সেই ভয়াবহতা আশ্চর্যরকম ফুটেছে। জানালা দিয়ে উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা নয়, মৃত্যুই তার ভীষণগ্রীবা বাড়িয়ে দিয়েছিল। অতএব উপমেয় 'নিস্তব্ধতা'র অর্থ এখানে মহাস্তব্ধতা, অর্থাৎ মৃত্যু। পূর্বচরণের 'অদ্ভুত'—এ সাভিপ্রায় বিশেষণটিও এখানে গাঢ়তা সঞ্চার করেছে।

এইরকম আরো কয়েকটি উদাহরণ :

১। তোমার সংস্পর্শের মানুষদের রক্তে ছিল মাছির মতো কামনা
২। জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছি বিশাল আকাশ।
৩। আমার হৃদয়—এক পুরুষ হরিণ।

জীবনানন্দ প্রধানত তানপ্রধান ছন্দের কবি। বুদ্ধদেব বসুর মতো তাঁরও স্বাতন্ত্র্য অসম পয়ার ও বলাকার ছন্দ রচনায় এবং বুদ্ধদেবের মতোই প্রথম থেকেই, অর্থাৎ 'ঝরা পালক'-এর যুগ থেকেই এ ছন্দে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'নাবিক', 'আলেয়া',

'সেদিন এ ধরণীরে' কবিতাগুলি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তখন থেকেই বোঝা যায়, ছন্দে জীবনানন্দের কান অত্যন্ত সজাগ। 'ঝরা পালক'-এর যুগে অবশ্য তিনি বিভিন্ন ছন্দে লিখেছেন, যেমন—ধ্বনিপ্রধান ছন্দে লেখা হয়েছে ''মরীচিকার পিছনে', 'যে কামনা নিয়ে', স্বরপ্রধানে লেখা হয়েছে 'সাগর বলাকা' কিংবা 'বনের চাতক—মনের চাতক'। কিন্তু এ কবিতাগুলিতে হয় নজরুল, নয় সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অথচ সেই একই সময়ে বলাকার ছন্দে যে-কবিতাগুলি তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে জীবনানন্দের স্বাক্ষর উজ্জ্বল। পরবর্তীকালে তাই কবিকে আর অন্য ছন্দ নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা যায় না। যে দু-একটি কবিতা অন্য ছন্দে তিনি লিখেছেন, যেমন—'লোকেন বোসের জর্নাল' ('শ্রেষ্ঠ কবিতা'), তাতে ঠিক কবির বৈশিষ্ট্যটি সম্যক্ ফুটে ওঠেনি। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি তানপ্রধানেই লেখা, হয় পয়ারে, নয় বলাকার ছন্দে। তাঁর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিলন। কথ্যভাষায় প্রবহমানতা, গাম্ভীর্য এবং স্বাভাবিকতা তিনি কাব্যকে দান করেছেন। তাছাড়া যুগের ক্লান্তি, বিষণ্নতা, তিক্ততা, হতাশা প্রভৃতি সুরগুলিকেও তিনি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এ তানপ্রধান ছন্দের মাধ্যমে।

জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ছন্দ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন : 'এ বইয়ের সবগুলো কবিতাই পয়ার-জাতীয় ছন্দে—বেশিরভাগ অসম মাত্রায়, যাকে বলতেই হয় বলাকার ছন্দ। অর্থাৎ, চেহারাটা বলাকার ছন্দের, কিন্তু ধ্বনি একেবারেই ভিন্ন। বলাকার তীব্রতা ও বেগ নেই এখানে; এ-ছন্দ মন্থর, যেন ইচ্ছে করে ভাঙা-ভাঙা, অসমান ও পালিশ-না-করা, এ-ছন্দ থেমে-থেমে ঘুরে-ঘুরে চলে, ঘুমে-ভরা সুর, স্বপ্নে ভরা, শিশির-কোমল, যেন ঘুমের মধ্যে গান এসে কানে লাগে, তারপর সমস্ত রাত হানা দেয় ;'[১]

বাস্তবিক-ই তাঁর ছন্দে ক্লান্তি ও অবসাদ এ মন্থর লয়ে অদ্ভুত রূপলাভ করেছে। কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সেই মৃত্যুচেতনাময় যুগের শেষে যখন তিনি ইতিহাসচেতনায় আশ্রয় নিলেন, তখন বর্ণাঢ্যতা, ইন্দ্রিয়ঘনতাকেও তিনি এই এক-ই ছন্দে ফুটিয়েছেন, আবার সমাজচেতনার কবিতা রচনাকালে কঠোর-কঠিন সমালোচনা তথা ব্যঙ্গও এই একই ছন্দে শাণিত হয়ে উঠেছে। তবু যে কবিতাগুলি প্রত্যেকটিই নতুন মনে হয়, তা হলো চিন্তার গভীরতার ও বৈচিত্র্যের জন্য। তবে প্রকরণের দিক থেকে বলা যায়, বিন্যাসও নানাভাবে করা হয়েছে। যথা—'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'কয়েকটি লাইন' চমক লাগায় শুধু বিপরীত বিন্যাসের জন্য। যথা :

শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান,—
তাই আসি,
নানা কাজ তার
আমরা মিটায়ে যাই,—
জাগিবার কাল আছে—দরকার আছে ঘুমোবার;

১. বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', পৃ—৫৬।

এই সচ্ছলতা
আমাদের; আকাশ কহিছে কোন কথা
নক্ষত্রের কানে?
আনন্দের? দুর্দশার?—পড়ি নাক'। সৃষ্টির আহ্বানে
আসিয়াছি।

যদিও ছন্দগুলির মাত্রাসংকেত প্রধানত ৮+১০=১৮, তবুও নানাভাবে সেগুলি সাজানো হয়েছে। যেমন—'মাঠের গল্পে' চরণগুলি দীর্ঘ নয়, ১০, ৮, ৬, এমনকি ৪ মাত্রারও চরণ আছে; আবার 'অবসরের গানে' ২২, ২৬, ২৮ মাত্রার দীর্ঘতম চরণও ব্যবহার করা হয়েছে। যথা :

৮ ৮ ৮
পাড়াগাঁর গায়ে আজ | লেগে আছে রূপশালি | ধানভানা রূপসীর |
৬
শরীরের ঘ্রাণ |

চরণটি ৩০ মাত্রার বলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যবহৃত 'রূপশালি' কথাটিও অভিনব মনে হচ্ছে।

জীবনানন্দ প্রথাবদ্ধ ২, ৪, ৬, ৮ চরণের স্তবকেরও ব্যতিক্রম করেছেন। যেমন 'অনেক আকাশ' ৯ চরণের স্তবকে রচিত। 'হায় চিল' সমগ্র কবিতাটি ৭ চরণে সমাপ্ত। 'মুহূর্ত', 'শহর' ৯ চরণে সমাপ্ত, 'অবশেষে' ১৩ চরণে। 'জীবন' কবিতাটি Spenserian Stanza-য় লিখিত। ছন্দসংকেত এরূপ—a b a b, b c b c, c অর্থাৎ ৯ চরণের স্তবক, শেষের চরণ দীর্ঘতম। প্রথম ৮টি চরণ ১৮ মাত্রা ও শেষ চরণটি ২২ মাত্রা।

মধ্যমিলের ব্যবহারেও কবি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, যেমন :

১। চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
২। পেপিরাসে—সেদিন প্রিন্টিং প্রেসে কিছু নেই আর;
৩। মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ

জীবনানন্দের জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থে সনেটের সংখ্যা মাত্র দু'টি—'শকুন' ('ধূসর পাণ্ডুলিপি') ও 'পথহাঁটা' ('বনলতা সেন')। কিন্তু বাংলা সনেটের ইতিহাসে দু'টিই মূল্যবান সংযোজন; দু'টি কবিতাই ৮+৮+১০=২৬ মাত্রার। দু'টি কবিতাতেই তিন চরণের স্তবক এবং প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ সহজ হয়েছে। এ ছাড়াও পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীয়রীয় উভয় রীতিকেই মিশ্রিত করা হয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সব কৌশলগুলিই প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ের জন্য। 'রূপসী বাংলা'য় অবশ্য পঞ্চাশেরও বেশি সনেট স্থান পেয়েছে। এদের অধিকাংশই ২২ মাত্রার। ২৬ মাত্রার সনেটও কয়েকটি দেখা যায়। ওপরে বর্ণিত লক্ষণগুলি এ-সনেটগুলিতে দেখা গেলেও উক্ত সনেটদ্বয়েই

জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য অধিকতর প্রকাশ পেয়েছে। সে-তুলনায় 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুলি খসড়া মাত্র, যদিও কাব্যগুণের অভাব নেই এতে।

গদ্য-কবিতা রচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব দেখা যায়। অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতার গদ্যছন্দে রচিত, যথা—'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'নগ্ন নির্জন হাত' ইত্যাদি।

কিন্তু জীবনানন্দের ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্নতা। তাঁর কবিতায় কলা-কৌশলের অভাব নেই, ছন্দ তাঁর কোথাও টলেনি, মিল, অনুপ্রাস, পুনরুক্তিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু সেগুলি কোথাও চমক দেয় না। সব মিলিয়ে কবির বক্তব্যটিকে আরো স্ফুটমান করে তোলে। আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর রচনাই সন্ধান দেয় গভীরতর মননের স্তরে যাত্রী হবার।

জীবনানন্দের ভাষা-ব্যাকরণ

সৈকত আসগর

কবিতায় শব্দ ব্যবহারে জীবনানন্দ দাশ আমাদের দিয়েছেন বিশুদ্ধতায় উজ্জ্বল উদ্ধার। একজন ইমারত শিল্পী যেমন একটির পর একটি বিশ্বস্ত ইট সাজিয়ে ইমারত নির্মাণ করেন, জীবনানন্দ দাশও তেমনি একটির পর একটি বিশ্বস্ত শব্দ সাজিয়ে তাঁর কবিতার অবয়ব নির্মাণ করেছেন। হয়তো ভাবের দিক থেকে তাঁর কিছু কবিতা দুর্বোধ্য, কিন্তু শব্দের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর প্রায় কোন শব্দই অবোধ্য নয়। তিরিশোত্তর বাংলা কবিতায় কাব্যধর্মী শব্দচয়নে জীবনানন্দ দাশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। আসলে কোনো শব্দ বা কোনো পদ-ই স্বভাবত কাব্যধর্মী অথবা স্বভাবত কাব্য বিধর্মী নয়। শব্দ মাত্রেই নির্গুণ, শব্দের গুণ জন্মায় অপর শব্দের 'কন্‌টেক্সট-এ পরিবেশে' জীবনানন্দ তা জানতেন এবং জানতেন বলেই গ্রাম্য-অন্ত্যজ-অকুলীন শব্দ ব্যবহারে তিনি যেমন কার্পণ্য করেননি, তেমনি তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী, (লোকজ) শব্দ ব্যবহারেও তিনি সার্থক শব্দ-শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ থেকেছেন। তিনি শুধু ভেবেছেন—কোন্ শব্দের সঙ্গে কোন্ শব্দ আনুষঙ্গিক। কোন্ পরিবেশে কোন্ শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য। এ সৎ ও মহৎ ভাবনা থেকেই তিনি যে শব্দভুবন গড়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যে, তা আধুনিক বাংলা কবিতায় পরম সম্পদ। তৎসম শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অবোধগম্য তৎসম শব্দ তাঁর কবিতা ও কাব্যে নেই বললেই চলে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দ যেমন :

১. এ্যম্বক-পিনাকে তব শঙ্কাকুল ছিল সদ্য শত্র—অক্ষৌহিনী। (ঝ. পা/জীকাস পৃ. ৩৯৮)
২. লোষ্ট্র, আমি, জীবন আর নক্ষত্রের তানাদি বিবর্ণ বিবরণ। (ম. পৃ. ঐ, পৃ ২০৫)
৩. অন্ধকার সংসার, ব্যাজস্তুতি, ভয় নিরাশার জন্ম হয়। (সা. তা. তি. ঐ, পৃ. ২৬৯)
৪. এর চেয়ে বেশি ব্যথা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিতে পারে; (বে. অ. কা. রে. ঐ, পৃ. ৩১২)

এখানে শুধু আমরা এ্যম্বক, লোষ্ট্র, ব্যাজস্তুতি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তৎসম শব্দগুলো লক্ষ্য করবো। শব্দগুলোর ব্যবহারে যেমন প্রাসঙ্গিকতা আছে, তেমনি আছে ভাবের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতার মিল। তাই জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় তৎসম শব্দ কোন্ কোন্ জায়গায় ব্যবহার করলেও তা কর্কশতাকে আশ্রয় করেনি এবং প্রাঞ্জলতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর অনেক কবিতায় অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাংগীতিক ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টির জন্য তিনি এমনটি করেছেন। ফলে তাঁর কবিতায়

অন্তরবাহী সাংগীতিক প্রসঙ্গটি আমাদের আকৃষ্ট করে। সাংগীতিক ধ্বনি কবিতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। এ অনুষঙ্গকে কবিতায় ধারণ করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। উদাহরণ নেয়া যাক :

১. কেহ নাই,—আঙুলের হাতের পরশ। সেইখানে নাই আর,—(ধূ. পা. জীকাস. পৃ. ১৯)

২. যেন এ-জনমে নয়-যে ঢের যুগধরে কথা শিখিয়াছে। এ হৃদয়—(রূ. বা. ঐ. পৃ. ১২৩)

৩. অনেক মেধাবী সুখ স্বপনের বন্দরের তীরে। যদিও পৃথিবী আজ সৌন্দর্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে। (ম. পৃ. ঐ. পৃ. ২০২)

এখানে পরম, জনম, স্বপন—এ অর্ধতৎসম শব্দগুলো তৎসম শব্দ থেকে উচ্চারণ বিকৃতির ফলে বাংলায় এসেছে স্পর্শ→পরশ, জন্ম→জনম, স্বপ্ন→স্বপন। সাংগীতিক প্রয়োজনে এ অর্ধতৎসম শব্দগুলো জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। তেমনি এ শব্দগুলোর রূপও কবি তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছেন। যেমন :

১. পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ নিয়ে গেছে তারে (ধূ. পা. ঐ. ৭৮), ২. আমরা যাইনি মরে আজো-তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় : (সা. তা. তি. ঐ. ১৪৯), ৩. ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি; (ধূ. পা. ঐ. ৮০)। এখানে স্পর্শ, জন্ম, স্বপ্ন—তৎসম শব্দ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় সাংগীতিক প্রয়োজনীয়তায়, যখন যেখানে যে শব্দ প্রয়োজন, তা সে তৎসম-ই হোক বা অর্ধতৎসম-ই হোক, ব্যবহার করেছেন। এবং সে শব্দগুলোর প্রয়োগ চাতুর্যই তাঁর কবিখ্যাতির উৎস-মূল।

বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসেবে তদ্ভব শব্দের এক উজ্জ্বল স্থান আছে। এ শব্দগুলো ভারতীয় আর্য ভাষার বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদরূপে গণ্য হয়েছে। জীবনানন্দ দাশের কাব্যে ব্যবহৃত কিছু তদ্ভব শব্দ; যেমন :

১. দেখিব খয়েরি ডানা—শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে (রূ. বা. জীকাস, ১০৯), ২. হলুদ পেঁপের পাতাকে একটা আচমকা পাখি বলে ভুল হবে না তোমার (ম. পৃ. ঐ. ১৯৭), ৩. মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা, (বে. অ. কা. বে. ঐ, ৩৩৬), ৪. মরুকে নদীর মতো মনে ভেবে অনুপম সাঁকো। আজীবন গড়ে তবু আমাদের প্রাণে (ঐ ৩২২), ৫. থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা/অশ্বত্থের ডালে বসে এসে, (ম. পৃ. ঐ, ১৮৯)।

এখানে শুধু আমরা-আসে, হলুদ, দাম, সাঁকো ও বসে শব্দগুলোর দিকে তাকাবো। এ তদ্ভব শব্দগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত এবং বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর্যভাষা—আবিশতি>আবিসতি>আইসই>আইসে>আসে, হরিদ্রা হলিদ্দা>হলদি>হলুদ, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে-গ্রিক, দ্রাখমে সংদ্রম্য দম্ম দাম, প্রা. ভা. আ. সংক্রম সংকম সাঁকো, প্রা. ভা. আ. উপবিশতি উপবিসই বইসই বৈসে বসে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় প্রচুর তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া ভালো। চলতি বাংলায় আমরা তদ্ভব শব্দের অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করে থাকি। তাছাড়া ক্রিয়া-সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ,

অভিশ্রুতি-স্বরসঙ্গতির প্রয়োগ আধিক্য, বাক্যে স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকি। কিন্তু সাধু বাংলায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য-লক্ষ্য করা যায়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সাধু বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের হার দিয়েছেন ৪৪% ভাগ এবং তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের হার উল্লেখ করেছেন ৫১.৪৫% ভাগ। তাছাড়াও সাধু বাংলায় ক্রিয়া-সর্বনামের পূর্ণ রূপ এবং বাক্য গঠনে বিশেষ রীতির প্রসঙ্গ থাকে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ সাধু ও চলতি উভয় ভাষাতেই তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। ক্রিয়ার ব্যবহারেও উভয় রীতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কবিতায় তৎসম শব্দ খুব বেশি ব্যবহার করেননি। প্রসঙ্গত আমরা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সাধু ও চলতি রীতির পাশাপাশি প্রয়োগ লক্ষ্য করি :

১. কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—(রূ. বা. জীকাস ১১০), ২. হেমন্ত আসিয়া গেছে; চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি; (বসে, ঐ ১৬১), ৩. কাশ আর চোর—কাঁটা ছেড়ে দিয়ে ফড়িং চলিয়া গেছে ঘরে। (ম. পৃ. ঐ ১৭৫) ইত্যাদি।

এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি কাব্যেই কবি সাধু বাংলা-চলতি বাংলার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এবং এ মিশ্রণের ফলে ভাব প্রকাশের সম্ভাবনাকে যেমন তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি ধ্বনি সম্যের সাঙ্গীতিক চাতুর্যকেও ধারণ করেছেন। ফলে শব্দ নির্বাচন ও তার ব্যবহারে শিল্পীত সংগতি, নতুন কবি ভাষার জন্ম দিয়েছে। চলতি ও সাধু বাংলার এ মিশ্রণ সম্পর্কে অমলেন্দু বসু বলেছেন—জীবনানন্দ ছিলেন বিদ্বান, অতীব আত্মসচেতন কবি, তাঁর সুরেলা চিত্তে অবশ্য এ মিশ্রণের একটা বিশেষ অর্থ ছিল। আর সেই অর্থ আমাদের শিখিয়ে দেয় যে, কাব্যের কাব্যত্ব সর্বক্ষেত্রে কাব্য ভাষা প্রয়োগে সীমাবদ্ধ নয়। এবং সীমাবদ্ধ নয় বলেই জীবনানন্দ দাশ জনগণের মুখ থেকে কাব্যের দরবারে অপাংক্তেয় অনেক শব্দ নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব কবি-ভাষা। তাঁর সমসাময়িক কবিরাও এ পরীক্ষায় নেমেছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ দাশকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। অবশ্য প্রকৃত কাব্যভাষা কেমন হবে, এ সম্পর্কে অভিন্ন মতের সাক্ষ্য আমরা পাই না। যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃত কাব্য বলতে চেয়েছিলেন গ্রাম্য মানুষের ভাষাকে এবং তিনি গদ্যভাষা ও কাব্যভাষায় কোন পার্থক্য স্বীকার করেননি। ফলে কোলরিজের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটেছিল। সে যাহোক, জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবি-ভাষা নির্মাণ করে নিয়েছিলেন নিজস্ব প্রতিভার অনুশাসনে। সেই অনুশাসনে প্রভাব ফেলেছিল দেশীয়/লোকজ শব্দ। আমরা এখানে জীবনানন্দ দাশের ব্যবহৃত দেশীয় বা লোকজ শব্দের একটি পরিচয় তুলে ধরছি :

১. জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়—এইসব ছুঁয়ে ছেনে; (ধূ. পা. জীকাস ৫), ২. আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—মুখে আছে নদীর এপারে। বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝরে পড়ে তার। শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে; (ঐ. ৩৮), ৩. আমরা দু'জনে বসে—বলিয়াছি ছেঁড়াফাঁড়া কতো। মাঠ ও চাঁদের কথা; (রূ. বা. জীকাস, ১৩০), ৪. হিমের রাতে শরীর উম রাখবার জন্য দেশোয়ালিরা সারা রাত মাঠে—আগুন জ্বেলেছে; (বসে, ঐ ১৫৫), ৫. ইন্দ্রলোকের অপ্সরীদের ঘাটা, গ্লাসিয়ারের যুগের মতন আঁধারে নীরব। (বে অ কা রে, ঐ ৩৩০)।

দেশী বা লোকজ শব্দ ব্যবহারে জীবনানন্দ দাশ যে অবিসংবাদিত খ্যাতির অধিকারী, ওপরের উদাহরণে তার প্রমাণ অস্পষ্ট নয়। জীবনানন্দ দাশের এ ভাষা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে, সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করেও তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর Dicton সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তাঁর অনুকরণ করাও সহজ বলে মনে হয় না।...তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরি করে নিতে পেরেছেন, এজন্য তিনি গৌরবের অধিকারী।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় বিদেশী শব্দ অর্থাৎ আরবি-ফারসি-ইংরেজি প্রভৃতির ব্যবহার দেখিয়েছেন। তাঁর 'ঝরাপালকে' যেমন আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু পরবর্তী কাব্যগুলোতে তেমন আর দেখা যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলামের আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের ঐতিহ্য নিয়েই তিনি তাঁর কাব্যে এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দ দাশের আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের পরিচয় এখানে তুলে ধরছি :

১. আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা করে। (ঝপা, জীকাস—৩৫৭), ২. সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার (মপৃ, ঐ—১৯৯), ৩. কালো দস্তানায় যেন সমর্পিত (জীকাস—২৩১), ৪. মানুষের হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল (ঐ—২৭৪), ৫. তবুও বেদম হেসে খিল ধরে যেতে বলে বেড়ালের পেটে (ঐ—৪৩৯), ৬. হাসপাতালের জন্যে যাহাদের অমূল্য দাদন (ঐ—৪৪৪)।

জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'ঝরা পালকে' আরবি-ফারসি শব্দ, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে দেশী বা দেশজ শব্দ, 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'র ইংরেজি শব্দের প্রয়োগবহুলতা উল্লেখ করার মতো। ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের ফলে তাঁর কবিতায় বেজে উঠেছে আন্তর্জাতিকতার সুবিনীত সুর। আমরা এখন জীবনানন্দ দাশের কাব্যে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্য লক্ষ্য করবো :

১. ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের পর—নেমেছিল তারা তারপর (জীকাস—৭৪), ২. স্কোয়াস খাবে হয়তো বা, বোম্বায়ের টাইমসটাকে/বাতাসের বেগুনে উড়িয়ে....সেই রলরোলে তিনচার ধনু ধনু দূরে দূরে এয়োরোড্রামের কলরব/লক্ষ্য পেল অচিরেই...কখন সে বাজেট মিটিং পার্টি পলিটিক্স, মাংস, মার্মালেড ছেড়ে/অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল (ঐ—২৭৬), ৩. আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস/মিডলম্যানদের কাছে পর নয় (ঐ—৩৭৭), ৪. কিছুটা সুবিধা করে দিতে যেত—মাটির দরের মতো রেটে (ঐ, ৪৩৯), ৫. ইলেক্ট্রনেরা নিজ দোষ-গুণে বলয়িত হয়ে যাবে (ঐ. ৪৫২), ৬. দিনের আলোয় ওই চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততাঃ/পথে ঘাটে ট্রাক—ট্রামলাইনে ফুটপাথে (ঐ ৪৫৪) ইত্যাদি।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী/লোকজ, বিদেশী শব্দের সাফল্যজনক প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করলাম। জীবনানন্দ দাশ জানতেন, শব্দকে বাক্যের মধ্যে নতুন ব্যঞ্জনা দিতে না পারলে, তা কখনো শিল্পোত্তীর্ণ হয় না। তিনি

আরো জানতেন, বহু ব্যবহারে শব্দ জীর্ণ হয়, সেজন্যেই তিনি ঝরাপালকের পর আরবি-ফারসি শব্দের প্রতি আগ্রহ কমিয়ে এনেছিলেন এবং পরবর্তীতে নতুন শব্দ সৃজনে এবং প্রয়োগে অভিনিবেশ করেছিলেন। বাংলাদেশের অপরূপ প্রকৃতি জীবনানন্দ দাশকে উপহার দিয়েছিল উল্লেখযোগ্য শব্দ সম্পদ। তাছাড়া তিনি পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ও স্থানকে তাঁর কাব্যে তুলে নিয়েছেন, যা তাঁর শব্দ ভাণ্ডারের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে পর্যাপ্তভাবে। যেমন—

বিখ্যাত ব্যক্তি : যখন মুকুন্দরাম রায়/লিখিতেছিলেন বসে দু-পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল, বল্লালের বাংলায় কবে যে উঠিলে তুমি জেগে,...অর্জুনের মতো আহা, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে। সেখানে ছিলাম আমি, হয়তো চেঙ্গিস আজো বাহিরে ঘুরিতে আছে করুণ রক্তের অভিযানে। বহু উপদেশ দিয়ে চলে গেলে কনফুশিয়াস—একদিন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাথে করে—হিটলার সাত কনাকড়ি/দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল, গগ্যার ছবির মতো, নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাতৎ-সে এঞ্জেলো—রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী/হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এসেছে? বুদ্ধের চেয়েও আরো দীন সুষমায় সুজাতার/মৃত বৎসকে বাঁচায়েছে। কেউ যেন; এম্পিডোক্লেসের মৃত্যু নয়; সেই মৃত্যু বৎসনের মতো মনে হয়। সোফোক্লেস ও মহাভারত মানবজাতির এ ব্যর্থতা জেনেছিল, মাতিগের—সেজানের—পিকাসোর,/অথবা কিসের ছবি? বুদ্ধ সোক্রাতেস্/কনফুচ লেলিন গ্যেটে হ্যোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে/আলোকিত হতে চায়; বলে গেল বায়ুলোকে নার্গাজুন, কৌটিল্য কপিল,/চার্বাক প্রভৃতি নিরীশ্বর; যদিও প্লেটোর থেকে রবি ফ্রয়েড নিজ নিজ চিন্তার বিষয় ঈশার শবোত্থান বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু করে। হেগেল ও মার্কস....ঘুরে যায় স্টালিন, নেহেরু, ব্লক অথবা রায়ের বোঝা বয়ে, এখন শেল্‌ফে চার্বাক ফ্রয়েড প্লেটো পাভলভ ভাবে। সুজাতাকে আমি ভালোবাসি কিনা। ইত্যাদি। তাছাড়া মহাত্মাগান্ধী ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ। বিখ্যাত স্থান : একদিন যদি আমি কোনো দূর মাদ্রাজের সমুদ্রের জলে/ফেনার মতন ভাসি শীত রাতে—স্বপ্ন কি দেখেনি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড় বাংলা/দিল্লি বেবিলন? চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; নীলাভ জনের রোদে কুয়ালালামপুর, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীন, বালি/অনেক ঘুরেছি আমি পায়ের ভঙ্গির নিচে হংকঙের তৃণ, বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে—বৈশালী থেকে বায়ু—গেৎসি—মানি—আলেকজান্দ্রিয়ার/মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে পড়ে অমায়িক সংকেতের মতো; বেবিলন লন্ডনের জন্ম, মৃত্যু হলে—তবুও রয়েছে পিছু ফিরে। কলকাতা থেকে দূর/গ্রিসের অলিভবন/অন্ধকার, ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেরে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার, উরময় হর আথেনস রোম কলকাতা রোদের সাগরে লোকার্ন হের্সাই মিউনিখ অতলন্তের চার্টারে/ইউ.এন.ওয়ের ভিড়ে আশা দীপ্তিকান্তি বাধা ব্যাসকূট বিষ—ইন্দ্রদ্যুম্নে উজ্জয়িনীতে মথুরা বৃন্দাবনে/পাটলীপুত্র শ্রাবস্তী কাশী কোশল তক্ষশীলা/অজন্তা আর নালন্দা তাঁর রটিছে কীর্তিলীলা প্রভৃতি। জীবনানন্দ দাশ এসব

বিখ্যাত ব্যক্তি ও স্থানের নাম কবিতায় ব্যবহার করে যে আন্তর্জাতিকতার আবহ সৃষ্টি করেছেন, তা তাঁকে শক্তিমান কবির মর্যাদা দিয়েছে। কারণ, আধুনিক কবিতার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় বিশ্বের অভিধান থেকে। জীবনানন্দ দাশ এ বিষয়ে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সন্দেহাতীত সত্যের আকারে প্রতিভাত।

বিশেষণের সুনিপুণ ব্যবহারের কলাময় কৃতিত্ব জীবনানন্দ দাশের কবি-প্রতিভার এক উজ্জ্বল অনুষঙ্গ। তাঁর চিন্তা ও চেতনা, অনুভব ও অনুশীলনের আশ্রয় এ বিশেষণ। আমরা জীবনানন্দ দাশের কাব্যে ব্যবহৃত কিছু বিশেষণ ও তার প্রয়োগ নৈপুণ্য উদ্ধার করি : ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদের আকাশ পিছে রেখে/চলে যাই; মসৃণ হাড়ের মতো সাদা হাত দু'টি/বুকের উপরে তাঁর রয়েছিল উঠি। যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ন লেগুন/কেঁদে ওঠে—চেয়ে দ্যাখে কখন গভীর নীল মিশে গেছে সেইসব হুন, মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ এইখানে ফাল্গুনের ছায়ামাখা ঘাসে শুয়ে আছি; গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে/আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে। বানরী ছাগল নিয়ে যে ভিক্ষুক প্রতারিত রাজপথে ফেরে—প্রান্তরের অমরতা জেগে ওঠে একরাশ প্রাদেশিক ঘাসের উন্মেষে, করুণার ছোট বড় উপকণ্ঠে—সাহসিক নগরে বন্দরে।

এখানে ফ্যাকাসে মেঘ, মসৃণ হাড়, বিষণ্ন লেগুন, গভীর নীল, মৌসুমী সমুদ্র, নীলাভ ব্যথিত...চোখ, ফাল্গুনের ছায়া মাখা ঘাস, অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগ, প্রতারিত রাজপথ, প্রাদেশিক ঘাস, সাহসিক নগর—এসব বিশেষণ প্রয়োগ কবি জীবনানন্দ দাশের কবিত্ব শক্তির গাঢ়ত্বকে নির্দেশ করে। আরো অনেক উদ্ধৃতি চয়ন করা যায়। কিন্তু তা বাহুল্য বলে মনে করি। তবে একটি বিশেষণের প্রতি জীবনানন্দ দাশ বড় দুর্বল। সে বিশেষণটি হলো—'ঢের'। একটু সুযোগ পেলেই তিনি এ বিশেষণটির সদ্ব্যবহার করেছেন। কিছু উদাহরণ যেমন—বেন ঢের যুগ ধরে কথা শিখিয়াছে।/এ-হৃদয়-পৃথিবীর বুকে আমি কেটেছি আঁচড় ঢের, অশ্রু গেছি রেখেঃ তবুও আঁধারে ঢের মৃত কুকুরের মুখ—, ঢের ধুলোখড়/লেগে আছে বুকে তার, সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চলে গেছে পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থাকে আমাদের আয়ু, তারপর ঢের দিন চলে গেলে আবার জীবনোৎসব, ঢের ছবি দেখা হল—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তাহাদের ইতিহাস—ধারা ঢের আগে শুরু হয়েছিল; ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে/হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করছে ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের ব্যবহারে জীবনানন্দ দাশ নতুন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দিয়েছেন। যদিও 'ঝরাপালকে' ক্রিয়ার অপভ্রংশরূপ অর্থাৎ (একদিন খুঁজেছিনু যারে), ছিনু বা গেনু'র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ঝরাপালকোত্তর কাব্যগুলোতে জীবনানন্দ দাশ এ রীতি পরিহার করেছিলেন। যদিও কেটেছে, ঘরছিল, খাচ্ছে-নিচ্ছে, আওড়াচ্ছে-জ্বলছে, খুলিয়া—ক্রিয়াপদের এসব রূপের ব্যবহার আছে, কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে

ছড়াতেছে, ফুটাতেছে প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার। জীবনানন্দ দাশের কাব্যে ব্যবহৃত এ ধরনের কিছু ক্রিয়াপদের উদাহরণ দেয়া যাক : ক. তাহার বুকের রক্তে পৃথিবী হতেছে শুধু লাল। খ. ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়, গ. ভেরেণ্ডাফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে—সাদা স্তন ঝরে করবীর, ঘ. বুকে তার লাল পেড়ে ভিজে শাড়ি অরুণ শঙ্খের মতো ছবি/ফুটাতেছে, ঙ. পাখির নীড়ের থেকে খড়/ছড়াতেছে, চ. ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়। ছ. যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর. জ. ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন/হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন। ঝ. পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে, ঞ. সম্বর মৃগের বেড় জড়ায়েছে যখন পাহাড়ে, ত. কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে/বধ করে ঘুমাতেছি, থ. মাঠের কিনারে বসে শুষ্ক পাতা পোড়াতেছে কয়েকটি নির্মল সন্তান প্রভৃতি।

মধ্যযুগের কবিসহ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবিদের কবিতায় আমরা নাম ধাতুর ব্যবহার লক্ষ্য করি। জীবনানন্দ দাশও তাঁর কবিতায় নাম ধাতু ব্যবহার করেছেন। তবে 'ঝরা পালকে' নামধাতুর ব্যবহার যেমন প্রচুর, কিন্তু পরবর্তী কাব্যগুলোতে নাম ধাতুর তেমন বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। ঝরাপালকে ব্যবহৃত নামধাতু, যেমন : উদ্বেলিছে, বিথারিয়া, রচিয়াৎ, আন্ধালিয়া, উথলিছে, বরিয়া, হেরিয়াছে, বিলসিছে, বিমথিয়া, নিঙারিয়া, শিহরিয়া, কুহরিয়া, পরশিয়া, লভেছিনু, পশিয়াছিনু, উথলিন, চুমিয়াছি, পরিহরি, ধনিলে, দানিলে, রণিয়া, অর্পিলে, রটিছে, উজলি, লভিয়াছে, দহি, ত্যাজিয়া, সমর্পিয়া, সন্তরি, আন্দালিছে, ক্ষরিছে, চুমিয়া, আবরি, হেরিবে, লাগি জাগি, বহি, বরি, প্রকাশি, ঝরি, রণি, টুটি, গড়ি, বিপরি, খুলি, নাশি প্রভৃতি। 'ঝরাপালক' ছাড়া অন্যান্য কাব্যে ব্যবহৃত নামধাতু : ছানি, মর্মরিয়া, চুমি, রচিতেছে, রচেতেছে, রচেছিল, প্রকাশি, লভিবার প্রভৃতি।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থের 'সমারূঢ়' কবিতাটি শুরু করেছেন একটি 'অব্যয়' দিয়ে, অব্যয়টির নাম বরং—"বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা'। এ অব্যয় শব্দ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উল্লেখযোগ্যভাবে ছড়িয়ে আছে। মতো, মতন, যেন—এসব অব্যয় উপমা-উৎপ্রেক্ষার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। তবে জীবনানন্দ দাশের সবচেয়ে প্রিয় এবং সার্থক প্রয়োগিত অব্যয়—'তবু'। সমালোচক বলেছেন—'দুই অক্ষরের ছোট একটি শব্দ, একটি অব্যয় : 'তবু'—এ হচ্ছে জীবনানন্দ দাশের রহস্য শাস্ত্র বিষয়—সিন্দুকের সোনার চাবি। যে জটিলতা...জীবনানন্দ, তাকে খুলে ফেলতে হলে এ চাবি আবশ্যিক। জীবনানন্দের উক্ত জটিল মানসিকতা বাক্য ও বক্তব্যের প্যাঁচানো প্যাটার্নে প্রকাশিত। বক্তব্যের দ্বৈরথে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানায়, সহজীবীদের মধ্যে জীবনানন্দ একক : ঝরাপালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, বেলা-অবেলা কালবেলা কিংবা তাঁর অন্য কবিতাবলীতে 'তবু' শব্দের ব্যবহার অজস্র এবং সার্থকতাবাহী। 'তবু' অব্যয় নিয়ে জীবনানন্দ দাশের উদ্ধৃতি অনেক পৃষ্ঠা বাড়ানো যায়।

কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। 'তবু'—জীবনানন্দ দাশের কাব্য-ভাবনাকে বৈচিত্র্যমুখী করেছে, জীবন-যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত কবিকে দিয়েছে শান্তির সন্ধান, কখনো মৃত্যুর হিম-শীতল সারাৎসার, কখনো নির্মাণ করেছে অপরিসীম শূন্যতার ভুবন। নির্মাণ করেছেন অখণ্ডকাল চেতনার, সময়-ভাবনার নিরেট নির্মোক। তাই 'তবু' অব্যয়টি জীবনানন্দ দাশের চিন্তা-চেতনার এক নির্ভরযোগ্য 'সুইচ' হিসেবে কাজ করে গেছে।

বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সমাস ব্যবহার। জীবনানন্দ দাশ তাঁর ঝরাপালক গ্রন্থেই শুধু এ বিষয়টির ওপর বেশি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। ঝরাপালকোত্তর কাব্য-সাধনায় জীবনানন্দ দাশ আর এদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলেননি। তাঁর সমাস-চিন্তা স্থান দখল করে নিয়েছিল অলংকার অন্বেষায়। আমরা এখানে ঝরাপালক কাব্যগ্রন্থে সংখ্যাভিত্তিক বিচারে দ্বিপদী, ত্রিপদী, চারপদী, পঞ্চপদী ও ষষ্ঠপদী সমাসের উদাহরণ তুলে ধরবো। দ্বিপদী সমাস : দাদুরী কাঁদানো, শাঙন-দরিয়া, চুয়া-চন্দন, অশ্রু-বেদনা, গরল-মদির, জীবন-সৈকত, শ্মশান-ডমরু, দাব-মরুভূমি, জৌলুস-রাস্তা, জিন-সর্দার, জীবন-রবার, যৌবন-শতদল, বালু-পারাবার, ঘর-দোর, খুন-রোশ্‌নাই, ছলা-মরীচিকা, মরণ-সাহারা, বন্দনা-মালা, বালুকা-পথ, নদী-ঝর্ণা, নদী-নির্ঝর, চরণ-চিহ্ন, দূর-দুরাশা, কেউটে-ঢেউ, কনক-রোদ, বরুণ-রাণী, প্রবাল-দ্বীপ, নিখিল-বিশ্ব, টাইফুন-ডঙ্কার, যৌবন-গর্জন, বাড়ব-আরক্ত, খুন-দুরন্ত, অতীত-আখের, প্রবাল-পালঙ্ক, হৃদয়-মণ্ডল, জল-বেদিরা, রহস্য-পাতাল, কপোত-ব্যথা, বাদল-বৌ, ফাঁপর-ফাটা, ছলা-মরীচিকা, অশ্রু-কুহেলিকা, ছায়া-বৌ, দূর-সোহাগী, ফাটক-কারাগার, শ্মশান-বোঝা, ধ্বংস-গিরি, গোধূলি-আঁধার, ছায়া-কুহেলিকা, পৌষ-নীরবতা, অঙ্গার-সমাধি, রাত্রি-কুমারিকা, আঁধার-সাগর, স্বপন-সংকুল, পাতাল-নিলয়, শ্মশান-শয্যা, চিতা-স্ফুলিঙ্গ, ক্ষুধিত-আঁধার, নাগ-কামিনী, পল্লী-পসারিণী, চুম্বন-শোনিয়া, নিশি-মরু, প্রাসাদ-অলিন্দ, যক্ষ-প্রাসাদ, মধুর-নীলিমা, সুর-পরী, আসন্ন-দিবস, দরিদ্র-নারায়ণ, প্রেম-খঞ্জর, স্বার্থ-লালসা, প্রহসন-পরিহাস, অপঘাত-মহামারী, তুহিন-অধর, কঙ্কাল-অঙ্গুলি, বৈতরণী-মরু, হিমানী-পাথর, কামনা-সাহারা, মরণ-সন্ধানী, মেঘ-রক্ত, অতিথি-সভ্যতা, মিসর-অলিন্দ, প্রেত-আঁখি, কপাল-কবর, চাঁদিনী-শরাব, মধু-পরিণয়, মিলন-বাসর, ছায়া-বধূ, ছায়া-ধূপ, বিধবা-নয়ন, হিম-সরণি, শ্মশান-শিঙা, সূতিকা-আলয়, শৈবাল-বিছানা, অশ্রু-অমানিশা, প্রেত-জ্যোৎস্না, পথিক-অতিথি প্রভৃতি।

ত্রিপদী সমাস : কঙ্কুম ভাঙা গাল, নারাঙ্গি ফাটা অধর, মধু পরিণয় রাতি, সর্বনাশ-ব্যসন-বাসনা, কামনার করব বন্ধন, পিছুডাকা-স্বর, অশ্রু-পাথার-কূল, অশ্রু-কুহেলিকা-মাখা, হাসি-অশ্রু-উৎসব, শান্তি-কুসুম-দাম, শস্য-স্বর্ণ-পসরা, অকলঙ্ক-সৌন্দর্যের বিভা প্রভৃতি।

চারপদী সমাস : প্রেম পুণ্য-পূজার-গরিমা, নবোৎফুল্ল মাধবীর গান, মিলন মদির নিধুর কানন, মৃত্যুর সুমেরু-সিন্ধু-অন্ধকার, সৃজনের যাদুঘর রহস্যের চাবি, ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু, দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ, আকাশের রত্নচূড় ময়ূখের টিপ প্রভৃতি।

পঞ্চপদী সমাস : পাতা ঝরা আঁধারের মুশাফির হিয়া প্রভৃতি।

ষষ্ঠপদী সমাস : মরকত-ইন্দ্রনীল-অয়স্কান্ত খনির তিমির, তৃষ্ণা-দৈন্য-দুরাশা-জর-সংগ্রাম-ভুল, নৃত্যগীতহাসি অশ্রু উৎসবের ফাঁদ প্রভৃতি।

সপ্তপদী সমাস : সন্ধ্যারাগ-প্রতিবিম্বে প্রস্ফুটিত সমুদ্রের আচম্বিত ইন্দ্রজাল।

'ঝরাপালকের' পরে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এ ধরনের সমাস অতি অল্পই চোখে পড়ে। যেমন—অক্ষিগোলক, অগ্নিপরিধি, প্রসববেদনা, তিমির-বিলাসী, তিমির-বিনাশী, হিমচোখ, সূর্য-তাড়সে, কিন্নর কণ্ঠ, ভ্রান্তিবিলাস, সময় গ্রন্থি প্রভৃতি। কাজী নজরুল ইসলাম এবং মোহিতলাল মজুমদারের সে প্রভাবকে অতিক্রম করেছিলেন সমাসের ব্যবহার একেবারে কমিয়ে দিয়ে।

প্রবাদ অথবা প্রবচন ভাষাকে পুষ্ট করে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর বাক্যে বা স্তবকে এ প্রবাদ বা প্রবচনের সার্থক ব্যবহার দেখিয়েছেন, যা তার ভাষাকে করেছে প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। আমরা জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে প্রবাদ প্রবচনের উদাহরণ তুলে ধরছি : ক. কী করে ধর্মের কল নড়ে যায় মিহিন বাতাসে; খ. অব্যয় শিল্পীরা সব; মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে। গ. আদার ব্যাপারী হয়ে এইসব জাহাজের কথা/না ভেবে মানুষ কাজ করে যায় শুধু/ভয়াবহভাবে অনায়াসে; ঘ. গোলক ধাঁধার পথে ঘুরি; ঙ. অভাবে স্বভাব নষ্ট না হলে মানুষ এই সবে/হয়ে যেত একতিল অধিক বিভোর; চ. আকাশ-কুসুম বীথি দিয়া/মান্য তুমি আনো না রচিয়া; ছ. চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে প্রভৃতি। তবে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার খুব বেশি নেই।

জীবনানন্দ দাশ কমা, সেমিকোলন, কোলন, ড্যাস, কমা-ড্যাস, সেমিকোলন-ড্যাস বিরাম চিহ্নগুলোর সাহায্যে, কোন পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করেছেন। কমা-ড্যাস এবং সেমিকোলন-ড্যাস-এর প্রতি কবির দুর্বলতা বেশি। লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো—জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতা, বিশেষত 'রূপসী বাংলা'র প্রায় সব কবিতাই এক-একটি বড় বাক্য হিসেবে গড়ে উঠেছে। এ বাক্যের অনেক কবিতায় তিনি শেষে শুধু একটি দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন। ফলে একটি কবিতা একটি বড় বাক্য হয়ে গেছে। বড় বাক্য গঠনে জীবনানন্দ দাশের এ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। ভাষার স্বাভাবিক ক্রম, অর্থাৎ কর্তা, কর্ম-ক্রিয়ার সাহায্যে যে স্বাভাবিক বাক্য গঠিত হয়, জীবনানন্দ দাশ সে স্বাভাবিকতাকে ভেঙে বাক্য গঠনে নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এমন ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল নিদর্শন লক্ষ্য করার মতো।

এবার আমরা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাক্য ও স্তবকের ব্যবহার আলোচনা করবো। বাক্যের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের ওপর একজন কবির সাফল্য নির্ভরশীল। কোরমে বলেছেন—'বাক্য হচ্ছে এক বা একাধিক শব্দের সাহায্যে ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ,—বাক্যে শব্দগুলো এমন রূপে ও ভাবে বিন্যস্ত হয়, যাতে ঈপ্সিত অর্থ দ্যোতিত হয়। বাক্য ও স্তবক গঠনে জীবনানন্দ দাশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায়
বাক্য :

সংকেত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	মোট বাক্য	শতকরা হার	মন্তব্য
ছোট বাক্য	×	১	×	×	×	৪	৩	৮	×	১	১৭	১৯.১০%	কম
মাঝারি বাক্য	১২	×	×	২	৪	২	৭	×	×	×	২৭	৩০.৩৩%	-
বড় বাক্য	৫	১	১	৫	৯	৩	৬	১২	১	২	৪৫	৫৩.৫৬%	বেশি
মোট বাক্য	১৭	২	১	৫	১১	১১	১১	২৭	১	৩	৮৯	-	-
মোট পংক্তি	৪৬	১৪	৫৫	৪৩	৫২	৯৭	১২	১২	-	-	-		

এখানে, ক=দেশবন্ধু (ঝপা/জীকাস/৩৯), খ=মৃত্যুর আগে (ধূপা/ঐ/৭৭-৭৮), গ=বাংলার মুখ আমি (রূবা/ঐ/১১০), ঘ=হাওয়ার রাত (বসে/ঐ/১৪৮-৫০), ঙ=সিন্ধু সারস (মপৃ/ঐ/১৭৭-৭৯), চ=তিমির হননের গান সাতাতি/ঐ/২৭৯-৮১), ছ=সময়ের তীরে (বেঅকাবে/ঐ/৩৪২-৪৪), জ=এইসব দিন রাত্রি (অন্যান্য কবিতা/ঐ/৪৪৩-৪৬), ঝ-কার্তিকের ভোর বেলা (মবি/৩৫), ঞ=বিপাশা (আপৃ/৫৮)। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বড় বাক্য বেশি, ছোট বাক্য কম।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায়
স্তবক

সংকেত	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	মোট স্তবক	শতকরা হার	মন্তব্য
ছোট স্তবক	৩	২	৪	৭	×	৭	৪	৫	৪	৫	৪১	৫৭.২১%	বেশি
মঝারি স্তবক	৪	×	১	২	২	৪	১	×	২	১	১৭	২৭.৮৬%	
বড় স্তবক	১	×	×	১	১	×	×	×	×	×	৩	৪.৯৯%	
মোট স্তবক	৮	২	৫	১০	৩	১১	৫	৫	৬	৬	৬১	-	-
মোট পংক্তি	৯৬	১৩	৩৩	৮৫	৫৪	১০৪	৪১	১৪	৫২	৪৭	-	-	-

এখানে, ক=ক্যাম্পে (ধূপা/জীকাস/৪৩), খ=সেই দিন এই মাঠ (রূবা/ঐ/১০৯), গ=সুচেতনা (বসে/ঐ/২৬৯), ঘ-আট বছর আগের একদিন মপৃ/ঐ/১৮৬), ঙ=সময়ের কাছে (সাতাতি/২৮৭), চ=মহাত্মাগান্ধী বেঅকাবে/ঐ/৩৪৫), ছ=সাগর বলাকা (ঝপা/ঐ/৩৭০), জ=এই শান্তি (জীকাস/৯৫), ঝ=লোকেন বোসের জর্ণাল (ঐ/৪৫১), ঞ=মহাজিজ্ঞাসা মবি/৩৮), জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ছোট স্তবক বেশি বড় স্তবক কম

ছন্দকুশলী কবি জীবনানন্দ

নীলরতন সেন

কবিকে বুঝবার ব্যাপারে তাঁর কবিতার ছন্দ আলোচনার আবশ্যকতা কতটুকু, সঙ্গতভাবেই পাঠক সে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কৈফিয়তস্বরূপ ছন্দজিজ্ঞাসু সমালোচক বলবেন, কবিতামাত্রেই যখন কোনো না কোনো ছন্দ-বন্ধন থাকে, এবং পাঠক যখন সেই বাঁধন মেনে নিয়ে কবিতা পাঠ করলে তার ভাব ও ধ্বনি-স্পন্দনের মাধুর্য উপভোগ করতে পারেন, সেখানেই কবিতা পাঠে ছন্দবোধের উপযোগিতা স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। কবিতার ছন্দ মানেই হলো, উচ্চারণে ধ্বনি ও যতির আবর্তন। এ আবর্তন আবৃত্তিকারের মনে, কোথায় থামতে হবে, রুদ্ধদল (Closed Syllable) বা মুক্তদলের (open Syllable) উচ্চারণে কোথায় কতটা সময় দিতে হবে, তার একটা প্রত্যাশিত নিয়মবোধ জাগিয়ে তোলে। কবি যখন কবিতা লেখেন, তিনি এ ধরনের কোনো ধ্বনি ও যতির আবর্তন সৃষ্টি করেন। পাঠক যখন এ আবর্তন-রহস্যটি আবিষ্কার করে সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারেন, তখন একদিকে যেমন রহস্য আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করেন, অপরদিকে কবিতার ভাব ও ধ্বনির সৌন্দর্যও তাঁর মনে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। একটি ভাষায়, বিশেষ করে মাতৃভাষায়, নির্ভুল বাক্য-ব্যবহারে যেমন বক্তার বা লেখকের পক্ষে সেই ভাষার ব্যাকরণগত নিয়মগুলি কণ্ঠস্থ করার দরকার পড়ে না, অভ্যাসের বশেই নির্ভুলভাবে বাক্যের কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ইত্যাদি পদবিন্যাস করে থাকেন, যেখানে প্রয়োজন কমা-সেমিকোলন-দাঁড়ি ইত্যাদি যতি ব্যবহার করে থাকেন, অনুরূপভাবেই কবি ও তাঁর কবিতার পাঠক নিছক কালের সচেতন ধ্বনিবোধের সাহায্যে নির্ভুল ছন্দে কবিতা লিখতে ও পড়তে অভ্যস্ত হন। তালবোধযুক্ত গায়কের ও শ্রোতার পক্ষেও এক-ই কথা প্রযোজ্য। এঁদের সকলের-ই ছন্দবোধ আছে, তবে তাঁরা ছন্দ-বৈয়াকরণ নন। ছন্দ-বৈয়াকরণ বা ছান্দসিক যখন ওই উপলব্ধ ধ্বনি ও যতির আবর্তনকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সূত্রবদ্ধ করেন, কৌতূহলী কবি ও আবৃত্তিকার তাঁদের অনুসৃত ছন্দের নিয়মসূত্রটি খুঁজে পেয়ে আরো খুশি হয়ে ওঠেন।

এ যুগে কবিদের ছন্দবোধ প্রাচীন বা মধ্যযুগের তুলনায় সূক্ষ্মতর হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকলেও, তারা যে অনেকটা Uniform এবং Standardised একটি নীতি-নিয়মের দ্বারা চালিত হয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। যে-যুগে ছাপাখানার প্রচলন হয়নি, কবি বা কথক নিজেরাই শ্রোতাদের কবিতা পরে শোনাতেন। রামায়ণ-পাঠের আসরে সেই সুরাশ্রয়ী পাঠের আভাস শ্রোতারা এখনো কিছুটা পেতে পারেন।

তখন সুর করে পড়া হতো বলেই প্রয়োজনমতো কিছুটা সংশ্লিষ্ট বা প্রসারিত উচ্চারণে মাত্রা-সমতা রাখা হতো। কবির লেখাতে দু'-একটি মাত্রার কম-বেশিতে তেমন এসে যেতো না। ছাপাখানা প্রবর্তনের পর কবিতা ছাপা বই হিসেবেই প্রকাশিত হচ্ছে; পাঠক ঘরে বসেই মনে মনে বা উচ্চকণ্ঠে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু কবি বা কথক শ্রোতৃবর্গের সামনে বসে ছন্দের রিপুকর্ম করার সুযোগ হারাচ্ছেন। প্রথম প্রথম হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলদেব পালিত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ কবিগণ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বা কবিতা-বিশেষের শব্দ-বানানে পাঠককে পড়ার নিয়ম-নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর ধীরে ধীরে মুখ্য তিন প্রকৃতির ছন্দ পঠনের সর্বজনগ্রাহ্য মান বাংলা কাব্যে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।[১] এ-কালের কবিরা সেই উচ্চারণভঙ্গি অনুসারে কবিতা লিখতে অভ্যস্ত হয়েছেন। তার মধ্যেও যখন কোনো কবি নতুন কোনো ছন্দভঙ্গির পরীক্ষা করতে চেয়েছেন, তাঁকে পাঠকের সুবিধার্থে নব প্রয়াস সম্পর্কে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। অক্ষরবৃত্তে বা মিশ্রবৃত্তে 'অমিত্রাক্ষর' (Blank-verse) প্রবর্তন করার সময় মধুসূদনকে একাধিকবার এ ছন্দের নব-পঠনভঙ্গি সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে হয়েছে। স্বরবৃত্তে বা দলবৃত্তে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দীর্ঘপদযতি-প্রধান পঠনভঙ্গি প্রবর্তন করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় এ নতুন ঢঙে পড়ার নিয়মটি বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথকেও নব কলাবৃত্তের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বোঝাতে, এবং মুক্তক ও গণ্য-কবিতার ছন্দ-মুক্তি বোঝাতে বিবিধ প্রবন্ধ এবং পত্রাদি লিখতে হয়েছিল। গত অর্ধশতাব্দীকাল ধরে ছান্দসিকরাও কবিও পাঠককে আধুনিক সুনির্দিষ্ট মানের বাংলা ছন্দ-প্রকৃতি সম্পর্কে যথাসম্ভব সচেতন করতে চেষ্টা করে চলেছেন।

এ কবি ও ছান্দসিকদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা ছন্দের মুখ্য তিনটি উচ্চারণগত শ্রেণীবিন্যাস অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। গদ্য-কবিতার ছন্দ সম্পর্কেও আমরা কিছুটা অবহিত হয়েছি। কিন্তু সেখানেও পরিভাষা ব্যবহারে এবং সূত্র-নির্দেশে ছান্দসিকদের মধ্যে কিছু কিছু মত-পার্থক্য রয়েছে। জীবনানন্দের কবিতার ছন্দ আলোচনায় এখানে যে সূত্র ও পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সংক্ষেপে সেটা প্রথমেই পাঠককে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বোধ করি।

মুখ্য যে তিন প্রকৃতির ছন্দ রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে বাংলা পদ্যে উচ্চারণগত সুনির্দিষ্টতা লাভ করেছে, তাদের পরিচিত নাম হলো : মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত। আচার্য অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাদের নামকরণ করেছেন যথাক্রমে ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান এবং শ্বাসাঘাত প্রধান ঢঙের ছন্দ। একদা মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত নামের প্রবর্তক আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন বর্তমানে এ তিন ছন্দ প্রকৃতিকে যথাক্রমে সরল কলাবৃত্ত (সংক্ষেপে কলাবৃত্ত), মিশ্র কলাবৃত্ত (সংক্ষেপে মিশ্রবৃত্ত) এবং দলবৃত্ত নামে পরিচিত করেছেন। এ-প্রবন্ধে প্রবোধচন্দ্র-প্রবর্তিত কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত এবং দলবৃত্ত নাম তিনটিই ব্যবহৃত হলো। প্রবোধচন্দ্র Syllableকে 'দল' এবং Mora (বা Time

১. তিনটি ছন্দই প্রাচীন বাংলা কাব্যে কিছুটা নমনীয় (flexible) উচ্চারণে প্রচলিত ছিল।

Unit-কে 'কলা' নাম দিয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে সে নাম দু'টি এবং তাঁর দ্বারা উদ্ভাবিত অন্যান্য ছন্দ-পরিভাষাগুলিও ব্যবহার করা গেল।

(ক) কলাবৃত্ত : এখানে মুক্তদল বা Open Syllable-এর স্বাভাবিক উচ্চারণকালকে এক কলামাত্রা ধরে নিয়ে, রুদ্ধদল বা Closed Syllable-কে তার দ্বিগুণ সময় নিয়ে উচ্চারণ করা হয়। যেমন 'ছন্দ' শব্দে 'ছন্' রুদ্ধদল দু'মাত্রা, 'দ' মুক্তদল এক মাত্রা। অর্থাৎ, কলাবৃত্তে এ-শব্দটি তিন কলামাত্রা হিসেবে উচ্চারিত হয়। এ ছন্দরীতিতে সাধারণত চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার লঘু পর্বযতি প্রাধান্য পায়। উদাহরণ অনাবশ্যক। চারমাত্রা পর্বে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' বা সুকুমার রায়ের 'ট্যাস গরু' কবিতার কথা মনে করুন। পাঁচমাত্রার পর্ব পাবেন রবীন্দ্রনাথের 'মদনভস্মের পর' কবিতায়। ছ'মাত্রার বিখ্যাত কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' বা নজরুলের 'বিদ্রোহী'। রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' বা 'বর্ষার দিনে' সাতমাত্রা-পর্বের কবিতা। আটমাত্রার আবর্তন কলাবৃত্তে রয়েছে বটে (যেমন 'সোনার তরী'), তবে সেখানে সাধারণত চার-চার মাত্রার লঘুযতি ফুটে ওঠে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের 'জাতি' (বা মাত্রাবৃত্ত) ছন্দ থেকে 'জয়দেবী' ও 'ব্রজবুলি' লঘু-গুরু উচ্চারণের বিবর্তনধারায় এ-ছন্দ বাংলায় এসেছে বলে রবীন্দ্রনাথ একে 'সংস্কৃত ভাঙা ছন্দ' বলেছেন। আধুনিক 'কলাবৃত্তে'র প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং তাঁর বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কাজটি সহজ করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রপরবর্তী যে কবিরা এ-ছন্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, জীবনানন্দকে তাঁদের দলে ফেলা ঠিক হবে না। তিনি মাঝে-মধ্যে এ-ছন্দ ব্যবহার করলেও স্বস্তির সঙ্গে ব্যবহার করতেন মনে হয় না।

(খ) মিশ্রবৃত্ত : এখানে কলাবৃত্তের মতোই মুক্তদল এক কলামাত্রা; তবে রুদ্ধদল যুক্তবর্ণে লেখা হলে এক কলামাত্রা হিসেবে উচ্চারিত হয়; অযুক্ত বর্ণে লেখা হলে, কবির ইচ্ছা মতো কখনো এক কলার, কখনো দুই কলার মর্যাদা পায়। যেমন 'বন্ধন' শব্দে 'বন্' এক মাত্রা, 'ধন্' দু'মাত্রা; 'কলকাতা' শব্দে 'কল্' কখনো এক মাত্রায় কখনো বা দুই মাত্রায় উচ্চারিত হয়। 'করছি' কবি দুই বা তিন মাত্রায়—দু'ভাবেই ব্যবহার করেন। কিন্তু 'খাচ্ছি', 'যাচ্ছি',—এমন যুক্তবর্ণাশ্রিত শব্দ সর্বদাই দু'কলামাত্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ-ছন্দে আট, দশ বা ছয় কলার জোড়মাত্রক দীর্ঘযতি স্বীকৃতি পায়। কদাচিত লঘু যতি ব্যবহৃত হলেও বেজোড় মাত্রায় যতি পড়ে না। পূর্ব ভারতের তিনটি মুখ্য আর্যভাষা বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে মিশ্রবৃতই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছন্দ। বাংলায় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দ, কাশীদাস, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক অধিকাংশ কবিই এ-ছন্দ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন। অমিত্রাক্ষর ও মুক্তকের মাধ্যমে ছন্দমুক্তির পরীক্ষাও মুখ্যত এ-ছন্দরীতিতেই হয়েছে। জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় মিশ্রবৃত্তকেই মুখ্য ছন্দ-বাহন করেছিলেন।

(গ) **দলবৃত্ত** : কলাবৃত্তে বা মিশ্রবৃত্তে যেমন পরিমাপের একক বা মাত্রা হলো 'কলা' (Moric Unit), দলবৃত্তে তেমনি মাত্রা হলো 'দল' (Syllable Unit)। প্রাচীন গ্রাম্য ছড়া, লোকগীত বা রামপ্রসাদী গানে এ-ছন্দের শিথিলবদ্ধ যে রূপটি মেলে, তাতে

প্রতি পূর্ণ পর্বে (লঘুযতি-ভাগে), কম বেশি, চারটি দল এবং পর্বসূচনায় প্রস্বর (Stress) লক্ষিত হয়। পর্বের দলবিন্যাসে হেরফের ঘটলে, প্রচ্ছন্ন ছয়কলার পরিমাপে তার তালসমতা রক্ষিত হতো। এ-ছন্দকে ভাবগভীর কবিতাতেও ব্যবহার করে কৌলীন্য দিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর সংহত উচ্চারণে মিশ্রবৃত্তের মতো আট-দশ-ছয় মাত্রার দীর্ঘ যতিভাগে ব্যবহারের নতুন পরীক্ষা করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্রনাথও দলবৃত্ত-মুক্তক লিখতে গিয়ে উচ্চারণে কিছুটা সংশ্লিষ্টতা এনেছেন। কবিতার ভাষায় কথা সংলাপী আমেজ ফোটাতে এ-ছন্দই সবচেয়ে কার্যকরি হয়েছে বলে কবি ও ছান্দসিকদের ধারণা। জীবনানন্দের কবিতাতেও দলবৃত্তের কিছু মৌলিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

(ঘ) গদ্য-কবিতার ছন্দ : এ প্রসঙ্গটিও সংক্ষেপে প্রথমেই বলে নেয়া ভাল। প্রচলিত দলমাত্রা বা কলামাত্রার হিসেবে এ-ছন্দের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এক-ই ভঙ্গির বাক্যের (বা বাক্যাংশের) পুনরাবৃত্তি, গদ্যে প্রচলিত বাক্য গঠন-রীতির সচেতন পরিবর্তন, বাক্‌পর্বের ছোট ছোট যতি ভাগ, ধ্বনিগত প্রচ্ছন্ন অন্তর্মিল এ-ছন্দের কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের কিছু কবিতায় এ-ছন্দের জনপ্রিয়তা আনলেন; পরে তরুণতর কবিরা এ-ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। জীবনানন্দ সেই অনুসারকদের অন্যতম।

পঞ্চান্ন বছরের স্বল্পায়ু জীবনে (১৮৯৯-১৯৫৪) জীবনানন্দের প্রথম কবিতার বই বেরোয় উনত্রিশ বছর বয়সে। প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছাব্বিশ বছর ধরে তাঁর লিখিত কবিতার সংখ্যা সর্বসাকুল্যে কম-বেশি তিন শত। মুখ্যত আটটি কাব্যগ্রন্থে কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছে।[২]

পঞ্চান্ন বছরের অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়ু জীবনে জীবনানন্দের (১৮৯৯-১৯৫৪) প্রথম কবিতার বই বেরোয় উনত্রিশ বছর বয়সে; তাঁর জীবিতকালে মোট ছ'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাকি দু'টি মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে। সর্বসাকুল্যে তাঁর প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা বোধ হয় শ'তিনেক হবে।

কলাবৃত্ত রীতির ব্যবহার জীবনানন্দের কবিতায় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। 'মহাপৃথিবীতে' তিনটি (মনোবীজ, সূর্যসাগর তীরে, প্রার্থনা) এবং 'সাতটি তারার তিমির'-এ একটি (লঘুমুহূর্ত) এ পর্যন্ত চোখে পড়েছে। তার মধ্যেও 'মনোবীজ' কবিতার শেষ স্তবকটি মাত্র কলাবৃত্ত। মহাপৃথিবীর তিনটি কবিতাই ছয়মাত্রা পর্বের কলাবৃত্তে লিখিত। 'লঘুমুহূর্ত' কবিতাটি চারমাত্রার পর্ব এবং আটমাত্রার পদভাগে রচিত হয়েছে। সবগুলি কবিতাই অসমান-পংক্তিক মুক্তক। নানা ধরনের মিল রয়েছে। এর মধ্যে 'লঘুমুহূর্ত' কবিতাটিতে কবি যেন শব্দ ব্যবহারে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য এনেছেন। ছন্দযতি থেকে প্রয়োজন মতো ভাব-যতির পৃথক অস্তিত্ব দিয়েছেন, প্রয়োজনে আবার আমাদের কেতাবি মাত্রা

২. ঝরাপালক ১৯২৮, ধূসর পাণ্ডুলিপি ১৯৩৬, বনলতা সেন ১৯৪২, ১৯৫২, মহাপৃথিবী ১৯৪৪, সাতটি তারার তিমির ১৯৪৮, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৫৪, রূপসী বাংলা ১৯৪৭, বেলা অবেলা কালবেলা ১৯৬১। সম্প্রতি কয়েক বছরে কবির আরো কিছু পদ্য ও গদ্য (মুখ্যত উপন্যাস) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে+সবগুলি হাতের কাছে না থাকায় সেগুলির মূল্যায়ন সম্ভব হলো না।

নিরূপণের হিসাবকে অস্বীকার করেছেন। অথচ ছন্দ পঙ্গু হয়েছে—একথা বলা চলছে না। যেমন—

এখন দিনের শেষে৷৷ তিনজন/আধো আইবুড়ো ভিখিরীর৷৷
অত্যন্ত প্রশান্ত হল মনে;/
ধূসর বাতাস খেয়ে৷৷ একগাল—। রাস্তার পাশে৷৷
ধূসর বাতাস দিয়ে৷৷ করে নিলো মুখ আচমন।/
কেননা এখন তারা। যেই দেশে যাবে তাকে৷৷ রাঙা নদী বলে;/
সেইখানে ধোপা আর গাধা৷৷ এসে জলে /
মুখ দেখে৷৷ পরস্পরের পিঠে৷৷ চড়ে যাদুবলে।/

হাইড্রান্ট থেকে / কিছু জল৷৷ ঢেলে চায়ের ভিতরে৷৷
জীবনকে আরো স্থির৷৷ সাধুভাবে তারা৷৷
ব্যবহার করে নিতে গেল৷৷ সোঁদা ফুটপাতে বসে;/
মাথা নেড়ে / দুঃখ করে বলে গেল৷৷ জলিকলি ছাড়া৷৷
চেৎলার হাট থেকে৷৷ টালার জলের কল আজ৷৷
এমন কি হতো জাঁহাবাজ?/
ভিখিরীকে / একটি পয়সা দিতে৷৷ ভাসুর ভাদ্র-বৌ৷৷ সকলে নারাজ।'/
[সাতটি তারার তিমির, লঘুমুহূর্ত][৩]

ছন্দ-বৈরাকরণ ইচ্ছা হলে স্থুলাক্ষর যতিবিভাগগুলিতে কবির ছন্দি-মিশ্রণজাত ত্রুটি খুঁজে বের করতে পারেন। কারণ, ওখানে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের কলাবৃত্তের মধ্যে মিশ্রবৃত্তের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ বেআইনীভাবে প্রবেশ করেছে। তবে সেটা সম্ভব হয়েছে, এ ছন্দের আট-দশ মাত্রার দীর্ঘ পদক্ষেপের ফলে। নিঃসংশয়ে এটি একটি নতুন পরীক্ষা। কবি কোথাও কলাবৃত্তে মিশ্রবৃত্তের মিশ্রণ দিয়েছেন, কোথাও বা মিশ্রবৃত্তে কলাবৃত্তের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কলাবৃত্তে আট বা দশ মাত্রার দীর্ঘ যতিভাগের মাঝে চারমাত্রার লঘুযতি ফুটে উঠতে চায়। কবি ৩-৩-২ মাত্রার শব্দগ্রন্থির সাহায্যে সেই প্রবণতা অনেকাংশে এড়িয়ে গেছেন। তাছাড়া ভার-যতির তাগিদে অনেক সময় তিনি ছন্দ-যতির কিছু হেরফের করে বৈচিত্র্য এনেছেন। তবে জীবনানন্দের বাক্ভঙ্গিতে কলাবৃত্ত তেমন খাপ খায় না; কবি নিজেও সেটা বুঝতেন বলেই কাব্য রচনায় রীতিকে যথাসম্ভব পরিহার করে চলতেন।

'ঝরাপালক' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত জীবনানন্দের কবিতার মুখ্য ছন্দবাহন ছিল, মিশ্রবৃত্ত। 'ঝরাপালকে' সমিল মুক্তক দিয়ে তার সূচনা। তবে প্রথম থেকেই প্রচ্ছন্ন মিল, একপদী-দ্বিপদী-ত্রিপদী-চৌপদী মিশ্র-পংক্তির বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়। মুক্তকাশ্রয়ী বাক্পর্বে এক-ই ধরনের শব্দগুচ্ছের আবর্তন, এক-ই

৩. ১৯৬৮ 'ভারবি' সংস্করণ 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় 'লোকেন বোসের জার্নাল' কবিতাটিও ছ'মাত্রা পর্বের কলাবৃত্ত মুক্তক (শিথিলবদ্ধ) রীতিতে লিখিত। প্রবন্ধ লেখার পরে সেটা চোখে পড়লো।

প্রশ্নবোধক বা প্রত্যয়বোধক বাক্যের পুনরাবৃত্তি তাঁর কবিতার অন্য একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এখানে একটি উদাহরণ তুলছি।—

• শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর পরে?
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন্ এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে।

চলে গেছি ইহাদের ছেড়ে;
ভালবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে নাকি? পাবে না আহ্লাদ?
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন।
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন! [ধূসর পাণ্ডুলিপি, বোধ]

এক-ই ধরনের বাক্যাংশ বা শব্দগুচ্ছের আবর্তন এখানে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। চতুর্মাত্রক শব্দ ব্যবহারের প্রতি প্রবণতাও লক্ষণীয়। বাক্-বিন্যাসে এক-ই ভঙ্গির প্রশ্নবোধক বা প্রত্যয়বোধক ছোট ছোট Clause বা বাক্য ব্যবহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকাংশে লক্ষ করা যাবে। প্রচ্ছন্ন শব্দমিলও প্রায় প্রতি ছত্রে রয়েছে। শরীরে/মাটির/জলের/আলোর/চাষার, স্বপ্ন/শান্তি, কোন/এক/কাজ/করে, বা এক-ই ধরনের শব্দে এ ক্রিয়াপদ ও কর্মের আবর্তন :

ভাল বেসে	
হেলা করে	দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে
ঘৃণা করে	

বা 'পাবে না আহ্লাদ ক্রিয়া-সমন্বিত বাক্যাংশের লেজুড় হিসেবে তিনটি বাকপর্ব গঠন, যেখানে এক-ই শব্দগুচ্ছের আবর্তন :

মানুষের	
মানুষীর	মুখ দেখে কোনোদিন
শিশুদের	

জীবনানন্দের মিশ্রবৃত্তে, বিশেষ করে মুক্তকে, এমন ধরনের শব্দ প্রয়োগগত আরো কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য মনোযোগী পাঠক লক্ষ করবেন।

বাংলা কবিতায় বিদেশী Jenre-গুলির ব্যবহারে সনেটের ঐশ্বর্যই সব থেকে বেশি। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'য় এবং অন্যত্র যে অর্ধশতাধিক সনেট লিখেছেন, সেখানেও মিল বিন্যাসের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এক 'রূপসী বাংলা'র ৫৭টি সনেটেই লক্ষ করা গেল, প্রথম আট লাইনে প্রচলিত পেত্রার্কীয় ক খ খ ক ক খ খ ক মিল দিয়ে বাকি ছয় পংক্তিতে (দু'-একটি কবিতার পাঁচ। অন্তত তেইশ রকমের মিল ব্যবহার করেছেন। কৌতূহলী পাঠকের জন্যে এখানে তাঁর সনেটের ষট্‌ক মিলবৈচিত্র্যের একটি তালিকা দেয়া গেল—

তোমরা যেখানে সাধ	ক খ খ ক ক খ খ ক	গ ঘ ঘ গ ঘ ঘ
যতদিন বেঁচে আছি	”	গ ঘ ঘ গ ঙ ঙ
একদিন জলসিঁড়ি	”	গ ঘ ঘ গ ঘ গ
আকাশে সাতটি তারা	”	গ ঘ গ ঘ গ ঘ
কোথাও দেখিনি আহা	”	খ গ খ গ গ গ
হায় পাখি, একদিন	”	গ ঘ গ ঘ ঙ ঙ
ঘুমায়ে পড়িব আমি (১)	”	গ ঘ গ ঘ ঘ গ
ঘুমায়ে পড়িব আমি (২)	”	গ গ ঘ ঘ গ গ
যখন মৃত্যুর ঘুমে	”	গ ঘ গ ঘ গ গ
আমি যদি ঝরে যাই	”	গ ঘ ঘ গ গ গ
যে শালিখ মরে যায়	”	খ গ খ গ ঘ ঘ
তোমার বুকের থেকে	”	গ ক গ ক গ ঘ
ভিজে হয়ে আসে মেঘে	”	গ ঘ ঘ গ গ ঘ
চলে যাব শুকনো পাতা ছাওয়া ঘাসে	”	গ ঘ গ ঘ ঘ ঘ
এখন ঘুঘুর ডাকে	”	গ ঘ গ ঘ গ ঘ
তবু আহা ভুল জানি	”	গ ঘ গ গ ঘ ঘ
এখানে প্রাণের স্রোত	”	গ গ গ গ গ গ
মানুষের ব্যথা আমি	”	গ ঘ গ ঙ গ ঙ
বাতাসে ধানের শব্দ	”	গ ঘ ঘ ঙ ঙ ঘ
একদিন এই দেহ	”	গ গ ঘ ঘ ঙ ঙ
আজ তারা কই সব	”	গ ঘ ঙ ঘ ঙ ঙ
ঘাসের ভিতরে যেই	”	গ ঘ গ গ ঙ ঙ
(এই সব ভাল লাগে)	”	গ ঘ ঙ ঙ ঘ গ

আরও সতকর্তার সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখলে এর মধ্যেও কবির মিলগত নানা কারুকার্য চোখে পড়ে। 'একদিন যদি আমি' সনেটটিতে ষট্‌ক-মিল : গ ঘ গ ঘ গ ঘ। লক্ষণীয়, দু'টি পংক্তিতেই 'ত' ধ্বনির অনুপ্রাস (মুখ্যত পংক্তি প্রান্তিক) রয়েছে। অনুরূপভাবে

'পৃথিবীর পথে আমি' সনেটটির শেষ ছয় লাইনেও 'র' ধ্বনির অনুপ্রাস-মিল রয়েছে; 'হৃদয়ে প্রেমের চিত্র' সনেটটিতে 'ন' ধ্বনির অন্ত্যমিল রয়েছে। 'কোথাও চলিয়া যাব একদিন' সনেটটিতে কবি 'চ-ছ-জ-ঝ'-এর অর্থাৎ তালব্য বর্ণধ্বনির অন্ত্যমিল ব্যবহার করেছেন। মনোযোগী পাঠক এমন আরো কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবেন আশা করি।

সনেটগুলির ভাবগত ঐক্যের বিচার এ-আলোচনার ইখ্‌তিয়ার বহির্ভূত। তবে মোটামুটিভাবে বলা চলে, Descriptive বা বর্ণনাত্মক এবং Reflective বা প্রতিফলিত অষ্টক-ষট্‌ক স্তবকভাগ অধিকাংশ সনেটেই রক্ষিত হয়নি। পঙ্‌ক্তির ভাবপ্রবাহ অষ্টক পেরিয়ে ষট্‌কতে পৌঁছানোতেও এ মন্তব্যের সমর্থন মেলে। কবি সর্বত্র পংক্তিমাপের সমতা রক্ষাও প্রয়োজনীয় মনে করেননি। ভাব অনুযায়ী পংক্তি ছোটবড় রেখেছেন। এ-সনেটগুলিতে সবচেয়ে ছোট মাপের পংক্তি হলো, ৮-১০ মাত্রার মহাপয়ার, সবচেয়ে বড় মাপ হলো, ৮-৮-৮-৬ মাত্রার চৌপদী। অন্যান্য দীর্ঘ পংক্তিক কবিতার মতো সনেটেও পদযতিভাগে নানা বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। লাইন ভিঙ্গানো প্রবহমানতা এবং নানা মাপের যতির ব্যবহারে কবি অনেকটা স্বাধীনতা নিয়েছেন। এখানে অষ্টক-ষট্‌ক ভাবগত ঐক্য রয়েছে এমন একটি প্রবহমান অসম পংক্তিমাপের সনেট উদ্ধৃত করা গেল।—

তোমার বুকের থেকে॥ একদিন চলে যাবে॥ তোমার সন্তান॥ ক
বাংলার বুক ছেড়ে॥ চলে যাবে; যে ইঙ্গিতে নক্ষত্রও ঝরে, খ
আকাশের নীলাভ নরম বুক॥ ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে॥ খ
ডুবে যায়,—কুয়াশায় ঝরে পড়ে॥ দিকে দিকে রূপশালী ধান॥ ক
একদিন; হয়তো বা নিমপেঁচা॥ অন্ধকারে গাবে তার গান, ক
আমারে কুড়ায়ে নেবে॥ মেঠো ইঁদুরের মতো॥ মরণের ঘরে— খ
হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ। লেগে আকাঙ্ক্ষার—তবুও তো চোখের উপরে॥ খ
নীল মৃত্যু উজাগর—॥ বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ,॥ শিশিরের ঘ্রাণ— ক
কখন মরণ আসে॥ কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়॥ গ

কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল॥ শালিখের প্রাণ॥ ঘ
জানি নাকো;—তবু যেন মরি আমি॥ এই মাঠ ঘাটের ভিতর, গ
কৃষ্ণা যমুনায় নয়—যেন এই গাঙুড়ের॥ ঢেউয়ের আঘ্রাণ॥ ঘ
লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন॥ বুকের উপর ঙ
জেগে থাকে; তারি নিচে শুয়ে থাকি॥ যেন আমি অর্ধনারীশ্বর। ঙ

[রূপসী বাংলা, ২৯ নং কবিতা]

নানা ধরনের ধ্বনি ও যতির আবর্তন এবং পাঠক মনে তার থেকে প্রত্যাশা সৃষ্টি—ছন্দের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এখানে প্রতি পংক্তিতে ৮॥৮॥৬ মাত্রার পদ-বিন্যাস সাধারণ প্রত্যাশিত মাপ; কবি প্রয়োজন মতো যতি পরিবর্তন করেছেন। একটি পরিচিত পরিবর্তনের রূপ হলো, লাইন পেরিয়ে পরবর্তী লাইনের চার মাত্রায় এসে ভাবযতি

দেয়া। এ কবিতার ৪, ৫, ১১, ১৪ সংখ্যক লাইনে সেই রূপটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক-ই ধরঠের ক্রিয়াপদের আবর্তনও লক্ষণীয়; চলে যাবে, গাবে, কুড়ায়ে নেবে, অথবা লেগে আছে, লেগে থাকে, জেগে থাকে, শুয়ে থাকি ইত্যাদি।—এ আবর্তনও একটা প্রত্যাশাবোধ সৃষ্টি করে। চতুর্মাত্রক উপযতিতে শব্দের প্রয়োগ প্রবণতার কথা পূর্বেই বলেছি। এ কবিতায় চার, তিন ও দুই মাত্রার শব্দে উপযতির হিসাব নিতে গিয়ে দেখা গেল, চতুর্মাত্রক ৫৩, ত্রিমাত্রক ২৪ এবং দ্বিমাত্রক ১৪টি উপযতির অস্তিত্ব রয়েছে।

সনেট রচনায় জীবনানন্দ দান্তে-প্রবর্তিত তের্জারিমা (Terzarima) ত্রি-পংক্তির স্তবকের ব্যবহার করেছেন। ইতঃপূর্বেই প্রমথ চৌধুরী বাংলায় এ ত্রিক মিলবন্ধের প্রবর্তন করেছিলেন। জীবনানন্দ তাকে সনেটের আঙ্গিকে প্রয়োগ করলেন। বনলতা সেনের 'পথ হাঁটা' বা ধূসর পাণ্ডুলিপির 'শকুন' এ পর্যায়ের রচনা। 'শকুন' কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে—সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে ক
শকুনেরা চরিতেছে; মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি; নিস্তব্ধ প্রান্তর খ
শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে ক
আরেক আকাশ যেন—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর খ
কঠিন মেঘের থেকে; যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ গ
পড়ে গেছে—পড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার খেত মাঠ প্রান্তরের পর খ
এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু; আবার করিছে আরোহণ গ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে—পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে; ঘ
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে, বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন গ
বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দ্যাখে তাই; একবার স্নিগ্ধ মালাবারে ঘ
উড়ে যায়—কোন্ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন ঙ
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চলে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর উপরে; ঘ
যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ-জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ন লেগুন ঙ
কেঁদে ওঠে...চেয়ে দ্যাখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হুন। ঙ

[ধূসর পাণ্ডুলিপি, শকুন][৪]

লক্ষ করা যাবে, প্রত্যেক ত্রিক-এর মধ্য পংক্তিটি মিলহীন। সেই পংক্তিটির মিল পরবর্তী ত্রিক্-এর প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে ফিরে এসেছে। অর্থাৎ, একটি বিনুনি-বিন্যাসের প্যাটার্ন। শেষ দুই পংক্তিতে শ্লোকবন্ধের মিল বা Couplet Rhyme। এখানে সব লাইন-ই ৮-৮-১০ মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদীবন্ধে রচিত। অবশ্য মাঝে মাঝেই কবি যতির স্বাধীনতা নিয়েছেন, প্রয়োজনে সেটা লাইন ডিঙ্গিয়েও গেছে।

৪. ইংরেজি রোমান্টিক যুগের কবি শেলী তাঁর সুবিখ্যাত 'Ode to the west wind, কবিতাটি এ তের্জারিমা বিনুনী মিলের পাঁচটি সনেটের পারম্পর্য রেখে রচনা করেছিলেন, সুধী পাঠক প্রসঙ্গত তা স্মরণ করবেন।

বিদেশী স্তবকাদর্শের অনুসরণ অন্য কিছু কিছু কবিতাতেও লক্ষিত হয়। ধূসর পাণ্ডুলিপির 'অনেক আকাশ' কবিতায় নয় লাইনের শেনসবীয় স্তবক আনতে চেয়েছেন। মিল : কখ কখ খগ খগ গ, প্রথম আট লাইন ৮-১০ মাত্রাভাগের মহাপয়ার, নবম লাইনটি দীর্ঘতর, ৮-৮-৬ মাত্রার ত্রিপদী। যেমন—

গানের সুরের মতো বিকালের দিকের বাতাসে
পৃথিবীর পথ ছেড়ে সন্ধ্যার মেঘের রং খুঁজে
হৃদয় ভাসিয়া যায়—সেখানে সে কারে ভালবাসে!—
পাখির মতন কেঁপে—ডানা মেলে—হিম চোখ বুজে
অধীর পাতার মতো পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে উড়ে ঘর ছেড়ে কতদিকে গিয়েছে সে ভেসে,—
নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুজে
ঘুমাতে চেয়েছে,—তবু—ব্যথা পেয়ে গেছে ফেঁসে।
তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁটে উঠেছিল হেসে।

[ধূসর পাণ্ডুলিপি, অনেক আকাশ]

শেনসরীয় স্তবকে প্রথম আট লাইন আয়াম্বিক পঞ্চ পর্বিক; নবম লাইনটি আয়াম্বিক ষট্‌পর্বিক। জীবনানন্দ প্রথম সাত লাইন ৮॥১০-মাত্রাভাগে, অষ্টম লাইনটি, দু'মাত্রা কম রেখে, ৮॥৮-মাত্রাভাগে, এবং নবম দীর্ঘতর লাইনটি ৮॥৮॥৬-মাত্রাভাগে রচনা করেছেন। ইংরেজি কবিতার মিলের আদর্শে কবি আরো কিছু কিছু স্তবকবন্ধ রচনা করেছেন। তার মধ্যে কখ কখ গগ-মিলের ছয় লাইনের স্তবকের প্রতি তাঁর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব ছিল মনে হয়। এখানে কবির মিল-সচেতনতার নিদর্শন হিসেবে একটি পাঁচ লাইনের স্তবক উদ্ধৃত করা গেল।—

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
জানিবে না, কোনোদিন জানিবে না কলরব করে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়।

[মহাপৃথিবী, সিন্ধুসারস]

এখানে ক ক ক খ খ—মিল। কবিতাটিতে আরো নয়টি পাঁচ লাইনের স্তবক রয়েছে। সেখানে মিলবিন্যাসের আরো দু'-একটি বৈচিত্র্য রয়েছে। লাইন বা ছত্র ৮-৮ মাত্রা থেকে ৮-৮-৪-১০-মাত্রা পর্যন্ত নানা মাপে রচিত হয়েছে। প্রয়োজন মতো ভাবপ্রবাহ লাইন পেরিয়েও এসেছে।

ইতঃপূর্বে লক্ষ করা গেছে, জীবনানন্দ বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের কলাবৃত্তে মাঝে মাঝে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের মিশ্রবৃত্ত পংক্তি ব্যবহার করেছেন। অনুরূপভাবে মিশ্রবৃত্ত রীতির বহু কবিতা পাওয়া যাবে, যেখানে মাঝে মাঝে প্রচলিত নিয়ম ভেঙে কবি যুক্তবর্ণাশ্রিত রুদ্ধদলে বিশ্লিষ্ট দু'মাত্রার উচ্চারণ এনেছেন। ইতস্তত কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলছি—

(ক) জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হলো;—
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে!

[মহাপৃথিবী, আট বছর আগের একদিন]

'মর্গে' শব্দটি দু'বার-ই বিশ্লিষ্ট তিনমাত্রার উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবেনা আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :
সেই মুখ আর আমি রবো সেই 'স্বপ্নের' ভিতরে।

[মহাপৃথিবী, স্বপ্ন]

তৃতীয় পংক্তিতে 'স্বপ্ন' বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে তিন মাত্রায় পড়তে হচ্ছে, আবার চতুর্থ পংক্তিতে 'স্বপ্নের' সংশ্লিষ্ট তিন মাত্রার উচ্চারণে প্রয়োগ করা হয়েছে।

(গ) এখানে বনের কাছে 'ক্যাম্প' আমি ফেলিয়াছি ;
... ...
ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এলো যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন;

[ধূসর পাণ্ডুলিপি, ক্যাম্পে]

প্রথম পংক্তিতে 'ক্যাম্প' সংশ্লিষ্ট দু'মাত্রার উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে কিন্তু 'ক্যাম্পের' বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে চারমাত্রার গুরুত্ব পেয়েছে।

(ঘ) আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়;
বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে;
চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে নড়ে গেল ও-পাশের পাইস-রেস্তোরাঁতে;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল 'আস্তাবলে'
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;

[সাতটি তারার তিমির, ঘোড়া]

'আস্তাবল' শব্দটি প্রথম পংক্তিতে বিশ্লিষ্ট, ষষ্ঠ পংক্তিতে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া রেস্তোরাতে, লণ্ঠন,—বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু বাকি সব যুক্তবর্ণাশ্রিত

শব্দেই সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ রেখেছেন। জীবনানন্দের কবিতায়, বিশেষ করে শেষদিকে লেখা কবিতায় এমন উচ্চারণগত মিশ্রণের অনেক দৃষ্টান্তই চোখে পড়ে। মনে হয়, প্রচলিত নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্তির সন্ধানেই কবি এমনটি করেছেন। ছন্দে পদযতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বেই সেটা লক্ষ করা গেছে।

একটি প্রশ্ন। যদি এমন কবিতা পাওয়া যায়, যেখানে কলাবৃত্ত এবং মিশ্রবৃত্তের লক্ষণ প্রায় সমান সমানভাবেই ফুটে ওঠে, তাকে কোন্ রীতির কবিতা বলা যাবে? যেমন—

সারাদিন মিছে কেটে গেল;
সারারাত 'বড্ডো' খারাপ
নিরাশায় 'ব্যর্থতায়' কাটবে, জীবন
দিনরাত দিনগত পাপ
ক্ষয় করবার মতো ব্যবহার শুধু।
ফণিমনসার কাঁটা তবুও তো 'স্নিগ্ধ' শিশিরে
মেখে আছে; একটিও পাখি 'শূন্যে' নেই;
সব জ্ঞানপাপী পাখি ফিরে গেছে নীড়ে।

[জী. দা. শ্রে. ক., দিনরাত]

এ আট লাইনের সমিল, প্রবহমান, অসম মাত্রামাপের কবিতাটিতে চারটি যুক্তবর্ণাশ্রিত রুদ্ধদলের ব্যবহার হয়েছে। তার মধ্যে 'বড্ডো' এবং 'স্নিগ্ধ' শব্দ দু'টিতে বিশ্লিষ্ট কলাবৃত্ত রীতির উচ্চারণ ঘটেছে, আর 'ব্যর্থতায়' এবং 'শূন্যে' শব্দ দু'টিতে সংশ্লিষ্ট মিশ্রবৃত্তের উচ্চারণ ফুটে উঠেছে। শব্দ গ্রন্থনায়, যতিভাগে মিশ্রবৃত্তের আমেজ সুস্পষ্ট। এমন শিথিল উচ্চারণে মধ্যযুগের কাহিনীকাব্যের কবিরাও লিখতেন। সেগুলি মিশ্রবৃত্ত হিসেবেই ছান্দসিকরা গণ্য করেছেন। জীবনানন্দের এ-জাতীয় মিশ্র উচ্চারণের কবিতাকেও মিশ্রবৃত্ত হিসেবে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

দলবৃত্তের ব্যবহার কবির প্রথমদিককার রচনায় দেখা গেল না। 'বেলা অবেলা কালবেলা' (কবির মৃত্যুর পর ১৯৬১তে প্রকাশিত) কাব্যগ্রন্থে দশটি কবিতায় (মোট প্রকাশিত ৩৯টি কবিতার মধ্যে) এ-ছন্দের ব্যবহার চোখে পড়লো। তাছাড়া 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র অন্তর্ভুক্ত শেষদিককার আরো দু'-একটি কবিতাতেও এ-ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন। কৌতূহলী পাঠক তাঁর উক্ত কাব্যগ্রন্থ থেকে 'যতিহীন', 'তোমাকে', 'সময় সেতুপথে', 'শতাব্দী', 'প্রয়াণ পটভূমি', 'নারী সবিতা', 'গভীর এরিয়েলে', 'পটভূমির', 'যদিও দিন', 'আজকের রাতে'—কবিতাগুলি বা 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' থেকে 'তোমাকে ভালবেসে', 'অনন্দা' কবিতাগুলি দেখতে পারেন। মনে হয়, কলাবৃত্তের মতো দলবৃত্তেও কবি তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। একটু শিথিলবদ্ধ, ছোট-বড় প্রবহমান লাইনে, সংলাপের আমেজ মিশিয়ে কবিতাগুলি লিখেছেন। কবি নিজে কি এ-কবিতাগুলি প্রকাশে পরান্মুখ ছিলেন? অশোকানন্দ দাশ জানিয়েছেন, 'বেলা অবেলা কালবেলা'র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৪-৫০। গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্যে তিনি নাকি

কবিতাগুলি বাছাই করেছিলেন। প্রকাশিত হলো মৃত্যুর প্রায় সাত বছর বাদে। এখানে একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি।—

যদিও পথ আছে—তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে;
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দীপের মতো—
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব-সাগরে।
তবুও তোমায় জেনেছি নারি, ইতিহাসের
শেষে এসে; মানব প্রতিভার
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে
মানবকে নয়, নারী, শুধু তোমাকে ভালবেসে
বুঝেছি নিখিল বিশ্ব কীরকম মধুর হতে পারে।

['বেলা অবেলা কালবেলা', তোমাকে]

স্থূলাক্ষর পর্বগুলিতে কবি দলবৃত্তের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। সেটা স্বেচ্ছাকৃত বলেই মনে হয়। অন্যান্য কবিতাতেও এই এক-ই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের লৌকিক ছড়াগানগুলিতে এ শৈথিল্য যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। আর চতুর্দল পর্বের মাঝে পঞ্চদল পর্বের ব্যবহার আধুনিক কবিরা তো হামেশাই করছেন।

গদ্য কবিতার রাজ্যে কবিরা ছন্দমুক্তির তাগিদেই, অমিত্রাক্ষর ও মুক্তকের যারা পথে, পদক্ষেপ করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে ছন্দজিজ্ঞাসুরা দ্বিমত হতে পারেন। তবে গদ্য-কবিতায় যে নিরূপিত মাত্রার হিসাব থেকে ছন্দ পুরোপুরি মুক্তি পেয়েছে, সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। জীবনানন্দ বনলতা সেন, মহাপৃথিবী এবং বেলা অবেলা কালবেলা—কাব্যগ্রন্থ তিনটিতে বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট গদ্য-কবিতা লিখেছেন। পূর্বে উল্লেখ করেছি, আবর্তন এবং তার প্রত্যাশা থেকেই ছন্দের জন্ম হয়। গদ্য কবিতায় এ আবর্তন দলমাত্রা বা কলামাত্রা হিসেবে ধরা পড়ে না। সেখানে ছোট ছোট বাক্যের আবর্তন, এক ধরনের শব্দবিন্যাসের আবর্তন, এবং অনেক সময় প্রচ্ছন্ন ধ্বনিগত আবর্তন অনুভব করা যায়। বাক্‌রীতিতেও কবিরা বিন্যাসগত আবর্তন রক্ষা করে থাকেন। ভাব ও ধ্বনির Counter Balance এনে পাঠক মনে এক ধরনের প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলেন। জীবনানন্দের গদ্য-কবিতায় কম-বেশি উপরোক্ত সব বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়। এখানে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি—

হে নর,/হে নারী,॥
তোমাদের পৃথিবীকে/চিনি নি কোনোদিন;
আমি অন্য কোনো/নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি,॥ যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,॥
যেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি,॥ কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি;/

শত-শত শূকরের/প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এই সব ভয়াবহ আরতি।/ [বনলতা সেন, অন্ধকার]

তিন ধরনের চিহ্ন দিয়ে এখানে যতির গুরুত্ব বোঝানো গেল। তাছাড়া প্রতিটি কমা চিহ্নেই উপযতি রয়েছে। সুতরাং বাক্যগুলি স্বভাবতই ছোট ছোট বাক্‌পর্বে বিন্যস্ত হতে পেরেছে। নর-নারী, চিনিনি কোনোদিন, কোনো নক্ষত্র, স্পন্দন সংঘর্ষ, শত শত শূকরের/শত শত শূকরীর;—এমন সব শব্দ প্রয়োগে প্রচ্ছন্ন ধ্বনি-অনুপ্রাস অনুভব করা যায়। যেখানে (দু'বার) এবং সেখানে দিয়ে বাক্যের সূচনা এবং তার মধ্যে শব্দ বিন্যাসের সামঞ্জস্য পাঠকের প্রত্যাশাবোধকে তৃপ্ত করে। কবিতাটির পরবর্তী আর একটি স্তবকেও জেগে উঠব না, তাকিয়ে দেখব না, কোনোদিন জাগবে না—এ জাতীয় বাক্যের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়।

জীবনানন্দের প্রথমদিককার কবিতার ভাষায়, বিশেষ করে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে লেখা কবিতায় চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণ লক্ষিত হয়। পরের দিকে তিনি অবশ্য ক্রমশ বিশুদ্ধ চলিত ভাষার দিকেই ঝুঁকেছেন। গদ্য-কবিতায় এবং দলবৃত্ত রীতির কবিতায় ভাষা অবিমিশ্রভাবে 'চলিত'। ছন্দ বিশ্লেষণে ধরা গেল, তিন মুখ্য ছন্দরীতির ব্যবহার-ই তাঁর জানা ছিল। তবে মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক ব্যবহারে এবং গদ্য-কবিতা রচনায় তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। বিদেশী নানা ছন্দবন্ধের ব্যবহারেও তাঁর ছন্দ-মনস্কতার পরিচয় মেলে। তবে ছন্দের প্রচলিত নিয়ম-শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল। প্রথাগত মাত্রার হিসাব, পদযতির পর্বযতির বা পংক্তিযতির সুষম ভাগ রক্ষার বাধ্যবাধকতা তিনি সচেতনভাবেই ভাঙতে চেয়েছেন মনে হয়। এই প্রথাভঙ্গে তাঁর কবি-ভাষায় ও ছন্দে যে কিছুটা নতুন মেজাজ ফুটেছে, মনোযোগী পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

'ঝরাপালক' থেকে 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক কবির কাব্যে বিবর্তনচেতনা থাকে, বিশেষত তিনি যদি সমসময় চেতনা ও সমাজচেতন কবি হন। সূক্ষ্ম পরিবর্তন, মূল কাব্য-চারিত্রকে অপরিবর্তিত রেখে অগ্রসর হয়। কাব্য সাধনার বিভিন্ন পর্যায় থাকে, উপলব্ধির ক্রমবিকাশ থাকে এবং নিরীক্ষার ক্রম-পরিণতি থাকে। প্রত্যেক কবিকেই তাঁর অভিজ্ঞতার বলয়ের মাধ্যমে, সমকালীন ইতিহাসের বৃত্তের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। সৃজনশীল কবির পক্ষে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৃজনশীর, চেতনসম্পন্ন শিল্পীর পক্ষে তাঁর শিল্পের সূচনা ও সমাপ্তি পরস্পরবিরোধী আদর্শের প্রতিফলন হয় না; স্রষ্টার উপলব্ধিসঞ্জাত প্রত্যয়ের বিবর্তিত রূপ হয়ে দাঁড়ায়। কবির কবিতায় পরিবর্তিত সমাজ-ইতিহাস প্রতিভাসিত হয় বলেই কবিতার প্রকরণকৌশল পরিবর্তিত হয়; কিন্তু কবির জীবনদর্শনজাত প্রত্যয় সৃষ্টির জগতে যে ভাব-বলয় গঠন করে তা স্থির, আদর্শ জগতের সন্ধানে তৎপর, অন্বিষ্ট; আপাতদৃষ্টিতে তা স্থির হলেও মন্থরভাবে সেখানে বিবর্তনজাত জীবন-দর্শন ক্রিয়াশীল থাকে। অবশ্য যে কোনো কবির রচনার প্রথম পর্যায়ে এ পরিবর্তনশীলতা সম্ভবত মন্থর হবে না। কেননা, সেখানে অভিজ্ঞতার অনিশ্চয়তা, সংশয়মনস্কতা কবিকে অতৃপ্তির জগতে ঠেলে দেয়। কবিসত্তা আত্মপ্রকাশে উন্মুখ বলে নিরন্তর ভাঙা-গড়ার জগতে কবিচিত্তের উন্মুখর মননের আসা-যাওয়া; সত্যের স্বরূপ তখনও অনিশ্চিত, অভিজ্ঞতার জগত অনায়ত্ত। ফলত, ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার উপস্থিতি; কোথাও পূর্বসূরিদের অনুকরণ, কোথাও বা আবার কোনো দুরন্ত চমক। অবশ্য জীবনের প্রতি বিশ্বাসী কবি নিরূপিত আদর্শের সন্ধানে অন্বিষ্ট থাকেন বলেই গতিহীন হয়ে পড়েন না। ভাবের ক্ষেত্রে তাঁর রূপান্তর ঘটতে থাকে, প্রকরণেও তিনি তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে তুলে ক্রমশ ক্রমশ পরিণতির পথে এগিয়ে যান; কিন্তু নির্মাণ ও সৃষ্টিতে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন না। কারণ, কবিসত্তার তৃপ্তির অর্থ হলো সত্য নির্ধারিত হয়ে যাওয়া পরিবর্তনজনিত কাব্যকৌশলের সীমিত হয়ে যাওয়া, যা আমাদের অভিপ্রেত নয়। কবির জগৎ চিরকালীন অন্বিষ্ট—সেখানে স্থিরতা, গতিহীনতা, তৃপ্তি নেই; এ হলো চিরকালীন 'চরৈবেতির' জগৎ।

জীবনানন্দের জগৎ চির অন্বিষ্টের জগৎ, চিরচলার জগৎ, পথিকচিত্ততা আর নাবিক চিত্ততার জগৎ। 'ঝরাপালক' থেকে 'বেলা-অবেলা-কালবেলা' পর্যন্ত কবি অনিঃশেষভাবে খুঁজে চলেছেন তাঁর জগৎ—যা তাঁর বিশ্বাস, বোধ ও বোধির জগৎ।

'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থে শিল্পগত পরিশুদ্ধির অভাব হয়তো আছে; কিন্তু এ পরিশুদ্ধিহীনতার জগৎ থেকে কবির অন্বেষণ শুরু হয়ে যায় পরবর্তীকালের জন্য। জীবনানন্দের বোধের জগতে 'বনলতা সেন' যদি চূড়ান্ত সিদ্ধি করায় ও করে, তবে 'ঝরাপালকে' তার সূচনা; আর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'রূপসী বাংলা' ও 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'তে তার ক্রম-বিস্তার্যমানতা। অর্থাৎ, ১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত জীবনানন্দের কাব্য ও মনন-সাধনার বিবর্তিত স্তর প্রতিভাত হয় উক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির ভাবপ্রকাশে ও শিল্পগত কৌশলে। জীবনানন্দের প্রথম কাব্য 'ঝরাপালকের' (১৯২৭) অনেক কবিতায় সমকালীন কলকাতার অর্থনৈতিক স্থিতিহীনতার চিত্র অঙ্কিত। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দাবস্থায় বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রামনির্ভর অর্থনীতিতে তীব্র আঘাত পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অসম প্রতিযোগিতায় দেউলিয়া কুটিরশিল্পের অনেক শিল্পী এবং কৃষকরা কর্মসংস্থানের জন্য কলকাতায় আসতে শুরু করেছে। কলকাতার এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ধিত জনতার চাপে বিপর্যস্ত রূপ জীবনানন্দকে আলোড়িত করে। অর্থনৈতিক দিকটি ব্যতীত ছিল 'কল্লোলের কোলাহল', মোহিতলাল-নজরুল, যতীন্দ্রনাথের কবিতার ভিন্ন কণ্ঠস্বর; রবীন্দ্র-অস্বীকার ও রবীন্দ্র-স্বীকরণ—এ দুই শিবিরে বিভক্ত কবি-মানসিকতার অমেয় পার্থক্য জীবনানন্দের 'ঝরাপালক'-এ রূপায়িত হয়েছে। সমসাময়িক নগর-জীবনের বিপর্যস্ত অবস্থা 'বলাকা'র আকাশবিহারের প্রতিবাদ আর রবীন্দ্রবলয় থেকে মুক্তির তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা তিনি অগ্রজ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে অস্বীকার যেমন করতে পারেন না, তেমনি রবীন্দ্র-কবিতার আবহমণ্ডল ব্যতিরেকে তাঁর কবিতার ভুবন গড়ে ওঠে না। 'নীলিমা' কবিতায় শৃঙ্খলিত কার পৃথিবীর বিধি-বিধান উল্লঙ্ঘনে কবি জীবনানন্দ প্রয়াসী—'জনতার কোলাহলে এক বসে ভাবি কোন্ দূর যাদুপুর রহস্যের ইন্দ্রজল মাখি/বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী।' নগর জীবনের রিক্ততা, হতাশা, ক্লান্তি ইত্যাদির ফলে পৃথিবীতে তাঁর রক্তময় সমুদ্র বলে মনে হয়। তবুও 'ঝরাপালক' থেকেই কবির কাছে আভাসিত আর এক শুদ্ধ ও পবিত্র পৃথিবীর জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা। যদিও এ পৃথিবী অস্পষ্ট, তবুও কবির মনোভূমিতে তার দিগন্ত হয় উদ্ভাসিত। 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুলের প্রভাব থাকলেও জীবনানন্দ যেন এখান থেকেই তাঁর মৌলিক যাত্রাপথ খুঁজতে প্রয়াসী। আলোচ্য কাব্যেই কবির পথিকবৃত্তির প্রতীক করধৃত হয়, তাঁর জগৎ গড়ে উঠতে থাকে রূপকথার জগৎকে অবলম্বন করে, এমনকি কবিতার রূপকল্প ও বাণীভঙ্গিমাও তাঁকে চিনে নিতে সাহায্য করে।

জীবনানন্দ পরবর্তীকালে 'ঝরাপালকে'র গুরুত্ব স্বীকার করেননি। তবে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতায় 'নীলিমা', 'পিরামিড' এবং 'সেদিন এ ধরণীর' কবিতা তিনটিকে স্থান দিয়েছিলেন। এ তিনটি কবিতাকে কেন শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্ভুক্ত করা হলো তার আলোচনা প্রসঙ্গে সঞ্জয় ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—"সমাজ জীবনের তাৎপর্যময় দিকে যেমনি তাঁর মন জাগ্রত, তেমনি সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বোধেও কিন্তু তাঁর কবি-স্বভাবের ভিত্তি এখানে নয়। তা সম্ভবত পাওয়া যাবে 'ঝরাপালক' থেকে

পরবর্তীকালে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনে, তিনি নিজে যে কবিতাগুলো নির্বাচিত করেছেন; 'নীলিমা', 'পিরামিড' এবং 'সেদিন এ ধরণীর'। তাঁর স্বাবলম্বনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর ঐ কবিতাগুলো পড়ে এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের মানসিকতার পার্থক্যও ঐ কবিতাগুলো থেকেই উপলব্ধি করা সহজ।' আলোচ্য 'ঝরাপালকের' 'নীলিমা' কবিতাটি সম্পর্কে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন— "কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিল যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারিনি।...এ চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।' 'ঝরাপালক' জীবনানন্দের পরিণত কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর না হলেও কবিতার রাজ্যে অনুল্লেখ্য নয়। 'ঝরাপালক' জীবনানন্দীয় কাব্যদিগন্তে না হলেও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রতিভার ক্রমোন্মোচনের স্বাভাবিক অধ্যায়—যেখানে কবি সমকালীনতার সঙ্গে কাব্যপ্রতিমার অবয়বে নতুন মধুরিমা রচনার প্রয়াসে ব্রতী! এ কাব্যে কবির কণ্ঠে মানবতার বন্দনা গান ধ্বনিত, 'পতিতা' কবিতায় নারীত্বের জয়গান উচ্চারিত। জীবনানন্দ সকলের সঙ্গে সহমর্মিতা স্থাপন করতে চান—'সবার প্রাণের অশ্রু বেদনা মোদের বক্ষে লাগে।" এমনকি 'কবি' কবিতাটির অনেক ছত্র 'রূপালী বাংলার' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—

ঘুম কুমারীর মুখে চুমো খায় যখন আকাশ;
যখন ঘুমায়ে থাকে টুনটুনি, মধু, মাছি, ঘাস,
হাওয়ার কাতর শ্বাস থেমে যাবে আমলকী সাড়ে,
বাঁকা চাঁদ ডুবে যায় বাদলের মেঘের আঁধারে,
তেঁতুলের শাখে শাখে বাদুড়ের কালো ডানা ভালে।

'ঝরা পালক'-এর কাল থেকেই সময়চেতনা জীবনানন্দের কাব্য-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। নগর-জীবনের প্রাথমিক সাক্ষাৎকারজনিত প্রতিক্রিয়া, সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রগাঢ় অনিশ্চয়তা, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিপর্যয় কবির চিত্তদেশে যে আবহমণ্ডল রচনা করেছে, তার প্রকাশ আছে আলোচ্য কাব্যে। জীবনানন্দ তাঁর কালে স্বদেশীয়-জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় অভিজ্ঞতা থেকে যে চেতনা লাভ করেছিলেন, তা-ই আলোচ্য কাব্যে রূপায়িত হতে শুরু করেছে। এভাবেই জীবনানন্দ 'ঝরা পালকে'র পথ বেয়ে 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' পথে পা বাড়ালেন। 'ঝরাপালক' একার্থে কবির চিত্তনির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

'ঝরাপালকে'র পর কবি জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়। এ সময় কবির জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি বরিশালে, যার নৈসর্গিক শোভা ও স্নিগ্ধতা অনির্বচনীয়। তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তি-জীবনের পেশাগত নিরাপত্তাবোধ। তার আগেই তিনি কলকাতায় বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার ফসলে সমৃদ্ধ—এ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি পরিত্রাণ পাননি এবং তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি আত্মকেন্দ্রিকতার গভীরতাতেও নিমজ্জিত হননি। বিকৃত সমাজ চৈতন্য তাকে

তাড়া করে ফিরেছে। তার-ই অনিবার্য ফলশ্রুতিস্বরূপ এসেছে মৃত্যুচেতনা এবং স্বীয় হৃদয়ে ব্যাধির অনিবার্য সংক্রমণ তিনি লক্ষ করেছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে আছে মৃত্যু চেতনার প্রেক্ষাপট, সমসাময়িক অবক্ষয়িত সমাজ-জীবনের প্রতিবিম্ব। কিন্তু কবি জীবনশিল্পী বলে সামগ্রিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়েছেন। কবির অনাহত জীবনবাদিতা তাঁর জীবনের ধারাকে প্রবলতর করে তুলেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে কবি সমাজ তথা পারিপার্শ্বিক চেতনার পীড়নে বিচলিত। মর্ত্যপ্রীতি ও মৃত্যু-চেতনার পারস্পরিক দ্বৈরথ সমরের কবি নিবিড়ভাবে অন্তর্মুখী। এ কাব্যে সময়চেতনা ধূসরতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। যে নক্ষত্র কবির অন্যান্য কবিতায় জ্ঞানে শাশ্বত ও উপলব্ধিতে অক্ষয়, তার উপস্থাপন এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে জীবনের অন্যতম প্রতীকরূপে চিহ্নিত নক্ষত্র মানব বিপর্যয়ের ইঙ্গিত বহন করে। 'নির্জন স্বাক্ষর', 'বোধ' প্রভৃতি কবিতার নক্ষত্র-চেতনা এ বক্তব্যের পক্ষে রায় দেয়—১. 'নক্ষত্রের মতন হৃদয়/পড়িতেছে ঝরে/ক্লান্ত হয়ে—শিশিরের মতো শব্দ করে।' [নির্জন স্বাক্ষর]। ২. 'পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ/চায় না সে?'

শুধু বস্তুকে নয়, কালকেও লৌকিক ধারণার অনুযায়ী করে সর্বগ্রাসীরূপে উপস্থাপিত করেছেন; এবং তার প্রচণ্ড ধ্বংসময়তা শীতের প্রতীকে উপস্থিত হয়ে জীবন, যৌবন এবং সৌন্দর্যকে ক্ষণকালীন মহিমা দান করে।' (জীবন শিল্পী জীবনানন্দ দাশ : আসাদুজ্জামান) 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রায় সমস্ত কবিতার প্রকৃতির এক 'ধূসর, ক্ষয়িষ্ণু, শীতার্ত, ম্লান অন্ধকার' প্রকাশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু এক নির্জন ধূসরতায় লীন প্রকৃতি এখানে উপস্থাপিত। নামকরণের প্রতীকী ইঙ্গিতেও এ তত্ত্বটি প্রকাশিত। জীবনানন্দ স্বয়ং একটি চিঠিতে লিখেছেন—'আমার কাব্যের উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতি-চেতনার ভেতর রয়েছে বলেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সবসময়-ই যে ধূসর, তা হয়তো নয়।' একথাও সর্বতোভাবে সত্য; 'কেননা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সাময়িক মৃত্যুচেতনার জটিল কুহেলি অতিক্রম করে জীবনের পাখিরা অনন্ত আকাশে প্রদক্ষিণ শুরু করে। কবি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মৃত্যুচেতনার অন্ধকার পর্যায় পেরিয়ে সময়চেতনার চিন্ময় সূর্যকে নবরাগে রঞ্জিত দেখেন; এ কাব্যেই ঘটে যায় প্রতীক্ষিত উষালগ্ন, যা উদ্ভাসিত ঐশ্বর্যে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে 'বনলতা সেন'-এর পরিব্যাপ্ত পটভূমিতে।' (জীবন শিল্পী জীবনানন্দ দাশ : আসাদুজ্জামান) 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি যে প্রকৃতির রূপে আবিষ্ট, তা ক্ষয়িষ্ণু সৌন্দর্যের তীব্র আস্বাদে অপরূপ—এ জগৎ যেন কবির চেতনায় শরীরী হয়ে উঠেছে এবং এখানে চিত্ররূপময়তা ও ধ্বনিগন্ধময়তা যেন সমান্তরালভাবেই উপস্থিত। 'জীবনানন্দর কাব্যে দেখা যায় যে চিত্ররচনার অজস্রতা, তার বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য। যত উপমায়, যত ইঙ্গিতে তিনি কল্পনাকে প্রকাশ করেন, সেগুলি ভাবাত্মক নয়, রূপাত্মক; চিন্তাপ্রসূত নয়, অনুভূতি প্রসূত।*** তাঁর একটি কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'; জীবনানন্দর সমগ্র কাব্য সম্বন্ধেই এ আখ্যা প্রযোজ্য। ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার ওপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধ ও স্পর্শেরও বটে, বিশেষভাবে গন্ধ ও স্পর্শের।' (কালের পুতুল; বুদ্ধদেব বসু) ['ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আলোচনা প্রসঙ্গে]। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নিসর্গজগতে

যে ঋতুকে দেখতে পাওয়া যায়, তা হলো শীত ঋতু—এখানে শুধুই কুয়াশা, হিম আর পাতার ঝরে পড়া; সূর্যের অনুপস্থিতিও লক্ষ্যগোচর। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দতালিকা এ বক্তব্যের পক্ষে রায় দেয়—ধোঁয়াটে ধারাল কুয়াশা (পেঁচা)/যেখানে গাছের শাখা নড়ে শীত রাতে (সহজ)/চলিবার শক্তি নাই; সবচেয়ে শীত তৃপ্ত তাই (কয়েকটি লাইন)/মসৃণ হাড়ের মতো সাদা হাত (পরস্পর)/শীত রাতে আড়ষ্ট সাপের মতো শুয়ে (জীবন)/হলুদ পাতার ভিড়ে বসে/শিশিরে পালক ঘষে ঘষে (পেঁচা)/মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে/জেগেছিল অঘ্রাণের রাতে এই পাখি (পেঁচা)।

"'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এক পিপাসার গান,—সে পিপাসা সৌন্দর্যের, যে সৌন্দর্য অপরূপ অথচ মরণাহত, অনির্বচনীয় তবু নশ্বর।*** 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সকল কবিতাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের বিপর্যয়ের ঘনিষ্ঠ, অন্তত রচনাকালের দিক থেকে। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এসব কবিতার জগৎ রূঢ় বাস্তব নয়, কাব্যের বিষয় প্রাত্যহিক পৃথিবীর সমস্যা সংঘর্ষ নয়।*** নিসর্গের যে অপরূপতা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত জেনেই কবির চেতনা বিষণ্নতার বোধে ভারাক্রান্ত হতে দেখেছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র জগতে, তার-ই সঙ্গে ইতিহাসের ঢের লুপ্ত অধ্যায়ের গরিমা ও কীর্তির নশ্বরতার বিষণ্ন উপলব্ধির সংযুক্তি জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টিতে একটি নূতনতর চরিত্র লক্ষণ নিয়ে এসেছে, যা তাঁর আগামী রচনায় আরো বড় আয়তনে ও তাৎপর্যে অর্থময় হয়ে উঠেছে। নিসর্গের রূপাবিষ্ট ইন্দ্রিয়াসক্ত অনুপুঙ্খ অবলোকনের ভিত্তিভূমি থেকে স্বপ্নপ্রয়াণের যে আকাঙ্ক্ষাতীব্রতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'কে দিয়েছে অনন্য স্বকীয়তা, 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলীতে সে বিশিষ্টতা প্রবলভাবে উপস্থিত।' (জীবনানন্দের চেতনাজগৎ; প্রদ্যুম্ন মিত্র) 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে প্রেমচেতনা, নায়িকা বর্ণনা প্রভৃতি সমস্তই আছে। কিন্তু বিষণ্ন শীতার্ত নৈসর্গিক পটভূমিকায় প্রেম এক রোমান্টিক দীর্ঘশ্বাস, আর নায়িকারা প্রবলভাবে দেহজ কামনা-বাসনার আরক্ত সংসর্গে আবদ্ধা, ঈর্ষা-বঞ্চনা-অবহেলার ব্যর্থতায় চিত্রায়িত।

'বনলতা সেন' (১৯৪২) কাব্যে কবি যে বিশ্রামভূমির কথা চিন্তা করেছেন, তা কোনো বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট নিসর্গ নয়। কবির নিসর্গ-ভাবনা, প্রেম-চিন্তা, ইতিহাস-চেতনা কোনো একটি বিশেষ দেশ-কালের মাত্রায় আবদ্ধ নয়। বনলতা সেন নামকরণ থেকে মনে হয়, কবির আশ্রয়ভূমি মূলত নারীকেন্দ্রিক আলোচ্য কাব্যে; কিন্তু তা যথাযথ নয়। এ নারী কোনো ব্যক্তি নারী নয়, অবিমিশ্র নারী স্বভাবের নয়, আসলে এখানে মিশে যায় নিসর্গের আশ্রয়ময়তা আর নারীর প্রেমময়তা। নিসর্গ আর নারীর সমবায়ে যে প্রাণনাশক্তি, তার সঙ্গে আর এক চেতনার সংমিশ্রণ ঘটে—তা হলো ইতিহাস-চেতনা, সমসময় চেতনা। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে আছে মহাজীবনের অভীপ্সা, আছে অখণ্ড সময়চেতনা। এ কাব্যে 'আমি যদি হতাম' কবিতা আকাশ ও প্রান্তরব্যাপী এক বিস্ময়কর নৈসর্গিক উন্মোচন। 'বুনোহাঁস' কবিতায় আছে 'আমি যদি হতাম!' কবিতার স্তরপরম্পর, যেখানে কবি-মানসের শুদ্ধ আকৃতি সমর্থিত হয় পরিবেশের সঙ্গে এবং কবিতাটির স্তর থেকে স্তরান্তরে পাঠক উপনীত হয়, কবির অভিজ্ঞতার সাম্রাজ্যে।

'বুনোহাঁস' কবিতায় কল্পনার হাঁসের সব ধ্বনি মুছে গেলেও 'হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর' তারা উড়তে থাকে। 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায় বনলতা সেন কবির চোখে প্রেম ও জীবনধর্মের প্রতীকরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা থেকে বর্তমানকালে। 'ঘাস' কবিতায় জীবনানন্দের যে স্বেচ্ছা উত্তরণ ঘটে, তা রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' বা 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার মতো বিশ্বাত্মবোধের কবিতা না হলেও সেখানে মননশীল কবি-কল্পনার প্রত্যয় অনুপস্থিত নয়। 'বিড়াল' কবিতায় খাদ্য অন্বেষণের হিংস্র প্রবৃত্তির প্রতীক বিড়ালের বিচরণ প্রকাশ্য দিবালোকে, সে কৃষ্ণচূড়ার গায়ে সারাদিন থাবা দিয়ে আঘাত করে, আবার সূর্যের নরম শরীরে থাবা বুলিয়ে অন্ধকারকে লুফে নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারে। 'বুনো হাঁস' কবিতার অতিক্রান্ত প্রেমের আনন্দ উদ্বোধক স্মৃতি 'হায় চিল' কবিতায় আরো বিস্তার্যমান রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। 'শঙ্খমালা' কবিতার স্মৃতি আনন্দ বা বেদনার নয়, তা শুধুই স্বরূপ উপলব্ধির বিস্ময়। 'নগ্ননির্জন হাত' কবিতায় কবির স্মৃতির সংরাগ ইতিহাস অতিক্রম করে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিস্তৃত হয়। এ কবিতার কথক দেশ বা কালের সীমায় সীমাবদ্ধ পুরুষ নয়, এ পুরুষ আন্তর্জাতিক পুরুষ। এ কবিতার নারীও কারো নিজস্ব নয়। প্রকৃত অর্থে এ কবিতা প্রবহমান জীবনবোধের কবিতা। পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল ইত্যাদি ক্ষণসময় বিম্বিত বস্তুরাজি উত্তীর্ণ বিস্ময় ও জীবনের অনিঃশেষ প্রসারণের আভাস দানকারী কবিতা হলো 'নগ্ননির্জন হাত'। 'অন্ধকার' কবিতায় কবির আলোক-তৃষ্ণা, 'কমলালেবু' কবিতায় চৈতন্যের ব্যাপ্তি, 'তুমি' কবিতায় নিসর্গের মর্মবাণী উন্মোচন, 'ধানকাটা হয়ে গেছে' কবিতায় একটি ফড়িং পর্যন্ত প্রাণময় প্রশান্তির ধারক হয়ে ওঠে। 'সুচেতনা' কবিতায় মানবচৈতন্যেব উত্তরণে আশাবাদী কবি :

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় ততদূর ভালো মানবসমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।
*   *   *

শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়। 'সুদর্শনা' কবিতায় নারী অতীত স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করে ভাবমূর্তি। 'শ্যামলী' কবিতায় নারীর যে রূপ চিত্রিত, তা শক্তিরূপিণী ও প্রেরণদাত্রী'।

'বনলতা সেন' কাব্যের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের সম্ভবত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বনলতা সেন' জীবনানন্দ তাঁর 'কবিতার কথা' গ্রন্থে মহৎ কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন—'মহৎ কবিতা জ্ঞানে গভীর নয় শুধু অথবা প্রাকৃত জীবনের ব্যাপার নিয়ে নিবিড় নয় কেবলমাত্র, কিন্তু এ দুই জিনিস মিলে এক হয়ে গেছে যেখানে এমনই গাণিতিক শুদ্ধতায় যে, সহসা মনে হতে পারে, মিলনোৎপন্ন কবিতা জ্ঞান নয় আর,

জীবনও নয় যেন, জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল জিনিস।' এ পটভূমিকায় রাখলে 'বনলতা সেন' অবশ্যই মহৎ কবিতা। কবিতাটিকে যে পথ হাঁটার কথা বলা হয়েছে, তা হলো গতি—প্রাণের যাত্রা—যা চলেছে ধূসর অতীত থেকে এবং যা পায় জীবনের সমর্থন। এ কবিতার বর্তমান সময়গ্রন্থিতে আছেন কবি, আর ইতিহাসের সময়গ্রন্থিতে আছেন 'নাটোরের বনলতা সেন'। এই যে কবির আশ্রয়, তা হলো চিরন্তন মানবের কাছে চিরন্তন মানবীয় আশ্রয় অন্বেষণ। 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে সময়চেতনা, ইতিহাসচেতনা, প্রকৃতিচেতনা, প্রেমচেতনা যেন এক সূত্রে তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। অবশ্য এ কবিতার প্রকৃতিচেতনা প্রশান্তিতে পূর্ণ। এ কবিতর এবং তার সঙ্গে এ কাব্যের প্রকৃতিচেতনা পূর্ববর্তী 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মতো ম্লান হিমজগৎ নয় অথবা হৈমন্তিক বিষাদের ধূসর পাণ্ডুলিপি নয়; এ হলো আশ্রয় ও আশ্বাসবহ প্রকৃতিচেতনা, যেখানে প্রকৃতি লীন শান্তির মধ্যে মানুষ তার অস্তিত্বের মুক্তির আশ্রয় খুঁজে পায়।

'ঝরাপালক' কাব্যে কবির ব্যক্তিগত প্রেম-চিন্তা আবেগ-ইতিহাস ও পুরাণ-লোক-কথার মিশ্রণে সংহত হতে পারেনি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে বিষণ্ন শীতার্ত পটভূমিকায় প্রেম হলো রোমান্টিক দীর্ঘশ্বাস। আর 'বনলতা সেন' কবিতায় কবির প্রেমচেতনা হলো সৌন্দর্য ও কল্যাণের সমাহার। প্রেম ও প্রকৃতি এখানে এক অভিন্ন প্রতিমায় উপস্থিত। এ প্রেম চেতনার গভীর আলোকে মূল্যায়িত। আর এ কবিতা নারী, নিসর্গ, আশ্রয়, নিরাপত্তা এবং নিভৃতি ইত্যাদির সৃজনধর্মিতায় ব্যঞ্জনাবাহী।

জীবনানন্দ যথার্থই বলেছিলেন, 'কবিতার অস্থির ভেতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান' এবং 'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতি সাধক অপরিহার্য সত্যের মতো"। 'বনলতা সেন' কবিতায় এ; 'ইতিহাসচেতনা' ও 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান' এবং 'সময়চেতনা' 'একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো' কাজ করেছে। জীবনানন্দের কবিতায় ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক উল্লেখ মনের গভীরে লালিত উত্তরণ বোধে ব্যবহৃত হয়। ফলে বনলতা সেন হয়ে যায় ইতিহাসের পটভূমিতে মানবের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এ কবিতার মূলকথা মানবচৈতন্যের প্রবহমানতা, প্রেম ও জীবনের প্রবহমানতার মাধ্যমে বস্তুর চিরন্তনত্ব প্রতিষ্ঠার আয়োজন।

'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) যদিও 'বনলতা সেন' এর পর প্রকাশিত, তবুও 'মহাপৃথিবী'র কবিতাসমূহ 'বনলতা সেন' সমসাময়িককালে রচিত। মহাপৃথিবী' এক অর্থে 'বনলতা সেন'-এর বিস্তার। কেননা, 'বনলতা সেন' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে 'মহাপৃথিবীর' থেকে গৃহীত আঠারোটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। মনে হয়, বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবীর' কাব্যপরিমণ্ডলের মধ্যে কবি কোনো বিষমতা খুঁজে পাননি। 'বনলতা সেন'-এ লৌকিক জগতের সীমাতিক্রামী যে শুদ্ধতর জগতের ধারণা প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়, 'মহাপৃথিবী' বোধ হয় তার-ই সম্প্রসারিত রূপ। 'বনলতা সেন' কাব্যের বনলতা সেন, হাওয়ার রাত, নগ্ন নির্জন হাত, শেফালিকা, সুদর্শনা, সুরঞ্জনা ইত্যাদি কবিতায় কবির যে মনোনীত প্রেক্ষিত এবং যা পরিচিত পৃথিবীর, তার-ই দ্বিতীয় ভুবন 'মহাপৃথিবী'তে

রূপায়িত। মহাপৃথিবী পরিকল্পনার মূলে থাকে পূর্ববর্তী কাব্যের সমস্ত সূত্রের সমন্বিত রূপ। মহাপৃথিবী কবির নির্মিত দ্বিতীয় জগৎ যেখানে 'কোথাও উদ্যম নাই, কোথাও আবেগ নাই,—চিন্তা স্বপ্ন ভুলে গিয়ে শান্তি আমি পাবো?/রাতের নক্ষত্র তুমি বলো দেখি কোন্ পথে যাবো?" চিরন্তনতার প্রতীক নক্ষত্রকে এই প্রশ্ন করার পর নক্ষত্র কবিকে বলেছে—'তোমারি নিজের ঘরে চলে যাও।' অর্থাৎ শাশ্বতের প্রতি বিশ্বাস কবিকে শিল্প-ভাবনায় আরো সচেতন করে তুলতে চাইছে। এ সচেতনতার স্মরণীয় প্রতিফলন 'সিন্ধুসারস' কবিতায় সংলক্ষ্য :

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস; আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, সাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে, আবার তোমার গান,
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।
*　　　　*　　　　*
জানি পাখি, সাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহো নাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,
বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই
শীতরাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে যে পাখিবা :
ব্রিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের
পর নেমেছিল তারা তারপর—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে!
'মহাপৃথিবী'রত তারাই—
কলবর করে উড়ে যায়

শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়। 'সিন্ধুসারস', কবিতায় জীবনের উল্লাস—এখানে 'আনন্দের অন্তরালে' নেই 'প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত'। এ কবিতায় প্রবালপঞ্জর, ঘিরে ডানার উল্লাস, সিন্ধুর উৎসব; এখানে শুধুই দুপুরের অনন্ত আকাশ। কিন্তু কবির শিল্পচিন্তায় শুধু উল্লাস আর আনন্দের স্থান হতে পারে না; বেদনারও ভূমিকা থাকে। আর তার-ই প্রতিফলন ঘটে 'আবহমান' কবিতায়—

১. পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিঝুম।

২. গাঢ় করে দিয়ে যায়—এইবার কুয়াশায় যাত্রা সকলের।

৩. পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা নিজের মনের মুদ্রাদোষে নষ্ট হয়ে খসে যায় চারিদিকে আমিষ তিমিরে;

৪. নেউলধূসর নদী, আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয়।

৫. পৃথিবীর রাজপথে—রক্তপথে—অন্ধকার, অববাহিকায় এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।

৬. সৃষ্টির নাড়ির পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়, অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে বয়ে গেছে অমোঘ আমোদ।

জীবনানন্দ কী এখানে পরিচিত জগৎ অতিক্রমী কোনো চেতনার রাজ্যে প্রস্থানী পথিক! যার জন্য কাব্যগ্রন্থের নাম 'মহাপৃথিবী'। 'শব' কবিতায় কবির ভাবনা ক্রমশ মহাপৃথিবীর রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে,—যেখানে :

'পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ' এবং 'এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব/ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রূপালি নীরব।'

'মহাপৃথিবী'র সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কবিতা সম্ভবত 'আট বছর আগের একদিন'। জীবনানন্দ এ পর্বে যে বিশুদ্ধ শিল্পজগতের ধারণায় অভিস্নাত হতে চাইছেন, সম্ভবত উক্ত কবিতার নায়ক সেই জগতের স্বপ্নে অভ্যস্ত। কেননা, আলোচ্য কবিতার নায়ক যে মৃত্যুবরণ করেছেন, তা দুঃখবাদীর মৃত্যু নয়। জীবন যন্ত্রণাদায়ক বলে নায়ক মৃত্যুবরণ করেননি; তিনি ভিন্ন এক রূপলোক নির্মাণ করতে চান বলে অভিনব ইতিহাস বিবৃত করেন। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার নায়কের জীবন 'হাড়হাভাতের গ্লানির জীবন, নয়; এ নায়কের জীবন নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয়নি, মন আর মননের মধুর আস্বাদ বধূ তাঁকে দিয়েছেন। তবু তাঁর মৃত্যু বরণের সাধ হয়—কেননা, 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়' তাঁর 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে'। আসলে এখানে শিল্পী-জীবনের সূক্ষ্ম যন্ত্রণাবোধের আর্তির প্রকাশ। এ কবিতার বক্তব্য পলায়নী মনোবৃত্তির বক্তব্য নয়; ব্যক্তি-জীবন আর সমাজ-জীবন কবির কাছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত বলেই কবি শিল্পজগতের মহৎ আকাঙ্ক্ষাকে এখানে রূপায়িত করতে চাইলেন। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি আসলে কবির শিল্পীসত্তার অভিপ্রকাশের কবিতা।

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যের কবিতার রচনাকাল ১৩৩৫ থেকে ১৩৫০ [১৯২৮-১৯৪৩]; আর প্রকাশকাল ১৯৪৮। আলোচ্য কাব্যে কবির বিবর্তন পূর্ণতার মুখোমুখি। কবি এতদিন যে দু'টি জগতের লৌকিক জগৎ আর শিল্পজগতের পীড়নে কখনো আর্ত, কখনো নিঃসংশায়িত; সেই দু'টি জগৎ এখানে সমান্তরালভাবে উপস্থিত। 'মহাপৃথিবী' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত কবির এই যে অভিযাত্রা তা আসলে শিল্পলোক সৃজনের অভিযাত্রা, যা প্রাকৃত-জগৎ বিচ্ছিন্ন নয়। জীবনানন্দের এ কালের জগৎ কোনো বিচ্ছিন্ন জীবনলোক নয়; বরং তা আলোড়িত, আতঙ্কিত এবং অভিভূত পরিচিত পৃথিবীর প্রচ্ছায়ায়। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যের প্রবেশক করিতা 'আকাশলীনা'য় কবি শুদ্ধতার বাণী উচ্চারণ করলেও পরবর্তী কয়েকটি কবিতা পার হলেই শুরু হয়ে যায় সেই চেনা জগতের আলোড়িত প্রক্ষোভ :

১. বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে।

২. রক্তিম গির্জার মুণ্ড দেখা যায় সবুজের ফাঁকে।

৩. কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হয়ে আজ রাতে ঢের মেঘ হিম হয়ে আছে দিকে দিকে।

৪. নৃমুণ্ডের আবছায়া—নিস্তব্ধতা।
৫. খোঁপার ভিতরে চুলে; নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হৃংকঙের তৃণ।
৬. সেইখানে যুথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের
সংকেতে মেধাবিনী।
৭. বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ।
৮. হয়তো চেঙ্গিস আজো বাহিরে ঘুরিতে
আছে করুণ রক্তের অভিযানে।
৯. বৈশাখের মাঠের ফাটলে
এখানে পৃথিবী আসমান।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
১০. রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?
১১. তুচ্ছ নদী সমুদ্রের চোরাবালি ঘিরে
বিয়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কনভয়।
১২. পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ;
পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনটটাচ্ছন্নতা;
ইয়াঙ্কির লেন-দেন ডলারে প্রত্যয়।

প্রবেশক কবিতা 'আকাশলীনা'য় কবি পরিকল্পিত ও ভাবিত শিল্পলোকের মহনীয় বিস্তার্যধর্মিতা বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা ও অসূয়াকে অতিক্রম করে এক উজ্জ্বলতায় শেষ পর্যন্ত সমর্পিত হয়; কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি কবিতা অতিক্রম করলেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে এক ভয়ঙ্কর ক্লেদাক্ত 'সাতটি তারার তিমিরে' অভিভূত পৃথিবীর রূপ। কবির দৃষ্টিতে আধুনিক যন্ত্রযুগের বীভৎসতা প্রতিফলিত হয়; প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বপ্নাচ্ছন্নতা মৃত্যুর বিষণ্ণতা ও ভয়াবহতা নিয়ে উপস্থিত হয়। আলোচ্য কাব্যে জীবনানন্দের অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা আছে, অনুভূতির গভীরতা আছে, সংশয়াত্মক চেতনা আছে, যুদ্ধ বিপর্যস্ত লোকালয়ের মৃত্যু পাণ্ডুরতা আছে।

'সাতটি তারার তিমির' পূর্ববর্তী 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে পৃথিবীর, মানব-সভ্যতার জীবন জটিলতার মনননিষ্ঠ কয়েকটি কবিতার যে আয়োজন দেখা দিয়েছিল, 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে তাঁর-ই পুনরাবর্তন। অবশ্য নতুন উপলব্ধি, নতুন প্রকাশ পদ্ধতি, নতুন সংকেত ও নতুন প্রতীক লক্ষ করা যায়। ১৯২৮-১৯৪৩ 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহের রচনাকাল। এ সময় জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নানা কারণে আলোড়িত, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সর্বব্যাপী সংকট, আত্মঘাতী বুদ্ধি ও রুচিহীন বিলাসের তাড়নায় স্বার্থের মোহে বিভ্রান্ত মানব-সমাজ। জীবনানন্দ এমনই এক

অবস্থায় প্রজ্ঞার সাহায্যে উপনীত হতে চাইছিলেন আরো গভীরে। 'মহাপৃথিবীর' কবিতায় যে বিষাদের সূচনা, 'সাতটি তারার মিতির'-এ তা যেন আরো সংকেতগূঢ়। যে সপ্তর্ষিমণ্ডল মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক, তা যেন মানুষকে আর পথ দেখাতে পারছে না, উপরন্তু এক তিমিরের নীরন্ধ্রতায় পৃথিবী যেন নিস্তেজ হয়ে আসছে। তাই কবির চেতনাও যেন নিভন্ত। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের রচনাকাল প্রধানত অসহযোগ আন্দোলনের অস্থিরতা থেকে পঞ্চাশের মন্বন্তর পর্যন্ত। ফলে এখানে নানা সংশয়, বেদনা, বিভ্রান্তি, আর্তি লক্ষ্যগোচর। এ কাব্যগ্রন্থে সত্য ও কল্পনার বিভ্রম বুদ্ধির জগৎ বর্জন করে অনুভূতির কাছে আত্মসমর্পণ ও সাংকেতিকতার অন্তর্গূঢ় রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'ঘোড়া' কবিতাটি স্মরণ করা যেতে পারে। জীবনানন্দের অনেক পরাবাস্তবতার কবিতা আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে লক্ষ করা যায়। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে কবি যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ জগতের অধিবাসী এবং সচেতন অধিবাসী; তবুও প্রকৃতি এখানে অনুপস্থিত নয়। 'অন্তত মানব-সমাজের ঘনঘটায়' প্রকৃতি আর সময়-ভাবনা তাঁর কাছে দুর্নিরীক্ষ্য হয়নি। 'সাতটি তারার তিমির' মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের বলে এখানে 'ধ্বংস ও বিপর্যয়ে অবক্ষয়িত সমাজ-জীবনের এক শোকাবহ ছবি ফুটেছে, যেখানে প্রত্যয়হীনতার অন্ধকারে প্রয়াণের সকল শক্তি অবসন্ন, মহৎ রীতি বা সত্যের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ সব আলোকবর্তিকা নিষ্প্রভ, তাদের নির্দেশ পরাহত'। 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ে কাব্যসৃষ্টির যে চেতনা পটভূমিকা, তা নিম্নোক্তভাবে ব্যাঘাত হতে পারে—'যে অন্ধ দেশকালে মানুষ কেবলি জেগে উঠেছে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে', সেখানে সমাজ চাইছে সকলে কাছ থেকে নিরন্তর 'তিমিরবিদারী অনুসূর্যের কাজ'। যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে মূল্যবোধের ব্যাপক বিনষ্টিতে যখন ঘরে ও বাইরে নিরন্তর তমসা এবং সেই ভীষণ অমার উৎস শুধু বহির্জাগতিক বিপর্যয়-ই নয় ('এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক,') মানবের হৃদয় থেকে 'মহৎ সত্য বা রীতি' অর্থাৎ সকল মূল্যবোধের অন্তর্ধান, যার পরিণামে বিশাশতকী মানুষের নাগরিক পৃথিবী হয়ে যায় 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো' এবং কবি অনুভব করেন, সত্যভ্রষ্টের মতো, সভ্যতার এ জান্তব অধঃপাতের' পেছনে আছে 'হৃদয়বিহীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস'। 'সাতটি তারার তিমির'। গ্রন্থে যে নীরন্ধ্র তিমিরাচ্ছন্নতার সম্মুখীন হন জীবনানন্দের পাঠক, তা প্রতিবেশজাত এবং সমকালবদ্ধ। কবি এ অমারাত্রির উৎস দেখেছেন মানুষের-ই অধঃপতিত 'ইতিহাসবিবর্ণ' হৃদয়ে ('বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের রাত্রির বেবুন')। কিন্তু অন্ধ যুতমসা ও বীতবিশ্বাস উদ্‌ভ্রান্তি থেকে মানবের অন্তর্লোকের প্রেমবোধ-ই যে মুক্তির পথ দেখাতে পারে, এ কথাও বারংবার উচ্চারিত হয়েছে জীবনানন্দের শেষ পর্যায়ের কাব্য রচনায়; কিছুটা ক্ষীণ ও বিক্ষিপ্তভাবে 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে, প্রবলতরভাবে 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'য় এবং একেবারে অনন্য নিরপেক্ষভাবে তাঁর শেষতম রচনাসম্ভারে। প্রেমের শক্তি ও প্রেরণায় এ আস্থাশীলতা 'মহাপৃথিবী' 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের কাব্যের প্রবল বিবমিষা, বিদ্রূপ ও উদ্‌ভ্রান্তির বিপরীতে কবিচেতনার অন্তঃশীল মৌল আস্তিকতার প্রতিই সংবেদনশীল পাঠকের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে।

'সাতটি তারার তিমির'-এর নাগরিক জগৎ ভাব ও আবহে যেমন কাব্যসৃষ্টির পূর্ব-পর্যায়ের শান্ত নির্জন প্রকৃতিভুবন থেকে দূরস্থিত তেমনই? জগতে তার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও মহিমা থেকে স্খলিত হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে গ্রন্থের প্রারম্ভিক কবিতা 'আকাশলীনা'র নায়িকা সেই 'পৃথিবীর বয়সিনী', প্রেমস্বরূপা 'সুরঞ্জনা'কে কবি দেখেন যুবকের বাহুলগ্না; দুরাপসৃয়মান। স্পষ্টতই যুবক এখানে দেহী বাসনার, জৈব জীবনের প্রতিভূ; 'সুরঞ্জনা' যুগাবলীন মালিন্যে অধঃপতিত। মনে পড়ে, 'বনলতা সেন' গ্রন্থে আমরা যে 'সুদর্শনা' নারীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, তিনি 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে' লীন হতে না দিয়ে তাঁর প্রেমিকের চেতনাকে করেছিলেন অমৃত-সূর্যমুখী। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে সেই কবির-ই উপলব্ধিতে প্রেম মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মহিমাবিহীন, জৈবজীবন উপচারে পর্যবসিত'। (জীবনানন্দের চেতনাজগৎ : প্রদ্যুম্ন মিত্র)

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে যে নিসর্গ প্রকৃতি পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ায়, সেখানে শান্তি নেই, পূর্ণতা নেই। এ যেন এক অন্ধকারময় এক নাগরিক জগৎ, যেখানে মানুষের সংকটময় অস্তিত্ব 'রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে' জেগে ওঠে, 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো' অস্তিত্বে নিমজ্জিত মানুষ দিশাহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের অজস্র অনুরূপ উল্লেখ এক সমাচ্ছন্ন অন্ধকার, সভ্যতার জান্তব অধঃপতন ও মূল্যবোধ বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবহ। এ পরিব্যাপ্ত মূল্যবোধহীনতা ও বিপর্যয়ের আলোক 'সাতটি তারার তিমির' চিত্রকল্পটিও অর্থবহ হয়ে ওঠে। 'সাতটি তারা' আমাদের মনে আনে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অনুষঙ্গ, যা চিরকাল অন্ধকার রাত্রিতে, সমুদ্রে বিপর্যয়ের ঘনঘটায় মানবকে দেখিয়েছে পথ। তেমনই যে সমস্ত মূল্যবোধের আশ্রয়ে মানুষের সমাজ একাল লালিত ও প্রাণিত হয়েছে, যুদ্ধ-অবলীন পৃথিবীর এ সংকটকালে সে সবকিছুই নির্দেশে ব্যর্থ, তাই নিরর্থক। সপ্তর্ষিমণ্ডল বা সাতটি তারা আজ আর আলোকদেশি নয়, তিমিরাচ্ছন্নতায় অবলীন। স্বাভাবিকভাবেই এ আবিশ্ব ঘোর অমানিশায় পথভ্রষ্ট মানবিক পৃথিবীতে প্রেম ও প্রকৃতির ভূমিকা গৌণ ও অনুল্লেখ্যপ্রায় হয়ে পড়েছে। কারণ জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্য রচনায় প্রেম ও প্রকৃতিই বারংবার আবির্ভূত হয়েছে প্রেরণা ও শুভচেতনার কল্যাণ ভূমিকায়। 'সাতটি তারার তিমির' এ বীতপ্রেম বিশ্বাসরিক্ত আধুনিকের মনের ছবিটিই প্রবলভাবে এঁকেছে।

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যে যে সুর-বৈপরীত্য, তার পটভূমিকায় রয়েছে কবির সমসাময়িক ব্যক্তি-জীবনের অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতার যন্ত্রণা ও মানসিক বেদনা। দেশ-বিভাগজনিত বিপর্যস্ত পরিবেশ, দাঙ্গা কলঙ্কিত ভয়াবহতা, দুর্ভিক্ষ-উত্তর সামাজিক অবক্ষয়, ব্যক্তিগত স্বচ্ছলতার অভাব, নাগরিক জীবনের অসুস্থতা, ক্লান্তি-হতাশা ইত্যাদি কবিকে বিচলিত করে তোলে। শিল্পলোকের চিরন্তন শুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষা অথচ তাকে বাস্তবে না-পাওয়ার বেদনা কবির মনোলোকে যে অস্থিরতার ঘূর্ণি সৃষ্টি করে, তার-ই ফলে তাঁর কবিতায় এসে যায় অনীহা, অসঙ্গতি, অবক্ষয়, উৎসকেন্দ্রিকতা। যদি এ কাব্যের কবি মনে করেন, 'আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই', 'মানুষের ভবিষ্যৎ নেই', 'মানুষের-ই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল'; তবুও কবি বিশ্বাস করেছেন :

হৃদয়হীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস
সাঙ্গ করে দিতে চেয়ে যতদূর মানুষের প্রাণ
অতীতে ম্লানায়মান হয়ে গেছে সেই সীমা ঘিরে
জেগে উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ,
অনন্তের অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

'রূপসী বাংলার' কবি জীবনানন্দ ধ্যানতন্ময় কবি। যদিও কাব্যটির প্রকাশকাল ১৯৫৭, তবুও এ কাব্যের কবিতার রচনাকাল ১৩৩৯-৪০ সাল। অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দ। 'রূপসী বাংলা'র কবিতাসমূহ সম্পর্কে কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ জানিয়েছেন—'এ কাব্যগ্রন্থে যে কবিতাগুলি সঙ্কলিত হলো তার সবগুলিই কবির জীবিতকালে অপ্রকাশিত ছিল; তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো কোনো কবিতা ভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাগুলি প্রথম বারে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত ছিল, সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত।*** এসব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল" [রূপসী বাংলা/ভূমিকা : অশোকানন্দ দাশ, ৩১শে জুলাই, ১৯৫৭]। রূপসী বাংলায় অঙ্কিত নিসর্গ একান্তভাবে বাংলার নিজস্ব নিসর্গ এবং কবিতাগুলি 'প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী, গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ প্রকৃতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর।' জীবনানন্দ আলোচ্য কাব্যে বাংলাদেশের ইতিহাস-ভূগোলবোধের বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ কাব্যের জগৎ প্রাচীন নিসর্গ জগৎ হলেও সে জগৎ জাত হয় কবির সমকালীন দেশকাল-সঞ্জাত অভিজ্ঞতার বেদনা থেকে। 'রূপসী বাংলা' হলো বাংলার বিনাশশীল জীবন আর অবিনাশী আবহমান রূপ। এখানে প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে আছে মৃত্যুচেতনা। এখানকার প্রকৃতি কোনো বিশেষ আঞ্চলিক প্রকৃতি নয়; প্রকৃতিসর্বস্ব বাংলার সামগ্রিক নিসর্গ। যদিও এর পটভূমিকায় থাকে সম্ভবত কবির জন্মস্থান বরিশাল জেলার শ্যামস্নিগ্ধ সুকুমারী প্রকৃতি, তবুও এ-কাব্যে অঙ্কিত নিসর্গের অনাঞ্চলিকতা অগ্রাহ্য নয়। 'রূপসী বাংলা'র প্রকৃতি মূলত শ্যামশ্রীমণ্ডিত হলেও এখানে রাত্রি, জ্যোৎস্না, হেমন্ত, অগ্রহায়ণ শব্দগুলি এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে যে, প্রকৃতি যেন বর্ণগন্ধ-মিশ্রিত হয়ে আছে। এ নিসর্গ আমাদের ইন্দ্রিয়ে তরঙ্গ তোলে। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'য় যে চিত্র অঙ্কিত হয়, তা কোনো অতিপ্রাকৃত বা রোমান্টিকতায় বিধুর চিত্রকল্প নয়। এখানে পুকুরের পাড়ে চরে খইরঙা হাঁস, পুকুরে জন্মায় কলমিদাম, হিজলের বনে সন্ধ্যায় উড়ে আসে শালিক, ভোরের বাতাসে কাঁঠাল পাতা ঝরে যায়, ডুমুর গাছে দোয়েল পাখি বসে থাকে, নদীর চড়ায় কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না এসে পড়ে, আশ্বিনের ভোরে উড়ে যায় বক, মাছরাঙা, জলে পাট পচে, ভিজে প্যাঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখে কদম বনে চেয়ে থাকে, ধানের নরম গন্ধে বাতাস ভরে ওঠে, কিশোরের পায়ে দলিত হয় মুথাঘাস, হেমন্তের অপরাহ্নে গাঢ় কুয়াশা নামে, পুকুরের ক্লান্ত জল ছেড়ে হাঁস চলে যায়, কাঁঠালচাঁপার নীড়ে ঠোঁট গুঁজে থাকে চড়াই পাখি, ধোঁয়া-ওঠা ভাত—ইত্যাদি অজস্র পরিচিত চিত্রে এ বাংলা একান্তভাবেই

নিজস্ব। 'রূপসী বাংলা'য় অঙ্কিত বাংলার নিসর্গ পটভূমির বৈশিষ্ট হলো স্নিগ্ধতা, স্তব্ধতা, বিষাদ, বিমর্ষতা—

১. চারিদিকে শান্ত বাতি-ভিজে গন্ধ-মৃত্যুকলরব

২. নীরবে পায় ধোয় জলে একবার—তারপর দূরে নিরুদ্দেশে

৩. জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ

৪. বহুদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব

৫. ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে

৬. সনকার মুখ আমি দেখি না কি? বিষণ্ণ মলিন ক্লান্ত কী যে

৭. এরি নিচে কঙ্কাবতী শঙ্খমালা করিতেছে বাস তাদের দেহের গন্ধ, চাঁপাফুল মাখা ম্লান চুলের বিন্যাস

৮. যখন ঝরিছে ধান বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে ম্লান চোখ বুজে।

'রূপসী বাংলা' কাব্যে শুধু বাংলার একান্ত নিজস্ব নিসর্গ নয়, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, লোক-সাহিত্য, লোক-নায়িকা, লোক-জীবন এমন আশ্চর্য মমতায় চিত্রিত হয়ে যায় যে, 'রূপসী বাংলা' বাংলা কাব্য-সংস্কৃতির ধারক হয়ে ওঠে। মানুষ লোক-চেতনা বিচ্ছিন্ন নয়, মানবিক স্মৃতির গভীরে তা আবহমান—সর্বাঙ্গীণ জীবনবোধের এ পরম অনুবর্তই আলোচ্য কাব্যের কেন্দ্রীয় বিষয়। চাঁদ সদাগরের মধুকর ডিঙ্গা, গাঙুরের জলে বেহুলার ভেলা ভাসানো, রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত, নদীতীরের বাশুলী মন্দির, শঙ্খমালা-চন্দ্রমালা-মানিকমালার রূপকথা, কেশবতী কন্যার জন্য রাজপুত্রের অভিযান, কীর্তন যাত্রা-পাঁচালির আয়োজন, কীর্তিনাশা-ধলেশ্বরী নদী, নকশাপাড় শাড়ি, শ্রীমন্ত, বেহুলা, মুকুন্দরাম — লোক-বাংলার এ সমস্ত স্মারক বাংলাদেশের নিসর্গের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে বাংলার সামগ্রিকতাকে—তার ইতিহাস, ভূগোল, নর-নারীর বিশ্বাস-সংস্কার-প্রথা, আহার, ধর্ম-আচরণ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বিকশিত করে তোলে। এ কাব্যে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি পরস্পরের পরিপূরক :

১. মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে

২. বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে

৩. সেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে

৪. যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার কাঁকন বাজিত

৫. বাংলার নীলসন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে

৬. বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালির

৭. বেহুলার লহনার মধুর জগতে

৮. মাথুরের পালা বেঁধে কতবার ফাঁকা হল খড় আর ঘর।

৯ আসিয়াছে চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার
যখন মুকুন্দরাম হায়,
লিখিতেছিলেন বসে দুপহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে যে অপ্রত্যাশিত অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতার যন্ত্রণা পরিব্যাপ্ত অথচ শিল্পলোকের চিরন্তন শুদ্ধতার জন্য শিল্পীর যে মানসাকাঙ্ক্ষা, আর তা না পাওয়ার যে বেদনা-বিক্ষুব্ধ আলোড়ন, উৎকেন্দ্রিকতা, তা যেন 'বেলা-অবেলা-কালবেলার (১৯৬১) ক্রমবিস্তার্যমান। যেহেতু এ কাব্যের কবিতাগুলি 'সাতটি তারার তিমির'-এর সমসাময়িক এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের, তাই এখানে বেদনা, অবক্ষয়, উৎকেন্দ্রিকতা পূর্ববর্তী ধারা বিচ্যুত নয়। এ কাব্যের জগৎ 'কঠিন সময় পরিক্রমা'র, 'মানবপ্রতিভার রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকার', 'রক্তনদীর' জগৎ। জীবনানন্দের 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'র জগৎ তাঁর অনুভবে, উপলব্ধিতে, মেধায় যে বিচিত্র বিভঙ্গে ও বিচূর্ণ বিশ্বাসে চিত্রিত হয়েছে, তা বেদনার, হতাশার, ব্যর্থতার :

১. সেখানে নীলকণ্ঠ পাখি ফসল সূর্য নেই, ধূসর আকাশ।

২. চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার রয়ে গেছে।

৩. কোথাও দ্বিতীয় সূর্য নেই।

৪. অগণন মানুষের সময় ও রক্তের জোগান ভাঙে গড়ে ঘর-বাড়ি মরুভূমি চাঁদ।

৫. কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড় সে নারীর বং দেখে হো হো করে হাসে।

৬. কঠিন অমেয় দিনরাত এইসব।
চারিদিকে থেকে থেকে মানব ও অমানবিকতা
সময় সীমার ঢেউয়ে অধোমুখ হয়ে
চেয়ে দেখে শুধু মরণের
কেমন অপরিমেয় ছটা।

৭. পাখি নেই, সেই পাখির কঙ্কালের গুঞ্জরণ,
কোনো গাছ নেই, সেই তুঁতের পল্লবের
ভেতর থেকে/অন্ধ অন্ধকার তুষার পিচ্ছিল
এক শোন নদীর নির্দেশে।

৮. আজকে এখন আঁধারে অনেক মৃত ঘুমিয়ে আছে।

কিন্তু 'বেলা-অবেলা-কালবেলা' শেষ পর্যন্ত মানব-সভ্যতার অন্তিম নিয়তি হতে পারে না। জীবনানন্দ আস্তিক্যবাদী কবি, তাঁর বিশ্বাস আছে মানবতার প্রতি, সভ্যতার প্রতি, ইতিহাসের প্রতি। তাঁর কবিতার বক্তব্য কী হবে, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— 'আমার লক্ষ্য ছিল মানুষের সাধারণ হৃদয়ের কথা।' 'মানবস্বভাব স্পর্শে' যে কবিতা 'অন্তর্দীপ্ত' হয়, জীবনানন্দের কাম্য সেই কবিতার জগৎ। কেননা, তিনি জানেন—'জীবন তবুও অবিস্মরণীয় সততাকে চায়'। যদিও পৃথিবীতে মাঝে মাঝে অন্তহীন অন্ধকার নামে, পৃথিবী মাঝে মাঝে হয়ে যায় 'খণ্ডিত রক্ত বণিক পৃথিবী' এবং যেখানে অন্ধকার সময় বিশৃঙ্খল সমাজ তৈরি করে, তবুও সেই পৃথিবী শাশ্বত মর্যাদার পৃথিবী নয়। জীবনের উৎসব অনেক মহীয়ান :

১। তারপর একদিন মৌমাছিদের
অনুরণনের বলে রৌদ্র বিচ্ছুরিত হয়ে গেলে নীল
আকাশ নিজের কণ্ঠে কেমন নিঃসৃত হয়ে ওঠে—হেমন্তের
অপরাহ্নে পৃথিবী মাঠের দিকে সহসা তাকালে
কোথাও শনের বনে—হলুদ রঙের খড়ে—চাষার আঙুলে
গালে—কেমন নিমীল সোনা পশ্চিমের
অদৃশ্য সূর্যের থেকে চুপে নেমে আসে।

২। মানুষেরা এইসব পথে এসে চলে গেছে, ফিরে

ফিরে আসে, তাদের পারের রেখায় পথ কাটে কারা, হাল ধরে, জীব বোনে, ধান সমুজ্জ্বল কী অভিনিবেশে শোনা হয়ে ওঠে—দেখে।

'বেলা-অবেলা-কালবেলা' কাব্যগ্রন্থে রাতের স্রোত দীর্ঘতম, সেই তমসায় মানুষ তবুও বুদ্ধ, সক্রেটিস, কনফুশিয়াস, লেনিন, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের অনুভবে আলোকিত হতে চায়—এও কবির বিশ্বাস। অন্ধকার মানুষকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও—

পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্না, রৌদ্রে প্রদীপ্ত হয়, মানুষের মন

সহসা আকাশপথে বনহংসী পাখির বর্ণালী কি রকম সাহসিকা চেয়ে দেখে সূর্যের কিরণে নিমেষেই বিকিরিত হয়ে ওঠে।

'সময়ের নির্মম আঘাতে' কবির আকাশ কালো হতে চাইলেও গতির প্রবাহে সচেতন কবি-মন প্রার্থনা জানায় :

হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালবেসে আজ
সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন।

মানবতার প্রতি আস্থাবান কবি ইতিহাসের কালবেলা উত্তীর্ণ হওয়ার পরম প্রাণদ উজ্জীবন বাণী উচ্চারণ করেন :

আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে এই অনিমেষ আলোর বলয়
মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফলকাম সত্য হতে বলে
জেগে রবে; জয়, আলো সহিষ্ণুতা স্থিরতার জয়।

জীবনানন্দের কয়েকটি কাব্য

রথীন্দ্রনাথ রায়

জীবনানন্দের কাব্য-জীবনকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। তার অর্থ অবশ্য একথা নয় যে, এর প্রতিটি পর্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মপর্যাপ্ত। নানা জিজ্ঞাসা ও বক্তব্যের বিন্যাসে জীবনানন্দের কবি-চরিত্র একটি অখণ্ড বোধ, যা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও নব-নব চেতনার আলোকে ক্রম-প্রসারণশীল। তাই সংকীর্ণ ও একান্ত খণ্ডিত দৃষ্টি জীবনানন্দের কবি-চরিত্রের ওপর আলোকপাত না করে বিভ্রান্তি ঘটায়। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' নূতন ধরনের চিত্র রচনায় ও পয়ার ছন্দের নূতন বিন্যাসে সমৃদ্ধ। তবুও এ কাব্য জীবনানন্দের জীবন-জিজ্ঞাসার অন্তর্ভুক্ত নয়—তাছাড়া এ প্রথম কাব্যে অপরিণতির চিহ্নও বিদ্যমান। চিত্র সম্প্রসারণ ও নূতন কবিভাষা রচনাতেই 'ঝরা পালক'-এর কবি আত্মরুদ্ধ, যদিও প্রথম কাব্যগ্রন্থের পক্ষে এটুকু অঙ্গীকারের মূল্যও কম নয়। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-ই কবিকে নিঃসংশয়িতভাবে চিনিয়ে দিয়েছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকেই দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। 'ঝরা পালক'-এর গাঢ় বর্ণ এখানে যেন নেই, তার স্থান অধিকার করেছে একটি স্বপ্নাতুর অলস দৃষ্টি ও এক বিশেষ ধরনের প্রকৃতি-চেতনা। তাই চিত্র অপেক্ষাও চিত্রকল্পের ধূসর ক্রমশই কবির উপজীব্য হয়ে উঠেছিল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি মূলত প্রকৃতির—একথা সর্বাংশে সত্য না হলেও অনেকখানি যে সত্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রকৃতির এক নিরাভরণ সহজ আস্বাদন কবির পিপাসাতুর কাঙাল চোখের প্রসাদে ভরে উঠেছে :

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় রৌদ্র আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এক নিটোল মসৃণ জীবনের রূপকথা জীবিত স্বপ্ন-সাধ শিল্পিত হয়েছে—এ এক অভিনব ইন্দ্রিয়-সচেতন স্পর্শ-লোলুপ ও গন্ধতন্ময় অনুভব। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অবসরের গান' কবিতাটির আস্বাদনে কোথায় যেন কীটসীয় আবেদন আছে। কীটসের সুবিখ্যাত Ode on Indolence' কবিতাটিতে এক রসালাস্যের

আনন্দের গান অপূর্ব গুঞ্জরণ। জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে অতি তুচ্ছ জীবনের ওপর মায়াবী আলস্য নতুন বাসনালোকের সৃষ্টি করেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি স্বপ্নের অনিবার্য নিয়তি সম্বন্ধেও সচেতন :

প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই,
ঘৃণা মৃত্যু পাই;
পাই নাকি?

পরিচিত পৃথিবী ছাড়িয়ে তাই কবি সুদূর নির্জনের ছায়ালোকে তাঁর কল্পদৃষ্টি বিস্তৃত করেছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এখনো বক্তব্য তেমন করে আসেনি—কারণ এখনও তা পাণ্ডুলিপি মাত্র। প্রকৃতির অতি সহজ অনুভব পেরিয়ে এ কাব্যে আর এক বিশিষ্ট সুর কবিকে বিষণ্ন করেছে।—জীবনের এক অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাকে উদাস করেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি বক্তব্যের প্রায় কাছাকাছি হন; কিন্তু সুমিত চিন্তার উজ্জ্বল ফলকে তা ধরা দেয় না—

আলো অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;

এই 'বোধ'-ই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শেষ কথা।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরবর্তী কাব্য 'বনলতা সেন' নানা কারণে জীবনানন্দের কবি পুরুষের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। মৃত পৃথিবীর গোধূলি-ধূসর আবেশ-নিবিড় স্মৃতি-রোমন্থন, উপমা ও রূপক প্রয়োগের অজস্রতা সমালোচক ও কাব্যরসিককে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু 'বনলতা সেন' সম্পর্কে এ শ্রেণীর আস্বাদনে কবিবৃত্তির স্বীকৃতি থাকলেও আরো একটি মূল জিনিস অনুক্ত থেকে যায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি তাঁর বক্তব্যের পাণ্ডুলিপি রচনায় প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু এ স্তরে এসে বক্তব্য অনেকটা সুস্পষ্ট হয়েছে—চিত্র-প্রতীকী ব্যঞ্জনা অতিক্রম করে এক বৃহত্তর সংবেদন কবিকে নূতন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনানন্দের কাব্যের যে বর্ণ ও গন্ধ নিয়ে কাব্যরসিকদের এতো মাতামাতি—এ কাব্যেই তার এক অভিনব অভীপ্সার ইঙ্গিত চোখে পড়ে। শব্দ, গন্ধ, বর্ণ সবকিছুকেই ছাড়িয়ে—'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।' কবিতাটিতে এক সুবৃহৎ কাল-চেতনার প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করা যায়—তার ওপর এক উর্ধ্বতন চেতনা শরীরিণী হয়ে উঠেছে। একদিকে সময়-সীমানার বাইরে এক মহত্তর কালচেতনা, অন্যদিকে এক বহমান অবচেতনা জীবনানন্দের কবি-পুরুষকে নূতন রসে দীক্ষা দিয়েছে :

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?

হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল,
হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন?

বনলতা সেনের কবি আরো এক নূতন মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। সুবৃহৎ সময়-চেতনার আলোকে কবি কল্পান্তরের রূপ দেখে নিয়েছেন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের উদয়-বিলয়-পরিণতি কবির কাছে এক-ই অনুভবের সূত্রে গাঁথা :

দেখেছি যা হলো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

'আবহমান' কবিতায় কবির এ যুক্ততর ও প্রশস্ততর দীর্ঘ বহমান নবীন অনুভবের আশ্চর্য সুন্দর রূপ ফুটেছে। চিত্তের এ জাগ্রত স্বপ্ন সীমা-স্বর্গকে ছাড়িয়ে এক দূর বলয়িত আভাসের ছায়া ফেলেছে :

মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে বসে—অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূরে চলে যাবো—চেয়ে দেখি আরো কিছু আছে তার পরে।

'নিসর্গের চেয়েও প্রবীণ'—আর একটি বোধ, যা অবচেতন মনের ছায়া-চিত্রণের সাথে কালাশ্রয়ী, কখনো কখনো ইতিহাসাশ্রয়ী পটভূমিকায় স্বরূপ গ্রহণ করেছে। 'বনলতা সেন' গ্রন্থের চিত্রকল্পতা ও উপমা-নির্ভর রূপ রচনা বহিরঙ্গ মাত্র- আসল কথা এই এ কাব্যেই কবি-পুরুষের যথার্থ দীক্ষা—বক্তব্যের স্থিত-নিষ্ঠ উচ্চারণ।

'মহাপৃথিবী'র কবিকে তাই বিশুদ্ধ প্রকৃতি অথবা ইন্দ্রিয়-কৈবল্যের সূক্ষ্মতাই ধরে রাখতে পারেনি—অবচেতনার গভীরতম স্তরে কবির সন্ধান চলেছে। 'মহাপৃথিবী' কাব্যের এক বৃহৎ অংশই এ 'Cult oPfJ Sub-conscious'-এর আলো-ছায়ায় পরিপূর্ণ। অবচেতনবাদ ইউরোপখণ্ডে প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল-পরিধির মধ্যে চিন্তাজগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এ সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'The artist cannot observe his sub-conscious; he can only, at the bidding of-certain stimuli, allow his unconscious memory to come into action and record its vagaries or reducing himself to an aesthetic planchette, attempt a sort oPfJ automatic writing which will planchette, attempt a sort oPfJ automatic writing which will approximate in a greater or less degree to the working by means oPfJ associstion oPfJ worlds and ideas.' জীবনানন্দ সম্পর্কে এ মন্তব্যের সর্বাংশ না হলেও তাঁর গতিরেখা, প্রমাণ ও সিদ্ধির একটি পরিচয় পাওয়া যাবে। 'মহাপৃথিবী'র কবি অন্তর্মুখী—'A turning away from the outer world oPfJ human memory and desire, specially in its less conscious forms'. তাই কবি স্পষ্টই বলেছেন—

স্বপ্ন তুমি দ্যাখোনি তো পৃথিবীর সব পথ সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক; সন্ধ্যায় নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার—ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো
নিভে গেছে;

সূর্যালোকিত রেখালিম্পন থেকে মগ্ন-চেতনার 'মায়াবী আরশি'তে প্রতিফলিত এক স্বল্পস্ফুট তির্যক-কল্পজগতের অনুধাবন—তাই 'আজো কাঞ্চি বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে।' প্রাণী ও প্রকৃতির চেতনায় কবি অনায়াসে মিশেছেন তার মানবিক অহং সম্পূর্ণ বর্জন করে। তার কারণও ওই এক-ই। অবচেতনার নিগূঢ় লোকে কোথায় এক আদিম বাসনালোক, যেখানে প্রবেশাধিকার পেলে অনায়াসেই ঘাসমাতার শরীরের সুস্বাদ হয়ে ওঠা যায়, পক্ষিণী অনুভবের সম্পূর্ণ অঙ্গীকরণে নিজেকে অদ্বয় করে তোলা যায়। প্রকৃতি, ইতর প্রাণী ও মানব নিগূঢ় এ মৌল চেতনার অধিকারী—সেই মৌল চেতনায় আস্বাদনধন্য হলে পাখি, মাছ বা ঘাস হতে কোনো বাধাই থাকে না। 'বিড়াল' কবিতায় লৌকিক ও অলৌকিক আস্বাদন এক হয়ে উঠেছে, কারণ 'মহাপৃথিবী'র কবি এমন এক বলিষ্ঠ বোধের অধিকারী যেখানে প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃতের বিরোধ অনায়াসে ঘুচে যায়। মগ্ন-চৈতন্যলোক ও দীর্ঘবিসপিত কাল-চেতনার এক স্বল্পবাক সমন্বয় ঘটেছে এ কবিতায়; ''বনলতা সেন'-এ ইতিহাসবোধ এসেছিল, কিন্তু তার স্থান ছিল পটভূমিকায়। ''মহাপৃথিবী'তে কালাশ্রয়ী ইতিহাসচৈতন্য পুরোভাগে দাঁড়িয়েছে। রোমান্স, ইতিহাস, বর্ণতৃষ্ণা সমস্ত কিছুই বৃত্তায়িত হয় এক মগ্নলোকের বাসনা-বিন্দুতে—'তোমার নগ্ন নির্জন হাত'-এ চেতনার এ বিশিষ্টতার জন্যই জীবনানন্দের সমস্ত বোধ এক বিশেষ অনুভবের বিন্দুতে সংহত হতে পারে। জীবনের খণ্ড অনুভবকে বা অভিজ্ঞতাকে এক সূত্রে গাঁথা জীবনানন্দের অনেক কবিতার-ই বিশিষ্ট প্রকৃতি—সুররিয়ালিস্ট প্রতিভার একটি প্রধান সংকেত এখানে। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা 'মহাপৃথিবী'র সর্বাধিক প্রৌঢ় কবিতা। অনুভবের গাঢ়তায় ও জিজ্ঞাসার প্রশ্ন-চঞ্চল আবেদনে কবিতাটি কবি-পুরুষের একটি শ্রেষ্ঠ প্রৌঢ়োক্তি :

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;

বর্তমানের তাৎক্ষণিক কবিকে পরাজিত করেনি—কারণ কবি প্রগাঢ় পিতামহীর তত্ত্ব জানেন—অথচ তত্ত্বসর্বস্ব না হয়ে জীবনবোধের গূঢ়তায় কবিতাকে আবিষ্কার করেন্।

'সাতটি তারার তিমির' আরম্ভ হয়েছে 'মহাপৃথিবী"র কবির বিপন্ন বিস্ময় নিয়েই। কিন্তু এ কাব্যেই আর এক মহতী উত্তরণ লক্ষ্য করা যায়, যা জীবনানন্দের কবি-পুরুষের স্বপ্ন-সাফল্যের সীমান্ত। 'নাবিক' কবিতায় কালানুসারী ভৌগোলিক চিত্রকল্প বহমান সময়-চেতনার বিস্ময়ে প্রাগ্রসর :

হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য করে শুধু?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে
অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চলে যাও—দুপুর বেলায়;

কবি দেখেছেন কালের এক তৃপ্তিহীন অগ্রচারণা। তাই সংকীর্ণ সীমানায় আবদ্ধ আজকের ইতিহাসের কাছে কবি পরাভব স্বীকার করেননি। কারণ তিনি জানেন, মানব পরম্পরাবিধৃত ও 'আনুপূর্ব :

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

অনায়াস রচনা-রীতি দেখেই বোঝা যাবে, কতো গভীর তত্ত্বের কেমন আশ্চর্য সুন্দর অথচ সহজ উপলব্ধি—রসদৃষ্টি দ্বারাই একমাত্র ধরা যায়, পাণ্ডিত্যের এলাকার বাইরে। 'সাতটি তারার তিমির'-এর উত্তরণ কবি নিজেই বলেছেন :

এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয়

'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে সমকালীন সংকেতও দেখা যায়—অতীত মিশর বিদিশা বা ব্যাবিলন নয়—আজকের পৃথিবীও। কুইস্‌লিং, হিটলার কোনোটিই বাদ পড়েনি, শুধু জীবনানন্দের মূল বক্তব্যকে পরিপূর্ণ করতে বিশেষ অর্থে এসেছে। কালক্রান্তির চিহ্ন নির্দেশক মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি রাশিচক্রের কথাও এসেছে। 'মহাপৃথিবী'-র কবি কালাবর্তন অনুভব করেছেন, কিন্তু এ স্তরের কবি নূতন কালান্তরের পথিক। 'মহাপৃথিবী'র কবি কালভাবনায় আচ্ছন্ন, কিন্তু এখানে সেই আচ্ছন্নতাকে কাটিয়ে এক ভাবী পৃথিবীর তিমির হননের গান রচনা করেছেন—আগে ছিলেন তিমিরবিলাসী, এখন তিমিরবিনাশী হওয়ার দুর্বার কামনা জেগেছে :

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।

এ স্তরে এসে জীবনানন্দের কণ্ঠ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপক কল্পনাদৃষ্টির সামনে এ যুগের 'বিশ্বরূপ' উদ্ঘাটিত হয়েছে। এক সৃষ্টিশীল গতির আবেগের সাথে মিশেছে এক বহ্নিময় মানবিক অনুভূতি। শুধু প্রতীকের কবি যে কতোখানি ভ্রমাত্মক, তা

এ স্তরে. কবিতা পড়লে সহজেই বোঝা যাবে। জীবনানন্দ সম্পর্কে এমন কথাও শোনা যায় তাঁর কবিতা নাকি মানবীয় রসবর্জিত: জীবনানন্দের শেষ স্তরের কবিতা পড়লে স্বতঃই মনে হবে, এ শ্রেণীর ধারণা যে-পরিমাণ ভ্রমাত্মক, তদপেক্ষা বেশি.মারাত্মক। 'সময়ের কাছে' কবিতার একাংশ উদ্ধার করলেই এ মন্তব্যের তাৎপর্য বোঝা যাবে। মানবের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ অতীত ও অনাগত ভবিষ্যতের অপ্রতিরোধনীয় জয়যাত্রা কবি দেখেছেন 'গতির গুণ-গান গেয়ে', যেন স্পষ্ট দেখেছেন 'মানবিক রণ'-এর পরে 'মানবিক জাতীয় মিলন।' ইতিহাসগ্রথিত সেই বিশাল মানুষের উচ্চকিত পদধ্বনিতে জীবনানন্দের কাব্য মুখর হয়ে উঠেছে :

> সেইসব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়;
> জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।

জীবনানন্দের কাব্যের গোধূলি-ধূসরতা অতীতাশ্রয়ী রোমাঞ্চলোক পরিত্যাগ করে বর্তমানের মানবিক ইতিহাসের লোকায়ত জগতে প্রবেশ করেছে। সূর্যতামসী কবিতার শেষাংশ রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের কবিতা অথবা 'কালান্তর' প্রবন্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। আজকের সভ্যতা যে-চিতাবহ্নি সৃষ্টি করেছে, তার ভেতর থেকেই নবযুগের বলিষ্ঠ জীবনবাদ ঘোষিত হবে।

'সাতটি তারার তিমির'-এর পরবর্তী কালেও এ সুর লক্ষণীয়। গ্রাম্য সায়াহ্নের স্বপ্ন-মধুর পটভূমিকা পরিবর্তিত হয়েছে—বর্তমান জীবন ও সমকালীন কলকাতার পটভূমিকায় কবি নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করেছেন। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, যুদ্ধ, বঙ্গব্যবচ্ছেদ—প্রভৃতি সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কবির যে-নূতন বোধ জন্ম নিয়েছে, তার মূল্য অসাধারণ। বর্তমান জীবনের মানবিক গ্লানি কবিকে ব্যথিত করেছে। পূর্বতন কাব্যের অশরীরী বেদনার স্থান অধিকার করেছে এক গভীর মানবীয় সহানুভূতি। এ জগৎ চোখে দেখা স্পষ্ট-চেতনার ক্ষতাঙ্কিত জগৎ; অবন্তী বিদিশা নয় :

> বটতলা মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো—আরো ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে
> যারা ফুটপাত ধরে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলেছে
> তাদের আকাশ কোন্ দিকে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কবি নিজেই :

> কিংবা যারা এইসব মৃত্যু রোধ করে এক সাহসী পৃথিবী
> সুবাতাসে সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—
> তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে
> মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়।

জীবনানন্দের শেষ জীবনের কবিতা ভাবী পৃথিবীর, সুন্দরতর পৃথিবীর জিজ্ঞাসায় কাতর হয়ে উঠেছে। 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়'—এ বোধ এ পর্বের জীবনানন্দের কাছে শুধু ইতিহাস-দর্শন নয়, তিমির-বিদারী জীবন-জিজ্ঞাসা। তাই গতি-

দর্শন আজ তাঁর কাছে নূতন অর্থে অর্থময় হয়ে উঠেছে! এ গতিবৃত্ত নির্ভরও আত্মরুদ্ধগতি নয়—এ এক সৃষ্টিশীল জীবন-চেতনা। জীবনানন্দের গতি এখানে প্রায় বের্গস গতির মতোই সৃষ্টিশীল।

শেষ জীবনে কবি মানুষের চির-যাত্রিক রূপটি নিঃসংশয়িতভাবে চিনে নিয়েছেন—'মানুষের পটভূমি হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর।'—উত্তর পঁচিশের অবক্ষয়ী ক্লান্তি থেকে জীবনানন্দ নবীন ক্রান্তির আলোক প্রদেশে যাত্রা করেছিলেন। সংশয় থেকে এ বিশ্বাস-মুগ্ধ উত্তরণ জীবনানন্দের কবি-পুরুষের যথার্থ পৌরুষদ্যোতক স্বীকৃতি। কবি বুঝেছিলেন :

তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে: জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

তাই আলোকজিজ্ঞাসার এ কবি স্বপ্ন দেখছেন, নূতন দর্শন সৃষ্টি করেছেন। ক্লান্ত ধূসর রোমান্টিক মন্থরতা উপমাশ্রয়ী 'চিত্ররূপময়' প্রকৃতি ছেড়ে এক মহাজিজ্ঞাসার তটপ্রান্তে তাঁর কাব্য এসে দাঁড়িয়েছিল—এই মহত্তম পাদপতনে ইতিহাস ও কাল যুগে যুগে সমৃদ্ধ হয়েছে—তাই ইতিহাসেও সংশয়িত হয়ে কবি মানবের আলোক-জিজ্ঞাসা দেখেছেন।

অপ্রেমের থেকে প্রেমে গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়।

জীবনানন্দের কাব্য-ফলশ্রুতি এ মহাজিজ্ঞাসা। অকালে লোকান্তরিত কবির কবি-পুরুষ এ জিজ্ঞাসার-ই উন্মেষ, জাগরণ ও স্থিতপ্রজ্ঞ উপলব্ধির কাহিনী রচনা করেছেন।

জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি

বুদ্ধদেব বসু

বিদ্যালয়ে ইংরেজি কাব্যের পাঠ নিতে গিয়ে যখন শোনা যায় যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির কবি, তখন সহজ-বুদ্ধিতে সংশয় লাগে। প্রকৃতির কবি কোন কবি নন? প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে অন্তত কখনো-কখনো সাড়া না তোলে এমন মন যখন সাধারণের মধ্যেও বিরল, তখন কবি নামের যোগ্য যে-কোনো ব্যক্তির সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে তীব্রভাবেই তা নাড়া দেবে, তাতে সন্দেহ কী। শেক্সপীয়র কি প্রকৃতির কবিও নন? শেলি? কীটস? যদি বলা হয়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ জড়প্রকৃতির মধ্যে এক জীবন্ত ও সর্বব্যাপী সত্তা খুঁজে পেয়েছিলেন, সে-কথা মানবো। কিন্তু সকল কবির কাছেই তো প্রকৃতি জীবন্ত, এবং এ-উপলব্ধি শেলির মতো তীব্র অন্য কোন্ কবিতে, তা জানি না। যদি বলা হয়, ওঅর্ডস্বার্থের প্রকৃতিপ্রেম ছিল তাঁর পক্ষে ধর্মের শামিল, সে-কথা অস্বীকার করবো না; কিন্তু সেই ধর্মের সারতত্ত্ব অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর নির্বাসিত ডিউক খুব সংক্ষেপেই কি বলেননি—হয়তো কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের সুরে—যখন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'Tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything?' এর বেশি ওঅর্ডস্বার্থ কী বলেছেন?

তবে এটা সত্য যে, প্রকৃতি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ওঅর্ডস্বার্থ কবিতা লেখেননি, বা লিখলেও সফল হয়নি। সেজন্যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রকৃতির কবি লেবেল-আঁটা। কবিদের গায়ে লেবেল আঁটা থাকলে ডক্টরেট ডিগ্রিকামীদের সহায়তা হয়, কিন্তু রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার সমস্তটা ক্ষেত্র যেন ওঅর্ডস্বার্থেরই দখলে, এ রকম একটি ধারণা যদি আমাদের মনে জন্মায়, এবং তার ফলে পরবর্তী যুগের যেসব কবিতে প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুন রকমের অনুভূতি ধরা পড়ে, তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগী কি শ্রদ্ধাবান হতে যদি আমরা ভুলে যাই, সেজন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ শিক্ষাই দায়ী। প্রকৃতি সম্বন্ধে ওঅর্ডস্বার্থের মনোভঙ্গি তো একমাত্র নয়, এবং ভিন্ন মনোভঙ্গি আমাদের অনেকের পক্ষেই অধিকতর গ্রাহ্য হতে পারে।

আমাদের কবিদের মধ্যে অবশ্য রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতির কবি হিসেবে প্রধান। এ-কথা বললেও ভুল হয় না যে, তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়-ই প্রকৃতি। যত কবিতা ও গান তিনি লিখেছেন, তার বেশিরভাগ-ই তো সোজাসুজি ঋতু-সংক্রান্ত। তাছাড়া তাঁর 'জীবনদেবতা'র উপলব্ধিও মুখ্যত প্রকৃতির ভেতর দিয়ে; তাঁর মধ্যযুগের কবিতাবলীতে এ-বিষয়ে নিঃসংশয় সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

এক হিসেবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি, একথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু সকল কবিকেই ঐ আখ্যা দেয়া যায় না; কারণ সকলের পক্ষেই প্রকৃতি একমাত্র কিংবা প্রধান বিষয় নয়। অনেক কবির পক্ষে প্রকৃতি মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমিকা; অনেকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিলাস, আবার কারো-কারো পক্ষে আমাদের মনের অবস্থার প্রতিরূপমাত্র। প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব না করেন, এমন কোনো কবি নেই। কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভেতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন, এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি।

আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এ বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়; তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর নবপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পড়ে এ কথাই আমার মনে হলো। অবশ্য এ বইয়ের কবিতাগুলি আমার পক্ষে নতুন নয়। এদের রচনার কাল আজ থেকে এগারো ও সাত বছরের মধ্যে। সেই সময়ে এরা অধুনালুপ্ত কয়েকটি মাসিকপত্রে আত্মপ্রকাশ করে, এবং তখন থেকেই এদের সঙ্গে আমার পরিচয়। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' ১৩৩৪ সালে বেরিয়েছিল, তার রচনাকাল আরো কিছু আগে হবে বোধ করি। সে-বইখানা তখনো কারো বিশেষ নজরে পড়েনি, এখন তো একেবারেই বিস্মৃত। মোহিতলালের 'স্বপ্ন-পসারী'র মতো 'ঝরা পালকে'ও সত্যেন্দ্র দত্তের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। যে-মৌতাতের ঝোঁকে মোহিতলাল লিখতে পেরেছিলেন—

উটপাখি তার ডিমজোড়া কি লুকিয়েছে ঐ বুকে

সেটা জীবনানন্দও এড়াতে পারেননি তখন। 'ঝরা পালক'-এ স্মরণীয় বিশেষ-কিছু হয়তো ছিল না, কিন্তু তার কয়েকটি লাইন আজো দেখছি ভুলতে পারিনি :

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল—
ডালিমফুলের মতো ঠোঁট যার, পাকা আপেলের মতো লাল যার গলা,
চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন,
তারে আমি দেখিয়াছি প্রতি রাত্রে—স্বপ্নে কতদিন।

সত্যেন্দ্র দত্তীয় ঝংকার থেকে এ অনেক দূরে; অতি পুরনো কল্পনা এখানে যেন একটি অপূর্ব রূপ পেয়েছে। তার কারণ ছন্দের নবত্ব, ধ্বনির বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি লাইনে সম্পূর্ণ একটি ছবি পেলুম; এ-ছবির রচনায় যে-কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়েছে, তা এ কবির-ই নিজস্ব সৃষ্টি। বস্তুত, এখানে জীবনানন্দের মৌলিক সৃষ্টি-প্রেরণারই পরিচয় পাওয়া যায়। পড়তে পড়তে মনে হয়, একজন নতুন কবির বুঝি দেখা পেলুম।

এ সৃষ্টি প্রেরণা রুদ্ধ হয়ে থাকলো না; অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেল তার প্রকাশবৈচিত্র্য। সে-সময়ে জীবনানন্দ যে সব কবিতা বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন, তা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম; এবং এখন সেগুলোই একত্র দেখতে পাচ্ছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে। ভালো কবিতার কেমন একটি আদিম অপূর্বতা আছে। মনে হয়। এ যেন সদ্যোজাত অথচ চিরন্তন; এইমাত্র এ মুহূর্তে এর জন্ম হলো, এবং চিরকালের মধ্যে এর

মতো আর-কিছু হবে না। এ কবিতাগুলোয় ছিল সেই সুরের অনন্যতা ও অখণ্ডতা; প্রতিটি রচনার ভিতর দিয়ে এমন একটা স্বর বুকে এসে লাগলো, যে-রকম আর কখনো শুনিনি। একেবারে নতুন সেই স্বর। আর এমন অদ্ভুত যে, চমকে উঠতে হয়।

বছর দশেক পরে সেই কবিতাগুলোই আবার পড়ে সেই রকমই ভালো লাগলো। ইতোমধ্যেই জীবনানন্দের কাব্যপ্রেরণা ঝিমিয়ে পড়েনি, তার প্রমাণ তিনি সম্প্রতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় দিয়েছেন। তাঁর কল্পনা নব-নব রূপের সন্ধানী, তাঁর রচনাভঙ্গি গভীরতর পরিণতির দিকে উন্মুখ। কিন্তু এতদিনেও আমাদের সাহিত্যের 'বাজারে' তাঁর খ্যাতির রোল ওঠেনি। আমাদের সুধী-সমাজও তাঁর কাব্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত বলে মনে হয় না। আধুনিক বাংলা কাব্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনাতেই জীবনানন্দের উপযুক্ত উল্লেখ এ-পর্যন্ত দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব লোকচক্ষু থেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন, এছাড়া এ অন্যায়ের আর-কোনো কারণ আছে কিনা জানি না। কবিতা ছাড়া আর-কিছু তিনি লেখেন না, কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে দেশ-বিদেশে আত্মবটনার আয়োজন তিনি কখনোই করেননি। আমার বিশ্বাস, তাঁর প্রকৃত অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা এখনো যৎসামান্য। তবে এটাও দেখেছি যে, সাম্প্রতিক তরুণ কবিদের ওপর তাঁর প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

বাংলাদেশের পাঠক সাধারণের মধ্যে জীবনানন্দ যদি অজ্ঞাতই থাকেন, সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। তবে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের পর তিনি গুণী-সমাজে স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন, এ-আশা জোর করেই করা যায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পড়ে প্রথমেই মনে হয়, যে এ লেখকের আছে এমন একটি ভঙ্গি, যা বিশেষভাবে তাঁর নিজস্ব। কোথাও-কোথাও সেটা হয়তো মুদ্রাদোষে অবনত হয়েছে (যদিও সেটা খুব কম ক্ষেত্রে), এবং তা নিয়ে ব্যঙ্গ করাও সহজ। কিন্তু যদি আমরা সত্যি কবিত্বশক্তিকে শ্রদ্ধা করি, যদি কবিতা আমাদের পক্ষে বাচালতার বিষয় না-হয়ে গভীর অনুশীলনের বিষয় হয়, তবে একথা আমাদের মানতেই হবে, এ কবি এমন একটি সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন, যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়।

জীবনানন্দ প্রকৃত কবি ও প্রকৃতির কবি। ঠিক প্রেমের কবিতা বলতে যা বোঝায় এ গ্রন্থে তা একটিও নেই। 'নির্জন স্বাক্ষর', '১৩৩৩', 'সহজ', 'কয়েকটি লাইন'—এ-সমস্ত কবিতায় প্রেমের পাত্রী অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই অনেক বড় ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে কবির কল্পনায়। এটা উল্লেখযোগ্য যে জীবনানন্দর রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্টত পড়েনি। উনিশ শতকের ইংরেজি কাব্যস্রোত প্রচুর পান করেছেন তিনি। 'জীবন', 'প্রেম' এ দীর্ঘ কবিতা দু'টিতে শেলী ও কীটস উভয়ের-ই প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, শেলীর চাইতে বরং কীটসের প্রভাব বেশি, আর সেই সঙ্গে সুইনবর্ণ ও প্রিরাফেলাইটদের। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা, সমস্ত প্রভাব ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি। যে-দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হয়ে ওঠে, তুচ্ছকে ঘিরে গড়ে ওঠে মহিমামণ্ডল, সেই দৃষ্টি জীবনানন্দের। অতি ক্ষুদ্র উপাদান নিয়ে

অতি সূক্ষ্ম সংগীতের জাল তিনি এমনভাবে বুনে গেছেন যে, বিশ্লেষণে তা ধরা দিতে চায় না।

বলি আমি এই হৃদয়েরে
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!

ছন্দের বাঁকাচোরা গতিতে, সূক্ষ্ম ধ্বনিতে ও বিরতিতে, পুনরুক্তিতে ও প্রতিধ্বনিতে, মনে হয়, যেন এ কবিতাগুলি আঁকাবাঁকা জলের মতোই ঘুরে-ঘুরে একা-একা কথা বলছে। এদের আবহতে আছে একটি সুদূরতা ও নির্জনতা। আমাদের পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়ে, এ আকাশ আর পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য কোনো আকাশে, অন্য কোনো জগতে এক সম্পূর্ণ রূপকথা তিনি রচনা করেছেন। জীবন ক্ষয়শীল ও পরিবর্তনশীল, মৃত্যুতে সবকিছুরই সমাপ্তি, এ আদিম বেদনা জীবনানন্দের কাব্যের ভিত্তি।

পৃথিবীর বাধা---এই দেহের ব্যাঘাতে,
হৃদয়ের বেদনা জমে; স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই!...
পৃথিবীর দিন আর রাতের আঘাতে
বেদনা পেত না যদি কেউ আর.....
থাকিত না হৃদয়ে জরা.. .
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা' .

তরুণ ইয়েটসকে মনে পড়ে, আর এ কথা অনেক কবির-ই মনের কথা সন্দেহ নেই। স্বপ্নের হাতে ধরা দিতে চান যে সব কবি তাদের প্রত্যেকের-ই স্বপ্ন একটি বিশেষ রূপকথা মূর্তি গ্রহণ করে। প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করছেন।

তার পর,-- একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভরে আছে মাঠে,
পাতার, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে দিকে চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা ঠাণ্ডা কড়কড়!
শসাফুল, দু'-একটা নষ্ট সাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল, শুকনো মাকড়সা
লতায় পাতায়:
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাত পথ চেনা যায়;

দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়, ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে মাঠে, খুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে!

['মাঠের গল্প']

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চলে চাঁদ;
অবসর আছে তার, অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চলে যাবে পশ্চিমের পানে,
এটুকু সময় তাই কেটে যাক রূপ আর কামনার গানে।

এখানে নাহিক' কাজ উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিক' ভাবনা।
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়!
সকল পড়ন্ত রৌদ্র চারদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবাসে।

('অবসরের গান')

কহিল সে,—উত্তর সাগরে
আর নাই কেউ!—
জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ
উঁচুনিচু পাথরের পরে
হাতে হাত ধরে
সেইখানে; কখন জেগেছে তারা—তারপর ঘুমাল কখন।
ফেনার মতন তারা ঠাণ্ডা—সাদা—
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে জড়ায়ে যায় সাগরের জলে!
ঢেউয়ের মতন তারা ঢলে!
সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা,—সাদা—বরফের কুচির মতন!
তাহাদের চোখ মুখ ভিজে,—
ফেনার সেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল,
কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল

চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে।

('পরস্পর')

এসব রচনায় আধো আলোর লীলা, আধো ঘুমের মোহ; এ আবছায়ায়, এ অলসতায় কবির মুক্তি।

জীবনানন্দের কাব্যে দেখা যায় যে চিত্র রচনার অজস্রতা, তার বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য। যত উপমায়, যত ইঙ্গিতে তিনি কল্পনাকে প্রকাশ করেন, সেগুলি ভাবাত্মক নয়, রূপাত্মক; চিন্তাপ্রসূত নয়, অনুভূতিপ্রসূত। আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক'। তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়নির্ভর। তাঁর এ বিশেষত্বই কীটস ও প্রিরাফেলাইটদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর একটি কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন 'চিত্ররূপমাত্র'। জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য সম্বন্ধেই এ আখ্যা প্রযোজ্য। ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার ওপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে, বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শের। তাঁর যে-কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ মন্তব্য করেছিলেন, তা থেকে কয়েকটি ছবি উদ্ধার করছি :

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ
হিজলের জানালার আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ায়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;

('মৃত্যুর আগে')

এ স্তবক দু'টি বিশ্লেষণ করলে জীবনানন্দের সমস্ত কবিত্বলক্ষণ বোঝা যাবে। দৃষ্টি, স্পর্শ ও গন্ধের বিচিত্র ভোজ বসে গেছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম ও শেষ পংক্তির অপ্রকট সলজ্জ সহজ অনুপ্রাস লক্ষ্য করুন, গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠোনে খড়ের চালের স্পষ্ট কালো ছায়ার সামনে চুপ করে দাঁড়ান—অনুভব করুন ঘুমের ঘ্রাণ, ঝিঁঝির গন্ধ, নরম জলের গন্ধ, চালের ধূসর গন্ধ, তরঙ্গের রূপ, প্রান্তরের সবুজ বাতাস।

কোনো শব্দের উল্লেখ নেই—প্রকৃতি এখানে শান্ত, সান্ধ্য, স্বপ্নাচ্ছন্ন, শব্দহীন।

জীবনানন্দের এ ছবিগুলি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; স্পর্শ আর গন্ধ তো আছেই, রসনার স্বাদও একেবারে বাদ পড়েনি। এ তো সত্যি কথা যে, আমাদের সমস্ত অনুভূতি শরীরের ভেতর দিয়েই মনে এসে পৌঁছয়ে, অথচ কবিতায় এ ইন্দ্রিয়স্বাদের অবিমিশ্র প্রকাশ অনেকেই করেন না বা করতে পারেন না। উপরন্তু যদি কেউ করেন, সমালোচকেরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। কীটস যে 'sensuous' মাত্র, 'Sensual' নন, সেটা প্রমাণ করতে অধ্যাপকরা গলদ্‌ঘর্ম। এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার জন্যেই রসেটি সুইনবর্নের লাঞ্ছনা। আমাদের কবিদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সম্বন্ধে জীবনানন্দের চেতনা সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ; তাঁর রচনায় তত্ত্ব নেই, চিন্তাশীলতা নেই, উপদেশ নেই; তা স্বতঃস্ফূর্ত, বিশুদ্ধ ও সহজ, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও জীবন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি; তা নিছক কবিতা ছাড়া আর-কিছুই নয়।

৩.

পরিশেষে কলাকৌশলের দিক থেকে দু'-একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। জীবনানন্দের কান অত্যন্ত সজাগ। ছন্দকে ইচ্ছেমতো বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি নিয়ে গেছেন। যেখানে বাধা পেয়েছে, সেখানে বাধাটাই কবির অভিপ্রেত। এক-ই ছন্দের ছাঁচ বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্ন সুরে বাজে, এ পুরনো কথার একটি নতুন দৃষ্টান্ত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। এ-বইয়ের সবগুলো কবিতাই পয়ার জাতীয় ছন্দে—অধিকাংশ অসমমাত্রার, আইনত যাকে বলতে হবে 'বলাকা'র ছন্দ। অর্থাৎ চেহারাটা 'বলাকা'র ছন্দের, কিন্তু ধ্বনি একেবারেই ভিন্ন। 'বলাকা'র তীব্রতা ও বেগ নেই এখানে; এ-ছন্দ মন্থর, যেন ইচ্ছে করে ভাঙা-ভাঙা, অসমান ও পালিশ-না-করা। এ-ছন্দ থেমে-থেমে, ঘুরে-ঘুরে চলে; ঘুমে-ভরা সুর, স্বপ্নে-ভরা, শিশির-কোমল, যেন ঘুমের মধ্যে গান এসে কানে লাগে, তারপর সমস্ত রাত হানা দেয়। কলাকৌশলের অভাব নেই এ কবিতাগুলিতে, সেগুলোর প্রধান গুণ এই যে, তারা প্রচ্ছন্ন। মিলে, মধ্য-মিলে, অনুপ্রাসে, পুনরুক্তিতে ধ্বনির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য প্রতি পংক্তিতে বেজে উঠেছে; সে যেন অপার্থিব ও পলাতক, স্বপ্নের সুড়ঙ্গে অলস ভাবনায় তার যাওয়া-আসা।

> বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন
> বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই, একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
> উড়ে যায়; কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
> পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চলে যায় যেন কোন মৃত্যুর ওপারে।
>
> ('শকুন')

ধ্বনির দিক থেকে এর চেয়ে ভালো রচনা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই। এ ধ্বনি উচ্চ নয়, কিন্তু গভীর ও প্রতিধ্বনিময়। নামশব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে এতখানি কৃতিত্ব আর কোনো আধুনিক বাঙালি কবির দেখিনি। জীবনানন্দ নাম-শব্দ ব্যবহার করেন মিল্টনের মতো জমকালো ধ্বনি সৃষ্টি করার জন্য নয়, প্রির‍্যাফেলাইটদের মতো ছবি ফোটাতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উজ্জয়িনী মালবিকা প্রভৃতি পুরাযুগের নাম যে-উদ্দেশ্য

সাধন করে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যই জীবনানন্দ সাধন করেছেন বম্বাই, বনলতা সেন প্রভৃতি আধুনিক নাম-শব্দ দিয়ে।

সাগরের অই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের পর
নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।
বাদামি—সোনালি—সাদা ফুটফুটে ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল,—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হয়ে!

('পাখিরা')

ইংরেজি শব্দগুলোকে বাংলার প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে এমনভাবে মেশানো হয়েছে যে, আশ্চর্য বলতে হয়। একটু খোঁচ নেই। এটাও লক্ষণীয় যে, জীবনানন্দের পয়ারে যুক্তবর্ণ কম। যুক্তবর্ণের অভাবে পয়ারের শিথিল ও মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে একটি পংক্তিও নেই যা এলিয়ে পড়েছে। বরং যুক্তবর্ণের স্বল্পতাই কবি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যাতে পয়ারে লেগেছে নতুন সুর।

এ আলোচনা আমি দীর্ঘ করলুম। কেননা, জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি বলে মনে করি, এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ। আমাদের দেশে সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ এখনো অত্যন্ত শিথিল; প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হয় অ-সাহিত্যিক কারণে; আমাদের মূল্যজ্ঞানহীন মূঢ়তাকে মাঝে-মাঝে প্রবলভাবেই নাড়া দেয়া দরকার। আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে ভালোবাসেন (আশা করি তেমন লোকের সংখ্যা দিন-দিনই বাড়ছে), তাঁরা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নিজের গরজেই পড়বেন। কারণ, এ-বইয়ের পাতা খুললে তাঁরা এমন একজনের পরিচয় পাবেন, যিনি প্রকৃতই কবি, এবং প্রকৃত অর্থে নতুন।

'রূপসী বাংলা' ও জীবনানন্দ দাশ

মঞ্জুভাষ মিত্র

প্রকৃতির কাছে এসে, গাছপালা-প্রান্তর-মাঠ-খেতের কাছে এসে মানুষের মন শান্তি ও মুক্তি পায়, পায় এক অদ্ভুত স্বাধীনতার আনন্দ। এ স্বাধীনতার অর্থ, আত্মের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার অধিকার ও নির্জনতার মধ্যে প্রাণের অমেয় বিচরণের সুযোগ খুঁজে নেয়া; তখন কোলাহলময় মানুষের পৃথিবী, মফস্বল শহর ও বড় শহরের বিরক্তি, আতঙ্ক, মনোযোগ নষ্ট করে দেয়ার মতো ক্রুরতার ক্ষমতা ও অবাঞ্ছিতের ভিড় সবকিছু দূরে সরে যায়। এজন্যেই ইংরেজি সাহিত্যে ও বর্ণনায়, ভূমিছবি ও বন্য উদ্যানের স্তবগানের স্বাধীনতার প্রতিমা এতো বেশি আদৃত হয়েছে। আবহমানের অনেক মন্দির ও মিথ, আদিম অবচেতনার অনেক রক্ততরঙ্গ যেন সেখানে অস্থি-মাংস, লাবণ্য ও রক্তিমাভা সঞ্চার করে চলে গিয়েছে। কবি যখন ভূমিদেবীর চিত্রকল্পের, তার মহাসবুজ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের বর্ণনায় আবেগময় হয়ে ওঠেন, তখন তিনি মূলত তাঁর অন্তর্লীন ভাবনা ও বিশেষ মেজাজকেই প্রতিফলিত করেন; প্রকৃতি হয়ে ওঠে এ কাজের উপায়চিহ্ন—'A means of expressing inward feeling and mood' (The Genius of the Place : Edited by Jon Dixon Hunt and Peter Wills)। জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' নামক কবিতার বইটিতে ঠিক এ ব্যাপার-ই ঘটেছে। কবির অন্তর্লীন জীবন-অস্তিত্বের ভাব-প্রবাহ এবং অদ্ভুত নরম সংবেদনশীল মানস তাৎক্ষণিক অথচ প্রায় চিরস্থায়ী রেখাচিত্র অথবা রং-ছাপের নিটোল কঠিন মধুর মগ্নতা চতুর্দশপদী কবিতাগুলিকে স্ফুট থেকে স্ফুটতর করে তুলেছে।

মানুষের ইতিহাসে যাঁরা অমর কবি, সেই ভার্জিল, মিল্টন, স্পেন্সার সকলেই শান্তরসাম্পদা প্রকৃতিকে তাঁদের কবিতায় মাঝে মধ্যেই স্মরণ করেছেন। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে, আদম-ইভের নন্দনকানন বাসের চিত্র এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই স্মরণীয়।

Shade over shade, a woodie theatre
of Stateliest view....................................

And higher than that Wall a circling row
Of goodliest trees loaden with fairest Fruit,
Bloossoms and Fruits at once of golden hue

Appeared, with gay enameld colours mixt.

....

...................................Thus was this place

A happy rural seat of various view;

এক অপূর্ব চিত্ররূপময় বনানীপ্রান্তর, ফুলেফলে ভরা গাছপালা, বিচিত্র গ্রাম্য দৃশ্যাবলীর সুখী অধিষ্ঠান এখানে; আদম ও ইভ এখানেই তাদের যুগলপ্রহর যাপন করছে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভালোবাসা ও বিষাদ, অবসাদ ও অলসতা সম্বন্ধে কবিরা অবহিত ছিলেন। রূপসী বাংলার কবিতাগুলির শ্লথ এলায়িত বিন্যাসে এ সত্যি কথাই প্রকাশিত। কোনো ধ্রুপদী কবির মতো উদাত্ত গম্ভীর স্পষ্ট প্রোজ্জ্বল প্রকৃতি বর্ণনায় নয়; বরং একজন বিংশ শতকীয় কবির মতোই হার্দ্য, প্রায় অনুচ্চারিত, ম্লান আলোকিত উচ্চারণেই বঙ্গজ কবি লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয়েছেন।

'রূপসী বাংলা'র রচনাকাল ও সমকালীন ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কিছু প্রয়োজন আছে। সিগনেট প্রেস থেকে যখন 'রূপসী বাংলা' প্রকাশিত হয়, তখন তার ৩১ জুলাই, ১৯৫৭ সালে লেখা ভূমিকায় কবির ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ লিখেছিলেন, 'এ কাব্যগ্রন্থে যে কবিতাগুলি সঙ্কলিত হলো, তার সবগুলিই কবির জীবিতকালে অপ্রকাশিত ছিল; তাঁর মৃত্যুর পর কোনো কোনো কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।'

কবিতাগুলি প্রথমবারে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনি পাণ্ডুলিপি বন্ধ অবস্থায় রক্ষিত ছিল; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত। পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এসব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি পর্যায়ের শেষদিকের ফসল।' স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ধূসর পাণ্ডুলিপির কবিতাগুলির সঙ্গে 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলীর ভাবনার দিক থেকে একটা মেলবন্ধন আছে। সনেটের সংহত আঙ্গিকের কারণে ভাব এখানে যেন আরো সূচিতীব্র হয়ে উঠেছে, তা যেন সহজেই অনুভূতিশীলের হৃদয়ের আলোক কণিকাগুলিকে উস্‌কে দিতে পারে। কবি সজল কোমল পূর্ববাংলার চিত্রকল্প ও সঙ্কেত দিয়ে প্রেমের বেদনার ও স্বপ্নের ইচ্ছা পূরণের একটি গোপন সবুজ কুঞ্জ রচনা করেছেন। সেখানে সবুজ ভেতরে ভেতরে দীর্ঘকালের তাপপ্রবাহে রক্তিমাভা ধারণ করেছে—লেগেছে তার অন্তর্বলয়ে ধূসরতার অমোঘ ছাপ। শেষ অবধি কবি এক মন্ত্রপূত জগতের সৌন্দর্য পুরোহিত ও একমাত্র অধিবাসী হয়ে উঠেছেন। এ জগতে যে প্রবেশ করতে স্পৃহা করবে, তাকে অবশ্যই সমভিপ্রায়ী ও প্রকৃতির প্রতি সপ্রেম আসক্তিতে উদ্দীপ্ত হতে হবে।

কালক্রমে বনলতা সেনের পরে যে কাব্য পাঠকের কাছে সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হয়ে উঠেছিল, তা সম্ভবত 'রূপসী বাংলা'। 'যতদূর জানা যায়, আধুনিক পাঠকের কাছে 'রূপসী বাংলা'র যশ বনলতা সেনের সিদ্ধিকেও অচিরে অতিক্রম করে গিয়েছিল।...যশের মূল কারণ দেশাত্মগত, মহাপৃথিবী এমন কি বহির্বিশ্বের দুর্গম্য জটিল কবিতার বদলে এ কেবল-ই বাংলা-বাঙালির নিভৃত গুঞ্জনের শান্ত বিষণ্ন স্বগত

উচ্চারণ' (জীবনানন্দ দাশ, বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)। জীবনানন্দ-গবেষকের এ অভিমত সম্বন্ধে খুব একটা দ্বিমত হওয়া যায় না।

বাংলাদেশ থেকে ছাপানো 'প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাপত্র/জীবনানন্দ দাশ' বইয়ে সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দও একটি-দুটি কথায় 'রূপসী বাংলা'র বৈশিষ্ট্য নির্ভুলভাবে তুলে ধরেছেন। 'রূপসী বাংলার কবিতার পর কবিতায় বাংলাদেশের রূপ-প্রকৃতির বন্দনা এমনভাবে করা হয়েছে, আধুনিককালে যা হয়নি আর' অথবা 'রূপসী বাংলার ক্লান্ত ক্লান্তিহীন সনেটপুঞ্জের মধ্যে পূর্ববাংলার লুপ্ত রূপের জন্যে দীর্ঘশ্বাস অবিরাম শ্বসিত। আতীব্র দেশপ্রেমের এ অনন্যসাধারণ কবিতাগুচ্ছের ছত্রে ছত্রে রূপের জন্য বেদনা ও বাসনা রূপকথার মতো চিরন্তন রেখামালায় উৎকীর্ণ—' এবং বাক্যগুলি অবশ্যই যথার্থ।

জীবনানন্দ দাশ বিয়ে করেন ১৯৩০ সালে। তাঁর ও লাবণ্যের জীবন ছায়াপাত করে গেছে ১৯৩৩-এর 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ'-র মতো কোনো কোনো গল্পে। জীবনানন্দের প্রকৃতিপ্রিয়তা এবং গ্রামবাংলার এক সুন্দর আবহ এসব গল্পে ফুটে উঠেছে। আরো পরে তিনি লিখেছিলেন 'সুতীর্থ'-র মতো উপন্যাস। তাঁর একটা মূল স্তর সরলতার গ্রাম ও অভিজ্ঞতার শহরের নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব ও সেই দ্বন্দ্ব থেকে উঠে আসা এক অসাধারণ জীবন-দর্শন এবং এ সুরটি 'সুতীর্থ'-এর মতো গদ্যকর্মে ও বনলতা সেনের মতো কাব্যে বেশ ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে 'রূপসী বাংলা' কবির প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় বহন করে বাঙালি মানসে স্বাতী নক্ষত্রের মতো স্নিগ্ধ আলো বিকিরণ করছে। ১৯৩০-এর গোড়ার দিকে তিনি যে একগুচ্ছ সনেট লিখেছিলেন—পেত্রার্কীয় আঙ্গিকে, তাদের অষ্টক ও ষটকে বিভাজন করেছিলেন—একথা বহুদিন অজানা ছিল। কবিতাগুলি পরপর খুব দ্রুত রচিত হয়েছিল, এমনকি কবি তাদের পরিমার্জনাও করেননি এবং তারা যেন এক মৃত্যু-বেদনায় আক্রান্ত হয়ে লেখা—বিষাদ ও ভীতি, ভালোবাসা ও অকাল অপসরণের আশঙ্কায় ভারাতুর বোধ এ কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে দুর্লভ ব্যঞ্জনা বিস্তার করেছে। এ বেদনার বিলাসকে, ভালোবাসা ও মৃত্যুর দ্রুত ও অবিরল পরস্পর স্থান পরিবর্তনকে 'Romantic Agony' বলে চিহ্নিত করতে পারি। প্রায় ষাটটি সনেটে ছিল বাংলার—কবি যেখানে বাস করতেন তার-ই পারিপার্শ্ব প্রকৃতির নিখুঁত রূপচিত্র, অধিকন্তু ভাব ও নির্মিতিতে ছিল এক নতুন কবিতার ভঙ্গিমা, যাকে সম্পূর্ণভাবে বিংশ শতকীয় কবিতার মূল বৈশিষ্ট্যের অনুগত বলা যায়। বুদ্ধির দিক থেকে নয়, অনুভূতির দিক থেকেই কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ক্লিনটন বি সিলি যথার্থই লিখেছেন—'To write some sixty sonnets enlogizing Bengal presupposes intense emotional involvement with one's environment. And Jibanananda's sonnets are not intellectual constructs, no matter what the outward form might suggest. Visceral, sensuous statements, they speak of a romantic's childlike heart reexperiencing love. If overheard as he talked to himself in such exuberant outbursts, the poet might have burmed with

embarassment, for these, comments are almost too personal. Through such private exercises, Jibanananda relieves Bengal to the fullest, an animal vegetable mineral rural Bengal, not the human society of cosmopolitan Bengal.' (A Poet Apart : Clinton B. Seely). ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা প্রকৃতি-সুন্দরীর রূপের আরতি এখানে, এক শিশুর হৃদয় নিয়ে যৌবনের প্রখর সময়ে এবার ভুলে যাওয়া ভালোবাসাকে নতুন করে অনুভব, গুনগুন গুঞ্জন ও স্তবগান বা শুধু কানে কানেই বলা যায়, অত্যন্ত ব্যক্তিগতের এ গীতি-কবিতামালা বাংলার চারুসুষমামণ্ডিত ভেষজ প্রকৃতিকেই উন্মোচন করে দেখিয়েছে, নাগরিক বাংলার মানব-সমাজ সেখানে অনুপস্থিত'। অধ্যাপক সিলি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে জীবনানন্দের যে সনেটটি ইংরেজি অনুবাদে পরিবেশন করেছেন, এখানে তার মূল রূপটি আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করছি—

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সবচেয়ে সুন্দর করুণ
সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে, সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা—ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;
সেখানে লেবুর শাখা অন্ধকারে নুয়ে থাকে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের পর
শঙ্খমালা নাম তার; এ বিশাল পৃথিবীর কোন নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো—বিশালাক্ষী দিয়েছিলো বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

জন্মমাটির প্রতি ভালোবাসার এক মহৎ সঙ্গীত এ কবিতায় উচ্ছ্বসিত। মধুকূপী ঘাস, কাঁঠাল-অশ্বত্থ প্রভৃতি নাটা-পানের বন-ধান-লেবুর শাখা-ঘাস এনেছে শ্যামলী বাংলার অনুষঙ্গ; শঙ্খচিল-লক্ষ্মীপেঁচা-সুদর্শন নামক পতঙ্গ এনেছে প্রাণী-পতঙ্গের জীবলীলার ভেষজ-সংবাদ; কর্ণফুলী-ধলেশ্বরী-পদ্মা-জলঙ্গী নদীস্তনী স্থানভূমির প্রতিমাসমূহের দিকে ইঙ্গিত করছে; বরুণ-বারুণী-শঙ্খমালা-বিশালাক্ষী প্রভৃতি নামমালায় মর্মরিত হচ্ছে বাংলার মিথ বা পুরাণকল্প এবং লৌকিক গল্পগাথার অন্তঃসার। মাত্র চৌদ্দটি পংক্তিতে সৌন্দর্যের এই ঘনীভূত শোভাযাত্রা পাঠককে সত্যিই বিস্মিত করে দেয়। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এ এক কবি যুগের অর্থনৈতিক সামাজিক-বৈজ্ঞানিক-রাজনৈতিক আবহ সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে, ইংরেজি সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমা করে, কলকাতা দিল্লি প্রভৃতি স্থানে অধ্যাপনাসূত্রে নগর-জীবনকে

আগাপাশতলা অবলোকন করে তবুও তার মূল শিকড়ের প্রতি ভালোবাসায় অবিচল, ভেষজপ্রকৃতির তথা মৃত্তিকাস্বরূপিণীর রূপধ্যানে আত্মস্থ—একথা সত্যিই ভাববার মতো। 'রূপসী বাংলা'য় আবহমানের বাঙালির আদি ধাতু বা মানসিকতাই যে প্রতিফলিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

'রূপসী বাংলা'কে প্রকৃতির কবিতা হিসেবে, স্বদেশপ্রেমের কবিতা হিসেবে, মিথ ও সংকেতের কবিতা, ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা, অবক্ষয়ী অসুস্থতা ও Morbidity-র কবিতা, মৃত্যু ও অপসরণের কবিতা, স্মৃতির কবিতা হিসেবে পড়া যায়। প্রতিটি কবিতায় রয়েছে বহুস্তর অর্থের আভাস, বহুকৌণিক ভাবনার দ্যুতি বিচ্ছুরণ। একে একে প্রসঙ্গগুলি নিয়ে আলোচনা করছি।

রূপসী বাংলার সনেটপুঞ্জে আভাসিত হয়েছে প্রকৃতিপ্রেম—এ কথাটি সর্ববাদীসম্মত সত্য। তবু প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ, প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কথাগুলি এ তাবৎ যত অনায়াসে উচ্চারিত হয়েছে, প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ কথাটি বোধ হয় ততো অনায়াসে উচ্চারণ করা যায় না। আসলে এ নয় এক উনিশ শতকীয় রোমান্টিকের উচ্ছলিত প্রকৃতিবন্দনা, এ এক মননশীলতার রূপে আক্রান্ত প্রশ্নমনস্ক বিংশ শতকীয় বুদ্ধিজীবীর প্রকৃতির ভেতরে প্রবেশ করে সঙ্গ-নিঃসঙ্গতার অদ্ভুত প্রকরণগুলি ওইখানে আবিষ্কার করে নেয়ার প্রবণতা। এজন্যই রূপসী বাংলা বই করার সময় বিজ্ঞান—বিশ্বযুদ্ধ—ক্রমাগত নগরায়ন—কবিশিল্পীর আত্মের গভীরে অবতরণ—অবচেতনার অদ্ভুত ধূসর আলোতে নিজেকে ক্রমাগত চিনে নেয়ার প্রবণতা ইত্যাদি। বিষয়গুলি সব সময়-ই মনের ভেতর নড়াচড়া করে এবং এভাবেই পাঠকের মানসে এক অপূর্ব Contrast বা বৈপরীত্য, Tension বা চাপের সৃষ্টি হয়, যা কবিতার আস্বাদনকে গভীর থেকে গভীরতর করে তোলে। এখন যখন বিংশ শতক শেষ হয়ে একুশ শতক শুরু হতে যাচ্ছে, ইন্টারনেট-সেলুলার ফোন-মার্সেডিজ বেঞ্জ-বিদেশ ভ্রমণ—কলকাতার মতো বড় বড় শহরের ফ্ল্যাটবাড়ি-ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতি প্রায় ধ্রুবসত্যের মতো স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে উঠছে, তখনো বহু কবিতাপ্রেমিক ও ভাবুকের মনে প্রকৃতির জন্য কিছু স্পর্শকাতরতা রয়ে গেছে। এখানেই 'রূপসী বাংলা'র সমাদৃত হওয়ার কারণ—দিনে দিনে এ কবিতার বইটি আরো বেশি মায়াঘন হয়ে উঠছে।

এ প্রকৃতিরূপের বাতায়নটি আরো একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। উৎসবতী প্রকৃতির সৌন্দর্যস্পন্দন অজস্র চিত্রকল্পে-বিবরণে ধরা পড়ছে, ভেষজ পৃথিবীর শুশ্রূষাবতী শ্যামচ্ছায়া প্রায় সব কবিতার-ই অঙ্গে অঙ্গে ভাবতরঙ্গ তুলছে। কাঁঠালপাতা ভোরের বাতাসে ঝরে যাচ্ছে, খয়েরি ডানা শালিকের হলুদ ঠ্যাং ঘাসের বুকে নেচে চলেছে, খইরঙা হাঁসটিকে সন্ধ্যার পুকুরের পাশ থেকে নিয়ে যায় মেয়েলি করুণ হাত (তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও) ডুমুরের ছাতার মতো বড় পাতার নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েলপাখি আর জাম কাঁঠাল হিজলের পল্লবের স্তূপ চারদিকে, ছায়ামাখা ফণিমনসা ঝোপও শটিবন (বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি), বটের পশমের মতো লাল ফল নির্জন ঘাসে ঝরছে, আকন্দ বাসকলতা কলমি ও পাটের আবেদন চারদিকে (একদিন জলসিঁড়ি

নদীটির পারে); নরম ধানের গন্ধ, কলমির ঘ্রাণ, হাঁসের পালক শরবন পুকুরের জলে চাঁদা-সরপুঁটিদের ঘ্রাণ (আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে); ঘাসের বুকে কবি শুয়ে আছেন, এ ঘাসে সোঁদা ধুলো, এ ঘাসে ভেরেণ্ডাফুলের বুক থেকে নীল ভ্রমর ছুটে আসে, করবীর ফুলছেঁড়া বোঁটা থেকে দুধ ঝরে (জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে); পাড়াগাঁয় সন্ধ্যায় তালবনে দাঁড়কাক উড়ে যায় মুখে খড় নিয়ে, সকালে তেঁতুলের বনে নিমপাখি উড়ে আসে, বঁইচি বনে জোনাকির রূপ হৃদয়ে কাতরতা জাগায়, কদমের ডালে লক্ষ্মীপেঁচা গান গায় নিশুত জ্যোৎস্না রাতে (পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোন্‌খানে); হলুদ বোঁটা শেফালিরা নরম শরতে ঘাসের ওপর ঝরে পড়ে, শালিক খঞ্জনা উড়ে যায় (ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন); বাসকের গন্ধ, আনারস ফুলে ভোমরা ওড়ে, গুবরে পোকার ক্ষীণ গুমরানি বাতাসে ভাসে (যখন মৃত্যুর মুখে শুয়ে রব), চড়াই পাখি কাঁঠালীচাঁপার নীড়ে ঠোঁট গুঁজে বসে থাকে, ঝরে পড়ে হলুদ খয়েরি পাতা উঠোনে, সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ, শ্যাওলায় শামুক গুগলি পড়ে আছে, মাঠ ছেয়ে গেছে লালশাকে, বুনো চালতার গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসা যায় (যদি আমি ঝরে যাই একদিন); মাদারের ডুমুরের সোঁদা গন্ধ, মধুকূপী ঘাস, কাঁঠাল শাখার থেকে নেমে এসে পেঁচা ঘাসে পাখনা ডলছে, কিশোরীর আঁচলে নাটাফল, দুপুরে ঘাসের বুকে সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু পড়ে আছে (কোথাও চলিয়া যাব একদিন); শশালতা ছেড়ে উড়ে গেছে মৌমাছি, মরা প্রজাপতির পাখার নরম রেণু ঘাসে ফেলে পিঁপড়েরা চলে গেছে, আমগাছে শালিকে শালিকে ঝুটোপুটি, বউ কথা কও ডাক থামিয়েছে (ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ দুপুর); অবিরল শুধু বিরসারি ফলসা ক্ষীরুই গাছ, সরষে খেত চিনি চাঁপা গাছ হৃদয়ে আশ্বাস ও সংবেদনা জানায় (কখন সোনার রোদ নিভে গেছে); নীলাভ আকাশ জুড়ে সজনের ফুল, কাঁঠাল জামের বুকে রোদ তার চুল ঝাড়ে (এখানে আকাশ নীল); মনে হয় কবি যেন ঘাসের বুকের থেকে তাঁর শরীর পেয়েছেন (ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি); এ পৃথিবীতে সবাই যখন কাজ করছে, তখন কবির শুধু রয়েছে মুক্ত সময় এলানো ছড়ানো ছুটির বাসর, তিনি রাঙারোদমধুর কার্তিকের মাঠে অনির্দেশ্য ঘুরে বেড়িয়েছেন কত, দেখেছেন কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে হলুদ করবী ফুল, নদীর গোলাপি ঢেউ কুয়াশায় কথা বলে কান পেতে শুনেছেন (এই পৃথিবীতে আমি);—ভেষজ প্রকৃতির এই যে বিকীর্ণ ছবি জীবনানন্দ উপহার দিয়েছেন, তার রূপ চোখ মেলে দেখা যায়, কান পেতে শোনা যায়, তার ঘ্রাণ টেনে নেয়া যায় নাসারন্ধ্রে, জিহ্বায় ভরে নেয়া যায় তার মধুরসের আস্বাদ, দু'হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় ওই রূপরাশিকে, বুকের ভেতর আকর্ষণ করে নেয়া যায় তার স্পর্শের রহস্যসংবাদকে। সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকৃতির রূপ উপভোগের এমন কবি, সম্পূর্ণ নতুন চোখে দেখা গ্রাম্যপ্রকৃতির রূপকে নতুন ভাষায় শব্দমালায় গেঁথে তোলার ক্ষমতায়, আঙ্গিকের নির্বাচনের অমোঘতায় 'রূপসী বাংলা'র রূপকারের মতো আর কাউকে সাহিত্যজগতে খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুরূহ।

'রূপসী বাংলা'য় প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে, নারী হয়ে উঠেছে, এক দিব্যনারী হয়ে উঠেছে—একথা বার বার বোঝা যায়। প্রকৃতির রূপের সঙ্গে আরাধিত নারীর রূপ

মিলেমিশে গেছে, পরস্পর অবিরাম জায়গা বদল করেছে। বক্তব্যের সমর্থনে কাব্যামোদীদের কণ্ঠে কণ্ঠে ফেরে এমন একটি প্রিয় কবিতা থেকে মূলত Octave বা প্রথম আট লাইন উদ্ধৃত করছি।

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই এই ঘাসে
বসে থাকি; কামরাঙা লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে—আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে
আমার চোখের পরে আমার মুখের পরে চুল তাব ভাসে
পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দেখে নিকো—দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে পৃথিবীর কোনো পথে।

প্রকৃতি যে মানসী হয়ে উঠছে, মানবী হয়ে উঠছে, সহজেই বোঝা যায়। কল্পনাশক্তি দিয়ে প্রকৃতিকে কীভাবে জীবন্ত করে তুলতে হয়, কোন্ মন্ত্রে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তা শিখিয়েছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো আদি রোমান্টিকেরা। পথের ধারে বনফুল লেকভূমির কবির চোখে জল আনতো, মনের ভেতর তিনি অনুভব করতেন পূর্ণের পদপাত। কিটস তাঁর Ode to autumn-এ দেখিয়েছেন, কীভাবে শারদা প্রকৃতির মধুকোষ ঋতুর আনুকূল্যে ভরে ওঠে, ব্যথায় টনটন করে ওঠে। উচ্ছ্বসিত আবেগী বিহারীলাল চক্রবর্তী উনিশ শতকীয় বঙ্গে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন একটি খুব ব্যক্তিগত সংবাদ ও আশ্চর্য আবিষ্কারপ্রক্রিয়া 'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণীসনে/যাহার লাবণ্যচ্ছটা মোহিত করেছে মনে।' এ সবই ঘটেছিল রোমান্টিক কবিতার শিল্পতত্ত্ব মেনে; অন্যদিকে জীবনানন্দ দাশের মতো একজন কবির হাতে ছিল আধুনিক কবিতার শিল্পতত্ত্ব—চিরন্তন প্রকৃতিকেই নতুনভাবে দেখা নতুনভাবে নির্মাণের তাগিদ এখানে স্পষ্ট। ভাষা দিয়ে, বোধ দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, আঙ্গিক দিয়ে সেই প্রেরণার গীতিগাথাই 'রূপসী বাংলা'র সনেটপুঞ্জে রচিত হয়েছে।

বিগত একশ বছরে কবিতায় প্রকৃতি কোন স্থান অধিকার করেছে এখানে সে সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি-দুটি কথা বলা যেতে পারে। টমাস হার্ডির উপন্যাসে ছিল প্যাস্টোরাল পট—ভেষজ পৃথিবীর শ্যামশ্রী লাবণ্যের বিলীয়মান মুখশ্রীর জন্য কিছু বিলাপ ও আসক্তি, তার অনুরণন এ লেখকের কিছু কিছু কবিতাতেও রয়েছে। টি. এস. এলিয়টের কবিতায় প্রকৃতিচেতনা নয়, নগরচেতনাই মুখ্য—তবুও ফোর কোয়াট্রেটস-এ কোনো কোনো খণ্ড কবিতায় কিছু নিসর্গ-সংসর্গও বিক্ষিপ্তভাবে চোখে পড়ে। এ সময়ের কোনো ফরাসি কবিকেই নিছক প্রকৃতিচেতনার কবি বলে আলাদাভাবে বেছে নেয়া যায় না। পোল ভ্যালেরির Narcisse parle 'নার্সিসাস বলদে', Au platane 'প্লেন গাছের প্রতি', He Cimetiere marin 'সাগরতীরে সমাধি' কবিতায় কিছু নিসর্গ অনুষঙ্গ আছে। হে বিশাল প্লেন বৃক্ষ তুমি আনত হও এবং নিজেকে নগ্ন শুভ্ররূপে নিবেদন কর অথবা আমি পবিত্র ছায়ায় উদ্ভিন্ন রূপালি ঘাসদের কথাবার্তা শুনতে পাই—এমন কথা এ

কবি বলেছেন। কিন্তু তিনি খুব বেশি মস্তিষ্কনির্ভর কবি। (দ্রষ্টব্য The Penguin Book of French Verse)। জার্মান কবিতায় রাইনের মারিয়া রিলকে বা গটফ্রিড বেনের মতো কবিরা ভিন্ন ধরনের কবিতা লিখেছেন—এমন কোনো কবিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না, যিনি প্রকৃতিকে ভালোবাসবেন প্রতিজ্ঞা করে কামনাজর্জর চিত্তে দিন ও রাত উদ্‌যাপন করেছেন। ইতস্তত কিছু প্রকৃতিছবি ও প্রকৃতিপ্রেমের প্রেরণা কোনো কোনো কবির লেখনীতে অবশ্য এখানে-ওখানে ফুটে উঠেছে। যেমন আলফ্রেড লিশস্টেনস্টাইন বলে একজন জার্মান কবি 'গ্রীষ্মের বালকটির প্রত্যাবর্তন' বলে একটি স্বল্পায়তন কবিতায় লিখছেন—'আমি যখন ছোট ছিলাম পৃথিবী ছিল একটা ছোট্ট জলাশয়ের মতো...চারদিকে ছিল সবুজ সবুজ প্রান্তর। মধুর ছিল এ সুদূরের স্বপ্ন দেখা। শুধু বাতাস আর হাওয়া, পাখির ডাক আর রূপকথা। দূরে বিশাল লৌহ সরীসৃপের হুইসেল শোনা যায়।' (পাঠক এখানে বুঝতে পারবেন, লৌহ সরীসৃপ অবশ্যই রেলগাড়ি)। হাইনৎজ লিওনটেক বলে আর এক অনামা কবি Baume বা 'বৃক্ষসমূহ' বলে একটা কবিতা লিখেছেন—'তুমি...আঁধার পৃথিবীতে শান্তভাবে সংসক্ত।...সরলভাবে সুন্দর এবং সবসময়েই নতুন অর্থযুক্ত।' (দ্রষ্টব্য German Poetry 1910-1975; Ed, by Michael Hamburgher)। স্প্যানিশ কবিদের মধ্যে য়ুয়ান রামোন হিমেনেথ, ইতালীয় কবিদের মধ্যে সালভাতোর কোয়াসিমোদো এবং রাশিয়ান কবিদের মধ্যে বোরিস পাস্তেরনাক প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা বা বিষাদ জেগে ওঠে, তা কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন। বিংশ শতকে বা বিগত একশ' বছরে জীবনানন্দ দাশ ছাড়া এমন কোনো দ্বিতীয় বাঙালি কবি চোখে পড়ে না, যিনি প্রকৃতিকেই জীবনসর্বস্ব মনে করে এবং তাকে আঁকড়ে ধরে তীব্র, অতলান্ত ও একসুরা 'রূপসী বাংলা'র মতো কোনো কাব্য রচনা করেছেন। একজন মাত্র বাঙালি লেখকের দেখা পেয়েছি, যিনি প্রকৃতিকে জীবনসর্বস্ব করে তুলতে পেরেছিলেন। তিনি হচ্ছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি নন—ঔপন্যাসিক। জীবনানন্দের মতোই তিনিও প্রকৃতির ধ্যানে একেবারে বুঁদ হয়ে যেতে পারতেন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে এঁরা যা যা দেখেছেন ও ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তা পৌনঃপুনিকভাবে পাঠ করলে আন্তরিকভাবে বলা যায়। এঁদের সান্নিধ্যে এলে রক্তের ভেতর রিমঝিম নেশা ধরে এবং জাগর চেতনায় ও স্মৃতিধূসর অবচেতনায় আদি জননী ভেষজ-পৃথিবীর ভাবানুষঙ্গ ভীষণভাবে জেগে ওঠে। এরকম অনুভূতি আর জাগে মাত্র একটি লেখা পড়লে, তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী'। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে অনেক গান-কবিতা লিখেছেন। 'আজ সকালে কোকিল ডানে শুনে মনে 'লাগে/বাংলাদেশে ছিলেম যেন তিনশো বছর আগে' (খেয়া)। এমন কবিতার আবেদন যত না স্থানিক, তার চেয়ে বেশি সর্বজনীন—মনে হয় পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতে বসেই কবি যেন এই কথাগুলো লিখতে পারতেন। কিন্তু জীবনানন্দ পূর্ববাংলার বরিশালের বাইরে থেকে 'রূপসী বাংলা' কবিতাগুলির মতো কোনোকিছু লিখতে পারতেন না, অবশ্যই বলা যেতে পারে—সবুজ সুন্দর কিন্তু সভ্যতার সংজ্ঞা ও নিরিখে ওই আঁধার কোটরে বসবাস তাঁর পক্ষে ভীষণভাবে জরুরি ছিল ও ফলপ্রসূ হয়েছিল জীবনের ওই পর্বে। 'রূপসী বাংলা'র

স্থানিক আবেদন এতো বেশি যে, তার মধ্যে বিশ্বজনীন দ্যুতি আবিষ্কার প্রায় অসম্ভব এবং এটাই তার প্রধান গুণ।

'রূপসী বাংলা'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এখানে কবিতার থেকে কবিতায় বহু গাছের নাম আছে, যা উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং বহু পাখি-পতঙ্গের নাম আছে, যা জীববিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

যখন চড়াই পাখি কাঁঠালীচাঁপার নীড়ে ঠোঁট আছে গুঁজে
যখন হলুদ পাতা মিশিতেছে উঠানের খয়েরি পাতায়,
যখন পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়
শামুক গুগলিগুলো পড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে
তখন আমাকে যদি পাও নাকো লালশাকছাওয়া মাঠে খুঁজে
ঠেস্ দিয়ে বসে আর থাকি নাকো যদি বুনো চালতার গায়
(যদি আমি ঝরে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়)

এখানে গাছপালা-প্রাণী-বিহঙ্গের এক অপূর্ব বিন্যাস রয়েছে এবং এ চতুর্দশপদী সম্ভারের কবিতাতেই গাছপালা ও প্রাণিজগৎ সূক্ষ্মভাবে। মিলেমিশে এক নিটোল সুডৌল নিসর্গজগতের অফুরান স্বপ্নের ভাঁড়ার নির্মাণ করেছে।

অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, রূপসী বাংলায় চালতা, কাঁঠাল, হিজল, কলমি, ঘাস, ডুমুর, জাম, বট, অশ্বত্থ, ভাঁটফুল, পদ্ম, আকন্দ, বাসকলতা, ধান, বেত, ধুন্দুল, নাটাফল, চাঁপা, কামরাঙা, কুল, বঁইচি, আনারস, শটি, বাঁশ, শশালতা, নোনাগাছ, লিচু, কদম, কাশবন, করবী, আখ, গাব ইত্যাদি বহু গাছপালা-লতা-গুল্মের নামরূপের ব্যবহার আছে—তারা হয়ে উঠেছে কবির কাছে প্রকৃতির প্রাণ ও প্রতীক, তারা হয়ে উঠেছে কবি-হৃদয়ের স্বপ্ন ছেনে তৈরি এক অনির্বাণ ভেষজ জগৎ, যেখানে অহঙ্কারী মুহূর্তে পাওয়া যায় আনন্দ, দুঃখিত মুহূর্তে পাওয়া যায় সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা। এসব গাছ-লতা-গুল্ম বাংলার নিজস্ব সম্পদ এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের বইয়ে এদের ঠিকুজি-কুলুজি পাওয়া যেতে পারে। যেমন, আম সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—'The mango is indigenous to North-East India and North Burma; in the foothills of the Himalays and is said to have originated in the Indo-Burma region.......Perhaps nowhere is the world it commands the same popularity as in India. The unique taste and flavour developed in some of the top varieties of mango in India, imparting to the fruit a quality par excellence, is unsurpassed anywhere in the world.' (Mango; R. N. Sing; Indian Council of Agricultural Research.)। আম উত্তর-পূর্ব ভারতের নিজস্ব সম্পদ এবং এখানেই এর সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা। স্বাদে ও মাধুরীতে এর অনন্যতা একান্তভাবে এদেশেই অর্জিত।

একইভাবে 'রূপসী বাংলা'য় লক্ষ্মীপেঁচা, শালিক, হাঁস, দোয়েল, বক, মাছরাঙা, মনিয়া, শুক, দাঁড়কাক, শ্যামা, খঞ্জনা, শঙ্খচিল, বউ কথা কও, কাক, চকোরী প্রভৃতি

বহুগোত্রীয়, পাখিদের নাম রয়েছে। রয়েছে বাদুড়, বেজি ও ইঁদুরের উল্লেখ। আরো আছে সুদর্শন সাপমাসি, ম্যালাপোকা, গুবরে, ভোমরা, মৌমাছি, জোনাকি প্রভৃতি পতঙ্গের নামোল্লেখ। কৌতূহলী প্রাণিবিজ্ঞানীরা 'রূপসী বাংলা' পাঠ করলে বাংলার নিজস্ব পাখি প্রকৃতির নবরূপ দেখবেন এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাও মেটাতে পারবেন। পেঁচা সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'The tree owls have large round heads and large round, staring, forward directed eyes.....Most owls are crepuscular and nocturnal in their hunting and spend the daytime in holes in tree trunks, or in the seclusion of leafy branches or fissures in cliffs.' (The Wealth, of India—Birds : Publication and Information Directorate, CSIR, New Delhi)। 'পেঁচাদের মাথা বড় ও গোল, তাদের চোখও বড় বড় গোল গোল। এরা মূলত নিশাচর—রাতেই শিকার করে, দিনের বেলায় গাছের কোটরে—শাখায় বা পাথরের খাঁজে ঘুমিয়ে কাটায়'।

অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' পাঠে শুধু ভালো কবিতা পাঠের তীব্র ও বেদনাময় আনন্দই পাওয়া যায় না, বাংলার গাছপালা প্রাণী-পতঙ্গ পশু-পাখি সম্বন্ধেও অভিনিবেশ যথেষ্ট বেড়ে যায়। এ মুহূর্তে আ-পৃথিবী মানুষের বাঁচার জন্য গাছপালা পশু-পাখিদের বাঁচিয়ে রাখার যে আন্দোলন চলছে, 'Bio-diversity' বা জৈব-পৃথিবীর অনন্ত বৈচিত্রীকে অবিকল-বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে প্রয়াস চলছে, ecology বা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজার রাখার জন্য যেসব প্রযত্নের উদ্ভব হচ্ছে, বলা যেতে পারে, জীবনানন্দের কবিতার বইয়ের পাতায় পাতায় যেন তার একটা পূর্ববর্তী খসড়া পাওয়া যাচ্ছে।

'রূপসী বাংলা'কে স্বদেশপ্রেমের কবিতা হিসেবেও পড়া যায়। যে মাটির পৃথিবীতে কবি জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই ভূমিদেবীর প্রতি কবির অপরূপ ভালোবাসা এর সনেট পরম্পরায় ব্যক্ত হয়েছে। বরিশালের অপূর্ব মায়াবী ভুবন—এককথায় রূপসী পূর্ববাংলা জীবন্ত শরীরী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। জন্মমৃত্তিকার সঙ্গে মাটির সন্তানের নাড়ির যোগ গভীর, তাই পুরাতনী কথা আবার নতুন করে এখানে সপ্রমাণ হলো। পুরনো বাংলার ভূগোল আজ অবশ্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি নামগুলি তথাপি মন্ত্রের মতো সাংকেতিক ও অর্থগর্ভ হয়ে ওঠে। 'কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ হইয়া নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব ২৫৯ মাইল। গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে প্রত্যহ ডাকবাহী স্টিমার যাতায়াত করে। এই জলপথের দূরত্ব ১০৪ মাইল। গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জের মধ্যবর্তী স্টিমার স্টেশনগুলির মধ্যে টেপাখোলা, কুতুবপুর-পদ্মা, ভাগ্যকুল, তারপাশা, বহর, মুন্সীগঞ্জ ঘাট ও মির কাসিম ব্যবসায়প্রধান ও উল্লেখযোগ্য স্টেশন।' (বাংলায় ভ্রমণ; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪০)। পূর্ববঙ্গের রেলপথের প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত কিংবদন্তিপ্রতিম বইটির এসব বিবরণ ও স্থান-নামগুলি পড়লে এখনো পূর্ববঙ্গে যাঁদের পিতৃপুরুষ ও মাতৃনারীগণের বাসস্থান ছিল, তাঁদের মন স্মৃতিবেদনায় বিহ্বল হয়ে উঠতে পারে। সেই পূর্ববঙ্গের মধ্যে বরিশাল আবার জলমাতৃক নদীমাতৃক

অপূর্ব দেশ—তাকে ভাটি অঞ্চলের দেশও বলা হয়ে থাকে। সেখানে সুপুরিগাছের সারি, শটিবন, চালতাগাছ প্রভৃতি বিশেষ স্থানিক গাছপালার প্রাধান্য আছে। রূপসী বাংলার সনেটগুচ্ছে এসব গাছপালার নাম বারংবার উল্লিখিত হয়েছে, তারা প্রায় চরিত্র হয়ে উঠেছে। এ মায়াময়ী বরিশালেই জীবনানন্দ জন্মেছিলেন, তাঁর চতুর্দশপদী কবিতা বলতে এ বরিশালভূমির প্রীতি-ভালোবাসাই উচ্চারণের সৌন্দর্যে প্রায় মন্ত্রের মতো হয়ে উঠেছে। এ হচ্ছে জীবনানন্দের স্বদেশপ্রেম। দেশ-জননীকে তিনি জন্মভূমির একমুষ্ঠি মাটির মধ্যেই অনুভব করেছিলেন—এর জন্য তাঁকে দেশবিদেশ ভ্রমণ করতে হয়নি। কিন্তু তাঁর এই মৃৎপৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা জন্মভূমির ভেষজ-প্রকৃতির প্রতি প্রেম ক্রমে ক্রমে অদ্ভুত বিস্তারলাভ করে সমগ্র বঙ্গ, ভারতবর্ষ এমন কি বিশ্বপৃথিবীকে যেন আত্মসাৎ করে নিয়েছে। জন্মভূমি কী করে বিশ্বভূমি হয়ে উঠেছে, ব্যক্তি-মানুষের বোধের বৃন্তে কী করে বিশ্বমানুষের অনুভূতির ফুল পাপড়ি বিস্তার করছে, প্রথম কবিতাটিতেই তা আশ্চর্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

আমি চলে যাব বলে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
চারদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলবর,
খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল;
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।
(সেইদিন এই পাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি)

শেষ দু'টি পংক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে কবির ইতিহাসচেতনা। তাঁর আন্তর্জাতিক মন বুদ্ধিজীবীর চিত্তবৃত্তি জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার বাণীময় রূপটিকে নিখিল মানবতার বাণীময় রূপ করে তুললো। ব্যক্তি-মানুষ চলে যাবে, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য কখনো ম্লান হবে না। লক্ষ্মীপেঁচার গানে, শিশিরের জলে, চালতার ফুলে, খেয়ানৌকার তটলগ্ন হওয়ার ক্রিয়ায় ওই মৃত্যুঞ্জয়ী চিরসৌন্দর্যের প্রকাশ। নতুন কালের নতুন মানুষ এসে আবার চোখ ভরে ওইসব দৃশ্য দেখবে। ইতিহাসচেতনার অর্থ এ বৃক্ষমেখলা পৃথিবীর আধিপত্য নিয়ে যুগে যুগে হয়ে গেছে কত সংগ্রাম ও ষড়যন্ত্র, ঈর্ষাহিংসাশক্তির অভিযান। কিন্তু সেসব উদ্ধত শক্তি আজ কোথায়, ব্যবিলন এশিরিয়ার দম্ভের মূর্তি আজ বিনিঃশেষ ধুলো হয়ে গেছে। কিন্তু রয়ে গেছে ফুলের বর্ণ ও সুগন্ধ, প্রেমের মধুর জয়শক্তি, আলোর মায়াবী আবেদন ও বিহঙ্গের গীতগান। রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থে কবি প্রকৃতির এ মরণজয়ী শক্তিকেই বার বার অনুভব করেছেন বিবিধ অন্তরঙ্গ দৃশ্যের কাব্য-কবিতায়, এক জীবনে তাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব গ্রহণ করতে চেয়েছেন, আকণ্ঠ পান করে নিতে চেয়েছেন ওই সৌন্দর্যকে। এমনতর কথা পূর্ববর্তী কবি রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন একটু ভিন্ন ভঙ্গিতে, ভিন্নতর ভাষায়—

'তোমার কাছে আমার এ মিনতি
যাবার আগে জানি যেন আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশপানে নয়ন তুলে শ্যামল বসুমতী'

(দিনান্ত : গীতিমাল্য)

প্রত্যক্ষভাবে দেশপ্রেমের কাব্য নয় রূপসী বাংলা, এখানে দেশের জন্য অস্ত্রধারণ, রাজনৈতিক সংগ্রাম কোনোকিছুই নেই। কিন্তু পরোক্ষে, অন্তর্লীনভাবে আরেক ধরনের দেশপ্রেমের কবিতাগুলি ভেতরে ভেতরে কাজ করছে—কবি যেন অস্ত্রধারণ করেছেন সবুজ পৃথিবীর সপক্ষে, ভেষজ প্রকৃতিকে পৃথিবীতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সংসক্ত শিকড় দেখবার জন্যই তাঁর তৃষ্ণা ও সংগ্রাম। কবির এ কোমল মধুর দেশপ্রেম কবিতার পর কবিতায় উদ্‌ঘাটিত, 'বাংলা' শব্দটির ব্যবহার নিয়ে এসেছে বহুস্তর অনুভূতির বর্ণবৈভব ও আভাস।

'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—

আমি এই বাংলার পারে/রয়ে যাব' (তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও) 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/খুঁজিতে যাই না আর (বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি), 'জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে—আর এই বাংলার ঘাস/রবে বুকে (জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে), 'এই সোঁদা ঘাসের ধুলায়/জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—চারিদিকে বাঙালির ভিড় (যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে); 'কোনোদিন রূপহীন প্রবাদের পথে/বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন/কাটাইনি দিন মাস (ওই); 'দূর পৃথিবীর গন্ধে ভরে ওঠে আমার এ বাঙালির মন/আজ রাতে (দূর পৃথিবীর গন্ধে ভরে ওঠে);—ব্যবহৃত পংক্তিগুলিতে প্রতিটি 'বাংলা' শব্দের ব্যবহার ভালোবাসার অতলমাধুরী দিয়ে ভরা, দেশপ্রেমের এক স্বচ্ছ সুন্দর সরল নিষ্পাপ উচ্চারণ এখানে। এসব কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে, মধ্যে অদ্ভুত অতৃপ্তি ঘনিয়ে আসে—একমাত্র শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের উপভোগেই এরকম অতৃপ্তির জন্ম হয়; একটা অদ্ভুত বেদনা ও অস্থিরতা মনে জেগে ওঠে, জেগে ওঠে বিষাদ ও করুণা। বাংলার কবি বাংলাকে ভালোবেসেছেন—এ অপরূপ প্রেম-কাহিনী একটি অসাধারণ কবিতার সাহায্যে সবিস্তার ব্যক্ত করছি—

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে,
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়,"
হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;

হয়তো শুনিবে এক লক্ষীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলাজলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়াপালে
ডিঙা বায়, রাঙা বক সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে .
দেখিবে ধবল বক : আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—
(আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়)

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, সংহত চতুর্দশ পংক্তিতে কবি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কথাটিই বলেছেন। শুধু বলতে পারি, বাংলার প্রতি এমন স্থান-নিবদ্ধ ভালোবাসা সম্পূর্ণ একটি কাব্যে ব্যক্ত করেছেন মাত্র একজন কবি—তিনি হচ্ছেন প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ কবিপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। উদ্দিষ্ট কাব্যটির নাম 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ)।

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
...   .
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমিস্তনে!
(কপোতাক্ষ নদ : চতুর্দশপদী কবিতাবলী; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ)

এমনই সব কবিতায় ও উচ্চারণে মাইকেল বঙ্গভূমির প্রতি, তাঁর জন্ম-মৃত্তিকার প্রতি অন্তরের অমেয় ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে, আঙ্গিক প্রকরণে তিনি ধ্রুপদী কবিসংঘের অন্তর্ভুক্ত, ক্লাসিসিজমের বিভা তাঁর সর্বাঙ্গে; তথাপি অন্তরের বঙ্গভাষা, কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, বউ কথা কও, আশ্বিন মাস, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির ইত্যাদি কবিতায় যে আর্তি ও আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে, তা ইউরোপীয় শিক্ষা ও আদর্শে দীক্ষিত মহাকবির খাঁটি বাঙালির প্রাণকেই ব্যক্ত করেছে। কিন্তু জীবনানন্দে যেখানে বেদনা ও বিষণ্নতার পাশাপাশি একটা পরম সন্তোষ ও চরম তৃপ্তির ভাব রয়েছে, সেখানে মাইকেলে বঙ্গভূমির সপ্রেম আরতির পাশাপাশি এক চরম হতাশা; অন্ধতাপ, অশ্রু ও ট্রাজিক দ্বন্দ্বের কথা রয়েছে। আসলে কবি শ্রীমধুসূদন উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলেন 'রূপহীন প্রবাসের পথে'—আত্মস্থ বঙ্গীয় নীড়ে প্রত্যাবর্তনের পথ আক্ষরিক অর্থেই নিরুদ্ধ করেছিলেন।

জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'কে মিথ ও সংকেতের কবিতা হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। বঙ্গভূমির প্রাণোজ্জ্বল প্রতিমার নির্মিতির জন্যই এসব ইতিহাস, লোক-ইতিহাস বা লোক-কাহিনী, সংকেত অথবা প্রতীকের প্রয়োজন হয়েছিল। বহু সনেটেই একাধিক উল্লিখন বা Allusion-এর ব্যবহার আছে। এসব উল্লিখন গ্রহণ করা হয়েছে বাংলার কাব্য ও ইতিহাস থেকে। বস্তুত বিংশ শতকের কবিতায় Allusion-এর

ব্যবহারকে পাউন্ড ও এলিয়ট প্রমুখ কবিরা একটা নিয়ম করে তুলেছিলেন—এ নিয়মকে Imagist বা চিত্রকল্পবাদী কবিতার নিয়ম বলা যেতে পারে—'Eliot and I ound have, in fact, founded a school of poetry which depends on literary quotation and rereference to an unprecedented degree' (T. S. Eliot; Axel's Castle; Edmund Wilson, P.—93)। দ্রষ্টব্য আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব : মঞ্জুভাষ মিত্র)

জীবনানন্দ ব্যবহৃত উল্লিখনগুলি অতঃপর ব্যাখ্যা করা যাক।

মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল, বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে
কৃষ্ণাদ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়
সোনালি ধানের পাশে অজস্র অশ্বত্থ বট দেখেছিল হায়
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদীমাঠ ভাঁটাফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।
(বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ)

এখানে মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের বাণিজ্য প্রসঙ্গ ও বেহুলার ভাসান কবিতার রূপকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে, উদ্দেশ্য বাংলার সৌন্দর্যের সঙ্গে এক বেদনামিশ্রিত কারুণ্য বা ট্রাজিক বোধের সংযোজন। চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লখীন্দর কাহিনী আরো স্থানে স্থানে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

অন্যদিকে 'যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে'—এখানে রামপ্রসাদের শাক্ত-সঙ্গীতের প্রতি ইঙ্গিত (আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে); 'কীর্তিনাশা খুঁড়ে খুঁড়ে চলে বারোমাস নতুন ডাঙার দিকে' (মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা)—এখানে পদ্মার প্রতি; কত পাটরানীদের গাঢ় এলোচুল/এই গৌড় বাংলার' (যে শালিখ মরে যায় কুয়াশায়)—এখানে ইতিহাস সংকেত; 'অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া' নামক কবিতাটি পাশাপাশি বিভিন্ন পংক্তিতে সতী, উমা, চন্দ্রশেখর, বল্লান সেন, রায়গুণাকর, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদের শ্যামা, শঙ্খমালা প্রভৃতি নাম পাচ্ছি—এখানে পৌরাণিক অথবা মঙ্গলকাব্যীয় উল্লিখন, ইতিহাস-উল্লিখন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবি-নামের উল্লিখন রয়েছে। নানা কবিতায় লহনা, শ্রীমন্ত ইত্যাদি নামোল্লেখ ধনপতি সদাগরের গল্প মনে করিয়ে দিচ্ছে। উৎস মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, কবি তার নামও করেছেন। কঙ্কাবতী, শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা, মাণিকমালার প্রতিমা সরাসরি রূপকথা থেকে নেয়া। 'সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়'—এসব রাজচরিত্র বাংলার ইতিহাস উৎস থেকে গৃহীত; পুনশ্চ 'পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোনখানে সফলতা শক্তির ভিতর' নামাঙ্কিত সনেটের সমাপ্তিতে যে দুটি অলৌকিক পংক্তি।

কেউ নাই কোনো দিকে—তবু যদি জ্যোৎস্নায় পেতে থাক কান
শুনিবে বাতাসে শব্দ; 'ঘোড়া চড়ে কই যাও হে রায়রায়ান'

সেখানে ইতিহাস পুরুষকে অশরীরী প্রেতপ্রতিভায় রূপান্তরিত করা হয়েছে—এভাবে লোকযানের জন্ম হয়ে থাকে। ইয়েটসের কবিতার সঙ্গে এখানে তুলনা দেয়া যায়। 'ইয়েটসের কবিতায় রয়েছে কেল্টিক গোধূলির নতুন নিয়ম; উপকথা ও পুরাকাহিনী থেকে আবিষ্কৃত আলো। স্বয়ং এলিয়ট ইয়েটদের কেল্টিক গোধূলির নিহিতার্থ করেছেন কেল্টিক লোকগাথা থেকে ভূয়সী পরিগ্রহণ। এ কবি নানা চরিত্র গ্রহণ করেছেন উপকথা লোক কথা থেকে যারা হয়েছে সংকেতের মতো দৃশ্যজগতের অন্তরালে অবস্থিত অদৃশ্য শক্তিসমূহের তাৎপর্যবাহী, স্বপ্ন সম্মোহন ধ্যান থেকে তারা উঠে আসে নিরন্তর বিচিত্র রেশমতন্তুর মতো।' (আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব : মঞ্জুভাষ মিত্র; নবার্ক)। জীবনানন্দ দাশও 'রূপসী বাংলা'র কিছু কিছু কবিতায় অনেকটা এ জাতীয় কাজ-ই করেছেন।

রূপসী বাংলায় মিথ ও সংকেতের ব্যবহারের কথা কিছু বললাম, এবার কাব্যে প্রেমের কবিতার যে প্রচ্ছন্ন আদল আছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলছি। কিছু কিছু সনেটে তুমুল প্রকৃতি-বন্দনা—গাছপালা ও প্রাণিজগতের মধুমাখা সংবাদের মধ্যে একটি-দু'টি এমন পংক্তি এসে গেছে, যেখানে ব্যক্তিগত প্রেম-ভালোবাসার ইঙ্গিত-আভাস রয়েছে। 'দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে/শঙ্খের মতো কাঁদে' (তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও); 'কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত শীত হাতখান' (আকাশে সাতটি তারা); 'কোন এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল/তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে : নরম ব্যাকুল' (জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে); 'সারারাত কিশোরীর লাল পাড় চাঁদে ভাসে—হাতের কাঁকন বেজে ওঠে' (মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা); 'উঠানে কে রূপবতী খেলা করে—ছড়ায়ে দিতেছে বুঝি ধান/শালিখেরে (এখানে ঘুঘুর ডাকে);—এমনই বহু কবিতায় পংক্তিবিশেষে বাংলার কিশোরীর ভাবচিত্র ফুটে উঠেছে। বোঝা যায়, বাংলাকে রূপসী শুধু প্রকৃতি করেনি, রূপবতী কিশোরী অথবা অল্পবয়সিনী নারীও এ বিশেষণ সৃষ্টির অন্তরঙ্গ ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। জীবনানন্দের কবিতায় কিশোরীর ভেতর যেন এক বা একাধিক বঙ্গকিশোরীর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়—কবির নিজস্ব বঙ্গীয় কিশোর বয়সের কিছু ভাবানুষঙ্গ যেন সেখানে লেগে আছে।

তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে
শিউলি ঝরে লাখে লাখে
পুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে

বহুদিন আগে রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত এক কবি বঙ্গকিশোরীর এ মূর্তি রচনা করেছিলেন; আবার রবীন্দ্র-ঐতিহ্য বিদীর্ণ করে জেগে ওঠা এক নতুন ভাষা নতুন ভাবনার কবি কিশোরীস্তোত্র রচনা করলেন, অবশ্যই একটু অন্যভাবে। তাঁর নিজের কৈশোর স্মৃতি এখানে হয়তো জাগর, এমন কি তাঁর নবপরিণীতা বধূর সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনাও হয়তো এখানে ভাষা পেয়েছে।

'কতদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দুজনে' বলে একটি চমৎকার চতুর্দশপদী পাচ্ছি, যে কবিতাটি আগাগোড়াই প্রেমের বেদনা ও বিষাদ দিয়ে রচিত। অপরিহার্য প্রকৃতিপট তো আছেই, কিন্তু মানসিক পট তাকে ছাপিয়ে গেছে।

আধফোটা জ্যোৎস্নায়, তখন ঘাসের পাশে কতদিন তুমি
হলুদ শাড়িটি বুকে অন্ধকারে ফিঙ্গার পাখনার মতো
বসেছ আমার কাছে এইখানে—আসিয়াছে শটিবন চুমি
গভীর আঁধার আরো—দেখিয়াছি বাদুড়ের মৃদু অবিরত
আসা-যাওয়া আমরা দু'জনে বসে—বলিয়াছি ছেঁড়াফাঁড়া কত
মাঠ ও চাঁদের কথা: ম্লান চোখে একদিন সব শুনেছ তো।

'ম্লান চোখে' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার থেকে বোঝা যায়, এখানে ভালোবাসার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস কতখানি মিশে গেছে, স্মৃতিকে আকার দিয়ে আঁকার প্রয়াস কত সুতীব্র এখানে। এ বেদনার্ত ভালোবাসার ও স্মৃতিবেদনার সূক্ষ্ম কারুকাজ পেত্রার্কের মহান গীতি-কবিতাগুলিতে রয়েছে। পেত্রার্কের সনেটের আঙ্গিক জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'য় পরিগ্রহণ করেছেন; অন্তরঙ্গে মাঝে-মধ্যে প্রেমিকসত্তার এমন মর্জি ও মেজাজ ফুটে উঠেছে, যাকে অনায়াসে পেত্রার্ক-এর পাশে রেখে পাঠ ও অনুভব করা যায়।

পেত্রার্কের এমনি একটি-দু'টি কবিতার আদল পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। বিলম্বিত লয়ে রচিত প্রেমিকের এমন আর্তি আকাঙ্ক্ষার নিবিড় সঘন শব্দ-শরীর বিশ্বসাহিত্যেও অনুপম ও অদ্বিতীয়। Quel Sempre acerbo et onorato giorno' নামক ১৫৭ সংখ্যক সনেটে এ চতুদর্শ শতকের ইতালীয় রেনেসাঁসের কবি বলেছেন—'তার ভঙ্গিকে সাজিয়ে দিয়েছিল মহৎ করুণা, তার তিতোমধুর বিলাপ শুনে আমি ভাবলাম, এ নারী মানবী অথবা দেবী আকাশকে সে করে তুলেছিল স্বচ্ছ ও নির্মল। তার মস্তকটি যেন সূক্ষ্ম স্বর্ণে নির্মিত, মুখ তার উষ্ণ তুষার, এবনি-র কৃষ্ণাভা ভুরুযুগলে, আর তার চোখ হলো দু'টি তারা, প্রেম সেখানে বৃথাই আনত হয় না; মুক্তা আর রক্তগোলাপ, দুঃখ পুঞ্জিভূত হয়ে জন্ম দিল সুন্দর আন্তরিক শব্দরাজির, তার দীর্ঘশ্বাস বহ্নিকণা চোখের জলে তার টলমল সুচারু স্ফটিক।' আর একটি কবিতায় দেখছি, প্রিয়ার সঙ্গে প্রকৃতির এমন মাখামাখি যে, একজনকে ভালোবাসতে গেলে আর একজনকেও ভালোবাসতে হবে। ১৬২ সংখ্যক সনেট 'Lieti fiori et felici, et ben nate erbe'-তে কবি বলেছেন, 'সুখী ও সৌভাগ্যশীল ফুল আর সুজাত ঘাসেরা, আমার ভাবনামগ্ন প্রিয়া ওইখান দিয়ে হেঁটে যায়, অধিতট শুনছে তার মধুর কথাগুলি আর ধরে রাখছে তার সুন্দর পা দু'টির কিছু ছাপ। তন্বী বৃক্ষ, সবুজ নবপত্র, সূক্ষ্ম ম্লান ভায়োলেট, ছায়াঘেরা বন—এখানে যখন সূর্য ওঠে, তখন তার আলোয় তোমাকে দেখায় দীর্ঘাঙ্গী ও গরবিনী। হে মনোরম পল্লীঅঞ্চল, হে শুদ্ধ নদী, সুন্দর মুখ ও উজ্জ্বল চক্ষুকে যে ম্লান করালো, ওই জীবন্ত আলো দিয়ে গড়ে দিল স্বভাবকে.....এখানে একটি পাথরও নেই, যা আমার আগুন দিয়ে প্রজ্বলিত নয়।'

রূপসী বাংলায় অতএব অনুভূত হয় কোনো কোনো কবিতায়—প্রেমের কবিতার বৈভব স্পষ্টত উপস্থাপিত। প্রায় সব কবিতাতেই একটা অন্তর্লীন প্রেমপ্রবাহ ছিল—

প্রকৃতিকে ভালোবাসা, রমণীকে ভালোবাসা, শিল্পীর সত্তা ও দায়িত্বকে ভালোবাসা। অবশেষে তা জমাট বেঁধে শেষের দিকের কোনো কোনো কবিতায় আশ্চর্য পূর্ণাঙ্গ রূপে সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করলো। 'তুমি কেন বহু দূরে—ঢের দূরে—আরো দূরে' নামক অদ্ভুত স্পর্শময় বহুস্তর কবিতাটির কথাই প্রথমে মনে পড়ছে।

তুমি কেন বহু দূরে—ঢের দূরে—আরো দূরে—নক্ষত্রের অস্পষ্ট আকাশ
তুমি কেন কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে এসে বলনাকো একটিও কথা
আমরা মিনার গড়ি—ভেঙে পড়ে দু'দিনেই—স্বপনের ডানা ছিঁড়ে ব্যথা
রক্ত হয়ে ঝরে শুধু এইখানে—ক্ষুধা হয়ে ব্যথা দেয়—নীল নাভিশ্বাস
ফেনায়ে তুলিছে শুধু পিরামিড যুগ থেকে আবেগ বারোমাস,
আমাদের সত্য, আহা, রক্ত হয়ে ঝরে শুধু; আমাদের প্রাণের মমতা
ফড়িঙের ডানা নিয়ে ওড়ে আহা : চেয়ে দেখে অন্ধকার কঠিন ক্ষমতা
ক্ষমাহীন—বারবার পথ আটকায়ে ফেলে—বারবার করে তারে গ্রাস,
তারপর চোখ তুলে দেখি অই কোন্ দূর নক্ষত্রের ক্লান্ত আয়োজন
ক্লান্তিরে ভুলিতে বলে—ঘিয়ের সোনার দীপে লাল নীল শিখা
জ্বলিতেছে যেন দূর রহস্যের কুয়াশায়—আবার স্বপ্নের গন্ধে মন
কেঁদে ওঠে; তবু জানি আমাদের স্বপ্ন হতে অশ্রু ক্লান্তি রক্তের কণিকা
ঝরে শুধু—স্বপ্ন কি দেখেনি বুদ্ধ—নিউসিডিয়ায় বসে দেখেনি মণিকা,
স্বপ্ন কি দেখিনি রোম, এশিরিয়া উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা, দিল্লি, বেবিলন

জীবনানন্দ আমাদের, পৃথিবীর মানুষদের নাভিশ্বাসের কথা বলেছেন; জন কিটসও এভাবে পৃথিবীর মানুষের অশ্রু-ক্লান্তি মুমূর্ষার কথা বলেছিলেন তাঁর বিখ্যাত নাইটেঙ্গেল-স্তোত্রে—

Fade far away, dissolve and quite forget
What thou among the leaves hast never known,
The weariness, the fever, and the fret
Here where men sit and hear each other grown,
(Ode to a Nightingale)

উনিশ শতকীয় কবি এবং বিংশ শতকীয় কবি দু'জনেই এখানে প্রকাশ করেছেন 'Romantic Agony' বা রোমান্টিক নিপীড়ন ব্যথাকে, যার মূলে রয়েছে অবক্ষয় আসক্তি ও অবক্ষয় বা 'Decadence' সম্পর্কিত এক প্রবল চেতনা। এক আহত সৌন্দর্য এ কবিতার ভেতরে ভেতরে কাজ করছে, এক অদ্ভুত অস্বভাবী অনুভূতির সূক্ষ্ম মূর্ছনা এখানে প্রেরণার মতো কাজ করছে। প্রকৃতি বন্য, প্রকৃতি বিষণ্ন—এ ভাবটিও ধীরে ধীরে কবিকে গ্রাস করেছে। সৌন্দর্যের ভিতরে রয়েছে ক্ষয় ও ধ্বংস—এ বোধটি ক্রমশ মূল্যবান হয়ে উঠলো। আনন্দের সঙ্গে বেদনার যোগ যে অপরিহার্য, এ মতবাদে বিশ্বাস দেখা গেল। এমন এক নারীর দেখা মিললো যাকে ভালোবেসে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া যায়, অনুতাপে বিষাদে বিলাপে স্তবে স্তুতিতে অচরিতার্থতায়

আত্মহননের মতো বেদনা ভোগ করা যায়। নারীর ভেতর (এমন কি নারীরূপা প্রকৃতির ভেতর) আবিষ্কৃত হলো এক ভয়াবহ সৌন্দর্য এবং এ অভিনবত্বের প্রতি আকর্ষণ আসলে যৌন আকাঙ্ক্ষার-ই এক কল্পনারঙিন অভিক্ষেপণমাত্র। নারী এলো নিয়তির ছদ্মবেশ পরে। সৌন্দর্যের জন্য সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, নিখিল রূপের জন্য নিজেকে একেবারে রিক্ত করে দেয়া—কবিতার এবং প্রেমের কবিতার উপজীব্য হয়ে উঠলো। এ ভাবটাকেই সুইনর্বান অনবদ্য দু'টি পংক্তিতে প্রকাশ করেছেন—

Pain melted in tears, and war pleasure,
Death tingled with blood, and was life.

বেদনার সঙ্গে অশ্রু মিশলে তাকে বলে আনন্দ, মৃত্যু আর রক্তক্ষরণ মিশে গেলে তাকে বলে জীবন। বস্তুত নারী ধীরে ধীরে নতুন প্রেমের কবিতায় হয়ে উঠলো প্রভাব বিস্তারকারী, সে প্রভাবের কাছে পুরুষ স্বেচ্ছাকৃতভাবে আত্মসমর্পণ করছে—এ নারী অনেক সময়-ই কুহকিনী ও ছলনাময়ী এবং কবির আত্মা এখানেই উদ্ভাবন করে নিল নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করার মতো অদ্ভুত উপকরণ—এমন সব আঘাতসমূহ, যার ভেতর থেকে শিল্প ও কবিতার জন্ম হতে পারে। 'রূপসী বাংলা'কে প্রেমের কবিতা হিসেবে দেখতে হলে এ দৃষ্টিকোণটি মনে রাখতে হবে। 'তুমি কেন বহুদূরে' সনেটটিতে এ ভাবনার-ই বিপুল আলোড়ন—প্রেমের নশ্বরতার মহিমামণ্ডিত কবিতাছবি। এরকম উচ্চারণ অন্যত্রও রয়েছে—

হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়—চিতা শুধু পড়ে থাকে তার, আমরা জানি না তাহা;

(হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়)

রূপসী বাংলার সনেটসমূহের মধ্যে প্রেম ও অবক্ষয়ের যে পরাক্রম দেখা গেছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল। আর এখানে অধিকন্তু পাশাপাশি রয়েছে বিপুল স্মৃতিমেদুরতা এবং এক ব্যাপ্ত ও নিহিত অসাধারণ মৃত্যুবিলাস বা প্রায় জীবনতৃষ্ণার মতোই অমোঘ ও ভীষণভাবে কাঙ্ক্ষিত—শব্দের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে কবির বলা এবং না-বলা ওইসব অসাধারণ কথা; স্তরের পর স্তর খুলতে খুলতে সহানুভূতিতে মমতায় কবিতার পাঠক অকস্মাৎ ওইসব অর্থের মুখোমুখি হয়ে আনন্দিত অথবা দিশেহারা হয়ে উঠতে পারেন। কবির মৃত্যুচেতনা প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসে কখনো গাঢ় হয়েছে, কখনো বা হয়ে উঠেছে সহনীয়। উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করছি 'যখন মৃত্যুর মুখে শুয়ে রব' নামক অসাধারণ কবিতাটি—

যখন মৃত্যুর মুখে শুয়ে রব অন্ধকার নক্ষত্রের নিচে
কাঁঠাল গাছের তলে হয়তো বা ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে
দিনমানে কোনো মুখ হয়তো সে শ্মশানের কাছে নাহি আসে
তবুও কাঁঠাল জাম বাংলার—তাহাদের ছায়া যে পড়িছে
আমার বুকের পরে—আমার মুখের পরে নীরবে ঝরিছে
খয়েরি অশ্বত্থপাতা—বঁইচি শেয়ালকাঁটা আমার এ দেহ ভালোবাসে

নিবিড় হয়েছে তাই আমার চিতার ছাই-এ—বাংলার ঘাসে
গভীর ঘাসের গুচ্ছে রয়েছি ঘুমায়ে আমি,—নক্ষত্র নড়িছে

চিলাই-এর তীরে সারি সারি চিতার জ্বালামুখের বর্ণনা আরো এক বঙ্গকবি করে গিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন ভাওয়ালের স্বভাব-কবি উনিশ শতকীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস।

'রূপসী বাংলা'কে যে স্মৃতিমেদুরতার কবিতা বলা যায়, এ উক্তিও আগেই করেছি। বস্তুত স্মৃতির গোধূলিকে দু'হাতে ছেনে, তাকে যেন ঘনীভূত করে কবি এখানে কবিতার প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। স্মৃতি আর মৃত্যু পাশাপাশি এসে যেন সহবাসে লিপ্ত হয়েছে। স্মৃতি ক্ষণকালের আদরিণী সত্তা ত্যাগ করে চিরন্তন অথবা আবহমানের অঙ্কশায়িনী হয়েছে, তখন তার নাম হয়েছে ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস। জীবনানন্দ দাশ যখন এ কবিতাগুলি রচনা করছিলেন, তখন মনে হয়, এক অদ্ভুত অপসারণের বেদনা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। মনে হয়েছিল, এ পৃথিবী থেকে তিনি চলে যাবেন। এ আত্মদর্শনমণ্ডিত করে প্রকৃতিকে দেখেছিলেন বলে অমরাবতীর চিরজীবী দেবীর মতন রূপ নিয়েও 'রূপসী বাংলা'কে তাঁর মনে হয়েছিল মৃত্যুর অঙ্কশায়িনী—প্রতিটি গাছে, ঘাসে, পাখির ডানায়, পতঙ্গের পাখায় তিনি ক্রমাগত দেখেছিলেন চলে যাওয়া, অনুভব করেছিলেন ক্রমাগত বিচ্ছেদের হাতছানি। অনুভূতির প্রতীকী রূপ নিয়ে তাই 'রূপসী বাংলা'য় এসেছে ভাঙাঘাট, বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর পুরাতনী কপাট, রূপসীরা সে ঘাটে কেউ আসে না, কলসির গায়ে সারারাত বেজে চলে যেন প্রেতিনীর কাঁদন। কঙ্কাবতী শঙ্খমালা নামের বিন্যাস অতীত দিনের মৃত ও ম্লান মেয়েদের সংকেত নিয়ে আসে—কত কিশোরী চলে গেছে তাদের দিনযাপন করে। 'ভাসানের গান', 'মাথুরের' মতো শব্দের ব্যবহার এ বেগবতী বিসর্জনকে বোঝাতে প্রযুক্ত হয়েছে। 'ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে'—এ উচ্চারণও স্মৃতি ভারাক্রান্ত এক হৃদয়ের-ই মৃত্যু অভিসারী মর্মকথা। অন্ধকারে মৃত্যুর আহ্বানে ধ্যানে ও কল্পনায় তারপর চিত্রকল্প গাঢ় হয়ে কখন যেন হয়ে ওঠে ইতিহাসের অদ্ভুত সংকেত। অশ্বারোহণে সীতারাম রায় প্রভৃতি রাজন্যের যে চকিত ছবি কবি এঁকেছেন, তার উপযোগিতা এখানেই এক শঙ্খ-বালিকার ধূসর রূপের কথা কবির মনে পড়েছে—শ্মশানচিতায় কবে তার হাড় ঝরে গেছে, তবুও মনে হয়েছে, সে যেন এখানেই আছে। 'এ জনমে নয় যেন—এ পাড়াগাঁর পথে তবু তিনশ বছর আগে হয়তো বা—আমি তার সঙ্গে কাটায়েছি'—এ জাতিস্মর-স্মৃতি Algernon Blackwood রচিত 'The Ancient Sorcery' নামক মায়াবী অশরীরী নিয়ে লেখা গল্পটির নারীর মতোই এক নারীকে প্রকাশ করছে। খণ্ডকালের এ মায়াবিনী অখণ্ডকালের কাছেও বর পেয়েছে। সেই হচ্ছে রূপসী বাংলা, আবহমানের মৃত্যুহীনা; সে-ই প্রকৃতিরূপে শুশ্রূষাবতী অজরা আমরা; নারীরূপে আনন্দ-বেদনার মিশ্র রঙ্গরসের চিরন্তন আগ্নেয় উৎস জন্মভূমি। সনেটে সনেটে এই বিভিন্ন হয়েও এক ও অভিন্ন আদি বিদ্যার অনুধ্যান-ই জীবনী রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থে করেছেন—মৃত্যুর ভয়ে ব্যাকুল হয়েও শেষ পর্যন্ত শিল্পীর অমর পদবী পাবেন ভেবে, প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গমে বিরহে মৃত্যুর চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প খুঁজে নেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আলোচিত বইটিতে ভাষা ও ছন্দে, উপমায় ও আঙ্গিকেও রয়েছে অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রতিভার এক অদ্ভুত অগ্নিস্বাক্ষর। পেত্রার্কীয় সনেটে abba/abba; cd/cd/cd cde/cde—এ মিলের বিন্যাসটিই আছে; জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুচ্ছে সেই বিন্যাস-ই নিয়েছেন, যদিও ষটক বা sestet-এর মিলবিন্যাসে কিছুটা নিজস্ব রীতিও নিয়েছেন। সেখানে প্রথম চার পংক্তি cd/cd করে তারপর শেষ দুই পংক্তি cd-র বদলে dc করেছেন অর্থাৎ মিলের স্থানবদল করেছেন। কখনো আবার শেষ দু'টি পংক্তিতে পাশাপাশি মিলও ব্যবহার করেছেন। এ সবই হচ্ছে কবির স্বাধীনতা। ভাষার দিক থেকে দেখা যায়, ধূসর পাণ্ডুলিপিতে বা আরো পরে জীবনানন্দীয় ভাষার যে সম্মোহনী ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য দেখা গিয়েছিল, তা 'রূপসী বাংলা'তেও প্রচুর রয়েছে। শোনা গেছে, কবি এ কবিতাগুলি লিখে ফেলে রেখেছিলেন—পরিমার্জনা করেননি। ফলে কবিতাগুলির ভাষার মধ্যে 'Automatic Writing' বা স্বতঃস্ফূর্ত লেখনীর সুররিয়েলিস্ট ঢঙ যথেষ্টই এঁকেছে—যাকে নামান্তরে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের 'Free Association' বা মুক্ত-ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি বলা যায়। 'ঘুমায়ে পড়িব আমি' নামক কবিতাটি বিশ্লেষণ করে জীবনানন্দের শব্দ ব্যবহারের রীতি নিয়ে দু'-একটা কথা বলা যাক। 'ঘুমায়ে পড়িব' শব্দযুগলে মৃত্যুচেতনা, নক্ষত্রের—প্রিয় শব্দের ব্যবহার; 'শঙ্খবালিকার ধূসর রূপ' লোক-সংস্কৃতির ছায়া দিয়ে তৈরি, 'হাড়' শব্দে জন ডনের মতো মেটাফিজিক্যালগণ, বোদলেয়ারের মতো সংকেতবাদীর আভাস আসে—এখানে ব্যক্ত ক্ষয়ের অনুরঞ্জনা; 'আম জাম কাঁঠালের দেশ', 'ধানকাটা', 'খড়' এ ধরনের শব্দগুলি 'রূপসী বাংলা'র একেবারে মূল আদি শব্দ সম্ভারের অন্তর্গত—প্যাস্টোরাল বা ভেষজ প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরের ভাবৈশ্বর্য ফোটাতে এরাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। 'খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে' শব্দ ব্যবহারের এ অমোঘতা চোখ বুজে ছবিটি দেখতে সহায়তা করে। 'শ্যামা', 'খঞ্জনা' প্রভৃতি শব্দে জীবনানন্দের কবিতার প্রাণিজগৎ ও পরিবেশ-প্রণয়; 'ভাসান', 'মাথুর' প্রভৃতি শব্দে অবিরাম বিচ্ছেদ-বেদনা, যা নিখিল নর-নারীর স্বাভাবিক নিয়তি। লক্ষ করলে এও দেখা যায়, কবি 'ঘুমায়ে পড়িব', 'দেখিয়াছি' 'কাটায়েছি' ইত্যাদি সাধু ক্রিয়াপদের পাশাপাশি 'ঝরে গেছে', 'কুড়ালাম', 'পালা বেঁধে' ইত্যাদি চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার করেছেন—এভাবে এক সম্পূর্ণ মৌলিক ও ইতঃপূর্বে অনাস্বাদিত ধ্বনি সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব। আবার সামগ্রিক শব্দ-ব্যবহারে কবিমানসের অলস এলায়িত অবসাদের মাদকতা আক্রান্ত ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি-জ্ঞাপক ভাষা তৈরির ব্যাপারটাও সচেতন পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না। প্রস্তাবিত কবিতাটিতে যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ মাত্র তিন-চারটি—শঙ্খ, নক্ষত্র, খঞ্জনা প্রভৃতি। কিন্তু ৮/১০ পর্বের মহাপয়ার বা দীর্ঘ পয়ারের পংক্তিতে এ কবিতার ভাষা এমন এক প্রসন্ন গভীরতা ও বিলম্বিত ভঙ্গির অনায়াস মসৃণতা অর্জন করেছে যে, তা বলবার নয়। স্বেচ্ছাকৃতভাবে কবি ভাষাকে একসুরা করে তুলেছেন, এ আপাত একঘেয়েমি আসলে কবির মনোগত অভিপ্রায়ের কারণে। তিনি তাঁর কবিতার বাইরের চেহারাটাকে কৃত্রিম আড়ম্বরে-ঐশ্বর্যে-উৎসাহে ভারাক্রান্ত করতে চাননি। বিংশ শতকীয় কবিতায় এ রীতিটাই বার বার এসে গেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (প্রথম খণ্ড)
The Genius of the Place : Ed. by John Dixon Hunt and Peter Wills.
জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ; দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র—জীবনানন্দ দাশ; আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত।
A Poet Apart : Clinton B Seely
The Penguin Book of French Verse.
German Poetry 1910-1975, ed. by Michael Hamburgher
Mango : R. N. Sing, ICAR
The Wealth of India : Birds, CSIR
বাংলায় ভ্রমণ—২য় খণ্ড, ১৯৪০ সংস্করণ
আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব : মঞ্জুভাষ মিত্র
Petrarch's Lyric Poems : Translated by Robert M Durling
The Works of John Keats
The Romantic Agony : Mario Praz

বনলতা সেন

আবুল হোসেন

আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশই প্রধান ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে আলোচনা সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক সব মহলেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মফস্বলবাসী এবং স্বভাবতই নিঃসঙ্গ বলেই তাঁর এ বদনসিব কি না জানি না, মনে হয়, আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান গতিপথ থেকে তাঁর অসঙ্কুচিত নিঃশব্দ পলায়ন-ই এ অবহেলার মূলে। অথচ এ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে যে নতুন কাব্যধারার প্রবর্তন এবং রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা, জীবনানন্দ তাঁর একজন প্রধান, অক্লান্ত অথচ নির্জন কর্মী। তবু আজকালকার সমালোচকের মুখে তাঁর নাম আরো ঘন ঘন শুনি না। তার কারণ, জীবনানন্দ দাশের কবিতা একান্তরূপেই একটি বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গির প্রতীক, কোনো নতুন ভাবধারা অথবা নবাবিষ্কৃত আঙ্গিকের বিদ্রোহী বাহন নয়। কিন্তু চরম ও পরম বিশ্লেষণে যে কোনো সাহিত্য প্রচেষ্টা, বিশেষরূপে কবিতা-রচনা, একটি মানসিক ভঙ্গি ও তার সার্থক রূপায়ণ ছাড়া আর কী হতে পারে? এবং যে কবি একটি সম্পূর্ণ নতুন চেতনিক রাজ্যে ছত্রপতি, তাঁর বিবক্ষার ও বক্তব্যের আঙ্গিক যে স্বতন্ত্র হবে, সে তো স্বতঃসিদ্ধ।

জীবনানন্দ দাশের কাব্য-বিচার কঠিন, নানা কারণে। রবীন্দ্র-বিদ্রোহী হয়েও তিনি একান্তরূপেই রোমান্টিক, এমন কি তাঁর অনেক রচনাই নজরুলীয় পুনরুক্তিপূর্ণ। একজন সমালোচক একবার লিখেছিলেন, জীবনানন্দ-ই বাংলার সেরা প্রতীকী কবি এবং প্রতীকীবাদ বলতে মোটামুটি যদি এই বুঝায় যে, তা উপমা তুলনা অলঙ্কার অনুষঙ্গের আবর্তে পাঠকের মনে এমন এক রকমের মোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা, যার প্রধানতম গুণ কেবল একটি সুর, তাহলে একথা অনস্বীকার্য। অথচ কে না দেখেছে তাঁর কবিতা আর যা-ই হোক, প্রতীকীবাদসুলভ বাহুল্য বর্জিত নয়। বক্তব্যকে ঘনীভূত করার জন্য তিনি প্রতীক ব্যবহার করেন না, বরং একটি কথায় প্রকাশ করা যায়, এমন যে ভাব, তাকেও তিনি প্রায়-ই কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ছবি কি চিন্তার মধ্য দিয়ে জাহির করেন। 'ইয়ার্ন' শব্দটির সঙ্গে নাকি 'টেল' কথাটির কী রকম যোগসূত্র আছে। সেই বিচারে অন্নদাশঙ্কর বলেছেন, প্রথম চৌধুরী আমাদের সেরা গল্পবাগীশ। কাব্যের মজলিশে চৌধুরী মহাশয়ের সেরা কাউন্টারপার্ট জীবনানন্দ দাশ।

স্বভাবতই সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার বিদ্রোহ যে দ্বিতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, সেই সাম্যবাদী দৃষ্টিও তাঁর নেই। শুধু 'বনলতা সেন'ই নয়, জীবনানন্দ রাজনৈতিক কবিতা যদি লিখেই থাকেন, তাহলেও তাদের সংখ্যা এককের অঙ্ক ছাড়িয়ে যাবে না।

রেখা, রং, আর চেতনার কোন্ এক অচেনা-অজানা রাজ্যের একটি উদাস করুণ প্রশান্ত সুর, এই তো জীবনানন্দের কবিতা। স্বভাবতই তাঁর বেশিরভাগ রচনা প্রকৃতি-বিষয়ে, এমন কি নিছক প্রেমের কবিতার মধ্যেও তাঁর প্রাকৃতিক প্রলেপ আমাদের বিস্মিত প্রশংসা কাড়ে। হাক্সলী সাহেবের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়, প্রকৃতির মধ্যে একটি স্বাভাবিক কোমলতা আছে, মধ্যযুগীয় ফিউডাল সমাজ যার সন্ধান রাখতো। জীবনানন্দের বিশিষ্টতা এ প্রকৃতিময় স্টাইলে, এবং কোন্ কবিই না অনুভব করেছেন, পয়ারের দীর্ঘ চরণগুলি যুক্তাক্ষর বর্জিত হলে এমন টেনে টেনে চলে যে, ভাষার এক রকমের নরম অবসন্ন চাল আসে। আসলে একই-সুরে-বাঁধা শব্দ সংযোজিত পয়ার একান্তরূপেই কৃষি-যুগের ছন্দ। এবং জীবনানন্দ মনে-প্রাণে মফস্বলবাসী, কেবল সশরীরে নয়; তাঁর কাব্যে তাই পয়ারের ছড়াছড়ি।

কিন্তু এ কবির কাব্যের প্রাণ হলো তার অদ্ভুত মিশ্রণে : অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, পুরনোর সঙ্গে নতুনের, অসম্ভবে-সম্ভবে, অবিশ্বাস্যে-বিশ্বাস্যে, গ্রামের সঙ্গে নগরের অপূর্ব সংযোজনে। বিদিশা, শ্রাবস্তী আর সিংহল সমুদ্রতীর ছেড়ে যেই এসে দেখি 'নাটোরের বনলতা সেন' তার পাখির নীড়ের মতো চোখ মেলে বলে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন', আকস্মিক বিস্ময়ের বিদ্যুৎস্পর্শে আমরাও শিহরিত হই। এতো দূর আর এতো কাছে, এই মিলিয়ে জীবনানন্দের টেকনিক।

জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে-র মতো সুন্দর পঙ্ক্তিপ্রধান কবি। তাঁর এক-একটি উপমাই একটি কবিতার স্বাদ আনে এবং সে উপমা বেশিরভাগ সময়েই বক্তব্য স্বচ্ছ ও অর্থকরী করার জন্য ব্যবহৃত হয় না, কেবলমাত্র একটি আবহাওয়া সৃষ্টিই তাদের উদ্দেশ্য। স্বভাবতই রচনা মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। একটি ভাবের সঙ্গে অপর একটি বক্তব্যের সুদূরতম যোগসূত্র আবিষ্কারও দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ পাঠক অন্ধকার দেখতে পারেন, জীবনানন্দ এলিওটের উদ্ধৃতি তুলে বলবেন, কবিতার জন্যই কবিতা।

জীবনানন্দ দাশের বহুল আলোচিত কবিতাগ্রন্থ 'বনলতা সেন' বিষয়ে এ আলোচনাটি ছাপা হয়েছিল 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ১৯৪৯ সালের চৈত্র সংখ্যায়। ধারণা করা হয়, 'বনলতা সেন'-এর এটি প্রথম গ্রন্থসমালোচনা।

জীবনানন্দ দাশ : 'বনলতা সেন'

'বুদ্ধদেব বসু'

আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, এবং গেল দশ বছর যেসব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে, তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি কবিতা লেখেন, এবং কবিতা ছাড়া আর-কিছু লেখেন না; তার ওপর তিনি স্বভাবলাজুক ও মফস্বলবাসী; এসব কারণে আমাদের সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে তিনি সম্প্রতি যেন খানিকটা দূরে সরে গিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের অনেক আলোচনা আমার চোখে পড়েছে, যাতে জীবনানন্দ দাশের উল্লেখমাত্র নেই। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০-পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা হতেই পারে না। কেননা, এ সময়কার তিনি একজন প্রধান কবিকর্মী। আমাদের পরিপূর্ণ অভিনিবেশ তাঁর প্রাপ্য।

কবি-জীবনের একেবারে প্রথম অধ্যায়ে জীবনানন্দর রচনা ছিল সত্যেন্দ্র দত্ত-নজরুল ইসলামের আমেজ-লাগা, কিন্তু বছর সাতেক আগে তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যখন প্রকাশিত হলো, তখনই আমরা নিঃসংশয়ে জানলুম তাঁর অনন্যতা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে আমরা যে-কবিকে পেলুম, তিনি সুদূর, স্বপ্নাবিষ্ট; তাঁর মনোলোক যেন একটি ধূসর কোমল পরিমণ্ডল, যেখানে যাকে বাস্তব বলি তার আভাস মাত্র নেই, কিন্তু সত্য বলে যাকে অনুভব করি তার রঙিন ছায়া পড়েছে। সেই তাঁর নিজস্ব জগৎ—একান্তই তাঁর—দূর থেকে যাকে মনে হয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলংকরণে অত্যন্ত বেশি আচ্ছন্ন; স্বপ্নের আত্মচালনায় অত্যন্ত বেশি মসৃণ, কিন্তু যার ভেতরে একবার প্রবেশ করলে সহজেই নিশ্বাস নেয়া যায়, সহজেই বিশ্বাস করা যায়। রূপকথার জগতের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনানন্দর কবিতার যেটি সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বলে আমার মনে, হয় সেটি একটি সুর, আর-কিছু না। তার বর্ণনা কেমন করে করবো?

সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!

তাঁর কবিতা নিয়ে বসলেই তাঁর এ লাইনটি আমার মনে পড়ে। একটি সুর—জলের মতো, হাওয়ার মতো ঘুরে-ঘুরে অনেক দূর থেকে কানে এসে লাগছে। মন বাধ্য হয় কান পেতে শুনতে, নিজের অজান্তেই আমরা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করি। কবিত্ব কি এ সুর ছাড়া আর-কিছু?

জীবনানন্দের কবিতার সুর একবার কানে লাগলে তাকে যে ভোলা শক্ত, তার প্রমাণ এই যে, সাধারণ পাঠক-সমাজে তাঁর খ্যাতি যে-অনুপাতে কম, সে-অনুপাতে তাঁর অনুকারকের সংখ্যা আশ্চর্য রকম বেশি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এমন একটি স্বাদ, এমন একটি সৌরভ আমরা পেয়েছিলাম, যা তার আগে বাংলা সাহিত্যে আমাদের জানা ছিল না। তা যেন অনেক দূরদেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশবিহারী কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে পদে অপ্রত্যাশিত। ঠিক এসব লক্ষণ 'বনলতা সেনে'ও দেখতে পাচ্ছি। যদিও চার আনা দামের চটি বই, এবং এগারোটি মাত্র কবিতা এতে আছে, তবু এটি আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। এ এগারোটি কবিতাই জীবনানন্দীয় প্রতিভায় দীপ্যমান। 'বনলতা সেন' কিংবা 'হায়, চিল'-এর মতো নিখুঁত গীতিকবিতা সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে অল্পই আছে। 'হাওয়ার রাত', 'নগ্ন নির্জন হাত' ও 'শিকার'—এ তিনটি কবিতা সুস্পষ্ট আশ্চর্য স্বপ্নের মতো আমাদের সমস্ত মন অধিকার করে—তার জন্য ভাবতে হয় না, চেষ্টা করতে হয় না বরং তার সম্মোহন কাটিয়ে ওঠার জন্যই চেষ্টা করতে হয়। ছোট্ট 'ঘাস' কবিতাটিতে যেন সমুদ্রের ঢেউ ছিটকে এসে পড়েছে—তার পেছনে দিগন্তব্যাপী অসীম জলরাশির যে-ইতিহাস, তাকে সে ভোলেনি। 'বিড়াল' কবিতাটি অদ্ভুতরসে ভরপুর; বিস্ময়করকে চরমে টেনে নিলে কী দাঁড়ায়, এটি তার-ই উদাহরণ। রুচিভেদে এ-কবিতা কারো-কারো হয়তো ভালো লাগবে না, কিন্তু একে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

জীবনানন্দ সম্বন্ধে এ কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তিনি আজকের দিনেও কবিত্ব করতে ভয় পান না। তাঁর এ নির্লজ্জ ও নির্জলা কবিত্বকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি। এটি আমাদের সাহিত্যের একটি সম্পদ। তাঁর কবিত্বের বিশেষ একটি প্রকৃতি আছে, তার সঙ্গে প্রত্যেক পাঠককে প্রত্যক্ষ পরিচয় করতে আমন্ত্রণ করি। তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করা কঠিন নয়। পাঠকের কাছে তাঁর একটি মাত্র দাবি : সেটি এই যে, তিনি চোখ খোলা রাখবেন। কেননা, জীবনানন্দের জগৎ প্রায় সম্পূর্ণরূপে চোখে দেখার জগৎ। তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল—এটুকু বললেই জীবনানন্দের কবিতার জাত চিনিয়ে দেয়া সম্ভব হতে পারে। বর্ণনাকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দেবার বাহন তাঁর উপমা। উপমার এমন ছড়াছড়ি আজকালকার কোনো কবিতেই দেখা যায় না। তাঁর উপমা উজ্জ্বল জটিল ও দূরগন্ধবহ। এক-একটি উপমাই এক-একটি ছোটো কবিতা হতে পারতো। তিনি যে-জাতের কবি, তাতে উপমাবিলাসী না-হয়ে তাঁর উপায় নেই, অর্থাৎ উপমা তাঁর কাব্যের কারুকার্য মাত্র নয়, উপমাতেই তাঁর কাব্য। মনে পড়ে, বহুকাল পূর্বে জীবনানন্দ একবার কোনো-এক পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'উপমাই কবিত্ব'। কথাটা তখন থেকে আমার মনে গেঁথে আছে। উপমাই কবিত্ব—এ-কথাটাকে, কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, মেনে নেয়া অসম্ভব হয় না। অবশ্য উপমা কথাটাকে এখানে খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হয়—ভাষায় কবির যেটা নিজস্ব ব্যঞ্জনা—কোনো অভিনব বিশেষণ, কিংবা কোনো পুরনো বিশেষণের স্বকীয় ব্যবহার, এমনকি কোনো বিশেষ্যপদের প্রতীকী প্রয়োগ—এ সমস্তই কি মূলত উপমা নয়? এ

অর্থ-স্বীকার করে নিলে বলা যায়, উপমা পরীক্ষা করলেই একজন কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। জীবনানন্দ যখন বলেন—

> বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
> পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন—

তখনই বুঝতে পারি, তাঁর মন কীভাবে কাজ করছে। নাটোরের বনলতা সেনের যে-চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ— এ-সমস্তই যে কোনো সর্বদেশকালব্যাপী ভাবের চিত্রকল্প, তা অনুভব করলেই আমরা কবিতাটির মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারবো। আবার যখন পড়ি—

> এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
> মাথার ওপর মশারি নেই আমার,
> স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে সাদা বকের মতো উড়ছে সে—

তখন কবির নিছক কল্পনাশক্তি আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু এ মদির কল্পনা থেকে ফুটে ওঠে দৃঢ় রেখার উজ্জ্বল রঙের ছবির মিছিল—'নগ্ন নির্জন হাত' পুরো কবিতাটি তা-ই। শুধু শেষ কটি লাইন উদ্ধৃত করি :

> পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
> রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
> তোমার নগ্ন নির্জন হাত;
> তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

সমস্ত কবিতাটি একসঙ্গে না-পড়লে শেষ পংক্তিটির (কিংবা ছবিটির) আশ্চর্য আলোড়ন অনুভব করা যাবে না, কিন্তু, 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদে' দৃষ্টি ও স্পর্শের যে-বিবাহ ঘটেছে, তার আনন্দে আমাদের মন অনেকক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলিত হতে থাকে। 'নগ্ন নির্জন হাত' চিত্রটি যেন একটি Still Life, শুধু ঐ হাতখানা তাকে মানবিক ব্যাকুলতায় স্পন্দিত করে তুলেছে। আবার কখনো দেখি, এক-একটি চিত্ররূপ থেকেই আবেগের আঘাত উৎসারিত :

> হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
> দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
> মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের
> চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
> জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়!
> পর-পর চারটি বিশেষণ; কিন্তু চারটিই সার্থক।

জীবনানন্দের সমগ্র রচনায় একটি বিষণ্ন গাম্ভীর্য পরিব্যাপ্ত। তাতে বৈচিত্র্য নেই, না বিষয়ের, না কলাকৌশলের। তাঁর সমস্ত কবিতাই কোনো-না-কোনো অর্থে প্রকৃতির কবিতা; পয়ার ছাড়া অন্য-কোনো ছন্দও এ-পর্যন্ত তাঁকে ব্যবহার করতে দেখিনি।

অবশ্য গদ্য-কবিতা তিনি অনেক লিখেছেন—এবং গদ্য-কবিতায় তাঁর কৃতিত্ব আমি অসামান্য বলে মনে করি। পয়ারেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট—কিন্তু সেটা অনুভব করবার, বিশ্লেষণ করবার নয়। কেননা, সে-বৈশিষ্ট্যের নির্ভর আঙ্গিক অভিনবত্ব নয়, তাঁর নির্জন বিষণ্ন কবি-প্রাণেরই ক্ষরণ বলা যায় সেটাকে। আবার বলি, তিনি আমাদের নির্জনতম কবি। আধুনিক বাংলা কাব্যের নানা ঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে যে স্পর্শমাত্র করেনি, এটাকে নিন্দে করে বলা যায়, তিনি আত্মকেন্দ্রিক; প্রশংসা করে বলা যায়, তিনি আত্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান। আমাদের অভ্যস্ত, পরিচিত সাংসারিক জীবনের মধ্যে সেই-যে একজন চিরকালের কবিকে মাঝে-মাঝে আমরা দেখতে পাই, যার দেশ নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই, মানুষের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সভ্যতার সমস্ত উত্থান-পতন পার হয়ে যার সুর আজকের মতো কোনো-এক বসন্ত প্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে আঘাত করে, আর মুহূর্তে উচ্চনিনাদী প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়—সেই নামহারা ক্ষণস্থায়ীকে কিছু সময়ের জন্য যেন কাছে পেলুম 'বনলতা সেন' বইটিতে।

'সাতটি তারার তিমির'

অশোক মিত্র

রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে বাংলা কবিতায় নতুন নিক্বণ দিতে তখন যে-নবসূরিরা অগ্রসর হয়েছিলেন, আমাদের কিশোরকল্পনাকে মুগ্ধ করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই, কিন্তু অভিভূত করেছিলেন সম্ভবত মাত্র দু'জন : জীবনানন্দ দাশ এবং সমর সেন। শেষোক্তজন আমাদের মনোহরণ করেছিলেন বোধ হয় তাঁর নির্দয়তা দিয়ে : অপর পক্ষে জীবনানন্দের নিজস্বতা ছিল এক আদিম অদ্ভুত হার্দ্যতা।

ভুলতে পারবো না, 'মৃত্যুর আগে' বা 'বনলতা সেন' প্রথম পড়ার অনুভূতি। ভুলতে পারবো না অশ্বত্থের উপদেশ, কবেবার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ। আজো হৃদয়ে শিহরণ তোলে ঘাইহরিণীর ডাক, হিজল বন, মালাবার পাহাড়ের কিনার, বসন্তের রাত্রির আকাশে পাখিদের কথা পরস্পর, ধানসিঁড়ি নদীর পাশে সোনালি-ডানা চিলের উতলা-করা কান্না, লাশকাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা পুরুষের রক্তের ক্রীড়মান বিপন্ন বিস্ময়, সন্ধ্যার নক্ষত্রের কাছে শান্তির রেখানুসন্ধান : জীবনানন্দীয় পৃথিবীর সঞ্চিত অভিজ্ঞান আমাদের শিরায়-উপশিরায় চাতুর্য নেই, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মৃদু-নিস্তেজ শব্দরাজিতে শুধু পরস্পর স্থাপন করে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মনোনিবেশ ঘটানো মাত্র আপাত-অবহেলায় বিন্যস্ত এ শব্দরাজির অভিভাবেই বিস্মিত হতে হয়। দেখা যায় ধূসরিমার ব্যঞ্জনা, সরলতার বিস্তারেই হৃদয়ের অনুলিখন।

সেই যে জীবনানন্দ তাঁর জাদু দিয়ে আমাদের আচ্ছন্ন করলেন, তার ঘোর কখনোই কাটলো না। জীবনানন্দীয় আবহ-সত্তাকে আত্মসাৎ করা অসম্ভব, কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত প্রতীক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, এমনকি মাঝে মাঝে বাক্যাংশ পর্যন্ত পরবর্তীদের কাব্যোদ্যমে লক্ষণীয় : এক দিক থেকে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের প্রতিষ্ঠাবান পুরুষদের মধ্যে তাঁর এবং সমর সেনের প্রভাব-ই বোধ হয় ব্যাপ্ততম।

'সাতটি তারার তিমির' জীবনানন্দের সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ। দশ বছর আগেকার প্রগাঢ় বিহ্বল অনুভূতির স্মৃতিচারণে এখনো আমি অস্থির হয়ে উঠি, এবং স্বভাবতই তাঁর কবিতা পরিশুদ্ধ মুগ্ধতা নিয়েই পাঠ করা আমার প্রয়াস। সুতরাং তাঁর এ নতুন কাব্যগ্রন্থের চরিত্রলক্ষণাদি সম্বন্ধে যদি নিজের কয়েকটি উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসাকে ব্যক্ত করি, সে-উৎকণ্ঠার সংস্থান আমার আন্তরিকতাতেই।

জীবনানন্দের কাব্য, মনে হচ্ছে, কোনো নবতর আত্মাকে আহ্বান-প্রবৃত্ত। বিগত পাঁচ-ছ' বছর ধরে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তাঁর যেসব কবিতা প্রকাশিত হয়ে আসছে,

তাদের অনুধাবনেই অবশ্য ধরা পড়েছিল যে, পায়ের নিচের ঘাস সরে যাচ্ছে। 'বনলতা সেন" এবং তার পূর্বে ও পরেও কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর কাব্যে পর্যাপ্ত অর্থনির্মলতা ছিল। সে-প্রসাদ ইদানীং লুপ্যমান; তাঁর কাব্যগঠনে আজকাল প্রায়ই এক বিপজ্জনক দুরূহতা লক্ষ্য করি। 'সাতটি তারার তিমিরে''র অনেক কবিতার-ই অন্তর্ব্যঞ্জনার সঙ্গে, কিছুটা আত্মকরুণা নিয়েই বলছি, বার-বার নিজেকে সমন্বিত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পরিশ্রম প্রতিবার-ই পণ্ডশ্রম। প্রতীকে, শব্দযোজনায়, বাক্যপ্রয়োগে বহুলতই নিজের পুনরুচ্চারণ এখানে তিনি করেছেন, এবং পুনরুক্তিতে কোনো অর্থের ব্যাপ্তি নিশ্চয়ই তাঁর অভিপ্রেত, কিন্তু সে-অর্থ, দুঃখের বিষয়, কোনো আপাতদার্শনিক সন্ধ্যাভাষায় আচ্ছন্ন। ফলত, যা ছিল তাঁর মোহিনী কুয়াশা, এখানে তা অস্বস্তিকর ধূম্রজালের মতো মনে হয়। পংক্তির অব্যবধান সত্ত্বেও চিন্তা বহুবিচ্ছিন্ন, এমনকি কোথাও কোথাও বাক্যরচনাও দুর্বল। কী বলতে চাইছেন, চিত্তের কোন্ বিভঙ্গের প্রতি বর্তমানে তাঁর পক্ষপাত, কোন প্রতীকিতার অনুজ্ঞা এখন তাঁর মান্য, এসব প্রশ্ন অন্ধ আক্ষেপে মাথা খুঁড়ে মরে।

কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণপন্থী হবার চেষ্টা করছি : জীবনানন্দ আদি অনুভূতির কবি, হৃদয়-বেদনার ধূসর পদপাতেই তাঁর কাব্যের স্পন্দন। কখনো বিস্মিত শিশুর দৃষ্টি নিয়ে, কখনো ক্লান্ত পথিকের নিষ্পাপ স্পষ্টতা, এক সহজ নির্ভঙ্গিমা, এবং এ শেষোক্ত গুণ তাঁর কাব্যের প্রভাব-ক্রিয়ার মৌল হেতু। কিন্তু 'সাতটি তারার তিমিরে' বিশুদ্ধ হৃদয়োচ্চারণ স্তব্ধপ্রায়। পক্ষান্তরে, জীবনানন্দ মননমুখাপেক্ষী হয়েছেন, কোনো আত্মদর্শনের জটিলতায় জড়িয়েছেন। এ দর্শনাশ্রয়ের ফলেই, মনে হয়, তাঁর ভাষণে বক্রতা এবং সেই সঙ্গে প্রসাদের অভাব এসেছে। আবেগের সঙ্গে মননের প্রকৃত সমন্বয় ঘটাতে পারলে কথাই ছিল না, কিন্তু স্পষ্টতই সেই—সঙ্গম কাহিনী এখানে শোকান্তিকা। অনেক ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থের কবিতা রূপ নিয়েছে নিছক দার্শনিকতায় এবং সে দর্শনও অবোধ্য। বুদ্ধদেব বসুর মতে, জীবনানন্দের আত্মস্খলনের কারণ তাঁর সাম্প্রতিক তৎকাল্যপ্রবণতা। আমার তো মনে হয়, এ প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান প্রধান তথ্যের মধ্যেই বিধৃত : মননমুখিতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত তাঁর আদ্যতনিক অতিচেতনা।

কিন্তু সৌভাগ্যত, 'সাতটি তারার তিমিরে' স্মরণীয় কবিতার সংখ্যাও তুচ্ছ নয়। প্রাক-পরিবর্তন পর্যায়ের যে-ক'টি কবিতা গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত, তার অধিকাংশই উৎকৃষ্ট। বিশেষ করে প্রথম কবিতা 'আকাশলীনা' একটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছগীতল জীবনানন্দীয় মূর্চ্ছনা :

> সুরঞ্জনা, অইখানে যেও নাক' তুমি
> বোলো নাক' কথা অই যুবকের সাথে;
> ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
> নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;

তিন মাত্রার প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বেশ কয়েক জায়গায় পয়ারের গঠনে শিথিলতা চোখে পড়লো। বিশেষ করে যুগ্মধ্বনির ব্যবহারে জীবনানন্দ অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী, ফল সর্বত্র ভালো হয় না; এবং তাছাড়াও কোনো কোনো পংক্তিতে রীতিমতোই হোঁচট খেতে হয় :

অনেক ঘুরেছি আমি, তারপর এখানে বাদামি মলয়ালী (পৃ—৪), যেসব যুবারা সিংহীগর্ভে জন্মে পেয়েছিল কৌটিল্যের সংযম (পৃ—১১), না জেনে কৃষক চোত-চোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে পড়ে (পৃ.—২৯), যুগান্তের ইতিহাস,—তবু মানুষের চরিত্র সংহত হয় না কি? (পৃ—৬৫), মিশে গেলো পরস্পরের কায়ক্লেশে (পৃ ৪০)।

আশঙ্কা করি, এর কোনো কোনোটি নিঃসংশয়েই ছন্দ-পতন—না কি ছাপার ভুল?

উপসংহারে এ কথা না বলে পারছি না যে, বইয়ের অপরূপ নামের আক্ষরিক অর্থ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় প্রচ্ছদটি সুবৃহৎ নক্ষত্রে খচিত, আর তাদের ঘিরে এক তীক্ষ্ণ নীলিমা বিরাজমান। কিন্তু জীবনানন্দের নীলিমাও তো ততো উজ্জ্বল নয়।

জীবনানন্দ দাশের বরিশালপর্ব

মূল : ক্লিনটন বুথ সিলি

অনুবাদ : ফারুক মঈনউদ্দীন

ত্রিশ দশকের প্রথমার্ধে জীবনানন্দ নববিবাহিত এবং বেকার অবস্থায় বরিশাল প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৩৫-এর আগে তিনি তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার সর্ববৃহৎ কলেজ বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের ইংরেজি বিভাগে পুনরায় আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষকতা শুরু করেননি। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় 'ঝরা পালক'। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে, যদিও এ গ্রন্থের প্রায় সব কবিতা ১৯৩০-এর মধ্যে পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়ে গেছে।

এ দুই গ্রন্থের মাঝখানে বহু কবিতা এবং গল্প রচনা করেন, কিন্তু ছাপতে দেননি সেসব, এমনকি একটা শিরোনামহীন অসমাপ্ত উপন্যাসও লিখেছিলেন তিনি ১৯৩৩ সালে। এসব গদ্য প্রকাশের পর জীবনানন্দের বাস্তব, ভাষারীতিসিদ্ধ কথ্য বাংলা এবং জীবন-ঘনিষ্ঠ, বিশ্বাসযোগ্য ভুবন আবিষ্কার করার ক্ষমতার—যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে আত্মজীবনীমূলক চরিত্রের সূক্ষ্ম আভার উপস্থিতিসমৃদ্ধ—এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়।

১৯৩০-এর ছোটগল্প-প্রধান গদ্য লেখার শুরুটা জীবনানন্দের জীবনের বড় ধরনের একটা পরিবর্তনের সময়ের সাথে মিলে যায়। তাঁর বয়স যখন ত্রিশের কোঠায়, তখন তাঁর জীবন যাপন আরেকজন মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, যিনি তাঁর মতো নন—তরুণী, অপরূপা সুন্দরী এবং তাঁর সদ্য পরিচিতা প্রাণবন্ত এক রমণী, যাঁকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। এক দশকেরও বেশি সময়ের ব্যস্ত জীবনের পর (প্রথমে ছাত্রাবস্থায় কলকাতায়, তারপর শিক্ষক হিসেবে কলকাতা, বাগেরহাট এবং দিল্লিতে) বরিশালে ফিরে মনোযোগ দেয়ার মতো এবং সার্বক্ষণিক লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকার মতো একটা পারিবারিক জীবন লাভ করেন তিনি। ১৯৩৫ সালে কলেজের শিক্ষকতা শুরু করে ১৯৪৬ সালে আবার সেই পেশা ছেড়ে দিয়ে (স্থায়িভাবে, তেমনটিই ভেবেছিলেন তিনি, যদিও শেষ পর্যন্ত সেভাবে ঘটেনি), এমনকি তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে সাংবাদিকতা করে পুনরায় কলকাতায় বসবাস করার অদ্ভুত খেয়াল চাপে ওঁর। কিন্তু তাঁর জীবনের এ সন্ধিক্ষণে জীবনানন্দের বাস্তব এবং উপমিত ভুবন বোধ হয় একীভূত হয়ে যায়। কারণ, তাঁর গল্পে যে আনন্তর্য এবং ঋজুতা ছিল, তাঁর বহু কবিতা সেখানে পৌঁছতে পারেনি।

ততোদিনে প্রকাশিত তাঁর পাঁচটা ছোটগল্প এবং তিনটা উপন্যাসের মধ্যে একটা ছাড়া বাকি সবগুলো লেখা হয় প্রমিত চলিত ভাষায়। অসাধারণভাবে আত্মপ্রবণ স্বভাবের সঙ্কর বাঙালিদের কেউই জীবনানন্দের গদ্যে কবিতার উপস্থিতি পাননি। গদ্যগুলো গল্প হলেও বাস্তব জগতের ভাষায় বর্ণিত বাস্তব চিন্তাপ্রসূত। সংলাপে রয়েছে অকৃত্রিমতার ছোঁয়া, কথোপকথন সপ্রতিভ স্বাভাবিক গতিতে প্রবহমান। শব্দভাণ্ডার বিস্তৃত, বিশাল এবং তীক্ষ্ণ। এক কথায়, একটা বাস্তব মানবীয় পরিবেশকে জীবন্তভাবে চিত্রিত করার জন্য জীবনানন্দের ছিল গল্পের ভাষার ওপর পূর্ণ দখল—এটা তাঁর কাব্যভাষা এবং কাব্যক্ষেত্রের বিপরীতে, যার বেশিরভাগ-ই অদ্যাবধি গতানুগতিক দৈনন্দিন জগতের বাইরে পড়ে আছে।

তাঁর গল্পে যা প্রতিভাত হয়, সেটা প্রাথমিকভাবে বর্ণিত হয় সাধারণত কলকাতা অথবা বরিশালের সঙ্গে তুলনীয় কোনো মফস্বল শহরের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। যেসব বিষয় তাদেরকে ভাবিত করে, সেসব প্রায়-ই আবর্তিত হয় প্রতিদানহীন ভালোবাসা কিংবা কোনো ক্ষেত্রে এক মুখ্যচরিত্রের সঙ্গে অন্যের অপূরণীয় বিবাহকে কেন্দ্র করে। কবিতায় জীবনানন্দ বারংবার কথককে আক্রান্ত পক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ করান 'তোমার শরীর/তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;—তাঁরপর, মানুষের ভিড়/রাত্রি আর দিন/তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানি নি তা,—হয়েছে মলিন/চক্ষু এই;—ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি,—পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে/কতো দিন রাত্রি গেছে কেটে!' (১৩৩৩, ধূসর পাণ্ডুলিপি)। কিংবা 'আমারে সে ভালোবাসিয়াছে/আসিয়াছে কাছে/উপেক্ষা সে করেছে আমারে,/ঘৃণা করে চলে গেছে—যখন ডেকেছি বারে বারে/ভালোবেসে তারে;' (বোধ—ধূ. পা.)

গল্পে এভাবে সচরাচর পুরুষই হয় ব্যাভিচারী স্ত্রীর স্বামী এবং কখনো প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংক্ষুব্ধ ভূমিকা পালন করে। (দ্রষ্টব্য গল্প-ছায়ানট) জীবনানন্দের প্রথমদিককার গল্পগুলো শেষ হয় এভাবেই, যেখানে মূল চরিত্র ঘুমের ভান করে, আর তার স্ত্রী এবং বাড়িতে আগত তরুণ ডাক্তার বিয়ের ব্যাপারে মীমাংসায় পৌঁছায়।

বেশিরভাগই কলকাতার পটভূমিতে লেখা জীবনানন্দের গল্প শহুরে এবং গ্রামীণ পরিবেশের জীবনের সংঘাত ধারণ করে আছে। মফস্বল শহরেও রয়েছে কলকাতার মতো স্থূলরুচি স্থায়ী বাসিন্দারা, কিন্তু এসব স্থান এবং বাংলার অগণন গ্রামগুলোর প্রতিবেশের ভেতর রয়েছে চিরন্তন প্রলোভন। ১৯৩০-এর প্রথমদিকের আরেকটা গল্পের সমাপ্তিতে বিবাহিতা শচী অবিবাহিত সোমেনকে প্রস্তাব দিচ্ছে শহরের জনারণ্য থেকে রোমান্টিক জীবনের দিকে পালিয়ে যেতে। গল্প যখন শেষ হয়, বেকার ভবঘুরে সোমেন মধ্য-দুপুরে শচীর সঙ্গে দেখা করে, যখন ওর স্বামী কর্মক্ষেত্রে। এ ইঙ্গিতের পূর্ব পর্যন্ত পাঠকের ধারণা করার কোনো কারণ থাকে না যে, শচী একজন সফল ব্যবসায়ীর স্ত্রীর ভূমিকায় অসুখী। (দ্রষ্টব্য—গ্রাম ও শহরের গল্প)

প্রথমদিকে লেখা জীবনানন্দের একটা গল্প তাঁর অন্যগুলোর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি এটার ভাষাও আলাদা, জীবনানন্দের প্রবন্ধসহ রচনার মধ্যে একমাত্র এটাই সাধু ভাষায় লেখা ('সঙ্গ, নিঃসঙ্গ' নামটা প্রকাশকের দেয়া)। এ গল্পের বিষয়বস্তুও

একইভাবে তাঁর অন্যান্য গল্পের চেয়ে ভিন্ন। এতে রয়েছে কেবল একটা চরিত্র, কথক, যে তিন বছর আগে বিয়ে করা তার স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখছে। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যকার মেলামেশা এটাতে অনুপস্থিত, যার প্রবণতা অন্য গল্পগুলোতে প্রধান। শহরও অনুপস্থিত এটাতে। যদিও নাম দিয়ে পরিচিত করানো হয়নি, তবুও পরিচিত কিছু ল্যান্ডমার্কের উল্লেখ থাকায় এ শহরের সঙ্গে পরিচিত যে কেউ নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন, বরিশাল-ই ছিল পটভূমি। অনামিত মুখ্য চরিত্র আবারো আহত প্রেমকাতর ভূমিকা পালন করে এটিতে, যে চেতনার অভিব্যক্তি জীবনানন্দের কবিতায় বা গদ্যে বিরল নয়। তাঁর গদ্যের অন্য কোথাও যা দেখা যায়নি, সেটা হচ্ছে সেই একক চরিত্রের চারপাশের প্রাকৃতিক জগতের অবিশ্বাস্য প্রাচুর্য, যে অসাধারণ সংবেদনশীল কথক শহরে তার নৈমিত্তিক ঘটনাবিহীন পদচারণায় আর সবার চেয়ে বেশি দেখে এবং অনুভব করে। বাংলার একটা অঞ্চলের আভরণময় বর্ণনাসমৃদ্ধ পত্রাকারে লেখা এ গল্পটি জীবনানন্দের বহু সনেটের পূর্বাভাস দেয় (অথবা হতে পারে সহজ প্রতিফলন ঘটায়, কারণ ওগুলোর কোনো তারিখ ছিল না), যেগুলোর ওপর হয়তো তিনি কাজ করছিলেন তখন। এটির বর্ণনাবহুল আবহ থেকে যেন কবিতা ঝরে পড়ে। (দ্রষ্টব্য—'সঙ্গ, নিঃসঙ্গ')। গল্পটির পাণ্ডুলিপির ওপর জীবনানন্দের স্বহস্তে লিখিত তারিখ—মে, ১৯৩৩। তাঁর এবং লাবণ্যের বিয়ে হয়েছিল তিন বছর আগে এক-ই মাসে। ১৯৩৩ সালে তাঁদের এবং গল্পের পত্রলেখকের বিয়ের তিন বছর পূর্ণ হয়।

এ গল্পের ঐশ্বর্যপূর্ণ কাব্যময় ভাষা, যার ভেতর দিয়ে বরিশালের পরিবেশ অনূদিত হয়েছে শব্দে, তার সঙ্গে ঠিক সে সময় বা বছরখানেক অনূদিত হয়েছে শব্দে, তার সঙ্গে ঠিক সে সময় বা বছরখানেক পরে রচিত তাঁর কবিতার একটা পুরো খণ্ডের ভাষা সাযুজ্যপূর্ণ। তাঁর চল্লিশটিরও বেশি নোটবুক ১৯৩৩ থেকে ১৯৫৪ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত কালপর্বকে ধরে রেখেছে। মার্চ ১৯৩৪ তারিখ সংবলিত এগুলোর একটিতে রয়েছে ষাটটি সনেট এবং অল্প কয়েকটা কবিতা, যেগুলো সনেট আকারে নয়। একটা কবিতার উৎসারিত ভাবের ওপর ভিত্তি করে একটা গ্রন্থ 'রূপসী বাংলা' নামে কবির ভ্রাতার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পর। ৩১ জুলাই ১৯৫৭ তারিখের ভূমিকায় অশোকানন্দ লেখেন, 'পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগ আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলো রচিত হয়েছিল। এসব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল'।

বাংলাদেশকে মহিমান্বিত করে রচিত ৬০টি সনেট পরিবেশের সঙ্গে কবির প্রগাঢ় আবেগপূর্ণ সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। আর বহিরঙ্গে যেটাই বলা হোক না কেন জীবনানন্দের সনেটগুচ্ছ বুদ্ধিজীবীসুলভ রচনা নয়। নাড়িছেঁড়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বক্তব্যের ভেতর দিয়ে এগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কোনো এক রোমান্টিকের শিশুসুলভ হৃদয়ের পুনঃলব্ধ ভালোবাসার কথা। তিনি যখন এরকম উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ করতে নিজে নিজে কথা বলেন, তখন কান পেতে শুনলে বোঝা যেতো, এসব অতিব্যক্তিগত-প্রায় বক্তব্যের জন্য কবি লজ্জায় দগ্ধ হয়ে যেতে পারতেন। এরকম একান্ত চর্চায় জীবনানন্দ পরিপূর্ণভাবে পুনর্যাপন করেন বাংলাকে, প্রাণী-উদ্ভিদ-আকরিক গ্রামবাংলাকে,

নগরবাংলার মানব সমাজকে নয়। 'শঙ্খমালা নাম তার : এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে/তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো—বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,/তাই—সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।' (রূপসী বাংলা—সনেট ২৮)

বিশালাক্ষী আক্ষরিক অর্থে বিশাল চোখের কেউ, যা 'দুর্গা' নামে সমধিক পরিচিতা বাঙালি দেবীকে ইঙ্গিত করে। কবিতাটির সরল স্বীকারোক্তি হচ্ছে : বিশালাক্ষী দেবীর বর পেয়ে সেখানে আমি যাই। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর করুণ এ দেশে জন্ম নিয়েছে এমন সৌভাগ্যবান জীবনানন্দ এবং অন্যান্য সবার প্রতিনিধিত্ব করে রূপকথার রাজকন্যা শঙ্খমালা, যেখানে নদীগুলো জলের দেবতা বরুণ ও তাঁর স্ত্রী বরুণার বাসস্থান বঙ্গোপসাগরে নিঃশেষিত হয়। জীবনানন্দ বিশাল পৃথিবীর অল্পই দেখেছেন, তবে দিল্লিতে থাকার কারণে অল্প কয়েক মাসের জন্য তিনি বাংলার বাইরে ছিলেন। এটাই বোধ হয় তাঁকে তাঁর মফস্বলের বাসভূমির গুণাবলীর যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় করেছিল। বাংলার উদ্ভিদ, পাখ-পাখালি, নদ-নদী সম্পর্কে তাঁর একটা পাঠক মন্ত্রোচ্চারণের মতো করে বাংলাকে মানসপটে তুলে ধরে। পাছে কেউ তাঁর বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করে, তাই জীবনানন্দ অন্যান্য আপাত কাঙ্ক্ষিত স্থানের উল্লেখ করেন, যেগুলো তাঁর মতে, তাঁর প্রিয় বাসভূমির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না।'—আমি কোনোমতে/বাসমতী ধানক্ষেত ছেড়ে দিয়ে মালাবারে—উটির পর্বতে/যাব নাকো—দেখিব না পামগাছ মাথা নাড়ে সমুদ্রের গানে/কোন্ দেশে—কোথায় এলাচিফুল দারুচিনি বারুণীর প্রাণে/বিনুনি খসায়ে বসে থাকিবার স্বপ্ন আনে—।'

মালাবার দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের আরামদায়ক উপকূলীয় অঞ্চল, উটি হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের এক শৈলস্টেশন। এ ধরনের স্টেশন নিদাঘ গ্রীষ্ম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অবকাশ যাপন কেন্দ্র। এরকম কোনো কেন্দ্র অথবা মালাবার উপকূলের পাম গাছে ঢাকা সৈকত, এমনকি এলাচিফুল দারুচিনির মনোরম দেশের সঙ্গে বাংলা এবং তার সুগন্ধী বাসমতী ধানের ক্ষেত্রেব কোনো তুলনা হয় না। নভেম্বরের কোনো এক দিন, বর্ষা শেষ হয়েছে বহুদিন আগে, শুষ্ক ভূমিতল, ইতস্তত ছড়ানো পাতা, দু'-একটা সাধারণ ছোট চড়াই, শূন্য প্রান্তর, চিত্তবিক্ষেপহীন নির্জনতা—এ অবস্থায় কবি আবার স্মরণ করেন, কেন তিনি অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য বাংলাকে পরিত্যাগ করেননি।

বাংলার বিস্ময়কে প্রত্যক্ষ করার জন্য এক জীবনের বিস্তার যথেষ্ট মনে হয় না—এক শরীরী রূপ মনে হয় অপ্রতুল : 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—-এই বাংলায়/হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে....'। পাখির বেশ ধরে অথবা সবুজ কলমির গন্ধমাখা অগণন দিয়ে ধানসিঁড়ির তীরে (বাংলার প্রতীক এখানে, তবে বরিশালের অদূরে বয়ে যাওয়া একটা নদীর নাম) যদি ফিরে আসতেন তিনি। বোধ হয় কোনো এক অনির্দিষ্ট আকারে বাংলাকে কেবল পর্যবেক্ষণ করতেন : বাংলার পাখি, ক্রীড়ামগ্ন, শিশু, রূপসার তরুণ মাঝি—এসব। জীবনানন্দ সম্ভবত ডিঙ্গি দেখে থাকবেন খুলনা এবং বাগেরহাটের ছোট লোকালয়ের মধ্যবর্তী নদীতে, ১৯২৯ সালে সেখানে স্বল্প সময়ের জন্য তিনি শিক্ষকতা করেন।

যদিও বৃক্ষ, প্রাণী এবং নদ-নদীগুলো বাস্তব, অল্পকিছু বাস্তবের মানুষ এসব কবিতায় উপস্থিত—কবির সঙ্গে তাদের মানবিক সম্পর্ক ঘটে কদাচিৎ। যাদের সঙ্গে তার মেলামেশা হয়েছে, তারা 'তুমি' হিসেবে অনামিত রয়ে যায়। এসব চরিত্র, বিশেষ করে রমণীরা রয়ে যায় যথেষ্ট সন্দেহের আড়ালে। এসব সনেটের অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্র, যেমন : বাংলার রূপকথা, লোকগাথা, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক-ঐতিহাসিক চরিত্রের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওরা সব নগণ্য ভূমিকার।

সনেটে সংযুক্ত চম্পা ও বেহুলা উপাখ্যান অভিজ্ঞতার এক ধারাবাহিকতা স্থাপন করে দেখায়, আজ কবি যেভাবে দেখছেন, তারাও সেভাবে বাংলার রূপ প্রত্যক্ষ করেছে। বঙ্গোপসাগর অভিমুখী নদী বেয়ে তার বাণিজ্য-তরী নিয়ে যাওয়ার সময় চাঁদ উপভোগ করেছে বাংলার অপরূপ দৃশ্যাবলী। বিশ্বস্ততা আর সদ্‌গুণের প্রতীক বেহুলাও মৃত স্বামীকে নিয়ে ভাটির দিকে ভেসে যেতে যেতে বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করেছিল।

জীবনানন্দ ইতিহাস এবং পুরাণের চরিত্রদেরও উপস্থাপন করেছেন। যেমন : প্রাচীন বাংলার রাজা বল্লাল সেন, রাজবল্লভ—যার কীর্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কীর্তিনাশা নদীর দ্বারা, মহাভারত থেকে অর্জুন, বুদ্ধ এবং কনফুসিয়াস, মধ্যযুগের স্বনামধন্য বাঙালি কবি মুকুন্দরাম, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ ও রায়গুণাকর (ভারতচন্দ্র রায়); এবং 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন দাস, যার স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রথমদিকে জীবনানন্দ একটা কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর এ গ্রন্থটিতে বাস্তবের, জীবিত মানুষ প্রায় অনুপস্থিত। কারণ, তাঁর বাংলা বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে মানবসমাজ-সৃষ্ট নয়, কেবল স্থির মানবজীবন-সৃষ্ট। লালাভ পায়ের তরুণী, খই ছড়ানোরত শিশু, যুবক মাঝি—এসব মানুষ নদী ও বৃক্ষের মতো প্রাকৃতিক প্রতিবেশের উপাদান হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকে জীবন্ত চিত্রপট তৈরি করে যেন।

সমস্ত জীবন জীবনানন্দ গুটিকয় মানুষ ছাড়া সবার সঙ্গে যোগাযোগ পরিহার করে চলেছেন। মৃত্যু এক ব্যক্তি থেকে আরেকজনকে নিযুক্ত করার একটা উপায়, এ মৃত্যু তাঁর কবিতায় পরিব্যাপ্ত। কিন্তু কেবলমাত্র সনেটগুলো মৃত্যুর আচ্ছন্নতার চেয়েও অধিকতর কিছু প্রকাশ করে। এগুলোর একটিতে কবি মানবজাতিকে বর্জন করে মরণোত্তর রূপান্তরিত হতে চান বাংলার বৃক্ষ ও পাখিতে। অন্যটিতে তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে যাবেন, যদি মৃত্যু নিয়ে যায় তাকে। এখানেই তাঁর সংকট, বাংলার প্রতি সুনিশ্চিত উদ্বেলিত আবেগ এবং মৃত্যুর প্রলোভনের মধ্যকার সংঘাত। এ সংকলনটি কেবলমাত্র নৈসর্গিক কবিতাগুচ্ছের সমষ্টি মাত্র নয়, তারচেয়ে অধিক কিছু—অস্তিত্ববাদী সংশয়ে জীবনানন্দের ভাষ্যের সরল স্বীকারোক্তি।

'রূপসী বাংলা' কিছু পাঠকের কাছে জীবনানন্দের সবচেয়ে সার্থক গ্রন্থ হিসেবে অনুমোদন পেয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ গ্রন্থের কবিতাগুলোকে এদেশের মূল সুরের প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা হতো, যে দেশের জন্য মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছিল। যুদ্ধের নয় মাসের মধ্যে এ গ্রন্থের দু'টো সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কেবল সাধারণ পাঠকগোষ্ঠী নয়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সনেটগুলোকে একইভাবে

মূল্যায়ন করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা কাব্য সংকলনে গৃহীত জীবনানন্দের পাঁচটি কবিতার ভেতর তিনটি 'রূপসী বাংলা' থেকে নেয়া সনেট। যারা কবিতাগুলোর প্রশংসা করেন, তাঁরা সাধারণত এতে গাঙ্গেয় বাংলার প্রাচুর্যপূর্ণ সৌন্দর্যের চিত্রায়নের জন্যই সেটা করে থাকেন।

তবে গ্রন্থটি সর্বসম্মত সমর্থন পায়নি। এ প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনা করেছেন আলোক সরকার, যিনি নিজে একজন কবি এবং জীবনানন্দের কিছু কবিতার প্রকাশকও : 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলোর পাশাপাশি ধরা যাক 'আট বছর আগের একদিন' বা 'বোধ' নামের কবিতাটি, পড়লে আমরা বুঝতে পারি অপরিণত আবেগ, তরল কাব্যময়তা, ছলছল কবিত্ব কবিতার কতো বড় শত্রু।'

যে দু'টো কবিতার কথা আলোক সরকার উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর উৎকর্ষ নিয়ে কেউ বিতর্ক করবেন না। অনুরূপভাবে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে কোনো একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য বিষয়ে জীবনানন্দ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী অনুরাগ এবং মগ্নতা নিঃসারিত করেছেন, যা রসালো চিত্রকল্প ও আবহের আতিশয্যে পাঠককে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। তবে এসব সনেটকে যদি পরাক্রমশালী সৌন্দর্যকে মেনে নিতে সচেষ্ট শক্তিশালী আবেগের মিশ্রণে সৃষ্ট মন্তাজের খণ্ডচিত্র হিসেবে গণ্য করা যায়, তাহলে বিস্ময়কর লোভনীয় জীবনের মুখোমুখি মৃত্যু : এ দুর্বহ সত্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কবির নিষ্ফল সংগ্রামের দৃশ্যমান ইতিহাস হয়ে কবিতাগুলো সামষ্টিকভাবে একটা বাড়তি মাত্রা লাভ করে।

জীবনানন্দ নিজেও সমগ্র কাব্যের সঙ্গে প্রত্যেকটি কবিতার একক সম্পর্ককে চিত্রিত করেছেন, 'এরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী; গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ প্রসৃতির মতো ব্যাষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর।'

মনে হয় এভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যৌক্তিক যে, জীবনানন্দ পরবর্তীকালে কবিতায় ব্যবহার করবেন, এমন কিছুর ওপর কাজ এবং অনুশীলন করছিলেন। জীবনানন্দের বন্ধু, সমর্থক এবং তাঁর একটা গ্রন্থের প্রকাশক সঞ্জয় ভট্টাচার্য যুক্তি দেখান যে, জীবনানন্দ বাস্তব বিশ্বের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন, আর তা একরকমভাবে পুনরুদ্ধার করেন 'রূপসী বাংলা' ও 'বনলতা সেন' গ্রন্থে মূর্ত স্বকৃত কল্পিত ভুবনে। সঞ্জয়ের তত্ত্ব কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক, 'রূপসী বাংলা' আর 'বনলতা সেন-এর সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দু'টো পর্যায়ে উপলব্ধি করা যায়। প্রথমত 'বনলতা সেন'-এ ফলবতী হওয়া যে বীজকে সঞ্জয় নবায়িত বিশ্বাস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা ধারণ করা হয় 'রূপসী বাংলা'য়। বনলতা সেন-এ পাওয়া কবির দু'দণ্ড শান্তির 'বীজ' কেবল 'রূপসী বাংলা'য় অস্তিত্বশীল নয়, সঞ্জয়ের ধারণাকে আরো বিস্তৃত করলে বরং অবস্থান করে বাংলাতেই। বাংলা কবিকে শান্তি দিয়েছে, যেমন দিয়েছিল বনলতা সেন। অতএব বাস্তবের লোকায়ত বাংলা রূপান্তরিত হয় বনলতা সেনে।

দ্বিতীয়ত আরো প্রকরণগত পর্যায়ে 'রূপসী বাংলা'য় অস্তিত্বশীল। সঞ্জয় যাকে বীজ বলেছেন, 'বনলতা সেন'-এ অঙ্কুরিত সেই বীজকে চিত্রকল্প, মোটিফ এবং বিশেষ শব্দ

হিসেবে বিবেচনা করা যায়। 'রূপসী বাংলা'র আবহ সঙ্গীতের মতো 'পৃথিবীর পথে' 'বনলতা সেন'-এ ধ্বনিত হয়। 'ঘাস' শিরোনামে দুটো কবিতা, যার একটি বনলতা সেন গ্রন্থভুক্ত, যেন 'রূপসী বাংলা'র সর্বত্র বিরাজমান একটা উপাদান। জীবনানন্দের প্রথমদিকের প্রিয় পেঁচা তাঁর শব্দসম্ভারে অনুবর্তিত থাকে, যেমন থাকে ইঁদুর আর পেঁচা এক সঙ্গে। শঙ্খমালা, ধানসিঁড়ি, সোনালী বাজ, কমলা রঙ রোদ এবং নগ্ন হাত—এ সবই 'রূপসী বাংলা' এবং পরবর্তী কবিতাগুলোতে উপস্থিত, যার বেশিরভাগ-ই দেখা গেছে 'বনলতা সেন'-এ। 'রূপসী বাংলা' এবং পরের কবিতাগুলোর মধ্যে আরো অনেক যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়। অশোকানন্দ কৃত ভূমিকায় উদ্ধৃত জীবনানন্দের ভাষা অনুযায়ী এ গ্রন্থভুক্ত সনেটগুলোর মধ্যকার যোগাযোগকে সামগ্রিকভাবে ধরলে গ্রামবাংলার একটা ভাষাচিত্র হিসেবে গণ্য করা যায়।

জানুয়ারি ১৯৩২ সালে 'পরিচয়'-এর তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় জীবনানন্দের বিতর্কিত 'ক্যাম্পে' কবিতাটি। লেখা চেয়ে জীবনানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন বিষ্ণু দে। তবুও কবিতাটি যখন পৌছায়, এটা 'পরিচয়'-কর্মীদেরকে এক ধরনের বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। বিশেষ করে 'ঘাই হরিণী'র 'ঘাই' শব্দটা ছিল বিব্রতকর। মূল বক্তব্যে শব্দটাকে বোধগম্য মনে হলেও এটার প্রকৃত অর্থ কেউ-ই জানতো না। প্রাসঙ্গিকভাবে এ শব্দের গূঢ়ার্থের ভেতর নিহিত যৌন উত্তেজনা কবিতাটিকে বিতর্কিত করে তোলে। শব্দটির অর্থ এখনো অযথার্থভাবে বিশ্লেষিত হয়ে আসছে। 'ঘাই' একটা অসমীয়া শব্দ, যা 'অন্য পাখিকে ফাঁদে ফেলার জন্য টোপ হিসেবে ব্যবহৃত পাখি'কে অথবা 'একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ পাখি বা টোপ পাখি'কে বোঝায়। জীবনানন্দ এ টোপের সংজ্ঞাটিকে পুরুষ পাখি থেকে হরিণীতে রূপান্তরিত করেছেন। মনে হয়, এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, যৌনতাই এ টোপের প্রতি প্রলোভন জাগ্রত করে। গ্রীষ্মে হরিণের প্রতি হরিণীর আকর্ষণের মতো জীবনানন্দের কবিতাটিও পাঠকদের কাছে অপ্রতিরোধ্য রকম আকর্ষণীয় প্রমাণিত হয়েছে। 'ঘাই হরিণী' অভিব্যক্তির মতো এক-ই কবিতা মাঝে মাঝে সেই পাঠকদেরকেও হতবুদ্ধি করে ফেলে।

কারো জানা মতে, জীবনানন্দ তাঁর জীবনে কখনোই শিকার অভিযানে যাননি। হরিণ শিকার প্রসঙ্গে তাঁর অন্য একটা কবিতায় (শিকার—বনলতা সেন) তিনি শিকারীর প্রতি তাঁর অসমর্থন প্রকাশ করেন।

অবশ্য 'ক্যাম্পে' আদৌ হরিণ শিকার সম্পর্কিত নয়, বরং মানুষ সম্বন্ধে বিশেষ করে কথক সম্পর্কে এবং মানুষের মধ্যকার সম্বন্ধ সম্পর্কে। কবিতাটিতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, জীবনানন্দের জীবনে এক রমণী ছিল, যে প্রেমিকা তাঁকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ ব্যাপারে দৃঢ়-সমর্থিত জীবনীমূলক তথ্য পাওয়া যায় না, তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বন্ধুদের মতে, বিয়ের আগে বা পরে কারো সঙ্গে প্রেমের মতো সামান্যতম সম্পর্কও তাঁর ছিল না। তথাপি তাঁর আরো বহু কবিতা কোনো এক নারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে, কয়েকটি কোনো এক রমণীর নাম ধরে সম্বোধন করেও লেখা।

এরকম সম্পর্ক সত্যি না হলেও বস্তুত তা উৎসারিত আবেগকে নাকচ করে দেয় না। জীবনানন্দ তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য শিকার, শিকারি এবং প্রলোভনের এক জটিল নমুনা সৃষ্টি করেছেন। গ্রীষ্মে টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হরিণী বনের পুরুষ হরিণকে আমন্ত্রণ করে, তার নিজের বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং হরিণগুলোকে শিকারীর বন্দুকের আওতায় আসতে প্ররোচিত করার জন্য। হরিণী একটা ধ্বংসাত্মক শক্তির পক্ষে ওকালতি করে। তার আবেদন এতো প্রবল যে, হরিণ তাদের প্রাকৃতিক শিকারীদের ভয়ও বিস্মৃত হয়। তারপর বন্দুক গর্জে ওঠে, আর হরিণ শিকার হয় শিকারীর।

'ক্যাম্পে'র পর জীবনানন্দ আর কোনো কবিতা প্রকাশ করেননি, যতোদিন পর্যন্ত না সমর সেনসহ বুদ্ধদেব বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় এ শতাব্দীর সর্বপ্রধান বাংলা কবিতা পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়।

১৯৩৫ সালে ত্রৈমাসিক 'কবিতা' বের হওয়ার পর জীবনানন্দ আবার কবিতা প্রকাশ করা শুরু করেন এবং প্রথম বছরেই তাঁর দশটি কবিতা ছাপা হয়। সে বছর কেবলমাত্র সহযোগী সম্পাদক সমর সেনের প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা তাঁর চেয়ে বেশি ছিল (১৬টি)। ১০টি কবিতা দিয়ে বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের রচনার সঙ্গে সমতা রক্ষা করেন। পরের বছর জীবনানন্দের কবিতার সংখ্যা (১৩টি) বাকি সবার কবিতাকে ছাড়িয়ে যায়, এবং তৃতীয় বছরেও এক-ই ঘটনা ঘটে, যে বছর তাঁর কবিতার সংখ্যা ছিল ১০টি। সে বছর তাঁর 'কবিতার কথা' নামে একটা প্রবন্ধ এবং বুদ্ধদেব বসুর একটি গ্রন্থের (কঙ্কাবতী) আলোচনা প্রকাশিত হয়। স্পষ্টতই জীবনানন্দ আবারো একটা সমঝদার সম্পাদকমণ্ডলী পেয়েছিলেন। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'মৃত্যুর আগে'। (দ্রষ্টব্য : মৃত্যুর আগে—ধূ. পা.)

শেষ দু'টো স্তবক ছাড়া কবিতাটি জীবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সহজ স্মৃতিচারণ। এটা একজন কবির দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করে, আরো নিশ্চিতভাবে বললে, সেই কবি, যার রয়েছে 'অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা' (তাঁর 'কবিতার কথা' প্রবন্ধের বাক্যাংশ), যা তাঁকে দেখায়, 'মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল/কুয়াশায়;...'। সেজন্য তিনি লেখেন—'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি। কবি, কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভেতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে...।' 'আমরা' যারা ভালোবেসেছে, দেখেছে এবং বুঝেছে তারা কবি। কেবল একজন কবিই দেখে 'মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে।' একজন কবিই কেবল বুঝতে পারে 'জীবনের এইসব নিভৃত কুহক'।

কথকের দৃষ্টিতে 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় জীবনের সহজাত সৌন্দর্য উৎসারিত হয় শরৎ শেষের কিংবা শীতের মাসগুলো থেকে, যখন দিনগুলো অন্ধকার, আলোর চাইতে দীর্ঘতর, যখন মাঠের ফসল কাটা শেষ। এ ঋতু কোনোভাবেই তার রুগ্নতাকে উপমিত করে না—বরং ঠিক তার বিপরীত। সে বরং অন্ধকার, কুয়াশা এবং এ সময়ের নির্জনতাকে উপভোগ করে।

কবির শরীরের ধূসরতা তাহলে 'সম্বন্ধের' ধূসরতা ও নূতনতা, যে সম্বন্ধ কবিতা ও জীবনের মধ্যে, সাদা কিংবা কালো নয়, বরং মাঝামাঝি কিছু, চকচকে উজ্জ্বল ও নতুন নয়, তবুও নতুন, এক-ই সঙ্গে নতুন ও পুরনো দু'টোই। কবির দৃষ্টিতে এটা নিশ্চিতভাবে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক এবং বাস্তবের বিশ্লেষণক্ষম উপাদানের চাইতেও অধিক কিছু। তিনি আরো বৃহৎ সমষ্টিকে দেখেন, যাকে মাঠ, ঘাট, পথ—সবকিছুর ধূসরতা ধারণ করে এক 'নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে, যা কাব্য।'

বিকেলের উজ্জ্বলতা কেবল মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে না। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে দৃষ্ট 'অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবন'-এর জগত কাউকে তৃপ্ত করতে পারে না। আমরা সবাই অনুমানসাধ্যভাবে সেটাই দেখতে পাই, যার 'ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে।' কিন্তু কবি আরো বেশি কিছু দেখতে পান। তাঁর পর্যবেক্ষণের এক পর্যায়ে তার 'দেখার হাত, ইন্দ্রিয়জাত প্রবৃত্তি নিয়ে 'পৃথিবীর সমস্ত জল' থেকে 'সমস্ত দীপ' থেকে অন্য ভুবনের দিকে চলে যেতে পারেন।

'কবিতা'র দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয় ১৯৩৬-এর অক্টোবরে প্রকাশিতব্য (বইটি প্রকাশিত হয় ডিসেম্বরে) জীবনানন্দের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র একটা পূর্ণপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনসহ, এটির পরবর্তী সংখ্যাগুলোতেও নতুন গ্রন্থটির আগমন বার্তার ঘোষণা অব্যাহত থাকে।

জীবনানন্দ বরিশালে আচ্ছন্নচিত্ত হয়ে ছিলেন। তাঁর রচনাগুলো প্রকাশের দায়িত্ব বর্তায় বুদ্ধদেবের ওপর যিনি কয়েক বছর আগে ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় থিতু হয়েছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ওপর, প্রকাশক হিসেবে কলকাতার প্রকাশক পুস্তক বিক্রেতা ডি. এম. লাইব্রেরির নাম ছাপা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে জীবনানন্দই ছিলেন প্রকাশক, যেমন ছিলেন তাঁর প্রথম গ্রন্থে এবং পরবর্তীকালেও। প্রকাশক বলতে তিনি শুধু অর্থের যোগান দিয়েছিলেন। প্রেসের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা, প্রুফ সংশোধন করা, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা (অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকৃত, যিনি 'প্রগতি' এবং 'কবিতা' দু'টোর-ই প্রচ্ছদ একেছিলেন)—সব ব্যবস্থা বৃদ্ধদেবকেই করতে হয়েছিল। জীবনানন্দ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' উৎসর্গ করেন বুদ্ধদেবকে, যিনি বাঙালি পাঠকের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করানোর জন্য এতোকিছু করেছেন এবং করছিলেন।

বুদ্ধদেব বলেন, 'ধূসর পাণ্ডুলিপিতে জীবনানন্দ নিজেকে প্রকৃতির কবি হিসেবে প্রমাণ করেছেন।' বুদ্ধদেবের মতে, কেবল একজন বাঙালি কবিকে সত্যিকার প্রকৃতির কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, তিনি জীবনানন্দ দাশ। বুদ্ধদেব যুক্তি দেখান, এমনকি যেসব কবিতাকে প্রেমের কবিতা বলে মনে হয়, সেসব কবিতাও মূলত প্রকৃতির কবিতা। কারণ 'প্রেমের পাত্রী অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই অনেক বড় ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে কবির কল্পনায়।' বুদ্ধদেব বলেন, এ কবিতায় সুদূরতা আর নির্জনতা পরিব্যাপ্ত। সেখানে রয়েছে আমাদের নিজেদের পৃথিবীর বাইরের ভুবনের রূপকথার গল্প, অদ্ভুত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র। বুদ্ধদেব জানান, শব্দ-চিত্রকর হিসেবে জীবনানন্দের রয়েছে অনন্যসাধারণ দক্ষতা, 'তার ওপর কবিতাগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে।' তিনি উপসংহারে মূল্যায়িত করেন, জীবনানন্দকে 'আমি আধুনিক

যুগের একজন প্রধান কবি বলে বিবেচনা করি, এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ।'

১৯৩০-এর শেষার্ধে সবকিছুই জীবনানন্দের দিকে চোখ তুলে তাকায়। তিনি একটা চাকরি লাভ করেন। এবারে 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপানোর মতো অবস্থায় বুদ্ধদেবের মতো একজন খুব সহানুভূতিশীল সম্পাদক পান আবার। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এ সময়। আর কিছু লোক, যদিও খুব-ই স্বল্পসংখ্যক, তাঁর রচনার প্রতি কিছুটা সম্মান প্রদর্শন করা শুরু করে।

ডিসেম্বর ১৯৩৫ সংখ্যায় তাঁর চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়, যার একটি—'বনলতা সেন', যেটি পরিণত হয় তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতায়। বেশ ক'জনের হাতে এটার শিল্পসম্মত ইংরেজি তর্জমা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য—বনলতা সেন) সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) এবং মালয়ের পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন। বিম্বিসার এবং অশোক একদা প্রাচীন ভারতের শাসক ছিলেন। বিদর্ভ, বিদিশা শ্রাবস্তীর মতোই নগর—যেখানকার কারিগরদের ছিল চমৎকার দক্ষতা। এদিকে নাটোর বাংলাদেশের একটা সাধারণ ছোট মফস্বল শহর, আর বনলতা সেন, শুধু একজন রমণীর নাম। ওর প্রকৃত পরিচয় অনুমান করা সাহিত্য-রসিকদের একটা প্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যা হোক, সকলের জানা মতে, বনলতা সেন কোনো বাস্তব চরিত্র নয়। এর গুরুত্ব নিহিত নামটির সাধারণত্বে/সেন বলতে বৈদ্য বর্ণ বোঝায়, যেটি জীবনানন্দেরও গোত্র। অন্য বাংলা নামের মতো বনলতারও রয়েছে একটা আক্ষরিক অর্থ। নামটির অর্থ বনের লতা, যা রূপসী বাংলার নৈসর্গিক পরিবেশের প্রতি জীবনানন্দের প্রবণতার কারণে তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারে।

মানুষের সকল সৃষ্টির নামকরণের একটা কথা থাকে। কোনো মহিলার নামের দ্বিতীয়াংশের 'লতা' জীবনানন্দের পিতৃ-মাতৃ প্রজন্মের কাছে প্রিয় ছিল বলে মনে হয়। তাঁর এক মাসীর নাম ছিল 'স্নেহলতা', যেটি ছিল সম্ভবত প্রথম বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক কুসুমকুমারী রায় চৌধুরীর প্রথম উপন্যাসের শিরোনাম। 'স্নেহলতা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৬ (১৮৮৯-৯০ খ্রিঃ) বঙ্গাব্দে। এ লেখিকা নায়িকাদের নামে নামকরণ করে আরো দু'টো বই লেখেন 'প্রেমলতা' এবং 'শান্তিলতা' নামে। ত্মারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কলকাতার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'নষ্ট নীড়-এ বৌদির ভূমিকায় মূল চরিত্রের নাম ছিল চারুলতা। অতএব বনলতা নামটা সাধারণত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি পূর্বপ্রজন্মের চেতনা বহন করে, যে প্রজন্ম নিরাপত্তা এবং লালন-পালনকারী পিতামাতাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'রূপসী বাংলা'র 'তুমি' কবিতায় একটা যথাযথ নাম খুঁজে পায় : বনলতা সেন এক স্বস্তিদাত্রী নারী, যে মানব-সংসারের আর সবার চেয়ে আলাদা। সে অন্তত এ কবিতায় কবিকে উপলব্ধি করতে পারে। পক্ষান্তরে, কবিও বিম্বিসারের যুগ থেকে অদ্যাবধি সদা ক্লান্তিকর মানব-সমাজকে যেরকম পরিহার করে এসেছেন, তাকে সেভাবে পরিহার করেননি। ঐতিহাসিক মাত্রা তাঁর কুশীলবরা যে

মঞ্চে পদচারণা করে, সেটাকে তিনি ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারের মাধ্যমে আরো বিস্তৃত করেন। আর এভাবে ঘটনাস্থলকে প্রসারিত করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে দান করেন গতি। মানব বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁকে—কবিতার 'আমি'কে—যথেষ্ট আঘাত দিয়েছে। সেই মানব বিশ্ব যেহেতু দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দক্ষিণ এশিয়া এবং ঐতিহাসিক- যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত, যে আঘাত তিনি অনুভব করেন, সেটা আরো বড়।

কবি সরাসরি বলেন, জীবনের চারদিকের ফেনিল জলরাশি থেকে বনলতা সেন তাঁকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছে। কবিতার শেষ দু'চরণে সিদ্ধান্তহীন অস্পষ্টতা রয়ে যায় যে, বনলতা সেন আরাম এবং ক্লান্তিকর জীবন থেকে বিশ্রাম—অর্থাৎ মৃত্যুকে প্রতীকায়িত করে কিনা। অবশ্যই বনলতা সেন সান্ত্বনার প্রতীক, আর জীবনানন্দ ওর এ গুণটির কথা ব্যক্ত করেন দ্বিতীয় স্তবকের শেষ চরণের বিখ্যাত চিত্রকল্পটির মাধ্যমে : পাখির নীড়ের মতো চোখ। কল্পিত কর্ম (নিরাপত্তা ও শান্তি) এবং কারণ (নীড়)—এ সংশ্লেষের মতো বাংলা ভাষায় কোনো শব্দ বা গতানুগতিক উপমা তখন শুধু নয়, আজ পর্যন্ত 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'-এর মতো পাঠককে চ্যালেঞ্জ করেনি।

একই চিত্রকল্প জীবনানন্দ অন্যত্রও ব্যবহার করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, ১৯২৯-৩০ সালে দিল্লির রামযশ কলেজে শিক্ষকতা করার সময়টা তিনি উপভোগ করেননি। বরিশালে তাঁর সতীর্থ ব্রাহ্ম এবং বছরখানেকের ছোট সুধীর কুমার দত্ত তাঁকে কিছুটা সাহচর্য দিয়েছিলেন। তাঁরা ঘন ঘন পরস্পর দেখা করতেন। জীবনানন্দ যখন দিল্লি আসেন, তখন সুধীর কুমার তাঁর সঙ্গে রেল স্টেশনে দেখা করেন। প্রায় পাঁচ বছরেরও বেশি সময় পর জীবনানন্দ সেই উপলক্ষে সুধীর কুমার সম্বন্ধে লেখেন '...মুখে তার পাখির নীড়ের মতো আশ্বাস ও আশ্রয়।' বনলতা সেন কবিতার ক্লান্ত পথচারীর দিকে চোখ তুলে সেই এক-ই আশ্রয়ের স্বস্তি ও আশ্বাস প্রদান করেছে। এটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, কোন্‌টা আগে, সুধীর কুমার সম্পর্কে (মৃত্যু—জুন, ১৯৩৫) বক্তব্য, নাকি বনলতা সেন (ডিসেম্বর, ১৯৩৫-এ প্রকাশিত)। এটাও জানা যায় না, জীবনানন্দ ১৯২৯ সালে যখন তাঁর বন্ধুকে দেখেন তখন, নাকি আরো বহু পরে সুধীর কুমারের অকাল মৃত্যুর পর চিত্রকল্পটা তিনি কল্পনা করেছিলেন। কারণ, দিল্লি স্টেশনের সেই সাক্ষাৎ জীবনানন্দ স্মরণ করেছিলেন।

ন মাস পর আরেকটি কবিতায় বনলতা সেনের দেখা পাওয়া যায়, এটিও ছাপা হয় 'কবিতা'য় (দ্রষ্টব্য—হাজার বছর শুধু খেলা করে, ব. সে.)। এটি এবং বনলতা সেন, উভয় কবিতাতেই প্রাথমিকভাবে হাজার বছরের কালিক বিস্তারের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, উপান্তের চরণগুলো জীবনের লেনদেনের সমাপ্তির কথা বলে। সর্বোপরি দু'টো কবিতাতেই মূর্ত বনলতা সেন।

'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটির দু'টো প্রকাশিত ভাষ্য পাওয়া গেছে। একটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা'য়, যেটি তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ 'মহাপৃথিবী'তে (১৯৪৪) অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য়

(১৯৫৪) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এটি। অন্য ভাষ্যটি সিগনেট প্রেস প্রকাশিত তাঁর ষষ্ঠ গ্রন্থ 'বনলতা সেন' (এক-ই নামে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত বইটির পরিবর্ধিত সংস্করণ) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। দু'টোর পটভূমি ছিল আলাদা।

একটি কবিতায় ব্যবহৃত হয় মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্প, অন্যটিতে ভারতীয়। জীবনানন্দের প্রথম গ্রন্থ 'ঝরা পালক'-এ মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পের বহুল ব্যবহার রয়েছে। এ গ্রন্থে এসবের ব্যবহার ছিল মূলত আক্ষরিক, কোনো ক্রিয়ার প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবহৃত। 'বনলতা সেন' কবিতায় উৎকীর্ণ ইতিহাস ও ভূগোলের ভূমিকার সমার্থক স্থান ও সময়ের দূরত্বের ভেতর যেরকম দ্যোতনা পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পগুলো আক্ষরিকভাবে তেমন বেশি কিছু প্রতীকায়িত করে না। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক চিত্রকল্পসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্ট দূরত্বকে আরো দূরবর্তী করার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পগুলো যোগ করে বিচিত্র চমকপ্রদ উপাদান।

সাধারণভাবে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক চিত্রকল্প এবং নির্দিষ্টভাবে মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পসমূহের ব্যবহারিক সাদৃশ্যের কারণে জীবনানন্দ উপলব্ধি করেন যে, কবিতাটিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেও মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পের বিকল্প হিসেবে ভারতীয় চিত্রকল্প ব্যবহার করা যায়। বস্তুত 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায় 'এশিরিয়'র পরিবর্তে 'দ্বারকা' (ভগবান কৃষ্ণের প্রাচীন রাজধানী), পাম গাছের পরিবর্তে ভারতীয় দেবদারুর ব্যবহার যথার্থ। কবিতাটির জন্য পিরামিড কিংবা মমি আক্ষরিক অর্থে ততো গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু প্রথম পঙ্‌ক্তির 'হাজার বছর'-এর ভেতর অনির্দিষ্ট মহাকালের ধারণাকে আরো বেগবান করে। এশিরিয়া এবং দ্বারকার উল্লেখও একই উদ্দেশ্য সাধন করে।

'বনলতা সেন' কবিতায় জীবনের সব লেনদেন সাঙ্গ হওয়া বিষয়ক বক্তব্য (সব পাখি ঘরে আসে, সব নদী, ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন) কর্মতৎপরতার প্রস্তাবনা বহন করে। এ অংশের পূর্ববর্তী অংশে আলোকপাত করা হয় জীবনের সক্রিয়তার ওপর (হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে)। একই রকম একটা বক্তব্য যখন 'হাজার বছর শুধু খেলা করে'তে আসে (ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন), সেটা অনুমানসিদ্ধ হিসেবে আসে না। কারণ, জীবন এবং জীবনের লেনদেনের তেমন কিছুই এখানে উন্মোচিত হয় না। 'হাজার বছর...' কবিতায় বনলতা সেন এবং কথকের মধ্যকার সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের ভেতর কেউ কিছুটা সান্ত্বনার রেশ পেতে পারেন। বস্তুত 'বনলতা সেন' কবিতা এটাকেই সঠিক ব্যাখ্যা হিসেবে ইঙ্গিত প্রদান করে, কিন্তু পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তিগুলো এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে খুব একটা সাহায্য করে না। কেবলমাত্র দীর্ঘটির সামস্বরিক হওয়া ছাড়া কবিতাটির (হাজার বছর..) ব্যর্থতা 'বনলতা সেন'-এর সার্থকতার একটা মূল অনুষঙ্গ—সঙ্গত বিস্তারকে বিশেষায়িত করে। কেউ ভাবলেও ভাবতে পারে 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' 'বনলতা সেন'-এর প্রাথমিক খসড়া থেকে সুচিন্তিতভাবে বাতিল করে দেয়া কোনো স্তবক কিনা।

মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকল্পগুলো আরো বিস্তৃত ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক শ্রেণীর চিত্রকল্পসমূহের একটা অংশ হিসেবে উপস্থাপিত। 'রূপসী বাংলা'র একটা সনেটে প্রশ্ন

করা হয়, 'স্বপ্ন কি দেখেনি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা, দিল্লি, বেবিলনঃ' (সনেট নং ৫০)। 'কবিতা' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত একটি কবিতায় কবি এশিরিয়া, মিশর এবং বিদিশাকে এক পঙ্ক্তিতে একসঙ্গে গ্রথিত করেন। ('যে-রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি,' দ্রষ্টব্য—হাওয়ার রাত, ব. সে.)।

আঙ্গিকের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোকোজ্জ্বল কাব্যময় এ বর্ণিল উৎসারণ জীবনানন্দের কয়েকটি গদ্য-কবিতার একটি। ১৯৩০-এর দশকের মধ্যেই বাংলায় গদ্য কবিতা বিষয়ক একটি বিতর্ক শুরু হয়েও শেষ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ-ই প্রথম তাঁর কিছু গীতি-কবিতাকে ইংরেজি গদ্যে ভাষান্তর করেন এবং ১৯১২ সালে সেগুলো কবিতা হিসেবে 'গীতাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত হয়।

১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসে গদ্য-কবিতা বাঙালি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর ভেতর কিছুকালের জন্য প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অল্প কয়েকজনের ছাড়া জীবনানন্দেরটাসহ অন্য প্রায় সবার কবিতাই ছিল গদ্য ছন্দে। 'কবিতা'র তৃতীয় ইস্যুতে যেটিতে 'হাওয়ার রাত' ছাপা হয়, গদ্য ছন্দের ওপর সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। মধ্য ত্রিশে, ব্যাপারটা যখন একটা তপ্ত বিষয়, জীবনানন্দ এরকম কিছু গদ্য কবিতা লেখেন, 'হাওয়ার রাত' ছিল সেগুলোর একটা, যেমন ছিল এ কল্পচিত্রটি। (দ্রষ্টব্য—নগ্ন নির্জন হাত, ব. সে.)

'বনলতা সেন' এবং তাঁর অন্যান্য কবিতার মতো এখানেও রয়েছে এক রমণী, উপবিষ্টা, কেবলমাত্র দৃশ্যমান তাঁর হাত। এটিতেও কালের পরিমাপ শতাব্দী দিয়ে আর ঘটনাস্থল বিস্তৃত ভারত থেকে ভূমধ্যসাগর অবধি। এ কবিতায় রয়েছে একজন কবির আবেগমথিত কল্পনায় সূর্যাস্তের দৃশ্য। তিনি স্মরণ করেন এক কল্পনার প্রাসাদ। তারপর ডুবে যেতে যেতে রক্তিম হয়ে যাওয়া অস্তগামী কমলা রং সূর্যের সাহায্যে কবি পাঠকের চোখের সামনে ছিটিয়ে দেন রাশি রাশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্প-কাকাতুয়া, অবিরল পত্ররাজি, কোনো এক দুর্গের কাঠামো দুর্লভ ফল (নাশপাতি), হরিণ ও সিংহের ছালের পাণ্ডুলিপি, উজ্জ্বল পর্দা ও গালিচায় মাখানো উষ্ণ স্বেদাক্ত রং, রক্তিম গেলাসে ততোধিক লাল তরমুজ মদ। আর এসব বর্ণের ভেতর সহসা পড়ে থাকতে দেখা যায় এক নিরাভরণ হাত। আপাত প্রতীয়মান হয়, এটি সেই রহস্যময়ী রমণীর-ই হাত, যাকে জীবনানন্দ নামিত করেছেন কিছু কবিতায়, এখানে যাকে রেখেছেন অনামিত।

জীবনানন্দ যে উপলব্ধিতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতিকে উপস্থাপন করতে পারেন তাঁর অধিকাংশ কবিতায়, অনুরূপভাবে তিনি যে প্রাকৃতিক বিমানবিক বিশ্বের সঙ্গে আত্মনিবিষ্ট হতে পারেন, তা সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ তাঁর ত্রিশ দশকের কবিতাগুলোতে। (দ্রষ্টব্য—শিকার, ব. সে.)

সুন্দরী গাছের উল্লেখ কবিতাটিকে প্রতিস্থাপন করে বরিশালের দক্ষিণে সুন্দরবনের অরণ্যে, যেখান থেকে কথক ভোরের আকাশে শুকতারা দেখতে পায়। অনুমান করা যায়, শিকারীরা বাঙালি, সাথের দেহাতি ভৃত্যরা পাহারায় রত থেকে তাঁবুকে উষ্ণ রাখার চেষ্টায় প্রায় সারারাত জেগে থাকে। এসব বাস্তব অবিশিষ্ট মানুষেরা উপমার

বিশিষ্টা নারীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন সূর্য ওঠে অরণ্যের স্বাভাবিক ভোরের আলোকচ্ছটার তুলনায় ওদের আগুনের রং বিবর্ণ হয়ে আসে। মানুষকেই কেবল শীতরাত্রি পার করতে হয় না, হরিণও শিকারী চিতাবাঘিনীর থাবা থেকে নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য পালিয়ে থেকে রাত অতিবাহিত করে। একটা নতুন জীবন, নতুন দিন তার জন্য অপেক্ষা করে, যখন তাঁর দেহ চারপাশের আলো থেকে, জল আর ঘাস থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে।

মৃত্যুপরবর্তীকালে প্রকাশিত একটা কবিতায় জীবনানন্দ একটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের শিকারের চিত্র আঁকেন (দ্রষ্টব্য—সুন্দরবনের গল্প, অন্যান্য কবিতা, জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ —৬৬২)

জীবনানন্দ কেবলমাত্র নামকরণের জন্য নামিত করার সুবিধা গ্রহণ করেছেন সত্যিকারভাবে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'তুমি' তাঁর পরবর্তী রচনায় নাম পরিগ্রহ করেছে, যেমন এক্ষেত্রে 'বনলতা সেন'। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত 'বনলতা সেন'-এর পরিবর্ধিত সংস্করণে বহু নাম এসেছে। ত্রিশটি কবিতার ভেতর সাতটির শিরোনাম তাঁর কল্পনার নারীদের নামানুসারে : বনলতা সেন, 'শঙ্খমালা, সুর্দশনা, শ্যামলী, সুরঞ্জনা, সবিতা এবং সুচেতনা। জনৈকা শেফালিকা বোস হঠাৎ করে (ক্ষণিকের জন্য) 'হরিণেরা' কবিতায় উপস্থিত হয়। 'আকাশলীনা'তে কথক আবার সম্বোধন করে এক সুরঞ্জনাকে। এক-ই সময়ে 'বুনো হাঁস' নামের কবিতাটিতে অরুণিমা সান্যাল নামের এক মহিলাকে স্মরণ করেন তিনি। শঙ্খমালার দেখা পাওয়া যায় বেশ ক'বার বিভিন্ন কবিতায়, যার একটিতে তাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য—শঙ্খমালা : ব. সে.)

প্রথম স্তবকে কল্পিত এক প্রাচীন রূপকথার নারী কথককে খোঁজ করে, কবিতার বাকি অংশে তার-ই বর্ণনা। শঙ্খিনীমালা এবং শঙ্খমালা নামের মধ্যকার সাদৃশ্য তাঁর নারী-চরিত্রকে সমৃদ্ধ করার একটা পন্থা হিসেবে জীবনানন্দের ভাবনায় থাকতে পারে। আগে উল্লিখিত সনেটগুলোতে এ শঙ্খমালাকেই বিশালাক্ষী বর দিয়েছিল 'নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভেতর' জন্মাবার জন্য। আর বাংলা হচ্ছে সেই স্থান, 'যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার/কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন বাজিবে কি আর!' এ কবিতায় শুধু নয়, ১৯৩০ দশকে, বিশেষ করে প্রথমদিকে জীবনানন্দের বহু কবিতা কল্পনার এসব কালো, তেলহীন রুক্ষচুল নারীদের কথা স্মরণ করে।

জীবনানন্দের এ যাবৎ লেখা কবিতাগুলোর মধ্যে চমৎকার একটা 'কবিতা' পত্রিকার মার্চ ১৯৩০ সংখ্যায় ছাপা হয়। (দ্রষ্টব্য—আট বছর আগের একদিন, মহাপৃথিবী)।

ঘটনাটা যথেষ্ট সহজ : একজন লোক আত্মঘাতী হয়। সে কেন এরকম করে, আমরা জানি না। মর্গে নিয়ে যাওয়া হয় লোকটিকে। তার মরার সাধ জেগেছিল আগের রাতে, যখন ক্ষয়িত পঞ্চমীর চাঁদ ফাল্গুনের রাতের আঁধারে ডুবে গিয়েছে। পঞ্চমীর চাঁদ অস্তমিত হয় মধ্যরাতের আগে। চাঁদের ষষ্ঠী হচ্ছে দেবী ষষ্ঠীর দিন। শিশুদের দেবী ষষ্ঠী নবজাতককে লালন-পালন করে, দান করে নতুন জীবন। লোকটি নতুনভাবে জন্মলাভ করার জন্য ফাঁসিতে ঝুলতে পারে। মানুষ হিসেবে নয়, অন্য কোনো রূপে ওর বেঁচে

থাকার সাধ হয়েছিল হয়তো। 'যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা/এই জেনে, সে হয়তো তার মনুষ্য অস্তিত্ব শেষ করতে চেয়েছিল, যাতে সে মিশে যেতে পারে প্রাকৃতিক বিমানবিক মহাবিশ্বের সাথে।

'আট বছর আগের একদিন'-এর নায়ক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিল সংসারবৃক্ষে ঝুলে, যে বৃক্ষ অবিনশ্বর হলেও সদা-পরিবর্তনশীল। পাঠক বা কথক কেউ-ই নিশ্চিতভাবে জানে না, মানুষটির জীবন বৃক্ষের মতো এক রূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয়ে, যেমন : শালিক পাখি অথবা শঙ্খচিল কিংবা ভোরের কাক বা ঘাস হয়ে থাকা অবিনশ্বর কিছু কিনা।

লোকটি অশ্বত্থ গাছের মুখোমুখি হয় কবিতাটির আবেগের চরম পরিণতি হিসেবে। কিন্তু এসবকিছু ছাড়িয়ে প্রশ্ন ওঠে, লোকটি কেন আত্মহত্যা করে? কী এই 'বিপন্ন বিস্ময়'?

জীবনানন্দ 'বিস্ময়' ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে, কখনো বিশেষত তাঁর প্রিয় বাংলায় দেখা জীবনের মহিমার প্রতি নিজের অনিঃশেষ অক্লান্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রকাশ করতে, কখনো মৃত্যুর ধারণাকে ভীতি বিহ্বলতাসদৃশ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থাপন করতে। বিশেষভাবে বলতে গেলে, তাঁর কবিকৃতি এবং ঘটনাপঞ্জির একজন সংবেদনশীল লিপিকার হিসেবেও তাঁর চিত্রায়িত রক্তের মাঝে গতিশীল 'বিপন্ন' বিস্ময়েও সেই জীবনের অধিকারী ক্লান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে পারে। আত্মহত্যার বিপরীতে জীবনানন্দ যেন শিশুর হাতের ঘাসফড়িং কিংবা বুড়ি থুরথুরে পেঁচা— 'অন্ধকার বিছানা' থেকে কেবল তাকিয়ে না থেকে জীবনের বৈচিত্র্যের সাথে অংশগ্রহণ করতে সংগ্রামমুখর। আমাদের কবি 'জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার' থেকে মুখ ফিরিয়ে আত্মহত্যার কারণ বুঝতে পারেন না। তাই জানতে চান, কেন জীবনের বৃক্ষ থেকে অর্জন করা আত্মহত্যার এ চূড়ান্ত যাত্রা। জীবনানন্দ মৃত্যুকে গ্রহণ করবেন, যদি তাঁকে 'মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে' ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, ক্লান্তি সত্ত্বেও তিনি 'জানিবার গাঢ় বেদনার' জ্ঞান দিয়ে জানেন, তাঁর জীবনও রয়েছে অদৃশ্য হাতের ওপর, যা তাঁকে যে কোনোদিন ছুড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করবে না। কেবলমাত্র কাব্যিক দক্ষতা এবং গতিশীল দৃষ্টি জীবনানন্দকে 'আট বছর আগের একদিন'-এ এতো বিস্ময়করভাবে, শ্রবণগ্রাহ্যভাবে বিস্মিত হতে সক্ষম করেছে। তিনি জীবন-মৃত্যুর দ্বিবিভাজন সৃষ্টিকারী দ্বৈততা ও সংঘাতের কিনারা করেন এবং নিরীক্ষা করে দেখেন 'এই কুয়াশার মাঠ'-এর নকশায় গঠিত ক্লান্তি ও প্রলোভনের খেলা।

জীবনানন্দ : জীবন ও কবিতাপঞ্জি

অসিতাভ দাশ

জীবনানন্দ প্রকৃতিপ্রেমিক। মানুষকেও ভালবেসেছেন আন্তরিকভাবে। প্রকৃতি-সখ্যতা ও নির্জনতা তাঁকে কিছুটা অন্তর্মুখী করে তুললেও জীবনের রসোপলব্ধিতে সাহায্য করেছে তার প্রত্যয়, যা অভিজ্ঞতা ও সংবেদনশীলতা থেকে উদ্ভূত। নির্জনতার কবি, ধূসরতার কবি, চিত্ররূপময় কবি—এ অভিধাগুলি সবই আংশিক সত্য, কিন্তু এভাবে বিচারের তক্‌মা লাগিয়ে আমরা ছুঁতে পারি না জীবনানন্দের কবিতার সেই অন্তঃসারকে, যাকে তিনি নিজে বলেছিলেন 'সুড়ঙ্গলালিত সম্পর্ক'।

জীবন, পৃথিবী, মোহিনী নারী প্রভৃতি সম্পর্কে জীবনানন্দের চিত্তে যে বোধ বিষাদ অনুভূতি, তা আমাদের পরিচিত পৃথিবীর নয়। এ কারণেই তাঁকে আমাদের অপরিচিত মনে হয়, নিঃসঙ্গ মনে হয়। তাঁর নিসর্গবোধ ও বিষাদবোধ অনন্য। 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে জীবনানন্দ লিখেছিলেন—

'আমি বলতে চাই না যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই; সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই। কবিতা ও জীবন এক-ই জিনিসের-ই দুই রকম উৎসারণ। জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি, তার ভেতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে। কিন্তু এ অসংলগ্ন অব্যবহিত জীবনের দিকে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না। কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়।...সৃষ্টির ভেতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের কী এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়—কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয় যে, মনে হয়, এ সমস্ত জিনিস-ই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথাও যেন ছিল; এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে আরো অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত কোথাও যেন রয়ে যাবে।—এসবের অপরূপ উদ্‌গীরণের ভেতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়।—নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে, তেমনি বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর;—এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয়।—এ বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনা মনীষার ভেতর তাদের একাত্মতা ঘটে, কাব্য জন্মলাভ করে।"

জীবনানন্দের কাব্য-বক্তব্য তথা জীবন-বোধ এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। আধুনিক হয়েও জীবনানন্দ ছিলেন ঐতিহ্যানুসারী। তাঁর চেতনার গভীরে ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব। প্রকৃতি তাঁর কাব্য-চিন্তার মানস সরোবর। তাঁর জীবনবোধের গভীরে নিসর্গচেতনা এতই প্রবল যে, তাঁর সমস্ত চিন্তা, ধারণা ও অনুভব, তাঁর জীবন ও কাব্য এ প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত। জীবনানন্দের সমগ্র রচনায় একটি বিষণ্ন গাম্ভীর্য পরিব্যাপ্ত। তাতে বৈচিত্র্য নেই, না বিষয়ের, না কলাকৌশলের। তাঁর সমস্ত কবিতাই কোনো-না-কোনও অর্থে প্রকৃতির কবিতা। তাই প্রকৃতির কবি বলে বর্ণনা করলেও জীবনানন্দ সম্বন্ধে কোনো অসঙ্গত উক্তি করা হয় না।

জীবনানন্দের কবিতায় বিচিত্র স্বাদ এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে দৃষ্ট হয় একটি বিশেষ ভাব-লক্ষণ, যেটি তিনি সযত্নে সংগ্রহ করেছেন জীব-জন্তু এবং গাছপালার জগৎ থেকে। সেখানে আছে গাংশালিকের ঝাঁক, গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা, শঙ্খচিল, হাঁস, মাছরাঙা প্রভৃতি অজস্র জীবন এবং হিজল, কলমি, জাম, বট, কাঁঠাল, জামরুল, অশ্বত্থ, ফণিমনসা প্রভৃতি নামের অজস্র গাছপালা-লতাগুল্ম।

জীবনানন্দের কাব্যে বাংলার উপস্থিতি শুধু পরিমাণগত বিশালতায় নয়, প্রগাঢ় ব্যাপকতা ও উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। কবির সমস্ত হৃদয় জুড়ে বাংলা। বাংলাদেশের প্রতিটি পশু-পাখি, জীব-জন্তু, বৃক্ষলতার ওপর কবির যে মমত্ববোধ, তা কাটিয়ে তিনি কোথাও যেতে চান না। দু'চোখ ভরে নেবেন বাংলাদেশের সবুজ রূপ। তিনি দেখবেন, ভোরের বাতাসে কাঁঠালপাতা ঝরা, শালিকের খয়েরি ডানার প্রতি হিজল গাছের ইশারা।

বাংলার মাটি মাঠ আর আকাশের বর্ণমাধুরীতে এবং দেহগন্ধে বুঁদ হয়ে থাকতেন জীবনানন্দ। অনুভূত হয়েছিলেন বাংলায় জন্ম নিয়ে। তাই তিনি লিখেছিলেন : মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখনো এসেছি, না এলেই ভালো হতো অনুভব করে; এসে যে গভীরতর লাভ হলো সেসব বুঝেছি শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;...

(সুচেতনা : বনলতা সেন)

এ বাংলা-বোধের প্রকৃতি কী? এ বোধের উৎসে উগ্র জাতীয়তা-চেতনা নয়, উচ্ছল দেশপ্রেমের বন্যা নয়, উদ্ধত গর্বের নিশান নয়, ইতিহাস-চেতনা নয়, দুঃখ-দারিদ্র্যের উপলব্ধির দহন নয়, শুধুমাত্র প্রকৃতিপ্রেম নয়, এ বোধ আরো ব্যাপক, আরো গভীর। তাঁর সত্তায় বাংলার অকপট অস্তিত্ব, তাঁর চেতনায় বাংলার সহজাত সহাবস্থান, তাঁর মানসতন্ত্রীর তন্ময়তায় বাংলার আবহমান প্রবাহ।

বাংলার বুক থেকে কালের নির্মম নিয়তি যদি কবিকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, কোনো বাধা নেই। বাংলাকে ভালোবেসে তার সৌন্দর্যকে কবি অন্তরে অন্তরে এমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে, সে ভালোবাসা মৃত্যুর মধ্যেও সুন্দরতর হয়ে উঠবে—এই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। তিনি লিখেছিলেন—

...তবু যেন মরি আমি এই মাঠ-ঘাটের ভিতর
কৃষ্ণা-যমুনার নয়—যেন এই গাঙুরের ঢেউয়ের আঘ্রাণ

লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

(রূপসী বাংলা)

॥ জীবনপঞ্জি ॥

১৩০৫

ফাল্গুন ৬ (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯) : স্নাতক স্কুল শিক্ষাক ও 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং প্রবন্ধকার সত্যানন্দ দাশ ও মহিলা কবি কুসুমকুমারী দাশের পুত্র জীবনানন্দ দাশ (ডাক নাম মিলু) বরিশাল জেলা শহরে জন্মগ্রহণ করেন;

১৩০৮

আশ্বিন ২৫ (১২ অক্টোবর, ১৯০১) : জীবনানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ জন্মগ্রহণ করেন।

১৩০৯—১৩২১

বাড়িতে মায়ের কাছে বাল্যশিক্ষার সূচনা।

জীবনানন্দ কঠিন অসুখে আক্রান্ত হলে শিশু জীবনানন্দের মাতা ও মাতামহ চন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লি ভ্রমণ।

১৩১৪

পৌষ (১৯০৮ জানুয়ারি) : বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি।

১৩১৫

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় সত্যানন্দ দাশ অসুস্থ হয়ে পড়লে মামাবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে গিরিডিতে গিয়ে কিছুদিনের জন্য বসবাস।

১৩১৬—১৩২১

প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভ ও জীবনানন্দের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার।

বরিশাল শহরে, কীর্তনখোলা নদীর ধারে, আশপাশের গ্রামে, খেতে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন।

ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্য বই ক্রয় করেন।

স্কুল জীবনের উপান্তে নিজের লেখা কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথকে পাঠালে প্রশংসা ও আপত্তি মেলানো জবাব। কিন্তু সেই কবিতাগুলির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

১৩২১

চৈত্র ১৮ : জীবনানন্দের একমাত্র বোন সুচরিতার জন্ম (ডাকনাম খুকু)।

১৩২২

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে জীবনানন্দ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দেয়ার বয়সকাল পূর্ণ হয়নি। এক বছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়।

১৩২৪

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতায় ভর্তি হন। আই. এ.-তে তাঁর বিষয় ছিল ইংরেজি, বাংলা ও রসায়ন। অক্সফোর্ড মিশন ছাত্রাবাসে আবাসিক হিসেবে বসবাস শুরু করেন।

১৩২৫

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থায় হিন্দু হোস্টেলের পরিবর্তে অক্সফোর্ড মিশনেই বসবাস করেন।

১৩২৬

মনোমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় 'বর্ষ আবাহন' নামে প্রথম মুদ্রিত কবিতার মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ। এ কবিতাটির শেষে শুধু 'শ্রী' উল্লিখিত হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ইংরেজি অনার্স সহ বি. এ. পাস করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. (ইংরেজি) ও আইন ক্লাসে ভর্তি হন।

চৈত্র : 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যার সূচিপত্রে 'বর্ষ আবাহন' কবিতার লেখক শ্রী জীবনানন্দ দাশ বি. এ. নাম উল্লেখ করা হয়।

১৩২৭

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে হার্ডিঞ্জ হস্টেলে বসবাস শুরু করেন।

১৩২৮

এম. এ. পরীক্ষার কিছুদিন আগে 'ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি' রোগে আক্রান্ত। পরীক্ষায় না বসার সিদ্ধান্ত নেন।

পিতার অনুরোধে পরীক্ষায় বসেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. (ইংরেজি) পাস করেন।

আইন পড়া ছেড়ে দেন।

কলকাতার সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে 'টিউটর' পদে কর্মজীবন শুরু করেন (ইংরেজি ১৯২২ সাল)।

১৩২৯

সিটি কলেজে কর্মরত অবস্থায় হ্যারিসন রোডে (বর্তমান নাম মহাত্মা গান্ধী রোড) অবস্থিত প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে বসবাস শুরু করেন।

১৩৩০

বরিশাল থেকে ছোট ভাই অশোকানন্দ দাশ এম. এসসি. পড়ার জন্য কলকাতায় এলে ১৮/২/এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে একটি ছোট ঘর ভাড়া নেন।

১৩৩১

বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বাস ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা।

১৩৩২

শ্রাবণ : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণে বেদনাহত জীবনানন্দের কবিতা 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' বঙ্গবাণী পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

আশ্বিন ১৫ : মাতামহ কালীমোহন দাশের জীবনাবসান।

পৌষ : 'ব্রহ্মমোহন' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় 'স্বর্গীয় কালীমোহন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে' শীর্ষক সাধুভাষায় রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৩৩৪

শ্রাবণ : ঢাকার ৪৭, পুরানা পল্টন থেকে বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকার ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হলে প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ, ১৩৩৪) 'প্রগতি' পত্রিকায় শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামে তাঁর 'খুশ-রোজী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

আশ্বিন : জীবনানন্দের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয়। এ সময় থেকেই জীবনানন্দ 'দাশগুপ্ত' ছেড়ে 'দাশ' হয়ে যান।

ছোট ভাইয়ের চাকরিস্থল পুনা ও বোম্বাই ভ্রমণ করেন।

অগ্রহায়ণ : 'কল্লোল' পত্রিকায় 'ঝরা পালক' গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। "ঝরা পালক' কবিতার বই জীবনানন্দ দাশগুপ্ত প্রণীত। দাম এক টাকা। কয়েক বৎসরের মধ্যেই জীবনানন্দ দাশগুপ্ত কাব্য-সাহিত্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তরুণ কবির সমস্ত কবিতাতেই তারুণ্যের উল্লাস ধ্বনিত।'

১৩৩৫

শ্রাবণ : সিটি কলেজের চাকরি থেকে জীবনানন্দ বরখাস্ত হন। এ সম্বন্ধে নানা মতামত থাকলেও আসল কারণ, রামমোহন রায় ছাত্রাবাসের একদল ছাত্রের সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে গোলমাল দেখা দিলে ছাত্রসংখ্যা কমে গিয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে এ কলেজের সবচেয়ে কনিষ্ঠ অধ্যাপক হওয়ার সুবাদে জীবনানন্দ চাকরি থেকে বরখাস্ত হন।

ভাদ্র : 'ধূপছায়া' ও 'প্রগতি'তে প্রকাশিত যথাক্রমে 'প্রেম' ও 'পরস্পর' কবিতা দু'টি উল্লেখ করে 'শনিবারের চিঠি'তে 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে লেখা হয়, 'মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।' কবি জীবনানন্দ দাশ এবার দু'টি গণ্ডারমারী কবিতা লিখিয়াছেন। একটি ধূপছায়া অন্যটি প্রগতিতে।'

আশ্বিন : জীবনানন্দ শেলির 'হিম টু ইনটেলেকচুয়াল বিউটি' শীর্ষক কবিতাটির উদাহরণ দিয়ে 'কালপুরুষের উক্তি' শিরোনামে নিজের অভিমত জানান, 'যাঁরা কবিতার ভেতর 'as', 'like', 'মতো' বা 'মতন'-এর সংখ্যাগুণে সাহিত্যে কেরানিগিরি করে থাকেন, এ প্রশ্নের জবাব তাঁদের নিকট থেকে ভাঁড়ামি ও বদরসিকতার 'বারোমাস্যা' ও 'Centenary' ছাড়া বারোমাস্য কিংবা শতবর্ষেও আমরা কিছু আশা করি না। দু'-একটি কবিতার খোঁচায় এসব গণ্ডারের যদি নিপাত হয়, মন্দ কি?' এ মন্তব্যটি 'ধূপছায়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৩৩৬

শ্রাবণ : প্রায় এক বছর বেকার অবস্থায় থাকার পর সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে যোগ দেন।

কার্তিক : বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের শিক্ষকতার পদ থেকে ইস্তফা দেন।

অগ্রহায়ণ : কলকাতায় ফিরে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে বসবাস করতে শুরু করেন এবং গৃহ-শিক্ষকতার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন।

পৌষ (ডিসেম্বর ২৯) : পুরনো দিল্লি থেকে এক শুষ্ক অনুর্বর 'কালাপাহাড়' এলাকায় অবস্থিত রামযশ কলেজে ইংরেজি বিভাগে যুক্ত হন।

১৩৩৭

বৈশাখ : ছুটি নিয়ে রামযশ কলেজ থেকে বরিশালে আগমন।

পৌষ ২৬ (মে ৯) : খুলনা জেলার সেনহাটির রোহিণীকুমার গুপ্ত ও সরযূবালার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যের সঙ্গে জীবনানন্দের বিয়ে হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে আচার্য হন মনোমোহন চক্রবর্তী। ঢাকার রামমোহন লাইব্রেরিতে বিয়ের আসরে বুদ্ধদেব বসু, অজিতকুমার দত্ত প্রমুখ কবিবন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈশাখ ৩১ : নববধূর সংবর্ধনা উপলক্ষে সর্বানন্দ ভবনে বউভাত অনুষ্ঠান এবং বিশেষ উপাসনা হয়।

আষাঢ় ৫ : জীবনানন্দের মাতামহী প্রসন্নকুমারী ছিয়াশি বছর বয়সে বরিশাল সর্বানন্দ ভবনে দেহত্যাগ করেন।

ফাল্গুন ৩ (ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৩১) : রবিবার, তাঁদের এক কন্যা-সন্তানের জন্ম হয়। নাম রাখা হয় মঞ্জুশ্রী (ডাকনাম মঞ্জু)।

১৩৩৯

জ্যৈষ্ঠ : জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দাশ আই. এ. পাস করেন।

১৩৪২

লাবণ্য দাশ বরিশাল কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন।

শ্রাবণ (আগস্ট) : জন্ম-শহর বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের ইংরেজি বিভাগের টিউটর পদে যোগ দেন।

আশ্বিন ১৬ (অক্টোবর ৩) : রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যুর আগে' শীর্ষক কবিতা সম্পর্কে জানান, 'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।'

১৩৪৩

অগ্রহায়ণ ১৩ (নভেম্বর ২৯, ১৯৩৬) : রবিবার, একমাত্র পুত্র সমরানন্দ (ডাক-নাম রঞ্জু) বরিশালের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'।

ফাল্গুন ২০ (মার্চ ৫, ১৯৩৭) : 'পরম পূজনীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু/শ্রদ্ধাবনত জীবনানন্দ/২০ ফাল্গুন, ১৩৪৩'—নিজ হাতে লিখে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভিপ্রায় জানিয়ে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখ করেছিলেন, 'প্রায় নয় বছর আগে আমি আমার প্রথম কবিতার বই একখানা আপনাকে পাঠিয়েছিলুম। সেই বই পেয়ে আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানি আমার মূল্যবান সম্পদের মধ্যে একটি।'

ফাল্গুন ২৭ (মার্চ ১২, ১৯৩৭) : বিশদভাবে লেখার পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ দু'পংক্তির চিঠিতে জানান, 'তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।'

চৈত্র : 'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব স্পষ্টত ঘোষণা করেন, 'আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি। এটা উল্লেখযোগ্য যে, জীবনানন্দ একেবারেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত।...এ দেশে মাতৃভাষার সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে ভালোবাসেন (যদি আজকালকার দিনে এমন কেউ থাকেন), তাঁরা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নিজের গরজেই পড়বেন। কারণ, এ-বইয়ের পাতা খুললেই তাঁরা একজনের পরিচয় পাবেন, যিনি প্রকৃতই কবি এবং প্রকৃত অর্থে নতুন। বিশেষ

করে 'শকুন', 'পাখিরা', 'অবসরের গান', 'মৃত্যুর আগে', 'ক্যাম্পে' এসব কবিতা পড়ে তাঁরা স্বতই উপলব্ধি করবেন, বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব শক্তির আবির্ভাব হয়েছে।'

১৩৪৪

জ্যৈষ্ঠ : গ্রীষ্মাবকাশে কলকাতায় থাকার সময় প্রমথ চৌধুরীর বাসায় গিয়ে একখণ্ড 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' দিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় গ্রন্থটির সমালোচনা প্রকাশিত হোক। সঙ্গে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

জ্যৈষ্ঠ ২৩ (জুন ৭) : প্রমথ চৌধুরীকে এক চিঠিতে অনুরোধ করেন : 'তৃপ্তি দিক, অতৃপ্তি দিক—আমার কাব্যে কোনো গুণ থাকুক বা অনেক দোষ থাকুক, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পড়ে আমার সম্পর্কে আপনার যা মনে হয়েছে, সে সম্বন্ধে 'বিচিত্রা'য় একটা বড় প্রবন্ধ লিখলে আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করবো।'

আষাঢ় ১৯ : 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় 'কবিতা' পত্রিকার সহকারী সমর সেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের সমালোচনা করেন।

মাঘ ২ (জানুয়ারি ১৬) : বরিশালের সাহিত্য পরিষদ শাখায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণ সভায় শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় সাহিত্য-রসের ব্যাখা করে জীবনানন্দ একটি উচ্চ অঙ্গের প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৩৪৫

বৈশাখ : 'কবিতা' পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের প্রথম বাক্যদুটি 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।'

শ্রাবণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলনে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি স্থান পায়। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির প্রথম, পঞ্চম সম্পূর্ণ এবং শেষতম অষ্টম স্তবকের প্রথম চার পংক্তি বাদ দিয়ে কবিতাটি গ্রহণ করেছিলেন।

আশ্বিন : 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় 'ফুটপাতে' নামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। হুমায়ুন কবির ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার এটাই ছিল প্রথম সংখ্যা।

বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থের তীব্র ও দীর্ঘ সমালোচনা করেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় যে রকম বেরোয়, তারই কিছু কেটেছেঁটে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন। অঙ্গহানিতে কবিতাটির ক্ষতি হয়েছে।

১৩৪৬

শ্রাবণ : কবিতা ভবনের উদ্যোগে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামে কাব্য সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দ

দাশের 'পাখিরা', 'শকুন', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত' চারটি কবিতা সঙ্কলনে স্থান পায়।

১৩৪৮

শ্রাবণ : কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাইশে শ্রাবণ প্রয়াত হলে বরিশাল কলেজের ছাত্রাবাসের উঁচু ক্লাসের কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগে আয়োজিত রবীন্দ্র স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি জীবনানন্দ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

১৩৪৯

অগ্রহায়ণ ৫ (নভেম্বর ২২, ১৯৪২) : বরিশালের বাড়িতে রবিবার পিতা সত্যানন্দ দাশের আশি বছর বয়সে জীবনাবসান।

অগ্রহায়ণ ২০ : পিতা সত্যানন্দ দাশের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে জীবনানন্দ তাঁর পিতার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঋষিতুল্য মানুষটির জীবনে বিচিত্র সাধনার কথা উল্লেখ করে পাঠ করেন একটি প্রবন্ধ। এ রচনার প্রথম দু'-তিন অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছিলেন ; 'আমার বাবা ছিলেন সত্যানন্দ দাশ। তাঁর সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই মনে হয় ভেতরের সঙ্গে বাইরের জীবনের যে বিরোধে একদিকে মানুষের ব্যক্তি-মানস ও অন্যদিকে তার ব্যবহারিক ও জনমানস আশ্রয়ী জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তাঁর বেলায় তা তেমন নিঃশেষে ঘটে উঠতে পারেনি।'

পৌষ : বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে কবিতা ভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

চৈত্র : বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকায় 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করেন।

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় আবুল হোসেন 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা করেন।

১৩৫০

বৈশাখ : বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বিচিত্রিত মুহূর্ত' শিরোনামিত উত্তর-অংশে 'জীবনানন্দ দাশ/কবি করকমলে' উল্লেখ করে একটি কবিতা লেখেন।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ : 'একক' পত্রিকায় শুদ্ধসত্ত্ব বসু 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করেন। তিনি লেখেন 'বনলতা সেন বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে অমর সৃষ্টি এবং রবীন্দ্রনাথের পর এতো সুন্দর ও সার্থক রোমান্টিক কবিতা আর সৃষ্টি হয়নি বললেই হয়।'

জ্যৈষ্ঠ : গ্রীষ্মের ছুটিতে টালিগঞ্জ রসা রোডে ছোট ভাই অশোকানন্দের বাড়িতে জীবনানন্দ কয়েকদিন আতিথ্য গ্রহণ করেন।

আষাঢ় : সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'নিরুক্ত' পত্রিকায় 'জীবনানন্দ দাশ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

কার্তিক ১৩ (অক্টোবর ৩০) : সুকুমার রায়ের জন্মতিথি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে সিগ্‌নেট প্রেস উদ্বোধন হলে আমন্ত্রিত হন জীবনানন্দ। কিন্তু জীবনানন্দ অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি উদ্যোক্তাদের জানিয়েছিলেন, 'আপনাদের আমন্ত্রণলিপি যখন এখানে এসেছে, তখন আমি বরিশালে ছিলাম না। এখানে এসে কাল আপনাদের চিঠি দেখলাম। এখন আর সময়ে কুলোবে না, অল্পের জন্য কবির স্মৃতি সভায় উপস্থিত থাকতে না পারায় আমি এতো বেশি দুঃখিত যে, কবির আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে স্মৃতিসভায় আমাকে ডাকতে ভুলবেন না, আপনাদের কাছে এই আমার একান্ত অনুরোধ।'

মাঘ : বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ গঠিত হলে জীবনানন্দ দাশকে একটি প্রবন্ধ লেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন 'কেন লিখি' শীর্ষক একটি পুস্তিকার জন্য। এ পুস্তিকাটি জীবনানন্দ দাশের লেখাসহ প্রকাশিত হয়।

ফাল্গুন : ইংরেজি তর্জমায় বাংলা কবিতার একটি সংকলন প্রকাশে সিগ্‌নেট প্রেস উদ্যোগ নিলে জীবনানন্দকে অনুরোধ জানানো হয় তাঁর নিজের কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করে পাঠানোর জন্য। পল্টনকর্মী ও কবি মার্টিন কার্কম্যান প্রধান অনুবাদক, সম্পাদক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

চৈত্র : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যাযের অনুরোধে 'শঙ্খমালা', 'হায় চিল', 'আমি যদি হতাম', 'মনোবীজ', 'বিভিন্ন কোরাস' ও 'আলোকস্তম্ভ' কবিতাগুলির ইংরেজি অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেন।

১৩৫১

শ্রাবণ : 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

কার্তিক : 'পূর্বাশা' পত্রিকায় মাত্র দুই স্তবকের অতি সংক্ষিপ্ত অস্বাক্ষরিত একটি সমালোচনায় 'মহাপৃথিবী' প্রসঙ্গে উল্লেখ করে লেখা হয়— 'রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দ দাশ-ই একমাত্র বাঙালি কবি, যাঁর কবিতায় সমগ্রভাবে জীবনবোধের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।'

'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু 'মহাপৃথিবী' নতুন গ্রন্থ স্বীকার না করে বলেন— 'মহাপৃথিবী'তে কোনো নতুন সুর লাগেনি; বস্তু এটা ভিন্ন নামে 'বনলতা সেন'-এরই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।'

পৌষ : 'নিরুক্ত' পত্রিকায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'আধুনিক কবিতায় জীবনবোধ' শিরোনামে জীবনানন্দের 'মহাপৃথিবী' এবং অমিয় চক্রবর্তীর 'দূরবাণী' গ্রন্থ নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা নিবন্ধ লেখেন। দুই বিপরীত স্বভাবের কবিকে, জীবনবোধের পার্থক্য সত্ত্বেও এক অনিবার্য জীবনস্রোত কীভাবে এক-ই রকম ব্যথা-ম্লান পরিণতিতে এনে পৌছে দিয়েছে, সমালোচক তা সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

১৩৫৩

আষাঢ় ২৩ : বরিশাল বি. এম. কলেজ থেকে প্রায় দু'মাসের সবেতন ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন।

শ্রাবণ-ভাদ্র : এই সময় ১৪টি গান রচনা করেন। গানগুলির প্রথম লাইন :

১. আজ বিকেলে ধূসর আলোয়
২. রাতের আঁধারে নীল নীরব সাগরে
৩. সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম
ক. পৃথিবীতে যত ইতিহাসে যত ক্ষয়
৪. অন্ধকারের ঘুম সাগরের রাতে
৫. আজ সকালের এই পৃথিবীর আলো
৬. আমরা যেন মেঘের আলোর ভিতর থেকে এসে
৭. ঘুমের হাওয়া ঘুমের আলো
৮. দেশ-সময়ের ক্রান্তি রাতে আজ এ পৃথিবীর
৯. কাউকে ভালোবেসেছিলাম জানি
১০. তোমার সাথে আমার ভালোবাসা
১১. ভোরের বেলায় তুমি আমি—
১২. ধ্বনি পাখির আলো নদীর স্মরণে এসেছি
১৩. তুমি আমার মনে এলে
১৪. মনে পড়ে আমি ছিলাম বেবিলনের রাজা

ভাদ্র : হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলে আগস্ট মাসের শেষদিকে পুলিশের ঝামেলায় পড়েন। বি. এম. কলেজের তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র তখন একটি থানার দায়িত্বে থাকায় নিরাপদ দূরত্বে পার করে দেন।

ভাদ্র ২৯ : দু মাস ছয়দিন ছুটি কাটানোর পর কলকাতা থেকে ফিরে বরিশাল বি. এ. কলেজে যোগ দেন।

কার্তিক : 'পূর্বাশা' পত্রিকায় কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লেখেন—'মহাবিশ্বলোকের ইসারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্য একটি সঙ্গতি-সাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে।'

কার্তিক ২৪ : বরিশাল বি. এম. কলেজে পূজাবকাশের পরে কলেজ খুললেও জীবনানন্দ যোগদান করেননি।

পৌষ ৭ : বরিশাল বি. এম. কলেজের কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ১১ নভেম্বর থেকে পরবর্তী গ্রীষ্মাবকাশের শেষ দিন পর্যন্ত বিনা বেতনে তাঁর ছুটি মঞ্জুর করার। সভার কার্য বিবরণে আরো একটি সিদ্ধান্ত লেখা হয়, 'জীবনানন্দ দাশকে যেন পরবর্তী জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গ্রন্থাগারের যাবতীয় বই ফেরত দেয়ার কথা জানানো হয়।'

মাঘ ১২ (জানুয়ারি ২৬, ১৯৪৭) : কলকাতার ক্রিক রোড থেকে হুমায়ুন কবির সহ আরো কয়েকজনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'স্বরাজ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্যপ্রসন্ন দত্তের ঐকান্তিক ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হন জীবনানন্দ।

১৩৫৪

বৈশাখ : বরিশাল থেকে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন।

জ্যৈষ্ঠ : বরিশাল বি. এম. কলেজ থেকে চাকরিতে ইস্তাফা দেন।

শ্রাবণ ২৪ : 'স্বরাজ' পত্রিকায় যোগদানের পর রবিবাসরীয়তে 'মনমর্মর' নামে জীবনানন্দ একটি বিভাগ খোলেন। এ বিভাগেই তিনি 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন।

জীবনানন্দের দায়িত্বে এ বছর প্রথম 'স্বরাজ'-এর পূজা সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

ভাদ্র : জীবনানন্দ দাশের উদ্যোগে তাঁর ছাত্র (পরবর্তীকালে খ্যাতনামা সাহিত্যিক) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'স্বরাজ' পত্রিকায় 'বৈতালিক' নামে একটি উপন্যাস লেখেন।

আশ্বিন : 'স্বরাজ' পত্রিকার আর্থিক সংকট দেখা দেয়ায় পূজার আগেই স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দেন।

১৩৫৫

শ্রাবণ : 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় অল্ডাস্ হাক্সলির 'গিয়োকন্দা স্মাইল' বইটির সমালোচনা করেন।

অগ্রহায়ণ : 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ বইটির জন্য জীবনানন্দ অগ্রিম একশত টাকা লেখক-স্বত্ব হিসেবে পেয়েছিলেন। বই লিখে সম্ভবত এই তাঁর প্রথম প্রাপ্তি।

কার্তিক : ছোট ভাই আশোকানন্দ দিল্লিতে বদলি হয়ে গেলে ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডে জীবনানন্দ সপরিবারে বসবাস শুরু করেন।

বিষ্ণু দের পৃষ্ঠপোষকতায় চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩৫৫) কবি মণীন্দ্র রায় 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন। তিনি লেখেন—'একজন কবি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, তিনি জীবনানন্দ বাবু। স্পষ্ট মনে আছে, আমাদের সাহিত্যিক হাতেখড়ির দিনে তাঁর কবিতার বিস্ময়কর চিত্রময়তা কিংবদন্তির মতো হয়ে উঠেছিল।'

পৌষ ৯ (ডিসেম্বর ২৫, ১৯৪৮) : কলকাতায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশোকানন্দের ১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউয়ের বাসস্থানে প্রায় তিয়াত্তর বছর বয়সে তাঁর মাতা কবি কুসুমকুমারী দাশের জীবনাবসান হয়।

দক্ষিণ কলকাতায় বিবেকানন্দ পার্কের পাশে কমলা গার্লস স্কুলে এক বৎসরের জন্য শিক্ষিকার কাজে নিযুক্ত হন লাবণ্য দাশ। এ সময়ে কবি বিষ্ণু দের স্ত্রী প্রণতি দে ছিলেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা।

অর্থোপার্জনের জন্য জীবনানন্দ গৃহ-শিক্ষকতা করতেন। তাঁর ভাড়া বাড়ির একটা অংশ কিছুদিনের জন্য মেজর এইচ. কে. মজুমদারকে ভাড়া দেন। মেজর মজুমদার মাস ছয়েক ছিলেন। জীবনানন্দ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্সি নিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ।

১৩৫৬

বৈশাখ : কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পরিচিত 'নিরুক্ত' পত্রিকার লেখক কবি অমল দত্তকে চারটি ঘরের মধ্যে একটি ঘর ভাড়া দেন। তাঁর সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য একটি বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা নেন, কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

আশ্বিন : রঞ্জন লিখিত 'শীতে উপেক্ষিতা' গ্রন্থের 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় সমালোচনা করেন।

পৌষ : 'কবিতা' পত্রিকায় অশোক মিত্র 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের সমালোচনা লেখেন। প্রাক্-পরিবর্তন পর্যায়ের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট স্মরণীয় কবিতার পর্যালোচনায় প্রশংসিত মন্তব্য থাকলেও বনলতা সেন পরবর্তী কাব্যধারার বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর অভিমতকে গ্রহণীয় মনে করে নতুন কাব্যগ্রন্থের চরিত্রলক্ষণাদি সম্পর্কে 'নিজের কয়েকটি উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা'কে সমালোচনায় ব্যক্ত করেন।

মাঘ (জানুয়ারি ২২) : কলকাতায় সিনেট হলে 'সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর প্রেরিত অভিনন্দন-বাণীটি সভায় পাঠ করা হয়। আলোচ্য সভায় বারোজন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হলে জীবনানন্দ অন্যতম সভ্য হন।

কার্যকরী সমিতিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন : আবু সয়ীদ আইয়ুব (সভাপতি); জীবনানন্দ দাশ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র (সহ-সভাপতি); দিনেশ দাশ, অম্লান দত্ত, প্রভঞ্জন সেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল ভৌমিক, নারায়ণ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ ও অনিল চক্রবর্তী (যুগ্ম সম্পাদক) ও আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত (সংগঠন সম্পাদক)।

১৩৫৭

বৈশাখ : 'সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র'-এর মুখপত্র হিসেবে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও সুহৃদ রুদ্র সম্পাদিত 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৪) রূপান্তর ঘটে। নবপরিকল্পিত পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন তিনজন : জীবনানন্দ দাশ, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

লাবণ্য দাশ ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে বি. টি. কোর্সে ভর্তি হন।

শ্রাবণ : অম্লান দত্ত ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যা 'দ্বন্দ্ব'-এর' জন্য সম্পাদকীয় লেখার আমন্ত্রণ জানালে তার পরিবর্তে জীবনানন্দ 'আধুনিক কবিতা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠান। 'সম্পাদকীয়'র পরিবর্তে রচনাটি প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করলে ঠিক হবে হয়তো বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

ভাদ্র ১৬ (সেপ্টেম্বর ২) : সদ্য প্রতিষ্ঠিত খপুর কলেজে (জুলাই, ১৯৪৯) ইংরেজির অধ্যাপক পদে যোগ দেন জীবনানন্দ। খাওয়া-থাকার খরচসহ নামমাত্র মাইনেয় পড়াতে হতো তাঁকে। তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল খপুরের পুরাতন বাজারে কৌশল্যা মোড়ের কাছে সিলভার জুবিলি ইন্স্টিটিউট সংলগ্ন ভাড়া করা কলেজ ছাত্রাবাসের একটি বাড়িতে।

কার্তিক : পত্নী লাবণ্য দাশ এনজাইনা রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

মাঘ : খপুর থেকে ছুটিতে কলকাতায় এসে স্ত্রীর অসুস্থতার বাড়াবাড়ি দেখে ছুটি আবেদন করেন।

কিন্তু স্ত্রী সুস্থ না হয়ে ওঠার জন্য আবার ছুটির আবেদন করেন। এবার কলেজ কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করেননি।

ফাল্গুন ১ (ফেব্রুয়ারি ১৫) : খপুর কলেজ থেকে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বরখাস্ত করেন। মূল কারণ, ছাত্র সংখ্যা কমে যাওয়ায় আর্থিক অসুবিধার জন্য জীবনানন্দের পদটি বিলোপ করা হয়।

১৩৫৮

বৈশাখ : এশিয়াটিক সোসাইটিতে একজন গবেষণা-সহায়ক পদে আবেদন করলেও কোনো ডাক পাননি।

জ্যৈষ্ঠ : সুরুচি মজুমদার নামে এক বিধবা মহিলাকে নিজের আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য ঘর সাবলেট করেন।

শ্রাবণ : অল্পদিনের মধ্যেই মহিলার আচরণে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন।

দমদম মতিঝিল কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে আবেদন করলেও ব্রজমোহন কলেজে তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী ও মতিঝিল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি তাঁর আবেদনপত্র বিবেচনা করেননি।

১৩৫৯

আশ্বিন : 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশ হয়। প্রকাশ তারিখ শ্রাবণ ১৩৫৯ উল্লেখ করা হলেও মাস দুয়েক বিলম্বে, অর্থাৎ আশ্বিনে বইটি প্রকাশিত হয়।

কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত 'বনলতা সেন'-এর বারোটি কবিতা, মহাপৃথিবীর দুটি এবং ষোলটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল এ নতুন সিগ্‌নেট সংস্করণটি।

কার্তিক : বড়িশা কলেজে চার মাসের লিভ্ ভ্যাকেন্সিতে (বর্তমান নাম বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজ) জীবনানন্দ যোগদান করেন।

অগ্রহায়ণ : পত্নী লাবণ্য দাশ পার্ক সার্কাসের কাছে শিশু বিদ্যাপীঠে (বর্তমান জহর নন্দী স্কুল) শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন।

মাঘ : 'উত্তরসূরি'র বিলম্বিত চতুর্থ সংখ্যায় 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা লেখেন অরুণ ভট্টাচার্য। তিনি লেখেন—'জীবনানন্দ দাশের কবিতার পটভূমি শুধুমাত্র প্রকৃতির পরিবেশ নয়, অথবা মধ্যযুগীয় বাঙালি কবিদের মতো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কথা নয়; বরং একটি অবিচ্ছিন্ন চেতনাবোধ তাঁর কাব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছে।'

ফাল্গুন : শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব উপলক্ষে (১৫-১৭ ফাল্গুন) অনুষ্ঠিত সাহিত্যমেলায় কাব্য শাখার আহ্বায়ক অশোকবিজয় রাহা জীবনানন্দকে সভায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালেও তিনি রাজি হননি। বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

চৈত্র : মণীন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় 'সীমান্ত' নামে প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক 'প্রগতিশীল বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ও দায়িত্ব' শিরোনামে একটি নিবন্ধে জীবনানন্দ দাশের কবিতা বিষয়ে বিরূপ অভিমত প্রকাশ করে লেখেন— 'জীবনানন্দ দাশের গ্রামীণ পটভূমিতে আশ্রয় নেয়ার মূলেও আসলে বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়ার তাগিদ-ই বর্তমান।'

১৩৬০

বৈশাখ : ডায়মন্ডহারবারে অবস্থিত ফকিরচাঁদ কলেজে অধ্যাপক পদে আবেদন করলেও দূরত্ব ও বসবাস করতে হবে বলে এ চাকরি গ্রহণ করেননি।

বৈশাখ ১০ (এপ্রিল ২৫) : হাওড়া গার্লস কলেজে (বর্তমান বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ) বিনা আবেদনে কলেজ পরিচালন সমিতির সভায় স্থায়ী অধ্যাপক পদে জীবনানন্দের নিযুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'বনলতা সেন' ১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে 'নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন' কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।

জ্যৈষ্ঠ ২ : মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে কবিকে সংবর্ধনা জানিয়ে নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃপক্ষ 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের জন্য পুরস্কারের নগদ মূল্য একশ টাকা তাঁর হাতে তুলে দেন।

আষাঢ় ১৬ : হাওড়া গার্লস কলেজে ১৫০ টাকা বেতনের সঙ্গে ১৫ টাকা ভাতাসহ ইংরেজির অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

শ্রাবণ : 'পরিচয়' পত্রিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বনলতা সেন-এর দ্বিতীয় তথা সিগনেট সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় 'নির্জনতম কবি' শিরোনামে 'বনলতা সেন' অবলম্বনে একটি সমালোচনা লেখেন। 'বনলতা সেন'-এর পরবর্তী কাব্যধারার বিশ্লেষণ কিংবা উল্লেখমাত্র না করে এ সমালোচনা লেখা হয়েছিল।

আশ্বিন : পূজার ছুটিতে সপরিবারে দিল্লি যান। হুমায়ুন কবির ও আতাউর রহমানের সঙ্গে দেখা করে চাকরির কথা বলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী

আবুল কালাম আজাদের সচিব হুমায়ুন কবির দিল্লির একটা কলেজে তাঁর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু জীবনানন্দ কলকাতা ছেড়ে থাকতে রাজি হননি।

অগ্রহায়ণ : হুমায়ুন কবির পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা পরিমল রায়কে সরকারি কলেজে জীবনানন্দের চাকরির জন্য অনুরোধ করলে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে তাঁর জন্য চাকরির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জীবনানন্দ দূরত্বের জন্য এ চাকরি গ্রহণ করেননি।

হুমায়ুন কবির জীবনানন্দের পছন্দানুযায়ী প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরির জন্য পরিমল রায়কে অনুরোধ করলেও ওই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকের কোনো পদ শূন্য না থাকায় কিছু ব্যবস্থা হয়নি।

মাঘ ১৪-১৫ (জানুয়ারি ২৮-২৯) : কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের সিনেট হলে সিগনেট প্রেসের উদ্যোগে এক কাব্যপাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষে আহ্বায়ক ছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, দিলীপকুমার গুপ্ত। প্রথমদিনের সর্বশেষ কবি হিসেবে তিনি কবিতা পাঠ করেন, প্রথমে 'বনলতা সেন', তারপর দর্শকদের অনুরোধে 'সুচেতনা' এবং আরো কয়েকটি কবিতা।

ফাল্গুন : বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা (ফাল্গুন ১৩৬০) সংকলন' প্রকাশ। কবিতা ভবনের পূর্ববর্তী সংস্করণে চারটি কবিতা ছাড়াও 'হায় চিল; 'বেড়াল', 'হাওয়ার রাত', 'সমারূঢ়', 'আকাশলীনা', 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৩৬১

বৈশাখ : 'নাভানা' থেকে 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ভাদ্র ২৩ : হাওড়া গার্লস কলেজের পরিচালন সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, জীবনানন্দের কর্মকালের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বার্ষিক পঁচিশ টাকা বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য অতিরিক্ত পঁচিশ টাকা বিশেষ ভাতা তাঁকে দেয়া হবে।

আশ্বিন ২৬ (অক্টোবর ১৩) : গারস্টিন প্লেসে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের পুরনো বাড়িতে এক বড় ধরনের কবি সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, বনফুল, সজনীকান্ত, সুধীন্দ্রনাথ, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে কবিতা পড়েন জীবনানন্দ। এ বছর পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটি তিনি পাঠ করেন।

আশ্বিন ২৭ (অক্টোবর ১৪) : সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সান্ধ্যভ্রমণের সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে ট্রাম দুর্ঘটনায় গুরুতররূপে আহত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি হন। এ দুর্ঘটনার ফলে তাঁর পাঁজর, কণ্ঠী ও উরুদেশের হাড় ভেঙে যায়।

আশ্বিন ২৮ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য চিঠি লিখে ভূমেন্দ্র গুহ ও দিলীপ মজুমদারকে পাঠান সজনীকান্ত দাসের কাছে।

আশ্বিন ৩০ (অক্টোবর ১৭) : সজনীকান্ত দাশ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে রাজি করালে ডাক্তার অজিতকুমার বসু ও ডাক্তার অমলানন্দ দাশকে সঙ্গে নিয়ে বিধানচন্দ্র রায় হাসপাতালে জীবনানন্দকে দেখতে যান।

কার্তিক ৫ (অক্টোবর ২২) : শুক্রবার, রাত ১১-৩৫ মিনিটে হাসপাতালেই বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনাবসান হয়।

কার্তিক ৬ (অক্টোবর ২৩) : এক নাতিদীর্ঘ শোকযাত্রাসহ মরদেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

॥ কবিতাপঞ্জি ॥

এখানে জীবনানন্দের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কবিতা ও কাব্যগ্রন্থগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এ সমস্ত কবিতা ব্যতীত জীবনানন্দের অনেক কবিতা অপ্রকাশিত আছে বা ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। সেগুলি এ কবিতাপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অগ্নি (কবিতা)

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

অঘ্রাণ প্রান্তরে (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

অদ্ভুত আঁধার এক (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যার 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত।

অনন্দা (কবিতা)

'দৈনিক বসুমতী'তে কবিতাটি প্রকাশিত।

অনির্বাণ (কবিতা)

'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অনুপম ত্রিবেদী (কবিতা)

'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

অনুভব (কবিতা)

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় প্রতিরোধ'-এ কবিতাটি প্রকাশিত।

অনুসূর্যের গান (কবিতা)

'পূর্বাশা' পত্রিকার ১৩৪০ বঙ্গাব্দে কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

অনেক নদীর জল (কবিতা)

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

অনেক মৃত বিপ্লবী স্মরণে (কবিতা)

'ইঙ্গিত' পত্রিকার ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অনেক রক্তে (কবিতা)

১৩৬৭ বঙ্গাব্দে 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অনেক রাত্রিদিন (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত।

অন্তর বাহির (কবিতা)

'একক' পত্রিকায় ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত।

অন্ধকার (কবিতা)

১৩৫৬ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কবিতাটি। কবিতাটির সঙ্গে কবির মন্তব্যও মুদ্রিত হয় : 'অন্ধকার' কবিতাটি প্রায় সতের বছর আগে (১৯৩৯-৪০-এ) লেখা হয়েছিল। খুব সম্ভব ১৩৪২-এ কবিতায় দিয়েছিলাম। তখন ছাপানো হয়নি, পরে পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে কোনো কপি নেই ভেবেছিলাম। পুরনো খাতা খুঁজতে খুঁজতে সেদিন বেরিয়ে পড়লো। সতের বছর আগের সেই মনোস্বভাব এখন নেই আর আমার। এ রকম কবিতা আজ আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।"

অন্ধকার থেকে (কবিতা)

'মাসিক বসুমতী'তে ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অন্ধকারে (কবিতা)

'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

অন্য এক প্রেমিককে (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে সংখ্যায় কবিতাটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

অন্য প্রেমিককে (কবিতা)

'দেশ' পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসে কবিতাটি প্রকাশিত।

অবরোধ (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

অবশেষে (কবিতা)

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে 'বৈশাখী' (বার্ষিকী) বর্ষ ১-এ কবিতাটি প্রকাশিত।

অবসরের গান (কবিতা)

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে 'প্রগতি' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

অবিনশ্বর (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে পূর্বাশা (শারদীয় সংখ্যা) পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত।

অভিভাবিকা (কবিতা)

'নতুন পত্র' পত্রিকায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

অমৃতযোগ (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।

অলকা (কবিতা)

'বঙ্গবাণী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে কবিতাটি প্রকাশিত।

আকাশ ভরে (কবিতা)

'উত্তরসূরী' পত্রিকায় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে 'কার্তিক-পৌষ' সংখ্যায় প্রকাশিত।

আকাশলীনা (কবিতা)

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত।

আকাশে সাতটি তারা (কবিতা)

'শারদীয় একক'-এ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

আজ (কবিতা)

আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দের ১৪ কার্তিক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'কালি-কলম' পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'প্রগতি' পত্রিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত। 'শারদীয় নির্ণয়'-এ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

আজকের এক মুহূর্ত (কবিতা)

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

আট বছর আগের একদিন (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

আদিম (কবিতা)

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

আদিম দেবতারা (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

আঁধারের যাত্রী (কবিতা)

'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

আবছায়া (কবিতা)

'জয়শ্রী' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

আবহমান (কবিতা)

'শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

আমরা (কবিতা)

'ধূপছায়া' পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

আমাকে একটি কথা দাও (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

আমাদের বুদ্ধি আজ (কবিতা)

১৩৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'শতাব্দীর শত কবিতা' সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত।

আমি (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় কবিতাটি।

আমি যদি হতাম (কবিতা)

১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

আমিষাশী তরবার (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

আলো-পৃথিবী (কবিতা)

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্ষিক সংখ্যায় এবং
'দেশ' পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

আলো সাগরের গান (কবিতা)

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় 'নতুন লেখা' পত্রিকায় প্রকাশিত।

আলোকপাত (কবিতা)

১৩৫৬ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় যুগান্তর'-এ কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

আলোকস্তম্ভ (কবিতা)

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'পত্রিকা'র মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

আশা, অনুমিতি (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'একক' পত্রিকায় প্রকাশিত।

আশা-ভরসা (কবিতা)

'দ্বন্দ্ব' পত্রিকায় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

আশার আস্থার আধার নিজেই মানুষ (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৬২ বঙ্গাব্দের মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

ইতিবৃত্ত (কবিতা)

১৩৬৪ বঙ্গাব্দে 'উত্তরসূরী'র কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ইতিহাস যান (কবিতা)

'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'বৈশাখ' প্রকাশিত হয়।

ইহাদেরি কানে (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

উদয়াস্ত (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

উনিশ শো চৌত্রিশের কবিতা (কবিতা)

'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় ১৯৭৩ সালে এপ্রিল-জুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৯৩৬ (কবিতা)

'বিভাব' পত্রিকায় ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের শরৎ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৯৪৬-৪৭ (কবিতা)

১৩৫৫ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

উন্মেষ (কবিতা)

'নিরুক্ত' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

উপলব্ধি (কবিতা)

'উত্তরসূরী' পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দে পৌষ-ফাল্গুন সংখ্যায়, 'পরিক্রমা' পত্রিকায় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় এবং ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে আশ্বিন মাসে 'মাসিক বাংলা কবিতা'য় প্রকাশিত হয়।

এই কি সিন্ধুর হাওয়া (কবিতা)

১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় ক্রান্তি'তে প্রকাশিত।

এই চেতনা (কবিতা)

১৩৫৫ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্যপত্রে'-র কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

এই পথ দিয়ে (কবিতা)

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় ক্রান্তি'তে প্রকাশিত।

এই পৃথিবীর (কবিতা)

১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

এই শতাব্দী-সন্ধিতে মৃত্যু (কবিতা)

১৩৫০ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় পরিক্রমা'য় কবিতাটি প্রকাশিত।

এই সব দিন রাত্রি (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

এই সব পাখি (কবিতা)

'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় ১৯৭৩ সালের এপ্রিল-জুন মাসে প্রকাশিত।

এক অন্ধকার থেকে এসে (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

একটি কবিতা (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

একটি নক্ষত্র আসে (কবিতা)

১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

একদিন খুঁজেছিনু যারে (কবিতা)

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'কালি-কলম' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

একদিন যদি আমি (কবিতা)

১৩৬৩ বঙ্গাব্দে 'অনুক্ত' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

এখন এ পৃথিবীর (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

এখন ওরা (কবিতা)

'পূর্বপত্র' পত্রিকায় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

এখন রাতের শেষে (কবিতা)

'উত্তরসূরী' পত্রিকায় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

এখানে নক্ষত্র ভরে (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

এসো (কবিতা)

১৩৬৭ বঙ্গাব্দে 'উত্তরসূরী' পত্রিকার কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ঐখানে সারাদিন উঁচু (কবিতা)

'ময়ূখ' পত্রিকায় ১৩৬১-৬২ বঙ্গাব্দের পৌষ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ওগো দরদিয়া (কবিতা)

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কালি-কলম' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইন ট্রপিকস পড়ে (কবিতা)

'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় (১৩৫২ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয়।

কখনো নক্ষত্রহীন (কবিতা)

'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কখনো মুহূর্ত (কবিতা)

১৩৬৬ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কনভেনশন (কবিতা)

'অনুক্ত' পত্রিকায় ১৮৭৯ শকাব্দের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কবি (কবিতা)

'উত্তরসূরী' পত্রিকায় ১৩৬২ বঙ্গাব্দের কার্তিক-পৌষ সংখ্যায়, 'প্রগতি' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কবের সে রাত্রি আজ (কবিতা)

১৩৭৫ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় জলসা' পত্রিকায় প্রকাশিত।

কমলালেবু (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

কয়েকটি লাইন (কবিতা)

'প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত।

কারা করে (কবিতা)

১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'অধুনা' (সঙ্কলন)-এ প্রকাশিত।

কারা কবে কথা বলেছিল (কবিতা)

১৩৮৪ বঙ্গাব্দের শারদীয় যুগান্তর-এ প্রকাশিত।

কার্তিক-অঘ্রাণ ১৯৪৬ (কবিতা)

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

কার্তিক ভোরে; ১৩৪০ (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দের 'শারদীয় শতভিষা'য় প্রকাশিত হয়।

কার্তিকের ভোরবেলা (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কিশোরের প্রতি (কবিতা)

'কালি-কলম' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

কুজ্ঝটিকায় আকাশ মলিন (কবিতা)

'ক্রান্তি' পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

কুড়ি বছর পরে (কবিতা)

১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

কে এসে যেন (কবিতা)

১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'শতভিষা' পত্রিকার শরৎ সংখ্যায় প্রকাশিত।

কে কবিতা লেখে (কবিতা)

'শারদীয় যুগান্তর'-এ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

কেন মিছে নক্ষত্রেরা (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার দোল সংখ্যায় প্রকাশিত।

কেমন বৃষ্টি ঝরে (কবিতা)

১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় ময়ূখ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

কোনো এক নারীকে (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'কবিপত্র' পত্রিকার তৃতীয় সংকলন-এ প্রকাশিত।

কোনো ব্যথিতাকে (কবিতা)

১৩৬৪ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

কোরাস (কবিতা)

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

কোহিনুর (কবিতা)

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

ক্যাম্পে (কবিতা)

'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ক্রান্তিবলয় (কবিতা)

১৩৫৭ বঙ্গাব্দে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।

খুশরোজী (কবিতা)

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'প্রগতি' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

খেতে প্রান্তরে (কবিতা)

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে 'নিরুক্ত' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

গতিবিধি (কবিতা)

'নিরুক্ত' পত্রিকার ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

গভীর এরিয়েলে (কবিতা)

'দৈনিক বসুমতী'তে কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

গরিমা (কবিতা)

'নিরুক্ত' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

গোধূলি সন্ধির নৃত্য (কবিতা)

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ঘাস (কবিতা)

১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় এবং 'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ঘোড়া (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

'নিরুক্ত' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

চারিদিকে নীল হয়ে (কবিতা)

'ঊষা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

চারিদিকে প্রকৃতির (কবিতা)

'চুনটা প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

চিঠি এল (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

চেতনা-লিখন (কবিতা)

'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

চেতনা-সবিতা (কবিতা)

১৩৫৫ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় যুগান্তর'-এ প্রকাশিত হয়।

জন্মতারকা (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'কল্পনা-সাহিত্য' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

জয়জয়ন্তীর সূর্য (কবিতা)

১৩৬৭ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় দৈনিক কৃষক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জর্নাল : '৩৪ (কবিতা)

১৩৮৪ বঙ্গাব্দে 'শতভিষা' পত্রিকার শরৎ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

জর্নাল : '৩৬ (কবিতা)

১৩৮৩ বঙ্গাব্দে 'শতভিষা' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

জর্নাল : ১৩৪২ (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় উষা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জর্নাল : ১৩৪৬ (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ১৩৬১ বঙ্গাব্দে বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

জর্নাল : ১৩৪৮ (কবিতা)

১৩৮৪ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় যুগান্তর'-এ প্রকাশিত হয়।

জল (কবিতা)

১৩৬৬ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

জার্মানীর রাত্রিপথে : ১৯৪৫ (কবিতা)

'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

জীবন (কবিতা)

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'প্রগতি' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

জীবন বেদ (কবিতা)

'দেশ' পত্রিকায় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

জীবন সংগীত (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম মুদ্রণ বৈশাখ, ১৩৬১ (মে ১৯৫৪)। প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু, নাভানা ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলকাতা ১৩। মুদ্রাকর : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩। রয়াল পৃ—১৩৬। বোর্ড বাঁধাই। প্রচ্ছদশিল্পী ইন্দ্র দুগার। মূল্য পাঁচ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৭২।

কবিতা কী এ-জিজ্ঞাসার কোনো আবছা উত্তর দেয়ার আগে এটুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায়, কবিতা অনেক রকম। হোমারও কবিতা লিখেছিলেন, মালার্মে র‍্যাঁবো ও রিলকেও। শেক্‌স্‌পীয়র, বদ্‌লেয়র, রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়ট কবিতা রচনা করে গেছেন। কেউ কেউ কবিকে সবের ওপরে সংস্কারকের ভূমিকায় দেখেন: কারো কারো ঝোঁক একান্তই রসের দিকে। কবিতা রসের-ই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।

বিভিন্ন অভিজ্ঞ পাঠকের বিচার ও রুচির সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার কবির কবিতা সম্পর্কে পাঠক ও সমালোচকেরা কী ভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করছেন—এবং কীভাবে তা করা উচিত, সেসব চেতনার ওপর কবির ভবিষ্যৎ কাব্য, আমার মনে হয়, আরো স্পষ্টভাবে দাঁড়াবার সুযোগ পেতে পারে। কাব্য চেনার, আস্বাদ করার ও বিচার করার নানারকম স্বভাব ও পদ্ধতির বিচিত্র সত্য-মিথ্যার পথে আধুনিক কাব্যের আধুনিক সমালোচককে প্রায়-ই চলতে দেখা যায়, কিন্তু সেই কাব্যের মোটামুটি সত্যও অনেক সময়েই তাঁকে এড়িয়ে যায়।

আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার। কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সব-ই আংশিকভাবে সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার। কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এতো তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ তারতম্যের; সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড় সমালোচককে অবহিত হতে হয়।

নানা দেশে অনেকদিন থেকেই কাব্যের সংগ্রহ বেরুচ্ছে। বাংলায় কবিতার সঞ্চয়ন খুব-ই কম। নানা শতকের অক্‌স্‌ফোর্ড বুক অব ভর্সের সংকলকদের মধ্যে বড় কবি

প্রায়-ই কেউ নেই; কিন্তু সংকলনগুলো ভালো হয়েছে। ঢের পুরনো কাব্যের বাছ-বিচারে বেশি সার্থকতা বেশি সহজ, নতুন কবি ও কবিতার খাঁটি বিচার বেশি কঠিন। অনেক কবির সমাবেশে একটি সংগ্রহ; একজন কবির প্রায় সমস্ত উল্লেখ্য কবিতা নিয়ে আর-এক জাতীয় সংকলন। পশ্চিমে এ ধরনের অনেক বই আছে; তাদের ভেতর কয়েকটি তাৎপর্যে—এমন-কি মাহাত্ম্যে প্রায় অক্ষুণ্ন। আমাদের দেশে দু'-একজন পূর্বজ (উনিশ-বিশ শতকের) কবির নির্বাচিত কাব্যাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। কতদূর সফল হয়েছে, এখনো ঠিক বলতে পারছি না। ভালো কবিতা যাচাই করার বিশেষ শক্তি সংকলকের থাকলেও আদিম নির্বাচন অনেক সময়-ই কবির মৃত্যুর পরে খাঁটি সংকলনে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায়। কিন্তু কোনো কোনো সংকলনে প্রথম থেকেই যথেষ্ট নির্ভুল চেতনার প্রয়োগ দেখা যায়। পাঠকদের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগস্থাপনের দিক দিয়ে এ ধরনের প্রাথমিক সংকলনের মূল্য আমাদের দেশেও লেখক, পাঠক ও প্রকাশকদের কাছে ক্রমেই বেশি স্বীকৃত হচ্ছে হয়তো। যিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেননি, তাঁর কবিতার এ রকম সংগ্রহ থেকে পাঠক ও সমালোচক এ কাব্যের যথেষ্ট সঙ্গত পরিচয় পেতে পারেন; যদিও শেষ পরিচয়লাভ সমসাময়িকদের পক্ষে নানা কারণেই দুঃসাধ্য।

এ সংকলনের কবিতাগুলো শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় আমার পাঁচখানা কবিতার বই ও অন্যান্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা থেকে সঞ্চয় করেছেন। তাঁর নির্বাচনে বিশেষ শুদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। বিন্যাস-সাধনে মোটামুটিভাবে রচনার কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।

কলকাতা — জীবনানন্দ দাশ

২০.৪.১৯৫৪

কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা

ঝরা পালক : ১ নীলিমা ২ পিরামিড ৩ সেদিন এ ধরণীর,

ধূসর পাণ্ডুলিপি : ৪ মৃত্যুর আগে ৫ বোধ ৬ নির্জন স্বাক্ষর ৭ অবসরের গান ৮ ক্যাম্পে ৯ মাঠের গল্প ১০ সহজ ১১ পাখিরা ১২ শকুন ১৩ স্বপ্নের হাতে

বনলতা সেন : ১৪ ধান কাটা হয়ে গেছে ১৫ পথ হাঁটা ১৬ বনলতা সেন ১৭ আমাকে তুমি ১৮ তুমি ১৯ অন্ধকার ২০ সুরঞ্জনা ২১ সবিতা ২২ সুচেতনা ২৩ আবহমান ২৪ ভিখিরী ২৫ তোমাকে

মহাপৃথিবী : ২৬ হাজার বছর শুধু খেলা করে ২৭ শব ২৮ হায় চিল ২৯ সিন্ধু সারস ৩০ কুড়ি বছর পরে ৩১ ঘাস ৩২ হাওয়ার রাত ৩৩ বুনো হাঁস ৩৪ শঙ্খমালা ৩৫ বিড়াল ৩৬ শিকার ৩৭ নগ্ন নির্জন হাত ৩৮ আট বছর আগের একদিন *৩৯ মনোকণিকা *৪০ সুবিনয় মুস্তফী *৪১ অনুপম ত্রিবেদী

সাতটি তারার তিমির : ৪২ আকাশলীনা ৪৩ ঘোড়া ৪৪ সমারূঢ় ৪৫ নিরঙ্কুশ ৪৬ গোধূলি সন্ধির নৃত্য ৪৭ একটি কবিতা ৪৮ নাবিক ৪৯ খেতে প্রান্তরে ৫০ রাত্রি ৫১ লঘু মুহূর্ত ৫২ নাবিকী ৫৩ উত্তরপ্রবেশ ৫৪ সৃষ্টির তীরে ৫৫ তিমিরহননের

গান ৫৬ জুহু ৫৭ সময়ের কাছে ৫৮ জনান্তিকে ৫৯ সূর্যতামসী ৬০ বিভিন্ন কোরাস *৬১ তবু *৬২ পৃথিবীতে *৬৩ এই সব দিনরাত্রি *৬৪ লোকেন বোসের জর্নাল *৬৫ ১৯৪৬-৪৭ *৬৬ মানুষের মৃত্যু হলে **৬৭ অনন্দা *৬৮ আছে *৬৯ যাত্রী ***৭০ স্থান থেকে *৭১ দিনরাত **৭২ পৃথিবীতে এই

*চিহ্নিত কবিতাগুলি ইতঃপূর্বে কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

**চিহ্নিত কবিতাগুলি ইতঃপূর্বে কোনো গ্রন্থে কিংবা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

—নাভানা দ্বিতীয় সংভথনরণ বৈশাখ ১৩৬৩ [মে ১৯৫৬]। ডিমাই পৃ ১০+১৪২। মূল্য : চার টাকা। কবিতার সংখ্যা ৮১।

কবিতা : *৭৩ একটি নক্ষত্র আসে *৭৪ জর্নাল ১৩৪৬ *৭৫ পৃথিবীলোক ৭৬ এইখানে সূর্যের *৭৭ তোমাকে ভালবেসে *৭৮ সে **৭৯ রাত্রিদিন *৮০ অদ্ভুত আঁধার *৮১ দু'দিকে।

—নাভানা তৃতীয় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ [নভেম্বর, ১৯৬০]। কবিতার সংখ্যা ৮৮।

রূপসী বাংলা : ৮২ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ৮৩ আকাশে সাতটি তারা ৮৪ আবার আসিব ফিরে ৮৫ গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে ৮৬ এখানে আকাশ নীল ৮৭ দূর পৃথিবীর গন্ধে ৮৮ সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা

—নাভানা চতুর্থ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ [ডিসেম্বর, ১৯৬৩]। কবিতা সংখ্যা ৯০।

বেলা অবেলা কালবেলা : ৮৯ মাঘসংক্রান্তির রাতে ৯০ সূর্য নক্ষত্র নারী।

জীবনে অনেক দূর (কবিতা)

'ব্রাত্য' পত্রিকায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

জীবনের এই সাদা কালো (কবিতা)

'উষা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কবিতাটি।

জীবনের মানে ভালো (কবিতা)

১৩৬৩ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

জুহু (কবিতা)

১৩৫০ বঙ্গাব্দে 'বৈশাখী' (বার্ষিকী) বর্ষ ২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

জোনাকি (কবিতা)

১৩৬৩ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কবিতাটি।

ঝরা পালক (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ ১৩৩৪ [১৯২৭] প্রকাশক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ৯০/২, এ হ্যারিসন রোড কলকাতা। মুদ্রাকর : এ, চৌধুরী, ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৯ নং কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা। [প্রচ্ছদ : গায় জলপাই রঙের লিনেন ফিনিস্ মলাট-কাগজের ওপর ডান দিকে/বামদিকে, ২১/২˝ × ৪˝ মাপের পৃথকভাবে সাঁটা নীর রঙের জরির ওপর রিভার্স-এ নামাক্ষর এবং আটটি ছোট-বড় পালকের ছবি।] উৎসর্গ:—কল্যাণীয়াসু— [জীবনানন্দ-র কাকা অতুলানন্দ-র কন্যা শোভনা]। মূল্য এক টাকা। ক্রাউন ৮ পেজি, পৃ [১০]+৯৩। কাগজে বাঁধাই। কবিতার সংখ্যা ৩৫।

ভূমিকা

ঝরাপালকের কতকগুলি কবিত প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, বিজলি প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকীগুলি নূতন।

কলিকাতা, শ্রী জীবনানন্দ দাশ

১০ আশ্বিন, ১৩৩৪

কবিতা ❑ ১ আমি কবি,—সেই কবি ২ নীলিমা ৩ নব নবীনের লাগি ৪ কিশোরের প্রতি ৫ মরীচিকার পিছে ৬ জীবন-মরণ দুয়ারে আমার ৭ বেদিয়া ৮ নাবিক ৯ বনের চাতক—মনের চাতক ১০ সাগর-বলাকা ১১ চলছি উধাও ১২ একদিন খুঁজেছিনু যারে ১৩ আলেয়া ১৪ অস্তচাঁদে ১৫ ছায়া-প্রিয়া ১৬ ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল ১৭ কবি ১৮ সিন্ধু ১৯ দেশবন্ধু ২০ বিবেকানন্দ ২১ হিন্দু-মুসলমান ২২ নিখিল আমার ভাই ২৩ পতিতা ২৪ ডাহুকী ২৫ শ্মশান ২৬ মিশর ২৭ পিরামিড ২৮ মরুবালু ২৯ চাঁদিনীতে ৩০ দক্ষিণা ৩১ যে কামনা নিয়ে ৩২ স্মৃতি ৩৩ সেদিন এ ধরণীর ৩৪ ওগো দরদিয়া ৩৫ সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়।

রচনাকাল : ১৯২৫ থেকে ১৯২৭।

ঝরা ফসলের গান (কবিতা)

'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ডালপালা নড়ে বারবার (কবিতা)

১৩৬৭ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত।

ডাহুকী (কবিতা)

'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

তার স্থির প্রেমিকের নি[illegible]না উদ্দীপিতা (কবিতা)

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'কবি[illegible]একার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

তিমির সূর্যে (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

তিমির হননের গান (কবিতা)

১৩৫০ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

তুমি (কবিতা)

'শারদীয় একক' পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত।

তুমি আজ (কবিতা)

১৯৫৯ সালে 'নবান্ন' পত্রিকায় প্রকাশিত।

তুমি আলো (কবিতা)

'শারদীয়া দেশ' পত্রিকায় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

তুমি কেন বহু দূরে (কবিতা)

১৩৬৪ বঙ্গাব্দের ৩২ শ্রাবণ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

তুমি যদি (কবিতা)

'নবান্ন' পত্রিকায় ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৩৩৬-৩৮ স্মরণে (কবিতা)

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত।

তেরশো তেত্রিশ (কবিতা)

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'প্রগতি' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

তোমরা যেখানে সাধ (কবিতা)

১৩৬৩ বঙ্গাব্দে 'অনুক্ত' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

তোমাকে (কবিতা)

'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

তোমাকে ভালবেসে (কবিতা)

'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

তোমায় আমি (কবিতা)

'দেশ' পত্রিকায় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ও ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

তোমার আমার (কবিতা)

শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

দক্ষিণা (কবিতা)

'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

দাও দাও সূর্যকে (কবিতা)

'একক' পত্রিকায় প্রকাশিত।

দানবীয় (কবিতা)

'শান্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত।

দিনরাত্রি (কবিতা)

১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

দীপ্তি (কবিতা)

১৩৫২ বঙ্গাব্দের 'বৈশাখী' (বার্ষিকী) বর্ষ ৪ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাটি।

দু'জন (কবিতা)

১৩৫৭ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

দু'টি তুরঙ্গম (কবিতা)

'দেশ' পত্রিকায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

দুদিকে ছড়িয়ে আছে (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

দুর্দিন (কবিতা)

'বিংশ শতাব্দী' ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

দূর পৃথিবীর গন্ধে (কবিতা)

১৩৬৩ বঙ্গাব্দে 'অনুক্ত' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

দেশ কাল সন্ততি (কবিতা)

'শারদীয়া যুগান্তর'-এ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় উষা'য় প্রকাশিত।

দেশবন্ধু (কবিতা)

বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

দোয়েল (কবিতা)

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ধান কাটা হয়ে গেছে (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

ধূসর পাণ্ডুলিপি (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ / ডিসেম্বর, ১৯৩৬। প্রকাশক : শ্রীজীবনানন্দ দাশ, শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস, প্রিন্টার—শ্রীসুভাষচন্দ্র রায়, ৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা। [নামপত্রে মুদ্রিত] ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা। উৎসর্গ : 'বুদ্ধদেব বসুকে'। কাপড়ে বাঁধাই। জ্যাকেট সংবলিত। [প্রচ্ছদ শিল্পী অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।] মূল্য দুই টাকা। রয়াল ৮ পেজি পৃ ১০+১০১। কবিতার সংখ্যা ১৭।

ভূমিকা

আমার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ সালে। কিন্তু সে বইখানা অনেকদিন হয় আমার নিজের চোখের আড়ালেও হারিয়ে গেছে। আমার মনে হয়, সে তার প্রাপ্য মূল্যই পেয়েছে।

১৩৩৬ সালে আর একখানা কবিতার বই বের করার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। কিন্তু নিজ মনে কবিতা লিখে এবং কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করে সে ইচ্ছাকে আমি শিশুর মতো ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। শিশুকে অসময়ে এবং বার বার ঘুম পাড়িয়ে রাখতে জননীর যে রকম কষ্ট হয়, সেইরকম কেমন একটা উদ্বেগ—খুব স্পষ্টও নয়, খুব নিরুত্তেজও নয়—এই ক'বছর ধরে বোধ করে এসেছি আমি।

আজ ন' বছর পরে আমার দ্বিতীয় কবিতার বই বের হলো। এর নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-এর পরিচয় দিচ্ছে। এ বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে। আজ যে সব মাসিক পত্রিকা আর নেই—প্রগতি, ধূপছায়া, কল্লোল—এ বইয়ের প্রায় সমস্ত কবিতাই সেসব মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল একদিন।

সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে। যদিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়, তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হয়ে বেঁচে রইলো।

আশ্বিন জীবনানন্দ

দাশ

১৩৪৩

কবিতা ❑ ১ নির্জন স্বাক্ষর ২ মাঠের গল্প [মেঠো চাঁদ, পেঁচা, পঁচিশ বছর পরে, কার্তিক মাঠে চাঁদ] ৩ সহজ ৪ কয়েকটি লাইন ৫ অনেক আকাশ ৬ পরস্পর ৭ বোধ ৮ অবসরের গান ৯ ক্যাম্পে ১০ জীবন ১১ ১৩৩৩ ১২ প্রেম ১৩ পিপাসার গান ১৪ পাখিরা ১৫ শকুন ১৬ মৃত্যুর আগে ১৭ স্বপ্নের হাতে।

রচনাকাল : ১৯২৫ থেকে ১৯২৯।

দ্বিতীয় সংস্করণ [প্রথম সিগনেট সংস্করণ] আশ্বিন, ১৩৬৩। প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস। ১০/২, এলগিন রোড, কলকাতা—২০। প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়। সহায়তা করেছেন পীযূষ মিত্র। ভূমিকা অশোকানন্দ দাশ [আশ্বিন ১৩৬৩]। মূল্য তিন টাকা, পৃ ১২+৯৩

প্রথম সংস্করণের সতেরটি কবিতাসহ আরো নতুন ১৪টি কবিতা 'অপ্রকাশিত কবিতা' শিরোনামে স্থান পেয়েছে। এ কবিতাগুলি ❑ ১ এই নিদ্রা ২ পাখি ৩ অঘ্রাণ ৪ শীত শেষ ৫ এই সব ৬ তাই শান্তি ৭ পায়রারা ৮ এই শান্তি ৯ বুনো হাঁস ১০ বৈতরণী ১১ নদীরা ১২ মেয়ে ১৩ নদী ১৪ পৃথিবীতে থেকে।

নক্ষত্র ব্যাপ্তির রাতে (কবিতা)

'উজ্জীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত।

নগ্ন নির্জন হাত (কবিতা)

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

নদী (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

নদী নক্ষত্র মানুষ (কবিতা)

১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

নব নব সূর্যে (কবিতা)

১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

নব নবীনের লাগি (কবিতা)

'কালি-কলম' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

নবপ্রস্থান (কবিতা)

১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় যুগান্তর'-এ প্রকাশিত হয়।

নবহরিতের গান (কবিতা)

'শারদীয় একক' পত্রিকায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

নাবিক (কবিতা)

'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

নাবিকী (কবিতা)

১৩৫১ বঙ্গাব্দে 'বৈশাখী' (বার্ষিকী) পত্রিকার বর্ষ ৩-এ কবিতাটি প্রকাশিত হয়

নারীসবিতা (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত।

নিঃসরণ (কবিতা)

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

নিজেকে নিয়েমে ক্ষয় (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় একক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

নিবিড়তর (কবিতা)

১৩৫১ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

নিবেদন (কবিতা)

'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

নিরঙ্কুশ (কবিতা)

'নিরুক্ত' পত্রিকার ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

নিরালোক (কবিতা)

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

নির্দেশ (কবিতা)

'নিরুক্ত' পত্রিকায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

নির্জন হাঁসের ছবি (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান (কবিতা)

'শারদীয় দেশ'-এ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

নিশির ডাক (কবিতা)

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

নীলিমা (কবিতা)

'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

পটভূমি (কবিতা)

'ক্রান্তি' পত্রিকার ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

পটভূমি কল্লোল (কবিতা)

১৩৫৩ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

পটভূমিবিসার (কবিতা)

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'মেঘনা' (সংকলন)-এ অন্তর্ভুক্ত।

পতিতা (কবিতা)

'কালি-কলম' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পড়ে গেলো একেবারে (কবিতা)

১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পরবাসী (কবিতা)

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'প্রগতি' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

পরস্পর (কবিতা)

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'প্রগতি' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

পরিচায়ক (কবিতা)

শারদীয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

পলাতকা (কবিতা)

'প্রগতি' পত্রিকার ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

পলাতক (কবিতা)

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

পাখিরা (কবিতা)

'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

পিপাসার গান (কবিতা)

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'প্রগতি' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

পুরোহিত (কবিতা)

'প্রগতি' পত্রিকার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

পৃথিবী আজ (কবিতা)

১৩৫৭ বঙ্গাব্দে শারদীয় 'দৈনিক সত্যযুগ'-এ প্রকাশিত হয়।

পৃথিবী ও সময় (কবিতা)

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে 'ক্রান্তি' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পৃথিবী গ্রহবাসী (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

পৃথিবী, জীবন, সময় (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় গণবার্তা'য় প্রকাশিত হয়।

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে (কবিতা)

১৩৫৩ বঙ্গাব্দে শারদীয় 'মাসিক বসুমতী'-তে প্রকাশিত।

পৃথিবীতে (কবিতা)

'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা)-এ ১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

প্যারাডিম (কবিতা)

'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

প্রতীক (কবিতা)

'উত্তরা' পত্রিকায় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

প্রার্থনা (কবিতা)

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকায় পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত।

প্রিয়দের প্রাণে (কবিতা)

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে 'অলকা' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত।

প্রেম (কবিতা)

'ধূপছায়া' পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

প্রেম অপ্রেমের কবিতা (কবিতা)

১৩৫০ বঙ্গাব্দে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

প্রেমিক (কবিতা)

'বন্দেমাতরম' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দে কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

ফসলের দিনে (কবিতা)

'কালি-কলম' পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

ফিরে এসো (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

ফুটপাথে (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

বড়ো বড়ো মাছ (কবিতা)

১৩৬৬ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকায় আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়।

বনলতা সেন (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

বনলতা সেন (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ পৌষ, ১৩৪৯ / ডিসেম্বর, ১৯৪২। কবিতাভবন (২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা) প্রকাশিত 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশক জীবনানন্দ দাশ, বরিশাল। মুদ্রাকর : ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন, মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস, ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা। কাগজের মলাট। প্রচ্ছদ শিল্পী শম্ভু সাহা। মূল্য : চার আনা। ডিমাই ৮ পেজি পৃ ১৬। কবিতার সংখ্যা ১২।

কবিতা ❑ ১ বনলতা সেন ২ কুড়ি বছর পরে ৩ ঘাস ৪ হাওয়ার রাত ৫ আমি যদি হতাম ৬ হায় চিল ৭ হাঁস ৮ শঙ্খমালা ৯ নগ্ন নির্জন হাত ১০ শিকার ১১ হরিণেরা ১২ বিড়াল।

দ্বিতীয় সংস্করণ [প্রথম সিগনেট সংস্করণ] শ্রাবণ, ১৩৫৯ [১৯৫২]। মূল্য: দুই টাকা। প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২, এলগিন রোড, কলকাতা—২০। মুদ্রাকর প্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, প্রচ্ছদপট মুদ্রক গসেন এন্ড কোম্পানি, ৭/১, গ্রান্ট লেন। বোর্ড বাঁধাই। প্রচ্ছদপট সত্যজিৎ রায়। ডিমাই ৮ পেজি পৃ ৪৯। কবিতার সংখ্যা ৩০।

কবিতা ❑ ১ বনলতা সেন ২ কুড়ি বছর পরে ৩ হাওয়ার রাত ৪ আমি যদি হতাম ৫ ঘাস ৬ হায় চিল ৭ বুনো হাঁস ৮ শঙ্খমালা ৯ নগ্ন নির্জন হাত ১০ শিকার ১১ হরিণেরা ১২ বেড়াল ১৩ সুদর্শনা ১৪ অন্ধকার ১৫ কমলালেবু ১৬ শ্যামলী ১৭ দুজন ১৮ অবশেষে ১৯ স্বপ্নের ধ্বনিরা ২০ আমাকে তুমি ২১ তুমি ২২ ধান কাটা

হয়ে গেছে ২৩ শিরীষের ডালপালা ২৪ হাজার বছর শুধু খেলা করে ২৫ সুরঞ্জনা ২৬ মিতভাষণ ২৭ সবিতা ২৮ সুচেতনা ২৯ অঘ্রাণ প্রান্তরে ৩০ পথ হাঁটা।

রচনাকাল : ১৩৩২ থেকে ১৩৪৬। ১৯২৫। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৯।

বরং নতুন এই (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৬২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বর্ষ-আবাহন (কবিতা)

১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বলিল অশ্বত্থ সেই (কবিতা)

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়েছি (কবিতা)

'অনুক্ত' পত্রিকায় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

বাতাসের শব্দ এসে (কবিতা)

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে সম্প্রতি (বার্ষিক-তে) প্রকাশিত।

বাসনা (কবিতা)

১৩৪৭ বঙ্গাব্দে 'পত্রিকা'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিজয়ী (কবিতা)

'গণবাণী' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিপাশা (কবিতা)

১৩৫৬ বঙ্গাব্দে 'মৌসুমী' (সংকলন)-তে বৈশাখ মাসে প্রকাশিত।

বিবেকানন্দ (কবিতা)

১৩৩২ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিভিন্ন কোরাস (কবিতা)

কবিতা পত্রিকায় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

'নিরুক্ত' পত্রিকায় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিস্ময় (কবিতা)

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

বুনো হাঁস (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

বৃক্ষ (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

বেড়াল (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বেদিয়া (কবিতা)

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'কালি-কলম' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

বেদুইন (কবিতা)

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বেলা অবেলা কালবেলা (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮, বৈশাখ [১৯৬১] প্রকাশক অশোকানন্দ দাশ নিউস্ক্রিপ্ট ১৭২/৩, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলকাতা—২৯। প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়। ডিমাই পৃ. ৭২। মূল্য : তিন টাকা। কবিতার সংখ্যা ৩৯। মন্তব্য : অশোকনন্দ দাশ [বৈশাখ, ১৩৬৮]

কবিতা ❑ ১ মাঘ সংক্রান্তির রাতে ২ আমাকে একটি কথা দাও ৩ তোমাকে ৪ সময়সেতু পথে ৫ যতিহীন ৬ অনেক নদীর জল ৭ শতাব্দী ৮ সূর্য নক্ষত্র নারী ৯ চারিদিকে প্রকৃতির ১০ মহিলা ১১ সামান্য মানুষ ১২ প্রিয়দের প্রাণে ১৩ তার স্থির প্রেমিকের নিকট ১৪ অবরোধ ১৫ পৃথিবীর রৌদ্রে ১৬ প্রয়াণ পটভূমি ১৭ সূর্য রাত্রি নক্ষত্র ১৮ জয়জয়ন্তীর সূর্য ১৯ হেমন্ত রাতে ২০ নারী-সবিতা ২১ উত্তরসাময়িকী ২২ বিস্ময় ২৩ গভীর এরিয়েলে ২৪ ইতিহাসযান ২৫ মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প ২৬ পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ২৭ পটভূমির ২৮ অন্ধকার থেকে ২৯ একটি কবিতা ৩০ সারাৎসার ৩১ সময়ের তীরে ৩২ যতদিন পৃথিবীতে ৩৩ মহাত্মা গান্ধী ৩৪ যদিও দিন ৩৫ দেশ কাল সন্ততি ৩৬ মহাগোধূলি ৩৭ মানুষ যা চেয়েছিল ৩৮ আজকে রাতে ৩৯ হে হৃদয়।

রচনাকাল : ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০।

বোধ (কবিতা)

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে 'প্রগতি' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'বোধ' কবিতাটিকে সামনে রেখে 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে (আশ্বিন, ১৩৩৬) প্রকাশিত মন্তব্যে অশালীন আক্রমণের সীমা অতিক্রম করেছিল : কবিতাটির নামকরণে বোধ হয় কিছু ভুল আছে, 'বোধ না হইয়া কবিতাটির নাম ' খোদ' হইবে। চালকুমড়া ফলার মতো ইহা মাংস ফলা-র কবিতা।

ভাষিত (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

ভারতবর্ষ (কবিতা)

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ভিখারী (কবিতা)

'নিরুক্ত' পত্রিকায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ভোর ও ছয়টি বমার : ১৯৪২ (কবিতা)

'সওগাত' পত্রিকায় ১৩৪২ বঙ্গাব্দের কার্তিক-সংখ্যায় প্রকাশিত।

ভোরের কবি জ্যোতির কবি (কবিতা)

১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

মকর সংক্রান্তির রাতে (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

মনকে আমি নিজে (কবিতা)

১৩৬৬ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

মনবিহঙ্গম (কবিতা)

'পূর্বাশা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

মনোবীজ (কবিতা)

১৩৪৭ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

মনোসরণি (কবিতা)

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।

মরীচিকার পিছে (কবিতা)

'কালি-কলম' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

মরুতৃণোজ্জ্বলা (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'ক্রান্তি' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মহাইতিহাস (কবিতা)

'উত্তরসূরি' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

মহাগ্রহণ (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

মহাজিজ্ঞাসা (কবিতা)

'শারদীয় আনন্দবাজার' পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

মহাত্মা (কবিতা)

'একক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মহাত্মা গান্ধী (কবিতা)

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

মহাপতনের ভোরে (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় যুগান্তর'-এ প্রকাশিত।

মহাপৃথিবী (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ ১৩৫১ [১৯৪৪]। প্রকাশক ও মুদ্রক সত্যপ্রসন্ন দত্ত, পূর্বাশা লিমিটেড, পি ১৩৪ গণেশচন্দ্র এভিনু্য। উৎসর্গ প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রিয়বরেষু। বোর্ড জ্যাকেট সম্বলিত।

মূল্য :দেড় টাকা। রয়াল পৃ ৮ + ৪০।

কবিতার সংখ্যা : ৩৫

ভূমিকা

'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলি ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮ এর ভেতরে রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বেরিয়েছে। ১৩৪২ থেকে ১৩৫০-এ। 'বনলতা সেন' ও অর্ন কয়েকটি কবিতা বের হয়েছিল 'বনলতা সেন' বইটিতে। বাকি সব কবিতা আজ প্রথম বইয়ের ভেতর স্থান পেল।

শ্রাবণ ১৩৫১ জীবনানন্দ দাশ

কবিতা ❑ ১ বনলতা সেন ২ হাজার বছর শুধু খেলা করে ৩ কুড়ি বছর পরে ৪ নিরালোক ৫ সিন্ধুসারস ৬ ঘাস ৭ ফিরে এসে ৮ হাওয়ার রাত ৯ শ্রাবণরাত ১০ আমি যদি হতাম ১১ হায় চিল ১২ মুহূর্ত ১৩ শহর ১৪ বুনো হাঁস ১৫ শঙ্খমালা ১৬ নগ্ন নির্জন হাত ১৭ শিকার ১৮ শব ১৯ হরিণেরা ২০ স্বপ্ন ২১ বেড়াল ২২ বলিল অশ্বত্থ সেই ২৩ আট বছর আগের একদিন ২৪ শীতরাত ২৫ আদিম দেবতারা ২৬ স্থবির যৌবন ২৭ আজকের এক মুহূর্ত ২৮ ফুটপাথে ২৯ প্রার্থনা ৩০ ইহাদেরই কানে ৩১ সূর্যসাগরতীরে ৩২ মনোবীজ ৩৩ পরিচায়ক ৩৪ বিভিন্ন কোরাস ৩৫ প্রেম অপ্রেমের কবিতা।

রচনাকাল : ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৮-১৯৪১। প্রথম সিগনেট সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭৬, প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগানেট প্রেস, ২৫/৪, ইকবালপুর রোড কলকাতা ২৩।

প্রচ্ছদ পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। উৎসর্গ 'শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীকে—বাবার আশীর্বাদ। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা/সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [২৪ আশ্বিন, ১৩৭৫] মূল্য : চার টাকা। ডিমাই পৃ ১২ + ৮২। কবিতার সংখ্যা ৩৯।

কবিতা ১ নিরালোক ২ সিন্ধুসারস ৩ ফিরে এসো ৪ শ্রাবণরাত ৫ মুহূর্ত ৬ শহর ৭ শব ৮ স্বপ্ন ৯ বলিল অশ্বত্থ সেই ১০ আট বছর আগের একদিন ১১ শীতরাত ১২ আদিম দেবতারা ১৩ স্থবির-যৌবন ১৪ আজকের এক মুহূর্ত ১৫ ফুটপাথে ১৬ প্রার্থনা ১৭ ইহাদেরি কানে ১৮ সূর্যসাগরতীরে ১৯ মনোবীজ ২০ পরিচায়ক ২১ বিভিন্ন কোরাস ২২ প্রেম অপ্রেমের কবিতা।

আমিষাশী তরবার ১ মৃত মাংস ২ হঠাৎ-মৃত অগ্নি ৪ উদয়াস্ত ৫ সুমেরীয় ৬ মৃত্য ৭ আমিষাশী তরবার ৮ তিনটি কবিতা। [সন্ধিহীন, স্বাক্ষর বিহীন; শান্তি; হে হৃদয়] ৯ ১৩৩৬-৩৮ স্মরণে ঘাস ১১ সমিতিতে ১২ কোরাস ১৩ দোয়েল ১৪ সমুদ্র-পায়রা ১৫ আবহমান ১৬ জর্নাল : ১৩৪৬ ১৭ পৃথিবীলোক ।

পুনশ্চ ❑ 'সিন্ধুসারস' কবিতার আদিলেখন। সম্পাদকের নিবেদন।

রচনাকাল : ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৪।

মহিলা (কবিতা)

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে 'নিরুক্ত' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মাঘ সংক্রান্তির রাতে (কবিতা)

'দ্বন্দ্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত ।

মাঝে মাঝে (কবিতা)

১৩৫৭ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মাঠের গল্প (কবিতা)

'ধূপছায়া' পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

মানুষ চারিয়ে (কবিতা)

১৩৫০ বঙ্গাব্দে 'দিগন্ত' পত্রিকায় (শারদীয়া সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।

মানুষ সেদিন (কবিতা)

'সেতু' (সংকলন)-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

মানুষের ব্যথা আমি (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

মুহূর্ত (কবিতা)

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

মূল্যনাশের দিকে (কবিতা)

'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

মৃত, বর্তমান উপেক্ষিত কবিদের (কবিতা)

'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায় ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মৃত মাংস (কবিতা)

১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মৃত্যু (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল (কবিতা)

১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'ময়ূখ' পত্রিকার শরৎ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মৃত্যুর আগে (কবিতা)

১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

মৃত্যু, সূর্য, সংকল্প (কবিতা)

১৯৪৭-এ প্রকাশিত ৯ই আগস্ট (সংকলন)-এ অন্তর্ভুক্ত।

মৃত্যু স্বপ্ন, সংকল্প (কবিতা)

'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়।

মোর আঁখিজল (কবিতা)

'কল্লোল' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

যতদিন পৃথিবীতে (কবিতা)

'দেশ' পত্রিকায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

যতিহীন (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত ।

যদিও দিন (কবিতা)

১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

যাত্রা (কবিতা)

'উত্তরসূরি' পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ।

যাত্রী (কবিতা)

১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রবাশিত হয়।

যুবা অশ্বারোহী (কবিতা)

'কালি কলম' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

যে কোনো আকাশে (কবিতা)

'স্বরাজ' পত্রিকায় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ কবিতাটি প্রকাশিত।

যেখানে মনীষী তার (কবিতা)

১৩৬৭ বঙ্গাব্দে 'উত্তরসূরি' পত্রিকার কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

রক্ত নদীর তীরে (কবিতা)

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'করিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রজনীগন্ধা (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকার রবীন্দ্র স্মৃতি সংখ্যায়, 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'পঁচিশে বৈশাখ' (সংকলন) গ্রন্থে।

১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'উষা' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এবং ১৩৯১ বঙ্গাব্দে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

রশ্মি এসে পড়ে (কবিতা)

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'শতভিষা' পত্রিকার শরৎ সংখ্যায় প্রকাশিত।

রাত্রি (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'নিরুক্ত' পত্রিকায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

রাত্রি ও ভের (কবিতা)

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে 'গিন্ত' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

রাত্রিদিন (কবিতা)

'শারদীয় ময়ূখ'-এ ১৩৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

রাত্রি, মন, মানব পৃথিবী (কবিতা)

১৩৫৭ বঙ্গাব্দে শারদীয় 'দৈনিক সত্যযুগ'-এ প্রকাশিত হয়।

রাত্রির কোরাস (কবিতা)

১৩৫১ বঙ্গাব্দে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।

রামদাস (কবিতা)

'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

রিস্টওয়াচ (কবিতা)

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রূপসী বাংলা (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৫৭ : প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২, এলগিন রোড, কলকাতা-২০। মুদ্রাকার : শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা। প্রচ্ছদপট সত্যজিৎ রায়। সহায়তা রেছেন পীযূষ মিত্র। উৎসর্গ 'আবহমান বাংলা—বাঙালি।' ভূমিকা

অশোকানন্দ দাশ [৩১ জুলাই, ১৯৫৭] আকার ডিমাই পৃ ৮ + ৬২। মূল্য তিন টাকা। কবিতার সংখ্যা ৬১।

কবিতার প্রথম পংক্তির সূচি ❑ ১ সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি ২ তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও— আমি এই বাংলার পারে ৩ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ ৪ যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে ৫ একদিন জলসিঁড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে ৬ আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে ৭ কোথাও দেখিনি, আহা, এমন বিজন ঘাস—প্রান্তরের পারে ৮ হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে না কি —দহের বাতাসে; ৯ জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে—আর এই বাংলার ঘাস ১০ যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে— দূর কুয়াশায় ১১ পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোনখানে সফলতা শক্তির ভিতর ১২ ঘুমিয়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে ১৩ ঘুমিয়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে ১৪ যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে রব— অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে ১৫ আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায় ১৬ যদি আমি ঝরে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায় : ১৭ মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিব না আর; ১৮ যে শালিক মরে যায় কুয়াশায়— সে তো আর ফিরে নাহি আসে; ১৯ কোথাও চলিয়া যাবো একদিন,—তারপর রাত্রির আকাশ ২০ তোমার বুকের থেকে একদিন চলে যাবে তোমার সন্তান ২১ গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায় ২২ অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে ২৩ ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ-দুপুর—চিল একা নদীটির পাশে ২৪ খুঁজে তারে মর মিছে—পাড়াগাঁর পথে তারে পাবে নাকো আর; ২৫ পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি—রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে ২৬ কখন সোনার রোদ নিভে গেছে—অবিরল সুপুরির সারি, ২৭ এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সবচেয়ে সুন্দর করুণ; ২৮ কত ভোরে দু'পহরে সন্ধ্যায় দেখি নীল সুপুরির বন ২৯ এই ডাঙ্গা ছেড়ে হায় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে ৩০ এখানে আকাশ নীল -- নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল ৩১ কোথাও মঠের কাছে যেইখানে ভাঙা মঠ নীল হয়ে আছে ৩২ চলে যাব শুকনো পাতা-ছাওয়া ঘাসে—জামরুল হিজলের বনে; ৩৩ এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তি আসে মানুষের মনে ৩৪ শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ—বহুকাল গেয়ে গেছ গান ৩৫ তবু তাহা ভুল জানি... রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা ৩৬ সোনার খাঁচার বুকে রহিব না আমি আর শুকের মতন; ৩৭ কত দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দু'জনে; ৩৮ এসব কবিতা আমি যখন লিখেছি বসে নিজ মনে একা ৩৯ কতদিন তুমি আর আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর ৪০ এখানে প্রাণের স্রোত আসে যায়—সন্ধ্যায় ঘুমায় নীরবে ৪১ একদিন যদি আমি কোনো দূর মান্দ্রাজের সমুদ্রের জলে ৪২ দূর পৃথিবীর গন্ধে ভরে ওঠে আমার এ বাঙালির মন ৪৩ অশ্বত্থ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী; ৪৪ ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে

আমার শরীর—৪৫ এই জল ভালো লাগে;—বৃষ্টির রূপালি জল কতদিন এসে ৪৬ একদিন পৃথিবীর পথে আমি ফলিয়াছি; আমার শরীর ৪৭ পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন বাস করে হৃদয়ের নরম কাতর; ৪৮ মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির আস্বাদ ৪৯ তুমি কেন বহু দূরে—আরো দূরে নক্ষত্রের অস্পষ্ট আকাশ ৫০ আমাদের রূঢ় কথা শুনে তুমি সরে যাও আরো দূরে বুঝি নীলাকাশ; ৫১ এই পৃথিবীতে আমি অবসর নিয়ে শুধু আসিয়াছি —আমি হৃষ্ট কবি ৫২ বাতাসে ধানের শব্দ শুনিয়াছি—ঝরিতেছে ধীরে ধীরে অপরাহ্ণ ভ'রে ৫৩ একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলার ৫৪ আজ তারা কই সব? ওখানে হিজল গাছ ছিল এক—পুকুরের জলে ৫৫ হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়—চিতা শুধু পড়ে থাকে তার, ৫৬ কোনোদিন দেখিব না তারে আমি; হেমন্তে পাকিবে ধান আষাঢ়ের রাতে ৫৭ ঘাসের ভিতরে যেই চড়ায়ের সাদা ডিম ভেঙে আছে—আমি ভালবাসি ৫৮ (এই সব ভালো লাগে); জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে ৫৯ সন্ধ্যা হয় —চারিদিকে শান্ত নীরবতা ৬০ একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে আর, জানি; ৬১ ভেবে ভেবে ব্যথা পাব—মনে হবে, পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম বেঁচে।

রচনাকাল : ১৯৩২ [১৯৩৪] মার্চ।

'রূপসী বাংলা' প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর সংস্করণ প্রথম প্রকাশ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪, সম্পাদক দেবেশ রায়। প্রকাশক প্রিয়ব্রত দেব, প্রতিক্ষণ প্রকাশন বিভাগ, ৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা৭০০০১৩। পরিকল্পনা পূর্ণেন্দু পত্রী। রয়াল পৃ. ২৬ + ১৫৮। মূল্য পেপারব্যাক সংস্করণ। কুড়ি টাকা। রাজ সংস্করণ পঁয়ত্রিশ টাকা। কবিতার সংখ্যা ৭৩। ভূমিকা দেবেশ রায়।

সিগনেট সংস্করণের ৫৬টি কবিতা ছাড়াও অপ্রকাশিত ১২টি কবিতা যুক্ত হয়েছে ❑ ১ সমুদ্রের জলে আমার দেহ ধুয়ে চেয়ে থাকি নক্ষত্রের পানে ২ তোমরা স্বপ্নের হাতে ধরা দাও ... ৩ গুবড়ে ফড়িং শুধু উড়ে যায় আজ... ৪ অনন্ত জীবন যদি পাই আমি... ৫ ঘরের ভিতর দীপ জ্বলে ওঠে... ৬ কতদিন ঘাসে আর মাঠে... ৭ আকাশে চাঁদের আলো... ৮ কেমন বৃষ্টি ঝরে মধুর বৃষ্টি ঝরে ৯ সন্ধ্যা হয়ে আসে—সন্ধ্যা হয়ে আসে ১০ গল্পে আমি পড়িয়াছি কাঞ্চী কাশী... ১১ চিরদিন শহরেই থাকি ১২ ঘাটশীলা।

রচনাকাল [?] পাণ্ডুলিপি খাতায় : মার্চ, ১৯৩৪।

রিস্টওয়াচ (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'পৌষ' সংখ্যায় প্রকাশিত।

লক্ষ্য (কবিতা)

'জয়শ্রী' পত্রিকায় (শারদীয় সংখ্যা) ১৩৬১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

লঘু মুহূর্ত (কবিতা)

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে 'নিরুক্ত' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শকুন (কবিতা)

'শতাব্দী' পত্রিকায় প্রকাশিত।

শঙ্খমালা (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিাকায় ১৩৪২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

শত শতাব্দীর (কবিতা)

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'পূর্বাশা' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

শতাব্দী (কবিতা)

'দেশ' পত্রিকায় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

শতাব্দী শেষ (কবিতা)

১৩৫১ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় একক' পত্রিকায় প্রকাশিত।

শতাব্দীর মানবকে (কবিতা)

১৩৬০ বঙ্গাব্দে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

শব (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

শবের পাশে (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

শহর (কবিতা)

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

শান্তি (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

শান্তি ভালো (কবিতা)

১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত।

শিকার (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

শিরীষের ডালপালা (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

শিল্পী (কবিতা)

'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকায় ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

শীতরাত (কবিতা)

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

শীতের রাতের (কবিতা)

১৩৫১ বঙ্গাব্দে 'একক' পত্রিকার বসন্ত সংখ্যায় প্রকাশিত।

শেষ শয্যায় (কবিতা)

'কালি-কলম' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

শ্মশান (কবিতা)

'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

শ্রাবণ রাত (কবিতা)

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের 'কবিতা' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

শ্রুতি-স্মৃতি (কবিতা)

'নিরুক্ত' পত্রিকায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

সন্ধিহীন, সাক্ষরবিহীন (কবিতা)

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

সপ্তক (কবিতা)

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

সবারই হাতের কাজ (কবিতা)

'ময়ূখ' পত্রিকায় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সবার ওপর (কবিতা)

১৩৬৩ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

সবিতা (কবিতা)

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় অভ্যুদয়'-এ প্রকাশিত হয়।

সময় (কবিতা)

'প্রাঙ্গণ' পত্রিকায় ১৩৬১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সময় মুছিয়া ফেলে (কবিতা)

'ময়ূখ' পত্রিকায় ১৩৬১-৬২ বঙ্গাব্দের পৌষ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সময় সেতু পথে (কবিতা)

'একক' পত্রিকায় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

সময়ের তীরে (কবিতা)

মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

সমারূঢ় (কবিতা)

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সমিতিতে (কবিতা)

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সমুদ্রচিল (কবিতা)

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

সমুদ্র-পায়রা (কবিতা)

১৩৫১ বঙ্গাব্দে 'বৈশাখী' (বার্ষিকী) সঙ্কলনে (বর্ষ ৩) কবিতাটি প্রকাশিত।

সহজ (কবিতা)

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'প্রগতি' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

সাতটি তারার তিমির (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ [১৯৪৮]। প্রকাশক আতাউর রহমান, গুপ্ত রহমান অ্যান্ড গুপ্ত, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা। মুদ্রাকর প্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা। বোর্ড বাঁধাই। প্রচ্ছদপট শিল্পী

সত্যজিৎ রায়। উৎসর্গ; হুমায়ুন কবির/বন্ধুবরেষু। মূল্য আড়াই টাকা। ডিমাই ৬ + ৮০। কবিতার সংখ্যা ৪০।

কবিতা ❑ ১ আকাশলীনা ২ ঘোড়া ৩ সমারূঢ় ৪ নিরঙ্কুশ ৫ রিস্টওয়াচ ৬ গোধূলি সন্ধির নৃত্য ৭ যেই সব শেয়ালেরা ৮ সপ্তক ৯ একটি কবিতা ১০ অভিভাবিকা ১১ কবিতা ১২ মনোসরণি ১৩ নাবিক ১৪ রাত্রি ১৫ লঘুমুহূর্ত ১৬ হাঁস ১৭ উন্মেষ ১৮ চক্ষুস্থির ১৯ খেতে প্রান্তরে ২০ বিভিন্ন কোরাস ২১ স্বভাব ২২ প্রতীতি ২৩ ভাষিত ২৪ সৃষ্টির তীরে ২৫ জুহু ২৬ সোনালি সিংহের গল্প, ২৭ অনুসূর্যের গান ২৮ তিমির হননের গান ২৯ বিস্ময় ৩০ সৌরকরোজ্জ্বল ৩১ সূর্যতামসী ৩২ রাত্রির কোরাস ৩৩ নাবিকী ৩৪ সময়ের কাছে ৩৫ লোকসামান্য ৩৬ জনান্তিকে ৩৭ মকরসংক্রান্তির রাতে ৩৮ উত্তরপ্রবেশ ৩৯ দীপ্তি ৪০ সূর্যপ্রতিম।

রচনাকাল : ১৩৩৫ থেকে ১৩৫০ / ১৯২৮ থেকে ১৯৪৩।

সামান্য মানুষ (কবিতা)

'নিরুক্ত' পত্রিকায় ১২৪৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

সারাৎসার (কবিতা)

'কবিত' পত্রিকায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

সিন্ধু (কবিতা)

'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সিন্ধুসারস (কবিতা)

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সুদর্শনা (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় ও 'শারদীয় উষা'র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

সুদর্শনা (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৮০-১৩৭৩, আগস্ট। প্রকাশক গোপালচন্দ্র রায়,, সাহিত্যসদন, এ ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২। প্রচ্ছদ কানাই রায়। মূল্য : চার টাকা। পৃ [১২ + ৫২]। কবিতার সংখ্যা ৪০। ভূমিকা গোপালচন্দ্র রায় [২১ আগস্ট ১৯৭৩]। কবিতা ❑ ১ এই পথ দিয়ে ২ তুমি আলো ৩ তোমায় আমি দেখেছিলাম ৪ তোমায় আমি ৫ এসো ৬ সে ৭ অন্ধকারে ৮ তোমায় আমি ৯ তোমার আমার ১০ জল ১১ সবার ওপর ১২ কে এসে যেন ১৩ রশ্মি এসে পড়ে ১৪ অনির্বাণ ১৫ অমৃতযোগ ১৬ ইতিবৃত্ত ১৭ আমি ১৮ চিঠি এল ১৯ হৃদয় তুমি ২০ অন্তর বাহির ২১ আজ ২২ রাত্রি ও ভোর ২৩ মনকে আমি নিজে ২৪ তুমি আজ ২৫ অনেক রক্তে ২৬ আজ ২৭ ফসলের দিনে ২৮ মরুতৃণোজ্জ্বলা ২৯ পৃথিবী, জীবন, সময় ৩০ তুমি ৩১ কোন ব্যথিতাকে ৩২ এখন ওরা ৩৩ স্বাতীতারা ৩৪ আলোকপাত ৩৫ এখন এ পৃথিবীর ৩৬ নদী নক্ষত্র মানুষ ৩৭ তোমাকে ৩৮ শান্তি ভাল ৩৯ হে জননী হে জীবন ৪০ শবের পাশে।

রচনাকাল : ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৪।

সুদূর বিধুর কবি (কবিতা)

'কালি-কলম' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সুন্দরবনের গল্প (কবিতা)

১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সুবিনয় মুস্তাফী (কবিতা)

১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সুমেরীয় (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

সুরঞ্জনা (কবিতা)

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে শারদীয় যুগান্তর-এ প্রকাশিত হয়।

সূর্য এলে (কবিতা)

১৩৬৬ বঙ্গাব্দে 'উত্তরসূরি' পত্রিকার কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সূর্য করোজ্জ্বলা (কবিতা)

১৩৫৬ বঙ্গাব্দে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সূর্য নক্ষত্র নারী (কবিতা)

'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

সূর্য নিভে গেলে (কবিতা)

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে 'একক' পত্রিকায় প্রকাশিত।

সূর্যপ্রতিম (কবিতা)

১৩৫১ বঙ্গাব্দে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

সূর্য সাগর তীরে (কবিতা)

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'পত্রিকা'র আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সৃষ্টির তীরে (কবিতা)

১৩৫০ বঙ্গাব্দে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

সৃষ্টির সময় (কবিতা)

'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সে (কবিতা)

১৩৬৬ বঙ্গাব্দে 'উত্তরসূরি' পত্রিকার কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় ও ১৩৬১ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সেইসব শেয়ালেরা (কবিতা)

১৩৫৫ বঙ্গাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

সৌরচেতনা (কবিতা)

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'চয়নিকা' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

স্বপ্ন (কবিতা)

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

স্বপ্নের ধ্বনিরা (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

স্বপ্নের হাতে (কবিতা)

'প্রগতি' পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ-মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

স্বভাব (কবিতা)

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

স্বাতীতারা (কবিতা)

শারদীয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

স্থবির যৌবন (কবিতা)

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

হঠাৎ তোমার সাথে (কবিতা)

'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় ১৩৯০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

হঠাৎ মৃত (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

হরিণেরা (কবিতা)

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

হাওয়ার রাত (কবিতা)

১৩৪২ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

হাঁস (কবিতা)

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে 'নিরুক্ত' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

হাজার বছর শুধু খেলা করে (কবিতা)

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

হাজার বর্ষ আগে (কবিতা)

'উষা' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

হায় চিল (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

হিন্দু মুসলমান (কবিতা)

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

হৃদয় তুমি (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

হে জননী, হে জীবন (কবিতা)

১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'অনুক্ত' পত্রিকার মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

হেমন্ত (কবিতা)

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

হেমন্ত কুয়াশায় (কবিতা)

'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

হেমন্ত রাত (কবিতা)

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

হেমন্তের নদীর পারে (কবিতা)

১৩৬৮ বঙ্গাব্দে 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

হে হৃদয় (কবিতা)

'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল মান্নান সৈয়দ, সংকলক ও সম্পাদক— প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : জীবনানন্দ দাশ, ঢাকা, অবসর প্রকাশন, ১৯৯৪।

তরুণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক

জীবনানন্দ জিজ্ঞাসা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫।

তাপস বসু, সম্পাদক

জীবনানন্দ দাশ ও সমকালীন ভাবনাক্রম। কলকাতা, পতরি প্রকাশন, ১৯৮৭।

দেবকুমার বসু, সম্পাদক

জীবনানন্দ স্মৃতি। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৩৭৮।

দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক

জীবনানন্দ : বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত। কলকাতা, ভারত বুক এজেন্সি, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।

দেবেশ রায়, সম্পাদক

জীবনানন্দ সমগ্র। কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স, ১৯৮৫-১৯৯৯। ১২ + ১ খণ্ড।

প্রভাতকুমার দাস

জীবনানন্দ দাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৪০৫।

'বিভাব', জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ১৯৯৮।
